ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

বাল্মীকি রামায়ণ

Talks on Valmiki Ramayana, delivered by Swami Samarpanananda at Ramakrishna Mission Vivekananda University before the students of Indian Spiritual Heritage Course

(Transcribed and edited by Amit Ray Chaudhuri)

ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়া পতয়ে নমঃ।।

বাল্মীকি রামায়ণ – ১৭ই এপ্রিল ২০১০

যদি তন্ত্র আর স্মৃতিকে হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা করে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে একটি বিশেষ শ্রেণীর শাস্ত্র হিন্দু ধর্মের মূল ধারার সঙ্গে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। মূল ধারা মানে, যে ধারাকে আধার করে আজকের দিনে ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম যে জায়গাতে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের যে মূল গ্রন্থগুলিকে প্রকৃত অর্থে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়, যে গ্রন্থ ও শাস্ত্রগুলো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ধর্ম জীবন ও সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করছে, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে জানার জন্য মানুষ যে গ্রন্থগুলোকে ভরসা করে, এই সব ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আমরা বিশেষ কয়েকটি বাছা বাছা পুস্তক পাই। এর মধ্যে সব থেকে আগে আসে বেদ, বেদের সাথেই জড়িয়ে আছে উপনিষদ। উপনিষদের পরে যেটা আসছে তাকে বলা হয় ইতিহাস। এই ইতিহাস শুধু দুটি বইকে নিয়ে – বাল্মীকি রামায়ণ আর ব্যাসদেব রচিত মহাভারত। ইতিহাসের পরে আসছে আঠারোটি পুরাণ, আর তার আঠারোটি উপপুরাণ। ভারতের ঠিক ঠিক ধর্মগ্রন্থ বলতে এই পাঁচটি – বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত আর আঠারোটি পুরাণ। এর মধ্যে বেদ আর উপনিষদকে বলা হয় শ্রুতি আর বাকি সব গ্রন্থকে স্মৃতি শাস্ত্র বলা হয়।

বেদ আর উপনিষদকে শ্রুতি বলা হচ্ছে এই কারণে যে, এর যা কিছু বিদ্যা সবই গুরুমুখী, অর্থাৎ গুরু শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। স্বামীজীও এই একই কথা বলেছেন, একমাত্র গুরুর কাছ থেকে শিষ্য শ্রবণ করেই এই বিদ্যাকে জানত। এর মধ্যে একটা ব্যাপার বোঝার আছে, অনেক পেছনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই আমরা যাকে ইতিহাস বলছি বা পুরাণ বলছি এগুলোও কিন্তু সব শোনা কথাই। যদি আমরা বেদ ও উপনিষদকে শোনা কথা বলি এতে কোন দ্বিমত হবে না, এটাই ঠিক ঠিক শ্রুতির ব্যাখ্যা হবে। কিন্তু আমাদের পরম্পরাতে ঋষিরা স্থির সিদ্ধান্ত করে যেটাকে শ্রুতি বলে দিয়েছেন সেটা শ্রুতিই, আর পরম্পরাতে যাকে স্মৃতি বলে দিয়েছে সেটা স্মৃতিই। বেদের এই অংশকে কেন সংহিতা বলা হচ্ছে আর এই অংশকে কেন ব্রাহ্মণ বলা হচ্ছে? পরম্পরাতে এটাই বলে দেওয়া হয়েছে। পরম্পরাতে যাকে শ্রুতি বা স্মৃতি বলে দিয়েছে, সবাই সেটাকেই শ্রুতি বা স্মৃতি রূপে মেনে নিয়েছে। পরের দিকে পণ্ডিতরা এসে নানা রকম বিচার করে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন এই এই কারণে এগুলো শ্রুতি আর এগুলো স্মৃতি। ওনারা নতুন নতুন পরিভাষা আর তথ্যের নিরিখে একটা ব্যাখ্যা দিলেন যে গুরুমুখী বিদ্যা অর্থাৎ গুরুর কাছ থেকে শোনা হত বলে এগুলো কে শ্রুতি শাস্ত্র বলা হয়েছে। কিন্তু বেদ, উপনিষদ, রামায়ণাদি ধর্মগ্রন্থ এতই প্রাচীন যে কে বলতে পারবে যে এগুলোকে কেন শ্রুতি বলা হয়েছে! কিন্তু যাই বলা হোক না কেন, শ্রুতি কেন বলা হচ্ছে, এর সঠিক উত্তর হচ্ছে – পরম্পরাতে এভাবেই সাজান হয়ে আছে। আর ভারতে পরম্পরাকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই পরম্পরাতে যেটাকে শ্রুতি বলা হয়েছে সেটা শ্রুতি আর পরম্পরাতে যাকে বলে দিয়েছে

স্মৃতি সেটা স্মৃতি। শ্রুতি আর স্মৃতির ব্যাখ্যাগুলি পরের দিকে এসেছে, এসব ব্যাখ্যা আগে কোথাও ছিল না। জিনিষটা আগে তৈরী হয়ে গেছে আর তার পরিভাষাটা পরে দেওয়া হয়েছে।

যাই হোক, হিন্দু ধর্ম মূলতঃ দু ধরণের শাস্ত্র দ্বারা পরিপুষ্ট - শ্রুতিমূলক শাস্ত্র আর স্মৃতিমূলক শাস্ত্র। শ্রুতিমূলক শাস্ত্রের সম্মান বেশী বলে যে পণ্ডিতের কাছে যা শাস্ত্র আছে তারা নিজেরটিকেই শ্রুতি বলবেন। যেমন তন্ত্র, এখন তন্ত্রকে আমরা কোন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব? তন্ত্রের পণ্ডিতরা বলবেন তন্ত্র শ্রুতি মূলক শাস্ত্র, কারণ সাক্ষাৎ ভগবান শিব নিজের মুখে পার্বতীকে বলেছেন, তাই তন্ত্র ভগবানের কথা। এই ধরণের সমস্যা ও বিরোধ চলে আসছে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে বেদ আর উপনিষদই শ্রুতি আর তার বাইরে যত শাস্ত্র আছে সব স্মৃতি। কিন্তু তন্ত্রের ক্ষেত্রে বলা যায় তন্ত্র এর দুটোর কোনটাতেই পড়ছে না। তন্ত্রশাস্ত্র একেবারেই অন্য ধরণের শাস্ত্র, এক দিক থেকে দেখতে গেলে তন্ত্র শ্রুতি মনে হবে আবার আরেক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তন্ত্র স্মৃতি শাস্ত্র হয়ে যাবে। কিন্তু প্রাচীন কালে তন্ত্রের অতটা প্রভাব ছিল না, আর তন্ত্রকে নিয়ে কারুর খুব একটা আগ্রহ না থাকাতে কেউ বেশি অধ্যয়নও করতেন না।

স্মৃতি মূলক শাস্ত্রে তিনটি জিনিষ পাওয়া যায় – প্রথম হল যাকে স্মৃতি বলছে, এই স্মৃতি মানে আচার ও আচরণ বিধি, যেমন মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, রঘুনন্দনস্মৃতি ইত্যাদি। দ্বিতীয় ইতিহাস মূলক স্মৃতি গ্রন্থ আর শেষে তৃতীয় পুরাণ। তন্ত্রকে এই তিনটের কোনটির মধ্যেই ধরা যাবে না, কারণ তন্ত্রকে ঠিক এভাবে বিভাজন করা যায় না।

যে কোন ধর্মের চারটে অঙ্গ থাকবেই, আমাদের হিন্দু ধর্মও এই চারটে স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছে – দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি আর তন্ত্র। বেদ ও উপনিষদ হিন্দু ধর্মের দর্শনকে ব্যাখ্যা করছে, পুরাণ হিন্দু ধর্মের যত পৌরাণিক আখ্যায়িকা গুলিকে ধরে রেখেছে, স্মৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণ ও বিধি অর্থাৎ লোকাচার, সমাজে থাকতে গেলে কি ধরণের আচার আচরণকে অনুসরণ করে চলতে হবে সেটা স্মৃতি বলে দিচ্ছে। চতুর্থ হল তন্ত্র, পূজার উপাচার, কি ভাবে পূজা করা হবে। এই তন্ত্র আমাদের হিন্দু ধর্মে তিনটে জায়গা থেকে আসে – একটা আসে বেদের সংহিতা থেকে, দ্বিতীয় পুরাণ থেকে আসে, আর তৃতীয় সব থেকে বেশি আসে তন্ত্রের নিজস্ব ধারা থেকে। গরুর যেমন চারটে পা, ঠিক তেমনি প্রত্যেক ধর্মের এই চারটে পা থাকতেই হবে। এই চারটি অঙ্গ না থাকলে কোন ধর্মই কোন দিন সর্বাঙ্গিন ভাবে শক্তিশালী হতে পারবে না।

ইতিহাস শাস্ত্র দুটি – বাল্মীকি রামায়ণ আর মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র বলতে ঠিক ঠিক যা বোঝায়, সেই অর্থে এই দুটিকে কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। আবার এই দুটিকে ঠিক ভাবে পুরাণও বলা যায় না, দর্শনও বলা যায় না, আবার পূজা উপাচারের শাস্ত্র মানে তন্ত্রও বলা যাবে না। অথচ এর সবটাই কিছু না কিছু এই দুটি গ্রন্থে পাওয়া যাবে। তৎকালীন সমাজে দুটো জিনিষ চলছিল – একদিকে কিছু উচ্চ আধ্যাত্মিক শ্রেণীর ঋষি ছিলেন, তাঁরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে কিছু কিছু মন্ত্র, সেই গায়ত্রীমন্ত্র থেকে শুরু করে বিবাহে কন্যাকে যে আশীর্বাদ করা হবে সেই মন্ত্র পর্যন্ত তাঁরা ধ্যানের গভীরে পেয়েছিলেন। ঋষিরা তাঁদের ধ্যানের গভীরে প্রাপ্ত উপলব্ধ জ্ঞানরাশি লোকের কাছে প্রচার করতেন না, কখন সখন কোন শিষ্য এলে আগে দেখে নিতেন এর যোগ্যতা আছে কিনা, যদি দেখতেন এর সত্যিই আগ্রহ আছে সাথে সাথে যোগ্যতাও আছে, তখন সেই শিষ্যকে কিছু কিছু মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে কয়েকটি নির্দেশ দিয়ে দিতেন। অন্য দিকে তখনকার সমাজে প্রচুর কাহিনী ও রীতিনীতি মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছিল। এই যেমন কিছু দিন আগে চৈত্র সংক্রান্তি গেল, ঐ দিন গাজন উৎসব হয়। গাজনে অনেক ধরণের ব্রত পালন করা হয়, এখন এই গাজন উৎসবের উৎসটা কোথায়, একটা কিছু ঘটনা এর পেছনে নিশ্চয়ই আছে যাকে ভিত্তি করে গ্রামের লোকেরা খুব উৎসাহ সহকারে গাজন উৎসব পালন করে। এই একটি ঘটনা দিয়েই বোঝা যাবে শ্রুতি আর স্মৃতি কি। শিবের গাজনে বলে কিছু লোকেরা সন্ন্যাসী হয় আর মুখে কাটারি নিয়ে ঝাঁপ দেয়। মিছি মিছি কেউতো ঝাঁপ দিতে যাবে না। যদি এদের কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় – তুমি কেন এই শিবের

গাজন করছ? তার উত্তরে এরা সবাই বলবে – আমার বাপ ঠাকুর্দা করত। এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় এর পেছনে কি কিছু কাহিনী আছে? তখন এদের কেউ হয়তো বলবে – অনেক আগে একজন কেউ ছিল যে শিবের কাছে বর চেয়েছিল, শিব তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন তুমি এই ভাবে ঝাঁপ মারবে ইত্যাদি। এমনি কি এখনও কোথাও যদি খোঁজ করা যায় তাহলে এই ধরণের কাহিনী পাওয়া যাবে। এটাকেই বলা হয় Oral Tradition বা মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, কোথাও এর লিখিত কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। এখন কোন খুব নামজাদা সাহিত্যিক বা কবি এই কাহিনীটাকে নিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে একটা আখ্যায়িকাতে দাঁড় করিয়ে দিলে সেটাই হয়ে যাবে Written Tradition, যেমনি এটা Written Tradition হয়ে গেল তখন সেটা ধর্মগ্রন্থে প্রবেশ করে গেল। যত ধর্মগ্রন্থ আছে, যত স্মৃতি মূলক গ্রন্থ আছে সবেতে এই জিনিষটাই হয়েছে। এই কাহিনীগুলি প্রাথমিক অবস্থায় লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

বিশ্ব সাহিত্যে দুটো খুব নামকরা কাহিনী আছে – একটা সেক্সপিয়রের রোমিও জুলিয়েত আর আরেকটি আরবিক কাহিনী লায়লা-মজনু। দুটো কাহিনীই খুবই সাধারণ কাহিনী, কিন্তু প্রতিভাবান সাহিত্যিকের হাতে পরে তার চেহারা আমূল পাল্টে গেছে। আজ এর ওপরেই কত সিনেমা, নাটক, কত কাব্যগাথা তৈরী হচ্ছে। কোন সাধারণ একটা প্রচলিত কাহিনীকে যদি চিরন্তন সাহিত্যে রূপান্তরি করতে কেউ চায় তাহলে কাহিনীটিকে একজন খুব প্রতিভাবান কবির হাতে দিয়ে দিতে হবে। স্মৃতির ক্ষেত্রে এই জিনিষটাই হয়েছিল।

সমাজে একটা জিনিষ চলছিল, যেমন একটা শিশুর জন্ম হলে তাকে নির্দিষ্ট কয়েক দিন বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে নেই, আতুর ঘরে রেখে দিতে হবে। আবার কয়েক মাস পরে তার অন্নপ্রাশন দিতে হবে, এই প্রথা গুলো আগে থেকেই চলে আসছিল। বাচ্চাদের সহজেই যে কোন সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করতে পারে, সেইজন্য বাড়ির বাইরে বার করা হত না। একটা অবস্থার পর তার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন হয়ে গেলে তাকে সবার কাছে ছেড়ে দেওয়া হত। এরপর উপনয়ন হয়ে গেলে পুরোপুরি তাকে সমাজে সবার কাছে ছেড়ে দেওয়া হত। এই ধরণের বিভিন্ন প্রথাগুলোকে স্মৃতিকাররা একটা জায়গায় লিপিবদ্ধ করে ধরে রাখলেন। ঠিক একই জিনিষই রামায়ণ মহাভারতের ক্ষেত্রেও হয়েছে। কিছু কিছু কাহিনী লোকের মুখে মুখে চলে আসছিল, কবিরা সেই কাহিনীগুলিকে ধরে নিয়ে নিজেদের সৃজনশীলতা আর প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর ভারতে এমন কোন কিছু নেই যেটা ধর্মকে বাদ দিয়ে করা হবে। অঙ্ক যেটা করতেন সেটাও ধর্মের মাধ্যমে করতেন। আর্যভট্ট, ভাস্কর এনারা সবাই বিরাট গণিতজ্ঞ কিন্তু প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন। চরক, শুশ্রুত যাঁরা বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন, এনারাও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ছিলেন। ভারতে ধর্মের বাইরে কখনই কেউ যাবে না। নাচ করবে সেখানেও ধর্ম, গান করবে সেখানেও ধর্ম, ছবি আঁকবে সেটাও আধ্যাত্মিক মনস্কতা নিয়ে আঁকবে, এমনকি যখন যুদ্ধ করবে সেখানেও ধর্মের বাইরে করবে না। এই একই জিনিষ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। সাহিত্যও আবার দুই ধরণের হয়, একটা ধর্মীয় সাহিত্য আরেকটি জাগতিক সাহিত্য। জাগতিকে সাহিত্যকেও ধর্ম তার দিকে টেনে নিয়ে এসেছিল। যেমন অনেক দিনে আগের পুরনো জাগতিক সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে কালিদাস খুব বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু কালিদাসের সাহিত্যেও শিব আর পার্বতীকে অবলম্বন করা হয়েছে। কুমারসম্ভবম্ বা রঘুবংশচরিত যদিও ধর্মীয় পুরুষদের নিয়ে লেখা কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বলা যাবে না।

তবে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে কোন ধর্মগ্রন্থই শাস্ত্র। শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়া। যদি কোন গ্রন্থে ধর্মীয় পুরুষ বা ভগবানের কথা বর্ণনা করা হয়ে থাকে অথচ মানুষের মনকে ভগবানের দিকে আকর্ষিত করছে না, তখন তাকে কোন ভাবেই শাস্ত্র বলা যাবে না। কাব্যগ্রন্থ আর ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মূল পার্থক্য এটাই। কালিদাসের কাব্যগ্রন্থের উদ্দেশ্য বা প্রবণতা কিন্তু মানুষকে ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়া নয়। সেই কারণে, যদিও ভগবানের কথা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তাকে শাস্ত্র বলা হচ্ছে না। কালিদাসের উদ্দেশ্য মানুষকে সাহিত্য রসের আস্বাদন করিয়ে আনন্দ দেওয়া,

সাহিত্যের মূল্যায়নে কালিদাসের রচনা যে অনেক উচ্চমানের এই ব্যাপারে কারুরই অস্বীকার করার উপায় নেই। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, তন্ত্রশাস্ত্র ইত্যাদি এই সব গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্যই হল মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া। যদিও বা ভগবানের দিকে না নিয়ে যায় কিন্তু আমাদের যে চারটি পুরুষার্থ – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের যে কোন একটি বা একের অধিক কোন একটা পুরুষার্থের দিকে নিয়ে যায় তখনও তাকে শাস্ত্র বলে মানা হবে। যেমন বাৎসায়ন কামশাস্ত্র রচনা করেছেন। কামশাস্ত্রে আসলে বলতে চাইছে নারী আর পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কীভাবে বৈবাহিক জীবন যাপন করবে। তখন তাদের ঐ জীবনটার পুরোটাই কামশাস্ত্র হয়ে যাচ্ছে। বাৎসায়ন, যিনি খুব উচ্চকোটির ঋষি ছিলেন, তিনি চারটে পুরুষার্থের কামের ব্যাপারগুলোকে codified করে নাম দিলেন কামশাস্ত্র। এই যে চতুর্বর্গ, তার যে কোন একটাকে নিয়ে সেটার দ্বারা কীভাবে সিদ্ধি লাভ করবে তার বর্ণনা করা হয়েছে। কামশাস্ত্রে কামের উপর জোর দিয়ে সেই কামকে কীভাবে সিদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তারই বর্ণনা করা হয়েছে আর সেটাই তাকে ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আবার বাল্মীকির রামায়ণ কিংবা ব্যাসদেবের মহাভারত মানুষকে হয় ধর্মের মাধ্যমে সিদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে নয়তো মোক্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যখন ধর্মের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন তাকে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছে আবার যখন মোক্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব তৈরী করে দিচ্ছে। অন্যান্য গ্রন্থ, যেমন চাণক্যের অর্থশাস্ত্রকে শাস্ত্র বলা হচ্ছে, আবার যখন কাব্যশাস্ত্র বলা হয় তখন বুঝতে হবে এখানে কবিতার মাধ্যমে তোমাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যখনই কোন কিছুর সাথে শাস্ত্র এই শব্দ যুক্ত হবে, আর মানুষ যদি তাকে গ্রহণ করে, তখন সব সময় বুঝতে হবে যে আমাদের মানুষ রূপে যে অস্তিত্ব আছে সেখান থেকে আমাকে আরও উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। কিভাবে নিয়ে যাচ্ছে? চারটে পুরুষার্থের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যে কোন একটি বা একের অধিকের সাহায্যে। সেইজন্য কালিদাস, সেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এনারা যাই রচনা করে থাকুন না কেন, এঁদের রচনাকে শাস্ত্র বলা যাবে না। অন্য দিকে কথামৃতকে মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়। মহাপুরুষদের জীবনী, যেমন শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনী, স্বামীজীর জীবনী এগুলোও ঠিক ঠিক শাস্ত্র।

শ্রুতিকে বলা হয় প্রভু সংহিতা আর স্মৃতিকে বলা হয় সুহৃদ সংহিতা। প্রভু সংহিতার অর্থ হচ্ছে – একজন প্রভু বা মালিক নিজের চাকরকে যে আদেশ করেন তাকে সেই আদেশই পালন করতে হয়, প্রভুর আদেশ অমান্য করার কোন রাস্তা নেই। স্মৃতিকে সুহৃদ বলা হচ্ছে, সুহৃদ মানে বন্ধু। বন্ধু যখন আমার ভালোর জন্য আমাকে কিছু করতে বলে তখন আমি সেটা করতেও পারি আবার নাও করতে পারি। শ্রুতি আর স্মৃতির মধ্যে এটাই বিরাট পার্থক্য। শ্রুতির যে আদেশ, যে উপদেশ তাকে সব সময় পালন করতেই হবে, কখনই অমান্য করা যাবে না। কিন্তু স্মৃতির উপদেশ বা আদেশকে অমান্য করা যায়, আমরা পালন করতেও পারি আবার নাও করতে পারি। সেইজন্য স্মৃতি কালে কালে, সময়ের গতির সাথে পাল্টাতে থাকে, নতুন নতুন স্মৃতি লেখা হয়। স্মৃতি বন্ধুর মত, আমার বাবা-মা কখনই পাল্টাবে না একজনই বাবা কিংবা মা থাকবেন কিন্তু বন্ধু অনেক আসবে অনেক যাবে। সেইজন্য শাস্ত্র অনেক তৈরী হতে পারে, এর কোন সীমাবদ্ধতা নেই। শ্রুতি কিন্তু নির্দিষ্ট করা আছে, সেই বেদ আর উপনিষদ, এর বাইরে আর কোন শ্রুতি নেই। এর বাইরে যা কিছু আছে সব সুহৃদ সংহিতা।

বেদকে বলা হয় রহস্য বিদ্যা। কেন রহস্য বিদ্যা বলা হচ্ছে বেদকে? যিনি জানেন তিনি তাঁর শিষ্যকেই একমাত্র বলছেন, আর কেউ জানতে পারছে না। রহস্য বিদ্যা মানে গুরুমুখী বিদ্যা। কিন্তু এখন যদি কেউ বলে আমি কোন গুরু করব না, আমি কারুর কাছে যাব না। তখন কি হবে? এই যেমন গাজন অনেকে পালন করছে না আবার অনেকে করছে। ঠিক তেমনি কিছু কিছু জিনিষ আছে অন্যরা করে না। বেদ একেই শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের জন্য, তারপরে করে দিচ্ছে রহস্য বিদ্যা। তাহলে ব্রাহ্মণদের বাইরে বাকিরা শাস্ত্রের ব্যাপারে জানবে কি করে? এটাই প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে – মুখে মুখে যে কাহিনী আর রীতিনীতি, বিধি নিষেধ চলে আসছিল সেগুলোকে একত্র করে একটা জায়গায় দাঁড় করান হল, তখন

এগুলোকে বলা হচ্ছে Auxiliary Literature মানে সহায়ক শাস্ত্র, অথবা বলা যেতে পারে supporting literature, মূল ধর্ম গ্রন্থ বেদ ও উপনিষদ, কিন্তু এই দুটোকে সাহায্য করার জন্য আরও অনেক ধরণের শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য ধর্মেও শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রের এই ধরণের বিভাজন আছে। ইসলাম ধর্মে এক দিকে যেমন কোরান আছে আবার অন্য দিকে হাদিস্‌ও আছে। কোরানে মূলতঃ সেই কথাগুলিই আছে যা আল্লা মহম্মদকে আদেশ করেছিলেন। আর মহম্মদ যেগুলো করেছিলেন, যেসব কথা বলেছিলেন, যেগুলো তিনি করেননি বা নিষেধ করেছিলেন সেগুলোকে আবার আরেকটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাকেই বলছে হাদিস্‌। আমাদের যদি কোন কিছুতে সংশয় হয় তখন প্রথমে বলবে এই ব্যাপারে বেদে কি বলা হয়েছে, যদি বেদে না পাওয়া যায় তখন দেখা হবে পুরাণে কি বলছে। ঠিক সেই রকম মুসলমানরাও প্রথমে কোরানে দেখবে, যখন কোরানে পাওয়া যাবে না তখন হাদিস্‌ কি বলছে দেখবে। হাদিসে যদি না পাওয়া যায় তখন তারা দেখবে এর আগের আগের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে কি করা হয়েছিল। হাদিসে না পাওয়া গেলে শারিয়ৎ এ দেখা হবে, শারিয়ৎএ যদি কিছু থাকে সেখানে কি করা হয়েছিল বার কর। জুদাইজিমেও এই ধরণের পর্যায়ক্রমে শাস্ত্র আছে। খ্রীশ্চানদের কাছে ওল্ড টেস্টামেন্ট স্মৃতির মত, অথচ জুইস্‌দের কাছে ওল্ড টেস্টামেন্ট হয়ে যায় শ্রুতি। বৌদ্ধ ধর্মেও এই একই জিনিষ। যে কোন ধর্মের যা সার সেটা খুব ছোট্ট অঙ্গ, কিন্তু ঐ ছোট্ট অঙ্গকে সহায়তা করার জন্য আরও অনেক শাস্ত্রের উদ্ভব হয়।

ইতিহাস রচিত হয় একটি মূল চরিত্রকে নিয়ে, যেমন বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রকে মূল কেন্দ্র করে রামায়ণ রচনা করলেন। ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণ আর পাণ্ডবদের চরিত্রকে কেন্দ্র করে মহাভারত রচনা করলেন। এই মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক অথবা তারও আগেকার দিনে যেসব মহাপুরুষরা ছিলেন তাঁদের কথা ও জীবনের কিছু ঘটনা, সেই সময়কার ছোট বড় ঘটনা, রীতিনীতি আর প্রচলিত কিছু গল্প ও কাহিনীকে, যেগুলো মানুষের মুখে মুখে চলে আসছিল, এই জিনিষগুলিই ইতিহাসে একত্রে জায়গা করে নিয়েছিল। এখন কেউ যদি স্বামীজীর জীবনকে মূল কেন্দ্র করে কোন কাহিনী রচনা করেন আর তার মধ্যে স্বামীজীর সময়ের আরও কিছু ঘটনা, ভারতের সেই সময়ে যে ধরণের সমাজ ব্যাবস্থা ছিল তাকে নিয়ে কবিতার আকারে লেখেন তখন সেইটাই হয়ে যাবে ইতিহাস মূলক শাস্ত্র। তবে এই ধরণের কাজ অনেক পরিশ্রম সাপেক্ষ।

ইতিহাস যখন ধর্মের সারতত্ত্ব বা আধ্যত্মিক তত্ত্বের কথা বলছে তখন সেটা সব সময়ই নেওয়া হয়েছে বেদ উপনিষদ থেকে। এই তত্ত্বগুলিকে খাপে খাপে বসিয়ে দেবে সেই সময়কার কোন জীবিত মহানায়কের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে। আর তার সঙ্গে সেই সময়কার মূল্যবোধ, প্রথা, আচার, আচরণ সব কিছুকে উল্লেখ করে কাহিনীর সাথে জুড়ে দেবে। এইভাবেই ইতিহাস মূলক শাস্ত্রের জন্ম হয়। ইতিহাস মূলক শাস্ত্রের একটা খুব বড় সুবিধা হল এখানে যে কোন নৈর্ব্যক্তিক জিনিষকে মুর্ত রূপ দিয়ে সামনে নিয়ে আসা যায়। স্মৃতিপ্রধান শাস্ত্রের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য, নৈর্ব্যক্তিককে মুর্ত রূপে প্রস্তুত করা হয়। যেমন বেদে বলা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার চরম সত্য ব্রহ্ম বা আত্মা, এর বাইরে বেদ আর কিছু বলবে না, যা কিছু বলার সব নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে শেষে এই একটি তত্ত্বে এনে ঠেলে দেবে। কিন্তু ইতিহাস মূলক ধর্মগ্রন্থে বলা হবে শ্রীরামচন্দ্র হলেন ভগবান, ভগবানই ব্রহ্ম। ঠাকুরের নামে গান আছে – তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম। এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় ব্রহ্ম কি? তখন আর উত্তর দিতে পারবে না, কারণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। রামকৃষ্ণকে আমরা জানি, কিছুটা বুঝি, শ্রীরামকৃষ্ণই ভগবান, ভগবান মানেই ব্রহ্ম এগুলোও না হয় একটু একটু বুঝবে, কিন্তু ব্রহ্ম কি আর কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলা হচ্ছে তার উত্তর আমাদের কাছে জানা নেই। ইতিহাস আর পুরাণে নিরাকারকে সাকার করে দেখান হয়, ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁকেই সাকার রূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এখন কেউ যদি শক্তিকে ব্যাখ্যা করতে চায়, তখন সে শক্তিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব? শক্তিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ শক্তি নৈর্ব্যক্তিক, ঠিক তেমনি, ক্রোধ, হিংসা এগুলিকেও ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ ক্রোধ, হিংসা এগুলোও সব অমুর্ত। কিন্তু এখানে, ইতিহাস মূলক শাস্ত্র এই ধরণের যত অমুর্ত আছে তাদের একটা মুর্ত রূপ দিয়ে দিচ্ছে।

স্মৃতিমূলক শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল – এখানে সবাই যে যে অবস্থাতে আছে সেখান থেকেই মহৎ হতে পারবে। বেদ উপনিষদে যদি কেউ মহৎ হতে চায় তাহলে তাকে আগে ঋষি হতে হবে, তার আগে তাকে সন্ন্যাসী হতে হবে, জঙ্গলে যেতে হবে, তপস্যা করতে হবে। কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্রে দেখা যাচ্ছে সেখানে সে যেখানেই থাকুক না কেন, সেখান থেকেই সে মহৎ হয়ে যেতে পারবে। একজন গৃহিণী শুধু তার স্বামীর সেবা করেই মহৎ হয়ে যেতে পারে। মানুষ যত নীচু পেশাতেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, সেখান থেকেই সে মহৎ হয়ে যেতে পারবে, যে ব্যাধ, মাংস বিক্রী করা যার বংশগত পেশা, সে মাংস কেটেই মহৎ হয়ে যেতে পারে। এখানে কেউ ব্যাধকে বলতে পারবে না যে, তুমি এই বাজে কাজ করছ তোমার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল। কথা হচ্ছে তুমি যে কাজই কর না কেন, তুমি যদি সেই কাজ নিষ্কাম ভাবে কর তাতেই তুমি মহৎ হয়ে যাবে। ব্যাধগীতার কাহিনীতে ঠিক এই জিনিষটাকেই তুলে ধরা হয়েছে। রামায়ণে শবরীর কাহিনীতে দেখব শবরী ছিল নীচ বর্ণের আদিবাসী মহিলা, কিন্তু সে শুধু শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করে করে মহৎ হয়ে গেল। বেদ উপনিষদ থেকে স্মৃতিমূলক শাস্ত্রে এটা একটা বিরাট পরিবর্তন।

আমরা যখন স্কুলে পড়তে যাই তখন আমরা কিছু হতে যাই, আমি গ্রাজুয়েট হতে চাই, আমি মাস্টার ডিগ্রি করতে চাই। সবাই কিছু হতে চাইছি। স্মৃতি মূলক শাস্ত্রে কিন্তু এধরণের কোন কথা বলবে না, তুমি যা আছ ঠিকই আছ, এখান থেকেই তুমি সংগ্রাম করে বড় হয়ে যেতে পারবে। তোমাকে মহৎ হওয়ার জন্য তোমাকে ব্রাহ্মণ হতে হবে না, তোমাকে সন্ন্যাসী হতে হবে না, তোমাকে ঋষি হতে হবে না, তোমাকে গ্রাজুয়েট হতে হবে না, তোমাকে পিএইচডি করতে হবে না। তুমি যেমনটি আছে ঠিকই আছ, এখান থেকেই তুমি বিরাট হয়ে যেতে পারবে অবশ্য তোমার যদি লক্ষ্যটা পরিষ্কার থাকে। তোমার যদি ঈশ্বর লাভ করাই লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে তুমি যেখানে আছ সেখান থেকেই তোমার ঈশ্বর লাভ হয়ে যাবে, তুমি মহৎ হয়ে যাবে, এর জন্য তোমার জীবিকাকে পাল্টাতে হবে না। তুমি যে জীবিকার দ্বারা জীবন নির্বাহ করছ সেই জীবন ও জীবিকার মধ্যে থেকে তোমার চিন্তা ভাবনাগুলিকে একটু পাল্টে নিলেই তুমি মহৎ হয়ে যাবে। বেদ উপনিষদের যুগ থেকে স্মৃতির যুগে এটা একটা বিরাট পরিবর্তন।

আরেকটা যেটা বিরাট পরিবর্তন তা হল, সহায়ক শাস্ত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করা যেত। লেখার পদ্ধতি যখন শুরু হল তখন বেদের উপর বোঝাটা অনেক কমে গেল। বেদের সময় লেখালেখির কোন ব্যাপারই ছিল না, সব কিছু মুখস্ত করে রাখতে হত। কিন্তু স্মৃতিগুলো লেখা হত বলে আর মুখস্ত করে রাখতে হত না, তবে কারুর যদি ইচ্ছে হত সে মুখস্ত করে রাখতে পারত কিন্তু বাধ্যতামূলক ছিল না, লোকে যেমন এখন গীতা মুখস্ত করে, উপনিষদকে মুখস্ত করে রাখে। মুখস্ত করাটা বাধ্যাতামূলক থাকল না বলে স্মৃতি মূলক শাস্ত্রগুলি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে বৃহৎ সংখ্যার মানুষের কাছে পৌঁছে গেল।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে নীতিবোধ ও নৈতিকতার সম্বন্ধে বলা হয়েছে *সত্যং বদ ধর্মং চর* – সত্য কথা বলবে, ধর্মাচরণ করবে, এই কথাগুলো পরিষ্কার শিক্ষামূলক কথা। কিন্তু যখনই সহায়ক শাস্ত্রে আসবে তখন এই কথাগুলিকে কাহিনীর মাধ্যমে একটা মুর্ত রূপ দিয়ে দেবে। কিছু দিন আগে পিয়ারলেস হাসপাতালের সামনে খুব গোলমাল হয়েছিল, এই গোলমালটাকে লক্ষ্য করে কয়েকজন মন্ত্রী বলছেন এই গোলমালটা আসলে পাড়ার কিছু মস্তান ছেলেদের তাণ্ডব নৃত্য। এখন তাণ্ডব এই শব্দটা আমরা শিবের কাহিনীতে পাই, শিব সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন, তাণ্ডব শব্দের পেছনে বিনাশের ভাব আসে। শিব যখন সতীর মৃত দেহ কাঁধের উপর ফেলে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছিলেন তখন পুরো জগতের বিনাশ হতে বসেছিল। এখন যারা অতি সাধারণ লোক যখন একটা শব্দ তাণ্ডব শুনে নিল তখন বুঝে নিচ্ছে

কি বলতে চাইছে। এখন যদি বলে সীতা, তখনও বুঝে নিচ্ছে সীতা বলতে কি বোঝাতে চাইছে, আবার যখন কেউ বলছে আমি সীতার মত হতে পারব না, তখনও বুঝে নিচ্ছে কি বলতে চাইছে। যে নীতিবোধ ও নৈতিকতা বেদে অমুর্ত ছিল সেগুলিকেই পরের দিকে যত সহায়ক শাস্ত্রে মুর্ত করে দেওয়া হলে। গল্পছলে মানুষকে যা বলা হয় মানুষ সেটা সহজে বুঝে নেয়। স্মৃতি মূলক শাস্ত্রে এগুলিকে সহজ করে দেওয়াতে মানুষের অনেক সুবিধা হয়ে গেল।

বেদ আর উপনিষদের ঠিক পরে বাল্মীকি রামায়ণ রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এখন বলা খুব মুশকিল বাল্মীকি ঠিক কোন সময়ে এসেছিলেন, তবে অনেকে বলেন দু হাজার খ্রীষ্টপূর্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন, তার মানে আজ থেকে চার হাজার বছর আগে। শ্রীরামচন্দ্রের এই সময়কে নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে এখন মতৈক্য হয়নি। একজন আরেকজনের মতকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করছে আবার অপর পক্ষ তাদের যুক্তি দিয়ে অন্যের বক্তব্যকে খণ্ডন করে দিচ্ছেন। কেউই কারুর মতকে মানতে চান না। কিন্তু এটা সবাই মানেন যে বেদ ও উপনিষদের পরে আর মহাভারতের আগের সময়টা শ্রীরামচন্দ্রের সময়, আর শ্রীরামচন্দ্রের জীবিত থাকাকালীন অবস্থাতেই বাল্মীকি তাঁর অমর গ্রন্থ রামায়ণ রচনা সম্পন্ন করেন। মহাভারতের আগে, মানে অনেক আগে রামায়ণ রচিত হয়েছে – এই ব্যাপারে কারুর দ্বিমত নেই। তবে আমরা যদি রামায়ণের সময় কালকে দু হাজার খ্রীষ্টপূর্ব ধরে নিই তাহলে খুব একটা হেরফের হবে না।

তবে যেটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে সেটা খুব উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকি রামায়ণে আমরা চারজন বিরাট মাপের ঋষিকে একই সাথে পাচ্ছি – বাল্মীকি রামায়ণে বশিষ্ঠ আছেন, বিশ্বামিত্র আছেন, ভরদ্বাজ আছেন আর বাল্মীকি তো আছেনই। রামায়ণে ব্যাসদেবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ব্যাসদেব হলেন মহাভারতের সময়কার। বৈদিক মন্ত্রের ব্যাপারে বিশ্বামিত্রের বিরাট ভূমিকা আছে, তবে রামায়ণের বিশ্বামিত্রের ব্যাপারে এটা ঠিক পরিষ্কার নয় যে, বিশ্বামিত্র কি পারবারিক উপাধি সূত্রে একটি নাম, না কি কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম, না কি একটা সাধারণ কারুর নাম। যেমন গদাধর চট্টোপাধ্যায়, এখন বিশ্বামিত্র এই নামটা গদাধরের মত একটি নাম নাকি চট্টোপাধ্যায়ের মত একটা কোন পারিবারিক উপাধি, এই ব্যাপারটা কারুর কাছে পরিষ্কার নয়। অন্য দিকে বিশ্বামিত্র আবার একটি গোত্র। বিশ্বামিত্রের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই বেদে। বেদের পরে রামায়ণে বিশ্বামিত্রের পরিষ্কার উল্লেখ পাচ্ছি। এখন বেদের বিশ্বামিত্র আর রামায়ণের বিশ্বামিত্র একই ব্যক্তি কিনা বলা খুব কঠিন, কারণ একই বিশ্বামিত্র হলে কিন্তু সময়ের নিরিখে মিল খাবে না। সময়ের নিরিখে মিলবে যদি ধরে নেওয়া হয় রামায়ণ যখন লেখা হচ্ছে তখনও বৈদিক যুগ চলছে। এরও সম্ভবনা রয়েছে, কারণ বৈদিক যুগের শেষ রেখা টানা হয়েছিল ব্যাসদেবের সময়। বৈদিক যুগ আর পরবর্তি বৈদিক যুগের বিভাজন ব্যাসদেবই করেছিলেন। ব্যাসদেব আর বাল্মীকির সময়ের তফাৎ হচ্ছে প্রায় পাঁচশ বছরের, তার মানে আমাদের সময়ের সাথে আকবরের সময়ের যতটা তফাৎ। পাঁচশ বছরের ব্যবধানটা অনেকটাই হয়ে যায়।

বাল্মীকি ছিলেন একজন ঋষি, অনেক অধ্যয়ন ও তপস্যা করেছিলেন। ওনার জীবন নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। একটা খুব প্রচলিত মত যে তিনি ছিলেন আদিবাসী প্রধান নিষাদ বংশের সন্তান, তাঁর তখন নাম ছিল রত্নাকর, আর তাঁর কাজ ছিল চুরি ডাকাতি করে বেড়ান। একবার সপ্তর্ষী মণ্ডলের ঋষিদের একজন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় দস্যু রত্নাকরের হাতে ধরা পড়েছে। তার সব লুটপাট করবার জন্য তিনি ঋষিকে আটকেছেন। ঋষি তখন বলছেন – তুমি আমাকে আগে হত্যা না করে বল, তুমি যে এত পাপ কর্ম করছে এই পাপের বোঝা কে নেবে? তোমার স্ত্রী কতটা নেবে, তোমার বাবা-মা কতটা নেবে আর তোমার সন্তানই বা কতটা নেবে? এটা একবার তুমি বাড়ি থেকে জিজ্ঞেস করে এস। বাল্মীকি ভাবল আমি বাড়ি চলে যাব আর ইতিমধ্যে এই ঋষি পালিয়ে যাবার মতলবে এই ফন্দি করছে। ঋষি তাঁর মনের ভাব বুঝে নিয়ে বলছেন তুমি বাড়ি যাবার আগে আমাকে এই গাছে খুব করে বেঁধে রেখে যাও। এই সব গল্পের কোন ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। একেই সাধু বাবারা নিঃসম্বল হয়ে চলাফেরা করেন, তাও আবার

তখনকার দিনের সাধুবাবা, উপরন্তু তিনি হচ্ছে সপ্তর্ষী ঋষিদের একজন, কৌপিন ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই নেই। এ হেন নিঃসম্বল ঋষির কাছ থেকে কি আর লুটপাট করবে আর বেঁধেই বা রাখবে কেন বোঝা খুব মুশকিল।

সে যাই হোক, ঋষিকে বেঁধে রেখে উনি বাড়িতে এসে বউকে জিজ্ঞেস করেছেন সে তাঁর পাপের বোঝা কতটা নেবে। বউতো শুনে তাঁকে এই মারতে আসে কি সেই মারতে আসে – তুমি আমাকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছ আমাকে ভরণ-পোষণ করবে বলে, এখন তুমি যেখান থেকে পার, যেভাবে পার তোমার দায়ীত্ব আমার ভরণ-পোষণ করা, তা তোমার সেই কাজের পাপের ভাগ আমি কেন নিতে যাব! বাবা-মারও একই কথা। কেউ তাঁর পাপের বোঝা লাঘব করতে রাজী নয়। বাল্মীকির চোখটা তখন খুলে গেল, চোখ খুলতেই তিনি ঋষির পায়ে পড়ে গিয়ে বলছেন – আজ পর্যন্ত আমি এই জীবনে যা যা পাপ করে ফেলেছি তাতে আমার তো আর কোন গতি হতে পারে না। ঋষি তখন তাঁকে মাটি থেকে তুলে আশ্বাস দিয়ে বলছেন – হ্যাঁ, তোমার গতি হবে, তুমি সর্বদা 'রাম' এই নাম জপ করতে থাক। বাল্মীকি নাকি এত বড় পাপী ছিল যে 'রাম' এই নামটাও উচ্চারণ করতে পারছেন না, তিনি তখন 'মরা', 'মরা' জপ করতে থাকলেন। মরা, মরা যদি টানা বলতে থাকে তাহলে রাম হয়ে যায়। এগুলো হল সব আজগুবি গপ্পো।

একজন মানুষ সাধনার দ্বারা অনেক কিছু অর্জন করে নিতে পারে। তাকে ডাকাত থেকে ঋষি পর্যন্ত বানিয়ে দেওয়া যায় তপস্যার দ্বারা, মরা জপ করিয়ে রাম জপ করিয়ে দেওয়া যায়। সব কিছুই করে নিতে পারবে কিন্তু তাকে সংস্কৃতের পণ্ডিত কোন ভাবেই বানিয়ে দেওয়া যাবে না। ঠাকুর নিজেও সংস্কৃত জানতেন না। একটা সময়ে স্বামীজী সংস্কৃতের সামনে নিজেকে অসহায় মনে করছিলেন এই ভেবে যে তিনি সংস্কৃত ভাষা ঠিক ঠিক শিখতে পারছেন না। আর স্বামীজীর গুরুভাইয়েদের মধ্যে স্বামী অভেদানন্দজী ছাড়া কেউই ইংরাজী ভাষার বড় পণ্ডিত ছিলেন না। ভাষার দক্ষতা সম্পূর্ণ আলাদা একটা বিষয়, বাল্মীকি রামায়ণে পরের দিকে দেখতে পাব যেখানে হনুমানের সাথে শ্রীরামচন্দ্রের প্রথম দেখা হয়েছে সেই সময় হনুমানের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণকে বলছেন 'হে লক্ষ্মণ, এর কথাগুলো শুনেছ? এর কথা বলার মধ্যে কোন ধরণের জড়তা নেই। সব কথাই পরিষ্কার আর স্পষ্ট, তার মানে এর মনটা পরিষ্কার। আর এর প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ সুস্পষ্ট, বাক্যের প্রত্যেকটি শব্দ-বিন্যাস একেবারে স্পষ্ট এবং ব্যাকরণের দিক থেকেও একেবারে নিখুঁত। তার মানে লোকটি সুসংস্কৃত আর পড়াশোনা করা'। যারা চালাকি করে, কোন বদ উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলতে আসে তখন সে অবশ্যই কথা বলার সময় কয়েক বার ঢোক গিলবে, কাশি আসবে, তোতলাম করবে, কথার মধ্যে অস্পষ্টতা, জড়তা এই সব জিনিষগুলো ধরা পরবে। যে কোন লোককে যদি বুঝতে হয় তাহলে তার কথাতে, তার কথা বলার ভঙ্গিতে, তার বাক্যে শব্দগুলির চয়ন দিয়েই বোঝা যাবে লোকটি কেমন স্বভাবের, তার মনোভাব কি, কতটা বিদ্বান আর কতটাই বা সংস্কৃতবান। এগুলো বোঝার জন্য যোগী হওয়ার দরকার লাগে না। একজন গ্রাজুয়েট ছাত্র একটা ক্লাশ ওয়ানের ছেলের কথা শুনেই বুঝে নিতে পারে তার বিদ্যের দৌড় কত দূর। আমি ভাষাতে কি শব্দ ব্যবহার করছি, কি ধরণের শব্দের ব্যবহার করছি না, কথা বলার সময় কোথায় থামছি, কোথায় থামছি না, এগুলি দিয়ে বোঝা যায় আমি প্রশিক্ষণ কেমন পেয়েছি, শুধু পেয়েছি নয়, কেমন গ্রহণ করেছি। যে কোন লোকের সাথে এক আধ ঘণ্টা কথা বললেই লোকটির এই ব্যাপার গুলোকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই তার স্বভাব চরিত্রের হাল হকিকৎ জেনে নেওয়া যাবে, শুধু তাই নয় ঐটুকু সময়ের মধ্যে তার মনের ভেতরের সব খবরও পড়া হয়ে যাবে।

বাল্মীকির রামায়ণ পড়লেই বোঝা যাবে বাল্মীকি সংস্কৃতের কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর সংস্কৃতের ভাষা ছিল অত্যন্ত মার্জিত। বিহারের অশিক্ষিত গেঁও লাটুকে লাটু মহারাজ বানিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু লাটু মহারাজকে দিয়ে কেউ ইংরাজীতে ভাষণ দেওয়াতে পারবে না। তাই বলে কি লাটু মহারাজকে ইংরাজী শেখানো যাবে না? কেন যাবে না, অবশ্যই যাবে। কিন্তু ঠাকুরের কাছে আসার আগে যে লাটু ছিলেন তাকে ইংরাজী শেখাতে যত সময় লাগত, ঠাকুরের কাছে আসার পর যে সিদ্ধ পুরুষ লাটু মহারাজ তাঁকে ইংরাজী

শেখাতে অনেক কম সময় লাগবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সিদ্ধপুরুষরা যদি কোন কিছুকে আয়ত্ত করতে চান তাহলে ওনারা যে কোন জিনিষ খুব সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারেন।

মাই ফেয়ার লেডিতে এই একই জিনিষের কথা বলা হয়েছে। সেখানে একজন ভাষার উপরে রিসার্চ করা লোক ছিল, তিনি বলে দিতে পারতেন লণ্ডনের কোন গলিতে এই ধরণের ইংরাজী উচ্চারণ হয়। তাতে অনেকে তাকে বলতে এল উচ্চারণ শুনে লণ্ডনের কোন গলি থেকে সে এসেছে এটা বলে দেওয়াতে কি উপকার তোমার হয়েছে। সে তখন বলছে আমাকে যে কোন একটা বস্তি থেকে যে কোন একজনকে নিয়ে এসো, আমি তাকে ছয় মাসের মধ্যে এমন ট্রেনিং দিয়ে দেব যে তার উচ্চারণ শুনে লোকে তাকে রাজকুমারী বলে মনে করবে। তারাও একটা বস্তি থেকে একটা মেয়েকে, যে ফুল বিক্রী করে বেড়াত, তুলে এনে তাকে দিয়েছে। তাকে সে রেকর্ড বাজিয়ে বাজিয়ে রাজারা এই শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করে আর সাধারণ লোকেরা কিভাবে উচ্চারণ করছে শুনিয়ে শুনিয়ে ট্রেনিং শুরু করেছে। এইভাবে ছয় মাস ধরে তাকে ট্রেনিং দিয়েছে। লণ্ডনে একটা রয়েল পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। মেয়েটিকে ছটি মাস উচ্চারণ শিখিয়ে ভালো জামা কাপড় পড়িয়ে ঐ রয়েল পার্টিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন সেই রয়েল পার্টিতে আরেক জন এসেছে সে ছিল ভাষাবিদ্। রানী তাকে দেখে বলছে – এখানে একটি মেয়ে এসেছে, তুমি দ্যাখো তো এই মেয়েটি সত্যিকারের রয়েল পরিবারের কিনা। লোকটি ঐ মেয়েটির সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর রানীকে বলছে – হার হাইনেস্, মেয়েটি কিন্তু মিথ্যে কথা বলছে, মেয়েটি রয়েল পরিবারের কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নয়। ভাষাবিদও বোকা বনে গেছে মেয়েটির কথাতে, মেয়েটিকে এমন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সে ধরতেই পারল না যে সে একটি বস্তির মেয়ে।

ভাষা হচ্ছে মানুষের আসল পরীক্ষা, কত মার্জিত আপনার ভাষা, কি শব্দ আপনি ব্যবহার করছেন, তার উচ্চারণ কিভাবে করছেন, উচ্চারণের সময় কোন জায়গাতে আপনি জোর দিচ্ছেন, কোন জায়গাতে আপনি হাল্কা করে ছেড়ে দিচ্ছেন, এগুলো দিয়েই বোঝা যায় আপনার কালচার, আপনার রুচি, আপনার স্বভাবটা কি রকম।

সংস্কৃত ভাষার সংস্কৃত শব্দটা এসেছে কৃ ধাতু থেকে, কৃ মানে করা, তার আগে আসছে সম্ মানে সম্যক রূপে সংস্কার। বাড়ির সংস্কার করা হয়েছে মানে বাড়িটার মধ্যে যত রকম আবর্জনা ছিল, যেখানে যেখান ভাঙাচোরা ছিল সব কিছুকে সারিয়ে, সাফসুতরো করে শুদ্ধ করা হয়েছে। যখন কোন ভাষাকে এইভাবে পরিমার্জিত করে শুদ্ধ করা হয় তখন ঐ ভাষাকেই বলা হবে সংস্কৃত। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব কালচার আছে, আবার প্রত্যেক ভাষাকেই এই ভাবে সংস্কৃত করা যায়। সংস্কৃত শব্দের অর্থই হল কালচার, সুসংস্কৃত। বেদের সব কিছু নির্ভর করছে শব্দের উচ্চারণের উপর। উচ্চারণেই একজন ধরা পরে যাবে সে দেবতা না অসুর।

তাই বাল্মীকি যে ভাবে সংস্কৃত ভাষাকে ব্যবহার করেছেন, যে ভাবে কাব্যে শব্দের প্রয়োগ করেছেন তা দেখে কেউ মনে করবে না যে তিনি নিষাদ নামে কোন জংলী আদিবাসীর লোক ছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণ পড়ার আগে আমাদের মন থেকে বাল্মীকির সম্বন্ধে এই ধরণের পুরনো ধ্যান-ধারণা গুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। তিনি একেবারে খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই হওয়ার কথা নয়। কোনও জন্মে হয়তো তিনি নিষাদ থাকতে পারেন কিন্তু রামায়ণ রচনাতে আমরা যে বাল্মীকিকে পাচ্ছি তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, শুধু ব্রাহ্মণই নয়, শাস্ত্রে বিরাট পাণ্ডিত্য আর সংস্কৃত ভাষাতে তাঁর সাবলিল বিচরণ ক্ষমতা ছিল। পৌরাণিক কাহিনীতে ভগবানের কৃপাকে বেশি করে দেখাতে হয়, মানে ভগবানের কৃপাতে সে কত মহৎ হয়ে গেছে। ভগবানের কৃপা যখন দেখাতে হবে তখন তার আগে দেখাতে হবে লোকটা একেবারে রসাতলে চলে গিয়েছিল, সেখান থেকে সে ভগবানের কৃপা লাভ করে কত উপরে উঠে গেছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই জিনিষটাকে তুলে ধরার জন্য বাল্মীকিকে খুব করে দেখানো হয়েছে যে তিনি আগে কত বাজে লোক ছিলেন, সেখান থেকে ভগবানের নাম করে করে, তাঁর কৃপাতে কত বড়

পণ্ডিত আর কবি হয়ে গেলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেরই একটি ছোট্ট অংশ, পুরাণের এটাই বৈশিষ্ট্য। গিরিশ ঘোষের নামে আমাদের কত কথা শুনতে হয়, আমরা মনে করি গিরিশ ঘোষ একজন থিয়েটার বাজ, দুশ্চরিত্রের লোক ছিলেন, মদ খেতেন। যা আমরা শুনেছি বা লেখাতে পড়ি তা অতিরঞ্জিত করা, তাঁর আগে থাকতেই অনেক সাধনা ছিল। সাহিত্যিক প্রতিভাতে তাঁর সময়ে কেউ ধারে কাছে আসতে পারবে না, সাহিত্যিক প্রতিভা কি এমনি এমনি একদিনে হয়ে যাবে! গিরিশ ঘোষের রচিত গান – 'কেশবকুরু করুণাদীনে' ঐ ধরণের গান কি মামুলি কেউ লিখে দিতে পারবে? ঐ গান শুনে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা মোহিত হয়ে গিরিশ ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। গিরিশ ঘোষ কোন সাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন না, তাঁর আগে থাকতেই অনেক গুণ ছিল। এখন ঠাকুরের যত সিনেমা, নাটক হচ্ছে তার মধ্যে ঠাকুরকে বড় করার জন্য এনারা গিরিশ ঘোষকে দেখালেন তিনি একেবারে রসাতলে পড়ে ছিলেন, মদ খেতেন আর বাঈজীদের কাছে পড়ে থাকতেন, তাঁর আর কোন গুণ ছিল না, ঠাকুরের কৃপাতে তিনি সরস্বতীর বর পেয়ে এই সব গান, নাটক লিখতে শুরু করলেন। এই ধরণের কিছুই হয়নি গিরিশ ঘোষের ক্ষেত্রে, কিছু দুর্গুণ একটা দুটো থাকতেই পারে, কিন্তু ঐটাকেই এত বড় করে দেখানো হল যে গিরিশ ঘোষ যেন একটা পাষণ্ড ছিলেন। নরেনকে গিরিশ ঘোষের সাথে মিশতে বারণ করেছিলেন, তার পেছনে আলাদা কারণ আছে। মানুষ হিসাবে গিরিশ ঘোষ প্রচণ্ড সৎ লোক ছিলেন, তাঁর মধ্যে লুকোচুরির কোন কিছু ছিল না।

বাল্মীকির ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটেছে। তবে বাস্তব যেটা তা হল তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, সুগভীর তপস্যাও ছিল, তবে কোন কারণে তিনি হয়তো কুসঙ্গে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তাঁর হুঁশ হয়ে যাওয়ায় তিনি সেখান থেকে জোর সাধনায় নেমে পড়লেন। তাঁর নামে যে চুরি ডাকাতির বদনাম আছে তার সম্ভবনা এটাই হতে পারে, এর বাইরে দ্বিতীয় কোন সম্ভবনা হতে পারেনা। একটা কাহিনী দাঁড় করাতে হলে যতই গাল গপ্পো বানান হোক তাকে একটা জায়গায় বাস্তবে মেলাতে হবে, বাল্মীকির ক্ষেত্রে যত গাল গপ্পো এত দিন ধরে আমরা শুনে আসছি তার একটাও বাস্তবে এসে মিলবে না। বাস্তবে কেন মিলবে না? বেদেই বলছে একজন মানুষের আয়ু একশ বছর। গাল গপ্পো ফাঁদতে গিয়ে এমন ভাবে সময়কে টানা হল যেন বাল্মীকির আয়ু পাঁচশ বছর। কারুর জীবনের যাবতীয় যা কিছু কাহিনী ঐ একশ বছরের মধ্যে রাখতে হবে। এখন একজন লোক সংস্কৃত ভাষা শিখেছে, বেদ মুখস্ত করেছে, ছিনতাই ডাকাতিতে ওস্তাদ তৈরী হয়েছে, সাধনা করেছে, তপস্যা করেছে আর রামায়ণ রচনা করেছে। এর প্রত্যেকটা করতে তাকে একটা সময় দিতে হবে, সংস্কৃত ভাষা শেখা, বেদ মুখস্ত করা এগুলো করতে একটা সময় লাগবে। সেখান থেকে একটা উল্টো দিকে ঘুরে গিয়ে ছিনতাই ডাকাতিতে নেমে পড়ল। একটা ভালো মানুষকে খারাপ হতেও সময় দিতে হবে। সংস্কৃত শিখে বেদ মুখস্ত করে রাতারাতি কেউ ডাকাত হয়ে যেতে পারবে না। একটা মানুষের যখন পতন হয় একদিনে হয় না, তার জন্য অনেক দিন ধরে টানাপোড়েন চলে, তারও একটা সময় লাগবে, তাও কম করে চৌদ্দ পনের বছর লাগবে। ছয় মাস, এক বছরে এত নীচে নেমে যাবে না যে রাতারাতি সে ডাকাতি করতে থাকবে। এবারে সে ডাকাতি করতে করতে হাত পাকিয়েছে। তারপর দুম্ করে তার মনে কি হল সে নিজেকে দোষী মনে করে সাধনা করতে শুরু করে দিল। নিজের পাপবোধ থেকে বেরিয়ে এসে সাধনা করে তিনি হয়ে গেলেন একজন মহান ঋষি। সেখানেও তাকে সময় দিতে হবে। সব কটা সময়কে যদি যোগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে বাল্মীকি পাঁচশ বছর বেঁচে ছিলেন। একটা মানুষ তার জীবনের সেরা কাজ গুলো করে কুড়ি থেক পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। এই কারণে বাল্মীকির সব কীর্তি কলাপ তাঁর একশ বছর জীবনের পরিধি কাল ধরলেও খাপ খাবে না। সেইজন্য বাল্মীকির এই কাহিনী গুলোকে বিশ্বাস করার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।

বাল্মীকি একজন ঋষি ছিলেন বলে হয়তো তিনি তাঁর পূর্ব জন্মগুলিকে দেখতে পেয়েছিলেন। এখন কোন জন্মে তিনি হয়তো ডাকাত ছিলেন, অনেক খুনটুনও করেছিলেন। তবে এক জন্মে এত কিছু করা কার্যত কোন মতেই সম্ভব নয়। মূল কথা হচ্ছে আমাদের ছোটবেলা থেকে বাল্মীকিকে নিয়ে যত ধরণের

গালগাপ্পো শুনে এসেছি সেগুলো সবই অমূলক। বাল্মীকি রামায়ণ পড়ার সময় আমাদের এইটি কে মাথায় রেখে অধ্যয়ন করতে হবে। এখানে আমরা যা কিছু শিখতে এসেছি যুক্তি বিচার করে যেটা সামনে আসবে সেটাকেই গ্রহণ করব, গাল গপ্পের এখানে কোন স্থান নেই। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর জীবনের দিকে যখন আমরা তাকাই তখন সেখানেও কোন ধরণের গালগপ্পো আমরা পাইনা।

তবে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, বাল্মীকিকে নিয়ে যে এত কাহিনী বলা হয়, তিনি ডাকাত ছিলেন, তারপর তিনি তপস্যা করে ঋষি হয়ে গেলেন, এগুলো বলা হয় মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। মানে তোমার যদি পতন হয়ে থাকে তবে তার জন্য তোমার হতাশায় ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই, সেখান থেকেও তুমি চেষ্টা করলে মহৎ হয়ে যেতে পার। এছাড়া এর আর কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। এটাই পৌরাণিক বৈশিষ্ট্য, যাকে যখন খারাপ বানাবে তাকে এত খারাপ বানাবে যে তার আর কোন ভাবে উঠে দাঁড়াবার সম্ভবনা নেই, আবার যাকে ভালো বানাবে তাকে এমন উঁচুতে তুলে দেবে যে কল্পনাই করা যায় না। বাস্তবে কিন্তু এরকম কখন হয় না। রামায়ণ মহাভারতে এই ধরণের কখনই কাউকে বানাবে না, ইতিহাস মূলক শাস্ত্রে চরিত্রকে সব সময় ভালো মন্দ মিশিয়ে দেখান হয়। তার মানে শ্রীরামচন্দ্র যত বড় মহামানব হোন না কেন তাঁরও দুর্গুণ আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যত ক্ষমতাই থাকুক না কেন তাঁরও অনেক দুর্গুণ দেখান হবে। আবার অন্য দিকে রাবণেরও অনেক গুণ থাকবে, দুর্যোধনেরও অনেক গুণ থাকবে, কংসেরও অনেক গুণ থাকবে।

ইতিহাস মূলক শাস্ত্রে কোন খারাপ উদ্দেশ্য থাকে না। উদ্দেশ্য একটাই থাকে, মানুষকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া, যার জন্য দরকার একটা কাহিনী। ইতিহাস মূলক শাস্ত্র প্রণেতারা জানতেন যে মানুষের চরিত্র ভালো-মন্দ, সুগুণ-দুর্গুণ মিলিয়ে তৈরী হয়। ইতিহাসে খুব কৌশলে একজন মহান নায়কের গুণগুলিকে ফুটিয়ে তুলবে আবার সুকৌশলে তার দুর্বলতা গুলিকেও তুলে নিয়ে আসবে। ঠিক একই ভাবে যারা খল নায়ক তাদেরও দুর্বলতাকে যেভাবে আঁকবে সেইভাবে তার গুণ গুলিকেও দেখান হবে। দুটোকেই দেখিয়ে নিয়ে, সেইখান থেকে কায়দা করে করে মানুষকে চারটের যে কোন একটা বা দুটো লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। পৌরাণিক সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের মহিমা আর তাঁর মাহাত্ম্যকে সাধারণ মানুষের কাছে হাজির করান। ঈশ্বরের মাহাত্ম্যকে দেখানোর জন্য কোন একটা চরিত্রকে হয় ছোট করবে বা বিকৃত করে ঘুরিয়ে বলে দেবে, আর এমন এমন ভাবে ঘুরিয়ে বলবে যে আসল ব্যাপারটাকে আমরা ধরতেই পারব না। পৌরাণিক সাহিত্যে কাল্পনিক ব্যাপারটা এত বেশি থাকে বলে মানুষ খুব উৎসাহ সহকারে গোগ্রাসে আস্বাদন করতে থাকে। মানুষের আয়ুই হয়ত কয়েক হাজার বানিয়ে দেবে, আর পৌরাণিকে শূন্যের কোন হিসেব নেই, একটা সংখ্যার পর যত ইচ্ছে শূন্য বসিয়ে দেবে, সময়ের কোন হিসেব নেই। ইতিহাসে এই ধরণের জিনিষ কখনই পাওয়া যাবে না, সময়ের বাস্তবানুগ পরিকাঠামোর মধ্যেই কাহিনীকে বেঁধে রাখবে।

বাল্মীকি রামায়ণ একবার ঠিক ঠিক ভাব নিয়ে পড়ে নিতে পারলে ধর্মীয় সাহিত্য বলতে সত্যিকারের কি হতে পারে, সে ব্যাপারে পুরো ধারণাটাই পাল্টে যাবে। সত্যিকারের সাহিত্য কি হতে পারে, একটা সাহিত্য কিভাবে একটা জাতিকে দীর্ঘকাল এক সূত্রে ধরে রেখেছে, আর সাহিত্য কত উচ্চমানের হতে পারে, বাল্মীকি রামায়ণ না পড়লে বোঝা যাবে না। পরবর্তি কালে বাল্মীকি রামায়ণের ধারা আর শৈলীকে পুরোপুরি অবলম্বন করে মহাভারত রচিত হয়েছিল। কাহিনী আলাদা কিন্তু রচনা শৈলী এক। পৌরাণিক সাহিত্যের শৈলী এই দুটো থেকে একেবারেই আলাদা। মহাভারতে যদিও কিছু কিছু পৌরাণিক মাল মশলা আছে, কিন্তু মহাভারতের মূল ভাবটা হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে চারটি লক্ষ্যের দিকে মানুষকে ঠেলে দেওয়া। সেই কারণে মহাভারতে সময়, স্থান, চরিত্র সবই একটা নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে রাখা হয়েছে।

চব্বিশ হাজার শ্লোক নিয়ে পুরো বাল্মীকি রামায়ণ। সেই তুলনায় মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক। বাল্মীকির রামায়ণের মূল ভাবটা কি যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় একটি কথাতেই বলে দেওয়া যায়, সেটা হল তপস্যা। বেদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞ, যজ্ঞ থেকে পরে আস্তে আস্তে বেদ প্রার্থনার দিকে সরে এসেছে, প্রার্থনার থেকেও বেদ তপস্যার কথা বেশি করে বলতে আরম্ভ করেছে। তপস্যা দুই রকমের পাই – প্রথমের দিকে যে যজ্ঞ-যাগ করছিল সেটাও একটা তপস্যা আবার যখন প্রার্থনাদি করছে সেটাও তপস্যা। তপস্যা সব সময়ই হয় মানসিক, তপস্যাতে বাইরের কোন আনুষাঙ্গিক দরকার পড়ে না। প্রার্থনার ক্ষেত্রে একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রার্থনা করা হয়, একটা যজ্ঞ যখন করা হয় তখনও তার একটা পরিষ্কার উদ্দেশ্য সামনে থাকে, আমি এটা চাইছি সেইজন্য আমি এই যজ্ঞ করছি। এই ক্ষেত্রে তপস্যা কিন্তু এগুলো থেকে একেবারেই আলাদা। তপস্যা ঠিক শরীর চর্চার মত। জিমে গিয়ে যেমন আমরা শরীরের পেশীকে ইস্পাতের মত দৃঢ় ও মজবুত তৈরী করছি। কেন করছি? শরীরটাকে ঠিক রেখে সুস্থ রেখে আমি দৈনন্দিন কায়িক শ্রমের দ্বারা কর্মগুলি ঠিক ভাবে করতে পারি, শরীরের যেন কোন ব্যাধির সংক্রামণ না হয়। ক্রিকেট প্লেয়ারদের সব রকমের শারীরিক ট্রেনিং দেওয়া হয়, কেন দেওয়া হচ্ছে? যাতে করে আরো ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে। যজ্ঞ, প্রার্থনাতে উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু তপস্যাতে এই ধরণের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকবে না। তাহলে তপস্যাতে কি হচ্ছে? তপস্যা হচ্ছে ঠিক বডিবিল্ডিং এর মত, যার বডিবিল্ডিং করে শরীর শক্তপোক্ত হয়ে গেছে তখন সে যদি দৌড়াতে চায় দৌড়াবে যদি সাঁতার কাটতে চায় সাঁতার কাটবে, আবার এই দুটোকে বন্ধ করে সে যদি বক্সিং করতে চায় তাহলে বক্সিং করতে পারবে। কিন্তু যদি সে সাঁতারের ট্রেনিং নেয় সে সাঁতারে দক্ষ হবে, যে বক্সিং এর ট্রেনিং নিয়েছে সে বক্সিংই করতে পারবে দক্ষ সাঁতারু হতে পারবে না। কিন্তু যে বডিবিল্ডিং করে পুরো শরীরটাকে ফিট রেখেছে, তখন সেই শরীরকে যেখানে ব্যবহার করবে সেটাই সে করতে পারবে। যজ্ঞ ও প্রার্থনাতে উদ্দেশ্যটা নির্দিষ্ট থাকে, আমি একটা সন্তান চাই তাই আমি এই যজ্ঞটা করলাম, এখানে লক্ষ্যটা পরিষ্কার। এখন মনে করা যাক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার মাঝ পথে সে হঠাৎ ঠিক করল আমার সন্তান লাগবে না, তখন কি হবে? ঐ যজ্ঞটা তার কোন কাজেই লাগবে না, পুরো বেকার হয়ে গেল সব কিছু। কিন্তু তপস্যাতে কোন কিছুই নষ্ট হয়ে যায় না, তপস্যা হচ্ছে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মত। আমার যদি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স থাকে তখন সেই টাকা দিয়ে আমি গাড়িও কিনতে পারি আবার বাড়িও বানাতে পারি, আমি বিদেশেও যেতে পারি আবার কুম্ভেও যেতে পারি। তপস্যা হল ব্যাঙ্কের টাকা জমানোর মত। আর যজ্ঞ, প্রার্থনা হচ্ছে শাড়ি কেনা, গয়না কেনার মত। একজন তার বউএর জন্য একশ খানা শাড়ি কিনে রেখেছে, মাঝখান থেকে বউ যদি অন্য একজনের সাথে পালিয়ে যায় তখন এই একশ শাড়ি সব ফালতু হয়ে যাবে। কিন্তু শাড়ি না কিনে যদি সেই টাকা সে ব্যাঙ্কে রেখে দিত তাহলে বউ চলে গেলে এই টাকা দিয়ে সে যা খুশি করতে পারবে। তপস্যা হল ঠিক এই রকম, তপস্যাকে যে কোন কাজে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ডিভিসি বিদ্যুত তৈরী করে দিচ্ছে, এখন এই বিদ্যুত দিয়ে অনেক কিছুই করা যাচ্ছে, কেউ আলো জালাচ্ছে, কেউ ট্রেন চালাচ্ছে, কেউ কয়লা তুলছে। তপস্যা তপস্বীকে শক্তিমান তৈরী করে দিচ্ছে।

যজ্ঞাদি, প্রার্থনাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে, আমি এটা চাই, তাই যজ্ঞ করছি। কিন্তু মাঝখান থেকে যখন সে ইচ্ছেটা চলে যায় তখন প্রার্থনা আর যজ্ঞ যেটা করা হল সেটা বেকার হয়ে গেল। প্রার্থনা যজ্ঞাদিতেও মনের পরিবর্তন হয়, এতেও যে সংযম হচ্ছে না তা নয়, এগুলোও অন্য এক ধরণের তপস্যা কিন্তু শুধু তপস্যার ফলের সাথে অনেক তারতম্য হয়ে যায়। যেমন, আমি এক ধরণের প্রার্থনা করে আসছি, আমি তখন অন্য ধরণের কিছুতে যেতে পারছি না, কিন্তু আমি যদি বিরাট তপস্যা করে থাকি, তারপর এই তপস্যার ফল যদি আমি তীর চালানোর উপরে লাগিয়ে দিই তাহলে ঐটাই হয়ে যাবে ব্রহ্মাস্ত্র। ঐ তপস্যার ফল যদি আমার কথা ও বাণীর মধ্যে লাগিয়ে দিই তখন স্বামীজীর মত Sisters & brothers of America বললেই সমস্ত লোক সম্মোহিত হয়ে যাবে, এই তপস্যার শক্তিকে যখন সাহিত্যে লাগিয়ে দেব তখন আমি বাল্মীকি ব্যাসদেবের মত অমর সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারব, এই তপস্যাই যখন আত্মজ্ঞানে

লাগিয়ে দেব তখন আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যাব, যদি জাগতিক জ্ঞানে লাগাব তখন জগতের সব জ্ঞান আমার মধ্যে চলে আসবে, আমি যদি এই তপস্যার ফল টাকা পয়সা ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে লাগাই তাহলে দশটা বিল গেটসের মত সম্পদ আমার একার হয়ে যাবে। তপস্যার ফলকে যে ভাবে খুশি কাজে লাগান যাবে, কিন্তু যজ্ঞ ও প্রার্থনাতে এই জিনিষটা হবে না, যজ্ঞ ও প্রার্থনা হচ্ছে target specific এই target এর বাইরে যেতে পারবে না।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এইটাই বলছেন – মানুষ যখন ছোট খাটো দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তখন যা প্রার্থনা করে সেটাই পায়, কিন্তু আমার কাছে যদি প্রার্থনা করে তখন যেটার জন্য প্রার্থনা করছে সেটাও পাচ্ছে সাথে সাথে আমাকেও পায়। দুটোতে পরিশ্রম একই কিন্তু ফল অন্য রকম হয়। লোকেদের এমনই দুঃখ যে তারা বেশি পরিশ্রম করে কম ফলটি নিতে চায়। তাই বলে যজ্ঞ আর প্রার্থনা করা লোকে বন্ধ করে দেবে? কখনই বন্ধ করবে না। যজ্ঞ ও প্রার্থনাতে স্বল্পকালীন লাভ হয়। তপস্যা আমি অনেক দিন করে যাচ্ছি এর ফল তৈরী হতে কত দিন লাগবে কেউ জানে না, কিন্তু যদি আমার এখন একটা জিনিষের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আর আমি যদি তপস্যার ফলের আশায় বসে থাকি তাহলে রোগীর এদিকে নাভিশ্বাস ওঠার মত অবস্থা হয়ে যাবে আমার। সেইজন্য যাঁরা তপস্বী তাঁরা মাঝখানে তপস্যাকে কয়েক দিন বন্ধ রেখে প্রার্থনাতে লেগে যান, প্রভু তুমি এইটা করে দাও। যেই ওটা মিটে যাবে সঙ্গে সঙ্গে আবার তপস্যাতে ডুবে যাবে। তপস্যা হচ্ছে একটা দীর্ঘকালীন পদ্ধতি। অন্য দিক যজ্ঞ ও প্রার্থনা হচ্ছে target specific আর স্বল্পকালীন পদ্ধতি। তবে যাঁরা অনেক দিন ধরে যজ্ঞ-যাগ করে যাচ্ছেন তাঁরা যদি তপস্যায় আসতে চান খুব সহজেই এসে যাবেন, কেননা যজ্ঞ যাগ করে করে তপস্যার জন্য তাঁর মানসিক একটা প্রস্তুতি আগে থাকতেই হয়ে যাচ্ছে।

তপস্যার ফল যে কোন কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়, এর একটা ভালো দৃষ্টান্ত আমরা স্বামীজীর জীবনে পাই। স্বামীজী তখন আমেরিকাতে মিস্টার লেগেটের বাড়িতে অতিথি রূপে ছিলেন। একদিন লেগেটের বাচ্চা ছেলেটি বাগানে গলফ খেলছিল। স্বামীজী বাগানে গেছেন, ছেলেটির কাছে জানতে চাইলেন এটা কি ধরণের খেলা। ছেলেটি স্বামীজীকে গলফ খেলা সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিয়ে কিভাবে খেলতে হয় দেখিয়ে দিল। গলফ্ খেলাতে একটা বলকে স্টিকের সাহায্যে অনেক দূরে পাঠানো হয়, সেখানে আবার একটা গর্ত থাকে, বলটাকে ঐ গর্তের মধ্যে কে কত কম স্ট্রোকে ফেলতে পারবে তার উপর নির্ভর করবে তার কৃতিত্ব। স্বামীজী এর আগে গলফ্ খেলা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। স্বামীজী সব শুনে টুনে বললেন – আচ্ছা এক স্ট্রোকে যদি কেউ ঐ গর্তের মধ্যে বলটাকে ফেলে দেয়? ছেলেটি বলছে – না, আজ পর্যন্ত এক স্ট্রোকে কেউ গর্তে বল ফেলতে পারেনি আর কোন দিন পারবেও না। স্বামীজী তখন বলছে – আমি যদি ফেলতে পারি? ছেলেটি বলছে – তাহলে আমি তোমাকে এক ডলার দেব। হয়ে যাক বাজি। ইতিমধ্যে মিস্টার লেগেটও ঐখানে এসে গেছেন। তিনিও সব শুনে বললেন – স্বামীজী, দশ ডলার আমার তরফ থেকে। স্বামীজী স্টিকটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে একটু দেখলেন, বলটাকে নির্দিষ্ট জায়গাতে বসালেন, দূরত্বটা মনে মনে মেপে নিলেন, মনটাকে সামান্য সময়ের জন্য একাগ্র করে বলটাকে স্টিক দিয়ে আঘাত করলেন, সবাইকে অবাক করে বলটা সোজা গিয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। মিস্টার লেগেট আর তার ছেলেতো হতবম্ব। স্বামীজীকে মিস্টার লেগেট জিজ্ঞেস করছেন 'এর মধ্যে কি আপনি কোন যোগের শক্তি লাগিয়েছেন'? স্বামীজী তখন উত্তর দিচ্ছেন 'আমরা যোগকে এত সাধারণ জিনিষে লাগাই না। আমি আমার মনকে বললাম - মন ঐ দশটি ডলার ওনার পকেটে আছে, ওটা যেন আমার পকেটে চলে আসে। মন তখন আমার পেশীগুলিকে বলে দিল কিভাবে আর কতটা জোরে মারতে হবে। বাকী কাজটা আমার পেশীগুলি করে দিল'। এই জিনিষ আমি আপনি কি পারব না করতে? কোন দিনই পারব না। কারণ স্বামীজীর তপস্যা করে করে ওনার মন এত নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল যে, মন এখন তার ভৃত্যের মত হয়ে গেছে, মন তাই সত্যি সত্যি স্বামীজীর আজ্ঞাকে পালন করে অসম্ভবকে সম্ভব করে দিয়েছে। শুধু তপস্যার জোরে স্বামীজীর মন, শরীর, পেশী এমন দখলে এসে গেছে যে এক স্ট্রোকে বল গর্তে ঢুকে গেছে, যেটা

টাইগার উডও কোন দিন পারবে না। তপস্যা আর যজ্ঞের এটাই তফাৎ। টাইগার উড একমাত্র গলফ খেলাতেই জোর দিয়ে এই খেলাতে প্রচণ্ড দক্ষতা অর্জন করেছে। উড শুধু গলফ খেলাতেই পারদর্শি। অন্য দিকে স্বামীজী চিকাগো ধর্মসভাতে ভাষণ দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠ বক্তার শিরোপা পাচ্ছেন, আবার গলফও খেলতে পারছেন, অন্য দিকে বইও লিখছেন আবার সজ্ঞও চালাতে পারছেন। তপস্যার শক্তির জোরেই এত গুলোতে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। তপস্যার শক্তি যেখানেই লাগিয়ে দেবে সেখানে বুম্ করে সেটা ফেটে যাবে। বাল্মীকি রামায়ণের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে এই তপস্যা, তপস্যার গুরুত্বকে তুলে ধরা। সেইজন্য রামায়ণের প্রথম শ্লোক শুরুই হচ্ছে তপস্যার কথা দিয়ে – **ওঁ তপঃ-স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী......**।

<u>*বাল্মীকি রামায়ণ – ১৮ই এপ্রিল ২০১০*</u>

বালকাণ্ড

আমরা দেখলাম কিভাবে বাল্মীকি রামায়ণে তপস্যাকে মূল লক্ষ্য করা হয়েছে। আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত যত প্রামাণিক শাস্ত্র এসেছে তার মধ্যে প্রথম এসেছে বেদ, বেদের পরেই লিখিত শাস্ত্র রূপে এসেছে বাল্মীকি রামায়ণ, বাল্মীকি রামায়ণের পরেই পাই ব্যাসদেবের মহাভারত। রামায়ণ ও মহাভারত যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থাতে, মানে কোন রকম সংযোজন ছাড়া এবং অবিকৃত অবস্থাতেই পেয়েছি।

বেদের মূল বিষয় ছিল যজ্ঞ, যা কিছু বক্তব্য সব যজ্ঞকে নিয়ে। বেদ থেকে যখন উপনিষদে এসেছে তখন যজ্ঞ সরে গিয়ে তার জায়গায় এসে গেল আত্মজ্ঞানের কথা, আমিই সেই আত্মা, সেই আত্মার অনুসন্ধানে বেশি জোর দেওয়া হল। যজ্ঞ আর আত্মজ্ঞানের মাঝখানে আসছে তপস্যা। তপস্যার যে কতখানি গুরুত্ব আর মানুষ তপস্যার দ্বারা যেকোন জিনিষকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, বাল্মীকি তপস্যার এই গুরুত্বকে তাঁর অমর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন।

বেদের বক্তব্য ছিল তুমি যজ্ঞ দ্বারা যে কোন জিনিষকে পেয়ে যেতে পার, কিন্তু পরের দিকে, এমনকি আজকের দিনেও হিন্দু ধর্মের চিন্তার পরিকাঠামো তপস্যাকেই সব থেকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। যজ্ঞ আর প্রার্থনার সাথে তপস্যার তুলনা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, যেটা আমি চাইছি একমাত্র সেটার জন্য যজ্ঞ ও প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু তপস্যার ক্ষেত্রে তা করা হয় না, তপস্যা হচ্ছে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মত। আমি নিষ্কাম ভাবে তপস্যা করে যাচ্ছি, কিছুই চাইছি না, কিন্তু আমার অজান্তেই নিজে থেকেই পূণ্য সঞ্চয় হয়ে যাচ্ছে। এখন কোন এক পরিস্থিতিতে হঠাৎ যদি আমি যদি মনে করি এই তপস্যার ফলকে লাগাতে হবে, তখন আমার ইচ্ছা মাত্রই সেটা হয়ে যাবে। যেমন মনে করা যাক, কেউ সকাল বিকেল দু-ঘন্টা করে আসনে বসে জপ করে যাচ্ছে, রোজ স্নান করে ঠাকুরকে পূজা করছে, আসনে বসে প্রাণায়ামাদি করে যাচ্ছে, সন্ধ্যা বন্দনা করে যাচ্ছে, সাধু সেবা করে যাচ্ছে, গরীব-দুখীদের দান করছে, এগুলো সবই তপস্যা। এখন তার এক সময় ইচ্ছে হল আমি একজন লেখক হব। সে তখন যদি লেখা শুরু করে তখন দেখা যাবে তার কলম দিয়ে খুব উচ্চমানের লেখা বেরিয়ে আসছে। কিংবা ইচ্ছে হল অনেক অর্থ উপার্জন করবে, যদি সে অর্থোপার্জনে নেমে পড়ে তখন তার প্রচুর অর্থ আসতে থাকবে।

বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকি এই নিষ্কাম তপস্যার কথাই বার বার বলে গেছেন। যারা মঠ থেকে দীক্ষা নিয়ে থাকেন তাদেরকে দীক্ষার সময় বলে দেওয়া হয় জপ শেষ করার পর ঠাকুরের কাছে জপ সমর্পণ করতে, শুধু জপের ক্ষেত্রেই নয়, এখানে যা কিছুই করা হয় সবার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু বলা হয়। অর্থাৎ আমি কোন কিছু উদ্দেশ্য নিয় জপ করেছি তা নয়। কিন্তু যখন মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি করা হচ্ছে এগুলোর পেছন সব সময় কোন না কোন বদ্ বা সৎ উদ্দেশ্য থাকে। যখন শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

বলা হচ্ছে, যদি কোন আমার উদ্দেশ্য থেকেও থাকে, তখন সেটাকে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে উৎসর্গ করে দেওয়া হল।

সাতটি কাণ্ড নিয়ে বাল্মীকি রামায়ণ রচিত হয়েছে, প্রত্যেকটি কাণ্ড আবার কয়েকটি সর্গে ভাগ করা হয়েছে, সর্গ বলতে অধ্যায়কে বোঝাচ্ছে, আবার কয়েকটি শ্লোককে নিয়ে একেকটি সর্গ তৈরী হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম কাণ্ডের প্রথম সর্গ আর তার প্রথম শ্লোকটিই (১/১/১) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাল্মীকি রামায়ণ শুরুই হচ্ছে তপস্যা শব্দটি দিয়ে – **ওঁ তপঃ স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগবিদাং বরম্।** এখানে বাল্মীকির গুণের বর্ণনা করা হচ্ছে, বাল্মীকি কি রকম মানুষ ছিলেন দেখানো হচ্ছে। এখন বলা মুশকিল, এই শ্লোকটি বাল্মীকি নিজে লিখেছেন, না কি অন্য কেউ পরবর্তি কালে তাঁর কোন শিষ্য মুখবন্ধ হিসেবে রচনা করেছিলেন। বাল্মীকি খুব উচ্চকোটির ঋষি ছিলেন, ঋষিরা কখন নিজেকে এই ভাবে জাহির করতে যাবেন না। আবার অন্যটাও হতে পারে, এই বই কিছু না হোক আজ থেকে প্রায় চার হাজার আগে রচিত হয়েছিল, সেই সময় এই শব্দগুলির অর্থ এখনকার মত এত জটিল ছিল না। যেমন এখানে একটি শব্দকে বিশেষণ রূপে বলা হচ্ছে *বাগবিদাং বরম্*, এই শব্দের অর্থ হল বিদ্বান ও মনীষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মানে বাল্মীকিকে তখনকার দিনের সমস্ত মনীষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে। বাল্মীকির এমন কোন দুরবস্থা বা দুর্মতি হয়নি যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে নিজেই জাহির করে লিখতে যাবেন। সাধারণ মানুষ নিজের নামে ঢাক পেটাতে পারে কিন্তু তাই বলে একজন ঋষি কখনই এই কাজ করতে যাবেন না। সেইজন্য আমরা খুব নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে প্রথম শ্লোকটি পরের দিকে তাঁর কোন শিষ্য বা অন্য কেউ মুখবন্ধ হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কীভাবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে আজকের দিনে এই জায়গা থেকে বলা খুব মুশকিল। তবে আমরা কিছু ধারণা করতে পারি, যেমন লব-কুশ যখন অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভার মাঝখানে সবার সামনে এই রামায়ণ গান করত তখন হয়তো এই শ্লোকটাকেও শুরুতে যোগ করা হয়েছিল। আসলে বাল্মীকির রামায়ণে ঠিক ঠিক বাল্মীকির রচনা অনেক পরের দিক থেকে শুরু হয়েছে। হয় এই শ্লোকটি অন্য কেউ রচনা করেছেন এবং পরে এটাকে একটা ভূমিকার মত করে রামায়ণে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় বাল্মীকি নিজে কখনই এই শ্লোক লেখেননি, কেননা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে এই জিনিষ কখনই খাপ খাবে না।

বাল্মীকির রচিত না হলেও এই শ্লোকটির বক্তব্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। *তপঃ স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগবিদাং বরম্*। - এই যে বাল্মীকি, ইনি মনীষী ও পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিত বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়, বেদে আমরা পেয়েছিলাম – *কবির্ মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ*, তিনিই মনীষী যিনি এই প্রকৃতির রহস্যকে বার করতে পারেন। কিন্তু এখানে যে প্রকৃতির রহস্যকে বার করার ক্ষমতা বলা হচ্ছে, এটা কিন্তু বৈদিক ঋষিদের পরম্পরার জিনিষ নয়।

শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে বলছেন – বাল্মীকি নারদ মুনিকে জিজ্ঞেস করছেন – **নারদ পরিপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্**। কেন নারদ মুনিকে জিজ্ঞেস করছেন তার বর্ণনা এখানে নেই। বর্ণনা না থাকার জন্যই পরের দিকের সাহিত্যিকরা অনেক কিছু বানিয়ে বলে দিয়েছেন, যেমন বাল্মীকি মরা মরা জপ করে তপস্যা করছিলেন, নারদ তখন বললেন তুমি উঠে এস, ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো কিছুই নয়, বাল্মীকি খুব সহজ একটা উক্তি দিয়ে শুরু করছেন – বাল্মীকি একজন ঋষি, আর তিনি তপঃ আর স্বাধ্যায় এই দুটো জিনিষে লেগে ছিলেন, কে লেগে ছিলেন? যিনি তপস্বী।

বাল্মীকি স্বভাবেই ছিলেন তপস্বী, তপস্যা সবাই করতে পারে কিন্তু সবাই তপস্বী হতে পারবে না, যাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন তপস্যা তিনিই তপস্বী। আমরা সবাই তপস্যা করছি, একজন লেকচার দিচ্ছে সেও তপস্যা করছে, আরেকজন সেই লেকচার শুনছে সেও তপস্যা করছে, আমি একজনকে সহ্য করছি সেটাও তপস্যা যে আমাকে সহ্য করছে সেটাও তার তপস্যা, কিন্তু এখানে কেউ তপস্বী হয়ে যাবে না। যার সমগ্র জীবনধারা, যার সারাটা দিন, সারাটা মাস, সারাটা বছরের একমাত্র পরিচর্যা হল সচেতন

তপস্যা তিনিই তপস্বী। আমাদের তপস্যা মাছির মত, এখন এখানে ধর্ম কথা শুনছি, বাড়িতে গিয়ে একটু জপ ধ্যান করছি, বাবা মার সেবা করছি আর ফাঁকা সময়ে টিভি খুলে সিরিয়াল দেখছি, সেখানেই তপস্যার ইতি হয়ে গেল। মাছিও তাই করে, কিছুক্ষণ সন্দেশে বসছে, কিছুক্ষণ ঘায়েও বসছে। একজন সন্ন্যাসীকে আশ্রমে থাকতে হচ্ছে, এখন সন্ন্যাসী কি তপস্যা করছে? আশ্রমে আর ভালোমন্দ কি খাবার পাবে, রোজ তাঁকে ঝোলচচ্চড়ি খেতে হচ্ছে। এটাই তাঁর একটা তপস্যা হয়ে গেল। কিন্তু সে যদি মনে করে একদিন যদি একটু ভালোমন্দ কিছু খাওয়া যায় তাহলে মন্দ হত না, তখন কিন্তু এটা আর তপস্যা থাকল না। যিনি তপস্বী, তাঁর কিন্তু মন ঝোলচচ্চড়ি থেকে একটুও সরবেই না। যদি কোন ভক্ত বাড়ি থেকে ভালো উপাদেয় খাবার নিয়েও আসে তবুও সেখান থেকে মন সরবে না।

তপস্বী তিনিই যিনি সর্বদাই তপস্যাতে লেগে রয়েছেন। তপস্যার তপঃ শব্দের অর্থ হচ্ছে আগুনের তাপ, তেজ। একটা কর্ম যখন করা হয় তখন শারীরিক ও মানসিক দু রকমেরই পরিশ্রম করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমি যখন টিভি দেখছি তখন কি আমার পরিশ্রম হচ্ছে? হয়, খুব সামান্য। শুয়ে থাকলে যে পরিশ্রম হয় টিভি দেখলে ততটুকুই পরিশ্রম হয়। যখন আমি বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করছি তখন পরিশ্রম হচ্ছে, জিনিষের চড়া দাম দেখে মেজাজ খারাপ হচ্ছে তাতেও পরিশ্রম হচ্ছে, এটাও একটা তপস্যা, কিন্তু প্রকৃত তপস্যা নয়। প্রকৃত তপস্যা হচ্ছে সচেতন ভাবে মনের মধ্যে ঠিক করে নেওয়া যে আমি আত্মার ব্যাপারে বা চিত্তশুদ্ধির জন্য আমার মনকে নিয়োজিত করব। তখন সে সারাদিন এই একটা জিনিষকে নিয়েই থাকবে, অন্য আর কিছু করবে না সে। রাত্রে যখন ঘুমাতে যাচ্ছে সেটাও তার কাছে তপস্যা, কারণ এতটুকু সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে আমার শরীর মনকে সতেজ করব, শরীর সতেজ হলে আমি সূর্যোদয়ের আগে উঠে আরও জোর কদমে জপ ধ্যান করতে পারব। জপ ধ্যান করে আমি খাওয়া দাওয়া করব। খাওয়া দাওয়া কেন করব? যে শরীর দিয়ে তপস্যা করব সেই শরীরটা যাতে ঠিক থাকে। যা কিছুই করবে তার মূল উদ্দেশ্য হল তপস্যা। কিন্তু আমরা যা কিছু করি, খাওয়া, ঘুমনো সবই শরীরকে তোয়াজ করার জন্য করছি। আর তা নাহলে গীতায় যেমন ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – অসক্তিরনভিসঙ্গঃ, আসক্তি আর অভিসঙ্গের জন্য করছি, হয় আসক্তি আর তা নাহলে অভিসঙ্গি। আসক্তি হচ্ছে নিজের শরীর নিজের জিনিষের প্রতি আসক্তি। আর অভিসঙ্গি হচ্ছে, আমার পারপার্শ্বিক যারা আছে, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান এদের জন্য কিছু করা। আমরা যদি একটু চিন্তা করে দেখি, আমরা সারাদিন যা কিছু করছি সবই নিজের শরীরকে, মনকে বা আমাদের আশেপাশে যারা আছে, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, নাতি, নাতনী এদেরকে খুশি রাখার জন্য। একে কখনই তপস্যা বলা যায় না। একজন সত্তর বছরের বয়স্ক লোক, খুব ভালো স্বাস্থ্য, আর খুব বড়লোক। এখনও সব সময় দৌড় ঝাঁপ করে বেড়ান। মানে এখনও অর্থের পেছনে ছুটে চলেছেন, কি করে কয়েকটা বিজনেস কন্ট্রাক্ট পাওয়া যায় তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একজন ব্রহ্মচারী ওনাকে জিজ্ঞেস করল – আপনি এই বয়সেও দৌড় ঝাঁপ করছেন? শুনে তিনি একগাল হেসে বলছেন – আমি ভাবি আমার যদি আরও কিছু পয়সা রোজগার হত তাহলে খুব ভালো হত। ব্রহ্মচারী তখন জিজ্ঞেস করছে – এই বয়সে এত পয়সা দিয়ে করবেন কি? তিনি বলছেন – আমি ভাবি, আমার বউ এর জন্য যদি একটা ভালো গয়না কিনে দিতে পারতাম তাহলে আমার বউ কত খুশি হত। ব্রহ্মচারীও মজা করে বলছে – এই সত্তর বয়সে বউকে গয়না দেবার জন্য ছুটছেন! ভদ্রলোকও একগাল হাসি নিয়ে বললেন – ও আপনি বুঝবেন না, এগুলোও খুব দরকার। বলে তিনি অন্য দিকে চলে গেলেন। তার উদ্দেশ্য কিন্তু বউকে খুশি করা। এই পরিশ্রমকে কি তপস্যা বলা যবে? কখনই না। তপস্যা তখনই হবে যখন সব পরিশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবান। ভগবানকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন, ঈশ্বর, আত্মা, যোগের দৃষ্টিতে পরমাত্মা, আর এটাই তার একমাত্র জীবনচর্চা। এখন আমরা যেটা করছি আমার শরীর আর মন আর আমার মনের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে তাদের জন্য, আর তপস্যার ক্ষেত্রে হয়ে যাবে আত্মা আর আত্মার সঙ্গে যা যুক্ত আছে তার জন্য কিছু করা। স্ত্রী সন্তান এসে যদি বলে – তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তখন সে জোর গলায় বলতে পারবে – হ্যাঁ, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ছেলে যদি এসে বলে – সবার বাবারা কত কিছু করছে,

গাড়ি কিনছে, বাড়িতে এসি মেসিন বসাচ্ছে আর তুমি একটা মোবাইল ফোনও কিনে দিতে পারলে না। তখন সে বলবে – হ্যাঁ বাপু আমার দ্বারা হল না, তুম যদি চাও তাহলে নিজে চেষ্টা করে দেখো। কারণ সব কিছুই সে ত্যাগ করে সব তপস্যাতে লাগিয়ে দিয়েছে, তপস্যা ছাড়া আর কিছুই সে জানে না।

এই তপস্যার ফলে শরীর মনে যে তেজ উদ্ভব হয়, সেই তেজ তাকে এক প্রচণ্ড শক্তিমান আর ক্ষমতাবান পুরুষে পরিণত করে দেবে। তপস্যার সাথে স্বাধ্যায়ও কিন্তু এক সাথে চলতে থাকবে। স্বাধ্যায় হচ্ছে শাস্ত্র অধ্যয়ন। এই যে এখানে আমরা বেদ পড়ছি, বাল্মীকি রামায়ণ পড়ছি এগুলোই স্বাধ্যায়। কেউ কেউ বলেন – এখানে যা কিছু শুনি বাড়ি গিয়ে সব ভুলে যাই। তার কারণ, স্বাধ্যায় নেই বলে, এটাকে বলে পার্ট টাইম স্বাধ্যায়। কিন্তু যাঁরা বড় ঋষি, বাল্মীকি মুনির মত, এনারা দুটো জিনিষই এক সঙ্গে করতেন, তপঃ আর স্বাধ্যায়। যাঁরা সন্ন্যাসী হতে আসেন, তাঁদের প্রথম থেকেই বলে দেওয়া হয়, জপ, ধ্যান আর পাঠের বাইরে আর কিছু করতে না। যদি কোন সন্ন্যাসী ধ্যান আর পাঠের বাইরে কিছু করে, পাঠ মানে স্বাধ্যায়, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর কোন না কোন গোলমাল আছে। শুধু সন্ন্যাসী সাধকই নয়, যে কোন সাধক, সে গৃহস্থ সাধক হন, কি সন্ন্যাসী সাধক হন কিংবা ঋষি সাধক হন, সাধক মাত্রেই তাঁকে দুটি জিনিষকে নিয়েই পড়ে থাকতে হবে, তপস্যা আর স্বাধ্যায়, এর বাইরে সে আর কিছু করবে না। বাল্মীকিও এই দুটি জিনিষই করছেন, তপঃ আর স্বাধ্যায়। বেদ পড়ছেন, শিষ্যদের শাস্ত্র মুখস্ত করাচ্ছেন নয়তো শাস্ত্র পাঠ করে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সব সময় মনকে সাধনার মধ্যে ব্যস্ত রাখছেন, যখন বহির্জগতে আছেন তখন মুখ দিয়ে স্বাধ্যায় করছেন, আবার যখন অন্তর্জগতে ঢুকে পড়ছেন তখন ঈশ্বরের সঙ্গে মনটাকে যুক্ত করে দিচ্ছেন, ঈশ্বর বলতে আত্মাকেও বোঝাচ্ছে আবার ব্রহ্মকেও বোঝাচ্ছে। এক দিকে চৈতন্যের চিন্তা, আবার যখন মুখ খুলছেন তখন অনর্গল শাস্ত্রের কথাই বেরোচ্ছে, তখনও শাস্ত্রের আবৃত্তি হচ্ছে, শাস্ত্রের চিন্তন করছেন। এর ফলে কি হয়েছে, তাঁর মনটা একেবারে শুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিকের মত পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অন্য দিকে তাঁর জাগতিক প্রয়োজনও খুব সামান্য, খাওয়া পড়া যেমন তেমন হলেই হল, জীবন ধারণের জন্য যতটুকু না হলেই নয় ঠিক ততটুকুতেই পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট। এই ছিল তাঁর প্রতি দিনের জীবনচর্চা।

এখন বাল্মীকির মনে কোথাও একটা গোলমাল দানা বেঁধেছে। কি গোলমাল? সৃজন করার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগরিত হয়েছে। কোন কিছু রচনা করার ইচ্ছে যখন মনের মধ্যে জন্ম নিল তখন তপস্যাও সরে গেলে। সৃজন করাটা স্বাধ্যায়ের মধ্যে পড়ে না, আর তপস্যাও নয়। মোর ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, যদি নিষ্কাম ভাবে করা যায় তাহলেই সেটা তপস্যা হয়ে যাবে। এখানে এসে বৈদিক ঋষি আর বাল্মীকির মধ্যে একটা বড় পার্থক্য নজরে পড়বে। বৈদিক ঋষিদের মনে কখনই এই সৃজন করার ইচ্ছে হত না, আমি একটা কিছু রচনা করব এই ধরণের কোন সঙ্কল্পও তাঁরা করতেন না। কিন্তু বাল্মীকির এই ইচ্ছেটা এসেছিল। তাই বলে বাল্মীকি যে বৈদিক ঋষিদের থেকে ছোট ছিলেন তা নয়। বাল্মীকি ছিলেন অন্য এক স্বতন্ত্র ধরণের ঋষি, আর তিনি যেটা করেছেন লোককল্যাণের জন্যই করেছেন। বাল্মীকির এই একটি কাজের জন্যই আজ ভারত সাহিত্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতিতে এত সমৃদ্ধশালী হয়েছে।

যাই হোক, নারদ মুনি এসেছেন বাল্মীকির কাছে, কোন্ বাল্মীকির কাছে? যিনি *তপঃ স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগবিদাং বরম্*। দুজন সাধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন কথাবার্তা হয় এখানেও দুজনের কথাবার্তা হচ্ছে। বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞেস করছেন 'হে মুনিবর, এই সময়, বর্তমান কালে এই জগতে এমন মানুষ আছেন কি, যিনি সর্ববিধ গুণে ভূষিত, তিনি অনেক গুণের অধিকারি, আবার বীর্যবানও'।

আমাদের মধ্যে একটা সাধারণ ধারণা হয়ে আছে যে যার মধ্যে সাধু গুণ থাকবে সে একটা হাবা গোবা, ক্যাবলা হবে। যারা একেবারে অপদার্থ তারাই গুণী হন। যখনই কাউকে সৎ লোক বলে লোকে জানবে তাকেই মনে করবে যে এর চুরি করার ক্ষমতা নেই, মিথ্যে কথা বলার ক্ষমতা নেই বলেই সে সৎ। স্বামীজীর কাছে একটি ছোকরা এসেছে সাধু হবার জন্য। তাকে স্বামীজী জিজ্ঞেস করছেন 'তুমি চুরি করতে

পার’? ছোকরা বলছে ‘না’। ‘মিথ্যে কথা বলতে পার’? ‘না’। ‘যাও তোমার দ্বারা সাধু হওয়া হবে না’। তার মানে বলতে চাইছেন – তুমি এমনই অপদার্থ যে তুমি চুরিও করতে পারবে না, মিথ্যে কথাও বলতে পারবে না। মিথ্যে কথা বলা খুব কঠিণ, লোকে ধরতে পারবে না যে সে মিথ্যে কথা বলছে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে মিথ্যে কথা বলা খুবই কঠিণ। সেই থেকে ভারতে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যারা বদমাইশি করতে পারেনা, মিথ্যে কথা বলতে পারেনা তারাই সৎ হয়ে যায়, সন্ন্যাসী হয়ে যায়। দেওঘরের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তিনি ছাত্রদের admission এর সময় আগে দেখে নিতেন ছেলে বদমাইশি, দুষ্টুমি করতে পারবে কিনা। তিনি ছাত্রদের বলতেন ‘দ্যাখ্ বাপু, বদমাইশি যদি না করিস মানুষ হবি না। তোরা বদমাইশি করলে তোদের ধরা আমার কাজ, আর যখন ধরা পড়বি তখন শাস্তিও দেবো। বদমাইশি তোকে করতে হবে মানুষ হবার জন্য, আর আমিও ধরা পড়লে তোকে শাস্তি দেব’। Man making এর প্রথম শর্তই হচ্ছে তোমাকে শক্তি অর্জন করতে হবে। স্বামীজী বলছেন ‘Be one man making character building’। ঠিক এই কথা দিয়েই বাল্মীকি এখানে তাঁর রচনা শুরু করছেন – বর্তমান কালে এই জগতে এমন কি কোন পুরুষ আছেন যিনি একাধারে বীর্যবান ও গুণবান। বীর্যবানটা এখানে হল man making আর গুণবানটা হল character building। তাঁর দুটোই আছে। আমাদের সমাজে বেশির ভাগই যাদের আমরা character বলে জানি, এরা কিন্তু প্রকৃত অর্থে অপদার্থ, এদের দিয়ে কোন কাজই হয় না। একটা কাজের দায়ীত্ব দিলে তাতেই ল্যাজে গোবরে হয়ে তালগোল পাকিয়ে দেবে, কোন কিছু করার ক্ষমতাই এদের নেই। যখন কারুর মধ্যে চুরি করার ক্ষমতা থাকবে, মারামারি করার ক্ষমতা থাকবে, মিথ্যে কথা বলার ক্ষমতা থাকবে অথচ চুরিও করবে না, মারামারিও করবে না আর মিথ্যে কথাও বলবে না তখন তাকে বীর্যবান ও গুণবান বলা যাবে। বাল্মীকি ঠিক এই বিন্দু থেকেই কথা বলা শুরু করছেন – হে নারদ, সাম্প্রতিক কালে এমন কি কেউ আছেন যিনি একাধারে গুণবান আর বীর্যবান। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন সমসাময়িক সেই পুরুষ যিনি গুণবান, বীর্যবান এবং ধর্মজ্ঞ, বাল্মীকি যদিও শ্রীরামচন্দ্রের থেকে বয়সে সামান্য বড় ছিলেন। তিনি ধর্মজ্ঞ ছিলেন, মানে তিনি শোনা কথাতেই চলতেন না, শুধু যে মিথ্যে কথা বলতে নেই চুরি করতে নেই, এই ধরণের শোনা কথাতে তিনি চলতেন না, তিনি জানতেন কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। মহাভারতে বারবার একটা প্রশ্ন ঘুরেফিরে এসেছে – ধর্ম কি? যখন দ্রৌপদীকে রাজসভায় এক দঙ্গল পুরুষের মাঝখানে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসা হয়েছে, তখন চোখের জল নিয়ে ভীষ্মের কাছে গিয়ে বলছেন – পিতামহ এটা কি ধর্ম? পিতামহ বলছেন – মা, ধর্মের গতি খুব গহন, বোঝা যায় না। আর ক্ষমতাবানরা যেটা বলে আর করে সেটাই ধর্ম হয়ে যায়, এখন ক্ষমতা দুর্যোধনের হাতে, ও যা বলবে ওটাকেই ধর্ম বলে মেনে নিতে হবে।

বাল্মীকি বলছেন তিনি যে ক্ষমতাবান ও বীর্যবান তাই নয় – **ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ**।১।১।২।। তিনি কৃতজ্ঞ। তাঁর কিছু ভালো কেউ করে দিলে সে সেটাকে ভালো করে মনে রেখে দেন। আর তিনি *সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ* – তিনি সত্য কথা বলেন, আর যে জিনিষটাকে তিনি ঠিক করে নিয়েছেন, আমি এটা করব, সেই কাজে তিনি দৃঢ়ব্রত। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের যে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে কোথাও তাঁকে ভগবান বলা হচ্ছে না, শ্রীরামচন্দ্রকে অতিমানব বা মহামানব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতিমানবের ধারণাটা খুবই অদ্ভুত। মিৎসে বলে একজন দার্শনিক ছিলেন, তিনি একটা কবিতাতে প্রথম অতিমানবের ধারণাকে তুলে ধরলেন। সেখানে অতিমানবের যে গুণাবলী হবে তার বর্ণনা যখন তিনি দিলেন সেটাই একটা নতুন দর্শন হয়ে পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সেখান থেকে জর্জ বার্ণার্ড’শ একটা খুব নামকরা নাটক লেখেন যার নাম Man in Superman। সেই সুপারম্যান থেকে কমিক্স এবং পরে সিনেমাও তৈরী হল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এর কয়েক হাজার বছর আগে বাল্মীকি এই সুপারম্যানের ধারণা দিয়ে রেখেছেন, আর এই ধারণাটা তিনি পুরোপুরি শ্রীরামচন্দ্রের উপরে আরোপ করে গেছেন। যদি কারুর জানতে ইচ্ছে হয় সুপারম্যান বা অতিমানব ঠিক কি রকম হবে, যার সামনে সবাই

কীট পতঙ্গের মত হয়ে থাকবে, তাহলে বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা পড়তে হবে, এই ব্যাপারে এর সামনে কোন সাহিত্যই দাঁড়াতে পারবে না।

বাল্মীকি রামায়ণকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে দু বছরের একটা ডিগ্রী কোর্স করেও শেষ করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে, এতই এর গভীরতা আর বিশালত্ব। বিশ্বের যত বড় বড় কবি আছেন তাঁরা শুধু নারী শরীরের বর্ণনাই করেন। বেদে আমরা মানব শরীরের বর্ণনা পাইনা। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে প্রথম দেখা যায় একজন যে সুপুরুষ, তার শরীরটা কেমন হবে তার আদ্যপান্ত বর্ণনা দিচ্ছেন। আর তার যে বর্ণনা করেছেন এখনকার কেন, কোন কালে কোন সাহিত্যিক এভাবে কখন বর্ণনা করতে পারবেন বলে মনে হয় না। রামায়ণে পরের দিকে আমরা দেখতে পাবো বাল্মীকি সুপুরুষের শরীরের লক্ষণ বলছেন – তাঁর শরীরের ছটা জায়গায় নীচু হবে, তাঁর শরীরের নটা জায়গা উঁচু হবে, তার অমুক জায়গা ফ্ল্যাট হবে, চিন্তা করা যায় না কি নিখুঁত আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করে গেছেন। তেমনি নারীর শরীর, যখন সীতার বর্ণনা দিচ্ছেন তখন নারীর শরীর কেমন হলে তাঁকে রমণীয় বলা যাবে, তখন তিনি এক এক করে তার প্রত্যেকটি শর্তের কথা নিখুঁত ভাবে বলে গেছেন।

ঠিক তেমনি অতিমানব যিনি তাঁর কি কি গুণ থাকতে হবে, কি কি গুণ থাকলে অতিমানব বলে গণ্য করা যাবে তার আদ্যপান্ত বর্ণনা দিচ্ছেন। কেউ যদি নিজেকে অতিমানব মনে করেন তার মধ্যে এই গুণগুলো থাকতে হবে – গুণবান, বীর্যবান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্য ও দৃঢ়ব্রত। সত্যবাক্যের ব্যাখ্যা আমরা আরো বিস্তৃত ভাবে মনুস্মৃতিতে পাই। সেখানে বলা হয়েছে, যে অপ্রিয় সত্যবাক্য বলে সে কিন্তু সত্যবাদী নয়। সত্যবাক্যের প্রথম শর্ত হচ্ছে অপ্রিয় কথা বলা যাবে না। কিন্তু তাই বলে আবার প্রিয় মিথ্যা কথা বলা যাবে না। এটাই সনাতন ধর্ম। তার মানে শ্রীরামচন্দ্র সত্য কথা বলেন কিন্তু কখন অপ্রিয় কথা বলেন না। যে বলে আমি সত্য কথা বলতে ভয় পাইনা, বুঝে নিতে হবে সে কিন্তু সনাতন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়। যখন সে নিজের ব্যাপারে সত্য কথা বলতে হয় তখনই পরীক্ষা হয়ে যাবে সে কতটা সত্যবাদী।

অতিমানবের আরও অনেকগুলো শর্তের কথা বলা হচ্ছে – **চারিত্রেণ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ।১/১/৩ -** তিনি সদাচারী, সমস্ত প্রাণীর হিতাকাঙ্খী ও হিতসাধক *সর্বভূতেষু কো হিতঃ*, ধার্মিক জীবনের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। একজন মানুষ, তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ কিনা ঠিক ঠিক বিচার করতে হলে দেখতে হবে এর প্রাথমিক শর্ত তিনি কিনা। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *সর্বভূতে হিতে রতাঃ* এই কথাটি ছয়বার উল্লেখ করেছেন। আজকের দিনে মিডিয়ার দৌলতে আমরা কত বাবাজীদর নাম শুনছি, চোখে দেখছি, ভাষণ শুনছি আর এনারা সবাই নিজেদের পরমহংস বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তিনি পরমহংস কিনা আমরা কি করে বুঝবে, একটা কথাতেই – *সর্বভূতে হিতে রতাঃ*, সব প্রাণীর হিতে নিজের সমস্ত মন প্রাণ উৎসর্গ করেছেন কিনা। যদি আপনি মনে করেন আমি আমার বাড়ির লোকেদেরই দেখাশুনা করব, অপরের দেখাশুনা করতে যাব না, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মধ্যে গোলমাল আছে। যদি মনে করেন আমি কলকাতার লোকেদেরকেই দেখব, দিল্লীর লোকেরা বাঁচল কি মরল আমি দেখতে যাচ্ছি না, তাহলেও বুঝতে হবে আপনার মধ্যে গোলমাল আছে। যিনি বীর্যবান, যিনি গুণবান, যিনি ধর্মজ্ঞ, যিনি সত্যবান সব গুণই আছে তার সঙ্গে কিন্তু *সর্বভূত হিতে রতাঃ* নেই, তাহলে এই গুণ দিয়ে কি হবে? তখন সে বিধর্মীদের গলা কাটবে। একজন সুপারম্যানের সব গুণের সাথে *সর্বভূতে হিতে রতাঃ*ও আছে, সর্বভূতের প্রতি তার করুণা আছে।

আর কি কি গুণের কথা বাল্মীকি বলছেন – **বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ।। ১/১/৩**– দেখতে খুব সুন্দর। শুধু গুণবান, শক্তিমান, বীর্যবানই নয় তিনি দেখতেও সুপুরুষ। তারপরে তাঁর আধ্যাত্মিক গুণাবলীর কথা বলছেন – **আত্মবান কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোহনসূয়কঃ।১/১/৪** – তাঁর মন সর্বদাই তাঁর নিয়ন্ত্রণে, আর *জিতক্রোধঃ*, ক্রোধটাও সম্পূর্ণ তাঁর বশে রয়েছে। তার মানে যখন ক্রোধ দেখাবার আবশ্যক হবে তখন ইচ্ছামাত্র তিনি ক্রোধের জন্ম দিয়ে দেবেন। যখন ক্রোধকে তিনি

ছাড়তে থাকবেন তখন তাঁকে আর আটকানো যাবে না। সেতুবন্ধনের সময় দেখতে পাব লক্ষ্মণ বলছেন – এক বাণ মেরে সমুদ্রকে শুকিয়ে দিন। শ্রীরামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে বলছেন – না, না, কখনই এই কাজ করা ঠিক হবে না। শ্রীরামচন্দ্র প্রথমে সমুদ্রের স্তব করতে শুরু করলেন। অনেকক্ষণ স্তুতি করার পরেও সমুদ্রের থেকে কোন সারা আসছে না দেখে শ্রীরামচন্দ্র খুব ক্রোধান্বিত হয়ে গেলেন। ক্রোধে তিনি ধনুক তুলে তাতে তীর সংযোজন করতেই তীর থেকে পৌরুষের আগুন বেরিয়ে এল। ক্রোধ পুরো নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কিন্তু যখন ক্রোধকে ছাড়বেন তখন আর তাকে থামান যাবে না।

যাই হোক, বাল্মীকি নারদ ঋষিকে বলছেন – হে দেবর্ষি, অতিমানবের এই গুণগুলিকে আমি চিন্তা করে ভেবে রেখেছি, এই ধরণের গুণে গুণান্বিত অতিমানব খুবই দুর্লভ, এই রকম সহজে কেউ হয় না, কিন্তু আপনি তো তিন লোকের খবর রাখেন কারণ আপনি সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান, যদি এই রকম অতিমানব কেউ থেকে থাকেন তাহলে একমাত্র আপনিই নিশ্চয় করে বলতে পারবেন।

তখন নারদ মুনি বলছেন – হ্যাঁ আছেন – **ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।** – ইক্ষ্বাকু বংশে রাম এই নামে প্রসিদ্ধ একজন আছেন, আর তিনি **নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান ধৃতিমান্ বশবী।**১/১/৮। তাঁর মন সব সময় নিজের সুনিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তিনি প্রচণ্ড শক্তিমান, দ্যুতিমান, মানে তাঁর শরীর কান্তিমান, বশী, বশী মানে জিতেন্দ্রীয়। বাল্মীকি রামায়ণে শরীরের বর্ণনা অনেকবার আসবে। এখানেও নারদ শরীরের ছোট্ট বর্ণনা দিচ্ছেন – **বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ।**।১/১/৯ – ওনার কাঁধ খুব পুষ্ট ও মোটা, হাত দুটি আজানুলম্বিত, গ্রীবা খুব সরু আর তাতে শঙ্খের মত সুন্দর তিনটি বলয়, হনু খুব ভরাট, বক্ষ চওড়া। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে – **মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ। আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ।**।১/১/১০- গলার নীচের হাড়টা মানে কণ্ঠির হাড়টা মাংস দিয়ে ঢাকা, জানু পর্যন্ত প্রসারিত তাঁর বাহুদ্বয়, তাঁর ললাট খুব উন্নত। শিরোদেশ খুব সুন্দর, আর তিনি যখন চলাফেরা করেন সেই চলাফেরার মধ্যে তাঁর বিক্রম প্রকাশ পায়। ওনার শরীরটা – **সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্।**১/১/১১ – বলছেন – উনি খুব লম্বাও নন আবার বেঁটে তাও নন, মাঝারি উচ্চতার, সমস্ত শরীরটাই ছিল সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ তাঁর শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলি সম অনুপাতে সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে, শরীরের চামড়া অতি কোমল, চোখ বড় বড় এবং শরীর নানা রকমের শুভ চিহ্নযুক্ত। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের শরীরের বিরাট বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। এই সব বলে নারদ মুনি বলছেন – হে বাল্মীকি, তুমি যে জিজ্ঞেস করছিলে এই রকম গুণের আধারে কোন অতিমানব আছে কিনা, হ্যাঁ আছে, আর তিনি তোমার আশ্রমের কাছেই আছেন। বাল্মীকি কানপুরের কাছে থাকতেন, আর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাতে আছেন। শ্রীরামচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ রচনা করেছেন।

বাল্মীকি রামায়ণ – ২৪শে এপ্রিল ২০১০

বাল্মীকি রামায়ণকে ইতিহাস বলা হয়। ইতিহাসকে নিয়ে অনেক পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু বিতর্ক আছে। অনেক মনে করেন ইতিহাস বলতে একমাত্র মহাভারতকেই বোঝায়। কিন্তু সাধারণ ভাবে ইতিহাস বলতে বাল্মীকি রামায়ণ আর মহাভারত এই দুটোকেই বলা হয়। ভারতবর্ষে রামায়ণ অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু সব রামায়ণকেই ইতিহাস বলা যাবে না, যেমন তুলসীদাসের রামচরিত মানসকে ইতিহাস বলা হয় না। একমাত্র বাল্মীকি রামায়ণকেই ইতিহাস বলা হয়।

সাধারণতঃ আমরা ইতিহাস বলতে যা বুঝি যেমন ভারতের ইতিহাস, ইউরোপের ইতিহাস, মহাত্মা গান্ধীর পরিবারের ইতিহাস, মুঘল আমলের ইতিহাস, কিন্তু কোন শাস্ত্রকে যখন ইতিহাস বলা হবে তখন তার অর্থের মধ্যে অনেক পার্থক্য হয়ে যাবে। প্রধান পার্থক্য একটা সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যেই বলা হয়েছে – *ধর্ম*

অর্থ কাম মোক্ষ অনাদ উপদেশ সমন্বিতম্ পূর্ববৃত্তং কথাযুক্তং - মানে, যে কোন সাহিত্যে যদি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটির উপদেশ সমন্বিতম্ থাকে আর তার সাথে আগে আগে কি হয়েছিল এই *কথাযুক্তং*, কথা এখানে দুটো অর্থে নেওয়া হয়, একটা হল পূর্বের কথা আরেকটি কথা কাহিনী। তাহলে ইতিহাসের সংজ্ঞা কি দাঁড়াল? যে শাস্ত্রে আগে কি হয়েছে তার কথার সাথে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের এই চারটের উপদেশ যখন এক সঙ্গে মিশে থাকবে তখন তাকেই ইতিহাস শাস্ত্র বলা হবে।

কিন্তু ইতিহাস বলতে আমরা সচারচর যা বুঝি, যেমন ভারতের ইতিহাস, মুঘল ইতিহাস, এই ইতিহাসে আমরা সেই সময়কার কিছু খবর ও তথ্য পাচ্ছি। এখানে কেউ যদি বলে আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে এই কথার মধ্যে একটা চালাকি লুকিয়ে আছে। এই কথার পেছনে যে রহস্য হচ্ছে, আমাদের কাছে দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখা, কিন্তু চোখের উপরে যখন একটা চশমার লেন্স লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন সে কিন্তু মানুষকে দেখতে পাচ্ছে না, তার ইমেজকে দেখছে। কিন্তু যখন চশমাটা খুলে দেওয়া হয় তখন সে ঝাপসাই দেখুক আর আবছাই দেখুক সে তখন প্রকৃত জিনিষটাকেই দেখছে। অথচ যারা চশমা পরে থাকেন তারা কখনই কোন জিনিষকেই দেখতে পায়না, জিনিষটার ইমেজটাকে দেখে। যেটা আমরা ফিজিক্সে জানি বস্তুর সামনে একটা লেন্স থাকলে সেই লেন্সে বস্তুটির ইমেজ তৈরী হবে, এটা হয়ে গেল একটা তথ্যকে জানা। কিন্তু যখন আমি বলছি আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তখন এটাই হয়ে গেল প্রকৃত বিজ্ঞান। একটা তথ্যকে জানা আর সেই তথ্যটাকে ঠিক ঠিক বুঝে প্রয়োগ করা দুটো পুরো আলাদা ব্যাপার। আমাদের স্কুল কলেজে যা পড়ান হয় সেগুলো কতকগুলি তথ্য মাত্র। উইল ডুরাণ্ডের একটি বই আছে লেসন্স্ ফ্রম হিস্ট্রি, ইতিহাস থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই। সত্যি বলতে গেলে ইতিহাস থেকে আমরা কোন শিক্ষাই পাইনা, কারণ ইতিহাস আমরা যা পড়ি এগুলো তথ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। শচীন তেণ্ডুলকার তিরানব্বুইটা সেঞ্চুরি করেছে না একশটা সেঞ্চুরি করেছে এটা জেনে আমার কি হবে? কারণ এটা আমার কাছে একটা তথ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইতিহাস বলতে আমরা বুঝি হিস্ট্রি, এই ইতিহাসকে যখন ধর্মশাস্ত্র বলা হয় তখন ইতিহাসের ইংরাজী অনুবাদ করে হিস্ট্রির যে ব্যাখ্যা করা হয় সেই ইতিহাস তখন আর বলা যাবে না। আমরা যে ইতিহাস পড়তে যাচ্ছি সেই ইতিহাসের সংজ্ঞা হচ্ছে পূর্ববৃত্ত কথা, আগেকার দিনের কথা ও কাহিনী। সেই কথা ও কাহিনীতে কি দেওয়া থাকবে? শুধু কতকগুলি তথ্যই দেওয়া থাকবে না, ধর্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষের উপদেশ থাকতেই হবে তাতে। যেমন গীতা, গীতাতে যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা বলা আছে সেখানে এগুলো তত্ত্বাকারেই শুধু দেওয়া হয়েছে – আত্মার জন্ম হয় না আত্মার মৃত্যু হয় না। কিন্তু যখন ইতিহাস লেখা হবে তখন তার মধ্যে এই তত্ত্বগুলিই এমন ভাবে ঢোকান থাকবে, যেই কেউ পড়বে সে খুব সহজেই ধরে নেবে কি বলতে চাইছে। কিভাবে দেওয়া হবে? একজন লোক ছিল সে মরে অমুক জিনিষ হয়ে গেল, তারপর মরে আবার একটা অমুক জিনিষ হয়ে গেল। মানে তার যে ব্যক্তিসত্তা সেটার কখন মৃত্যু হয় না, সেই ব্যক্তিসত্তা চলতেই থাকবে। ইতিহাসে সেটাকেই বলবে – সে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে ভালো কাজ করে মরার পর স্বর্গে গেল, সেখান থেকে তার আবার পতন হল। রাজা নহুষ ছিলেন পৃথিবীর রাজা, সেখান থেকে সে হয়ে গেল ইন্দ্র, সেখান থেকে তার পতন হয়ে তার ইন্দ্রত্ব চলে গেল, পতন হয় সে একটা অজগর সাপ হয়ে জন্ম নিল। মানে বলতে চাইছে, চিরন্তন একটা কিছু যেটা সব সময় অবিকৃত থাকে কিন্তু তার শরীরটাই পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। এইভাবে ধর্ম ও মোক্ষকে কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। পূর্বকালে রাজা নহুষ বলে একজন ছিলেন, এখন মৃত্যুর পর সে স্বর্গে গেছে কি যায়নি সেটা আমরা বলতে পারব না, আর সেখান থেকে তার পতন হয়ে একটা সাপ হয়ে জন্মাল, তার আমরা কি জানতে পারব? কিন্তু কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে গল্পাকারে এই তত্ত্বটাকেই এমন ভাবে বুনন করা হয়েছে যে জীবাত্মার ধারণা আর সে জন্মাচ্ছে আর মরছে, মানে একটা শরীর ছেড়ে আরেকটা শরীরকে ধারণ করে

নেয় আর এইভাবেই জন্ম-মৃত্যু চলতেই থাকে, এই জিনিষটাকে অত্যন্ত নিপুণ ভাবে আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার একটা সার্থক প্রয়াস করা হয়েছে।

তাহলে আমরা ইতিহাস বলতে কি বুঝলাম? ইতিহাস হচ্ছে পূর্বকথা, আগের আগের দিনে যেটা হয়ে গেছে, সেই কাহিনীগুলোর সাথে ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের উপদেশ সমণ্বিত থাকবে। এই নয় যে ইতিহাসে লেখা হবে – ইন্দিরা গান্ধী ভারতের একজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি একদিন এক সাধুবাবার কাছে দেখা করতে গেলেন, সাধুবাবা তাকে বললেন – ইন্দিরা, তুমি এই রকম করছ, কিন্তু মনে রেখো আত্মা অজর, অমর। এটাকে আমরা কখনই ইতিহাস বলতে পারব না। ইতিহাস কাহিনীর সাথে এই চারটি পুরুষার্থের দর্শনকে এমন ভাবে সমণ্বিত হয়ে থাকবে যে কোথায় কাহিনী আর কোথায় দর্শন এই পার্থক্যকে আর ধরা যাবে না, একেবারে এক হয়ে মিশে থাকবে। কয়েকটা রঙের সুতো এক সঙ্গে নিয়ে তাঁতে বোনার পর যেমন সব সুতো মিশে গিয়ে একটা শাড়ি হয়ে যায়, আলাদা করে আর সুতোগুলোকে ধরা যায় না, ইতিহাসেও এই ভাবে সুন্দর করে চারটে পুরুষার্থ আর কাহিনী ও ঘটনাকে একসঙ্গে বুনে দেওয়া হয় যে ধরা যাবে না, কখন কাহিনী শুরু হচ্ছে আর কোথা থেকে দর্শন শুরু হচ্ছে। ইতিহাসে এইটি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

বাল্মীকি রামায়ণ আর ব্যাসদেবের মহাভারতের সব কিছুতেই, তার অনেক কাহিনী, রচনার ধরণের মধ্যে এত বেশি মিল যে অনেক সময় বোঝা যায় না আমরা রামায়ণ পড়ছি না মহাভারত পড়ছি। অন্যদিকে মহাভারতেও আমরা রামায়ণের কাহিনী পাই। ঠিক ঠিক ইতিহাস বলতে আমরা বাল্মীকি রামায়ণ আর ব্যাসদেবের মহাভারত এই দুটোকেই বুঝি, ইংরাজী ভাষায় বলা হয় epics বা মহাকাব্য। একদিকে এই দুটো বই এর নাম মহাকাব্য আবার অন্যদিকে এই দুটোকেই বলা হয় সত্যিকারের ইতিহাসমূলক শাস্ত্র। বই এর আকার অনুযায়ী ঠিক করা হয় কোনটা মহাকাব্য। কিন্তু যোগবশিষ্ঠ আর বাল্মীকি রামায়ণের সাইজ এক, কিন্তু যোগবশিষ্ঠকে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। আবার অনেক গুলো পুরাণ আছে যা কিনা আকারে বাল্মীকি রামায়ণের থেকে বেশি, কিন্তু পুরাণকে ইতিহাস শাস্ত্র বলা হয় না, পুরাণ আলাদা শ্রেণীর গ্রন্থ, যদিও পুরাণকে মহাকাব্য বলা হয়। সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণের দুটি নাম – একটি মহাকাব্য আরেকটি নাম ইতিহাস। এখন কেউ যদি রামায়নের মত বিশাল গ্রন্থ লিখে দেন তখন তাকে মহাকাব্য বলা হবে না, তখন তাকে বলবে epic works, কিন্তু মহাকাব্য বলতে ঠিক ঠিক বোঝাবে একমাত্র বাল্মীকির রামায়ণ আর মহাভারত।

ইতিহাসের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – পুরাণে অতি মাত্রায় কাল্পনিক কাহিনীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে আবার অন্য দিকে উপনিষদে চরম তত্ত্বকে অত্যন্ত রূঢ় ও কোন ধরণের রাখঢাক না রেখে উপস্থাপিত করা হয়েছে – এই দুটোর সেতুবন্ধন হচ্ছে ইতিহাস। সেতু যেমন নদীর দুই তীরকেই স্পর্শ করে আছে, ইতিহাস ঠিক তাই করছে, ইতিহাসে আমরা বেদান্তের চরম দর্শনের কথাও যেমন পাই আবার কিছু কাল্পনিক কাহিনীও পাই। উপনিষদ থেকে যখন কাল্পনিক কাহিনীর ভাণ্ডার পুরাণে যাবে তখন তাকে ইতিহাসের উপর দিয়েই যেতে হবে, তাই ইতিহাস উপনিষদকেও স্পর্শ করে আছে আবার অন্য দিকে পুরাণকেও স্পর্শ করে রয়েছে। উপনিষদে অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই, আবার পুরাণে রয়েছে অনেক গালগপ্পো। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই এই অদ্বৈত তত্ত্বকে বুঝতে পারে না, কারণ অদ্বৈত তত্ত্ব খুব কঠিণ ও সাধন সাপেক্ষ। যারা পুরাণের এই গালগপ্পোকে পছন্দ করে না তারা উপনিষদের দিকে চলে যায়, আবার অনেকে আছে যারা উপনিষদের এই কাঠখোট্টা ভাবটাকে একেবারেই পছন্দ করে না তারা পুরাণের দিকে চলে যায়। সাহিত্যে বিশেষ করে ছাদ থেকে কেউ ধপাস্ করে মাটিতে লাফ দিয়ে পড়ে যায় না। তাকে সিড়ি দিয়ে বা মই এর সাহায্যে নামতে হবে। উপনিষদ থেকে পুরাণে নামার জন্য ইতিহাস হচ্ছে সিঁড়ির মত।

বেদে প্রকৃতিকে উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় যেভাবে উপাসনা করা হয়, ইতিহাসে ঠিক এই ধরণের প্রকৃতির উপাসনা পাই যেখানে প্রকৃতির প্রতি বেদের মত উদ্‌গার করা হয়েছে আবার সাথে সাথে উপনিষদের মত উচ্চ দর্শনের সমাবেশও রয়েছে – তার মানে, ইতিহাসে প্রকৃতিকেও রাখা হয়েছে আর তার সাথে দেবতাদেরকেও নিয়ে আসা হয়েছে, আবার অন্য দিকে উপনিষদের সত্যের উপাদানও রাখা হয়েছে। পুরাণে উপনিষদের সত্যের উপাদান খুব কম পাওয়া যাবে।

বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রের একত্র সমাবেশ পাচ্ছি – শ্রীরামচন্দ্র, দশরথ, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন আবার এর মধ্যে দেবতারাও তাঁদের কাছে হাজির হচ্ছেন। প্রকৃতি, দেবতা, ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে আবার ছোট ছোট দেবতারাও তাঁদের অস্তিত্বকে জানিয়ে যাচ্ছেন, যেমন অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ ইত্যাদি। ইতিহাসের এই এক অদ্ভুত ধরণ, যাতে সব কিছুরই একত্র সমাবেশ এখানে করা হয়েছে। ইতিহাসে একদিকে বাস্তব চরিত্র আবার অন্যদিকে কাল্পনিক চরিত্র আবার দেবতাদের ও উপদেবতাদেরকেও পাওয়া যাবে। সেইজন্য ইতিহাস মূলক সাহিত্য আর পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যেকার পার্থক্য গুলিকে খুব সহজে বার করা যায় না। যেমন শ্রীমদ্ভাগবত, বাল্মীকি রামায়ণ আর শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে কোথায় পার্থক্য আছে ধরা খুবই মুশকিল। তবে বড় পার্থক্যটা আমাদের সবার নজরেই আসবে তা হচ্ছে, শ্রীমদ্ভাগবত ঐতিহাসিক কোন কিছুর কথাই জোর দিয়ে বলবে না, সেখানে ভক্তিটাকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহাভারত আর বাল্মীকি রামায়ণের উভয় ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক তথ্যকে বেশ জোরের সাথেই তুলে ধরা হয়েছে। অন্য দিকে পুরাণের যেমন পঞ্চ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে সেইভাবে ইতিহাস মূলক সাহিত্যে কোন লক্ষণের কথা বলা হয় না।

কিন্তু এত পার্থক্যের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে শ্রীমদ্ভাগবতকে কেন পুরাণ বলা হয় আর বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটোকে কেন ইতিহাস বলা হচ্ছে? তার একটাই উত্তর আমাদের ঋষিরা পরম্পরাতে বলে দিয়ে এসেছেন এটা পুরাণ আর এটা ইতিহাস। আমাদের হিন্দু ধর্মে গুরুকে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দেওয়া হয় আর তাঁর বাক্য আমাদের কাছে বেদবাক্য, গুরু বলে দিয়েছেন এটা পুরাণ আর ওটা ইতিহাস, তাই এটা ইতিহাস আর ওটা পুরাণ। এছাড়া আর বিশেষ কোন ভাবে পার্থক্য করা যায় না। ঠাকুর বলছেন – মা ছুতোরের ছেলেকে দেখিয়ে বলে দিয়েছেন 'ও তোর দাদা', তখন পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস করে নিয়েছে সে তার দাদা। আমাদেরকেও পরম্পরাতে বলে দেওয়া হয়েছে ভাগবত হল পুরাণ আর বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস, এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই। কিন্তু এদের বৈশিষ্ট্য গুলি দিয়ে যদি পার্থক্য বার করতে যাওয়া হয় তাহলে খুব একটা পার্থক্য নজরে আসবে না।

পরের দিকে, আজ থেকে প্রায় একশ দুশো বছর আগে পণ্ডিতরা এসে চিন্তা করে বার করতে শুরু করলেন আগের আগের ঋষিরা কেন ভাগবতকে পুরাণ বলেছেন আর বাল্মীকি রামায়ণ আর মহাভারতকে কেন ইতিহাস বলেছেন। তখন তাঁরা পুরাণ আর ইতিহাসের উপরে কিছু কিছু শর্ত আরোপ করে পুরাণ আর ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য তৈরী করলেন, যেমন – যদি কোন সাহিত্যে পূর্ববৃত্ত কথা থাকে, যদি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ থাকে তখন এগুলো হয়ে যাবে ইতিহাস আর যে সাহিত্যে পঞ্চ লক্ষণ থাকবে সেটা হয়ে যাবে পুরাণ। কিন্তু যত বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা যাবে তখন দেখা যাবে ভাগবত পুরাণও ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা বলছে আবার অন্য দিকে মহাভারতেও পঞ্চ লক্ষণ আছে, সেই কারণে এগুলোর কোন দাম নেই। সেইজন্য ইতিহাস আর পুরাণের কোন সংজ্ঞাই ঠিক ঠিক প্রযোজ্য হয় না। শেষ পর্যন্ত ঐ একটি ব্যাখ্যাতেই গিয়ে দাঁড়ায় – ছুতোরের ছেলেকে দেখিয়ে মা বলে দিয়েছে 'ও তোর দাদা' তখন সে তার দাদাই। আমাদের পরম্পরাতে বলে দেওয়া হয়েছে ভাগবত পুরাণধর্মি আর বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাসধর্মি, আমরাও সেইভাবে দেখে আসছি। কিন্তু পণ্ডিতরা মানতে চান না, যখন মানবেন না তখন কয়েকটা শর্ত আরোপ করে দেওয়া হল।

তবে একটা ব্যাপার খুবই উল্লেখনীয়, ভাগবতের মূল চরিত্রের যে ব্যক্তি সত্তা সেটাকে সব সময়ই দিব্য সত্তা বলে তুলে ধরা হয়ছে, এখানে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপে আনা হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে আর মহাভারতের মূল চরিত্রের ব্যক্তি সত্তাকে ভগবান বা দিব্য সত্তা রূপে না এনে তাঁকে একজন মানবীয় চরিত্র রূপে আঁকা হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণের যে মূল চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র হলেন একজন ঐতিহাসিক পুরুষ, তিনি কিন্তু ভগবান নন। পুরাণ আর ইতিহাসের মধ্যে এটা একটা খুব বড় পার্থক্য। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দুর্যোধন এনারা সবাই ছিলেন ঐতিহাসিক পুরুষ। কিন্তু ভাগবতে যখন শ্রীকৃষ্ণ আসেন তখন তিনি হয়ে যান ভগবান।

এর আগে আমরা দুটো দিক, তপস্যা আর স্বাধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছি – *তপঃ-স্বাধ্যায় নিরতং তপস্বী বাগবিদাং বরম্*। বাল্মীকির বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে বাল্মীকি তিনি তপঃ আর স্বাধ্যায়ে নিরত, এই দুটোতে তিনি সব সময় লেগে আছেন। আর তিনি হচ্ছেন *বাগবিদাং বরম্*। যখন কোন একটা বড় কাজ করা হয় তখন তপস্যা ছাড়া সেই কাজ করা সম্ভব হয় না। যে কোন সাধুর পক্ষে তপঃ আর স্বাধ্যায় প্রতিদিনের সর্বক্ষণের জীবনচর্চা, যে সাধু তপঃ আর স্বাধ্যায় থেকে সরে এসেছে তাহলে তাঁর সর্বনাশ। বাল্মীকিও এই দুটো জিনিষই করছেন। একটা কিছুকে উদ্দেশ্য করে যখন তপস্যা করা হয় তখন মনকে আস্তে আস্তে সেই উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যেতে হয়। তাঁর চিন্তন হবে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারবৎ আর *সমানপ্রত্যয় প্রভাব* – মনের বৃত্তি একেবারে সমান ভাবে চলতে থাকবে, এখন এক রকম ধ্যান করছি, তারপরেই অন্য রকম ধ্যান করছি, এখন এই চিন্তা নিয়ে আছি, তার কিছুক্ষণ পরেই অন্য চিন্তা এসে আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে, এই রকম কখনই হবে না। তারপরে বলছেন মনের বৃত্তি যখন সমান ভাবে চলতে শুরু করেছে, তখন এটাকেই দীর্ঘকাল ধরে করে যেতে হবে। একদিন করলাম তারপরে দু-দিন করলাম না, একমাস করলাম তারপরে ছয় মাস কিছুই করলাম, তাহলে হবে না, দীর্ঘকাল ধরে একভাবে করে যেতে হবে। বলা হয় পঁচিশ বছর কি তিরিশ বছর এখানে কোন ব্যাপারই নয়।

তপস্যার প্রথম যেটা দরকার তা হল – উপাসনার একটা বিষয় থাকবে, যেমন আমাদের কাছে উপাসনার বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণ। তারপরের ধাপ হচ্ছে নিজেকে এই বিষয়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ ধ্যানের গভীরে গিয়ে তাঁকে চিন্তা করতে হবে। চিন্তাটা কেমন হবে? অবিচ্ছিন্ন তৈলধারবৎ, মন একটুও চঞ্চল হবে না, আর সামানপ্রত্যয় প্রভাব – একই রকম চিন্তন হতে থাকবে, এটাই দীর্ঘকাল ধরে করে যেতে হবে। এই কয়টি হচ্ছে ধাপ। এর প্রত্যেকটি যখন এক সঙ্গে মিশে যায় তখনই হবে তপস্যা। যখন বলা হয় পার্বতী শিবের তপস্যা করছেন। তার মানে পার্বতী নিজেকে শিবের ধ্যানে নিমগ্ন করে দিচ্ছেন। তখন তাঁর মনে শিব ছাড়া আর কোন কিছুর চিন্তন নেই। যখন পার্বতী ফুল চয়ন করছেন, শিবের চিন্তন করছেন, যখন আহার করছেন তখন শিবের চিন্তন করছেন, যখন পার্বতী ঘুমোতে যাচ্ছেন তখনও শিবের চিন্তন করতে করতে নিদ্রাতে চলে যাচ্ছেন। আর এই জিনিষটাই অনেক কাল ধরে করে চলেছেন।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে খুব ভালো বাড়ির একটি ছেলে পড়ত, সে প্রচণ্ড চঞ্চল ছিল। বাবা-মা দুজনই ডাক্তার। যখন ছাত্রটি বাড়ি যাচ্ছে তখন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ছেলেটির বাবা-মাকে বলে দিলেন ওকে বাড়ি গিয়ে রোজ ঠাকুর ঘরে ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট করে সকাল বিকেল চুপ করে বসাবেন। বাড়িতে গিয়ে ছেলেকে বসিয়েছেন। তার দু-মিনিট পরেই ছেলে মাকে জিজ্ঞেস করছে 'মা, পাঁচ মিনিট কি হয়ে গেছে'? মা বলছেন 'না, এখনো হয়নি, চুপ করে বসো'। তারপরে আধ মিনিট পরেই বলছে 'মা, তুমি ঘড়ি দেখতে ভুলে যাবে নাতো'? মা – না ভুলে যাব না। ছেলে – মা, তুমি সত্যি বলছ না মজা করছ? পরে মায়ের সাথে মহারাজের দেখা হতেই বলছেন 'মহারাজ কি বলব, ঐ পাঁচ মিনিটের মধ্যে পঁচিশ বার আমাকে মনে করাচ্ছে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে কিনা'। মন কত চঞ্চল। আমাদেরও ঐ অবস্থা, টানা দুই থেকে তিন ঘন্টা যদি জপে না বসা যায় তাহলে কিছুই বোঝা যাবে না। তপস্যা করার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে কম করে দুই থেকে তিন ঘন্টা একাসনে বসে থাকা। শুধু টানা দু-তিন ঘন্টা বসা অভ্যেস করলেই হবে না,

যিনি আমার উপাস্য, শ্রীরামচন্দ্রই হোন কিংবা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ, যেই হোন না কেন, তাঁর কাছে মনটাকে নিয়ে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ, মন একটুও উপাস্যের চিন্তা থেকে সরে যাবে না, আর সমানপ্রত্যয় প্রবাহ, মানে মন এক ভাবে থাকবে, এটাই দীর্ঘকাল ধরে, কুড়ি বছর কি পঁচিশ বছর ধরে চলছে তো চলছেই। তখনই ঠিক ঠিক তপস্যা হবে, তপস্যার বাঞ্ছিত ফল তারপরেই পাওয়া যায়।

নারদকে বাল্মীকি প্রশ্ন করার পর নারদ তখন উত্তর দিচ্ছেন। রামায়ণ দুই রকমের আছে – বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম অধ্যায়কে বলা হয় সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। পণ্ডিতরা অনেকেই এই প্রথম অধ্যায়কে মুখস্ত করে রাখেন এবং নিত্য এর পাঠ করেন। একে অনেকে শতশ্লোকী রামায়ণও বলেন। এই শতশ্লোকী রামায়ণে বাল্মীকির কথা থেকে শুরু করে রাম কথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এর প্রথম যে চারটি শ্লোক নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে বাল্মীকি এই শ্লোক কয়টি রচনা করেননি। আবার এর এক জায়গায় বাল্মীকি ভবিষ্যত বাণী করছেন শ্রীরামচন্দ্র এগার হাজার বছর রাজত্ব করে তারপর তিনি পরমধামে যাবেন ইত্যাদি, এগুলোও বাল্মীকি লেখেননি। প্রথম কয়েকটি সর্গ বাল্মীকির শিষ্যরা পরে লিখে ভূমিকা রূপে রামায়ণে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। প্রথম সর্গকে তাই বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকা বলা যায়, দ্বিতীয় সর্গও ভূমিকা।

বাল্মীকি রামায়ণে আমরা মাঝে মাঝেই গ্রন্থস্তুতি পাব। গ্রন্থস্তুতি মানে, যখন কোন গ্রন্থ রচনা করা হয় তখন তাঁরা জানতেন যে মানুষ এগুলো পড়বে না, তাই মানুষের মন যাতে গ্রন্থ পাঠে আকৃষ্ট হয় তার জন্য তাঁরা বলে দিতেন এই গ্রন্থ পাঠ করলে কি কি লাভ হবে। প্রত্যেক শাস্ত্রেই এই ধরণের গ্রন্থস্তুতি থাকে। অধ্যাত্ম-রামায়ণে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের পরে লেখা আছে এই অধ্যায় পাঠ করলে কি কি হবে। মানুষ তার স্বভাবে খুবই অধৈর্য্য, অধৈর্য্য হওয়ার জন্য তাকে কিছু করতে বললেই আগে জানতে চাইবে এটা করে আমার কি লাভ হবে। মানুষের এই অধৈর্য্য প্রবণতার কথা ভেবে শাস্ত্রকাররা গ্রন্থস্তুতি করেন।

বাল্মীকি রামায়ণের এই অধ্যায়ের শেষেও গ্রন্থস্তুতি করা হয়েছে। যদি ব্রাহ্মণ এই অধ্যায়কে পাঠ করেন তাহলে বিরাট বিদ্বান হয়ে যাবেন, মানে শাস্ত্রবাক্যে তাঁর অনেক পারদর্শিতা এসে যাবে। ক্ষত্রিয় যদি এই অধ্যায়কে নিত্য পাঠ করে তাহলে সে পুরো পৃথিবীকে সাম্রাজ্য রূপে পেয়ে যাবে। বৈশ্যরা যদি পাঠ করে তাহলে বিদেশে বাণিজ্যে তাঁর খুব লাভ হবে। আর শূদ্ররা যদি পাঠ করে তাহলে সে খুব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এখানে একটা কথা বোঝা খুবই জরুরি, যারাই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বা করান তাঁরা সবাই ব্রাহ্মণ। কর্মের বিপাকে কেউ এই বংশে কেউ এই কুলে জন্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু ব্রাহ্মণ না হলে এত ধৈর্য্য ধরে শাস্ত্র শোনা কখনই ইচ্ছা হবে না, যদি ব্রাহ্মণ না হতেন তাহলে শাস্ত্র শুনতেই পারত না, শাস্ত্রের কথা শুনলেই ছিটকে যেত। তাই যারাই এত কষ্ট করে এখানে এসে ধৈর্য্য সহকারে শাস্ত্র শুনছেন তাঁরা সবাই ব্রাহ্মণ, এখন তাঁরা বাল্মীকি রামায়ণ শুনছেন, তার ফলে তাঁদের কি হবে? বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকি বলছেন – **পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ** ১/১/১০০- মানে তাঁরা বিদ্বজ্জন হয়ে যাবেন, তাঁদের বিদ্যা বুদ্ধি অনেক বৃদ্ধি হয়ে যাবে। আর যিনি বেদ পড়ান তিনিই গুরু, সেই গুরু যদি কাউকে বলে দেন ও ব্রাহ্মণ, তখন সে সত্যি সত্যিই ব্রাহ্মণ হয়ে যাবেন। এখানে বলছেন ব্রাহ্মণ যদি রামায়ণ পড়ে তাহলে সে বাগৃষভ্ হয়ে যান, ঋষভ মানে ষাঁড়, তিনি, বাগ্ মানে শব্দের, মানে বিদ্যার ষাঁড় হয়ে যান, এই ষাঁড় রাজা অর্থে বলা হচ্ছে। তাই ঋষভ কথাটি খুবই সম্মানের জিনিষ, বলা হয় – শ্যেনো গৃধ্রানাং মহিষো মৃগাণাং, মানে পাখিদের মধ্যে শ্যেন আর পশুদের মধ্যে মহিষ।

বাল্মীকি রামায়ণ – ২৫শে এপ্রিল ২০১০

রামায়ণের কাহিনী আমাদের মোটামুটি সবারই জানা। এখানে কাহিনী আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাল্মীকির রামায়ণের দর্শনকে জানা এবং ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ক্রমবিবর্তনে বাল্মীকি রামায়ণের কি ভূমিকা। যদিও আলোচনার মাঝে মাঝে কিছু কাহিনী বলতেই হবে।

বাল্মীকির পরবর্তি কালে ভারতে যত রামায়ণ রচিত হয়েছে সব রামায়ণ থেকে বাল্মীকি রামায়ণ সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু সব রামায়ণের আকর গ্রন্থ বাল্মীকি রামায়ণ, বাল্মীকি রামায়ণকে আধার করেই পরের দিকে অন্যান্য সব রামায়ণ লেখা হয়েছে। আমরা জানি সীতার বনবাস যখন হয় তখন মা সীতাকে বাল্মীকি আশ্রমেই পাঠান হয়েছিল। আর এমনই কপাল যে তিনি সীতার পরিচয় জানতেন না, অথচ তিনি নারদকে প্রশ্ন করছেন কে এমন পুরুষ এই ধরণীতলে আছেন যিনি শৌর্যে বীর্যে বলীয়ান আবার অন্য দিকে ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যে দৃঢ়ব্রতঃ। হতে পারে, যখন সীতাকে বনবাসে পাঠান হয়েছিল তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাপারে সীতার থেকেও অনেক বেশি বিস্তৃত ভাবে জানতেন। আমরা রামায়ণে যে রকম বর্ণনা পাই তাতে মনে হয় বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাপারে আগে থেকেই অনেক কিছুর বর্ণনা কোথাও পেয়েছিলেন।

তবে বাল্মীকি যে এই রামায়ণ রচনা করেছেন এর উপাদান তিনি কিছুটা তাঁর জ্ঞানচক্ষু দিয়ে পেয়েছিলেন আর কিছুটা সীতার কাছ থেকে শুনেও থাকতে পারেন। সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণের রামকথা অন্যান্য যত রামায়ণ আছে, সে তুলসীদাসের রামচরিতমানসই হোক, অধ্যাত্ম রামায়ণই হোক বা কৃত্তিবাস রামায়ণই হোক সবার থেকে অনেক বেশি প্রামাণিক। অন্যান্য রামায়ণে দর্শনের থেকে কাহিনীতেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে কাহিনী তেমন গুরুত্ব নয়, আমাদের কাছে গুরুত্ব হল ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতের ভূমিকা ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যতা।

আমরা বলছি বাল্মীকি রামায়ণ আর মহাভারত ইতিহাস মূলক শাস্ত্র বা সাহিত্য। এই ইতিহাস আর আমরা সাধারণত যাকে ইতিহাস মনে করি, সেই ইতিহাসের সঙ্গে এই ইতিহাসের কোন মিল নেই। সাধারণত যাকে আমরা ইতিহাস মনে করি সেই ইতিহাস আমাদের কয়েকটি তথ্য সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসকে তখনই শাস্ত্র বলা হয় যখন কোন মহাপুরুষের চরিত্র, তাঁর জীবনের পূর্ব বৃত্তান্ত ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করে চতুরবর্গ পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়। এই ইতিহাস শব্দকে এখানে একটা পারিভাষিক শব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে, আমরা ষষ্ঠ শ্রেনী বা সপ্তম বা অষ্টম শ্রেনীতে যে ইতিহাস বই পড়েছি সেই ইতিহাসের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। যেমন আত্মা শব্দ, এই আত্মা শব্দকে হিন্দুরা ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে, এই আত্মাকেই খ্রীশ্চানরা বলছে soul সোলের ধারণাটা শুধু খ্রীশ্চানদের। খ্রীশ্চানরা সোলকে যে অর্থে ধারণা করে সেটা হিন্দুদের কাছে সূক্ষ্ম শরীর। আমাদের মধ্যেও অনেকেই আত্মা শব্দকে সূক্ষ্মশরীরের সাথে মিশিয়ে গোলমাল করে ফেলে। অনেকে সূক্ষ্মশরীরের কথা বলতে গিয়ে আত্মা শব্দকে ব্যবহার করে ফেলেন, ফলে আত্মতত্ত্ব বুঝতে গিয়ে সব গোলমাল পাকিয়ে যায়। হিন্দুদের আত্মার অর্থ সূক্ষ্মশরীরও নয় আবার সোলও না। বিদেশে আত্মা শব্দের অর্থ বুঝবে না বলে স্বামীজী অনেক জায়গায় সোল কথাটা ব্যবহার করেছেন। তেমনি ইতিহাস আর হিস্ট্রি এক জিনিষ নয়।

ইতিহাস শাস্ত্রে যে তথ্য থাকবে না তা নয়, তথ্যও থাকবে, কিন্তু তার সাথে সাথে এই চারটের উপর জোর দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের যে কোন একটি বা একাধিককে অবলম্বন করে মানব জীবনের উদ্দেশ্যকে সার্থক কিভাবে করবে। আমাদের হিন্দুধর্মে তথ্যকে কোন মূল্য দেওয়া হয় না। একটা বই পড়ে যদি তুমি ভগবানের দিকে এগোতে নাই পারলে, যদি তুমি একজন সত্যিকারে ভালো মানুষ নাই হতে পারলে তাতে মামুলি কয়েকটি বই পড়ে আর কতকগুলি তথ্য জেনে আমার কি হবে! কোন্ রাজা দুটো বিয়ে করেছিল কি চারটে বিয়ে করেছিল জেনে আমার আপনার কোন পুরুষার্থই সার্থক হবে না। কিন্তু যখন শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনছি, যখন লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণের কথা শুনছি তখন আস্তে আস্তে আমার মন বুঝে নিতে পারবে যে এই রকম করলে আমি এই শ্রীরামচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্ব লাভ করতে পারব। ভারতে যত শাস্ত্র আছে, অঙ্ক থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্র, সব শাস্ত্রেরই লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের আত্মোন্নতি, আত্মবিকাশ।

বাল্মীকি আশ্রম করেছিলেন তমসা নদীর তীরে। তমসা নদীর অস্তিত্বের কথা আমরা এখন আর বলতে পারব না। বাল্মীকির আশ্রম ছিল গঙ্গার ধারে কানপুরের কাছে বিঠুর বলে একটি জায়গা আছে,

সেখানে। বিঠুরে এখনও বাল্মীকির আশ্রম আছে। মনে হয় বিঠুরের পাশ দিয়ে ছোট একটা নালা জাতীয় নদী প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় মিশে যেত। কিন্তু বর্তমানে বাল্মীকির আশ্রমে গেলে গঙ্গাই দেখা যায়, আর কোন নদীর চিহ্নও চোখে পরে না। গাড়োয়ালের দিকে তমসা নামে একটা নদীর কথা পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা সীতার বনবাসের আগের মুহূর্তের যে বর্ণনা পাই তাতে বলা হচ্ছে সীতাকে রথে করে নিয়ে গিয়ে বনে ছেড়ে আসা হয়েছিল। অযোধ্যা লক্ষ্ণৌর কাছাকাছি। অযোধ্যা থেকে গাড়োয়াল অনেক দূরের রাস্তা, রথে করে যেতে এক সপ্তাহের বেশি লাগবে, অথচ লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর কয়েক ঘন্টার রাস্তা। যদিও রামায়ণের কাহিনী অনেক পুরাতন কিন্তু তাই বলে যে পুরোটাই কাল্পনিক আর গালগপ্প হবে তা নয়। ঐতিহাসিক অনেক তথ্যই সঠিক ভাবে বলা আছে। লক্ষ্ণৌ থেকে কানপুর ট্রেনে লাগছে দু-ঘন্টা তাহলে রথে হয়তো সারা দিন লাগবে। তখনকার দিনে যে নাম ছিল তাকে পরে পাল্টেও দিতে পারে, যেমন জয়রামবাটীতে আমোদর নদীকে মা বলতেন গঙ্গা, এখন যদি এর গঙ্গা নাম কেউ দিয়ে দেয় তাহলে সেই নামটাই চলতে থাকবে। রামায়ণের ভৌগলিক যে বর্ণনা আমরা পাই তার মধ্যে যতটা বাস্তবে মিলবে আমরা ততটুকুই নেব।

বেদে যজ্ঞের উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল, রামায়ণে এসে সেখান থেকে সরে এসে তপস্যার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। রামায়ণ বেদের ঠিক পরের দিকে সাহিত্য। প্রথম সাহিত্য বেদের যজ্ঞ থেকে সরে এসে দ্বিতীয় সাহিত্য তপস্যাতে চলে এল। বাল্মীকির রামায়ণের রচনা শুরুই হয়েছে 'তপঃ' এই শব্দ দিয়ে। সেই থেকে পুরো রামায়ণ জুড়ে তপস্যার কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে।

বাল্মীকি রামায়ণের পুরো কাহিনীটাই ঐতিহাসিক কিন্তু তপস্যা আর তপস্যার যে বিভিন্ন রূপ, যেমন আমি হয়ত তপস্যা করেছি আর আপনি হয়ত তপস্যা করেননি, আমার তপস্যার ফল কিন্তু আমি আপনাকে হস্তান্তর করে দিতে পারি, এই ব্যাপার গুলো রামায়ণে খুব পাওয়া যাবে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তপস্যা করেছেন, কিন্তু মথুরবাবু তপস্যা না করে খালি সেবা করে গেলেন। তারপর মথুরবাবুর কিছু সমস্যা হলেই তিনি ঠাকুরের কাছে ছুটে এসে বলছেন 'বাবা, আমার এই এই সমস্যা হয়ে গেছে'। তখন ঠাকুর কি করেছেন? ঠাকুর যে তপস্যা করে শক্তি পেয়েছেন তিনি সেখান থেকে একটু শক্তি মথুরবাবুকে দিয়ে দিলেন।

তারপর বলা হচ্ছে বাল্মীকি ঋষি তমসা নদী, যা কিনা গঙ্গা থেকে বেশি দূরে নয়, তার তীরে তপস্যা করছিলেন। এখানে বাল্মীকি নিজের শিষ্যদের বর্ণনা করছেন, আর যখন তিনি এসবের বর্ণনা দিচ্ছেন তখন ইতিমধ্যেই তিনি খুব বিখ্যাত হয়ে গেছেন। কারণ বিখ্যাত না হলে শিষ্য হবে না, যখন অনেক শিষ্য হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে তিনি খুব ভালো মতই একজন প্রতিষ্ঠিত মহাত্মা হয়ে গেছেন। সেইজন্য এই বাল্মীকিকে নিয়ে এই ধরণের কাহিনী যে তিনি রত্নাকর ডাকাত ছিলেন, ডাকাত থেকে তিনি মরা মরা জপ করে মহাপুরুষ হয়ে গেছেন কখনই বাস্তব সম্মত হতে পারেনা, সবই গালগপ্প। এগুলো হচ্ছে পৌরাণিক কথা, পৌরাণিক কথার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যাকে খারাপ করবে তার সব কিছুকেই যতটা খারাপ করা যেতে পারে পারলে তার থেকেও বেশি খারাপ করে দেবে, আবার যাকে ভালো করেবে তার মধ্যে সব ভালো জিনিষ ঢালতেই থাকবে, ঢালতে ঢালতে কোথায় গিয়ে যে থামবে বলা মুশকিল। ইতিহাস মূলক সাহিত্যে এই ধরণের কোন সমস্যা নেই। রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রগুলো পুরোটাই ভালো কিংবা পুরোটাই খারাপ হবে না, সব কটা চরিত্রে ভালো-মন্দ দুটোই মিশিয়ে থাকবে। বাল্মীকি রামায়ণেও তাই শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলা হয়েছে যেগুলো পড়লে ভক্তরা আঁতকে উঠবেন। যারা ভক্তিশাস্ত্র মনে করে বাল্মীকি রামায়ণ পড়বেন তাঁরা অনেক জায়গাতেই হতাশ হয়ে যাবেন। এই কারণে ভক্তিমার্গের ভক্তরা বাল্মীকি রামায়ণ পড়তে গেলে রীতিমত ভেঙ্গে পড়েন। তাহলে আমরা কেন বাল্মীকি রামায়ণকে এত গুরুত্ব মনে করে অধ্যয়ন করতে এসেছি? কারণ বাল্মীকি রামায়ণ ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পক্ষে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের আধ্যাত্মিকতা কিভাবে বিবর্তন হতে হতে আজকে এই জায়গাতে এসে দাঁড়িয়েছে, বাল্মীকি রামায়ণকে ঠিক ঠিক ভাবে অধ্যয়ন না করলে আমরা ধরতেই পারব না।

এখানেই বোঝা যাবে একজন সাধারণ লোককে কিভাবে মহাত্মা, মহাত্মা থেকে দেবতা আর দেবতা থেকে তাকে কিভাবে ভগবান বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একমাত্র বাল্মীকি রামায়ণ পড়লেই পুরো জিনিষটা বোঝা যাবে যে একজন শক্তিমান মানুষ থেকে সে কিভাবে মহাপুরুষ হয়ে যাচ্ছেন, মহাপুরুষ থেকে কিভাবে দেবতা হয়ে যান আর দেবতা থেকে তিনি কিভাবে ভগবান হয়ে যাচ্ছেন। দেবতা আর ভগবানের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? দেবতাদের ক্ষমতা ও শক্তি সীমিত, কিন্তু ভগবানের ক্ষমতা ও শক্তি অনন্ত, তিনি দেবতাদেরও ওপরে। বাল্মীকি রামায়ণকে অধ্যয়ন করলে এই বিবর্তনটাকে ধরা যায়। অবতার তত্ত্ব কিভাবে এসেছে সব তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমাদের বলে দেওয়া দরকার আদিকাণ্ডে প্রথম যে চারটি সর্গ আমরা পাচ্ছি, এই চারটি কিন্তু বাল্মীকির রচনা নয়। কারণ বাল্মীকি নিজেকে কখনই ভগবান বলবেন না। দ্বিতীয় সর্গের নবম শ্লোকে বলা হচ্ছে – **তস্যাভ্যাসে তু মিথুনং চরন্তমনপায়িনম্। দদর্শ ভগবাংস্তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চারু নিঃস্বনম্।।**১/২/৯। আসলে ভগবান কথার অর্থ যিনি বিরাট। বাল্মীকি তখনকার দিনের খুব বড় ঋষি ছিলেন আর তাঁকে আদি কবি বলা হত। এখন ঋষিকে একেবারে খারাপ থেকে মহান করতে পারলে শ্রীরামের মহিমাও দেখান হয়ে যাবে, তাই বাল্মীকিকে ডাকাত বানিয়ে দেওয়া হল। ডাকাত যখন বানিয়ে দিল তখন আবার অনেক কিছুই হিসেবের মধ্যে মিলছে না, তখন এটা সেটা বলে কোন রকমে পার করে দিয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে বাল্মীকিকে অনেক নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপরে আবার তাঁকে সেখান থেকে উপরে উঠিয়ে আনা হয়েছে, এগুলো শ্রীরামের মহিমা দেখানোর জন্যই করা হয়েছে। কিন্তু এসব কিছুই নয় তিনি একেবারে সত্যিকারের ঋষি ছিলেন, আবার *তপঃ-স্বাধ্যায়নিরতং*, তপস্যা আর স্বাধ্যায় এই দুটো ছাড়া তাঁর জীবনে আর কিছু ছিল না। বিয়েও করেননি, তবে তিনি ঋষি, সন্ন্যাসী ছিলেন না। বাল্মীকি শিষ্যদের বর্ণনা করে বলছেন যে তপস্যাদি করার পর যখন তমসা নদী থেকে স্নান করে উঠছেন তখন তাঁর দৃষ্টিতে ক্রৌঞ্চ যুগল পাখির আনন্দঘন মুহুর্ত ধরা পড়ল। দুটি পাখি যুগলে আনন্দ করছে। সেই সময় এক ব্যাধের তীরে পুরুষ পাখিটি বধ হয়ে যায়।

যাঁরা তপস্যা করেন তাঁদের মন অত্যন্ত কোমল হয়ে যায়। তাঁদের মন এত নরম হয়ে যায় যে, তাঁর অসুবিধা করেও যদি কেউ আনন্দ পায় তাতেও তিনি আনন্দ অনুভব করেন। অপরের আনন্দে যদি কেউ আনন্দ না পায় তাহলে বুঝতে হবে তার মন পরিষ্কার নয়। সেইজন্য যোগশাস্ত্রে বলা হয় *‘মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষা’* – এখানে মুদিত বলতে বোঝাচ্ছে অপরের কিছু ভালো হচ্ছে সেটা দেখে আমারও আনন্দ হবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ একবার এক সেন্টারে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি যে ঘরে ছিলেন তার পাশের ঘরে ঐ সেন্টারের অল্প বয়সী সন্ন্যাসীরা খুব হৈহুল্লোড় করছিল। তখন প্রভু মহারাজের একজন সেবক পাশের ঘরে গিয়ে ধমক দিয়ে হৈ হুল্লোড় বন্ধ করতে বলেছেন – পাশের ঘরে প্রভু মহারাজ রয়েছেন আর তোমরা এত চেঁচামেচি করছ! তখন এরা সবাই চুপ করে গেছে। হঠাৎ সব চারিদিক নিঃস্তব্দ হয়ে গেছে, সব চুপচাপ, প্রভু মহারাজ বুঝতে পেরেছেন। তিনি তাঁর সেবককে ডেকে পাঠালেন। সেবক এসে প্রভু মহারাজের সামনে দাঁড়িয়েছেন। সেবককে জিজ্ঞেস করছেন – পাশের ঘরে চেঁচামেচি হৈ হুল্লোড় হচ্ছিল হঠাৎ কেন বন্ধ হয়ে গেল? সেবক বললেন – মহারাজ আপনি এখানে বিশ্রাম করছেন তো তাই বারণ করে দেওয়া হয়েছে। তখন প্রভু মহারাজ বলছেন – তোমাকে কি আমি বলেছি আমার অসুবিধা হচ্ছে ওদের হৈ হুল্লোড় করতে বারণ করে এসো? তুমি কেন বারণ করতে গেলে? ওদের বলে এস, ওরা যে রকম করছিল সেই রকমই করতে।

কারণটা হল, অপরে আনন্দ করছে, এখানে আনন্দ মানে ছ্যাবলামো নয়, সে আনন্দে যদি আমার মনেও আনন্দ না হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে আমি অসুর। সাধু আর অসাধুর মধ্যে তফাৎ এটাই। যাঁরা প্রকৃত সাধু তাঁরা অপরের আনন্দে বিরাট আনন্দ করবে। অসুরদের স্বভাব কি রকম? তুমি মরে যাও, গোল্লায় যাও, আমি যেন আনন্দে থাকি। ট্রামে বাসে ট্রেনে যখন ভিড়ের মধ্যে চলাফের করবেন তখন কান

পাতলে একটি কথা প্রায়ই শোনা যাবে – এত লোক কোথা থেকে যে রোজ আসে, কবে যে ভূমিকম্প হয়ে লোকগুলো মরবে তাহলে রাস্তাঘাট গুলো একটু ফাঁকা হয়। তার মানে, যে এই কথা বলছে তার মনে আসুরিক প্রবৃত্তি, অসাধু মনোভাব জেগে উঠেছে। অপরের আনন্দতেই শুধু আনন্দ হবে তাই নয়, অপরের চোখের জল দেখলে যখন নিজের চোখেও জল আসবে, তখন বোঝা যাবে যে তার মধ্যে সাধু প্রবৃত্তি জেগে গেছে। সাধু আর অসাধুর মধ্যে এটাই প্রভেদ – অপরের আনন্দে আনন্দ, অপরের ক্রন্দনে ক্রন্দন।

বাল্মীকি ঋষিও দীর্ঘ দিন তপস্যা করে করে তাঁর মন এত পবিত্র আর এত কোমল হয়ে গেছে যে, যখন দুটি পাখি আনন্দে হিল্লোল কল্লোল করছে সেই দৃশ্য দেখে তাঁর মনটাও ওদের আনন্দে পুরো একাকার হয়ে গেছে। যখন দুটি শিশু নিজেদের মধ্যে আনন্দে খেলা করে, তখন তাদের মা দূর থেকে তাদের সেই খেলা দেখতে দেখতে যেমন নিজের আনন্দে মশগুল হয়ে যায়। সেই সময় এক নিষাদ শিকারের জন্য একটা বাণ মেরেছে, বাণ মারতেই যুগলের একটা পাখি বাণবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পরে মরে যায়। অন্য পাখিটা তখন বিরাট জোরে আর্তনাদ করতে শুরু করেছে – **ভার্যা তু নিহতং দৃষ্টা রুরাব করুণাং গিরাম্**।।১/২/১১ - রক্তাক্ত ক্রৌঞ্চকে ভুতলে নিপতিত দেখে পত্নী ক্রৌঞ্চী করুণ ক্রন্দন করতে লাগল। ক্রৌঞ্চীর করুণ ক্রন্দন শুনে বাল্মীকির মনে এক তীব্র বেদনা অনুভূত হয়েছে। এই রকমই হয়, আমরাও দেখেছি যখন কোন উচ্চ আধারের মহারাজরা যখন কোন খারাপ কিছু দেখে ফেলেন, ওনাদের মনটা এত নরম থাকে যে ওনারা ঐ কষ্টটাকে আর নিতে পারেন না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – *দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ* – দুঃখেও তাঁর কিছু হয় না, সুখেও তিনি নিঃস্পৃহ থাকেন, এই শ্লোকটিকে মাথায় রেখে অনেকে মনে করেন তাহলে এনারা দুঃখে এত কাতর হয়ে যান কেন। কিন্তু আদপেই তা হয় না, ঠিক উল্টোটাই হয়। তাহলে গীতাতে ভগবান কেন এই কথা বলছেন? আসলে স্বাভাবিক অবস্থায় এনাদের মন এত পরিষ্কার থাকে যে, শ্রীশ্রীমা যেমন বলছেন – সাধু যেন একটা ধবধবে সাদা কাপড়, সাদা কাপড়ে সামান্য একটু কালো দাগ যদি লাগে তাহলে দূর থেকে দেখা যাবে। যিনি যোগী, যিনি সাধনা করছেন, তাঁর মনটাও একেবারে পরম পবিত্র হয়ে যায়, ঠিক সাদা কাপড়। একটা স্বচ্ছ গ্লাশে বিশুদ্ধ জল রেখে দিলে যেমন জলটাও স্বচ্ছ দেখাবে। সেই গ্লাশের মধ্যে যদি এক ফোঁটা কালি ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে কালিটা আস্তে আস্তে পুরো গ্লাশটাতে ছড়িয়ে যাবে। যোগীর মন ঠিক এই রকম। যোগশাস্ত্রে উপমা দেওয়া হয় চোখে যদি মাকড়সার জাল একটু লেগে যায় তখন যেমন চোখে জ্বালা করে, স্নান করার সময় চোখে একটু সাবান চলে গেলে চোখ কেমন জ্বালা করে সেই অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের প্রায়ই হয়, সঙ্গে সঙ্গে চোখে জলের ঝাপটা দিতে হয়। যোগীর মন ঠিক ঐ রকম। যোগীর মন এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে, সেই মনে যদি একটু কারুর কিছু দুঃখ চলে যায় যোগী তখন তীব্র বেদনা অনুভব করবে। তখন তাঁর মন কিছুতেই আর সেটাকে সহ্য করতে পারবে না। সেইজন্য কি হয়, তাঁদের মন সব সময় করুণায় পরিপূর্ণ থাকে।

ঠাকুর বর্ষাকালে কামারপুকুরে হালদার পুকুরের দিক থেকে ঘরে ফিরছেন। বৃষ্টিতে হালদার পুকুর ভেসে গেছে, পুকুর থেকে মাছ গুলো উঠে এসেছে। একটা মাগুর মাছ ঠাকুরের পায়ে পায়ে চলছে। ঠাকুর মাগুর মাছটাকে বলছেন – যা যা, এখুনি হৃদু দেখলে তোকে ধরে কেটে ঝোল রেঁধে খেয়ে ফেলবে। ঠাকুরের মনটা তখন এত নরম আর সূক্ষ্ম হয়ে রয়েছে যে একটা মাছের প্রতিও তাঁর সেই করুণা উথলে উঠছে। কিন্তু মনটা ঐ রকম সব সময় থাকে না। যখন তিনি জগতের মধ্যে মনটাকে নামিয়ে এনে সবার সাথে মিশছেন তখন মনটা অন্য রকম হয়ে যাবে। তিনি যখন চাইবেন আমি নির্বিকার থাকব তখন তিনি সেই ভাব অবলম্বন করে নির্বিকার চিত্ত হয়ে যাবেন। এই ধরণের করুণায় আপ্লুত হওয়ার জন্য তাঁকে প্রস্তুতির সময় দিতে হবে, কিন্তু যদি তাঁর প্রস্তুতি না থাকে তাহলে কিন্তু এক রকম হবে। এমনিতে সাধারণ অবস্থায় তাঁর মন এমন করুণায় পূর্ণ হয়ে থাকবে সেই অবস্থায় হঠাৎ কিছু একটা দেখলেই তিনি আঁতকে উঠবেন, তখন তিনি কিছুতেই ঐ অবস্থাটাকে সামাল দিতে পারবেন না। কিন্তু যখন প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন, ঢাল তরোয়াল তুলে নিলেন, তখন কোন সুখ দুঃখই তাঁকে আর বিচলিত করতে পারবে না।

বাল্মীকিও পাখির ঐ করুণ আর্তনাদের সাথে এক হয়ে গেলেন। বেদনায় তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন – **<u>মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্</u>**।। ১/২/১৫। এটাই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম কবিতা। বাল্মীকি অভিশাপ দিচ্ছেন এই দু-জন মিলে একে অপরকে প্রচণ্ড ভালোবাসছিল, তোমার হৃদয় এত ক্রূঢ় যে তুমি তাদের একজনকে শেষ করে দিলে, এরজন্য তুমি চিরন্তন কালের জন্য নরকে যাও, তুমি আর কোন দিন যেন শান্তি না পাও।

এখন যদি বলা হয় নিষাদ কি অন্যায় করেছে, কারণ এটাই তো তার জীবিকা। মেনকা গান্ধী ফতোয়া দিয়ে দিলেন কোন পশুপাখি ধরা যাবে না। এখন পাখি ধরা যাদের জীবিকা তারা গাড়োয়ালের ঐদিকে ডিএম অফিসের সামনে ভুখ হরতাল করে অবস্থান করে বিক্ষোভ শুরু করে দিল। তারা বলছে 'আমাদের বাপ-ঠাকুর্দা এই কাজই করে এসেছে, আমাদের জীবিকাই হল পাখি ধরা, আর আপনারা এক ফতোয় জারি করে পাখি ধরা বন্ধ করে দিলেন, এখন আমাদের পেট চলবে কি করে, আমরা অন্য কিছু কাজ করাও শিখিনি'। এগুলোই হয়ে যায় বিরাট সমস্যা, আমাদের যে চিন্তন আর তাদের যে চিন্তন এই দুই চিন্তনের মধ্যে বিরাট তফাৎ এসে যায়। যখনই দুটো চিন্তনের তফাৎ হয় তখনই সমস্যার উদ্ভব হয় আর মারামারি শুরু হয়। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার ঘোষণা করে দিল যত বন জঙ্গল আছে সব সরকারের সম্পত্তি। এখন যারা গাছ কেটে, গাছের পাতা বেচে জীবন চালায়, পাখি ধরা যাদের রুজিরোজগার তারা এখন কোথায় যাবে! কিছু করার নেই, দেশ, সমাজ এভাবেই চলে। সমাজিক শক্তি, অর্থনৈতিক শক্তি, আইনীশক্তি এক অপরের সঙ্গে বিবাদ বিতণ্ডা লেগেই থাকে। সমাজে এত কিছু ঝামেলা, খুন খারাপি লেগে আছে এই কারণেই। একদিকে কিছু লোক বলছে মাওবাদীরা কেন এত অত্যাচার করছে। অন্য দিকে মাওবাদীরা আবার আদিবাসীদের মধ্যে মজবুত সংগঠন করে ফেলেছে। কেন করতে পেরেছে? কারণ বড় বড় কোম্পানি আর সরকার মিলে এদের এত দিন শোষণ করে এসেছে। আবার ওদের শোষণ না করলে ঘরে ঘরে বিদ্যুত আসবে না, বিদ্যুত না এলে পাখা ঘুরবে না, বাতি জ্বলবে না, এসি চলবে না, গাড়ি চলবে না। তখন আমরা বলব সরকার আমাদের জন্য কিছুই করছে না। এখন সরকারই বা যাবে কোন দিকে! হয় তাকে গরীবদের মেরে বড়লোকদের বাঁচাতে হবে নয়তো বড়লোকদের মেরে গরীবদের বাঁচাতে হবে। দুটোকে এক সঙ্গে বাঁচান যাবে না। কারণ কেউ তো জনসংখ্যা কমানর ব্যাপারে চিন্তাই করছে না। আবার চীনে যখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে ফতোয়া দিয়ে দিল একটা পরিবারের একটা বাচ্চা, তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘও আরেক পাল্টা ফতোয়া দিয়ে দিল এই ধরণের জন্ম নিয়ন্ত্রণে মানবিক অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, সে বাচ্চা চাইছে কেন সে বাচ্চার জন্ম দিতে পারবে না। মানুষ যাবেটা কোথায়? বাচ্চা করলে মুশকিল আবার বাচ্চা না করলেও মুশকিল। জঙ্গল যদি কাটেন তাহলেও মুশকিল আবার জঙ্গল না কাটেন তাহলেও মুশকিল। এখন মানুষ যাবে কোথায়? কিছুই করার নেই। এই করেই চলেছে এই করেই চলবে। অফিস যাত্রীরা ট্রেনের ভীড়ে যেমন গুঁতোগুতি করে চলে, সমাজেও এভাবেই গুঁতোগুতি করে চলতে হবে। আমাদের জীবন হচ্ছে লোকাল ট্রেনে চলার মত, একজন এদিক দিয়ে ধাক্কা মারবে, আরেকজন অন্য দিক দিয়ে গুঁতো মারবে, একজন ছিটকে পড়ে যাবে, আবার ওর মধ্যেই নিজেকে কোন ভাবে জায়গা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মাওবাদীদের দিয়েও সমস্যার সমাধান হবে না, আবার গণতন্ত্র দিয়েও এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

জগত এভাবে চলছে আর এভাবেই চলবে। কি রকম? যেমন নিষাদের জীবিকা শিকার করা আবার বাল্মীকির অভিশাপ। বাল্মীকি তো অভিশাপ দিয়ে দিলেন, এখন নিষাদ কি করে জীবিকা উপার্জন করবে আর পেটের অন্ন, শরীরের বস্ত্র জোগাড় করবেই বা কিভাবে! নিষাদ না হয় পাখিটা মেরেছে, কিন্তু ওর বাচ্চাটা কি দোষ করল, বাচ্চাটা এখন কি অনাহারে মরে যাবে? যদিও নিষাদ পাখিটাকে মেরেছিল বলেই আজকে আমরা এত উচ্চমানের কবিতা পেয়েছি, আর পাখিটাকে না মারলে রামায়ণও সৃষ্টি হত না, আর আমরাও শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুযোগ পেতাম না। পাখিটাকে মেরে নিষাদ ভালই করেছিল কিন্তু মাঝখান

থেকে সে পেয়ে গেল অভিশাপ – চিরদিনের জন্য তুমি নরক বাস করবে আর যুগে যুগে যেন তুমি শান্তি না পাও। এটাই জীবন। একটা কর্মের জন্য একজনের জীবন হয়ে গেল অভিশপ্ত আর সারা বিশ্বের অধ্যাত্ম পিপাসু পেয়ে গেলে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন কথা আর কাব্য রসিকরা পেয়ে গেলেন রামায়ণের মত মহাকাব্য। এটাই বিচিত্র সংসার চক্র। এই ভাবেই লীলা চলতে থাকে আর জগৎ কালের গতিতে এগিয়ে চলে। এটাই হচ্ছে জগতের বাস্তব চিত্র। সেইজন্য কেউ যদি আমাকে অভিশাপ দেয় তারও কোন দাম নেই কেউ যদি আমার প্রশংসা করে তারও কোন দাম নেই।

যাই হোক, আমরা এখন রামায়ণের আলোচনাতেই ফিরে আসি। বাল্মীকি *মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ* এই কটি শব্দ উচ্চারণ করে নিজের মনেই চমকে উঠলেন। বাল্মীকি ছিলেন তখনকার দিনের বিরাট বড় পণ্ডিত, বেদের জ্ঞাতা ছিলেন, কারণ তিনি একাধারে তপস্যা আর স্বাধ্যায় সমান ভাবে করে গেছেন। এই বাক্যটা বলার পরই তিনি হিসেব করে দেখলেন যে এই বাক্যটা একটা নতুন ছন্দে বাঁধা। আমাদের জেনে রাখা উচিৎ বাল্মীকির এই কবিতাটি অনুষ্টুপ ছন্দে ছন্দোবদ্ধ করা হয়েছে। অনুষ্টুপ ছন্দের নিয়ম হল প্রত্যেক শ্লোকে দুটো করে লাইন থাকবে, যেমন এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে বলছেন – **যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।** অনুষ্টুপ ছন্দ চারটে ভাগে বিভক্ত, মানে চারটে চরণ আর প্রত্যেক ভাগে আটটা করে অক্ষর থাকবে, একটি শ্লোকে মোট বত্রিশটি করে অক্ষর থাকবে। যেখানে যুক্তাক্ষর থাকে সেটাকে এক ধরা হয়।

বত্রিশ অক্ষর সমণ্বিত একটা শ্লোক বলে দেওয়ার পর বাল্মীকি বলছেন – **পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্ততন্ত্রীলয় সমন্বিতঃ। শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা।।**১/২/১৮। এতে যে শুধু আটটা আটটা করে অক্ষর আছে তাই নয়, এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ধরণের কবিতার ছন্দকে বীণা ও বাদ্য সহকারে গান করা যেতে পারে। অর্থাৎ এইটি গেয়যুক্ত, এই কবিতাকে শুধু যে পাঠ বা আবৃত্তিই করা যাবে তা নয়, সুর লাগিয়ে খুব সহজে গানও করা যেতে পারে। বাল্মীকি রামায়ণের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রতিটি শ্লোক যেমন আবৃত্তি করা যায় তেমনি খুব সচ্ছন্দে গানও করা যায়, রামায়ণের শেষের দিকেও আমরা পাই লব কুশ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের রাজদরবারে এসে গান করছেন।

বাল্মীকি বলছেন আমার মুখ দিয়ে যে বাক্যটা শব্দ হয়ে বেরিয়ে এল, এটি কোন সাধারণ বাক্য নয়, প্রথম হল এটি একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা। মানুষ যখন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে তখন সে কখন পদ্যে কথা বলে না, কথা বলা হয় গদ্যে। কিন্তু বাল্মীকির মুখ থেকে এই কথাটা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে শ্লোক রূপে বেরিয়ে এসেছে। আবার একে গানও করা যাবে। এখানে যেটা মজার ব্যাপার তা হল, আমাদের ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মূল্যের উৎসটা কোথায় তা এখানে বোঝা যায়। বেদের সময় বেদের ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি পেতেন, সেই তত্ত্বগুলিকে নিজেদের শিষ্যদের বলতেন, শিষ্যরা সেগুলো মুখস্ত করত, পরে সেটাই হয়ে গেল বেদ। কিন্তু এখানে বাল্মীকির ভেতর থেকে হঠাৎ একটা কথা বেরিয়ে এল, যার উপাদান আসছে বেদের থেকে, অথচ সাধারণ লোকের যেটা খুব বেশি পছন্দের, মানে গান গাওয়াও যাচ্ছে। এটা যে সামগানের মত অত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তাও নয়। কিন্তু রামায়ণের যুগে সমাজে সাংস্কৃতিক কৃষ্টি অনেক উন্নত হয়ে গেছে। আমরা একটু পরেই দেখতে পাব ভরত যখন মামার বাড়িতে ছিল সেখানে সে নাটক, প্রহসনাদিতে অংশ গ্রহণ করছে বা দর্শক হয়ে সেখানে হাজির আছে। এই গান, বাজনা, নাটক এগুলো তখন সমাজে ভালো মতই এসে গিয়েছিল। একদিকে বাল্মীকি হলেন খুব উচ্চ ঋষি, তাঁর মুখ থেকে যে কথা বেরোচ্ছে সেটা প্রচণ্ড আবেগমথিত ও ছন্দোবদ্ধ বাক্য, অথচ অন্য দিকে সাধারণ লোকেরা যেভাবে গান করে সেই ভাবে গান করা যাচ্ছে – সেইজন্য বললেন এটা *যশস্করং*, বাল্মীকি এটাকে শ্লোক বললেন। শ্লোক একটা ছন্দের নাম, আবার এর যশ হবে, যশস্বরূপং।

এই ভাবতে ভাবতে তিনি আশ্রমে ফিরে এসেছেন, কিন্তু তাঁর মনটা তারপর থেকে *মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ* এই শ্লোকটাতেই ঘুরছে। হঠাৎ এটি কি ভাবে এলো, কেন এল? তিনি যে

ক্রৌঞ্চ যুগলের আনন্দ আর তাদের একটিকে বাণে বিদ্ধ করা আর নিষাদকে অভিশাপ দেওয়া এগুলো থেকে তাঁর মন এখন সরে এসে পুরোপুরি একাগ্র হয়ে গেছে এই নতুন যে সৃষ্টিটা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল তার উপর। তখন বলছেন – **আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ। চতুর্মুখো মহাতেজা দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্।**।১/২/২৩। তখন জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা তিনি নিজে এসে বাল্মীকির আশ্রমে হাজির হয়ে গেলেন। এখানে আমরা যে শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি তা নয়, কি ভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশ হয়েছে সেটাকে জানাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যদিও এখানে বলছে লোককর্তা ব্রহ্মা, কিন্তু এখানে ব্রহ্মাকে লোককর্তা বলাটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না। বেদের ঠিক পরেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। বাল্মীকির সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ধারণা তখনও আসেনি। কিন্তু আমরা প্রথম থেকে বলছি যে বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম চারটি সর্গ বাল্মীকির শিষ্যদের দ্বারা রচিত। শিষ্যরা অনেক পরে লিখেছিলেন, সেইজন্য ব্রহ্মার নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্মীকির সময়ে ব্রহ্মার ধারণা তখন আসেনি। আরেকটি ব্যাপার খুবই উল্লেখযোগ্য যে, এখানে দেখান হচ্ছে যেন দেবতারা তখনও শরীর ধারণ করে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। রামায়ণ যুগের থেকে যদি আমরা একটু পেছনের দিকে যাই তাহলে দেখতে পাই যে দেবতারা যেন মানুষের মত শরীর ধারণ করে মানুষের সঙ্গে কথা বলত। যাই হোক, ব্রহ্মা এসেছেন। বাল্মীকি সব কথা তাঁকে নিবেদন করলেন। ব্রহ্মা সব শুনে হাসলেন, কারণ তিনি তো সর্বজ্ঞ, সব কিছুই জানতেন।

ব্রহ্মা তখন বাল্মীকিকে বলছেন – **শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্যা বিচারণা। মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মান্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী।**।১/২/৩১। এটি একটি শ্লোক যা কিনা ছন্দোবদ্ধ কথায় তোমার মুখ থেকে বেরিয়েছে, ধুমধারাক্কা কিছু বেরোয়নি। আর আমার প্রেরণাতেই এই শ্লোক তোমার মুখ থেকে বেরিয়েছে। এখানেই বোঝা যায় যে এই সর্গটি পরে বাল্মীকি রামায়ণে সংযোজিত করা হয়েছে। পরের দিকে অন্যরা সংযোজন করেছে বলেই সব কিছু ভগবানের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্মীকির তপস্যা আর স্বাধ্যায়ের ক্ষমতায় যে জিনিষ সৃষ্টি হল, তার পুরো কৃতিত্বটা দিয়ে দেওয়া হল ব্রহ্মাকে। এটাই পৌরাণিক রীতি। এই কথা বলার পর ব্রহ্মা বাল্মীকিকে উপদেশ দিলেন – **রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিত্তম**।১/২/৩২। অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের যে চরিত্রের কথা তুমি কিছু দিন আগে নারদের কাছে শুনেছ, সেই কাহিনীকে তুমি এই ছন্দে আর কাব্যিক শৈলীতে রচনা করতে শুরু কর। আর যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ – **রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ**।।১/২/৩৩ – যা কিছু বাস্তবে হয়েছিল আর যা কিছু রহস্য, অর্থাৎ যা এখনও সামনে প্রকাশিত হয়নি, এই সব কিছুই তুমি জানতে পারবে। কিভাবে জানতে পারবে – তুমি যে এত দিন তপস্যা করেছ সেইজন্য তোমার কাছে কোন কিছুই গুপ্ত থাকবে না। কি ব্যাপারে রহস্য থাকবে না? রাম, লক্ষ্মণ, সীতা আর রাক্ষস, অসুর এদের কোন ব্যাপারে তোমার কিছু গুপ্ত থাকবে না। তুমি যখনই লিখতে শুরু করবে, আর যা কিছুই তুমি লিখতে আরম্ভ করবে, যে মুহুর্তে তুমি কারুর উপরে ধ্যান করবে, যেমন রাবণ কিংবা মন্দোদরি, এখন মন্দোদরির শরীরটা কেমন ছিল, ধ্যান করলেই তোমার কাছে স্বয়ং প্রকাশ হয়ে যাবে, তখন তুমি ঐটা রচনা করতে পারবে। ঠিক এই ধরণের ব্যাপার মহাভারতেও পাই, ব্যাসদেব সঞ্জয়কে ঠিক এই বরদান দিয়েছিলেন যে তুমি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সব কিছুই জানতে পারবে, প্রকাশ্যে আর গুপ্ত ভাবে যা কিছু হবে সবই তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে। এখানেও ঠিক ঐ একই বর ব্রহ্মা দিচ্ছেন বাল্মীকিকে। এখানে যা কিছু হওয়ার হয়ে গেছে সেটা বাল্মীকি জানতে পারছেন, আর সঞ্জয়কে ব্যাসদেব বর দিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে যা কিছু হবে সব তুমি জানতে পারবে। যুদ্ধভূমির বাইরে কি হচ্ছে সেটা কিন্তু সঞ্জয় দেখতে পাচ্ছে না। বাল্মীকির ক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু হয়েছে সব বাল্মীকি জানতে পারবেন।

যখনই রামায়ণ লেখা হয় তখন এই শ্লোকের শেষটা উল্লেখ করা হয় – **যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে**।১/২/৩৬। যেমন এক সময় একটা স্লোগান দেওয়া হত – যব তক্ সূরয চাঁদ রহেগা ইন্দিরা তেরা নাম রহেগা, এখানে ঠিক ঐ রকমই বলা হচ্ছে যত দিন এই পৃথিবীতে নদী থাকবে, পাহাড়

থাকবে, মানুষ থাকবে – **তাবদ্ রামায়ণীকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।** ১/২/৩৭– তত দিন তুমি যে এই রামায়ণ কথা লিখবে তার প্রচার প্রসার চলতেই থাকবে, এর প্রচার কোন দিন বন্ধ হবে না।

ব্রহ্মার বর পাওয়ার পর বাল্মীকি নেমে পড়লেন রামায়ণ রচনাতে। বাল্মীকি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ, সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর তো আর কিছুই করার নেই, এখন তিনি এই সৃজনশীল রচনা কার্যে পুরোপুরি মনোনিবেশ করলেন। পূর্বদিকে মুখ করে কুশাসনে কৃতাঞ্জলি হয়ে উপবেশন করে বাল্মীকি ধ্যানের গভীরে একটা সমাধি অবস্থায় চলে গেলেন। মনটা যখন এইভাবে গভীরে চলে গেল, তখন সেই অবস্থায় রামায়ণ রচনা করতে থাকলেন। বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের কিছুই জানতেন না, কিন্তু যখনই ধ্যানের গভীরে চলে যেতেন তখনই তাঁর কাছে সব স্পষ্ট হয়ে যেত।

চব্বিশ হাজার শ্লোক আর পাঁচশ সর্গ মানে অধ্যায় নিয়ে সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণ রচিত হয়েছে। পুরো রামায়ণে সাতটি কাণ্ড। কিন্তু এখানে একটু সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ উত্তরকাণ্ড বাল্মীকি রচনা করেননি। বিশিষ্ট পণ্ডিতরা বলেন বাল্মীকি ছয়টি কাণ্ড রচনা করেছিলেন, পরের দিকে বাল্মীকি রামায়ণকে আধার করে যত রামায়ণ লেখা হয়েছে সেখানে সবাই সাতটি কাণ্ড রচনা করেছিলেন।

তারপরে বলছেন এই মহাকাব্যকে পড়া যায়, গানও করা যায়। এই মহাকাব্য মধুরতায় দ্রুত, মধ্য আর বিলম্বিত এই তিনটি লয়ে চলার ছন্দ আছে। এই মহাকাব্যে সাত সুর আছে। আর শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, বীর এই ছয় প্রকার রস এই মহাকাব্যে আছে। পরের দিকে ভারতীয় সাহিত্যের পরম্পরাতে প্রশ্ন উঠেছিল কবিতা কাকে বলা যেতে পারে, একটা কবিতার কি কি বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকতে হবে, তখন কবিতার যে সংজ্ঞা নিরুপণ করা হয় সেটা এই বাল্মীকি রামায়ণকে ভিত্তি করেই করা হয়েছিল। বাল্মীকি যে শৈলীতে রামায়ণ রচনা করেছিলেন, পরের দিকে যত কাব্য গ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল সবই এই শৈলীতে রচনা করা হয়েছে। কাব্যরস বলতে আমরা এখনও যা বুঝি, বাল্মীকি যে কয়টি কাব্যরস দিয়ে গেছেন ঠিক ঐ কটি কাব্যরসই এখনও কাব্য সাহিত্যে ব্যবহার হয়ে চলেছে। এসবের জন্যই বাল্মীকি রামায়ণকে আদিকাব্য বলা হয়ে থাকে। তার আগে পর্যন্ত যেটা ছিল সেটা বেদ, আর বাকি যা ছিল সব স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী আর ছড়া।

বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করছেন তখন তাঁর আশ্রমে লব আর কুশ বাস করছে। এখানে একটা কথা বলছেন মার্গ-বিধানসম্পদা। মার্গ-বিধান এই শব্দ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তখনকার দিনে দুই ভাবে কোন কিছু উপস্থাপন করা হত, একটা ছিল দেশীয় প্রথায় আরেকটা ছিল মার্গ। দেশী হচ্ছে যেটা স্থানীয় ভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় উপস্থাপন করা হত, আর মার্গ হচ্ছে যেটা আমাদের জাতীয় ভাষায় উপস্থাপন করা হত, সংস্কৃতে যে কথা বলা হত সেটাই ছিল তখন জাতীয় ভাষা। লব ও কুশ যে গান গুলো পরিবেশন করত সেটা ছিল মার্গ দেশীয়। সংস্কৃত ভাষায় এই প্রথম গান-বাজনা করা হল। এখন যে আমাদের দ্বিভাষী তত্ত্ব ইংরাজী আর স্থানীয় ভাষাকে বোঝায়, তখন ছিল প্রাকৃত আর সংস্কৃত ভাষা। যারা সংস্কৃতবান মানুষ ছিলেন তারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন, তাও মুষ্টিমেয় কয়েকজন। কিন্তু বাড়িতে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাতে সব সময় প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করা হত। দ্বিভাষী তত্ত্ব ভারতে চিরদিনই ছিল।

রামায়ণের ভূমিকা এখানেই শেষ হয়ে যায়। এরপর মূল কাহিনীতে আমরা প্রবেশ করব। মহাভারতে সঞ্জয় যেমন ধৃতরাষ্ট্রকে বর্ণন করছেন এখানে লব ও কুশ শ্রীরামচন্দ্রকে বর্ণনা করে যাচ্ছেন গানের মাধ্যমে।

এবারে লব-কুশ রামায়ণ কথা শুরু করছেন। প্রথমে রাজা দশরথ কিভাবে তাঁর রাজ্য ও প্রজাবর্গকে শাসন করতেন তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। আমরা আগেই বলেছি বাল্মীকি রামায়ণের চব্বিশ হাজার শ্লোক রয়েছে। এই স্বল্প পরিসরে পুরো চব্বিশ হাজার শ্লোককে আলোচনা করা কখনই সম্ভব নয়। আমরা মূল

কয়েকটি বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ইতিহাসে বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকাকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

কাব্য সাহিত্যের নিরিখে বাল্মীকি রামায়ণ খুব উচ্চমানের কাব্যগ্রন্থ, মহাভারত, পুরাণ এর ধারে কাছে দাঁড়াতে পারবে না। কবি হিসাবে বাল্মীকি একজন প্রকৃত কবি, তাঁর সাথে কালিদাসের কিছুটা তুলনা করা যেতে পারে, ব্যাসদেবকে সেই অর্থে আমরা খুব বড় কবি বলতে পারিনা, কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যিকারের দার্শনিক। দার্শনিক আর কবির মধ্যে বিরাট পার্থক্য। অবশ্য যিনি দার্শনিক তিনিও কবি হতে পারেন, আবার যিনি কবি তিনিও দার্শনিক হতে পারেন, আবার যিনি প্রেমিক তিনিও কবি হতে পারেন, কবি অনেকেই হতে পারেন, কিন্তু সবাই দার্শনিক হতে পারেন না। ব্যাসদেবকে ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলা যেতে পারে, তিনি তাঁর দর্শনের তত্ত্বগুলিকে কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু বাল্মীকি ছিলেন স্বাভাবিক কবি, কবিতার যত রকমে সম্পদ হতে পারে, বাল্মীকি তাঁর লেখনিতে কবিতার সব কটি সম্পদকেই উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করে কাব্যে প্রয়োগ করে গেছেন। পদ্যে যত রকমের অলঙ্কার, যত রকমের ছন্দ হতে পারে সব কিছুকেই তিনি তাঁর কবি প্রতিভার দ্বারা প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে আমরা কয়েকটি শ্লোককে তুলে ধরে দেখার চেষ্টা করব কি ভাবে তিনি তাঁর কবিত্ব প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে কত নিখুঁত ভাবে একটা জিনিষকে সহজ সরল ভাবে বর্ণনা করছেন। যেমন এখানে বর্ণনা করছেন রাজা দশরথের শাসনের সময় তৎকালীন অযোধ্যার প্রজাদের অবস্থা কেমন ছিল।

নাকুণ্ডলী নামুকুটি নাস্রগ্বী নাল্পভোগবান্। নামৃষ্টো ন নলিপ্তাঙ্গো নাসুগন্ধশ্চ বিদ্যতে।।১/৬/১০। *নাকুণ্ডলী*, রাজা দশরথের রাজ্যে এমন কোন লোক ছিল না যার কানে কুণ্ডল ছিল না, কানে কুণ্ডল তখনকার দিনের ঐশ্বর্যের চিহ্ন। *নামুকুটি*, এমন কোন লোক ছিল না যিনি মাথায় মুকুট পরিধান করতেন না, *নাস্রগ্বী*, এমন কেউ ছিল না যাঁর গলায় হার ছিল না, *নাল্পভোগবান্* সবাই যথেষ্ট সুখসম্পদ ভোগ করতেন। *নামৃষ্টো*, তাঁদের দেহ ছিল মার্জিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। *নলিপ্তাঙ্গো*, আগেকার দিনে এখনকার মতো বিভিন্ন বডিস্প্রে ব্যবহারের প্রচলন ছিল না, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেক দিন স্নানাদি করার পর শরীরে চন্দন লেপন করতেন, সেই থেকে চন্দন আমাদের প্রাচীন পরম্পরার পারফিউম, আর *নাসুগন্ধশ্চ*, চন্দন ছাড়াও অন্যান্য যেসব সুগন্ধ দ্রব্যের ব্যবহার হত, যেমন আতর, অগুরু ইত্যাদি সবাই ব্যবহার করতেন।

তারপরে বলছেন **নামৃষ্টোভোজী নাদাতা নাপ্যঙ্গদনিষ্কধৃক্। নাহস্তাভরণো বাপি দৃশ্যতে নাপ্যনাত্মবান্।।১/৬/১১।** *নামৃষ্টোভোজী*, অপবিত্র অন্ন ভক্ষণ করতেন এই রকম কেউই ছিল না। *নাদাতা*, দান করেন না এমন কোন লোক ছিল না, মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখেনা এই রকম লোক কখনই দেখা যেত না, সবারই বাহুতে অঙ্গদ ও বাজুবন্ধ লাগান থাকত। তারপরে আরেক জায়গায় বলছেন – **নাস্তিকো নানৃতো বাপি চ কশ্চিদবহুশ্রুতঃ। নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে ক্বচিৎ।।১/৬/১৪।** দশরথের শাসন কালে অযোধ্যাতে এমন একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, যিনি নাস্তিক, মানে ভগবানে বিশ্বাস করে না এমন কোন লোক ছিল না। এখানে পরিষ্কার যে বাল্মীকি যখন এই রামায়ণ রচনা করছেন তখনই নাস্তিকের ধারণা এসে গিয়েছিল। এখনও আমরা বেদের যুগেই বাস করছি, বাল্মীকি সবে এসেছেন। তিনি কি বলছেন? অযোধ্যা রাজ্যে কেউ নাস্তিক ছিল না। তার মানে অন্য রাজ্যে নাস্তিক ছিল, অর্থাৎ নাস্তিকের ধারণা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে, নাস্তিক শব্দ নতুন কিছু নয়। এখনও মানুষ বলে নাস্তিকে দেশ ছেয়ে গেছে, কিন্তু নাস্তিকের সমস্যা শুধু এ যুগের নয়। সমাজ কখনই পাল্টায় না, ধনী আর গরীবের লড়াই, ধর্ম আর অধর্মের লড়াই, আস্তিক আর নাস্তিকের লড়াই চিরদিন চলছে, এগুলো আজকের দিনে নতুন কিছুই নয়, সব এভাবেই ছিল, এভাবেই চলে আসছে। সেটাই বাল্মীকি বলছেন। *নানৃতো*, ব্রাহ্মণদের মধ্যে অসত্যবাদী কেউ ছিল না। অনেক শাস্ত্রের জ্ঞান নেই এই রকম কোন ব্রাহ্মণও ছিলেন না। *নাসূয়কো*, অপরের ছিদ্রান্বেষী, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় এই রকম কোন লোক ছিল না, বিদ্যাহীন, দুর্বল কেউই ছিলেন না।

মানুষের কি কি গুণ থাকলে একজন মানুষ সত্যিকারের মানুষ বলে সমাজে গণ্য হতে পারে সেই গুণগুলিকেই বাল্মীকি তুলে ধরেছেন।

কশ্চিন্নরো বা নারী নাশ্রীমান্নাপ্যকরূপবান্।। ১/৬/১৬। অযোধ্যায় এমন কোন পুরুষ বা নারী ছিল না, যে শ্রীহীন, রূপ বিহীন এবং রাজভক্তিহীন। একজন মানুষের রূপ থাকতে পারে কিন্তু শ্রী নাও থাকতে পারে, আবার একজনের রূপ নেই, দেখতে সুন্দর নয় কিন্তু তার শ্রী আছে। একটা খুব সুন্দর বিখ্যাত কথা আছে – Success brings glamour যার জীবনে যখন সফলতা আসে তার চেহারাতে গ্লাম্যার এসে যায়। যিনি এই কথাটি লিখেছিলেন তিনি বলছেন যে, অমিতাভ বচ্চন যখন চলচ্চিত্র জগতে এসেছিলেন তখন তাঁর গ্লাম্যার ছিল না, কিন্তু পরের দিকে একের পর এক তাঁর ছবি গুলো হিট্ করতে থাকল তখন তাঁর পুরো চেহারাটাই পাল্টে গেল। গ্ল্যামার শ্রী শব্দের উপযুক্ত অনুবাদ নয়, শ্রী মানে সব সময় চেহারা ঝকঝকে। শ্রী আসে একমাত্র মনের প্রশান্তি ভাব থেকে, সফলতাও এক ধরণের মনের শান্তি। বাল্মীকি বলছেন অযোধ্যার লোকেদের শুধু যে শ্রীই আছে তা নয়, তারা প্রত্যেকই রূপবান। আজকাল রাস্থাঘাটে চলতে ফিরতে যেসব মুখ গুলো সামনে আসে এদের বেশির ভাগেরই রূপ নেই, যদিও রূপ থাকে শ্রী নেই। শ্রী সবার আসবে না, শ্রীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে, দুটো জিনিষ এক সঙ্গে হওয়া খুব মুশকিল। শৈশবে আর কৈশোরে কিছুটা শ্রী যদিও দেখা যায় কিন্তু কুড়ি পেরোতে না পেরোতেই সব উড়ে যায়। বাল্মীকি এটাই এখানে বলছেন, সেই সময় অযোধ্যায় নারী বা পুরুষ এমন কেউ ছিল না যার রূপ ছিল না, শ্রী ছিল না আর তার সাথে সাথে তার রাজভক্তি ছিল না। এখানে রাজা দশরথেরও প্রশংসা করা হয়ে যাচ্ছে, রাজা এতই ভালো ছিলেন যে তাঁকে সব প্রজাই ভক্তি করত।

বাল্মীকি রামায়ণের প্রত্যেকটি সর্গ এত গভীর আর চিন্তাস্পর্শী যে যে অংশটা পড়তে থাকব সেই অংশেই আটকে যাব পরের অংশে আর এগোতে পারা যাবে না। কিন্তু আমাদের তো এগিয়ে যেতে হবে। এরপর বাল্মীকি রাজা দশরথের রাজসভাতে রাজমন্ত্রীদের কি কি গুণ ছিল তার বর্ণনা দিচ্ছেন। বাল্মীকি এখানে মন্ত্রীদের যে গুণের বর্ণনা দিচ্ছেন, পরবর্তি কালে মহাভারতে রাজধর্মের বর্ণনা করার সময় ব্যাসদেব এই গুণগুলোকেই উল্লেখ করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণের যদি চারটে অধ্যায়কে পড়ার পর হঠাৎ যদি তার সাথে মহাভারতের চারটে অধ্যায়কে নিয়ে পড়তে থাকেন তখন বোঝা মুশকিল হবে কোনটা পড়ছি, মহাভারত না রামায়ণ।

মহাভারতের থেকে বাল্মীকি রামায়ণ হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল। তাই বাল্মীকিই হলেন প্রথম যিনি এই ভাব ও ধারণাগুলিকে কাব্যের মধ্যে প্রয়োগ করেছিলেন। রাজার কি কি গুণ, রাজমন্ত্রীদের কি কি গুণ হবে, প্রজাদের কি কি গুণ থাকবে, রাজার নীতি কি রকম হবে এগুলোকে বাল্মীকিই প্রথম তুলে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর অমর কাব্যকথার মাধ্যমে। যেমন নীতির কথা বলতে গিয়ে বলছেন রাজার যে চর হবে তারা কেমন হবে আর কি করবে। চরেরা নিজেদের রাজ্য আর শত্রু রাজ্যের উপর পুরো নজর রাখত। রাজাকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে প্রজাদের কীভাবে ধর্মের উপরে আস্থা রাখা হবে আর অধর্ম থেকে কীভাবে দূরে রাখা হবে, এগুলোকে বাল্মীকি খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাল্মীকি যেখানে কয়েকটি শ্লোকে বলে দিচ্ছেন, সেটাই মহাভারতে এসে আরও বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে যে বাল্মীকি রামায়ণে এগুলো বীজাকারে সংক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে তা নয়, পুরোটাই পরিষ্কার আর স্পষ্ট ভাবে বলা আছে। যদি সুযোগ হয় তাহলে প্রত্যেকেরই জীবনে অন্তত একবার বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ করা উচিত, তা নাহলে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঠিক মূল্যায়ন করা যাবে না।

একটা প্রচলিত ধারণা যে, দুনিয়াতে প্রথম যে কাজটা হয় সেটাই সব থেকে কঠিণ কাজ হয়, তারপরে আস্তে আস্তে সেই কাজটাই এক সময়ে দাঁড়িয়ে যায়। বাল্মীকিকে দিয়ে বিচার করলে এসব কথার কোন মূল্য পাওয়া যায় না, বাল্মীকি একাই যা কাজ করে গেছেন, তাঁকে যে আদিকবি বলা হয় এই কারণেই বলা হয়। বাল্মীকি যে কাজটা করছেন বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে সেটা তিনিই প্রথম করছেন, এই

ধরণের কাজ আগে কেউ কখন করেনি। একটা পুরো নতুন ভাবকে নিয়ে তিনি কাজে নেমেছিলেন, আর এমন এক ধরণের একটা জিনিষকে নিয়ে যে কবিতা লেখা যায়, যাকে পরের দিকে ইতিহাস শাস্ত্র বলা হবে, এ জিনিষ আজ পর্যন্ত কোন কবি বা সাহিত্যিক করে দেখাতে পারেননি, ভবিষ্যতেও কেউ পারবেন কিনা সন্দেহ। বাল্মীকি রামায়ণের আজ চার হাজার বছর হয়ে গেছে কিন্তু এখনও বিশ্বসাহিত্যে একে প্রথম স্থানে রাখা হচ্ছে। কি জিনিষের বর্ণনা করা হবে আর কিভাবে বর্ণনা করা হবে এবং তার ভিত্তি কি থাকবে বাল্মীকি রামায়ণের সবটাই হচ্ছে একেবারে নিখুঁত। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন হচ্ছে এর আধার। কি কি জিনিষ? তৎকালীন সমাজে যা কিছু আছে সবটাকেই নিতে হবে। কিভাবে নিতে হবে? ছন্দোবদ্ধ ভাবে। ভারতে অনেক বড় বড় কবি, সাহিত্যিক হয়েছেন এখনও হচ্ছেন, শুধু ভারতের নয় সারা বিশ্বের একজন বড় সাহিত্যিক নেই যে এই ধরণের একটা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। শুধু প্রতিভা দিয়ে এ জিনিষ সৃষ্টি করা যায় না, কারণ তাঁদের বাল্মীকির মত তপস্যা নেই, ঐ রকম তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধ্যান না হলে ক্ষমতাই হবে না। ঐ সাধনাই কারুর নেই, সেইজন্য রামায়ণের শুরুতেই বলছেন *তপঃ স্বাধ্যায় নিরতং*। একটা মানুষের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে সমাজের যা কিছু আছে, আদর্শ থেকে শুরু করে দর্শনের তত্ত্ব পর্যন্ত চব্বিশ হাজার শ্লোকের মধ্যে একটা সমান ছন্দে নিয়ে যাওয়া যে কোন সাহিত্যিকের পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্য মানুষ যখন দেখেন এই কাজ অমানবীয়, এই স্তরে কোন জিনিষকে তুলে ধরা একটা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে নয়, তখন বলে ব্রহ্মার আশীর্বাদে হয়েছে বা দৈবী শক্তিতেই সম্ভব হয়েছে।

এরপরে রাজা দশরথকে নিয়ে বলছেন, তিনি তিনটি লোকেই খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। উনি কখন জীবনে কোন শত্রু পেলেন না। ওনার বন্ধুর সংখ্যা ছিল বিরাট। কাহিনীটা এভাবেই শুরু হচ্ছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কাহিনী ঘুরে যাবে, কারণ বাল্মীকি কোন ইতিহাসবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন স্বাভাবিক কবি। এখানে দশরথকে পরিচয় করান হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে দশরথের মত ক্ষমতা কারুর ছিল না। কিন্তু যখন শ্রীরামকে আনা হব তখন দশরথ আবার তাঁর ক্ষমতার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। এটাই কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবিতা যখন যাকে ধরবে তখন দেখাবে তাঁর মত আর কেউ নেই। এসব বলে বলে দেখাচ্ছেন রাজা দশরথ কত সুন্দর ভাবে রাজ্য চালাচ্ছেন, বলছেন না যে রাজা দশরথ কত দিন রাজ্য চালালেন, তাঁর কত বয়স ছিল। কিন্তু পরের দিকে কবিরা বলতে শুরু করবেন রাজা দশরথ দশ হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন। বাল্মীকি ওসবের ধারে কাছে যাচ্ছেন না। ইতিহাস আর পুরাণের মধ্যে এটাই মৌলিক পার্থক্য। ইতিহাস সময় ও ভৌগলিক বাস্তবতাকে কখনই লঙ্ঘন করবে না, অন্য দিকে পুরাণে সময়ের বর্ণনার সাথে ভৌগলিক বর্ণনার বাস্তবে মিল খায় না। পৌরাণিক সাহিত্যে যখনই সময়ের ব্যাপার আসবে তখন চৌদ্দ হাজারের নীচে কোন কথাই বলবে না। এখানেও প্রথমের দিকে বলা হয়েছে শ্রীরামচন্দ্র এগার হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন। এগুলি বাল্মীকি লেখেননি, পরের দিকে তাঁর শিষ্যরা লিখে মূল রামায়ণে সংযোজন করে দিয়েছেন।

এক সময় রাজা দশরথের মনে হল আমার তো কোন সন্তান নেই, তাঁর ইচ্ছা হল আমার সন্তান হোক। তখন তিনি তাঁর এই মনোবাসনা রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে জানালেন। বশিষ্ঠদেব রাজা দশরথকে বললেন সন্তান লাভের জন্য যজ্ঞ করা হলে আমরা অঙ্গদেশের বিশিষ্ট মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসব। সুমন্ত্রকে আদেশ করা হল অঙ্গদেশ থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে অত্যন্ত সম্মান দিয়ে অযোধ্যায় নিয়ে আসার জন্য। বর্তমান ভাগলপুরের অঞ্চলকে তখন অঙ্গদেশ বলা হত। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে অঙ্গদেশ ভাগলপুর হওয়ার কথা নয়, পাটনার কাছাকাছি বা পাটনা থেকে আরও পশ্চিমের কোন অঞ্চল হওয়ার কথা। বাল্মীকি বর্ণনা করছেন শিব এক জায়গাতে তপস্যা করছিলেন আর কামদেব এসে বাণ মেরে তাঁকে পীড়িত করার চেষ্টা করেছেন। ভগবান শিব তখন কামদেবকে ভস্ম করে দিলেন। কামদেবের শরীর ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায় তিনি অনঙ্গ হয়ে গেলেন, এই জন্য কামদেবের আরেক নাম অনঙ্গ। অনঙ্গ হয়ে যাওয়ার জন্য ঐ জায়গার নাম হয়ে গেলে অঙ্গদেশ। কিন্তু সেটার অবস্থান বর্ণনা

করছেন আরও পশ্চিম দিকে। কিন্তু মহাভারতে যখন কর্ণ অঙ্গ দেশের রাজা হয়েছেন তখন সেই অঙ্গ দেশের বর্ণনা পাই ভাগলপুরের কাছে কোন অঞ্চলের।

মূল কথা হল, ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি অঙ্গ দেশে থাকতেন, আর ওনার স্ত্রীর নাম ছিল শান্তা। ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী মহাভারতেও আসবে, আর খুব নামকরা কাহিনী। সংক্ষেপে কাহিনী হচ্ছে, ঋষ্যশৃঙ্গের বাবার নাম ছিল বিভণ্ডক, কোন একটা কারণে কিছু একটা গোলমাল হয়ে যায়। ঋষিদের এই ধরণের গোলমাল প্রায়ই লেগে থাকত। ঋষিরা বন জঙ্গলে থেকে তপস্যা করতেন, আর ইন্দ্রের প্রেরণায় অপ্সরা, গন্ধর্ব, যক্ষের মেয়েরা বনে জঙ্গলে গিয়ে ঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করার অনেক ফন্দি ফিকির করত, কোন কোন ঋষি মেয়েদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেঁসে যেতেন। আমাদের পরম্পরাতে এই ধরণের অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে যে তাঁরা সন্ন্যাস থেকে বিচলিত হয়ে যেতেন তা নয়। ইদানিং কালেও অনেকে এসে প্রায়ই বলে অমুক সন্ন্যাসীর নাম মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, কি দরকার গেরুয়া পড়ার, ছেড়ে দিলেই পারে, বিয়ে করে থাকলেই পারে। এই জিনিষটাই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনা, একজন সন্ন্যাসী সুখভোগ করবে! কত দিনের জন্য? দুদিন চারদিন কি দশ দিনের জন্য, আর এই সামান্য কটি দিনের জন্য এত বড় আদর্শকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেবে! তিনি যখন একটা পথকে অবলম্বন করেছেন, তখন তিনি ভালো করেই জানেন যে আমি এই পথকে ধরে থাকলে একটা বিরাট উঁচু অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারব, সাক্ষাৎ আত্মার উপলব্ধি আমি করতে পারব। এখন মাঝখানে একটা বিপর্যয় এসেছে, সন্ন্যাসীর তো আর এই ইচ্ছে নয় যে আমি একটা মেয়েকে বিয়ে করে ঘর সংসার পাতব, আমার সন্তানাদি হবে। সংসারীরা যখন বিয়ে করে তখন সব সময় সন্তান প্রাপ্তির জন্যই করে। কিন্তু একজন ঋষি বা সন্ন্যাসি যখন কোন মেয়ের পাল্লায় পড়ে তখন সে সন্তান লাভের আশায় পড়ে না। এটা একটা মানসিক অবস্থার বিপর্যয়, এই মানসিক বিপর্যয় যে কোন লোকের জীবনেই আসতে পারে। সাধারণ লোকেরা এই জিনিষটা বুঝতেই পারেনা। কিছু দিন আগে এক সন্ন্যাসীকে নিয়ে কাগজে, টিভিতে এত লেখালেখি, আলোচনা হচ্ছে, সেই সন্ন্যাসী কি কারুর কাছ থেকে সন্তান চাইছে? সে কি মনে মনে চাইছে আমার একটা বাড়ি হবে, আমার সন্তান হবে? কখনই সে চাইছে না। কোন সন্দেহ নেই যে সন্ন্যাস জীবনে এটা একটা বিপর্যয়, আর এটা যে কোন সন্ন্যাসীর জীবনেই আসতে পারে। ভারতীয় পরম্পরাতে ঋষিদের এই বিপর্যয়কে কখনই গুরুত্ব দেওয়া হত না। একটা গোলমাল হল, হয়ে গিয়ে থেমে গেল, আবার সোজা হয়ে চলতে লাগল। আর আমাদের মহাভারত থেকে পুরানাদি যত শাস্ত্র আছে এই ধরণের ঘটনা ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে সেই ঋষি যে একেবারে শেষ হয়ে তলিয়ে যাবেন তাও হবে না। ঋষির যা সম্মান সেই সম্মানই তিনি পেতে থাকবেন, তাঁর সম্মান এতটুকুও কমে যাবে না।

বিভাণ্ডক ঋষিরও এই ধরণের কিছু একটা গোলমাল হয়েছিল। প্রাচীন কাল থেকে আমাদের পরম্পরাতে ঋষিদের পোশাককে অত্যন্ত সম্মান দেওয়া হয়। এই ঋষিবেশকে অত্যন্ত পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ঋষিরা তাঁদের ঋষির পোশাক পরিধান করে কখনই মেয়েদের সাথে জড়াতেন না। তবে ওনারা দরকার পড়লে একটা পশুর রূপ ধারণ করে নিতেন। মানে, এগুলো পশুদের কার্য, পশুদের মতই কর। বিভণ্ডক ঋষিও মৃগ রূপ ধারণ করে এক মৃগীর সাথে সম্পর্ক হয়ে তাঁর এই সন্তান হয়। বিভাণ্ডক এই সন্তানের নাম রাখেন ঋষ্যশৃঙ্গ। কারণ যেহেতু মৃগী থেকে সন্তান হয়েছে আর তার মাথায় শিং থাকবে তাই সন্তানের নাম দিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। সেই ঋষ্যশৃঙ্গের নামে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করা হচ্ছে – *দ্বৈবিধ্যং ব্রহ্মচর্যস্য ভবিষ্যতি মহাত্মনঃ* – এই ধরণের মন্তব্য যখন আমরা দেখব তখন বোঝা যাবে না যে আমরা বাল্মীকি রামায়ণ পড়ছি। এগুলো কে আধার করে মহাভারতে বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা এসেছে। বলছেন ব্রহ্মচর্য দুই রকমের – প্রথম ব্রহ্মচর্য হল দণ্ড, কমণ্ডুলু, মেখলা ইত্যাদি ধারণ করা, মানে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য হল – উপযুক্ত সময়ে নিজের স্বদারায় সমাগম করা। ভারতীয় পরম্পরাতে কখনই বলা হয় না যে তুমি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবে না। ঠাকুরও বলছেন স্বদারায় গমনে দোষ নেই। ঠাকুর কথাতে কখনই কোন শাস্ত্র বিরোধী কথা পাওয়া যাবে না। অনেকেই বিয়ে করে বলে আমি আমার

স্বামীর সঙ্গে থাকব না, অনেক ছেলেও এই একই জিনিষ করে। কিন্তু তা নয়, শাস্ত্র বলছে ব্রহ্মচর্য সব সময়ই দুই রকমের। যেখানে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে বলে দিচ্ছে আমি নারীর সঙ্গই করব না, এটা এক প্রকার ব্রহ্মচর্য। আর দ্বিতীয় ছেলে মেয়ের বিয়ে হওয়ার পর যখন ঋতুকালের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন না করে শুধু মাত্র সন্তান উৎপত্তির জন্য সমাগম করা ছাড়া আর কোন সময় সমাগম না করাটাও ব্রহ্মচর্য। এখানে বলা হচ্ছে ঋষ্যশৃঙ্গ দুই ধরণের ব্রহ্মচর্যই পালন করতেন। এটা খুবই বিরল ঘটনা। অন্যদের ক্ষেত্রে যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা সন্ন্যসীদের মত ব্রহ্মচর্য পালন করেন আর যাঁরা ঋষি তাঁরা দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। সাধারণ গৃহস্থরা শাস্ত্রে যে সময় ও শর্তাবলীকে ঠিক করে দিয়েছেন তার বাইরেও সমাগম করে বলে এটাকে নিন্দা করা হয়। কিন্তু সন্তান লাভের জন্য শাস্ত্র সম্মত ভাবে যখন একটা নির্দিষ্ট সময়ে যদিও সমাগম করছে তখন সেটাকে খারাপ বলা হচ্ছে না। বাল্মীকি রামায়ণে তাই আমরা দুই ধরণের ব্রহ্মচর্যের উল্লেখ পাই।

এখানে বলা হচ্ছে এটাই হচ্ছে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির বিশেষত্ব। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি ছোটবেলায় বাবার কাছে জঙ্গলের আশ্রমে বড় হয়েছেন। বন জঙ্গলে আশ্রমে থাকার দরুন কোন মানুষ জন সে কখন দেখেনি। আর খাবার বলতে বাবা যা একটু শাক পাতা রান্না করত তাই খেত আর জঙ্গলে ফলমূল যা পাওয়া যেত তাই ছোটবেলা থেকে খেয়ে এসেছেন। এদিকে অঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি চলছিল। অঙ্গদেশের রাজা রোমপাদকে পরামর্শদাতারা বললেন এই রাজ্যে যদি কোন বড় ঋষি পা রাখেন তাহলে বৃষ্টি হবে। তখন সবাই বললেন ঋষ্যশৃঙ্গ বলে একজন বড় ঋষি আছেন, তাঁকেই এই রাজ্যে নিয়ে আসা যাক। কিন্তু তা আনা হবে কি করে? কারণ বিভাণ্ডক তাঁর ছেলেকে কিছুতেই কোন লোকালয়ে আসতে দেবেন না, কারণ এক মেয়ে তাঁকে গোলমালে ফাঁসিয়ে দিয়ে সন্তানের জন্ম দিয়ে বিভাণ্ডকের কাছে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে, সেইজন্য তিনি ঠিক করেছেন যে ছেলেকে কোন মেয়ের মুখই দেখতে দেবেন না। মেয়েদের উপর তিনি প্রচণ্ড খাপ্পা। মেয়েদের নাম শুনলেই প্রচণ্ড চটে যান, আর ছেলেকেও এমন ভাবে আগলে রেখেছেন যে, কোন মেয়ে যেন ঋষ্যশৃঙ্গের ধারে কাছে না আসতে পারে। বাল্মীকি কবিতাতে খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন – **ঋষ্যশৃঙ্গো বনচরস্তপঃ-স্বাধ্যায়সংযুতঃ। অনভিজ্ঞস্তু নারীণাং বিষয়াণাং সুখস্য চ।।১/১০/৩/** যখনই কারুর প্রশংসা করবেন তখনই বলবেন তিনি তপঃ আর স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত, বলছেন ঋষ্যশৃঙ্গ বনেই থাকতেন আর তিনি সর্বদাই তপস্যা আর স্বাধ্যায়ে নিরত। তারপরে আরও সুন্দর বলছেন – *অনভিজ্ঞস্তু নারীণাং* – নারী জিনিষ যে কি সেই ব্যাপারে তিনি অনভিজ্ঞ, সে দেখেইনি, জানেনই না নারী কি জিনিষ। বাল্মীকি যে এখানে বলছেন এটা কোন অবান্তর কিছু নয়, অনেক সন্ন্যাসী আছেন তাঁরা ছোটবেলা থেকে এমন এক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন, আর একটু বয়স হতেই সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন তাঁরা নারীর ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ হন।

তখন রাজা রোমপাদ ঠিক করলেন কিছু নর্তকীকে ছেলে সাজিয়ে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে পাঠিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসার জন্য। নর্তকীরা তো শুনে নেওয়ার পর কিছুতেই রাজী হচ্ছে না বিভাণ্ডক মুনির ভয়ে। কারণ বিভাণ্ডক মুনি যদি একবার ধরে ফেলেন আর তারপর যদি অভিশাপ দিয়ে দেন তাহলে তো আমাদের সব শেষ। কিন্তু নর্তকীদের অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করান হয়েছে। তারপর নর্তকীরা সব মুনিদের বেশ ধরে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে নদী পথে বড় নৌকা করে সেই সময়েই গেছে যখন বিভাণ্ডক আশ্রমের বাইরে তপস্যা করতে কিংবা ভিক্ষার জন্য বেরিয়েছেন। আগে থাকতেই চর দিয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল বিভাণ্ডক মুনি কখন আশ্রমের বাইরে যান। এখন এরা সবাই ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে গেছে, নর্তকীরা সব যুবতী, আর দেখতেও সবাই সুন্দরী। ঋষ্যশৃঙ্গ তো কোন দিন নারীর রূপ দেখেনি, যদিও এরা সবাই মুনি বেশে গেছে, ওদের লম্বা চুল গুলো ঝুটি করে মাথায় বাঁধা। ঋষ্যশৃঙ্গ দেখেই বলছেন 'আপনাদের দেখতে কি সুন্দর, চোখ গুলো কি সুন্দর বড় বড়, আপনারা কোন আশ্রম থেকে আসছেন'? ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমের জঙ্গলে যা ফল ছিল ওদের খেতে দিয়েছে, এরাও অনেক ভালো খাবার দাবার পানীয় সব নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে কিছু ফল নিয়ে ঋশ্যশৃঙ্গকে দিয়ে বলছে 'আপনি আমাদের এই ফল একটু খেয়ে দেখুন না'। এরা একে নর্তকী আর রাজা পাঠিয়েছেন, এদের যা খাবার দাবার সবই খুব

উৎকৃষ্ট ও রাজকীয়। এই ধরণের ফল মিষ্টি ঋষ্যশৃঙ্গ কোন দিনই খায়নি। তিনি সারা জীবন শুধু কুয়ো আর ঝর্ণার জল খেয়ে এসেছেন, সেই জায়গায় তাঁকে এরা সুন্দর মিষ্টি শরবৎ যা নিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে পান করতে দেওয়া হয়েছে। এই সব খেয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের মাথাতো গেছে ঘুরে। তিনি এদের জিজ্ঞেস করছেন এত সুন্দর সুন্দর মিষ্টি সুস্বাদু জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়।

ঋষ্যশৃঙ্গের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এদিকে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে ফিরে আসার সময় হয়ে এসেছে। বিভাণ্ডকের ফিরে আসার আগেই নর্তকীর দলবল সব পালিয়ে গেছে। বিভাণ্ডক মুনি আশ্রমে ফিরে এসে ছেলের মুখ দেখে বুঝতে পারছেন তাঁর মন অন্যমনস্ক, কিন্তু পরিষ্কার করে কিছু বলছেনও না। ঋষ্যশৃঙ্গ শুধু বলছে কিছু মুনি কুমাররা এসেছিলেন। এই কাহিনী গুলিকে নিয়ে পরের দিকে খুব সুন্দর নাটকাদি করা হয়েছে। বাবা ছেলেক সাবধান করে দিয়ে বলছেন – তুমি খুব সাবধানে থাকবে, এখানে অনেক রাক্ষস টাক্ষসরা মায়ার রূপ ধরে আসতে পারে। কিন্তু ছেলের মনতো এখন ছিটকে গেছে, নতুন মুনি কুমাররা সব এসেছিল মন তাদের দিকে চলে গেছে। পরের দিন বিভাণ্ডক মুনি আশ্রম থেকে বেরিয়ে যেতে আবার ঐ নর্তকীর দল এসেছে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে। তারপর কায়দা করে করে অনেক পরে বলছে 'তোমার আশ্রমে তো আমরা অনেক সময় কাটালাম, তুমি চল না আমাদের আশ্রমে ঘুরে আসবে'। ঋষ্যশৃঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেছেন। সেখানে থেকে নর্তকীরা তাঁকে তাদের নৌকাতে তুলে নিয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ এই ধরণের নৌকাও কোন দিন দেখেনি, নৌকা বলতে এত দিন সে জানত ছোট্ট ছোট্ট পালতোলা নৌকা। কিন্তু এই নৌকাতো আর যাতা কিছু নয়, রাজার বজরা, নানান জিনিষ দিয়ে সাজান। নৌকাতে উঠেই এরা সবাই গান বাজনা, নাচ শুরু করে দিয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ বেদের সামগান ছাড়া অন্য কোন ধরণের গান কখন শোনেইনি। কিন্তু তপস্বী সে বিরাট, তাঁরা বাবা এই বয়সেই তাঁকে যা তৈরী করে দিয়েছে ভাবাই যায় না।

এইভাবে তাঁকে কিডন্যাপ করে অঙ্গদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অপহরণের কারবার আজকের দিনের নতুন কিছু ব্যাপার নয়, অপহরণের রমরমা অনেক আগে থেকেই ভারতে চলে আসছে। নৌকা থেকে যেমনি ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশের মাটিতে পা রেখেছেন সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। রাজা রোমপাদ দেখেই অবাক হয়ে গেছেন, কি প্রচণ্ড ক্ষমতা আর কত পবিত্র ঋষি যে, রাজ্যে পা দেবা মাত্রই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তিনি তাঁর মেয়ে শান্তার সাথে ঋষির বিয়ে দিয়ে দিলেন। এদিকে বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরে এসে দেখছেন ছেলে আশ্রমে নেই। খুব বড় ঋষি ছিলেন কিনা, নিজের যোগশক্তির মাধ্যমে বুঝে গেছেন কি হয়েছে। তখন উনি ছেলের পায়ের ছাপ দেখে দেখে অঙ্গদেশের দিকে প্রচণ্ড রেগেমেগে ছুটে চলেছেন। রাজা জানতেন বিভাণ্ডক মুনি প্রচণ্ড রেগে যাবেন তাই তিনি আগে থাকতেই অনেক লোকজন লাগিয়ে দিলেন বিভাণ্ডক মুনিকে অনেক খাতির যত্ন করে ঠাণ্ডা করার জন্য। বিভাণ্ডক মুনিকে যখন সবাই খুব সেবা করছে তখন তিনি রেগেমেগে বলছেন 'কে এই সেবা যত্নের আয়োজন করেছে'? তখন এরা বলছে 'এগুলো সব ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির ব্যবস্থাপনায় হচ্ছে'। কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ রাজার একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করে এই রাজ্যের ভাবী রাজা হয়ে গেছেন। তখন বিভাণ্ডকের মনটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, বড় ঋষি না হোক অন্ততঃ রাজা তো হয়েছে তাঁর সন্তান। তাছাড়া অনেক দিন হেঁটে হেঁটে চলেছেন, দুদিন তিন দিন সময়তো লাগছে, চলতে চলতে তাঁর রাগটাও একটু একটু করে ঠাণ্ডা হতে থেকেছে। যেমন যেমন খাতির হচ্ছে তেমন তেমন তাঁর মনটাও নরম হচ্ছে। সেইজন্য আগেকার দিনে নিয়ম ছিল, বাড়িতে কেউ অতিথি এলে তাড়াতাড়ি করে পা ধোওয়ার জল, খাবার জন্য জল দিয়ে দেওয়া হত যাতে তার মনটা ঠাণ্ডা হয়। যাই হোক, বিভাণ্ডক মুনি গিয়ে দেখছেন ঋষ্যশৃঙ্গ রাজকুমারিকে বিয়ে করেছেন, তখন বিভাণ্ডক মুনি আর বেশি রাগারাগি না করে ক্ষমা করে দিয়ে তাঁদের দুজনকে একসাথে থাকার জন্য আশীর্বাদ করলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ যদিও বিয়ে থা করেছেন কিন্তু তিনি সব সময় ছিলেন সাংঘাতিক তপস্বী।

বশিষ্ঠ মুনি, যিনি এত বড় ঋষি, তিনি দশরথকে বলছেন 'আপনি এই যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে নিয়ে আসুন। তিনি একজন বিরাট ঋষি, উনি এলে আপনার এই কামনা সফল হবেই হবে'। ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে

আসা হয়েছে। তিনি এসে প্রথমে খুব সাধারণ একটা যজ্ঞ করলেন, সেই যজ্ঞ দেখে রাজা দশরথের মাথা গেছে ঘুরে। তখন তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে পুত্র কামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য আবেদন করলেন। বেদে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে বলা হয় যিনি এই যজ্ঞে সঙ্কল্প করেছেন যে আমার পুত্র হোক তখন এই যজ্ঞ করলে তার পুত্র হবেই হবে। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্য রাজী হয়ে গেলেন আর তিনি রাজা দশরথকে বলে দিলেন 'আমি এই যজ্ঞ করব আর আপনারও পুত্র হবেই হবে'। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ যে করবে এখন তার কর্মে যাই থাক, বা সে নপুংসকই হোক বা তার স্ত্রী বন্ধ্যা যাই হোক তাতে কিছু যায় আসে না, পুত্র সন্তান হবেই হবে, হতে বাধ্য, এত কার্যকরী শক্তি এই যজ্ঞের। বেদের যজ্ঞ গুলিতে যে মন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার এমন শক্তি যে, যা কামনা করে আহুতি দেওয়া হবে সেটা হতে বাধ্য। মহাভারতে রাজা জনমেজয় সর্প যজ্ঞ করছেন তক্ষককে মারার জন্য, তক্ষক তখন ভয়ে, আতঙ্কে ইন্দ্রের মুকুটের মধ্যে লুকিয়ে গেছে। আহুতি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তক্ষক আসছে না। সবাই বলছে কোথায় আছে তক্ষক? বলছে তক্ষক ইন্দ্রের মুকুটে লুকিয়ে আছে। তখন মন্ত্র দ্বারা আহুতি দিয়ে বলা হচ্ছে ইন্দ্রকে শুদ্ধু নামিয়ে নিয়ে এস। ইন্দ্র দেখছে যে সে তার সিংহাসন শুদ্ধু পড়ে যাচ্ছে। এই ধারণাটাই পরে গিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এলো যে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যজ্ঞের দ্বারা চলছে। দেবতাদের যা কিছু শক্তি এই যজ্ঞের জন্য। আমরা যদি চাই তাহলে এই যজ্ঞ, যাদের উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, সেই যজ্ঞ দিয়েই দেবতাদের বেধে নামিয়ে আনতে পারি। মহাভারতের সময়ে ঋষিদের এগুলো কোন ব্যাপারই ছিল না, সেইখান থেকে ব্রাহ্মণরা নিজেদের খুব ক্ষমতাবান মনে করতে লাগল – আমরা যা চাইব তাই হতে হবে। তোমার টাকা নেই, ঠিক আছে আমি তোমার হয়ে যজ্ঞ করে দেব, আর যজ্ঞ যেই শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি দেখবে বিরাট ধনী হয়ে গেছ। তোমার সন্তান নেই, তোমার শত্রুকে মারতে হবে, লাগাও একটা যজ্ঞ, ফল পাবে না মানে, পেতেই হবে। আমরা ইতিহাসে পাই সত্যিই এইগুলো বাস্তবে ঠিক ফলে যেত। তপস্যার শক্তি, মন্ত্র শক্তি এখনও একই ভাবে রয়েছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ এইবার যজ্ঞ শুরু করছেন। এইখানে বাল্মীকি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির বিরাট প্রশংসা করছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন বাল্মীকির সমকালীন ঋষি। বাল্মীকি যখন রামায়ণ লিখছেন তখন দশরথ মারা গেছেন, শ্রীরামচন্দ্র রাজত্ব করছেন। সেই সময় ঋষ্যশৃঙ্গ হয়তো বেঁচে থাকতেও পারেন কিংবা কিছু দিন আগে মারা গেছেন। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ আর বাল্মীকি একই সময়ের ঋষি ছিলেন, তাঁর প্রশংসা করছেন বাল্মীকি, তার মানে তিনি কত বড় ঋষি ছিলেন। কিন্তু বাল্মীকি তাঁর সময়কার একজন ঋষির কি সুন্দর প্রশংসা করছেন এইখানে – ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন একজন প্রচণ্ড তেজস্বী ঋষি, তিনি যখন যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দিতে শুরু করেছেন তখন স্বয়ং এবং অন্যান্য দেবতারা সবাই এসে হাজির হয়ে গেছেন। বাল্মীকি দেবতাদের উপস্থিতির যেভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে দেবতারা সশরীরের এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা অদৃশ্য ছিলেন এই কথা লেখা নেই। কিন্তু কোন কোন ভাষ্যকাররা বলছেন দেবতারা অদৃশ্য রূপে সশরীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে একজন জিজ্ঞেস করছেন 'ঠাকুরকে যে এই ভোগ নিবেদন করা হয়, ঠাকুর কি এগুলো খান'? শ্রীশ্রীমা তখন বলছেন 'হ্যাঁ, তিনি সব খান। তাঁর ছবি থেকে একটা জ্যোতি নির্গত হয়ে তিনি সব খাবারের সার গ্রহণ করেন'।

এখানেও যখন যজ্ঞ হচ্ছে তখন সব দেবতারা অদৃশ্য রূপে সবাই নিজের নিজের ভাগ গ্রহণ করছেন। যখন যে দেবতার নামে আহুতি দেওয়া হচ্ছে তখন সেই দেবতা এসে ওই আহুতির দ্রব্যটা গ্রহণ করে নিচ্ছেন। বলা হয় পরবর্তি কালে যেমন যেমন যজ্ঞ ক্রিয়া কমতে শুরু করেছে তেমন তেমন দেবতাদের শক্তিও হ্রাস পেতে থেকেছে। বর্তমানে ইন্দ্রাদি দেবতাদের কোন দাম নেই কারণ এখন কেউ যজ্ঞ করে না। এই নিয়ে আলডাস হাক্সলের খুব সুন্দর একটা প্রবন্ধ আছে, যেখানে তিনি এই চিন্তাগুলির খুব প্রশংসা করেছেন। বেদের দেবতাদের শক্তি চলে গেছে কারণ এখন কেউ আর যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছে না। আর এটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলছেন – তোমরা যদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দিতে থাক, দেবতারাও তোমাদের দেখাশুনা করবেন। কি রকম ভাবে দেখাশুনা করবেন? ঠিক সময় বৃষ্টি দেবেন, গাছে ঠিক সময়ে ফল দেবেন, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ঠিক সময়ে আসবে আবার চলে যাবে। কিন্তু যদি এগুলো না

করে তুমি যদি শুধু ভোগের জন্য প্রকৃতির সম্পদ লুট করতেই থাক তাহলে কিন্তু সেটা এক তরফা হয়ে জগতের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়ে চারিদিকে এক অরাজকতার অবস্থা তৈরী হবে। তাই এই জিনিষটাকে বারে বারে তুলে ধরা হয়েছে যে তুমি যদি শ্রেয়কে পেতে চাও তাহলে তুমি দেবতাদের দেখবে আর দেবতারা তোমাদের দেখবে।

এটাই হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব ধরণের কর্মযজ্ঞে একজোট হওয়া। যখন কোন বড় পার্টি হয় তখন বড় বড় কোম্পানীর সব বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা হাজির হয়, গেছে পার্টিতে কিন্তু সেখানে নিজেদের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন সমস্যার কিছু কথাবার্তাও পরস্পর সেরে নেয়। রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে সব দেবতারাও এসে এক জোট হয়েছেন, এখানেও তাঁরা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। দেবতারা সব সময় যে যার নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকেন, সবার সাথে দেখা হয় না, মিটিং ডেকে যে সবাই একজোট হবেন সেটাও হচ্ছে না। কিন্তু এখন সব দেবতারাই রাজা দশরথের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। এখানেও ওনারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন।

যাঁরাই ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে ঠিক ঠিক ভাবে জানতে চান, তাঁদের কাছে এর প্রত্যেকটি কথাই প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কি বলতে চাইছেন? কীভাবে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনাগুলো বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন রূপ নিচ্ছে। দেবতাদের এখানে দেখান হচ্ছে সাধারণ মানবীয় রূপে কিন্তু তাঁদের সেই অতিন্দ্রিয় দৈবী শক্তি এখনও আছে। রামায়ণের যুগে এসে বেদের দেবতাদের অবস্থান ইতিমধ্যে অনেক পাল্টে গেছে। পালটে গেলেও দেবতাদের নিজস্ব ইচ্ছা, তাঁদের সমস্যাগুলো সব সমান ভাবেই বিদ্যমান ছিল। এখানেও তাঁদের এক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সেই সমস্যা সমাধাণের ব্যাপারে সবাই মিলে ব্রহ্মাকে গিয়ে ধরেছেন – রাবণ নামে একজন জন্ম নিয়েছে তাকে তো কেউ কিছুই করতে পারছে না – **নৈনং সূর্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ**।১/১৫/১০। এই যে রাবণ, তাকে সূর্য তপ্ত করতে পারেনা, বায়ু যে রাবণকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে তা সে পারেনা, সমুদ্র রাবণের ভয়ে স্তব্দ হয়ে রয়েছে। আপনি এই রাবণকে বর দিয়ে যত গোলমালের কারণ হয়েছেন। এখন হে ব্রহ্মা! আপনাকেই এই সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ব্রহ্মা বলছেন – আমি একটা উপায় পেয়ে গেছি।

এই জায়গাটাকে অধ্যাত্ম রামায়ণে অন্য ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অধ্যাত্ম রামায়ণ পুরাণ ধর্মী শাস্ত্র বলে সে পৌরাণিক দৃষ্টিতে কাহিনীটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বলা হবে, ব্রহ্মা সব দেবতাদের নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে যাবেন, যেখানে ক্ষীর সাগরে অশেষ নাগের উপরে তিনি শুয়ে আছেন, সেখান সবাই ক্ষীর সাগরের পারে দাঁড়াবে, তারপর হাতজোড় করে প্রার্থনা করে বলবে – হে প্রভু রক্ষা কর। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে দেখান হচ্ছে ব্রহ্মা নিজেই এর উপায় বার করে নিচ্ছেন, তাঁকে আর ভগবান বিষ্ণুর কাছে যেতে হচ্ছে না। বাল্মীকি রামায়ণ আর পরবর্তি কালে যত রামায়ণ লেখা হয়েছে তার সাথে এটাই একটা বিরাট পার্থক্য।

ব্রহ্মা তখন বলছেন – 'রাবণ যখন আমার কাছে বর চেয়েছিল তখন কিন্তু সে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষসদের হাতে যেন তার মৃত্যু না হয় এই বরই চেয়েছিল। মানুষ, পশু এদের তুচ্ছ মনে করে আর এদের থেকে মারা যাওয়া অসম্ভব বলে এদের কথা বর চাওয়ার সময় উল্লেখ করেনি। তাই একটা ফাঁক সে বরের মধ্যে রেখে দিয়েছিল আর আমিও সেই ফাঁকটাকেই কাজে লাগাব। মানুষকে দিয়েই রাবণকে মারা হবে'। আসল ব্যপার হয়েছিল, রাবণ ব্রহ্মার বর পেয়ে এত শক্তিশালী হয়ে গিয়েছিল যে সে কাউকেই কোন রকম তোয়াক্কা করত না, আর সমস্ত দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে আছে রাবণের দুষ্কর্মে। ব্রহ্মাও জানেন আমি রাবণকে বর দিয়েছি আর সেই ক্ষমতাতেই সে এই সব করে বেড়াচ্ছে, আমাকেই এর উপায় বার করতে হবে, আর তার বর চাওয়ার মধ্যেই একটা ফাঁক রয়ে গেছে। উকিলরা যেমন লিগাল এগ্রিমেন্টে আইনের নানা ফাঁক বার করে, তেমনি ব্রহ্মাও রাবণকে যে কন্ট্রাক্ট দিয়েছেন তুমি অবধ্য হয়ে যাবে, সেখানে লিগাল লুপ হোল একটা রেখে দিয়েছিলেন।

সেই সময় – **এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরুপযাতো মহাদ্যুতিঃ। শঙ্খ-চক্র-গদা পাণি পীতবাসা জগৎপতিঃ।।** ১/১৫/১৬। বাল্মীকি রামায়ণে এটা একটি খুব উল্লেখনীয় শ্লোক। বলছেন, সেই সময় জগৎপতি বিষ্ণু তাঁর সেই চিরাচরিত পীতবাস আর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী হয়ে স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মাও বাকি সব দেবতাদের সাথে বিষ্ণুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বলছেন – **তমব্রুবন্ সুরাঃ সুরাসর্বে সস্তিষ্টূয়সন্নতা, ত্বাং নিয়োক্ষ্যামহে বিষ্ণো লোকানাং হিতকাম্যয়া।।**১/১৫/১৮-১৯। দেবতারা সকলে প্রণত হয়ে তাঁকে সম্যগ রূপে বন্দনা করে বললেন – হে প্রভো ভগবন্ বিষ্ণু! আমরা সবাই মিলে আপনার উপরে একটা দায়ীত্ব অর্পণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছি, ত্রিজগতের কল্যাণের কামনায় অযোধ্যার রাজা দশরথের যজ্ঞে আপনাকে আমরা নিয়োগ করছি।

বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের মতই একজন সাধারণ দেবতা হলেও ইন্দ্রের মত অত শক্তিশালী দেবতা ছিলেন না। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ যুগে প্রবেশ করার সময় থেকে বিষ্ণুর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। রামায়ণে বিষ্ণুর গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার আগেই বেদে আমরা পেয়েছিলাম, দৈত্য রাজ বলির ক্ষমতাকে খর্ব করার জন্য বিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করে বলিকে কায়দা করে পাতাল লোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাল্মীকি এই কাহিনীর ভাবটুকু গ্রহণ করেছেন, বাল্মীকি নেওয়ার পর মহাভারতে এই ভাবটা আরও বিস্তার পেয়ে গেছে। বিষ্ণু যখন বেদে খুব সামান্য একজন দেবতা ছিলেন, বাল্মীকি তাঁকে রামায়ণে দেবতাদের মধ্যে খুব উচ্চ আসন দিয়ে দিলেন। কিন্তু তাই বলে সব দেবতারা ক্ষীর সাগরে গিয়ে হাতজোড় করে বিষ্ণুকে বলবে – প্রভু রক্ষা করুন, এই পৌরাণিক কল্পনাকে বাল্মীকি নিয়ে এলেন না। এখানে যেন বলা হচ্ছে, আমরা সবাই আছি, কিন্তু তোমাকে এই দায়ীত্বটা দিয়ে দেওয়া হল, তুমি তোমার ক্ষমতা দিয়ে করে দিও।

মূল কথা হচ্ছে রাবণকে বধ করতে হবে। কি করে বধ করা যাবে? তখন বিষ্ণুকে দায়ীত্ব দিয়ে বলা হল – রাবণতো আমাদের সবার অবধ্য, আপনি কোন রকমে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে রাবণকে বধ করুন। কারণ আপনি হচ্ছেন – **ত্বং গতিঃ পরমা দেবা সর্বেষাং নঃ পরন্তপ।।**১/১৫/২৫। আপনি দেবশত্রুদের ভীতি প্রদান করেন, আপনিই একমাত্র এই কাজটা করতে সক্ষম। ভগবন্ বিষ্ণু তখন সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললেন – আপনারা ভয় ত্যাগ করুন, আপনাদের মঙ্গলের জন্য ত্রিলোকবাসীদের কাছে ভয়ঙ্কর স্বরূপ রাবণকে আমি যুদ্ধে বিনাশ করে দেব।

এদিকে রাজা দশরথের পুত্র কামনার্থে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ চলছে, অন্য দিকে বিষ্ণু সবাইকে আশ্বাস দানের পর নিজে বিচার করতে বসে গেলেন। বিচার করতে করতে তিনি বললেন, ঠিক আছে কোন চিন্তা নেই আমি নিজেকে চারটে রূপে ভাগ করে নেব, আর সেইভাবে আমি আমার কাজ করে যাব। বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া অন্যান্য রামায়ণে আমরা পাই ভগবান বিষ্ণু আগে থাকতেই ঠিক করে নিয়েছিলেন যে দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন আর আমি তাঁর পুত্র রূপে জন্ম নেব। এখানে কিন্তু তা হচ্ছে না, যজ্ঞের সময়ই বিষ্ণু এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

তারপরেই বলছেন – **স কৃত্বা নিশ্চয়ং বিষ্ণুরামন্ত্র্য চ পিতামহম্। অন্তর্ধানং গতো দেবৈঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।।**১/১৬/১০। রাজা দশরথকে আমার পিতা বানাব এই নিশ্চয় করে ব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে এবং দেবতা ও মহির্ষিদের দ্বারা অর্চিত হয়ে তিনি সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, ব্রহ্মার থেকে অনুমতি নিয়ে। ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা রূপে দেখা হত। বাল্মীকি রামায়ণে ঠিক ঠিক বোঝা যায় না যে, ব্রহ্মা বড় না বিষ্ণু বড়। কিন্তু মনে হচ্ছে ব্রহ্মাকেই যেন বেশি বড় করে দেখান হয়েছে। পুরাণ তিন রকমের, তিনটি পুরাণে তিন জনকে বড় করা হয়েছে, একটাতে ব্রহ্মাকে বড় করা হয়েছে, আরেকটিতে বিষ্ণুকে বড় করা হয়েছে আর অন্যটিতে শিবকে বড় করে দেখান হয়েছে। যদি বাল্মীকি রামায়ণের দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে ব্রহ্মাকে কিন্তু মনে হবে বড়। তাই বলে বিষ্ণু একেবারে সাধারণ কেউ

নন, যদিও বিষ্ণুকে দায়ীত্ব দেওয়া হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মার থেকে অনুমতি নিতে। শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন বিষ্ণুরই রূপ।

এরপর দেবতাদেরও বলা হল যজ্ঞ ভূমি থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য। একদিকে দেবতা, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এঁদের জোর মিটিং চলছে অন্য দিকে যজ্ঞও চলছে। হঠাৎ যজ্ঞ থেকে একজন বিশালকায় লোক প্রকট হলেন। অন্য রামায়ণে বলা হয়েছে যে স্বয়ং অগ্নিদেব যজ্ঞ থেকে আবির্ভূত হলেন, কিন্তু এখানে কোন দেবতার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে না। শুধু বলা হচ্ছে একজন লোক প্রকট হলেন। তাঁর শরীরের রঙ কালো, আর তিনি লাল বস্ত্র পরিধান করেছিলেন, তাঁর মুখটা লাল। তাঁর মাথার চুল, দাড়ি, শরীরের রোম সব সিংহের মত। আসলে বেদে অগ্নি দেবতার রূপের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার সাথে এখানে এই রূপের বর্ণনাতে অনেক মিল পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে তিনি অগ্নি দেবতা।

সেই পুরুষ প্রকটিত হওয়ার পর রাজা দশরথকে সম্বোধন করে বলছেন – প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত হয় প্রজাপতি লোক থেকে আমি এসেছি। এই নাও পায়েসের পাত্র, এই পায়েস তোমার রানীদের খাইয়ে দিলে তোমার অভিষ্ট পুত্র লাভ হয়ে যাবে। তারপরের ঘটনা সবাই মোটামুটি জানেন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে দিলেন, কৌশল্যাকে দিলেন, কৈকেয়ী আর কৌশল্যা তাঁদের থেকে কিছুটা সুমিত্রাকে দিল।

এদিকে ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদের ডেকে বলছেন – দ্যাখো, জগৎপতি বিষ্ণু কিন্তু ঐদিকে রাজা দশরথের পুত্র রূপে শ্রীরামচন্দ্র হয়ে জন্ম নিয়ে নিয়েছেন। উনি ওনার কাজ তো করবেন, কিন্তু তোমরাও সবাই তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন বানর পরিবারে গিয়ে জন্ম নাও। আর যত প্রধান প্রধান অপ্সরা আছে, গন্ধর্বদের স্ত্রীরা আছে, যক্ষ নাগকন্যারা আছে, তাদের সবাইকে ব্রহ্মা বললেন – তোমরা সবাই সন্তান উৎপাদন কর। কি রকম সন্তান উৎপাদন করবে? তোমাদের স্বামীরা যেরকম সেই রকম শক্তিমান সন্তান উৎপাদন করবে। আমি জাম্বোবানের সৃষ্টি আগে থেকেই করে রেখেছি।

সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা সব নিজদেরই রূপ ধারণ করে এক এক করে নিজেদের মত সন্তান উৎপত্তি করতে থাকলেন, তখনও এই ধারণাটা থেকে গিয়েছিল যে দেবতারা নানা ধরণের রূপ পরিগ্রহ করতে পারতেন। তারপরে যত মহাত্মা, ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ, চারণ এরা সব বানর ভাল্লুকের রূপ ধারণ করে জন্ম গ্রহণ করতে শুরু করলেন। এনারা কেউ সাধারণ মানুষের মত ছিলেন না, এঁদের ক্ষমতা ছিল ইচ্ছা মাত্রই তাঁরা যে কোন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতে পারতেন।

দেবরাজ ইন্দ্র বালির জন্ম দিলেন, সূর্য সুগ্রীবের জন্ম দিলেন, বৃহস্পতি তাড় বলে একজনকে জন্ম দিলেন। দন্তমাদন বলে একজন বানর ছিল সে ছিল কুবেরের পুত্র। বিশ্বকর্মা, যিনি দেবতাদের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তিনি নলকে জন্ম দিলেন। নল আর নীল সমুদ্রে সেতু বন্ধনের সময় বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। এইভাবে বিভিন্ন দেবতা বিভিন্ন বানর ও ভাল্লুকের জন্ম দিলেন, বাল্মীকি বিরাট তালিকা দিয়ে বর্ণনা করেছেন। শেষে বায়ু দেবতা হনুমানের জন্ম দিলেন। হনুমানের শরীর ছিল বজ্রের সমান সুদৃঢ় আর গরুড়ের মত তাঁর গতি। এগুলো আবার কিছুটা পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে মিলে যায়।

এবার শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেছেন। সেখান বর্ণনা করা হচ্ছে তাঁর চোখটা একটু লালচে, ঠোঁট লাল, হাত দুটো লম্বা, কণ্ঠস্বর গভীর। পৌরাণিক ধারা অনুযায়ী যত রামায়ণ পরবর্তি কালে রচিত হয়েছিল সেখান বলা হয় যে ভগবান বিষ্ণুই নিজে দেবতাদের এই রকম বলেছিলেন, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে ব্রহ্মাই সব দেবতাদের দায়ীত্ব দিয়েছিলেন, তিনি যেমন বিষ্ণুকে দায়ীত্ব দিয়েছিলেন রাবণকে বিনাশ করার জন্য সেই রকম দেবতাদেরকেও তিনিই দায়ীত্ব অর্পণ করেছিলেন। অন্যান্য রামায়ণে বলা হয় কৌশল্যাদেবী জন্মাবার পর শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণু রূপেই অর্থাৎ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী রূপেই দর্শন করেছিলেন, বাল্মীকি রামায়ণে এই ধরণের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। এখানে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের বাল্য অবস্থাকে খুব তাড়াতাড়ি বড় করে দিয়েছেন। এরপরেই দেখান হচ্ছে বিশ্বামিত্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে

অযোধ্যাতে এসেছেন। বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য ছিল তিনি একটা যজ্ঞ করছেন, সেই যজ্ঞে রাক্ষসরা প্রচণ্ড বিঘ্ন উৎপাদন করছে, রাক্ষসদের বধ করবার জন্য আর যজ্ঞ সুসম্পন্ন করবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে নিয়ে যাওয়া। এই কাজের জন্য রাজা দশরথের কাছে তিনি শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ চাইতে এসেছেন।

আজকে আমরা বিষ্ণুকে যেভাবে দেখছি বাল্মীকি কিন্তু তাঁর রামায়ণে সেইভাবে বিষ্ণুকে দেখাননি। আবার বিষ্ণু যে কিছুই নয়, তাও বলছেন না। এরপর থেকে শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে তিনি যে ভাবে তুলে ধরেছেন সেখানে আমরা পুরোপুরি একটা মানুষের ব্যক্তিত্বকেই পাই। ঠাকুর যেমন তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাউকে বলছেন এ বিষ্ণুর অংশ থেকে, এ শিবের অংশে। ঠিক তেমনি শ্রীরামচন্দ্র হলেন বিষ্ণুর অংশ থেকে, হনুমান বায়ুর অংশ থেকে এসেছেন। আমরা, যদিও মানুষের মত আচরণ করছি সবাই, কিন্তু কোন না কোন দেবতার অংশ, কারণ দেবতার অংশ না হলে কখনই আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসতাম না। কিন্তু কে কোন দেবতার অংশ সেই ধারণা আমাদের নেই। অসুর বা পশুর অংশ হলে কখন শাস্ত্র পড়তে আসবে না। এগুলো বোঝা যায় না, কিন্তু বাল্মীকি ঠিক এই ভাবকেই প্রকাশ করে বিষ্ণুর অংশ বলে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে আগাগোড়া মানুষ রূপেই বর্ণনা করে গেছেন। যেমন মহাভারতে অর্জুনকে বলা হয় ইন্দ্রের পুত্র, কিন্তু কোথাও তাঁকে ইন্দ্রের মত বর্ণনা করা হয়নি, মানুষ রূপেই বর্ণনা করা হয়েছে, মহাভারতে অর্জুনকে যেমন মানুষ বলে দেখান হয়েছে, ঠিক তেমনি বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে মানুষ রূপেই তুলে ধরা হয়েছে। বাল্মীকি কোথাও শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান বা ভগবানের অবতার বলছেন না। এই ধারণাটা মাথায় রেখে আমাদের বাল্মীকি রামায়ণ বুঝতে হবে।

বাল্মীকি রামায়ণ – ২রা মে ২০১০

বাল্মীকি রামায়ণের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বারবার একটি কথা আমাদের বলতে হচ্ছে যে, বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, বৈদিক যুগ থেকে কীভাবে ভারতে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিবর্তন হয়েছে এবং ধর্মের প্রতি সেই সময়কার যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে বাল্মীকি রামায়ণে কিভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে, তার বিশ্লেষণ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

গীতা আমাদের কাছে নিত্যপাঠের অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতে খুব বিখ্যাত উক্তি আছে – *আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী*। যত শাস্ত্র আছে, সব শাস্ত্রই আমরা বুঝে নিতে পারি কিন্তু তার থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আবৃত্তি, শাস্ত্রের একটা অংশকে বারবার আবৃত্তি করা। গীতার যে কোন একটা অধ্যায়কে, ধরা যাক দ্বাদশ অধ্যায়, এই দ্বাদশ অধ্যায়কে রোজ কেউ যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে আবৃত্তি করতে থাকেন, বছরের পর বছর করে যাচ্ছেন, একটা সময় থেকে এই আবৃত্তি করার ফল আসতে শুরু করবে। অন্য দিকে কেউ বেদ, উপনিষদ, গীতা সব বুঝে ফেলেছেন, এই বুঝে ফেলাতে কিন্তু কোন দাম নেই, শুধু কতকগুলি তথ্য জানার মত হয়ে ভেতরে পরে থাকল, বলছেন, এতে কোন কাজ হয় না। কারণ তথ্য আর তত্ত্ব দুটো আলাদা জিনিষ। শচীন তেণ্ডুলকার কটা সেঞ্চুরি করেছে, অমিতাভ বচ্চন কটা সিনেমা করছে এগুলো জেনে কী লাভ! পৃথিবীর যত তথ্য ইচ্ছে করলে আমরা সংগ্রহ করতে পারি, কিন্তু এই তথ্য আমাদের জ্ঞানী বানাবে না, আত্মজ্ঞানে কোন সহায়ক হবে না। কম্প্যুটারের মধ্যে তো যাবতীয় তথ্য ইনপুট করা আছে, উইকিপেডিয়াতে ক্লিক করলে সব তথ্য এসে হাজির হয়, কিন্তু তাতে তার কি হচ্ছে? সে মেশিন মেশিনই থেকে যায়। আবৃত্তিতে কি হয়, একই জিনিষ রোজ শ্রদ্ধার সাথে করতে করতে ওর যে মন্ত্র শক্তি আছে, সেই শক্তিটা জেগে যায়। স্বামীজী বলছেন সমস্ত জ্ঞান তোমার মধ্যে আগে থাকতেই বিদ্যমান রয়েছে। মন্ত্র শক্তিতে ভেতরের সব জ্ঞান জেগে ওঠে, আর তার জীবন চিরদিনের মত পাল্টে যায়। মানুষের মধ্যে জ্ঞানের উদয় হলে সে অন্য রকম হয়ে যায়, তার চরিত্রই পাল্টে যায়। চরিত্র পাল্টানোর পথ আমাদের শাস্ত্র একটাই বলছে – *আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী*।

আমরা এখানে যা কিছু শিখছি জানছি সবই তথ্য। এগুলো আমাদের কখনই আধ্যাত্মিক মানুষ তৈরী করবে না। তৈরী করবে তখনই যখন এর যে কোন একটাকে, মনের মত যে কোন একটা অংশকে পছন্দ করে ঠিক করে নেব, তারপর ঐটাকেই দিনের পর দিন বছরের পর বছর শ্রদ্ধার সঙ্গে আবৃত্তি করে যেতে হবে, ঐ একটা জিনিষকে নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। তারপরেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ হবে। তবে সব শাস্ত্রই একটু জেনে রাখা ভালো, গীতা মানুষকে একভাবে নিয়ে যাচ্ছে, বাল্মীকি রামায়ণের দৃষ্টিভঙ্গী আবার অন্য রকমের। গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ জেনে রাখলে ভাল, শাস্ত্রের জ্ঞান যত জানা যাবে মন তত বিস্তার লাভ করে, মনের সংকীর্ণতা দূর হয়ে আসল ব্যক্তিত্বটা বেরিয়ে আসে।

আমাদের যত শাস্ত্র আছে তার মধ্যে সব থেকে আগে এসেছে বেদ আর উপনিষদ। দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত যে শাস্ত্র তাকে বলা হয় ইতিহাস, ইতিহাস দুটি – বাল্মীকি রামায়ণ আর মহাভারত। রামায়ণ আর মহাভারতের বিশেষত্ব হচ্ছে চতুর্বর্গ পুরুষার্থের, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটের বর্ণনা করা। আমরা ইতিহাস বলতে এত দিন ধরে যাকে মনে করে এসেছি তার সাথে এই ইতিহাস শাস্ত্রের এটাই পার্থক্য, সাধারণ ইতিহাস বলতে যাকে বুঝি তাতে থাকে শুধু মাত্র তথ্য, যেমন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল, এটা শুধু একটা তথ্য মাত্র। এই তথ্য জেনে আমার ব্যক্তিত্বের কোন পরিবর্তন হবে না, কিন্তু যখন আমরা শ্রীরামচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্ত, রাবণের বৃত্তান্ত পড়ছি, তখন সেটা আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর একটা ছাপ ফেলছে। তখন আমরা বুঝতে পারছি যে অপরের জিনিষের প্রতি দৃষ্টি দিতে নেই। যখন দুর্যোধন, কংসের কাহিনী পড়ছি বা শুনছি তখন আমার মনের মধ্যে একটা শিক্ষা হচ্ছে যে অতি গর্ব করা কখনই ভাল নয়। সীতা সোনার হরিণ দেখে লোভ করলেন, তাতেই রাবণ তাঁকে হরণ করার সুযোগ পেয়ে গেল। তখন বুঝে নিলাম যে কখনই লোভ করতে নেই। যখন কোন পূর্ব বৃত্তান্ত শুনে আমরা একটা শিক্ষা লাভ করছি, তখন তাকে বলা হচ্ছে ইতিহাস। কিসের শিক্ষা? চারটে জিনিষের শিক্ষা – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্মের জীবন, যা আমাদের স্বর্গাদির মত উচ্চ লোকে নিয়ে যায়, অর্থ ও কাম মানে এই জীবনে যেটা আমাকে সুখ ও আনন্দ দিচ্ছে, আর মোক্ষ যেটা এই জীবন আর পরের জীবন দুটোকেই অন্য দিকে নিয়ে চলে যায়।

আমাদের তিন ধরণের অস্তিত্বের কথা বলা হয় – একটা এই লোকের অস্তিত্বের, দ্বিতীয় পরলোকের অস্তিত্ব আর তৃতীয় এই দুটো লোকের পারের অস্তিত্ব। দুটো লোকের পার মানে মোক্ষ। পরলোকের যা কিছু তাকে ঠিক রাখছে ধর্ম আর ইহলোকের যা কিছু আছে তাকে ঠিকঠাক রাখছে অর্থ আর কাম, যাদের টাকা নেই, যাদের মনে কামনা-বাসনা জাগে না, ভোগ করার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা হচ্ছে কীটাধম। মহাভারতে এই ধরণের কটু মন্তব্য করা হয়, তোমার যদি টাকা না থাকে, তোমার যদি ভোগ করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে তুমি হচ্ছ কীটানুকীট। এই জগতে তুমি কোথাও প্রতিষ্ঠা পাবেনা, তোমাকে কেউই গুরুত্ব দেবে না। এখনও বুড়োরা এসে বলে – আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার টাকা-পয়সা নেই, আমার বউ আমাকে পাত্তা দেয়না, আমার ছেলে পাত্তা দেয়না, বৌমা পাত্তা দেয়না, নাতিরা পাত্তা দেয়না। সেইজন্য বলে টাকা পয়সা কখন ছাড়তে নেই, আর ভোগ করার সব ব্যবস্থা রাখতে হবে। ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয়, শাস্ত্র সম্মত ভাবে কীভাবে অর্থ উপার্জন করা যায়, আর শাস্ত্র সম্মত ভাবে কীভাবে সেই অর্জিত অর্থ ঠিক ঠিক ভোগ করা যায়।

ঠিক তেমনি ধর্মের ব্যাপারেও ইতিহাস শিক্ষা দেয় পরলোকে যাওয়ার কি ব্যবস্থা আছে, মানে মরে গিয়ে আমি যেন কুকুর শেয়াল না হয়ে যাই। মোক্ষ হচ্ছে আমি দুটোর মধ্যে কোনটাই চাইনা, আমি এই দুটোর পারে যেতে চাই। এই পুরো ব্যাপারটাকেই দুটি মার্গে ফেলে দিয়ে বলা হয় প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গ হল ধর্ম, অর্থ আর কাম, নিবৃত্তিমার্গ শুধু মোক্ষ। বাল্মীকি রামায়ণ আর মহাভারতের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই চারটে জিনিষকে এরা সমান ভাবে শিক্ষা দেয়। আচার্য শঙ্কর বলছেন বেদের এই দুটিই ধর্ম – প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সমান ভাবে না থাকলে ধর্মের সামঞ্জস্য

থাকবে না এবং তার ফলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। ইতিহাস ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পুরো সামঞ্জস্য করে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এর আগে আমরা আলোচনা করেছি শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম কিভাবে হল। এবার বিশ্বামিত্র এসেছেন রাজা দশরথের রাজদরবারে। বিশ্বামিত্র এসে রাজা দশরথকে বলছেন ‘হে রাজন্! আমি একটা খুব বড় সমস্যা নিয়ে এসেছি, আপনার সাহায্যের প্রত্যাশা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। রাজা দশরথও সঙ্গে সঙ্গে বললেন – হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আপনাকে সব রকমের সাহায্য করব। তখন বিশ্বামিত্র সমস্যার কথা বলতে লাগলেন। আমি সিদ্ধি পাওয়ার জন্য একটা যজ্ঞ করছি, কিন্তু দুটি মায়াবী রাক্ষস এসে বার বার এই যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপন্ন করছে। যে যজ্ঞটা আমি করছি সেটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, একটু বাকি আছে, দুটি রাক্ষস এসে রক্ত, মাংস ইত্যাদি যজ্ঞ বেদীতে ফেলে দিয়ে যজ্ঞকে অশুদ্ধ করে দিচ্ছে। বিশ্বামিত্র বলছেন – **ন চ মে ক্রোধমুৎস্রষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব।।**১/১৯/৭ – আমার কখন ইচ্ছে করেনা যে এই রাক্ষসগুলিকে আমি অভিশাপ দিয়ে দিই। বিশ্বামিত্র ছিলেন বিরাট ক্ষমতাবান ঋষি, তিনি যদি কাউকে অভিশাপ দিয়ে দেন সঙ্গে সঙ্গে সে ধ্বংস হয়ে যায়। আসলে এই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা আছে, একটা বর্ণনা আছে – যে যজ্ঞটা হচ্ছিল তাতে মৌনব্রত ধারণ করতে হবে। যখনই তিনি বারোটা দিন যজ্ঞ করবেন ঐ বারোটা দিনই তাঁকে মৌন থাকতে হবে। এখন যারা এসে যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে তাদের যদি মৌনব্রত ভঙ্গ করে অভিশাপ দিয়ে দেয় তাহলে দুটো জিনিষ হয়ে যাবে। মৌন অবস্থা ভঙ্গ হওয়ার জন্য যজ্ঞ তো পণ্ড হয়ে গেল, তার সঙ্গে যখন কেউ কাউকে অভিশাপ দিচ্ছে তখন তাঁর তপস্যার শক্তিটাও চলে যাবে। মুনি ঋষিরা এত সাধারণ কাজের জন্য অকারণে যখন তখন কাউকে অভিশাপ দিতে চাইতেন না, দেওয়াও উচিৎ মনে করতেন না। একটা শুভ কাজ শুরু করে দিলে আর কাউকে অভিশাপ দেওয়া উচিৎ নয়। অভিশাপ দেওয়ার মূলতঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে কারুর বিনাশ করে দেওয়া, ভালো কাজ বা শুভ কাজ করার সময় এই রকম অভিশাপ দেওয়াটা ঠিক নয়। বিশ্বামিত্র ছিলেন খুব বড় ঋষি, তিনি এগুলো ভালো ভাবেই জানতেন।

তখন তিনি বলছেন, আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া এই কাজে কেউ সফল হবে না, সেইজন্য আপনার কাছ থেকে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে যেতে এসেছে। আপনি এবার অনুমতি দিন তাহলে আমি ওদের নিয়ে যেতে পারি। রাজা দশরথ, তাঁর বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হয়েছে, বিশ্বামিত্রের কথা শুনে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তিনি এখন নানা কথাবার্তা শুরু করেছেন – ওরা কারা, যারা এই যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। রাজা দশরথের কথা শুনে বিশ্বামিত্র বলছেন – রাবণ বলে এক রাক্ষস আছে, যে পুলস্ত্য ঋষির বংশে জন্ম গ্রহণ করেছে এবং ব্রহ্মা তাকে এমন বরদান দিয়েছেন যার ফলে কেউ সহজে ওকে মারতে পারবে না।

বেদে Universal God বলে কিছু ছিল না, শুধু মাত্র পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তারপরে এই পুরুষই পরিবর্তিত হয়ে অধিপুরুষ বলা হত, শেষে রূপান্তর হয়ে গেল আদিপুরুষে। আমরা অবতার বলতে যা বুঝি, ভগবান নারায়ণ মানুষ রূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন, বাল্মীকি রামায়ণ কিন্তু ঠিক সেই অর্থে অবতার নিয়ে আসেন না। ঠাকুর কথামৃতে প্রায়ই বলছেন – ও শিবের অংশ, এ বিষ্ণুর অংশে। আবার অংশ বলার পর বলছেন – অংশ না কলা। তার মানে তাঁর মধ্যে যে দৈবী শক্তি সেটা কতটা রয়েছে। আমাদের ধর্মীয় চিন্তা ভাবনার রাজ্য বিরাট, তাই বলে এখানে কিন্তু কোন ভাব বা তত্ত্বের মধ্যে কোন রকমের বিরোধ কিছু নেই। শুধু আকারে বিরাট, আর আমাদের ধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও ভাব এত বিরাট যে, একটার সাথে আরেকটাকে মেলানো খুব কঠিন হয়ে যায়। যখন অংশ কলা ইত্যাদির কথা আসে তখন বুঝতে হবে এমন কেউ কেউ হতে পারেন যিনি ষোল কলা পূর্ণ। তাহলে তিনি অন্যদের তুলনায় উঁচু হয়ে গেলেন। আমরা সবাই কোন না কোন দেবতার অংশ, কেউ হচ্ছেন শিব অংশে, কেউ বিষ্ণুর অংশে আবার কেউ অসুর অংশের, কেউ রাক্ষস অংশের, কেউ বানর অংশের। মানুষের স্বভাব চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব দেখলেই বোঝা যায় কে কোন্ অংশের।

এখন কারুর মধ্যে যদি ষোল কলাই থাকে, অর্থাৎ কারুর মধ্যে যদি বিষ্ণুর ষোল কলাই থাকে তখন তাঁকে বলা হবে ইনি অবতার। এখন যদি কাউকে অবতার থেকেও উপরে রাখতে হয়, তখন কিভাবে করা হবে? তখন বলা হবে – আপনি অবতার নন, আপনি অবতারী, যেখান থেকে সব অবতাররা আসেন। আসলে এগুলো কিছুই নয়, শব্দের বাক্‌জাল, ইষ্টকে উপরে রাখার ভক্তের একটা প্রয়াস। যিনি পুরো ষোল আনাই এসে গেলেন তার আবার অবতার আর অবতারী কি হবে। যে যাকে ভালোবাসে তাকে বলবে তার মত কেউ হয় না। স্বামী ভূতেশানন্দজী প্রায়ই এই গল্পটা বলতেন – আকবর মজনুকে বলছেন, তুমি এই কালো কুচকুচে মেয়ে লায়লাকে ভালোবাসছ? মজনু বলছে – জাঁহাপনা আপনি লায়লাকে নিজের চোখ দিয়ে দেখবেন না, আমার চোখ দিয়ে দেখুন। ভক্তও যখন ভগবানের বর্ণনা করে তখন তাঁকে কোথায় যে তুলে নিয়ে যাবে ভাবাই যায় না।

বিশ্বামিত্র বলছেন – রাবণ নামে এক রাক্ষসের আবির্ভাব হয়েছে, তার প্রচুর সৈন্য। সে নিজে এসে কিছু করবে না, ওর নিজের অনেক লোক আছে, তার মধ্যে মারীচ আর সুবাহু নামে দুজন রাক্ষসকে দিয়ে আমার যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিয়েই চলেছে। এখানে একটা জিনিষ জানার আছে, এখন আমরা যে জিনিষগুলি আলোচনা করছি, এগুলো বাল্মীকি রচনা করেননি, আর ব্যাসদেব তো কখনই করেননি। সমাজে এই জিনিষ গুলো আগে থাকতে ছিল। কিছু দিন আগে সুপ্রীম কোর্ট একটা রায় দিয়েছে লিভ ইন এর উপর। খুশব বলে একজন অভিনেত্রীকে নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছিল। সেখানে সুপ্রীম কোর্ট একটা খুব সুন্দর কথা বলেছে – নৈতিকতা এক এক সমাজে এক এক রকম। আমাদের দেশে বিবাহ প্রথাকে খুব উঁচুতে রাখা হয় আর অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়। কিন্তু সব সমাজ এটাকে মানেনা, তাই বলে অনৈতিকতাকে কখনই অপরাধমূলক বলা যায় না, আর আমরা লিভ ইন রিলেশানসকে মেনে নিচ্ছি। তাহলে লিভ ইন রিলেশান সুপ্রীম কোর্ট রায় দিল বলেই হতে শুরু করেছে না তার আগে থাকতেই হচ্ছিল। এই ব্যাপারটাকে বুঝে নিলে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় চিন্তাধারার গতি প্রকৃতিকে বোঝা যাবে। লিভ ইন রিলেশান আগে থাকতেই হয়ে আসছে সুপ্রীম কোর্ট শুধু তার সম্মতির মোহরটা লাগিয়ে দিল।

হিন্দুদের দুই ধরণের ধর্মগ্রন্থ – শ্রুতি আর স্মৃতি। ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যে তত্ত্বগুলিকে পেলেন সেগুলিকে যেটাতে ধরে রাখা হল তাকে বলা হচ্ছে শ্রুতি। আজকে কিংবা আগামীকাল যদি আমিও ধ্যানের গভীরে কোন তত্ত্ব পেয়ে যাই, আর সেই তত্ত্ব যদি শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির শর্তকে পূরণ করে, তাহলে তাকেও শ্রুতির মধ্যে গণ্য করা হবে। শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি হচ্ছে যে তত্ত্ব আমি পেলাম তার একটা পরম্পরা থাকতে হবে, যুক্তিতে দাঁড়াতে হবে আর ভবিষ্যতে এই অনুভূতি অন্যেরাও পেতে পারেন তবেই তাকে শ্রুতি বলে গণ্য করা হবে। শ্রুতির বাইরে বাকী যত শাস্ত্র আছে সব স্মৃতির পর্যায়ে চলে আসবে। সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণ, ব্যাসদেবের মহাভারত, পুরাণ, তন্ত্র এগুলো সবই হচ্ছে স্মৃতি। স্মৃতিতে রচয়িতার বুদ্ধি, চিন্তা ভাবনাকে সংযুক্ত করা হয়েছে, শ্রুতিতে শুধু তত্ত্বগুলিকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই স্মৃতি গ্রন্তকাররা, সে পুরাণ হোক, ইতিহাস হোক কিংবা মনুস্মৃতিই হোক, এনারা আগে থাকতেই সমাজে যে প্রথা, রীতিনীতি গুলি রয়েছে, ঐগুলিকে সংগ্রহ করে এই সব স্মৃতি শাস্ত্র রচনা করেছেন। ইদানিং কালের যত ঔপন্যাসিকরা আছেন, তাঁরাও সমাজে এখন যা আছে সেগুলোকেই সংগ্রহ করে নিজের লেখনি প্রতিভার সাহায্যে আরো মালমশলা মিশিয়ে উপন্যাস রচনা করে দিচ্ছেন। বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসদেবের মহাভারত, পুরাণ সব এভাবেই রচিত হয়েছে। অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, এই ধরণের জীব আগে থাকতেই সমাজে ছিল। দেবাসুর সংগ্রাম, গঙ্গার অবতরণ এই সব কাহিনী বাল্মীকিই প্রথম তাঁর রামায়ণে নিয়ে এসেছেন। এই রামায়ণ থেকে পরে ব্যাসদবে এই কাহিনীগুলিকে মহাভারতে টেনে আনলেন, মহাভারতের থেকে আরও রঙ চরিয়ে পুরাণাদিতে প্রবেশ করল। এগুলোই পরে হিন্দু সংস্কৃতিতে বসে গেছে। গঙ্গাসাগরের মাহাত্ম্যের কথা আমরা কত শুনে এসেছি, এই মাহাত্ম্য কোথা থেকে এল? সগর রাজার একশ পুত্র কপিল মুনির অভিশাপে ভস্ম হয়ে এখানে পড়েছিলেন, ভগীরথ গঙ্গাকে অবতরণ করিয়ে তাঁর পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করলেন। এই কাহিনী আমরা কোথায় পাচ্ছি? পুরাণেই পাচ্ছি। পুরাণেরও আগে পাওয়া যাবে মহাভারতে, কিন্তু তারও আগে প্রথম

এই কাহিনী এসেছে বাল্মীকি রামায়ণে। বাল্মীকি রামায়ণ যিনি পড়ে নিয়েছেন, তিনি হিন্দুদের ধর্মের উৎসকে জেনে নিলেন, আধ্যাত্মিকতার কথা এখানে বলা হচ্ছে না, আধ্যাত্মিকতাকে জানতে হলে বেদে যেতে হবে। স্মৃতি সাহিত্যে যা কিছু আছে তার সব কিছুই একটু একটু করে বাল্মীকি রামায়ণে ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে।

এই যে পরের দিকে যত রকমের অসুর, রাক্ষস, প্রেত, দানবের যত বর্ণনা এসেছে এর সব কিছুই শুরু হয়েছে বাল্মীকি রামায়ণ থেকেই। বাল্মীকি রামায়ণ থেকে পরে ব্যাসদেব এই ধারণাগুলো নিয়ে মহাভারত রচনা করলেন। ব্যাসদেবই পরে আবার পুরাণ রচনা করলেন বাল্মীকির পদাংক অনুসরণ করে। এছাড়া পরবর্তি কালে আরও অনেকে পর পর সংযোজন করে গেছেন। যারা বেদ আর ব্রাহ্মণদের বিরোধী ছিল বাল্মীকি রামায়ণে তাদেরকেই অসুর বা রাক্ষস বলা হয়েছে। বেদ বিরোধী বলতে যজ্ঞের বিরুদ্ধে, আজকের দিনে আমরা বলতে পারি ধর্মবিরোধী। এখন যদি কেউ আমাদের পূজো বন্ধ করে দিতে বলে, বেলুড় মঠে আসা নিয়ে যদি কেউ কটূ কথা বলে আজকের দিনে এরা সবাই অসুর। এটাই অসুরের ব্যাখ্যা, রামায়ণের যুগে বাল্মীকি এদেরকেই নিজের কাব্য প্রতিভা দিয়ে একেবারে বিরাট উঁচুতে নিয়ে গেছেন।

এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন – **সতু বীর্যবতাং বীর্যমাদত্তে যুধি রাবণঃ** ১/২০/২৩ – রাবণের এত শক্তি ও বীর্য যে সে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ায় তখন সে সব যোদ্ধাদের শক্তিটাই হরণ করে নেয়। এটাই ঠিক ঠিক কবিত্বময় বর্ণনা, পরের দিকে এই জিনিষটাই আসবে শ্রীরামচন্দ্র আর পরশুরামের ক্ষেত্রে। রাবণের সম্বন্ধে এখানে বলছেন *বীর্যবতাং বীর্যামাদত্তে*, বীর্যবান, শক্তিমান যারা তাদের শক্তিটা *আদত্তে* মানে খেয়ে নেন। খেয়ে নেওয়ার দুটো তাৎপর্য হতে পারে, প্রথম তাৎপর্য তাদের পরাজিত করে দেয়, দ্বিতীয় তাৎপর্য হতে পারে, রাবণ এত শক্তিমান, তার সামনে বাকীরা এত দুর্বল যে তার যুদ্ধ করার ক্ষমতাটাই শেষ হয়ে যায়। যেমন, যুদ্ধ হচ্ছে, যুদ্ধ হতে হতে একটা সময় সৈন্যরা যখন দেখে আমি আর পারবনা, তখন তাদের শক্তি চলে যায় আর রণভূমি থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। যে লোকটা একটু আগে বলছিল – আমি যুদ্ধে মরে যাব, প্রাণ দিয়ে দেব, পিঠ দেখাব না, সেই এখন যুদ্ধভূমি থেকে পালিয়ে যায়।

বিশ্বামিত্রের কথা শোনার পর দশরথ বলে যাচ্ছেন – আমার ছেলেরা তো নেহাতই বাচ্চা, ওরাতো যুদ্ধ করা জানেই না, এদের কি করে আমি যুদ্ধে পাঠাব! আমার সমস্ত সৈন্য একত্র হয়েও রাবণকে হারাতে পারবে না আর সেখানে এই দুটো বাচ্চা ছেলেকে কিভাবে যুদ্ধে পাঠাব, ওরা তো নেহাতই শিশু।

রাজা দশরথের কথা শুনে বিশ্বামিত্র প্রচণ্ড রেগে গেছেন। রেগে গিয়ে তখন বলছেন – **পূর্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি।** ১/২১/২ – হে রাজা, তুমি আগে কথা দিয়ে দাও, আমি অমুক কাজ করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দাও, তারপর সেখান থেকে পিছিয়ে আস। এখানে রাজা দশরথকে বিশ্বামিত্র প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক কথা বলছেন। বাল্মীকি যখন শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করবেন তখন তিনি বলবেন, শ্রীরামচন্দ্র দুই রকমের কথা বলেন না, একবার যেটা করবেন বলে দেন তখন তিনি ঐটাই করবেন। রাজা দশরথ যে দুর্বল লোক তা নয়, তিনি খুব দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের তুলনায় রাজা দশরথ দুর্বল এবং মনের আবেগের দোদুল্যমানতার স্বীকার হয়ে আছেন। কিছুটা তাঁর বয়সের জন্য, কিছুটা তাঁর মানসিক দুর্বলতার জন্য তিনি এখন মনের আবেগে বশীভূত হয়ে আছেন।

সবার মন আর বুদ্ধি কিন্তু একই জিনিষ, আমরা বলি – তোমার বুদ্ধি কিন্তু ঠিক নেই। মন মানে যেখানে চিন্তন হয় আর বুদ্ধি মানে নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধিমান লোক বলতে বোঝায়, যিনি জানেন এটাই ঠিক এবং ঠিক জেনে যিনি ঐটাই করবেন তিনিই বুদ্ধিমান। ভালো পোষাক পড়লেই কেউ মনুষ্য পদবাচ্য হয়ে যায় না, দুটো ডিগ্রী পেয়েছে বলেই যে সে বুদ্ধিমান হয়ে যাবে তা নয়। তার মানে লেখাপড়া না করে, অনেকগুলি ডিগ্রী না থাকলেও সে বুদ্ধিমান হতে পারে। বাচ্চা ছেলেও জানে মনের ব্যপার, কিন্তু বাচ্চা ছেলে আর বয়স্ক লোকের পার্থক্য কোথায়? বাচ্চা ছেলে তার মনের আবেগ অনুযায়ী চলে বলে সে কোন কাজ

ঠিক ভাবে করতে পারেনা। একটা জিনিষ আমাদের জানা আছে কিন্তু একটা কিছুর ধাক্কা এলেই আমরা ছিটকে পরি, তখন আমরা ঐটাকে বলি মন। আবার যখন প্রচুর ধাক্কা আসছে কিন্তু আমি নড়ছি না, তখন ঐটাকে বলি বুদ্ধি। যিনি ধীমান, যার বুদ্ধি আছে তার ছেলে মরে গেছে কি বউ মরে গেছে তাতে সে একটুও বিচলিত হয়ে ভেঙ্গে যাবে না, তার বুদ্ধি নড়বে না। কিন্তু কাঁচা মনের যারা তাদের জীবনে একটু ধাক্কা এলেই লজ্জাবতী গাছের মত নুয়ে পড়ে। ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন – কয়েক বছর খরা চলছে, চাষবাস হচ্ছে না, এক চাষী জলাশয় থেকে খাল কেটে ক্ষেতে জল আনবে বলে খাল কেটেই যাচ্ছে। স্নান নেই, খাওয়া দাওয়া নেই, বিকেল হয়ে যাচ্ছে, বউ এসে বলছে – তোমার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি, তেল মেখে স্নান করে খাওয়া দাওয়া করে নাও। চাষী তো কোদাল নিয়ে বউকে এই মারতে আসে কি সেই মারতে আসে – তোকে আজ কেটেই ফেলব, জানিস না জল নেই, চাষবাস না হলে পরিবার শুদ্ধ না খেয়ে মরে যাব। বউ তো পালিয়ে বাঁচে। আরেক চাষীও খাল কেটে জল আনবে বলে খাল কেটে যাচ্ছে, তার বউ যখন এসে ঐ একই কথা বলছে, তখন সেই চাষী বলছে – তুই যখন বলছিস তাহলে চল। দু-জনেই জানে খাল কেটে জল না আনলে মাঠে ফসল হবে না, আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। একজন করল না, মানে তার বউ এসে যখন বলেছে, অর্থাৎ মনে আবেগ যখন ধাক্কা মেরেছে সেই চাষী ছিটকে পরে গেছে।

আমরাও কিন্তু বেশির ভাগই এই দ্বিতীয় চাষীর মত। আমরা সবাই জানি আমাদের ভাল মানুষ হতে হবে। আমরা সবাই জানি আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে আরও উচ্চতর অবস্থাতে যেতে হবে। সবাই জানে রোজ সকালে উঠতে হবে, নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করতে হবে, শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে রোজ জপ-ধ্যান করতে হবে, অথচ করিনা। মনে কোন আবেগের ঢেউ এসে যখন আমাদের সব কিছু উড়িয়ে দেয়, তখন বুঝতে হবে যে আমরা মনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। মনকে যে বশে রেখে বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় তখন তাকে কেউ নাড়াতে পারবে না। রাজা দশরথ আর শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে এটাই বিরাট পার্থক্য। রাজা দশরথকে আবেগ নাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু শ্রীরামকে নাড়াতে পারে না। পরের দিকে দেখা যাবে, শ্রীরামচন্দ্র হতাশ হয়ে গাল হাত দিয়ে ক্রন্দন করছেন আর লক্ষ্মণকে বলছেন – কি হয়ে গেল, যার রাজা হবার কথা তাকেই কিনা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, অন্য দিকে ভরত এখন সব রাজসুখ ভোগ করছে। লক্ষ্মণ তখন বলছেন – দাদা আপনার কাছেই আমি উপদেশ পেয়েছি, সেই উপদেশই এখন আমি আপনাকে দিচ্ছি, আপনি এই ভাবে হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়বেন না। বাল্মীকি ছাড়া অন্য রামায়ণে এই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যাবে না। কারণ অন্যান্য রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র হলেন ভগবান, বাল্মীকি রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র বীরপুরুষ। বীরপুরুষের চিত্তও যে কখন দুর্বল হবে না তা নয়, বীরপুরুষরে চিত্তও দুর্বলতার বশীভূত হয়ে যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় তো নরেনের জন্য বিল্লি আঁচড়ানোর মত আঁচড়াতো, তাহলে ঠাকুরকে কি আমরা পরমহংস বলতে পারি? গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান নিষ্কাম কর্মের কথা বলছেন, নিষ্কাম কর্ম কি একটা বাস্তব জিনিষ নাকি কোন কাল্পনিক তত্ত্ব? বাস্তবিক জিনিষ না হলে শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যাবে। তাহলে এমন কে আছেন যিনি ঠিক ঠিক অনাসক্ত ভাবে কর্ম করতে পারেন? সবাই এক বাক্যে বলবেন কেন? শ্রীকৃষ্ণই করতেন। তাহলে মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে হেন মিথ্যে কথা নেই যে শ্রীকৃষ্ণ বলেননি, এমন ছল চাতুরি নেই যে তিনি করেননি। তাহলে কি শ্রীকৃষ্ণ স্বামীজীর থেকেও খারাপ ছিলেন? আর একটা কায়েতের ছেলের জন্য ঠাকুরের যে বিল্লী আঁচড়াচ্ছে!

আসলে আমরা এই ব্যাপারটা ধরতেই পারিনা। এখন যদি কাউকে বলে দেওয়া হয় আপনি স্বামীজী, ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতেই পারছেন না, তাহলে তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করবেন। মূল কথা হল, তোমার যাই করে থাক না কেন, দেখতে হবে তোমার নিজস্ব কোন স্বার্থ আছে কিনা। কারণ পরমহংসই হোক আর পাঁতিহংসই হোক মনের আবেগ সবাইকে ধাক্কা মারবেই, এর থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। আর ঐ ধাক্কা যখন আসবে তখন চোখ দিয়ে জল বেরোবেই। কিন্তু সেখান থেকে কত তাড়াতাড়ি নিজের সাম্য অবস্থাতে ফিরে আসছে তার উপর নির্ভর করবে সে কত বড় আধ্যাত্মিক পুরুষ। আধ্যাত্মিক পুরুষ আর জাগতিক পুরুষের তফাৎটা এখানেই ধরা পড়ে। ধাক্কা দুজনকেই মারবে আর

দুজনেই নড়ে উঠবে। যদি না নড়ে ওঠে সে তো তৈলঙ্গস্বামী, তাঁকে দিয়ে জগতের কোন কাজ হয় না। আমার দুঃখে যদি তোমার হৃদয় বিচলিত না হয়, আমার ব্যাথাতে তোমার চোখে যদি জল নাই আসে, আমার কষ্টে তোমার রাতের নিদ্রা যদি না ব্যাঘাত হয়, তাহলে তোমার কাছে গিয়ে আমি কি করব! দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবে স্বামীজীর রাতে ঘুম হচ্ছে না। কেন? তিনি সবার দুঃখের সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন, কিন্তু এতে তাঁর কোন নিজস্ব ক্ষুদ্র স্বার্থ নেই। নিজস্ব ক্ষুদ্র স্বার্থ কোন গুলো? কামিনী-কাঞ্চন-নাম-যশ। এর বাইরে কোন নিজস্ব স্বার্থ থাকে না।

স্বামীজী যখন বিদেশে ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি কি অর্থ রোজগারের জন্য, না কি নিজের নাম যশ প্রচারের জন্য, না কি কোন মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ঐসব করে বেড়াচ্ছিলেন? কোনটাই তাঁর মধ্যে ছিল না। শ্রীকৃষ্ণও এই চারটের কোনটার জন্যই মিথ্যে কথা বলা, ছল চাতুরি করেননি, ঠাকুরও এগুলোর কোনটার জন্যই ছটফট করছেন না। যে কোন কাজ যখন কেউ এই চারটের বাইরে করে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, তখন বুঝে নিতে হবে সে অনাসক্ত কর্ম করছে। এই যে এখানে সবাই শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছেন, এর দ্বারা কি তাঁরা আরও বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারবেন, এর দ্বারা কি তাঁরা সংসারে আর সুখ ভোগ করতে পারবেন, এর দ্বারা কি তাঁদের খুব নাম-যশ হবে? কোনটাই হবে না, এই শাস্ত্র অধ্যয়ন হল একটা উচ্চ আদর্শকে ধরার চেষ্টা। এটিও কিন্তু অনাসক্ত কর্মের খুব কাছাকাছি। উচ্চ আদর্শের জন্য যখন কোন কর্ম করা হয় তখন সেটা নিষ্কার কর্মের পর্যায়ে পড়ে, যেমন ঠাকুর বলছেন – হিঞ্চের শাক শাকের মধ্যে নয়, মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। আমি জ্ঞান অর্জন করতে চাইছি, এখানে কিন্তু স্বার্থপরতার কোন ভাব আসছে না।

শ্রীরামচন্দ্রের নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, সেইজন্যই তিনি মহৎ। তাই বলে কি তাঁর দুঃখ কষ্টের অনুভব হবে ন? যিনি যুবরাজ ছিলেন, প্রথম থেকেই রাজবাড়িতে সুখে আদরে দিন কালাতিপাত করেছেন, তাঁর এখন খাওয়া জুটছে না, মাটিতে শয়ন করতে হচ্ছে, তাঁর কি কষ্ট অনুভব হবে না? শ্রীরামচন্দ্রের যদি কষ্ট না হত তাহলে তিনি তো সাধারণ গরীব মানুষের কষ্ট বুঝতেই পারতেন না। যিনি গরীবের কষ্ট বুঝতে পারেন না তাঁকে ভগবান বলে আমার কি লাভ! যে আমার দুঃখ কষ্ট বোঝে না তাঁর কাছে আমার ব্যাথার কথা বলে কি লাভ! একজনের সন্তান মারা গেছে, এখন তার মনে যে সন্তান হারা ব্যাথা সেটাকে কে জানতে পারবে? যার সন্তান নেই সে অনুভব করতেই পারবে না। কিন্তু তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হলে, কিংবা আমি যদি চাই তার দুঃখে সান্ত্বনা দিয়ে তার দুঃখকে লাঘব করতে, তাহলে আগে আমাকে ঐ ব্যাথাটা কি জিনিষ অনুভব করতে হবে। যদি সেটা নাইই অনুভব হয়, নাই বুঝি, তাহলে আমি বুঝব কি করে তার ভেতরে কি হচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রও যদি দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন না হন আর দুঃখ-কষ্টের ব্যাথাকে যদি তিনি না অনুভব করেন তাহলে তিনি কিভাবে জগতবাসীর উদ্ধার করবেন। স্বামী বিবেকানন্দের মনে যদি ব্যাথা বেদনার অনুভব না হত তাহলে তিনি কি পারতেন মানুষকে উদ্ধার করতে? যখন নরেন ছিলেন তখন বন্ধুদের সাথে হৈহুল্লোড় করে বেড়াচ্ছেন। কারণ তিনি বড় বাড়ির ছেলে, ভোগের সব উপকরণ তাঁর চারিদিকে। এভাবে থাকলে তো নরেন কোন দিন স্বামীজী হতে পারতেন না। তখন ঠাকুর দিলেন এক ধাক্কা। বাবা মারা গেলেন, জ্ঞাতীরা সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিচ্ছে, বাড়িতে টাকা নেই পয়সা নেই, খাবার নেই, কি তীব্র কষ্ট। এই কষ্টই তাঁকে পরবর্তি কালে সমস্ত দেশের মানুষের কষ্টের মধ্যে একাত্ম করে দিল। অবতারকেও বুঝতে হয় কষ্ট কাকে বলে, সব অবতারকেই এই দুঃখ কষ্টের তোড়কে সামলাতে হয়েছে। স্বামীজীর বোন আত্মহত্যা করেছে, প্রিয়জন যখন মরে যায় তখন তার মনে কী প্রচণ্ড কষ্ট হয় বোঝ এবার। এই ব্যাথা বেদনাকে না বুঝলে, এই ব্যাথা বেদনার মুখোমুখি দাঁড়াতে না পারলে কোন দিন তিনি জগতোদ্ধারে নামতে পারতেন না।

আরও একটা ব্যাপার আছে, অবতার বা মহাত্মাদের মন এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে এই ব্যাথা বেদনাগুলিকে ওনারা আমাদের থেকে আরও গভীর ভাবে অনুভব করেন। সেইজন্য তখন তিনি ঐভাবে

আঁতকে ওঠেন, বিল্লীর আঁচড় দেওয়ার মত যন্ত্রণা অনুভব করেন। শ্রীরামচন্দ্রও ঠিক তাই, সারা জীবনে তিনিও প্রচুর দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলেন। তাই বলে তিনি সেখানেই হারিয়ে যাননি বা থেমে পড়েননি। নিজেকে একটু সামলে নিয়েই আবার ঐ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছেন, এটাকেই বলে বুদ্ধি। কিন্তু রাজা দশরথ পারছেন না।

রাজা দশরথকে তাঁর রাজগুরু বশিষ্ঠদেব বলছেন – **ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মাত্মা ইতি রাঘবঃ ১/২১/৭**। রঘুবংশের লোকদের রাঘব বলা হয়, শ্রীরামচন্দ্রকেও রাঘব বলা হয় আবার রাজা দশরথকেও রাঘব বলা হয়। বলছেন – ত্রিলোকের সবাই জানে আপনি ধর্মাত্মা, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। তাই আপনি একবার কথা দিয়ে এইভাবে কথা ফেরত নেবেন না, আপনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকুন। এই কথা বলে বলছেন – **প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ। ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাদ্ রামং বিসর্জয়।। ১/২১/৮**। খুব সুন্দর এই শ্লোকটি। বশিষ্ঠ মুনি বলছেন – যিনি প্রতিশ্রুত, যিনি কথা দিয়েছেন আমি এই রকমটি করব, তারপর তিনি যদি সেই রকম না করেন, তখন কী হয়? *ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাদ্ রামং বিসর্জয়* – আপনি যা কিছু পূণ্য আজ পর্যন্ত করে এসেছেন, ইষ্টাপুর্ত মানে, এত দিন যা দান দক্ষিণা দিয়েছেন, গাছপালা লাগিয়েছেন, কূপ খনন করেছেন, যজ্ঞযাগ করে যত পূণ্য অর্জন করেছেন সব নাশ হয়ে যাবে। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন – অমুক বাবু কথা দিয়ে কথা রাখেনা, ও একটা ফালতু। অবতার পুরুষ তাকে এক কথাতেই শেষ করে রাখলেন। বশিষ্ঠদেবও তাই রাজা দশরথকে বলছেন – আপনি এই রকম কথার খেলাপ করবেন না।

এই কথা বলার পর বশিষ্ঠদেব আবার বলছেন – **এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ। ১/২১/১০** – শ্রীরামচন্দ্র হলেন ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ। এখানে বাল্মীকি বলছেন না যে শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু বশিষ্ঠ মুনির মাধ্যমে বলছেন ইনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, ধর্মের মুর্তি। আর বিশ্বামিত্র তিনিও ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের গতিকে কখনই নাশ করা যায় না। শুধু যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাই নয়, বিশ্বামিত্র আবার সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রের জ্ঞাতা। যিনি যুগপৎ ধর্মের বিগ্রহ আবার সব অস্ত্র-শস্ত্রের জ্ঞাতা, এই জগতের কোন শক্তি নেই যে তাঁকে কিছু করতে পারবে। সেইজন্য আপনাকে বলছি আপনি কোন রকমের দ্বিধা না রেখে শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের জিম্মায় ছেড়ে দিন।

প্রজাপতি দক্ষ ছিলেন প্রথম পিতাদের মধ্যে একজন। তাঁর ষাটটি কন্যা ছিল। পুরাণে আমরা তাঁর অনেক কাহিনী পাই। প্রজাপতি দক্ষ তাঁর কন্যাদের বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রদান করেছিলেন। এই কন্যাদের থেকে নানান ধরণের প্রজাতির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে তাঁর দুটি কন্যা ছিল যাঁদের নাম ছিল জয়া আর সুপ্রভা, এই দুই কন্যা বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের আরেকটি কন্যার নাম সরমা, তার থেকে জন্ম হয় সব কুকুর, বেড়াল, শেয়াল ইত্যাদির। দক্ষের আরেক কন্যা দিতি, দিতির সন্তানদের বলা হত দৈত্য। দক্ষের আরেক কন্যার নাম অদিতি, অদিতি থেকে সব আদিত্যাদি তেত্রিশ দেবতাদের জন্ম। এই ষাটটি মেয়ে থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রজাতি জন্ম দিয়েছে। তেমনি জয়া আর সুপ্রভা থেকে সব অস্ত্র-শস্ত্রের জন্ম হয়েছে, তাই বলে কি তারা তরোয়াল আর তীর ধনুকের জন্ম দিয়েছেন? না, তা নয়। হিন্দুরা জানে যে জগতে যত কিছু বস্তু আছে, নদী, পাহাড়, বৃক্ষ, পশু, পাখি সবারই একজন করে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা দেবী আছেন। ঠিক তেমনি যত শক্তিশালী অস্ত্র আছে সব অস্ত্রের একজন করে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, ঐ দেবতা আছেন বলেই ঐ অস্ত্রের মধ্যে শক্তি বিরাজ করে আছে। আধুনিক যুদ্ধে যে মিসাইল ছাড়া হয় তাতে মাইক্রো চিপস্ দেওয়া থাকে, এই চিপসকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মিসাইল কোন কাজ করবে না। ঠিক তেমন এই অস্ত্রগুলি, ব্রহ্মাস্ত্র, বায়ব্যস্ত্র, বরুণাস্ত্র ইত্যাদি যত রকমের অস্ত্র আছে সব অস্ত্রের একজন করে দেবতা আছেন। এই দেবতারা যদি অস্ত্র থেকে চলে যান তখন সেই অস্ত্রই একটা সাধারণ বাণ হয়ে যাবে। আবার এই দিব্যাস্ত্র যদি কোন সাধারণ সৈন্যের হাতে চলে যায়, এই দিব্যাস্ত্র কোন কাজ করবে না। যিনি তপস্যা করেছেন, যাঁর উপর ঐ অস্ত্রের দেবতা সন্তুষ্ট থাকেন তখনই ঐ অস্ত্র কাজ করবে।

এখানে বলা হচ্ছে এই জয়া আর সুপ্রভা প্রায় একশটি দিব্যাস্ত্রের জন্ম দিয়েছিল। এর সব কটি অস্ত্রই এখন বিশ্বামিত্রের কাছে গচ্ছিত আছে। সেইজন্য বশিষ্ঠদেব রাজা দশরথকে ভরসা দিয়ে বলছেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কারণ বিশ্বামিত্রের কাছে কোন রাক্ষসই দাঁড়াতে পারবে না। এত কথা হয়ে যাওয়ার পর রাজা দশরথের আর কিছু বলার নেই আর করারও কিছু ছিল না। তবুও তিনি বহু কষ্টে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের হাতে অর্পণ করে দিলেন।

এরপর অযোধ্যা থেকে তিন জন বেরিয়েছনে – বিশ্বামিত্র, শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ। বেরিয়ে বিশ্বামিত্র প্রথমেই বলছেন – **মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা। শ্রমো ন জ্বরো বা তে ন রূপস্য বিপর্যয়ঃ।।** ১/২২/১৩। হে রাম, তুমি এখন বিরাট এক কাজ করতে যাচ্ছ, সেইজন্য তোমাকে আমি দুটি শক্তি দিয়ে দিচ্ছি। এই যে তুমি এত বড় কাজ করতে যাচ্ছ, স্বাভাবিক অবস্থায় তুমি এই কাজ করতে পারবে না, আর সাধারণ মানবিক শক্তি দিয়ে এই কাজ করা একেবারেই অসম্ভব। এখানেও আমরা দেখতে পাই বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে কখনই ভগবান বলে মনে করা হচ্ছে না, কিন্তু তিনি শক্তিমান, অতিমানব। বিশ্বামিত্র বলছেন – তোমার মধ্যে চরম মানবিক শক্তি বিদ্যমান, এবার তোমার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবেশ করাচ্ছি। এই বলে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলা ও অতিবলা এই দুটি মন্ত্রশক্তি শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করলেন। এসব মন্ত্র গুরুর কাছে সিদ্ধ রূপে থাকে, গুরু কাউকে দিয়ে দিলেন তখন সে ঐ মন্ত্রে সিদ্ধ হয়ে গেলেন। ঠাকুর কারুর জিহ্বাতে একটা মন্ত্র লিখে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার অনুভূতি হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ হন তাঁরা যখন কোন মন্ত্র কাউকে দিয়ে দেন তখন সেই মন্ত্র সাথে সাথে কাজ করতে শুরু করে দেবে।

বলা ও অতিবলাতে কি কি হয়? বলছেন – **শ্রমো ন জ্বরো বা তে ন রূপস্য বিপর্যয়ঃ।। ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়িষ্যন্তি নৈর্ঋতাঃ। ন বাহ্বোঃ সদৃশো বীর্যে পৃথিব্যামস্তি কশ্চন।।**১/২২/১৪। এই দুটো বিদ্যার যদি তুমি মালিক হয়ে যাও তখন তোমার মধ্যে কয়েকটি ক্ষমতা এসে যাবে, যেমন যতই তুমি যুদ্ধ করতে থাক তুমি কখনই ক্লান্তি অনুভব করবে না, যখনই তুমি বলবে আমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন সঙ্গে সঙ্গে তোমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। স্বামীজীর উপস্থিতিতে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা হচ্ছে। শ্রীমা মঠে এসেছেন। স্বামীজী তখন নিজেকে বলছেন আমার জ্বর হয়ে যাক। কারণ সবাই পূজাতে খাটাখাটনি করছেন, পান থেকে চুন খসলে স্বামীজী কাকে যে খুব বকাবকি করবেন কোন ঠিক নেই, তাতে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যাঁরা প্রাণপাত শরীরপাত করে পরিশ্রম করছেন তাঁরা মনঃক্ষুন্ন হয়ে যাবে, তাই যাতে বকাবকি না করতে হয় স্বামীজী জ্বর নিয়ে এলেন। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ধুম জ্বর এসে গেছে, তিনি বিছানাতে শুয়ে পড়লেন। তিন দিন পরে যখন বিসর্জন হচ্ছে, শ্রীমা এসে বলছেন – নরেন! বিসর্জন হয়ে গেছে এবার উঠে পর। স্বামীজীও হ্যাঁ মা, এই উঠছি বলে ধড়মড় করে উঠে পড়লেন। এগুলোই হল নিজের শরীরের সমস্ত শারীরিক নিয়মের উপরে পুরো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। যদি বলে আমি এখন ক্লান্ত হতে চাইছি না, আমার আর ক্লান্তি আসবে না। দ্বিতীয় ক্ষমতা হল তোমার কখন জ্বর হবে না, মানে কোন ধরণের রোগ তোমার শরীরকে আশ্রয় করতে পারবে না। তৃতীয়, তোমার রূপের কখন বিপর্যয় হবে না। মানে আজকে চেহারাতে খুব জৌলুষ দেখাচ্ছে, আবার কালকে ম্যাড়ম্যাড়ে লাগছে এরকম কখন হবে না। যেমন এখন চেহারা ঝকঝকে দেখাচ্ছে একই রকম সব সময় দেখাবে। চতুর্থ, যখন তুমি ঘুমোচ্ছ বা অসাবধান রয়েছ, এবং পেছন থেকে হঠাৎ করে কোন শত্রু তোমাকে আক্রমণ করতে পারবে না। পঞ্চমত, মুখোমুখি তোমার সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করতে চাইলে তোমার সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারবে না। যার জন্য রাবণও শ্রীরামচন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়াতে পারল না। আসলে শ্রীরামকে মানব থেকে অতিমানব বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তপস্যার দ্বারা যে কেউই এই ক্ষমতাগুলি অর্জন করতে পারবে। বিশ্বামিত্র মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – হে অনঘ রাম! তুমি যদি প্রতিদিন এই মন্ত্রকে অনুশীলন কর, সৌভাগ্য তোমাকে সর্বদা অনুসরণ করবে, তাছাড়া চাতুর্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, সম্পত্তি তোমাকে আশ্রয় করে নেবে। চাতুর্যতার আবার খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করা

হয়, তুমি সবার কথার উত্তর দিতে পারবে কিন্তু তোমার কথার কেউ উত্তর দিতে পারবে না। বলা ও অতিবলার এমন ক্ষমতা যে তুমি যে শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠ হবে তাই নয়, বুদ্ধি, চাতুর্যতা এগুলোতেও তুমি শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে। এই চাতুর্যতা ও বুদ্ধির উপরে একটা খুব মজার ঘটনা আছে। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের সময় একবার পেঁয়াজের দাম খুব বেড়ে গিয়েছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ী তখন বিরোধী নেতা ছিলেন। সরকার পক্ষের লোকদের রাগাবার জন্য লোকসভাতে তিনি পকেটে করে দুটো পেঁয়াজ নিয়ে গেছেন, সেখানে পকেট থেকে পেঁয়াজ বার করে কংগ্রেস সদস্যদের দিকে লক্ষ্য করে দেখাচ্ছেন। তদানিন্তন খাদ্যমন্ত্রী এত রেগে গিয়েছিলেন যে, পা থেকে চটি খুলে বাজপেয়ীর দিকে দেখাচ্ছিলেন। বাজপেয়ীজী তখন খুব মিষ্টি করে বলছেন – যারা পেঁয়াজ খায় তারা পেঁয়াজ দেখায়, যারা চটি খায় তারা চটি দেখায়। হিন্দীতে বলেছিলেন – যো পেঁয়াজ খাতে ওহ পেঁয়াজ দেখাতে হ্যায়, যো চপ্পল খাতে ওহ চপ্পল দেখাতে হ্যায়। এটাই হল বিশেষ ধরণের এক উন্নত বুদ্ধির পরিচয়, এগুলোই বাক চাতুর্য। সব রাজনীতিবিদদের এই জিনিষ থাকে না। সাধনা না থাকলে এই বাক চাতুর্যতা আসে না। তা নাহলে সব বোকা বোকা কথা বলে। গ্রামে একটা লোক ছিল, সে একদিন দুঃখ করে বলছে – আমার কথা গ্রামের লোকেরা আর পছন্দ করে না। শুনে তাকে একজন বলছে – কেন, আমার কথাতে তো লোকে খুব নেয়, এইতো সেদিনকে অমুকের মা মারা গেছে, আমি গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম উনি কি শুধু তোমার মা ছিলেন, আমারও মা ছিলেন, গ্রামের সবার মা ছিলেন, তুমি দুঃখ করো না। শুনে সে কত শান্ত হয়ে গেল। লোকটি বলল – বাঃ, খুব ভালো বলেছ তো। আরেক দিন একজনের বউ মরে গেছে। লোকটি গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে – কেন মন খারাপ করছ, ও কি শুধু তোমার বউ ছিল, ও তারও বউ ছিল, এরও বউ ছিল, আমারও বউ ছিল, সারা গ্রামের সবার বউ ছিল। এই হচ্ছে বোকামি।

সাধনা করলেই বাক চাতুর্যতা চলে আসে। শ্রীরামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র বলছেন – তোমার বাক চাতুর্য হবে। তুমি যখন কথা বলবে তখন তোমার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। বলা ও অতিবলাতে এর সাথে তোমার আরও অনেক উপকার হবে – তোমার ক্ষিদে পাবে না, মানে যখন তোমার ইচ্ছে হবে তখন খাবে, জলতেষ্টা তোমার পাবে না।

শ্রীরামচন্দ্রকে এই বলা ও অতিবলা শক্তিকে বিশ্বামিত্র সম্প্রদান করার পর অযোধ্যা থেকে নিজের আশ্রমের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। বিশ্বামিত্রের আশ্রম ঠিক কোন জায়গাতে ছিল এখন বলা খুব মুশকিল, তবে সমস্ত সম্ভবনাকে মাথায় রেখে বলা যায় গোরক্ষপুরের কাছাকাছি কোথাও তাঁর আশ্রম ছিল। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ওনারা গঙ্গা পার হচ্ছেন, গঙ্গার জল প্রবাহের বিরাট আওয়াজের কথাও বাল্মীকি উল্লেখ করছেন।

আশ্রমের কাছাকাছি আসার পর বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে একটা জায়গা দেখিয়ে বলছেন – এই জায়গাটাই তাড়কা রাক্ষসীর এলাকা। তাড়কা রাক্ষসী ছিল অন্য কোন এক যোনির এক অভিশপ্ত যক্ষিণী। সে অহঙ্কারাদি করেছিল বলে অভিশপ্ত হয়ে রাক্ষসী রূপে পরিণত হয়ে যায়। মানুষ, কুকুর, বেড়াল, পাখি কে কোন যোনি থেকে এসেছে আমরা জানিনা। হয়ত তার এই যোনিতে থাকার কথা নয়, অভিশপ্ত হয়ে এই যোনিতে এসে পতন হয়ে গেছে। শ্রীরামচন্দ্রের তখন মাত্র ষোল বছর বয়সের এক কিশোর। সীতার যখন বিবাহ হয় তখন তিনিও বলেছিলেন – আমার যখন বিয়ে হয় তখন শ্রীরামের ষোল বছর বয়স আর আমার এগার বছর বয়স। কিন্তু অন্যান্য রামায়ণে আর টিভি সিরিয়ালে অনেক উল্টোপাল্টা দেখান হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র আর সীতার বর্ণনা ঠিক ঠিক দেওয়া হয়েছে কারণ তখনও ওনারা দুজনেই বেঁচে ছিলেন। আর শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকি রামায়ণ পুরোটাই নিজে শুনেছেন, লব-কুশ তাঁর রাজদরবারে গিয়ে গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন, যেমন কথামৃত শ্রীশ্রীমায়ের শোনা। এইজন্যই বাল্মীকি রামায়ণের সব কিছুর বর্ণনা খুব নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক।

এদিকে তাড়কা রাক্ষসীও এগিয়ে এসেছে। শ্রীরামচন্দ্র একেই বাচ্চা ছেলে, আবার এক নারীকে মারতে হবে ভেবে তিনি খুব ইতস্ততঃ করছিলেন। তখন বিশ্বামিত্র বলছেন – এ হচ্ছে শাপভ্রষ্ট, কোন দ্বিধা না রেখে এক্ষুনি এর উপর তোমার অস্ত্র চালিয়ে একে মেরে ফেল। কিন্তু তার থেকেও যেটা গুরুত্ব সেটা শুনে নাও – **নহি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণাকার্য নরোত্তম। চাতুর্বর্ণহিতার্থাং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা**।।(১/২৫/১৭) হে রামচন্দ্র, চারটি বর্ণের হিতের জন্য যদি তোমাকে কোন নারীকে বধ করতে হয়, তার জন্য তুমি একটুও চিন্তা ভাবনা করবে না। তোমার এই নারী কল্পনা সব ছেড়ে দিয়ে তীর চালাও। পরের দিকে মহাভারতে, পুরাণে বিধান করে দেওয়া হয়েছিল যে কোন মতেই নারীবধ করা যাবে না, নারীবধে পুরো অঙ্কুশ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ নারীবধকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুমতি দিচ্ছে, চারটে বর্ণের মঙ্গলের জন্য যদি দরকার হয় তাহলে অবশ্যই নারী বধ করা যাবে। এগুলো পড়লে বোঝা যায় হিন্দু ধর্ম কিভাবে বিবর্তিত হয়ে হয়ে আজকে এই জায়গাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বামিত্র এখানে পরের শ্লোকেই খুব সুন্দর একটা উক্তি করছেন। যাদের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি আছে, যারা বুঝতে চান ধর্ম জিনিষটা কি তাদের পক্ষে এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলছেন – **নৃশংসমনৃশংসম বা প্রজারক্ষণকারণাৎ। পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা**।।(১/২৫/১৮) - হে রামচন্দ্র, যিনি রাজা, তাঁর ধর্ম, অর্থাৎ রাজার ধর্ম একটাই, প্রজাদের রক্ষা। প্রজা রক্ষা ছাড়া রাজার অন্য কোন ধর্ম নেই। যার জন্য পরের দিকে যখন সীতার নামে কলঙ্ক হচ্ছে তিনি সীতাকে ত্যাগ করে দিলেন, কারণ প্রজাদের এই জিনিষ পছন্দ হচ্ছে না। যদি না ত্যাগ করেন তাহলে প্রজাদের মধ্যে অনাচার শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ হচ্ছে, অশ্বমেধ যজ্ঞে স্ত্রী না থাকলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন সবাই বলছে শ্রীরামচন্দ্র দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করুন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। প্রজা রক্ষণার্থম, প্রজার রক্ষার্থে আমি আমার সীতাকে ত্যাগ করেছি কিন্তু তাই বলে আমি আরেকজনকে বিয়ে করতে যাব না। তাই তখন যজ্ঞে সীতার সোনার মুর্তি স্থাপন করতে হল।

বিশ্বামিত্র এখানে শ্রীরামচন্দ্রকে রাজধর্ম শেখাচ্ছেন। তুমি রাজা, নৃশংস কাজ হোক, খুব কঠোর কাজ হোক, অথবা মৃদু কাজ হোক, আর যদি খুব পাতকযুক্ত কর্ম, যে কাজ অন্যদের পক্ষে অত্যন্ত পাতক কর্ম, কিংবা দোষযুক্ত কর্ম, প্রজার হিতের জন্য এই ধরণের যে কোন কাজ করার জন্য রাজাকে সব সময় তৈরী থাকতে হবে। রাজা যদি দেখে প্রজার হিতের জন্য ছেলেকে ত্যাগ করে দিতে হবে, তাহলে ছেলেকেও ত্যাগ করে দিতে হবে। অমুকের দ্বারা প্রজার অমঙ্গল সাধন হচ্ছে রাজাকে দেখতে হবে অমুককে বধ করে দিলে যদি প্রজাদের মঙ্গল হবে তাহলে নিঃসঙ্কোচে নির্বিচারে তাকে বধ করে দিতে হবে। লোকেরা যতই বলুক শ্রীরামচন্দ্র বালিকে কেন লুকিয়ে বধ করলেন, সীতাকে ত্যাগ কেন করলেন, শ্রীকৃষ্ণ এটা কেন করলেন, কিছু করার নেই এটাই হচ্ছে রাজধর্ম। রাজধর্মে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন তার আর নিজস্ব স্বার্থ থাকে না, নিজের টাকার জন্য, কামিনীর জন্য, নাম-যশ পাওয়ার জন্য এইসব কিছুই রাজার থাকতে নেই। মা নিজের ছেলের জন্য কিই না করে, নিজের স্বামীর পকেট থেকে টাকা সরিয়ে রাখে। দেশে তিন ধরণের টাকা খাটে, হোয়াইট মানি, যেটা সাধারণ লোকেরা চালায়, ব্ল্যাক মানি, যারা স্মাগলরার চালায়, হোয়াইট মানি, যেটা প্রত্যেক স্ত্রীরা চুরি করে রাখে যেটা তার স্বামীরা জানতে পারেনা। তাই বলে কি স্ত্রীকে চোর বলা যাবে? কখনই বলা যাবে না। মা ছেলের জন্য মিথ্যে কথা বলতে পারে, ছেলের জন্য মা খুনও করতে পারে। মার ক্ষেত্রে এগুলো কোন পাপ নয়। কারণ মা মাতৃধর্মে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীশ্রীমা দুধের ব্যাপারে ঠাকুরকে মিথ্যে কথা বলছেন, শ্রীমাকে তো কোন পাপ স্পর্শ করতে পারল না। কারণ তিনি মাতৃধর্মে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমা পরে বলছেন, রোগীকে, শিশুকে খাওয়াবার ব্যাপারে মিথ্যে কথা বললে ওটা মিথ্যের মধ্যে গণ্য হয় না। শঙ্করাচার্যও এক জায়গায় বলছেন, বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার সময় বলা হয় দুধ খেলে চন্দ্রিমা বাড়ে, মানে তুমি আরও ফর্সা হয়ে যাবে, কিংবা বলবে দুধ খেলে তোমার চুল তাড়াতাড়ি বড় হবে। শুনেই বাচ্চা চোঁ করে দুধ খেয়ে নেয়। মা যশোদাও শ্রীকৃষ্ণকে দুধ খাওয়ার সময় বলছেন দুধ খেলে চুল বড় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বাচ্চা তখন, একটু করে দুধ খাচ্ছে আর মাথায় হাত দিয়ে দেখছে চুল কতটা বড় হচ্ছে। চুল বাড়ছে না দেখে মাকে বলছে – মা, তুমি মিথ্যে কথা বলছ। এগুলোতে পাপ হয় না।

সেইজন্য বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – তুমি রাজধর্মে প্রতিষ্ঠিত নারী হত্যা যতই নৃশংস হোক, জানি নারী হচ্ছে করুণার প্রতিমুর্তি, কিন্তু জগতের কল্যাণ, প্রজার হিত আগে, তুমি কোন দ্বিধা করো না। বিশ্বামিত্রের কাজ থেকে এসব কথা শোনার পর শ্রীরামচন্দ্র তাড়কাকে বধ করে দিলেন।

বাল্মীকি বর্ণনা করছেন – বিশ্বামিত্র ঐ ভাবে বলার পরও যখন তাড়কা তাড়া করে দৌড়ে আসছে, তাও কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সংস্কার ছাড়তে পারছেন না। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন – দ্যাখো ভাই, এই তাড়কা রাক্ষসীর রূপ কি ভয়ঙ্কর, সাধারণ লোক এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখলেই আতঙ্কিত হয়ে যাবে। এই রাক্ষসীর যে নিজের দৈহিক শক্তিই আছে তা নয়, এর উপর আবার তার মায়া শক্তিও আছে, একে সহজে কেউ হারিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু যাই হোক, আমি একে প্রাণে মারব না, আমি শুধু এর নাক আর কান কেটে দেব, এতে যদি সে ভয়ে পিছিয়ে যায় তাহলে তাই যাক, আমার কিন্তু একে মারার একটুও ইচ্ছে নেই। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – **স্ত্রীস্বভাবেন রক্ষিতাম** – স্ত্রী স্বভাবের জন্য তাকে আমার রক্ষা করতে হবে, সে আমার কাছে রক্ষিত।

শ্রীরামচন্দ্র তো তাড়কার নাক আর কান কেটে দিলেন। কিন্তু তাতে সে পালিয়ে না গিয়ে আরও ক্ষিপ্র গতিতে ভয়ঙ্কর হিংস্র মুর্তি নিয়ে তাড়া করে এসেছে, তখন শ্রীরামচন্দ্র আর কোন উপায় না দেখে তাড়কাকে বধ করে দিলেন। দূরে একটা নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে বিশ্বামিত্র সব লক্ষ্য করছিলেন, দেখছিলেন কিভাবে শ্রীরামচন্দ্র তাড়কাকে বধ করেন। বিশ্বামিত্র নিজেও ঋষি হওয়ার আগে রাজা ছিলেন, এরও বর্ণনা বাল্মীকি রামায়ণে পরে আসবে।

সংক্ষেপে বিশ্বামিত্রের মূল কাহিনী হল, বিশ্বামিত্র যখন রাজা ছিলেন তখন একবার তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে হাজির হয়েছেন। বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে একটি আশ্চর্য কামধেনু গাভী ছিল, সেই কামধেনুর কাছে যাই চাওয়া হত সব পাওয়া যেত। কামধেনুর বদন্যতায় বিশ্বামিত্রের সব সৈন্যদের খুব আদর যত্ন করা হয়েছে। বিশ্বামিত্র অবাক হয়ে ভাবছেন জঙ্গলের এই আশ্রমে সমস্ত সৈন্যদের বশিষ্ঠ মুনি কীভাবে এত সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে সৎকার করলেন। খোঁজ নিয়ে বিশ্বামিত্র সব জানতে পেরেছেন। এখন কামধেনুর উপর তাঁর খুব লোভ হয়েছে। তিনি যাবার সময় কামধেনুকেও টানতে টানতে নিয়ে চলেছেন। কামধেনু তখন খুব চিৎকার করে বশিষ্ঠ মুনির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে 'আপনি কী আমাকে রাজার কাছে দান করে দিয়েছেন, নাকি রাজা বলপূর্বক আমাকে নিয়ে যাচ্ছে? আপনি আমাকে বাঁচান'। বশিষ্ঠ মুনি কামধেনুকে উদ্দেশ্য করে বলছেন 'তোমাকে রাজা বলপূর্বক টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আমি সামান্য ব্রাহ্মণ, রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সামর্থ আমার নেই, তোমার ক্ষমতা দিয়ে তুমি নিজে নিজেকে রক্ষা কর'। তখন কামধেনু প্রচণ্ড হুঙ্কার দিতে শুরু করে দিল। সেই হুঙ্কারে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে প্রচণ্ড উগ্রশক্তি সম্পন্ন সৈন্যরা বেরিয়ে বিশ্বামিত্রের পুরো সৈন্যদের মেরে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বামিত্র তখন প্রচণ্ড অনুতপ্ত হয়ে বলছেন 'ধিক্ এই ক্ষত্রিয় পরাক্রমে, একটা সামান্য গরুকেও সে অধিকার করে নিয়ে যেতে পারেনা! এক গরীব ব্রাহ্মণের কাছে আমার মাথা নীচু হয়ে গেল। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণ হয়ে যাব'। আজকালকার দিনে যেমন লোকেরা বলে আমি এমপি হব, এমএলএ হব, সেই রকম বিশ্বামিত্রও বললেন আমি ব্রাহ্মণ হব। তারপর তিনি তপস্যা শুরু করে দিলেন। প্রথমে তিনি শিবের আরাধনা করেন। শিব বিশ্বামিত্রকে সব অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে দিলেন। শিবের অস্ত্র পেয়েই তিনি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে আক্রমণ চালালেন। বশিষ্ঠ মুনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন, বিরক্ত হয়ে তিনি বলছেন এটা মুনির আশ্রম, এখানে এগুলো কি হচ্ছে। বশিষ্ঠ মুনিও সাধারণ কোন ঋষি ছিলেন না। ওনার আবার ব্রহ্মদণ্ড ছিল, যে দণ্ডের উপর হাত রেখে জপ করা হয় তাকে ব্রহ্মদণ্ড বলে। উনি তখন ব্রহ্মদণ্ডটাকে হাতে করে সামনের

দিকে তুলে ধরেছেন, তখন বিশ্বামিত্রের কাছে যত শিবের অস্ত্র-শস্ত্র ছিল সব ঐ ব্রহ্মদণ্ড শুষে নিয়েছে। বিশ্বামিত্রের তো দেখে মাথা ঘুরে গেছে, আমার নিক্ষেপ করা শিবের এত অস্ত্র এই দণ্ড শুষে নিল!

কিন্তু বিশ্বামিত্র পরে বিরাট ঋষি হয়েছিলেন। একেই তিনি রাজা ছিলেন, তারপর শিবের তপস্যা করে প্রচুর শিবের অস্ত্র-শস্ত্র পেয়েছিলেন, আর জয়া আর সুপ্রভার থেকে যত অস্ত্রের জন্ম হয়েছিল সব বিশ্বামিত্রের আজ্ঞাধীনে ছিল। বিশ্বের এমন কোন অস্ত্র ছিল না যেটা বিশ্বামিত্রের অধীনে ছিল না। এখনও শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি কোন অস্ত্র দেননি। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষমতাটা দেখে নিচ্ছেন, তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি তো অনেক, দেখি কতদূর যেতে পারে এই রাজকুমার। যখন দেখলেন এক বাণে তাড়কাকে বধ করে দিয়েছেন, তখন তাঁর একটু সম্বিৎ হয়েছে। বিশ্বামিত্র যদি কোন সাধারণ ক্ষত্রিয় কুমারকে নিয়ে আসতেন তাহলে তাড়কার ঐ বিকট ভয়ঙ্কর রূপ দেখেই সব ছেড়েছুড়ে আগেই পালাত। আর সেখানে শ্রীরামচন্দ্র এক বাণে তাড়কাকে মেরে দিল, তাও আবার পুরোপুরি নিজের শক্তিতে। কেউ সাহায্য করেনি, এমন শক্তিমান তিনি। একটা কথা জেনে নেওয়া খুব দরকার, যে শক্তিমান হয় তাকেই শক্তি দেওয়া হয়। আমরা কোন গরীবের বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণে দুশ টাকার শাড়ি নিয়ে যাই, বড়লোকের বাড়ির বিয়েতে নিমন্ত্রণে গেলে দু হাজার টাকার শাড়ি নিয়ে যাই। তেলা মাথাতেই তেল পরে, সাধারণকে তেল দিয়ে কি হবে! যার আছে তাকেই দেওয়া হয়। যার নেই তাকে ভগবানও কিছু দেননা, কারণ ভগবান জানেন দিলেও সে নিতে পারবে না। সেইজন্য আগে নেওয়ার ক্ষমতাটা অর্জন করতে হয়।

এটাই মূল কথা। বিশ্বামিত্রও দেখলেন যে শ্রীরামচন্দ্রের ভেতরে শক্তি আছে। মহাভারতেও দ্রোণাচার্যের যত অস্ত্রবিদ্যা জানা ছিল, অর্জুনের শক্তি দেখে তিনি তাকেই সব শিখিয়ে দিলেন। অশ্বত্থামা একবার শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলছেন – হে কৃষ্ণ, আপনি আপনার চক্রটা আমাকে দিয়ে দিননা। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র আসলে অস্ট্রেলিয়ানদের ব্যুমেরাং যে খেলনা হয়, অনেকটা তার মত। বাচ্চারা ফ্রিজভী খেলে তার মত। গোল চাকতির মত থাকে, কেউ ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে একটা চক্কড় মেরে আবার তার কাছে ফিরে আসবে। শ্রীকৃষ্ণের চক্রটা আসলে বিরাট একটা ভারী চাকা। আর চাকার ধারে ধারে পুরো লোহার ফলা ক্ষুরের মত লাগান ছিল। শ্রীকৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল, ঐ চাকাকে যখন তিনি ঘুরিয়ে যার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিতেন তার গলাটা কেটে আবার শ্রীকৃষ্ণের কাছে ঘুরে চলে আসত। শ্রীকৃষ্ণের চক্রটা কত ভারী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এখানে – অশ্বত্থামাও ছিলেন বিরাট ক্ষমতাবান, তাঁর হাতেও ছিল ব্রহ্মাস্ত্র, সেই অশ্বত্থামা শ্রীকৃষ্ণকে গিয়ে বলছেন – আপনার কাছে বিশেষ ভাবে তৈরী যে চক্রটা আছে ওটা আমাকে দিয়ে দিন। শ্রীকৃষ্ণ একটু মুচকি হেসে বলছেন – ঐতো ঐখানে রাখা আছে নিয়ে যাওনা, কে বারণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ যে চক্রকে আঙ্গুলে রেখে চালাতেন, অশ্বত্থামা সেই চক্রকে শুধু তুলতে গেছেন, তুলতেই পারলেন না। তারপর দু-হাতে লাগিয়ে তুলতে গেছেন, তাও পারলেন না, তারপর ভরত্তোলকদের মত বুক লাগিয়ে দম নিয়ে তুলতে গেছেন, কিন্তু চক্রকে তুলবেন কি, একটু নড়াতেও পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – তুমি যদি তুলতেই না পার তাহলে তুমি আর কি করে নেবে! চক্র এমনই ভারী যে, অশ্বত্থামার ক্ষমতাতেই কুলাল না ওটাকে তুলে নেবে, চালানোর কথা তো অনেক দূরের ব্যাপার। তবে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র মন্ত্র শক্তিতে চালাতেন না, এর পুরোটাই শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব কুশলতা, ক্ষমতা আর দক্ষতার উপরেই চলত। শ্রীকৃষ্ণের এত শারীরিক শক্তি ছিল যে যেটা অশ্বত্থামা দু-হাত দিয়ে তুলতে পারলেন না, সেটাকে তিনি আঙ্গুলে রেখে অনায়াসে চালাতেন।

শ্রীরামচন্দ্রের ঐ বাণ চালান দেখে বিশ্বামিত্র খুব মিষ্টি করে বলছেন – **পরিতুষ্টোঽহস্মি ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ। প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ।।**১/২৭/২। বিশ্বামিত্র তো এর আগে দেখেননি শ্রীরামচন্দ্রের কি প্রচণ্ড শক্তি। হে রাজপুত্র! তোমার তীর চালানো দেখে আমি খুব খুশি হলাম, যেভাবে তাড়কাকে বধ করে দিলে এরজন্য তুমি সত্যিই প্রশংসার যোগ্য, আমার ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য তুমি। এই নাও আমার যত অস্ত্র আছে সব তোমাকে আমি দিয়ে দিলাম।

প্রথমে শ্রীরামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র দিয়েছিলেন বলা ও অতিবলা, কারণ শ্রীরামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য নিয়ে এসেছেন, তাই শ্রীরামের নিরাপত্তা রক্ষার দায়ীত্ব বিশ্বামিত্রের। বলা ও অতিবলা দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে সব দিক দিয়ে সুবিধা করে দিয়ে তাঁর নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে দিলেন, আর তোমার ক্ষিদে হবে না, তোমার জলতেষ্টা পাবে না, তোমার ঘুমের কষ্ট হবে না, কোন শত্রু তোমার অসাবধনতার সুযোগ নিয়ে তোমাকে মারতে পারবে না ইত্যাদি। এর পরে তিনি সব অস্ত্রগুলি শ্রীরামের কাছে ছেড়ে দিলেন। কাশীপুরে নরেনকে সর্বস্ব দেওয়ার আগে শ্রীরামকৃষ্ণও নরেনকে প্রথমে অনেক ভাবে পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। তারপরেই স্বামী বিবেকানন্দের শক্তির খেলা শুরু হল।

বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আমি তোমাকে কি দিচ্ছি। এক এক করে সব অস্ত্রকে বুঝিয়ে দিয়ে বিশ্বামিত্র বলছেন – এই যে অস্ত্রগুলো তোমায় দিচ্ছি, যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতা হোক, গন্ধর্ব হোক, যক্ষ হোক, অসুর হোক, নাগ হোক সে যেইই হয়ে থাক না কেন, কেউই তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। **তানি দিব্যানি ভদ্রং তে দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ**।১/২৭/৪ – তোমার মঙ্গলের জন্য স্বর্গীয় দিব্য অস্ত্র সকল তোমায় আমি দান করছি। আর কি কি তোমাকে দিচ্ছি? **দণ্ডচক্রং ধর্মচক্রং কালচক্রং বিষ্ণুচক্রং ইন্দ্রচক্রং** – এটাই বাল্মীকির কাব্যের মাধুর্য, তাঁর কবিতার প্রতিটি লাইন ছন্দের মুর্ছনাতে সমৃদ্ধ। এই শৈলীই পরে ব্যাসদেব মহাভারত আর পুরাণে ব্যবহার করেছেন। যত চক্রের কথা বলা হয়েছে এগুলো আদপে আছে কিনা আমরা কেউই জানিনা, কিন্তু বাল্মীকির বর্ণনার মধ্যে যে কাব্যিক ছন্দ সেটা দেখার মত।

তারপরে বলছেন – **ধর্মচক্রং ততো বীর কালচক্রং তথৈব চ। বিষ্ণুচক্রং তথাত্যুগ্রমৈন্দ্রচক্রং তথৈব চ।।** ১/২৭/৫। এখানে বাল্মীকি একবারও অস্ত্রের নাম বলছেন না, চক্র চক্র বলে উল্লেখ করে যাচ্ছেন, কবিতার সৌন্দর্য কাকে বলে এখানেই বোঝা যায়। বিশ্বামিত্র বলছেন আর কি কি তোমাকে দিচ্ছি - **বজ্রমস্ত্রং নরশ্রেষ্ঠ শৈবং শূলবতং তথা। অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ঐষীকমপি রাঘব।।**১/২৭/৬ এইভাবে বিরাট লম্বা একটা ফিরিস্তি দিচ্ছেন। তোমাকে আমি ইন্দ্রের বজ্র দিচ্ছি, শিবের ত্রিশূল দিচ্ছি, ব্রহ্মার ব্রহ্মশির দিচ্ছি ইত্যাদি বিরাট লম্বা তালিকা।

কবি হিসাবে বাল্মীকির পর এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত কবি এসেছেন তাদের কারুরই সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায় না। বিশ্বে তিনিই যে প্রথম কবিতা লিখেছেন বলে এই কথা বলা হচ্ছে তা নয়, সব দিক দিয়েই তিনি কবি রূপে অতুলনীয়। সুযোগ হলে বাল্মীকি রামায়ণ আমাদের সবারই একবার পড়া উচিৎ, যদিও সংস্কৃতে কিন্তু ওনার সংস্কৃত অত্যন্ত সহজ সরল সংস্কৃত, বেদ বা উপনিষদের সংস্কৃত যেমন খুব কঠিন সেই তুলনায় বাল্মীকি রামায়ণের সংস্কৃত এত সহজ যে পড়লে মনে হবে যেন বাংলাই পড়ছি, যদি অনুবাদ নিয়ে পড়া যায় তাহলে আরও ভালো লাগবে। কবির কল্পনা কোথায় যায় আর সেখানে গিয়ে শব্দ, অর্থ, ভাব ও ছন্দের মেল বন্ধন কত মাধুর্যময় হতে পারে বাল্মীকি রামায়ণ না পড়লে বোঝা যাবে না। বাল্মীকি রামায়ণের যে কোন একটা সর্গকে বেছে নিয়ে পাঠ ও চিন্তন করা যায় তাহলে সেই কবিতা দিয়ে যে কোন কবিমনস্ক ব্যক্তি নিজের মত কবিতা রচনা করে দিতে পারবেন। পরের দিকে দণ্ডী বলে একজন নামকরা কবি ছিলেন তিনি কবিতার অনেক শ্রেণিবিন্যাস করেছিলেন – কবিতা কাকে বলা হবে, কবিতার কি কি গুণ থাকতে হবে, কবিতার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকবে, কবিতার ছন্দ কত রকমের হবে, কবিতার যে রসবোধ আস্বাদন করা যাবে, সেই রস কেমন থাকবে। তিনি পুরোপুরি এই বাল্মীকি রামায়ণের উপরে আধার করে এইভাবে কবিতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। কবিতার যত রকমের বিশেষত্ব থাকা দরকার, বাল্মীকি রামায়ণে কবিতার সমস্ত রকমের বিশেষত্বর একত্র সমাবেশ দেখা যায়।

আর কি কি দিচ্ছেন? বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন কামদেবের মদনাস্ত্র দেব, গন্ধর্বদের প্রিয় মানবাস্ত্র দেব, পিশাচদের প্রিয় মনাস্ত্র দেব। বাল্মীকি রামায়ণের দেড় পাতা জুড়ে খালি বিভিন্ন অস্ত্রের বর্ণনা করে গেছেন বাল্মীকি।

সব অস্ত্র শ্রীরামচন্দ্রকে দেওয়া হয়ে গেছে। শ্রীরামচন্দ্র হলেন ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের মনের মত জিনিষ হল অস্ত্র-শস্ত্র, মনের মত জিনিষ পেয়ে শ্রীরামচন্দ্রের চেহারাতে তেজ এসে গেছে, মন আনন্দে ভরপুর হয়ে গেছে। বলছেন – **প্রহৃষ্টবদন শুচিঃ** – শ্রীরামচন্দ্রের এক গাল হাসি বেরিয়ে গেছে। যে কোন মানুষই যখন মনের মত জিনিষ পেয়ে যায় তার মন স্বাভাবিক ভাবেই খুশি হয়ে যায়। এখনতো সব অস্ত্র শ্রীরামচন্দ্রের কছে এসে গেছে, কিন্তু এর প্রয়োগ বিধি আর চালানর কৌশলটাও তো জানতে হবে। তখন শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে বলছেন প্রত্যেকটি অস্ত্রের চালাবার কৌশলটা আমাকে শিখিয়ে দিন। এগুলো তো আর বন্দুক বা পিস্তল নয় যে ট্রিগার টিপে দেবে আর বুলেট বেরিয়ে আসবে, তীর ধনুকও নয় আর বর্শা বা তরোয়ালও নয়। তখন বিশ্বামিত্র একটা একটা করে অস্ত্র তুলছেন আর তার চালাবার কৌশল দেখিয়ে দিচ্ছেন। এখানে যে কত রকমের অস্ত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এর কোনটারই নাম আমরা কোন দিন শুনিনি; গুটি কয়েক নাম এখানে বলা হচ্ছে – **সত্যবন্তং সত্যকীর্তিং ধৃষ্টং রভসমেব চা। প্রতিহারতরং নাম পরাঙ্মুখমবাঙ্মুখম্।।**১/২৮/৪। অস্ত্রের কত রকম নাম হতে পারে, সত্যবন্ত, সত্যকীর্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহার, পরাঙ্মুখ, বাঙ্মুখ ইত্যাদি। সব অস্ত্রের নাম উল্লেখ করে বলছেন এরা সবাই জয়া আর সুপ্রভার সন্তান, এরা একাই সব কিছুকে শেষ করে দিতে পারে, আর ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – **দিব্যভাস্বরদেহাশ্চ মূর্তিমন্তঃ সুখপ্রদাঃ।। ১/২৮/১১**। শ্রীরামচন্দ্র যখন প্রত্যেকটি অস্ত্রকে গ্রহণ করছেন তখন প্রতিটি অস্ত্রের শরীর দিব্য কান্তিতে জ্বলজ্বল করছে। সাধারণ মানুষ দেখছে শ্রীরামচন্দ্র একটা তীর নিচ্ছেন, কি একটা কুঠার নিচ্ছেন কিন্তু যাদের দিব্যদৃষ্টি আছে তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ঐ অস্ত্রের চারিদিকে একটা দেবতার জ্যোতির্ময় শরীর ঘিরে রেখেছে, জ্যোতি যেন অস্ত্র থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে, ভয়ানক কান্তিময়। এই অস্ত্রগুলোর মধ্যে কোন কোন অস্ত্র আগুনের মত ধকধক করে জ্বলছে, কিছু অস্ত্র ধুয়োর মত কাল, কিছু কিছু অস্ত্র সূর্যের মত আলো বিকিরণ করছে, আবার কোন কোন অস্ত্র চাঁদের মত স্নিগ্ধ আলো ছড়াচ্ছে। এই বর্ণনাটাই বাল্মীকি কি সুন্দর কবিতায় বলছেন – **কেচিদঙ্গারসদৃশাঃ কোচিদ্ধূমোপমাস্তথা। চন্দ্রার্কসদৃশাঃ কেচিৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটাস্তথা।। ১/২৮/১২**।

সব অস্ত্রগুলো আগে বিশ্বামিত্রের অধীনে ছিল কিন্তু এখন শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত অস্ত্রের প্রভু হয়ে গেছেন। এখন সব অস্ত্র হাতজোড় করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেছে। ভৃত্য যেমন প্রভুর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে থাকে প্রভুর কোন্ আজ্ঞা তাকে পালন করতে হবে। অস্ত্রগুলিও যেন শ্রীরামচন্দ্রের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে – বলুন আমরা আপনার কি আদেশ পালন করব। আসলে এরা সবাই দেবতা, এগুলো সাধারণ কোন অস্ত্র নয়, এরা সবাই অস্ত্র দেবতা। দুর্গাপূজার সময় মা দুর্গার সব অস্ত্রেরও পূজা করা হয়, কারণ দেবীর সব অস্ত্রও দেবতা কিনা। এখানেও সমস্ত অস্ত্র দেবতা শ্রীরামচন্দ্রকে হাতজোড় করে বলছে 'হে নরশার্দুল! হে পুরুষসিংহ! আমরা আপনার দাস, বলুন আমরা আপনার কি সেবা করতে পারি'। শ্রীরামচন্দ্র তিনি নিজেও এত বিচিত্র ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র কখন দেখেননি, উনিও বিস্মিত হয়ে গেছেন, শ্রীরামচন্দ্রও ঐ তেজকে সামলে উঠতে পারছেন না। উনি তখন তাড়াতাড়ি করে বলছেন – **গম্যতামিতি তানাহ যথেষ্টং রঘুনন্দনঃ। মানসাঃ কার্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ।।**১/২৮/১৪ – আপনারা এখন নিজের নিজের ধামে ইচ্ছামত চলে যান। যখনই আমি প্রয়োজন মনে করব আমি আপনাদের আহ্বাণ করা মাত্র চলে আসবেন। শ্রীরামচন্দ্রের এই আজ্ঞা পাবা মাত্র সবাই তাঁদের প্রভুকে পরিক্রমা করে সবার বাসস্থান স্বর্গে চলে গেলেন। যখনই শ্রীরামচন্দ্র যাকে ডাকবেন সে তখন চলে এসে যাকে মারার মেরে দিয়ে আবার চলে যাবে, যতবার ডাকবেন ততবারই তারা আসবে। অস্ত্র দেবতার আরেকটি শর্ত হল, যদি তপস্যা করা না থাকে তাহলে এগুলো তাঁর কাছে থাকবে না। আর তপস্যা যদি দুজনের সমান থাকে তখন যার মনে পবিত্রতা বেশি থাকবে তার তত শক্তি বেশি হবে।

এরপর বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে চললেন তাঁর নিজের আশ্রম সিদ্ধাশ্রমে। সিদ্ধাশ্রমে পৌঁছে বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষণকে বলছেন, আমি যে এই যজ্ঞ করছি, মানবকল্যাণের জন্যই আমার এই যজ্ঞ,

এছাড়া আর কোন আমার নিজস্ব উদ্দেশ্য নেই। শ্রীরামচন্দ্রও এখন অস্ত্রের শক্তিতে পুরো শক্তিমান হয়ে গেছেন। এরপর সিদ্ধাশ্রমে বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করতে বসেছেন। আশ্রমের অন্যান্য ঋষিরা বলছেন এবার আমরা যজ্ঞ শুরু করছি। শ্রীরাম আর লক্ষ্মণ তখন খুবই ছেলেমানুষ, মাত্র ষোল বছরের কিশোর। দুজনেই খুব উৎসাহে চিৎকার করে বলছে – কোথায় রাক্ষস, রাক্ষসগুলি কোথায় গেল, ওদের ডাকুন যুদ্ধের জন্য। ঋষিরা বলছেন – ওদের ডাকতে হবে না, এক্ষুনিই চলে আসবে। যজ্ঞ শুরু হবার আগে বিশ্বামিত্র যজ্ঞের দীক্ষা নিয়ে মৌন হয়ে গেলেন। বারো দিন ধরে এই যজ্ঞ চলবে, এই বারো দিন বিশ্বামিত্র আর মুখ খুলবেন না, এই বারোটা দিনের মধ্যে যে কোন সময় ঐ রাক্ষসরা আক্রমণ শাণাতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র এখন বলা ও অতিবলা পেয়ে গেছেন, তাই ঘুমের কোন সমস্যা নেই। যজ্ঞ চলছে, শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণও ছটি দিন আর ছটি রাত না ঘুমিয়ে সর্বক্ষণ চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে পাহারা দিয়ে চলেছেন।

তারপর একটা সময়ে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্য করলেন সুবাহু আর মারীচ নামে দুটি রাক্ষস যজ্ঞস্থলের দিকে তেড়ে আসছে আর নানান রকম মায়ার বিস্তার করছে। শ্রীরামচন্দ্র তক্ষুনি ভাই লক্ষ্মণকে সাবধাণ করে বলে দিলেন – ঐ ওরা দুজন আসছে। ভাই, তুমি দাঁড়িয়ে দেখতে থাক কিভাবে আমি এদের শেষ করছি। দুই ভাইই ক্ষত্রিয় আবার রাজার সন্তান, সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আগে থেকেই এনারা যুদ্ধে বিশারদ ছিলেন, তার ওপরে শ্রীরামচন্দ্র এখন আবার সমস্ত দিব্যাস্ত্রদের প্রভু। লক্ষ্মণের কাছে অবশ্য কোন দিব্যাস্ত্র ছিল না। তখন শ্রীরামচন্দ্র প্রথমেই মানবাস্ত্র ধারণ করে নিলেন, ধারণ করে নিয়েই তিনি মারীচের উপরে সেই অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। মারীচের উপর মানবাস্ত্র মারতেই বলছেন যে মারীচ একশ যোজন দূরে সমুদ্রের ধারে গিয়ে ছিটকে পড়ল। এই ঘটনা চলছে গোরক্ষপুরের কাছে, অর্থাৎ মারীচ গোরক্ষপুর থেকে ছিটকে পড়ল গঙ্গাসাগরে বঙ্গপোসাগরের কাছে। এগুলো আসলে বাল্মীকির কাব্যিক বর্ণনা, কিছু কিছু জিনিষ আমাদের কবিতা বলে মেনে নিতে হবে। একটা দৃশ্য ও ভাবকে পাঠকের মনে গভীর ভাবে দাগ ফেলার জন্য কবিতায় অনেক কিছুকেই অতিরঞ্জিত করে বলা হয়। এসব ব্যাপারে কবিদের অনেক স্বাধীনতা দেওয়া থাকে। কবি নারীর মুখকে চাঁদের সাথে তুলনা করে বলবে চন্দ্রমুখী। কিন্তু কোন মেয়ের মুখ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ চাঁদের আলো বেরোতে দেখেছে? কিন্তু কোন মেয়েকে চন্দ্রমুখী বললে কী মিথ্যা কথা বলা হবে? না, এটাই কবিতা। বিয়ের আগে যখন মেয়েকে প্রথম দেখে তখন বলে চন্দ্রমুখী, বিয়ের পরে সেই মুখ হয়ে যায় সূর্যমুখী, আর বিয়ের কয়েক বছর বাদে সেই মুখ চন্দ্রমুখী ও সূর্যমুখী থেকে হয়ে যায় জ্বালামুখী। এটাই কবির কল্পনা। আর বাল্মীকি হলেন, কবি মনে যত রকম কল্পনা ডানা মেলতে পারে, সব কল্পনার ভিত্তি। পরে যারা কবিরা এসেছেন সবাই বাল্মীকিকে অনুসরণ করেই কবিতা রচনা করেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রের সব কিছুকে আক্ষরিক সত্যি বলে মেনে নিতে নেই, এর সারটাই নিতে হয়। সার কথা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে শক্তি আছে। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গুলিই দেখার ও ভাবার জিনিষ। কিন্তু শুধু তত্ত্ব কথা যদি জানতে হয় তাহলে বেদ উপনিষদ পড়তে হবে। স্মৃতিগ্রন্থের সব কিছুই আক্ষরিক অর্থে নিলে চলবে না, স্মৃতি শাস্ত্রকাররাই নিষেধ করেন।

এখানে মজার ব্যাপার যেটা তা হল, শ্রীরামচন্দ্রও জানতেন না কোন্ অস্ত্র কিভাবে কাজ করে, কারণ হঠাৎ করে এগুলো ওনার হাতে চলে এসেছে। অস্ত্র গুলির চালাবার কৌশল শ্রীরামচন্দ্রকে তাড়াতাড়ি করে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এক একটা অস্ত্রের পরিণাম এক এক রকম। শ্রীরামচন্দ্র প্রথমেই মানবাস্ত্র প্রয়োগ করলেন, এর নাম শীতেষু, অস্ত্র নিক্ষেপের আগেও শ্রীরামচন্দ্র জানতেন না এর পরিণাম কি হবে। অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, এই অস্ত্র প্রয়োগ করার পরই লক্ষ্মণকে বলছেন – **পশ্য লক্ষ্মণ শীতেষু মানবং মনুসংহিতম্** – লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, দ্যাখো, এই যে বাণ মেরেছি - **মোহয়িত্বা নয়ত্যেনং ন চ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে।।১/৩১/২০** – এই দ্যাখো এই বাণ মারীচকে মোহগ্রস্ত করে দিয়েছে, মোহগ্রস্ত করে ঘোরাচ্ছে, প্রাণটুকু কিন্তু হরণ করছে না। দিব্যাস্ত্র কোনটা কিভাবে কাজ করবে শ্রীরামচন্দ্রের তখনও কোন ধারণাই ছিল না। তিনি ক্ষত্রিয়কুলের রাজপুত্র, এত দিন শুধু তীর মেরে এসেছেন।

পরের দিকে যারা রামায়ণ রচনা করেছেন, সে অধ্যাত্ম রামায়ণই হোক বা তুলসীদাসের রামায়ণই হোক সেখানে বর্ণনা করা হচ্ছে – শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন মারীচ অগ্রসর হচ্ছে। তিনি চিন্তা করলেন মারীচকে মেরে দিলে আমার লীলা কি করে এগোবে, তাই একে আমার বধ করা চলবে না। প্রাণে না মেরে এমন এক ধাক্কা মারব যে সে যাতে অনেক দূর ছিটকে পড়ে, আর আমার লীলা কাহিনীও চলতে থাকবে। তখন তিনি একটা ভোঁতা বাণ দিয়ে এমন জোরে মারলেন তাতেই মারীচ অনেক দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে গেল। কিন্তু এখানে বাল্মীকি তা বলছেন না। শ্রীরামচন্দ্র নিজেও জানতেন না এই দিবাস্ত্রের কি পরিণাম হবে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে যদি অবতার রূপে দেখাতে হয় তাহলে তাঁকে সব কিছুই জানতে হবে, সেইজন্য পরের দিকে এসে কাহিনী পাল্টে গেল। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – জমিদার বাবু আলের উপর দিয়ে যেতে যেতে পা পিছলে পরে গেছেন, এখন জমিদারের মোসায়েবরা হাসাহাসি করবে ভেবে তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বলছেন – উর একটা মানে আছে। মানে, তিনি যে পরে গেলেন এরও একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। যারা মুর্খ তারা মুর্খদের মুর্খ বানানর জন্য এই জিনিষই করে। এক সাধু কেলেঙ্কারীতে ধরা পড়ে গিয়ে বলছেন – আমি তন্ত্র প্র্যাক্টিস করছিলাম। এখন আবার বলছেন – আমি তো পুরুষই না। নানান রকমের আজগুবি ব্যাখ্যা করে নিজের কুকীর্তি চাপা দিতে চাইছে।

যারা মহাত্মা হয়ে যান তাঁদেরও সব জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তাঁরা যেখানে নিজেদের বুদ্ধিকে লাগাবেন চট করে সেই জিনিষের রহস্যকে উদ্ঘাটন করে দিতে পারবেন। শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ হয়েছে। তিনি প্রয়োগটা সঙ্গে সঙ্গে করে দিলেন, যখন মারীচ ছিটকে পড়ছে তখন তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্মণকে বলছেন – দ্যাখো দ্যাখো, এর প্রাণ হরণ না করে মারীচকে ছিটকে ফেলে দিয়ে মুর্চ্ছিত করে দিচ্ছে। তারপরেই তিনি কত তাড়াতাড়ি আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিলেন, তুলেই সুবাহুর দিকে মারলেন। এখানে সুবাহুকে মারতেই সে শেষ হয়ে গেল। তারপরে বায়ব্যস্ত্র তুলে নিলেন, তিনি নিজেই জানেন না কোন্ অস্ত্রে কি কাজ হয়, এই সুযোগে সব দেখে নিচ্ছেন কোন্ অস্ত্রের কি পরিণাম। কারণ এমনিতে অকারণে খোলা আকাশে এগুলোকে চালান যায় না। এই ব্যাপারে মহাভারতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। অর্জুন যখন স্বর্গ থেকে সব দিব্যাস্ত্র নিয়ে এসেছেন তখন যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলছেন – ভাই, দিব্যাস্ত্রগুলি কেমন একবার এমনি মেরেই দেখাও না! দাদাকে দেখাবার জন্য যখনই একটা দিব্যাস্ত্র নিয়ে অর্জুন আকাশের দিকে সন্ধান করেছেন তখুনি নারদ দৌড়ে এসে বলছেন – হে অর্জুন, এসব দিব্যাস্ত্র ছেলেখেলার জিনিষ নয়, এগুলোকে নিয়ে খেলা করতে যেও না, ছেলেমানুষীর মত মজা করবার জন্য এগুলো নয়। শ্রীরামচন্দ্রও ঠিক তাই করছেন। তিনি ছেলেমানুষী করছেন না, এখানে রাক্ষসরা আক্রমণ করেছে, যুদ্ধ হচ্ছে, তাই একটা সুযোগ এসে গেছে, কিছু দিব্যাস্ত্রকে পরীক্ষামূলক ভাবে দেখে নেওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন। পরীক্ষা করাও হয়ে গেল আর সাথে সাথে সব রাক্ষসদের মেরে পিটিয়ে বার করে দিয়ে যজ্ঞের বিঘ্ন গুলিকে বিনষ্ট করে দিলেন। সেইজন্য এবারে বিশ্বামিত্র যজ্ঞকে পূর্ণাঙ্গ রূপে সমাপ্ত করতে সক্ষম হলেন।

যজ্ঞ সমাপ্তের পর বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে নিয়ে আশ্রম থেকে বেরিয়ে চলতে শুরু করলেন। চলতে চলতে বিশ্বামিত্র দুজনকে নানান রকমের কাহিনী, বিভিন্ন জায়গার ইতিহাস, সেই জায়গার কি কি মাহাত্ম্য সব বর্ণনা করে যাচ্ছেন। যেতে যেতে একটা বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন – **অলঙ্কারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা। দুষ্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ।।**১/৩৩/৭। নারী হোক আর পুরুষই হোক, তার আভূষণ হল ক্ষমা। আসলে বিশ্বামিত্রের মুখ দিয়ে বাল্মীকি তাঁর নিজের চিন্তা ভাবনার কথা বলছেন। এই ছবিটাই মহাভারতে বারবার নিয়ে আসা হয়েছে – ক্ষমা, সত্য, তপঃ এই জিনিষগুলোর উপর জোর দিয়ে অনেক বার বলে বলে শেষে ক্ষমাকেই শ্রেষ্ঠ বলা হবে। এই জিনিষগুলোকে বাল্মীকিই প্রথম নিয়ে এসেছেন। বিশ্বামিত্র বলছেন ক্ষমা করে দেওয়ার মত কিছু হতে পারে না, বাল্মীকি শ্লোকে বলছেন – **ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ।।** ১/৩৩/৮।

আরও বলছেন – **ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমায়াং বিষ্ঠিতং জগৎ।** ১/৩৩/৯। এই সমগ্র জগৎ ক্ষমাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

একটা জায়গায় একজন মন্তব্য করছেন – ভারতীয় নারী সব কিছুকে সহ্য করে নেবে। শাশুড়ী তার উপর অত্যাচার করে সহ্য করে নেবে, সারাদিন সংসারে খাটাখাটনি করে পেট ভরে খেতে পায়না সহ্য করে নেবে, স্বামী তাকে অবহেলা করে তাও সহ্য করে নেবে। কিন্তু যখন তার সন্তানের কোন ব্যাপার আসে, সন্তান হয়তো বিরাট কোন অন্যায় করেছে, তার বাবা এখন তাকে শাস্তি দেবার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তখন তার মাকে আর কেউ আটকাতে পারবে না, সন্তান যত অন্যায়ই করুক না কেন, অন্যায় করার পর মাকে বলে থাকুক আর নাই থাকুক যে, মা আমি এই অন্যায় করে ফেলেছি, এটাও মাকে বলতে হয় না, তবুও মা সন্তানকে সব সময় ক্ষমা করে দেয়। শুধু ক্ষমাই করে দেয়না, যে শাশুড়ীর ভয়ে বৌমা আতঙ্কিত হয়ে থাকে, যে স্বামীর কাছে কখন মুখ খোলে না, বাড়ির কারুর বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না, কিন্তু যখন সন্তানের কোন ব্যাপার আসবে মা একেবারে সিংহী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। মা নিজের সন্তানের প্রতি ক্ষমায় এমন প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেটাই পরে ধীরে ধীরে বিস্তার করে সবারই প্রতি, শাশুড়ীর প্রতি, ননদদের প্রতি, দেওর, ভাসুরের প্রতি, স্বামীর প্রতি এই ক্ষমা ভাবটা ছড়িয়ে যায়। তাই ভারতীয় সমাজে সন্তান না হওয়া পর্যন্ত কোন নারীকে তার নারীত্বের পূর্ণতা প্রাপ্তির মর্যাদা দেওয়া হয় না। নারীর যখন সন্তান হয়ে যায় তখনই বুঝতে পারে ক্ষমা কাকে বলে। ভারতে মায়ের স্থান এই কারণেই সব কিছুর থেকে উপরে রাখা হয়েছে। ঠাকুর মেয়ে দেখলেই বলতেন সাপ আসছে, আর বলতেন তুমি তোমার লেজ দেখাও মা। মানে তুমি আমার সামনে দাঁড়িও না, পেছন দেখাও। অথচ যখন মাতৃরূপে কোন নারী আসে তখন তার মত আর কেউ নেই, কারণ তাদের কাছে *ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ*, দান করা একটা বিরাট পূণ্য, তেমনি সত্য পালন, যজ্ঞ করা সবই পূণ্য, কিন্তু ক্ষমার মত পূণ্য আর কোন কিছুতে হয় না। ক্ষমা দিয়েই যশ, ধর্মাচরণ সব কিছুই হয়ে যায়। যিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তাঁর মত পূণ্যবান মানুষ জগতে আর কেউ নেই।

মহাভারতে দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠিরের সংলাপে, যুধিষ্ঠির ও পিতামহ ভীষ্মের সংলাপে ক্ষমা নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলছেন রাজাকে সব সময় ক্ষমা করতে নেই। রাজা যদি সব সময় ক্ষমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে আবার অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ হিসাবে তুমি সবাইকে ক্ষমা করবে, যা কিছুই হয়ে যাক না কেন সব সময় ক্ষমা করে যাবে। ক্ষমা যদি কর তাহলে সত্যের যা ফল তা তুমি পাবে, দানের যত ফল হয় তা তুমি পাবে, যজ্ঞ করে যা ফল পাবে তাও তুমি শুধু ক্ষমা দিয়ে পেয়ে যাবে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা এসব করলে কি হয়? মানুষ যশ লাভ করে, মানুষ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু একমাত্র ক্ষমাতে যদি তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও তাহলে এগুলো স্বাভাবিক ভাবেই তোমার কাছে চলে আসবে। এই জিনিষ গুলিকে নিয়েই বাল্মীকির চিন্তন প্রণালী কাব্যিক রূপ নিয়ে এগিয়ে গেছে।

এইভাবে বিশ্বামিত্র দুজনকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। এক জায়গায় এসে ওনারা সবাই শোনভদ্র নদী পার হলেন। যেতে যেতে নানা কাহিনীও চলছে। গঙ্গার উৎপত্তির কথা শোনাচ্ছেন। গঙ্গার উৎপত্তির ইতিহাস বলতে গিয়ে বাল্মীকি কয়েকটি ব্যাপার উল্লেখ করছেন, যেগুলো আমাদের জেনে রাখা দরকার। মেনা ছিলেন হিমবানের স্ত্রী। হিমবানের দুটি কন্যা, বড় মেয়ের নাম গঙ্গা আর ছোট মেয়ের নাম উমা। পরের দিকে পুরাণে আমরা দেখতে পাই হিমবান আর মেনার একটিই মেয়ে, যার নাম উমা। এটাই আমরা জানি। কিন্তু বাল্মীকি গঙ্গাকেও হিমবানের কন্যা বলছেন।

দেবতারা হিমবানকে গিয়ে বলল – আমাদের কার্যসিদ্ধির জন্য আপনার বড় মেয়েকে আমাদের দিয়ে দিন। হিমবান দেবতাদের আবেদনে রাজী হয়ে বললেন – ঠিক আছে, আপনারা আমাদের বড় মেয়েকে নিয়ে যান। কিন্তু গঙ্গাকে অবতরণ করাবে কিভাবে। এখান খুব সুন্দর বাল্মীকি বলছেন – **স্বছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া।**।১/৩৫/১৭। ঐ সময় গঙ্গা *স্বছন্দপথগাং*, মানে নিজের

খেয়াল খুশি মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাঁধন ছাড়া হয়ে চলত। এখানে দুটো জিনিষ আমরা পাচ্ছি – একটা হল গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে আর দ্বিতীয় তখন তার গতি ছিল নিজের মত বাঁধন ছাড়া, *স্বচ্ছন্দপথগাং*। কয়েক বছর আগে বিহারে কোশি নদী হঠাৎ তার গতি পথ পরিবর্তন করে নেয়, যার ফলে বিহারে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছিল। কেন কোশি নদী গতি পাল্টে নিয়েছিল? কারণ কোশি নদী *স্বচ্ছন্দপথগাং*। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলা হয় যে নদীগুলোর নতুন উৎপত্তি হয়, সেই নদীগুলো প্রথম অবস্থায় *স্বচ্ছন্দপথগাং* থাকে। নতুন নদীর গতিপথের ধারা ঠিক থাকে না। মেয়েদের মধ্যে যখন যৌবন আসে তখন তাদের হাঁটাচলাতে চঞ্চলতা, কথা বলাতে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস থাকে, সব কিছুতেই যেমন চপলতা বেশি থাকে ঠিক তেমনি নতুন নদী ছাড়া পেয়েই নিজের আনন্দে ধেয়ে চলে, আজ হয়ত এক দিক দিয়ে বইছে, দুদিন পরে অন্য দিক দিয়ে চলতে শুরু করবে। যখন অনেক বছর ধরে চলতে থাকে, চল্লিশ হাজার কি পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে চলতে চলতে তার ধারা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে একটা নির্দিষ্ট গতিপথ তৈরী করে নেয়। কোশি নদীও খুব পুরনো নদী নয়, সেদিনকার নদী। কখন কোন্ দিক দিয়ে বইবে কোন ঠিক নেই। গঙ্গাও তখন ছিল একেবারে যুবতী নদী, তাই গঙ্গা তখন *স্বচ্ছন্দপথগাং*। বাল্মীকি যখন রামায়ণ লিখছেন তখনও পরম্পরাতে মাথায় বসে আছে যে গঙ্গা হল *স্বচ্ছন্দপথগাং*। কারণ, বাল্মীকির আশ্রম ছিল কানপুরের কাছে, কানপুর সমতল ভূমি, সেখানে গঙ্গার ধারা পাল্টাতে তিনি দেখেছিলেন। এখনও ভাগলপুরের কাছে গঙ্গা সাত কিলোমিটার চওড়া অথচ কলকাতায় এক কিলোমিটারও চওড়া নয়। কারণ ভাগলপুরের কাছে কোন বছর নদী কোথা দিয়ে যাবে কোন ঠিক নেই, বালির চরা পরে গেলে গঙ্গা তার গতি ঘুরিয়ে দেয়। আর যখন বয়স অল্প থাকে তখন তার মধ্যে যৌবনের উদ্দাম বেশি থাকে বলে কখন কোন্ গতিপথ নেবে কোন ঠিক থাকে না।

হিমালয় থেকে নদী বেরিয়েছে, তার জলের তীব্র স্রোত রয়েছে, কিন্তু তার গতি পথ এখনও ঠিক হয়নি, নদীর কৈশোর অবস্থাতে এটাই হয়। বাল্মীকি এখানে জান্তেই হোক বা অজান্তেই হোক নদীর বৈশিষ্ট্যতার একটা ঐতিহাসিক রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা পরিষ্কার বলে দিতে পারি গঙ্গা হিমালয় থেকে নেমে হৃষিকেশ হয় হরিদ্বারে আসছে, সেখান থেকে কানপুর হয়ে, বারাণসী হয়ে, পাটনা হয়ে, মালদহ হয়ে বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগের গিয়ে মিশছে। কিন্তু প্রথম দিকে গঙ্গা আজকের মত এত নির্দিষ্ট গতিপথ বজায় রেখে চলত না। বাল্মীকির সময়ে গঙ্গা কিন্তু কৈশোর অবস্থা পেরিয়ে এসেছে, গঙ্গার কৈশোর অবস্থার গতিপথের কথা তিনি এখানে শ্রুতি থেকে নিচ্ছেন। সেইজন্য বলছেন আগেকার দিনে, কারণ জনমানসে যেটা একবার থেকে যায় সেটা সহজে মুছে যায় না, এখনও আমরা বলতে শুনি জানতো আগে নদী ঐ জায়গা দিয়ে বয়ে যেত, এই জিনিষটাকেই বাল্মীকি খুব সুন্দর আখ্যায়িকার মাধ্যমে উপস্থাপনা করে বলছেন, গঙ্গা *স্বচ্ছন্দপথগাং* ছিল।

দেবতারা তখন গঙ্গাকে নিয়ে চলে গেলেন। অন্য দিকে তার ছোট বোন উমা বিরাট তপস্যা করে রুদ্রকে পতি রূপে লাভ করেছেন। বেদে তখনও শিব আজকের শিব হননি যে শিবের মাথায় সবাই জল ঢালে। তখন তিনি বৈদিক দেবতা রুদ্র নামে অতি সাধারণ একজন দেবতা ছিলেন। বেদে ইন্দ্রই দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রের পরেই অগ্নিদেবতার স্থান, তারপর বরুণ, মিত্র ইত্যাদি। এই দেবতাদের অধীনে আরও কিছু সাধারণ দেবতারা ছিলেন তাদের মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্ররাও ছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে এসে এই অবস্থাটাই পাল্টাতে শুরু করে দিচ্ছে। আর মহাভারতে এসে বেদের দেবতাদের অবস্থান পুরোটাই পাল্টে গেল। আর মহাভারত যেটা ঠিক করে দিল সেটাই ভারতে স্থায়ী হয়ে গেল। বিষ্ণু হয়ে গেলেন সর্বোচ্চ দেবতা, শিব হচ্ছেন স্বতন্ত্র দেবতা কিন্তু মহাভারতে এদের দুজনের মধ্যে আর কোন মারামারি কাটাকাটি নেই। বাল্মীকি রামায়ণেও শিব আর বিষ্ণুর ঝগড়া বিবাদ আছে। রামায়ণে তখনও দেবতাদের ঠিক ঠিক স্থান নির্ধারিত না হওয়াতে, কে কোন্ পজিশানে যাবে এই নিয়ে বিবাদ বিতণ্ডা চলছিল।

একটা ইয়ং মেয়ে পার্টিতে যাবে বলে একটা খুব দামী সুন্দর পোষাক কিনেছে। ওর পছন্দের তারিফ করে সেলস্ গার্ল মেয়েটার খুব প্রশংসা করেছে। পরের দিনই ঐ পোষাকটাকে নিয়ে দোকানে

এসেছে ফেরত দেবে বলে। সেলস্ গার্ল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে – তুমি এটা ফেরত দিতে চাইছ কেন? ইয়ং মেয়েটি বলছে – এই ড্রেসটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের কথা আমার মা বাবারও এই ড্রেসটা খুব পছন্দ হয়ে গেছে, সেইজন্যই ফেরত দিতে এসেছে। এখনকার টিন এজারদের বাবা মা যদি কিছু পছন্দ করে কিনে দেন, ওরা আর কখনই ওটা পরবে না। বাবা মা যেটা পছন্দ করবে না, ওটাই ওরা পরবে। সমাজে এই বিদ্রোহ চিরকালই আছে। বাল্মীকির সময়ে এই বিদ্রোহ প্রারম্ভিক পর্যায়ে চলছিল, সেখানে ইন্দ্রকে ইতিমধ্যে ছোট করা শুরু হয়েছে। আর মহাভারতে ইন্দ্রকে একটা জোকার বানিয়ে ছেড়েছে।

বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি বিভিন্ন দেবতাদের নিয়ে যত প্রশংসা আর স্তুতি, সেখানে বিষ্ণুর কোন নামই নেই, ছোট্ট একটা দুটো জায়গা ছাড়া, রুদ্রেরও এই একই অবস্থা। রামায়ণ থেকেই এই অবস্থা পাল্টাতে পাল্টাতে মহাভারতে এসে ইন্দ্রাদি দেবতারা জোকার হয়ে গেল, পুরাণে তো দেবতাদের মহাভারতের থেকেও নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে হিন্দু ধর্ম যে জায়গাতে এসে দাঁড়িয়ে আছে, এই জায়গাতে আসার জন্য বাল্মীকির বিরাট অবদান রয়েছে। যদি প্রশ্ন করা হয় দেবতাদের এই অবস্থার জন্য কে দায়ী, বাল্মীকি না ব্যাসদেব? আসলে কেউই গোলমাল করেননি। এখানে মূল ব্যাপার হল অনন্তকে নিয়ে, ঈশ্বর যিনি তিনি অনন্ত। এখন এই অনন্তের যে মুখ, তাকে আমি এক রকম দেখব আবার আরেক জন অন্য রকম দেখবে। মহম্মদ আল্লার মধ্যে অনন্তকে দেখবে, যিশু তাঁর ফাদারের মধ্যে অনন্তকে দেখবে। বৈদিক ঋষিরা সেই অনন্তকে ইন্দ্রের মধ্যে দিয়ে দেখেছিলেন। আর বাল্মীকি সেই অনন্তকেই বিষ্ণুর মধ্যে দিয়ে দেখা শুরু করেছেন। ব্যাসদেব শিব আর বিষ্ণুর মধ্য দিয়ে দেখছিলেন। ঠাকুরের ভক্তরা সেই অনন্তকে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখছে। এখন যদি কেউ কারুর কোন মুখোশকে নিয়ে ঠাট্টা করতে শুরু করে দেয় তাহলে কিছু করার নেই। যার কবি প্রতিভা, ভাষার দখল আছে সে এখন যাকে নিয়ে খুশি ঠাট্টা করে মজা করে উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাতে হবেটা কি? কিছুই হবে না। অথচ যার নামে ঠাট্টা করা হচ্ছে তাকেই একজন সর্বোচ্চ দেবতা বলে উপাসনা করছে। আমরাও বলতে পারিনা যে বাল্মীকি দায়ী না ব্যাসদেব দায়ী। বাল্মীকি অনন্তকে এই রূপে দেখছেন। আবার বেদের বিভিন্ন ঋষিরা বিভিন্ন দেবতার মধ্যে সেই অনন্তকে আস্বাদন করতেন। এখন যে যেমন রূপে দেখেছেন, যার যেমন কবি প্রতিভা ছিল তিনি সেই ভাবে অনন্তকে প্রকাশ কবেন, তাঁর দেবতাও তেমন তেমন হয়ে গেছে। এখানে ভগবান যে নিজের ক্ষমতাতে বড় হচ্ছেন তা নয়, তাঁর ভক্তদের যেমন যেমন প্রতিভা আর ক্ষমতা থাকবে ভগবানও সেই ভাবে বড় হবেন। স্বামী ভূতেশানন্দজী প্রায়ই সন্ন্যাসী মহারাজদের বলতেন – তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, যারা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত নয় তারা তোমাদের মাধ্যমে ঠাকুরকে জানবে, সেইজন্য তোমরা খুব সাবধান, তোমার যদি মহৎ হও তাহলে লোকেরা জানবে ঠাকুরের ভক্তরা কত বড় মহাত্মা। ব্যবহারে, আচরণে, কাজে এমন যেন কখন না হয় যাতে লোকে বলতে পারে যে ঠাকুরের ভক্ত মানেই সব অপদার্থ। সাধারণ একটা ধারণা যে, যে ঠাকুরের ভক্ত হয়ে গেল সে সব কিছু ছেড়েছুড়ে চোখ, কান সব বন্ধ করে ধ্যান করবে। কিন্তু বাড়িতে ছেলে খেতে পাচ্ছে কিনা, মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা, বউয়ের শরীর খারাপ তার চিকিৎসা হচ্ছে কিনা, এই সব ব্যাপারে কোন খোঁজ নেই। এই নিয়েই ঠাকুর হাজরাকে গালাগাল দিচ্ছেন ঢ্যামনা শালা বলে।

আমি যখন ধর্মকে অবলম্বন করেছি, আমি দেখাচ্ছি যে আমি এখন ধর্মের লোক, তখন লোকে জানবে যে আপনি সব ব্যাপারে সবার ব্যাপারে সজাগ, আমরা মনে করি ধর্ম করলেই সব কিছুতে উদাসীন হয়ে যাব। লোকে যদি জিজ্ঞেস করে আপনি সব ব্যাপারে এত সাফল্য পান কি করে? তখন বলতে পারব আমি ধর্ম করি বলেই সফল হয়েছি। আবার যদি আমার নামে কোন খারাপ কিছু রটে যায় তখন সবাই বলবে ধর্মের মুখোশ পরে কিসব করে বেড়াচ্ছে। এইজন্য স্বামী ভূতেশানন্দজী বলে দিলেন খুব সাবধান থাকতে হবে। যখনই ঠাকুরকে অবলম্বন করে নিয়েছি, ধর্মকে গ্রহণ করে চলছি তখন খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে।

এদিকে উমা তপস্যা করে শিবকে পতি রূপে লাভ করেছেন। উমাকেই পরে পার্বতী নামে আমরা পুরাণাদিতে পাই। কিন্তু এখানে বাল্মীকি উমা নামই ব্যবহার করে গেছেন। অন্য দিকে উমার আবার কোন সন্তান হচ্ছে না বলে আবার তপস্যা করছেন। দেবতারা খুব ভয় পেয়ে গেছে, কারণ উমার যদি সন্তান হয় তাহলে আগুন লেগে যাবে। এখনো সেই শিব আজকের এই শিব নন, এখনও তিনি একজন সামান্য দেবতা মাত্র। দেবতারা গিয়ে শিবকে বলছেন – হে শিব! আপনি এত দিন সংযম করে আছেন, আপনি দয়া করে এই সংযমটাকে চিরদিনের মত ধরে রাখুন। আর তা নাহলে যদি উমার থেকে সন্তান হয়ে যায় তাহলে জগতে সর্বনাশ নেমে আসবে। কারণ আপনার এই তীব্র সংযমের পর উমার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নেবে সে এত শক্তিশালী হবে যে ত্রিভুবনে তাকে আর কেউ সামলাতে পারবে না। শিব তখন দেবতাদের আশ্বাস দিয়ে নিজেকে সংযমের মধ্যে ধরে রাখলেন। এদিকে উমার আর কোন সন্তান হল না। কিন্তু শিব তাঁর শক্তিটা গঙ্গার মধ্যে ছেড়ে দিলেন। গঙ্গায় তখন ছটি বোন স্নান করছিল, তারা মিলে শিবের ঐ শক্তিটাকে গ্রহণ করে গর্ভে ধারণ করে নিল। তাদের থেকে এই ছয় মাথাওয়ালা কার্তিকের জন্ম হল। এই কার্তিক হলেন শিবের পুত্র। একদিকে সে উমার পুত্র, কারণ উমাকে ধ্যানে দেখেই শিবের এই শক্তি স্খলিত হয়েছিল, আবার অন্য দিকে বলা হচ্ছে গঙ্গাপুত্র, যেহেতু গঙ্গাতে এই শক্তিকে তিনি ছেড়েছিলেন তাই কার্তিক হল গিয়ে গঙ্গার পুত্র।

দেবতাদের এই সব ব্যাপার বুঝে যেতেই উমা খুব রেগে গেছেন। রেগে গিয়ে তিনি দেবতাদের বলছেন 'হে দেবতারা' মানে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, 'তোমরা ভুলে যেও না যে, স্ত্রী স্বামীর সঙ্গ করে পুত্র প্রাপ্তির জন্য, তোমরা আমাকে পুত্র প্রাপ্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত করেছ, সেইজন্য আমি তোমাদের সবাইকে অভিশাপ দিচ্ছি, আজ থেকে তোমাদের স্ত্রীরাও আর কোন দিন সন্তান উৎপত্তি করতে পারবে না, তোমাদের স্ত্রীরা সবাই বন্ধ্যা হয়ে যাবে'। সেই থেকে দেবতাদের কোন সন্তান নেই। আর তার সাথে পৃথিবী দেবতাদের এই ব্যাপারে সহায়তা করেছিল বলে তাকেও উমা অভিশাপ দিলেন 'আজ থেকে তোমার একজন স্বামী থাকবে না, তোমার বহু মালিক হবে'। আজকের দিনের রাজারাই পৃথিবীর মালিক। আগে এই পৃথিবী ছিল না, তখন দ্যাবা পৃথিবী ছিল। উমা এত রেগে গেছেন যে, দেবতাদের সবাইকে এই অভিশাপ, আবার মহাভারতে পাই অগ্নিকে তিনি অভিশাপ দিয়ে দিলেন যে, আজ থেকে তুমি আর ঘি পাবে না, লোকেরা যত অখাদ্য কুখাদ্য খাবে সব তোমার মধ্যে দিয়ে দেবে। এটাই পরে গিয়ে হয়ে গেল, নারীর প্রথম সন্তান উৎপত্তির সময় হবে তখন যদি কেউ বিঘ্ন ঘটায়, তখন সেই নারী যদি অভিশাপ দেয় তাহলে সেই অভিশাপ ফলবেই ফলবে। এই ভাবটাই পরে মহাভারতে দেবযানী আর শর্মিষ্ঠার কাহিনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উমার অভিশাপের আগে কি দেবতাদের কখন সন্তান হত? আমরা কিন্তু বেদের কোথাও পাইনা যে দেবতাদের সন্তান আছে, আর বাল্মীকি রামায়ণের কোথাও উল্লেখ নেই যে দেবতাদের সন্তান হত। আসলে দেবতাদের সন্তান হবার কথা নয়, কারণ তাঁদের শরীর সাধারণ শরীর ছিল না, তেজরূপে তাঁরা থাকতেন। এটাকেই সুন্দর একটা কাহিনী আকারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সব অভিশাপ দেওয়ার পর উমা দেখলেন আমার তো আর সন্তান হবেই না, তখন আর কী করবেন, তিনিও হিমালয়ের গভীরে প্রবেশ করে শিবের সান্নিধ্যে গিয়ে তপস্যা করতে শুরু করলেন – **হিমবৎপ্রভবে শৃঙ্গে সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ**। শিব আর পার্বতীর ভালোবাসা সেই থেকে একই ভাবে চলে আসছে। পুরাণে এই নিয়ে অনেক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে।

তারপর বিশ্বামিত্র চার দিগ্‌গজের কথা বলছেন, চারটি হাতি কি করে পৃথিবী ধারণ করে আছে। এই করে দেবতারা গঙ্গাকে আকাশ মার্গে নিয়ে গেছেন, সেখানে তাকে আকাশগঙ্গা বলা হয়। স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পবিত্র করার জন্য। তারপর সেই গঙ্গাকে কেন পৃথিবীতে অবতরণ করা হল সে এক বিরাট ও বিখ্যাত কাহিনী, যে কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা, সগরের সন্তানদের কপিল মুনি ভস্ম করে দিয়েছেন। যদিও এই কাহিনীর সাথে রামায়ণের মূল কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। এখন সেই গঙ্গাকে

পৃথিবীতে নামান হবে, কিন্তু ওপর থেকে গঙ্গা নীচে অবতরণ করলে তার প্রচণ্ড গতি হবে, এমন গতি হবে যে পৃথিবীতে অবতরণের সময় সে সোজা পাতালে চলে যাবে। তখন শিবকে বলা হল 'হে মহাদেব, আপনি গঙ্গাকে আপনার জটাতে ধারণ করে ওর বেগকে স্তিমিত করে দিন'। শিব হলেন গঙ্গার বোনের স্বামী, তাই গঙ্গারও খুব আনন্দ, গঙ্গা ভাবল আমি যখন অবতরণ করব তখন শিব শুদ্ধু আমি পাতালে নিয়ে চলে যাব, আর সেখানে শিবকে চিরদিনের মত আমার কাছে নিজের মত করে রাখতে পারব। কিন্তু শিব গঙ্গার মনের ভাব গতিক বুঝে ফেলেছেন। শিব রেগে গিয়ে তাঁর জটাকে জালের ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবারে গঙ্গা শিবের জটাতে অবতরণ করে ঐ জটার মধ্যে হারিয়ে নিজেই ফেঁসে গেছে। এর অনেক রকম তাৎপর্য হতে পারে, গোমুখ থেকে গঙ্গা যখন নীচের দিকে নামছে তখন সে পথ খুঁজে পাচ্ছে না, কারণ পুরো হিমালয়কে শিবের জটার মত মনে হয়। তবে এগুলোর উপর আমরা খুব বেশি নজর দিই না। তারপর নানা রকমের কাহিনী, শিবের জটার মধ্যে গঙ্গা অদৃশ্য হয়ে গেল। গঙ্গা এখন বাচ্চা মেয়ের মত ছটফট করে তিড়িংবিড়িং করে লাফাচ্ছে। সুলতানপুরে ভাগলপুরের কাছে জহ্নু ঋষির আশ্রম আছে, সেখানে ঋষি তপস্যা করছিলেন, গঙ্গা মজা করে তাঁর যজ্ঞবেদীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, বাচ্চার মত মজা করে চলেছে। এতে জহ্নু ঋষি এমন রেগে গেলেন, তিনি গঙ্গাকে তুলে পান করে নিলেন। তখন আবার ভগীরথ জহ্নু ঋষির অনেক স্তুতি ও প্রার্থনা করতে শুরু করলেন – হে প্রভু, আপনি এই ভাবে গঙ্গাকে আটকে রাখবেন না। স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে জহ্নু ঋষি তখন আবার নিজের কান দিয়ে গঙ্গাকে বার করে দিলেন। সেই থেকে গঙ্গার আবার নাম হয়ে গেল জাহ্নবী। অনেকে বলেন জহ্নু ঋষি তার জঙ্ঘা চিড়ে গঙ্গাকে বার করেছিলেন বলে গঙ্গার আরেক নাম জাহ্নবী হয়েছে। কিন্তু এখানে বাল্মীকি বলছেন ঋষি তাঁর কান দিয়ে গঙ্গাকে বার করেছেন।

তারপরে আবার দেবতাদের সমুদ্র মন্থনের কাহিনী আসছে। সমুদ্র মন্থনের মধ্য দিয়ে বাল্মীকি শিবকে উপরে তুলতে শুরু করেছেন। সমুদ্র মন্থন করে যখন হলাহল বেরিয়েছে, আর সেই হলাহলের তীব্র জ্বালায় জগৎ শেষ হয়ে যেতে বসেছে, বিষ্ণু তখন দৌড়ে শিবের কাছে এসে বলছেন – হে শিব, আপনি আমাদের দাদা, সমুদ্র মন্থনের প্রথম উৎপন্ন জিনিষ আপনারই প্রাপ্য, এই হলাহল আপনি গ্রহণ করুন। শিব তখন হেসে বলছেন – আচ্ছা ঠিক আছে, আমিই নিচ্ছি এই হলাহল। নিয়েই তিনি হলাহলটা গলাধঃকরণ করে কণ্ঠে ধারণ করে নিলেন।

এখানে একটা বর্ণনা আছে, যেটা পুরাণে আরও বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে, পুরাণে বলা হয়েছে অমৃত যখন বেরিয়েছে তখন দেবতা আর অসুররা নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করতে শুরু করেছেন। সেই সময় বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করে দেবতা আর অসুরদের দুটো সারিতে বসিয়ে দিলেন। বিষ্ণু যখন অমৃত পরিবেশন করছেন তখন তিনি কায়দা করে শুধু দেবতাদেরই অমৃত পান করাতে থাকলেন আর অসুরদের অমৃত থেকে বঞ্চিত করে রাখলেন। বাল্মীকি কিন্তু তা বলছেন না, এখানে বলছেন প্রথমে সুরা দেওয়া হল, সুরা মানে মদ। দেবতারা সুরা গ্রহণ করলেন, কিন্তু অসুররা নিতে চাইল না। অসুররা ভাবল আমরা যদি সুরা গ্রহণ করি তাহলে অমৃতের ব্যাপারে গোলমাল হয়ে যেতে পারে। দেবতারা সুরা নিলেন বলে তাদের বলা হত সুরগণ, যারা সুরা নিল না তাদেরকে বলা হল অ-সুরগণ, অসুর শব্দটা এখান থেকে আরম্ভ হয়েছে। এর পরে যখন দেবাসুরের মধ্যে সংগ্রাম হতে শুরু হয়েছে তখন বিষ্ণু অসুরদের একেবারে পিশে দিয়েছেন। অন্য দিকে বিষ্ণু মোহিনী রূপ ধারণ করে অমৃতকে অপহরণ করে নিয়েছেন। এই ভাবে নানান পৌরাণিক কাহিনী বলতে বলতে বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

এর পরে আসবে অহল্যা উদ্ধার কাহিনী, ধনুর্ভঙ্গ ও সীতার বিবাহ। বাল্মীকি এখানে সীতার স্বয়ম্বরের কথা বলেননি। বাল্মীকি রামায়ণে আদপেই স্বয়ম্বরের কোন ঘটনার উল্লেখ নেই। আসল ঘটনা হল, রাজা জনক মিথিলাতে একটা যজ্ঞ করছিলেন। যেখানে যজ্ঞ হচ্ছিল সেখানে বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষণকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বিশ্বামিত্র গিয়ে রাজা জনককে বলছেন – শুনেছি আপনার কাছে শিবের

একটি ধনুক রাখা আছে, সেই ধনুকটা যদি আমাদের একটু দেখান। এখান থেকেই কাহিনী অন্য দিকে ঘুরে গেছে।

বাল্মীকি রামায়ণ – ৯ই মে ২০১০

এর আগে দেবাসুরের কিছুটা বর্ণনা করা হয়েছিল। সমুদ্র মন্থনে দেবাসুর সংগ্রামের কাহিনী গুলো বেশি জনপ্রিয় হয়েছে পুরাণের জন্য। পুরাণে এই ধরণের কাহিনী প্রচুর রয়েছে। কিন্তু ঠিক ঠিক বলতে গেলে দেবাসুর সংগ্রামের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় বাল্মীকি রামায়ণে।

মিথিলার যেখানে রাজা জনকের রাজ্য, তার পাশেই একটা জায়গায় শ্রীরামচন্দ্র দেখছেন ছোট্ট একটা আশ্রম। আশ্রমকে দেখে তাঁর কেমন একটা শূন্য শূন্য আর প্রাণহীন মনে হচ্ছে। আশ্রমে কোন পশু, পাখি, কোন প্রাণির চিহ্ন নেই, খুবই নির্জন। বিশ্বামিত্রকে শ্রীরামচন্দ্র এই আশ্রমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে বলছেন – এই আশ্রমে কোন প্রাণি দেখা যাচ্ছে না, এই ব্যাপারে আমার জানবার খুব আগ্রহ হচ্ছে, কি ব্যাপার আপনি আমাকে একটু খুলে বলুন। শ্রীরামচন্দ্রের কৌতুহল মেটাবার জন্য বিশ্বামিত্র বলতে শুরু করেছেন, অনেক আগে এই আশ্রমে বিখ্যাত গৌতম মুনি বাস করতেন। বাল্মীকির বর্ণনা অনুযায়ী গৌতম মুনির এই আশ্রম মিথিলা নগরীর এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। এখন মিথিলার প্রান্ত বলতে মিথিলা থেকে কতটা দূরে বলা খুব মুশকিল। পরের দিকে বলা হচ্ছে যে ছাপরার কাছে, দ্বারভাঙ্গা থেকে অনেকটা দূরত্বে গৌতম মুনির আশ্রম ছিল। আর ওখানেই অহল্যা পাথর হয়ে পড়েছিলেন। তবে এখন নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল ঠিক কোন জায়গাতে গৌতম মুনির আশ্রম ছিল।

বিশ্বামিত্র বলছেন – গৌতম মুনি তাঁর স্ত্রী অহল্যাকে নিয়ে এই আশ্রমে বাস করতেন আর দুজনে মিলে খুব তপস্যা করতেন। গৌতম মুনি কোন এক কারণে স্ত্রীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী একবার দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম মুনির বেশ ধারণ করে গৌতম মুনির অবর্তমানে আশ্রমে হাজির হয়ে অহল্যাকে আহ্বাণ করে বলছেন – ওহে ভদ্রে, আমি হলাম দেবতাদের রাজা ইন্দ্র, আমি তোমারই কাছে এসেছি, কেন এসেছি আশা করি বুঝতেই পেরেছ, তুমি কিন্তু দয়া করে না করো না। বাল্মীকি বলছেন – **মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ**।১/৪৮/১৯ – ইন্দ্রের আরেকটি নাম সহস্রাক্ষ। এখানে নানা রকমের পৌরাণিক কাহিনী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ইন্দ্রকে কেন সহস্রাক্ষ বলা হয়, সেটাকে নিয়ে আরেকটা বিরাট কাহিনী বলা হচ্ছে। সহস্রাক্ষ কথার অর্থ আমরা জানি যার হাজারটি চোখ, এই সহস্রাক্ষ শব্দটি আসছে আবার বেদের পুরুষসূক্তম্ থেকে। পুরুষসূক্তমে যে পুরুষের কথা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে এক করে ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে। সর্বশক্তিমান থেকেই হয়েছে সহস্রাক্ষ। পরের দিকে পুরাণে এসে কাহিনীগুলো অনেক পাল্টে যায়।

এই শ্লোকের পরের অংশে বলছেন – **মতিঞ্চাকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ**।। ১/৪৮/১৯। অহল্যা ছিলেন ব্রহ্মার পুত্রী, মানে খুব উচ্চ নারী। ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা। এখন দেবতাদের রাজা যখন নিজেই এগিয়ে এসেছেন তখন বলছেন *মতিঞ্চাকার*, মানে অহল্যার মাথা ঘুরে গেল। কেন? *দেবরাজকুতূহলাৎ*, দেবরাজকে দেখে অহল্যার মনে কৌতুহল হল, আহা আমার কি সৌভাগ্য, দেবতাদের যিনি রাজা তিনিই আমার প্রতি আসক্ত, তিনি আমার কাছে আসতে চাইছেন। অন্যান্য রামায়ণে বা অন্য জায়গাতে বলা হয়েছে গৌতম মুনির বেশে এসে অহল্যার সঙ্গে ইন্দ্র ছলনা করেছিলেন। আসলে ছল বল ইন্দ্র কিছুই করেননি। গৌতম মুনির বেশেই এসেছিলে, কিন্তু আসার পর ইন্দ্র পরিষ্কার সরাসরি বলছেন আমি ইন্দ্র। তখন অহল্যা একটু প্রলুব্ধ হয়ে গেছে – বাবাঃ, দেবতাদের রাজা তিনি আমার কাছে আসতে চাইছেন! অহল্যা রাজী হয়ে যায়। অহল্যার সাথে থাকার পর ইন্দ্র ফিরে যাওয়ার সময় অহল্যাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললেন – তোমার সঙ্গ করে আমার খুব ভালো লাগল, তোমার কাছে থেকে আমি খুব

পরিতুষ্ট হয়েছি। ইন্দ্র যখন বেরিয়ে যাবে তখন অহল্যা ইন্দ্রকে বলছেন – তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও আমার স্বামী এক্ষুনি এসে পড়বেন। কিন্তু যখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় গৌতম মুনিও স্নানাদি সেরে আশ্রমে প্রবেশ করছেন। গৌতম মুনি অবাক হয়ে দেখছেন আমারই মত একজন দেখতে আমারই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কি করে। গৌতম মুনি গিয়ে তাঁকে ধরেছেন। তুমি কে সত্যি করে বল, তা নাহলে এক্ষুণি অভিশাপ দিয়ে তোমাকে শেষ করে দেব। জঙ্গলের মধ্যে আশ্রম বলে গৌতম মুনি ভাবছেন কোন অসুর বা রাক্ষস হবে হয়তো। কিন্তু পরে যখন সব বুঝতে পারলেন, গৌতম মুনি গেছেন প্রচণ্ড রেগে। গৌতম মুনি বলছেন – তুমি এক ঋষির পত্নির সাথে এই কাণ্ড করেছ তো, ঠিক আছে এর পর থেকে তোমার আর কোন সন্তান উৎপত্তির ক্ষমতা থাকবে না। তুমি আজ থেকে নপুংসক হয়ে থাকবে।

আমরা এর আগে দেখেছিলাম উমা যত স্বর্গের দেবতা আর তাঁদের স্ত্রীদের অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন যে, তোমরা এই রকম কায়দা করেছ যাতে শিবের থেকে আমার সন্তান না হয়, ঠিক আছে আমিও অভিশাপ দিচ্ছি তোমাদেরও সন্তান হবে না। মানুষের মধ্যে তিনটে বাসনা সব সময়ই থাকে, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা। পুত্র আর বিত্ত মানে টাকা পয়সা আর সন্তান, এগুলোই এই সংসারের ভোগের জিনিষ। আর লোকৈষণা মানে স্বর্গ, মৃত্যুর পর যেন আমি ভালো স্বর্গে থাকতে পারি এই ইচ্ছাটাই লোকৈষণা। পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা এই লোকের আর লোকৈষণা মরার পরের। বিত্তের সাথে ঠাকুর কামিনীকে যোগ করে বললেন কামিনী-কাঞ্চন। ঠাকুর জানতেন একশ বছর পর অনাচার বেড়ে যাবে, মানুষ সন্তান কামনা না করেও অনেক কিছু করবে। কিন্তু মানুষের মনে সন্তানের ইচ্ছা প্রথম দিন থেকেই খুব প্রবল। যাঁরা বিয়ে না করে ভালোভাবে সাধারণ জীবন যাপন করে যাচ্ছেন, তাঁদেরও একটা বয়সের পর মনের মধ্যে একটা খেদ আসে, ইস্ আমার যদি একটা সন্তান থাকত। মানুষের মধ্যে যেমন অভিনিবেশ থাকে, মানে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা, ঠিক তেমনি সন্তান কামনাও মানুষের মধ্যে খুব গভীর ভাবে বিরাজ করে। শুধু যে মানুষের মধ্যেই সন্তান কামনা থাকে তাই না, যারা দেবী দেবতা তাদেরও এই সন্তান কামনা ছিল। এমনকি পার্বতী, যাঁকে আমরা জগন্মাতা রূপে উপাসনা করি, তাঁরও পুত্রৈষণা ছিল। যখন দেবতারা কৌশল করে তাঁকে সন্তান লাভ থেকে বঞ্চিত করলেন তখন তিনিও দেবতাদের পাল্টা অভিশাপ দিলেন।

এখানেও আমরা দেখছি গৌতম মুনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন, তোমার কোন সন্তান হবে না, তুমি এর পর থেকে নিষ্ফল হয়ে যাবে। ইন্দ্রকে অভিশাপ দেওয়ার পর তিনি আশ্রমের ভেতরে প্রবেশ করলেন। তখনও তিনি প্রচণ্ড রেগে রয়েছেন। এটা খুবই আশ্চর্যের যে, মানুষ সব কিছু ত্যাগ করে দিতে পারে, সে টাকা পয়সা ত্যাগ করে দিতে পারে, ঘর সংসার ত্যাগ করে দিতে পারে কিন্তু তার স্ত্রী, যে তার প্রিয়তমা বন্ধুর মত, সে যদি অন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টি দেয়, এটাকে কোন পুরুষ কিছুতেই সহ্য করতে পারেনা। মনস্তত্ত্বে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। নিজের প্রাণের বন্ধুর জন্য সে সব কিছু ছেড়ে দেবে, তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু সেই বন্ধু যদি বলে আমি তোমার স্ত্রীকে একটি মুহুর্তের জন্য চাই, এই আবদারকে সে আর কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। যারা উচ্ছৃঙ্খল, বদ চরিত্রের, স্বার্থপর, যারা নিজের স্ত্রীকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না।

গৌতম মুনি, যিনি এত বড় একজন ঋষি তিনিও এই ব্যাপারটাকে সহ্য করে নিতে পারলেন না। সহ্য করতে পারলেন না বলে অহল্যার কাছে এসে তিনি তাঁকে বিরাট এক লম্বা অভিশাপ দিয়ে দিলেন। বলছেন – তুমি কয়েক হাজার বছর এই ভাবে এখানে পরে থাকবে, আর – **বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়নী। অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেহস্মিন্ বসিষ্যসি।।** ১/৪৮/৩০। তুমি শুধু বাতাস খেয়ে থাকবে, মানে তোমার শরীর বলে কিছু থাকবে না, নিরাহারা, মানে কোন খাওয়া দাওয়া তোমার করা হবে না, আর *তপ্যতি*, বাল্মীকি রামায়ণে *তপ্যতি* কি অর্থে বলা হচ্ছে বোঝা মুশকিল, তুমি তপস্যা করবে, অথবা তুমি জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হতে থাকবে। কিন্তু তারপরেই বলছেন *ভস্মশায়িনী*। আমরা সবাই জানি অহল্যা পাথর হয়ে পড়েছিলেন, বাল্মীকি কিন্তু তা বলছেন না। বাল্মীকি বলছেন *ভস্মশায়িনী*, মানে তুমি ভস্ম হয়ে পরে থাকবে।

বাল্মীকি ঠিকই বলছেন কারণ সাধুরা অভিশাপ দিলে পাথর হয় না, অভিশাপের তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এখানেও গৌতম মুনি এমন অভিশাপ দিয়েছেন যে, অহল্যা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পরের দিকে অধ্যাত্ম রামায়ণে অহল্যাকে পাথর করে দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র অহল্যার পাথরের শরীরকে স্পর্শ করতেই তিনি আবার তাঁর মানবী দেহ ফিরে পান। অধ্যাত্ম রামায়ণের এই কাহিনীকেই আবার তুলসীদাস তাঁর রামচরিত মানসে নিয়েছেন, সেইজন্য অহল্যার পাথর হয়ে যাওয়ার কাহিনীই জনমানসে প্রচলিত হয়ে গেছে। মূল রামায়ণে কিন্তু অহল্যা ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

গৌতম মুনির অভিশাপে অহল্যা ভস্ম হয়ে যাওয়ার পর, গৌতম মুনি বলছেন – শ্রীরামচন্দ্র যখন এই আশ্রমে পদার্পণ করবেন তখন তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। আর তুমি যখন শ্রীরামচন্দ্রকে ভক্তিযুক্ত ও বিনম্র চিত্তে সেবা সৎকার করবে তখন তোমার মনের লোভ, মোহাদি দোষ সব বিদূরিত হয়ে যাবে। এই শ্লোকটি আবার খুব জটিল, বাল্মীকি পরিষ্কার করে বলছেন না যে, কি করে ও কিভাবে অহল্যা অভিশাপ মুক্ত হবে। পরের দিকে যখন তিনি রচনাতে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। লেখক যখন লিখতে থাকেন তখন তাঁরও সব ভাব গুলো পরিষ্কার থাকে না, যত লেখা এগোতে থাকে ততই ব্যাপার গুলো কোন দিকে যেতে পারে তাঁর কাছে পরিষ্কার হতে থাকে। আর যখনই মানুষ মনে করে এগুলো ভগবানের কথা তখন আরো গোলমাল হয়ে যায়। বাল্মীকিকে ব্রহ্মা বর দিলেন তুমি রামায়ণ রচনা কর, তার মানে এই নয় যে বাল্মীকি সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে ব্রহ্মা বলে দিচ্ছেন আর উনি লিখে যাচ্ছেন। বাল্মীকি রামায়ণ কত দিন ধরে লিখেছিলেন আমরা জানিনা, তবে কয়েক মাসে যে তিনি লিখে দিয়েছেন তা নয়, অন্তত দু-বছর কি তিন বছর ধরে লিখেছেন। প্রথম দিকে যে জিনিষ গুলি লিখছেন পরের দিকে হয়তো সেটা পাল্টে গেছে। সেইজন্য একটু সামান্য এদিক ওদিক তারতম্য থাকতেই পারে। আমরা যখন পড়ছি তখন আমরা হয়তো টানা তিন দিন ধরে পড়ে শেষ করে দিচ্ছি, কিন্তু যিনি লিখেছেন তিনি তো তিন দিনে লেখেননি।

এখন যেমন বিজ্ঞানীদের কথাই শেষ কথা। যে কোন ব্যাপারে মানুষ বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে জানতে চায় এই ব্যাপারে তাঁর কি মত। এখন একজন ফিল্মস্টারকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভগবানের ব্যাপারে আপনার কি মত, তাহলে সে কি বলবে? একজন ফিল্মস্টারের কি ভগবানের ব্যাপারে কিছু বলার যোগ্যতা আছে? আইনস্টাইন নিজের মত দিয়েছেন ভগবানের ব্যাপারে। কিন্তু আইনস্টাইনের কি অধিকার আছে ভগবানের ব্যাপারে বলার? ফিল্মস্টার অভিনয়ের ব্যাপারে বলতে পারে, আইনস্টাইন বিজ্ঞানের ব্যাপারে বলতে পারেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের একটা চিরন্তন অভ্যাস যে, সমাজ যাকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে মানুষ সবার আগে তার কাছেই সব ব্যাপারে তার মতটা আগে জানার জন্য ছুটে যায়। আগেকার দিনে যে ঋষিরা ছিলেন, এনারা সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সবাই তাঁদের কাছেই সব ব্যাপারে ছুটে যেত। এখন যদি জিজ্ঞেস করে – আচ্ছা চাঁদকে এক এক দিনে এক এক রকম দেখায় কেন? ঋষিরাও সব কিছুর উত্তর দিতে পারতেন না।

কিছু দিন আগে দক্ষিণ ভারতে এক পরমহংস নাকি সবাইকে তিন দিনে সমাধি করিয়ে দিচ্ছিলেন। যার চেলারা মুর্খ সে কেমন হবে না বলাই ভাল। এখন যারা কথামৃত পড়েছেন, লীলাপ্রসঙ্গ পড়েছেন, স্বামীজীর পুরো রচনাবলী পড়েছেন তারা কি কোথাও পেয়েছেন যে, ঠাকুর কাউকে তিন দিনে সমাধি করিয়ে দিচ্ছেন? ঠাকুরের কথাতে এদের এক পয়সার বিশ্বাস নেই। যত শাস্ত্র আছে আগে এগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে এই সব ধাপ্পাবাজ, চালবাজ বাবাজী, পরমহংসদের পেছনে এদের ঘোরা উচিৎ। যে যত বোকা বানাতে পারে তার কাছে তত লোকের ভিড়। আর যখন কোন কেলেঙ্কারীতে ধরা পড়বে তখন সব দেশসুদ্ধু লোক চেঁচিয়ে বলবে এই লম্পট চোর সাধুর ভেক ধরে আমাদের সব ঠকিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এরা বোঝে না যে, এরা নিজেরা ঠকবার জন্যই এই সব ভেক বাবাজীদের কাছে গিয়েছিল। তিন দিনে সমাধি লাভ করতে কারা যাবে? মুর্খরাই তো যাবে, আর মুর্খদেরই তো বোকা বানান হয়।

ঋষিদের কাছে মানুষ যখন তার মনের হাজারটা প্রশ্ন নিয়ে হাজির হত, তখন ওনারা তাঁদের মত করে এরা যাতে বুঝতে পারে সেইভাবে একটা উত্তর দিয়ে দিতেন। বাল্মীকিও কিছুটা নিজের তরফ থেকে আর কিছুটা তখনকার দিনের প্রচলিত লোককথা থেকে তিনি তাঁর রচনার উপাদান গুলি সংগ্রহ করেছেন। যাঁরাই বড় কবি বা লেখক হন, তাঁরা প্রথমে একটা সমসাময়িক জীবন্ত চরিত্রকে বেছে নেন, যে চরিত্রটা সবার চোখের সামনে আছে। সেক্সপিয়রের যে রোমিও জুলিয়েতের কাহিনী, খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর সাহিত্য প্রতিভা দিয়ে কি সুন্দর একটা কাহিনীকে সৃষ্টি করে দিলেন, এখানেও একটা জীবন্ত চরিত্রকে নিয়ে তাকে নিজের প্রতিভার সাহায্যে সেক্সপিয়র একটা কাহিনীতে দাঁড় করিয়ে তার মধ্যে যে জিনিষ গুলি তখন প্রচলিত ছিল সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত করে দিয়ে একটা সুন্দর সাহিত্য উপস্থাপন করে দিয়েছেন। বাল্মীকিও ঠিক তাই করেছেন।

রামায়ণের যুগে সমাজ যেমনটি ছিল বাল্মীকিও খুব সুন্দর ভাবে তেমনটি তুলে এনে রামায়ণে সাজিয়ে দিয়েছেন। বলছেন তখনকার দিনে ব্রাহ্মণরা যখন যজ্ঞ করতেন তখন তাঁদের কি রকমের ভেড়া, ছাগল দেওয়া হয়। এখানে বর্ণনা করছেন – যে ভেড়াগুলো খাসি হয়ে গেছে সেই ভেড়াগুলিকেই বলি দেওয়া হত। কিন্তু এখনকার দিনে কালীঘাটে ঠিক এর উল্টোটাই করা হয়, এখানে পাঠাকেই বলি দেওয়া হয়। খাসি হওয়া ভেড়াকে কেন বলি দেওয়া হত? বলছেন যেহেতু গৌতম মুনির অভিশাপে ইন্দ্র নপুংসক হয়ে গিয়েছিল। আর তখনকার দিনে ভেড়াকেই বলি দেওয়া হত, ছাগলকে বলি দেওয়া হত না। কোন একটা যুগে ভেড়া বলি থেকে ছাগ বলিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আবার কামাখ্যাতে পায়রা বলি দেওয়া হয়। লোকে জিজ্ঞেস করবে কেন পায়রা বলি দেওয়া হয়, তখন এনারা একটা উত্তর দিয়ে দিতেন, যেটাই উত্তর দিতেন সেটাকে খুব সততার সঙ্গে পরিষ্কার করে বলতেন।

শ্রীরামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র বললেন – চল আমরা আশ্রমে যাই, আমরা তো অভিশাপের কথা জানি আর অভিশাপ থেকে মুক্ত কিভাবে হবে তাও জানি। চল তুমি অহল্যাকে গিয়ে উদ্ধার করে দাও। সব থেকে মজার ব্যাপার হল গৌতম মুনি আর অহল্যার এক সন্তান ছিল, উনিও একজন বড় ঋষি ছিলেন, এনার কথা আর কোথাও পাওয়া যায় না, বাল্মীকি রামায়ণেই অহল্যার সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে এক জায়গায় অহল্যার পুত্র আবার জিজ্ঞেস করবেন – ইনিই কি সেই শ্রীরামচন্দ্র? আমি শুনে এসেছি আমার বাবা মাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। গৌতম মুনি অহল্যাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন কয়েক হাজার বছর ভস্ম হয়ে পরে থাকবে। অথচ তাঁর ছেলে আছে, যিনি শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক। কয়েক হাজারের ব্যাপারটাতে তাই খটকা লাগে। হয়তো একটা প্রায়শ্চিত্তের মত করতে বলা হয়েছিল, তুমি এইভাবে পরে থাকবে, শ্রীরামচন্দ্র এখানে এলে তাঁকে অতিথি রূপে গ্রহণ করে যথোচিত সৎকার করবে তখন তোমার সব পাপ দূর হবে। আদপেই হয়ত অহল্যা ভস্ম হননি আর পাথরও হননি। গৌতম মুনি তাঁকে আদেশ দিয়েছেন তুমি এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করবে। এই ব্যাপারে মনুস্মৃতিতে বলছে, কোন মানুষ যদি এই রকম কোন পাপ করে তাহলে তাকে গরুর চামড়া পরে শহরে ঘুরে ঘুরে সবাইর কাছে গিয়ে বলতে হবে – আমি এই পাপ করেছি আপনারা এর জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিন।

খুব যুক্তি বিচার করে যদি আমরা দেখি তাহলে পরিষ্কার দেখা যাবে যে অহল্যা হাজার বছর ধরে তপস্যা করছেন, আর তাঁর ছেলের বয়স শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক, তাহলে হয় বাল্মীকির হিসাবে কোথাও গোলমাল আছে আর তা নাহলে উনি কাব্যিক বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করে বলেছেন। আর যদি আসল ঘটনাকে বিচার করি তাহলে বলা যায় যে – নিজের স্ত্রীর এই কাণ্ড দেখে গৌতম মুনি প্রচণ্ড রেগে গেছেন, রেগে গিয়ে বলছেন – তুমি অভিশপ্ত নারী, তুমি এখান থেকে আর কোথাও বেরোবে না, এইখানেই ছাই মুখে দিয়ে পরে থাকবে, আর শ্রীরামচন্দ্র যখন আসবেন তখন তুমি তাঁকে অতিথি রূপে বরণ করবে, সৎকার করবে, পূজো করবে তখন তুমি অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। এই অভিশাপ দিয়ে

গৌতম মুনি আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোরা অহল্যাকে ছেড়ে চলে গেছেন। পরে অহল্যার সন্তান শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করছেন – আপনি আমার মার উদ্ধার করেছেন তো, উনি খুব কষ্টে আছেন ইত্যাদি।

শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ আর বিশ্বামিত্র তিনজন আশ্রমে গেছেন। ওখানে গিয়ে বলছেন – **দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাবম্। লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ।।** ১/৪৯/১৩। তপস্যা করে করে অহল্যা একেবারে দ্যুতিমান হয়ে গেছেন। এমন দ্যুতিমান হয়ে গেছেন যে, শুধু মানুষ কেন, দেবতা দানব কেউই অহল্যার সেই প্রদীপ্ত মুর্তির দিকে তাকাতে পারছিল না। আসলে মানুষ যদি কোন পাপ কর্ম করে থাকে তখন তার মুখের চেহারা মলিন হয়ে যায়। অন্তর্যামি, যিনি ভেতরে আছেন, তাঁর খুব কষ্ট হয়। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছেন পাপ কর্ম কোন্ গুলো? ঠাকুর বলছেন যেটা করতে গেলে মনটা খুঁত খুঁত করে। এটাই পাপ কর্মের একমাত্র সংজ্ঞা, এ ছাড়া পাপ কর্মের আর কোন সংজ্ঞা হতে পারে না। যখন মনটা খুঁত খুঁত করতে শুরু করে তখন ওই খুঁতখুঁতানিটা গিয়ে মুখটাকে কালো করে দেয়। কিন্তু যখন তপস্যা করতে শুরু করে দেয় তখন ঐ মলিনতাটা চলে যায়। প্রথমে মলিনতা চলে যাবে, তারপরে আরও যদি তপস্যা করে নেয় তখন পুরো চেহারার মধ্যে দ্যুতি চলে আসে। এগুলো কোন কল্পনা বা ধারণা নয়, এটাই বাস্তব। আমাদের কাছে ঠাকুরের জীবন হল অধ্যাত্ম জীবনের মাপকাঠি। রাজা মহারাজ তখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে থাকতেন। একদিন রাজা মহারাজকে ঠাকুর বলছেন – তুই কি করেছিস? তোর মুখে যেন একটা কালো মেঘের ছায়া, তোর দিকে তাকাতে পারছি না। রাজা মহারাজের কিছুতেই কিছু মনে পরছে না। অনেক চিন্তা করে করে হঠাৎ মনে পরে গেছে – হ্যাঁ, মজা করে আজকে আমি একটা মিথ্যা কথা বলেছি। ঠাকুর তক্ষুনি সাবধান করে নিষেধ করে দিলেন – খবরদার কক্ষণ মজা করেও মিথ্যে কথা বলবি না।

বাল্মীকি রামায়ণে অহল্যার কাহিনীকে দেখানোর একটাই উদ্দেশ্য, তুমি যতই গর্হিত কাজ করে থাক, তুমি যদি তপস্যা করে নাও, তাহলে তুমি সেই পাপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। যেভাবেই হোক আমাদের সমাজে পর পুরুষের সাথে সম্পর্ককে কখনই ভালো চোখে দেখা হয় না, মনুস্মৃতিতেও বিশদ ভাবে এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এমনকি দেবতাদের মধ্যেও যাদের অনেক কিছুই করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তাঁরাও যদি এই ধরণের কুকর্মে লিপ্ত হতেন তাঁদেরকেও প্রচণ্ড নিন্দা করা হত, এখানে অহল্যা হচ্ছেন একজন ঋষিকন্যা, ব্রহ্মার পুত্রী আবার ঋষিপত্নি, তিনি আবার সম্ভোগ করছেন দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের সাথে, তাঁকেও ক্ষমা করা হচ্ছে না। তবে হিন্দু ধর্মে এমন কিছু কর্ম নেই যে, তপস্যা করলে সেই পাপটা চলে যাবে না। পাপ মানে তো একটা কর্মই, নিউটনের থিয়োরি অনুযায়ী যেমন প্রত্যেক কর্মের action আর reaction আছে, এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে, একটা বাজে কাজ করলাম মুখের উপর একটা কালো ছায়া এসে গেল, আবার একটা ভালো কাজ করলাম কালো ছায়াটা সরে গিয়ে আলোর দ্যুতি চলে এল, এখানে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই।

এখানে এসেই হিন্দু ধর্ম খ্রীশ্চান ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী আমি অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ বা নরকে চলে যাব, কিন্তু হিন্দুদের কাছে অনন্ত কালের জন্য কোন বিধান দেওয়া হয় না। দুদিন, তিন দিন টানা তপস্যা করে দিলাম সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। ঠাকুর তো একেও ছাড়িয়ে গেছেন – ঠাকুর বলছেন – দোষ করার পর ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলতে হয় – ঠাকুর অপরাধ হয়ে গেছে, আর অমনটি করব না। আসলে সব কিছু মনকে নিয়েই হচ্ছে। যদি আমার মধ্যে কোথাও একটা অপরাধ বোধ থাকে, যারা বড় বড় ক্রিমিন্যাল তাদেরও একটা অপরাধ বোধ থাকে, কিন্তু ওরা সেটা বুঝতে পারেনা যে মন ভেতরে ভেতরে কাজ করছে। যার জন্য দেখা যায় যারা বেশি বড় অপরাধ করে বেড়াচ্ছে, পরের দিকে তারাই বেশি ধর্ম কর্ম করতে শুরু করে। আমাদের অন্তর্যামী কিছুতেই ছাড়বেন না, ভালো মন্দ যাই করা হোক না কেন, তিনি সবটার হিসেব রেখে দেন।

তারপর বলছেন, এমন একটা অবস্থা সেখানে – **লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ।।** দেবতা হোক, অসুর হোক আর মানুষই হোক কেউই অহল্যাকে অবলোকন করতে পারছিল না। কারণ, যেহেতু এখানে অভিশাপের কথা বলা হয়েছে, অহল্যা ভস্ম হয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম শরীরটা আছে। এই সূক্ষ্ম শরীরটা এখন তেজোময়। এগুলো আখ্যায়িকা হিসাবে যদি ধরা হয়, তাহলে সব ঠিক আছে, আর এটাও ঠিক যে বাল্মীকি খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। আবার যদি যুক্তি দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় তাতেও কোন অযৌক্তিক কিছু হবে না। কারণ, যে পাঁচটি তত্ত্ব আছে, ক্ষিতি, অপঃ, মরুৎ, ব্যোম ও তেজ, এই পাঁচটি তত্ত্ব দিয়ে এই জগতের যা কিছু আছে সব তৈরী হয়েছে। আমাদের যে শরীর, সেই শরীর পৃথিবী বা ক্ষিতি তত্ত্ব দিয়ে গঠিত অর্থাৎ মানুষের শরীরে পৃথিবীর উপাদানটা বেশি আছে। কিন্তু এই শরীরেই যদি তেজ তত্ত্বের উপাদান বেশি এসে যায় তখন কিন্তু কান্তিমান শরীর হয়ে যাবে। দেবতাদের শরীর তেজোময় শরীর, ভূত প্রেত যত আছে এদের বায়ুময় শরীর। এই ধারণাই ভারতীয় মনস্কতায় চিরস্থায়ী হয়ে বসে গেছে, আমরা জানি ঠাকুরও ভূত দেখেছিলেন, আর ঠাকুর দেবতাদেরকেও দেখেছিলেন, ঠাকুরের আবার অদ্বৈত জ্ঞানও আছে। সেইজন্য সব কিছুকেই আমাদের সত্য বলে স্বীকার করে চলতে হবে। মানব শরীরে ভূমি তত্ত্ব বেশি আছে, এই শরীরে যদি আকাশ তত্ত্ব বেড়ে যায় তখন এই শরীর অন্য রকম হয়ে যাবে, বায়ু তত্ত্ব বেড়ে গেলে আরেক রকম হয়ে যাবে, যদি তেজ তত্ত্ব বেড়ে যায় তাহলে শরীরটা আরও অন্য রকম হয়ে যাবে। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর যেটা সেটা একই রকম থাকবে। অর্থাৎ আমি পাল্টাব না আমার শরীরটা পাল্টে যাবে। ভালো উদাহরণ হচ্ছে, আমি একটা কাঠামো বানিয়েছি, ঐ কাঠামোতে আমি খড় আর মাটি দিয়ে দুর্গার মুর্তি করে দিতে পারি আবার ঐ কাঠামোতে আমি সোনার মুর্তি করে দিতে পারি। কাঠামো একই থাকছে, ফলে সেই দুর্গা মুর্তিই থেকে যাবে, কিন্তু তার যে বাহ্যিক আবরণ সেটা পাল্টাতে থাকবে।

যার শরীর যেটা দিয়ে নির্মিত হয় সেই শরীর সেই জিনিষ দিয়েই পোষণ হবে। যার শরীর ভূমি তত্ত্ব দিয়ে নির্মিত তার শরীরের পোষণ হবে ভূমি দিয়েই, সেইজন্য আমাদের অন্ন খেতে হয়। কিন্তু যাদের বায়ু দিয়ে শরীর নির্মিত, যেমন ভূত প্রেত, তারা অন্ন খেতে পারেনা। অহল্যার শরীর এখন তেজ তত্ত্ব দিয়ে তৈরী হয়ে গেছে। তাঁর যে স্বরূপ, সেটা এখন দিব্য। আর বলছেন – **প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।** (১/৪৯/১৪)। বিধাতা তাঁর শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গকে বিশেষ ভাবে নির্মিত করেছিলেন। *মায়াময়ীমিব* – মায়ার মুর্তির মত খুব সুন্দর। এখানে মায়া যে শব্দটা আসছে এটাও একটা খুব বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বেদে আছে – ইন্দ্র তাঁর মায়া দিয়ে অনেক রূপ ধারণ করতে পারেন। সেখানে মায়া বলতে বোঝাচ্ছে ইন্দ্রজাল শক্তি, ম্যাজিক। উপনিষদে কিন্তু মায়া এই অর্থে ব্যবহার হয় না। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত দর্শনে যখন মায়া শব্দ আসে তখন মায়ার গুরুত্ব অনেকে বেড়ে যায়। মায়ার প্রথম প্রবক্তা সাংখ্য দর্শন, যেখানে প্রকৃতির সাথে মায়াকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আর বাকীটা এসেছে তন্ত্র দর্শন থেকে। তন্ত্র বলছে শক্তি আর সাংখ্য বলছে প্রকৃতি, শক্তি আর প্রকৃতি এই দুটোকে মিলিয়ে বেদান্ত নিয়ে এল মায়া। আর মায়াকে যখন নিয়ে এল তখন সব কিছুর ব্যাখ্যা হয়ে গেল। কিন্তু বেদে মায়াকে এখন আমরা যে ভাবে দেখি সেই ভাবে এতটা বিস্তৃত ভাবে দেখা হত না। এখানে বাল্মীকি মায়া শব্দের অর্থ বলছেন – *প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব* – মায়া, মানে আকর্ষণী শক্তি। তোমার মায়ায় আমাকে আর মুগ্ধ করো না – মানে, তোমার আকর্ষণীতে আমাকে ভুলিও না।

আমাদের আধ্যাত্মিক দর্শন মায়ার যত অর্থ হতে পারে সব কয়টার অর্থকে ব্যাখ্যা দিয়ে দিতে পারে। সেইজন্য মায়া কি বলা খুব মুশকিল। পরের দিকে আমাদের ঋষিরা মায়াকে যখন ব্যাখ্যা করছেন, তখন তাঁরা মায়াকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করছেন। মায়া মানে ম্যাজিক, মায়ার আবার অর্থ হচ্ছে আকর্ষণী শক্তি, মায়াকে আবার বোঝায় ভুলিয়ে দেওয়া, মায়া মানে আবার হয় এক ধরণের ছলনা, এই ভাবে মায়ার অনেক অর্থ করা হয়। আবার যখন বেদান্তে মায়া যে কখন কি অর্থে নিচ্ছে বলা খুব কঠিন হয়ে যায়। যখন

একটা শব্দকে অনেক রকম ভাব ও ধারণার সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয় তখন এই সমস্যা এসে যায়। এখনতো সন্ন্যাসীদের বা যারা খুব ধর্ম ধর্ম করে তাদের সব সময়ই সাধারণ লোকের কাছে শুনতে হয় এরা তো মায়া মোহ ত্যাগ করে দিয়েছেন। যদি এদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় মায়া শব্দের অর্থ কি তখন আর কোন উত্তর দিতে পারে না। যাই হোক, আমরা বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ করছি, বাল্মীকি এখানে মায়ার অর্থ করছেন আকর্ষণী শক্তি।

এখানে এসে আবার বাল্মীকির কবিত্ব প্রতিভার প্রমাণ পাই। বলছেন যেমন হাল্কা ধুয়োর মধ্যে প্রচণ্ড আগুন জ্বলছে, অহল্যাকে ঠিক সেই রকম উজ্জ্বল অগ্নি শিখার মত দেখা যাচ্ছে, হাল্কা কুয়াশায় আচ্ছন্ন পূর্ণচন্দ্রের মত লাগছে। ঐ ধুয়ো থাকাতে, ঐ হাল্কা মেঘ থাকাতে সৌন্দর্যের উৎকর্ষতা যেন আরও ফুটে উঠছে। আরও উপমা দিয়ে অহল্যার সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হচ্ছে, জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত সূর্যের ভাস্বর প্রভার মত অহল্যাকে দেখাচ্ছে।

গৌতম মুনি আগেই বলে দিয়ে গেছেন শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনে তোমার অভিশাপ কেটে যাবে। এখন গৌতম মুনির মহিমা না শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা, বলা খুব মুশকিল। এই উপমাটাই ঠাকুর নিয়ে এসেছেন। যখন লব-কুশকে বলা হয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের এই মহিমা। কি মহিমা শ্রীরামচন্দ্রের? তিনি অহল্যাকে পাথর থেকে মানুষ করে দিয়েছেন। লব-কুশ বলছে সে আর কি! ওতো মুনির অভিশাপ ছিল, মুনি ঐ রকম বলেছিলেন বলেই হয়েছে। অহল্যা যে আবার মানুষ হয়ে গেলেন, এটা কি শ্রীরামচন্দ্রের মহিমাতে না ঋষি বাক্যের মহিমা। এগুলো হল তর্কের বিষয়।

তখন কি হয়েছে – **রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা।**১/৪৯/১৮। অহল্যা ছিলেন ঋষির পত্নি আবার নিজেও একজন তপস্বিনী ঋষি, এই জন্যই তিনি তপস্যা করতে পেরেছিলেন। এখানে কেউই অহল্যাকে দেখতে পাচ্ছেন না, একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রই দেখতে পারছিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র খুব সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন। যেমনি শ্রীরামচন্দ্র অহল্যাকে দেখে নিয়েছেন তখন বিশ্বামিত্র আর লক্ষ্মণও দেখতে পেয়ে গেছেন। এগিয়ে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্র অহল্যার দুটো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। আমরা এতদিন এর ঠিক উল্টোটাই শুনে এসেছি যে, শ্রীরামচন্দ্র তাঁর চরণ দিয়ে অহল্যা যেখানে পাথর হয়ে পড়েছিল সেই পাথরকে স্পর্শ করলেন। আর তুলসীদাস এই ঘটনাকে আধার করে অন্য এক কাহিনী দাঁড় করিয়ে দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র নদী পার হবেন, মাঝি এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে – হে শ্রীরামচন্দ্র আপনার পায়ে এমন কিছু জড়িবুটি আছে, যা পাথরে স্পর্শ করলে পাথর নারী হয়ে যায়। পাথরের থেকে কাঠ তো আর হাল্কা, আপনি আমার নৌকাতে পা দিতে যাচ্ছেন, এখন এই নৌকা যদি একটা নারী হয়ে যায় তখন আমি পেট চালাব কি করে। এই নৌকাই তো আমার রুজিরোজগারের একমাত্র উপায়। বাল্মীকি রামায়ণে আদপেই এসব কিছুই হয়নি। তবে এটা কোথা থেকে এসেছে? অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে। কেন অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে এসেছে? কারণ অধ্যাত্ম রামায়ণ হল ভক্তিশাস্ত্র। ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীরামচন্দ্র একজন অজানা অচেনা নারীকে গিয়ে প্রণাম করবেন তা কখনই হতে পারেনা, অসম্ভব ব্যাপার। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তরা এ জিনিষ কখনই হতে দেবে না। বাল্মীকির মতে শ্রীরামচন্দ্র একজন মহাপুরুষ। শ্রীরামচন্দ্র তখন ষোল বছরের এক যুবক। তিনি দেখছেন অহল্যা কত বড় তপস্বিনী, তাঁর শরীর দিব্য ভাস্বর জ্যোতিতে প্রদীপ্ত, তিনি মুগ্ধ হয়ে গেছেন, শ্রদ্ধা এসে গেছে, তিনি গিয়ে অহল্যাকে প্রণাম করে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

অহল্যাকে শ্রীরামচন্দ্র প্রণাম করতেই আস্তে আস্তে তাঁর হুঁশটা ফিরে আসছে, ইনি কে, কোথা থেকে আসছেন। বলছেন – **পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং চকার সুসমাহিতা।** ১/৪৯/১৮। অহল্যা তখন একাগ্রচিত্তে পা ধোবার জল এবং অর্ঘ্য নিবেদন করে তিনি তাঁদের আতিথ্যের দ্বারা অর্চনা করলেন। এটাই আমাদের হিন্দুদের অতিথিকে আপ্যায়নের চিরাচরিত প্রথা। শ্রীরামচন্দ্রকে অহল্যা অত্যন্ত সম্মানের সাথে আর শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী আপ্যায়ন করলেন, শ্রীরামচন্দ্রও শাস্ত্রবিধি মেনে তা গ্রহণ করলেন। অতিথি সৎকারের আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি আছে। এখানে কাউকেই ভগবান বা সন্ন্যাসী কিছু বলা হচ্ছে না, এনারা হলেন

অতিথি। নিয়ম আছে বাড়িতে অতিথি এলেই তাঁকে আগে জল দিতে হয়। কঠোপনিষদে আছে – *হর বৈবস্বতোদকম্* - ওহে বৈবস্বত নচিকেতার কাছে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে যাও। অতিথি এলেই পা ধোওয়ার জল নিয়ে যেতে হয়, রাস্থা দিয়ে এসেছে, পায়ে জল দিলে পায়ের নোংরা পরিষ্কার হয় আর ঠাণ্ডা জলে শরীরও শীতল হয়। পা ঠাণ্ডা হলে আস্তে আস্তে মাথাটাও ঠাণ্ডা হয়।

শ্রীরামচন্দ্র যখনই অহল্যার আতিথ্য গ্রহণ করে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগল, আর দেবতারা দুন্দুভির ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে দিলেন। অহল্যার বিশুদ্ধ শরীর হয়ে গেছে বলে দেবতারা সাধুবাদ দিতে শুরু করলেন। আর গৌতম মুনি ও অহল্যার আবার পুনর্মিলন হয়ে গেল।

ঐদিকে তখন মিথিলাতে রাজা জনকের ওখানে একটা বিরাট যজ্ঞ হচ্ছিল। সেখানে বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে নিয়ে এসেছেন। চারিদিকে প্রচুর লোকজন আর রথে রাস্থাঘাট গিজগিজ করছে। শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে বলছেন – হে আচার্য, কোথাও তো থাকার জায়গা নেই দেখছি, সব জায়গাই তো গাড়ি ঘোড়া আর লোকজনে ভর্তি হয়ে গেছে, একটা থাকার ব্যবস্থা তো করতে হবে। বিশ্বামিত্র তখন শহরে এক প্রান্তে যেখানে জলের সুবন্দোবস্ত আছে সেই রকম একটা জায়গা কোন রকমে জোগাড় করলেন। এখানে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে – *বিবিক্তে সলিলান্বিতে*, বিবিক্তে মানে একটু একান্তে নির্জন স্থানে, আর সলিলান্বিতে, মানে জলের সুবিধা আছে। কারণ জল ছাড়া এদের জীবন খুব দুর্বিষহ হয়ে যেত, এখন না হয় ট্যাপ কল, টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আছে, তখন একমাত্র জলাশয় আর না হয় কুয়োই ছিল সম্বল। জলের কাছাকাছি না থাকলে বিশেষ করে ঋষি মুনিদের খুব সমস্যা হয়ে যেত, কেননা তাঁদের একটু কিছু হলেই হাত পা ধুতে হয়, দিনে কত বার যে স্নান করতে হত তার ঠিক ছিল না। তাই জলাশয় অনেক দূরে থাকলে তাঁদের সমস্যা হয়ে যেত।

এখন কোন ভাবে রাজা জনকের কাছে খবর এসেছে মিথিলার এক প্রান্তে বিশ্বামিত্র অবস্থান করছেন। খবর পেয়েই তিনি বিশ্বামিত্রের কাছে দৌড়ে এসেছেন, তখনকার দিনে বিশ্বামিত্র ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। বিশ্বামিত্রের কাছে শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে দেখে রাজা জনক খুব অবাক হয়ে গেছেন। বাল্মীকি এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা বার বার বিভিন্ন ভাবে আসবে। বলছেন – দেবতার মতন দেখতে এরা দুজন কে? সুন্দর অস্ত্র ধারণ করে আছেন, হাতীর মত গাম্ভীর্যপূর্ণ এদের চলা-ফেরা। হাতী যখন চলে একটা বিশেষ ভাবে দুলকি চালে চলে। এদের হাব ভাব সিংহের মত বা ষাঁড়ের মত দেখাচ্ছে। আমরা কাউকে গালাগাল দেওয়ার সময় বলি ষণ্ডমার্কা, কিন্তু সংস্কৃতে ষাঁড়কে বলে ঋষভ, তখনকার দিনে কাউকে যদি ঋষভ বলা হয় তখন তা খুব সম্মান সূচক বলে গণ্য করা হত। এদের চেহারার সৌন্দর্য দেখে বলছেন – আরে এদের রূপ দেখে তো অশ্বিনীকুমাররাও লজ্জা পেয়ে যাবেন, তাও এরা এখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছে অথচ দেখে মনে হচ্ছে দুজন যেন দেবলোক থেকে নেমে এসেছেন।

এদের চেহারার আকৃতির বর্ণনা করে বলছেন – **পরস্পরস্য সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ। কাকপক্ষধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।।**১/৫০/২১ এদের দুজনকে দেখতে একই রকম, শরীর, শরীরের উচ্চতা আর এদের মুখের মুদ্রা, হাতের মুদ্রা, এদের চাল চলন, ভাব সবই এক রকম, এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে, আমি এদের ব্যাপারে সব তথ্য বিশদ ভাবে জানতে চাই। শ্রীরাম আর লক্ষ্মণ দুজনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি খুব প্রীতি ছিল। যেসব স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুব ভালোবাসা থাকে, তাদের দুজনের কথা বলার ধরণ একই রকম হয়ে যায়, হাঁটা চলাও একই রকম হয়ে যায়, দুজনের একই মুদ্রা দোষ দেখা যায়, একজন যদি কথায় কথায় 'তাই তো' বলে তাহলে অন্য জনও কথায় কথায় 'তাই তো' বলবে। যখন ভালোবাসা এসে যায় তখন একের অপরের প্রতি প্রভাব পড়তে শুরু করে। বন্ধুদের মধ্যেও এই একই জিনিষ লক্ষ্য করা যায়।

আমরা এখানে এসে অহল্যার পুত্রের নাম পাচ্ছি, তখন শতানন্দ, অহল্যার পুত্র জিজ্ঞেস করছেন – আমার মার উদ্ধার হয়ে গেছে কিনা। এখানে প্রথম বিশ্বামিত্র ঋষির পরিচয় করান হচ্ছে, এই কাহিনীকেই পরে আবার মহাভারতে বিরাট করে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে হচ্ছে বিশ্বামিত্র ঋষির সাথে বশিষ্ঠ মুনির আগে থাকতেই বিরাট ঝগড়া চলছিল। ঝগড়ার সূত্রপাতটাও খুব মজার। বিশ্বামিত্র ঋষি হবার আগে ছিলেন একজন ক্ষত্রিয় রাজা। রাজকার্যের উদ্দেশ্যে একদিন বিশ্বামিত্র জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্তি অনুভব করাতে একটা আশ্রম দেখতে পেয়ে সেখানে একটু বিশ্রামের জন্য গেছেন। ঐ আশ্রমটি ছিল বশিষ্ঠ মুনির। বশিষ্ঠ মুনির কাছে একটা কামধেনু গরু ছিল, ওর নাম ছিল সুরভি, বাল্মীকি রামায়ণে এক কামধেনুর নাম হচ্ছে শবলা। যাই হোক, বশিষ্ঠ মুনির যা কিছু প্রয়োজন হত এই সুরভিকে সব বলতেন, বলতেই সুরভি সব ব্যবস্থা করে দিত। এখন আশ্রমে রাজা তাঁর পার্ষদদের ও সৈন্যদের নিয়ে বিশ্রামের জন্য এসেছেন, এত লোকের খাতির যত্নের জন্য সুরভিকে বলতেই সে সব খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বিশ্বামিত্র দেখছেন এত সুন্দর খাবার আমি রাজমহলেও কোন দিন খাইনি। ভাবছেন এখানে এই নির্জন গভীর জঙ্গলের এক ছোট্ট আশ্রমে এত সব ভালো ভালো সুস্বাদু খাবার দাবার এলো কিভাবে! বশিষ্ঠ মুনিকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন – এ সবই সুরভির কৃপা। তখন জানলেন যে, সুরভি আসলে স্বর্গের যে কামধেনু আছে তারই বাচ্চা, আর এর কাছে যা কিছু প্রয়োজন হলে চাইলেই ও দিয়ে দেয়। তখন বিশ্বামিত্র বলছেন – আরে, এই মূল্যবান জিনিষ এখানে জঙ্গলে থেকে কি হবে, এটা তো রাজাদের কাছে থাকার কথা, আমিই এই কামধেনুকে নিয়ে যাচ্ছি। বশিষ্ঠ মুনি তো বিশ্বামিত্রকে নিয়ে যেতে বারণ করলেন, বিশ্বামিত্রও শুনবেন না। তারপরে বিশ্বামিত্র জোর করেই সুরভিকে নিয়ে যাবেন ঠিক করলেন।

তখন সুরভি বশিষ্ঠকে বলছে – হে ঋষিবর! এভাবে আমাকে ডাণ্ডা মেরে মেরে কেন নিয়ে যাচ্ছে, আর আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে? আপনি কি এভাবেই আমাকে এদের কাছে দিয়ে দিয়েছেন? একবারও আমাকে বললেন না যে, আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন। বশিষ্ঠ মুনি তখন বলছেন – আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় দিয়ে দিইনি, রাজা তোমাকে আমার কাছে থেকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমি এক অসহায় ব্রাহ্মণ, আমি তোমাকে কিভাবেই বা রক্ষা করতে পারি। তুমি যদি নিজেকে রক্ষা করতে পার কর।

বশিষ্ঠ মুনির কথা শেষ হতেই সুরভি গেছে প্রচণ্ড রেগে। রেগে গিয়ে সুরভি মাটিতে পায়ের আঁচড় দিতে শুরু করেছে, কান থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে। এর পরে সুরভির পা থেকে, কান থেকে, নাক থেকে, লোম থেকে, স্তন থেকে হাজারে হাজারে দুর্ধর্ষ সব সৈন্যরা নিষ্ক্রান্ত হতে শুরু করল। শরীরের কোন অংশ থেকে যবন সৈন্য, মানে গ্রীক সৈন্যদের কথা বলা হচ্ছে, কোন অঙ্গ থেকে কেরালার এক ধরণের ভয়ঙ্কর সৈন্যরা বেরোতে শুরু করল। এইসব সৈন্যরা বেরিয়েই বিশ্বামিত্রের সব সৈন্যদের এমন মার মারতে শুরু করল যে সব প্রাণ ছেড়ে পালিয়ে গেল। এই সব কাণ্ড দেখে বিশ্বামিত্র খুব হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছেন, একজন গরীব ব্রাহ্মণের কাছে আমি রাজা হয়ে মার খেয়ে গেলাম, ধিক্ আমার ক্ষত্রিয়ে, আমি আর ক্ষত্রিয় হয়ে থাকতে চাই না, আমি আজ থেকে ব্রাহ্মণ হব। সেখান থেকে রাজ্যের রাজধানীতে না ফিরে তিনি সোজা তপস্যায় চলে গেলেন। শিবের তপস্যা করে তিনি অনেক শক্তি অর্জন করলেন। শিব তাঁকে সব অস্ত্র দিয়ে দিলেন। বাল্মীকির সময় শিব এখনও বিরাট কিছু হয়ে যাননি। এরপর শিবের সব অস্ত্র নিয়ে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গিয়ে নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। বিশ্বামিত্র তপস্যা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য করেননি, তপস্যা করেছেন শক্তি পাওয়ার জন্য।

নিষ্কাম সাধনা বা তপস্যা বিশ্বামিত্রের ছিল না। কর্ম যখন হয় তখন দুই রকমের কর্ম হয় – একটি সকাম আরেকটি নিষ্কাম। সকাম কর্ম যখন নিশ্চিত ভাবে কিছু কামনা করে করা হয় তখন তিনটে কামনাই মূল – কামিনী, কাঞ্চন আর নাম-যশ। আর এর উল্টো নেতিবাচক দিক থেকে সকাম কর্ম হয় প্রতিশোধমূলক। প্রতিশোধমূলকটাও নাম-যশের মধ্যে পড়ে। আমাকে কেউ মেরেছে, মানে আমার ক্ষমতাটা নীচে চলে গেল, এখন ক্ষমতাকে উপরে ওঠাতে হলে আমাকেও এর একটা প্রতিশোধ নিতে হবে, এটাও নাম-যশাকাঙ্খার মধ্যে পড়ছে। ঘৃণা, ক্রোধ মনের এই বিকার গুলো কামিনী, কাঞ্চন আর নাম-যশেরই

একটা রূপ। সাধনা করা হয় মূলতঃ জ্ঞান লাভের জন্য। কিন্তু কোন না কোন ভাবে যদি এই তিনটে জিনিষ সাধনার উদ্দেশ্য হয়ে যায়, তখন সেটা সে তপস্যার জোরে পেয়ে যাবে কিন্তু মনের এই বিকার গুলো চলতেই থাকবে। বিশ্বামিত্র চাইছেন ক্ষমতা, রাজার রাজকীয়তার অহঙ্কারে আঘাত লেগেছে, রাজার থেকে ব্রাহ্মণের শক্তি বেশি তাই সে তপস্যা করছে ব্রাহ্মণের শক্তি যাতে সে পেতে পারে।

এখন সে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে এসে বাণ ছুঁড়তে শুরু করেছে। বশিষ্ঠ মুনি তখন খুব বিরক্ত হয়ে গেছেন, আমি এখানে সাধন ভজন করি, এটা একটা আশ্রম, এখানে এরা কি তামাসা আরম্ভ করেছে। তা যাই হোক, যখন আক্রমণ করে দিয়েছে তখন বিশ্বামিত্রের এই অস্ত্রগুলোকে তো আটকাতে হবে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদণ্ডটা তুলে নিলেন। ঋষিরা একটা দণ্ডের উপরে হাত রেখে মালাতে জপ করেন, সেটাকেই বলে দণ্ড। বশিষ্টের যে দণ্ড, সেটা তাঁকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা দিয়েছিলেন। বাল্মীকির সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনজনের মধ্যে কে বেশি ক্ষমতাবান, এটা তখনো নির্ধারিত হয়নি। যাই হোক, ব্রহ্মদণ্ড সামনে রাখতেই বিশ্বামিত্রের সব অস্ত্রের শক্তিকে সেই দণ্ড শুষে নিয়েছে। শিবের যত শক্তি ছিল সব ব্রহ্মদণ্ড টেনে শুষে নিয়েছে। তখন বিশ্বামিত্র আরও রেগে গেলেন, আমি এত তপস্যা করে এত শক্তি অর্জন করলাম আর এতদিনের সাধনার অর্জিত সব শক্তি মুহুর্তের মধ্যে জলাঞ্জলি হয়ে গেল! বলেই তিনি আবার তপস্যাতে চলে গেলেন, মাঝখান থেকে তাঁর এতদিনের সব তপস্যার ফল নিষ্ফল হয়ে গেল।

আবার ঘোর তপস্যাতে ডুবে গেলেন। এদিকে ইন্দ্র ভাবছে, বিশ্বামিত্র যে ভাবে ঘোর তপস্যা করছে তাতে মনে হচ্ছে আমার ইন্দ্রত্ব না চলে যায়। ইন্দ্রের ভয় হয়ে গেছে, তখন তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য মেনকাকে বিশ্বামিত্রের কাছে ছেড়ে দিলেন। মেনকা গিয়ে এমন কায়দা দেখাল যে বিশ্বামিত্রের তপস্যা গেলে ভঙ্গ হয়ে, আর আবার তিনি খসে পড়ে গেলেন। ঋষিদের পতন হয় এটা আমাদের পরম্পরাতে খুবই স্বাভাবিক, নতুন কিছু না। টিভিতে, খবর কাগজে বাবাজীদের নিয়ে যেসব কেলেঙ্কারীর রসাল খবর পরিবেশন হয় এগুলোর বাস্তবিক কোন দামই নেই, আমাদের পরম্পরাতেই এগুলো চলে আসছে। যাই হোক ঐখান থেকে মেনকার গর্ভে জন্ম হল শকুন্তলার।

আবার বিশ্বামিত্র তপস্যায় নেমে গেলেন। ইন্দ্র এবার রম্ভাকে পাঠিয়েছেন। রম্ভাকে দেখেই বিশ্বামিত্র এমন রেগে গেছেন, বলছেন তোমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেব, বাঁচতে হলে পালাও এখান থেকে। রম্ভা তো কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। কারণ বিশ্বামিত্র এই গাঁটটা তো মেনকার সময়ই পেরিয়ে এসেছেন। বিশ্বামিত্র তখন হাজার বছর ধরে নানান রকম ভাবে তপস্যা করে চলেছেন। আর কত ভাবে তপস্যাতে বিঘ্ন করার চেষ্টা হয়েছে যে তার ইয়ত্তা নেই, যাতে খেতে না পায়, যাতে প্রচণ্ড কষ্ট পায়, যাতে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু এখন বিশ্বামিত্র অটল, সমস্ত প্রলুব্ধ, বাধাকে অতিক্রম করে করে যখন ব্রহ্মা এসে বিশ্বামিত্রকে বললেন, তুমি এখন ব্রহ্মর্ষি। কিন্তু তখনও বশিষ্টের উপরে রাগটা যায়নি। ব্রহ্মাকে বলছেন – আপনার কথাতে হবে না, বশিষ্ঠ এখানে এসে আমাকে বলুক ব্রহ্মর্ষি তাহলে আমি নিজেকে ব্রহ্মর্ষি বলে মানব। তারপরে বশিষ্ঠ এসে যখন বললেন যে আমি মানছি আপনি ব্রহ্মর্ষি। আমাদের ধর্মীয় ইতিহাসে অনেক জায়গায় বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্রের লড়াই চলতেই থেকেছে, ওদের এই লড়াই কোন দিনও থেমে যায়নি। বশিষ্ঠ যেটাকে না করে দেবেন, বিশ্বামিত্র সেটাকে হ্যাঁ করাবেই করাবেন। আবার বিশ্বামিত্র যেটাকে না করে দেবেন বশিষ্ঠ সেটাকে আবার মানবেন না। একবার তো এমন হয়েছিল যে দুজনে পাখি হয়ে গিয়ে একে অপরের উপর অভিশাপ দিয়েই চলেছেন। এইভাবে হাজার বছর ধরে যখন একে অপরের উপর অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছেন, যে ঝগড়াকে থামাতে স্বয়ং ভগাবনও পারছেন না। কিন্তু ইন্দ্র এসে বলছেন – আপনারা ব্রহ্মর্ষি, আর আপনারা একে অপরকে এই ভাবে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছেন, বন্ধ করুন এইসব ছেলেখেলা। তখন আবার তারা একে অপরের অভিশাপ সব ফেরত নিতে শুরু করল, সেটা করতে আবার হাজার বছর লেগে গেল। এগুলো সবই আখ্যায়িকা। বক্তব্য হল এদের দুজনের ঝগড়া শেষমেশ কোন দিনই মেটেনি। এখানে মিথিলাতেও যে বিশ্বামিত্র দুই ভাইকে নিয়ে এসেছেন সেটাও হয়তো বশিষ্ঠকে ছোট করার জন্য, সেটাকে অবশ্য উল্লেখ করা হয়নি।

সব কাহিনী শোনা হয়ে যাওয়ার পর রাজা জনক বলছেন – আমি একবার যজ্ঞের জন্য ভূমি শোধন করছিলাম, তখন আমি দেখতে পেলাম লাঙ্গলের অগ্রভাগে একটা শিশুকন্যা যেন কেঁদে উঠল। লাঙ্গলের অগ্রভাগকে বলা হয় সীত, সীত থেকে জন্ম হয়েছে বলে কন্যার নাম রাখা হয় সীতা। সীতা হলেন অযোনিজা, মানে কোন মাতৃযোনি থেকে তাঁর জন্ম হয়নি। ভারতের এই ধারণাটা খুবই পরিচিত, জন্মের জন্য মাতৃগর্ভের দরকার নেই, মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম হয়নি এই ধরণের ঘটনা আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে প্রচুর আছে, তার মধ্যে দ্রৌপদী, দ্রোণাচার্য, ধৃষ্টদ্যুম্নোর নাম খুব উল্লেখযোগ্য। ইদানিং কালের টেস্টটিউব বেবির সাথে অযোনিজের একটা বড় পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান এখন যেটা বলছে তা হল, সন্তানের জন্মের জন্য মা হচ্ছে আবশ্যক, বাবা না হলেও চলবে। ক্লোনিং এর জন্য মাকে প্রয়োজন হয়, বাবাকে দরকার লাগেনা। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্র বলছে মায়ের কোন দরকার নেই কিন্তু বাবাকে দরকার। কোনটা ঠিক আমরা বলতে পারব না। তবে বিজ্ঞানীরা যা বলবে আমাদের মেনে নিতে হবে। কিন্তু হিন্দুদের মতে বাবার ভূমিকা আবশ্যক মায়ের কোন ভূমিকা নেই। মেডিক্যাল সাইন্স বলছে মার ভূমিকা প্রধান আর বাবার ভূমিকা শুধু বংশ ধারাকে ধরে রাখার জন্য। মার থেকে যদি ডিম্বাশয় না পাওয়া যায় তাহলে কোন সন্তান উৎপাদন হবে না। তবে বিজ্ঞান আজকে যেটা বলছে দুদিন পরে বলবে এত দিন যা বলেছি সেটা ভুল, এখন আমরা সেটাকে পাল্টে নতুন থিয়োরি দিচ্ছি, এইজন্য বিজ্ঞানের সব কথাতে বিশ্বাস রাখা যায় না। আমাদের একজন নামকরা অযোনিজ হলেন শুকদেব, শুকদেবেরও কোন মা ছিল না।

এরপর বলছেন, সেই থেকে সীতা হয়ে গেল বীর্যশুল্কা। আগেকার দিনে নিয়ম ছিল কোন মেয়েকে যখন আপনার বাড়িতে বধূ করে নিয়ে আসবেন তখন আপনাকে শুল্ক দিতে হবে। এখন হয়ে গেছে উল্টো মেয়ের বাপ ছেলেকে পণ দেয়। আগেকার দিনে কোন মেয়েকে পেতে হলে শুল্ক দিতে হত, যেমন দ্রৌপদীর ছিল। সীতা ছিলেন বীর্যশুল্ক, যে বীর্য দেখাবে, শক্তি দেখাবে ঐটাই তোমার শুল্ক হবে। তোমাকে টাকা বা ধনরত্ন দিতে হবে না। সীতার শুল্ক হচ্ছে – জনক রাজার এখানে যে শিবের ধনুক রাখা আছে, যে এটাকে তুলতে পারবে, আর তুলে ঐ ধনুকে যে দড়ি লাগাতে পারবে সেই আমার এই মেয়ে সীতাকে পাবে।

শিবের এই ধনুক নিয়ে পরে পরে অনেক কাহিনী এসেছে। জনক রাজার পূজার যজ্ঞশালায় এই ধনুক রাখা ছিল। একদিন এসে রাজা জনক দেখেন ধনুকটা যে জায়গায় রাখা থাকে সেই জায়গা থেকে অন্য দিকে সরিয়ে রাখা আছে। খবর নিয়ে জানলেন, সীতা ঘরটা মুছতে গিয়েছিল, ধনুকটা সরিয়ে মোছার পর সেটাকে আবার জায়গায় রাখতে ভুলে গেছেন। রাজা জনক শুনে তো অবাক হয়ে গেছেন, সীতার এত শক্তি যে এই ধনুক তুলে সরিয়ে রেখেছে! তখন রাজা জনক ঠিক করে নিলেন যে এমন একজন পুরুষের সাথে সীতার বিবাহ দিতে হবে যে ধনুকটাকে তুললেই হবে না, তাতে দড়িও লাগাতে হবে। এগুলোও আখ্যায়িকা। এই সব আখ্যায়িকাকে খুব বেশি আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই।

বাল্মীকি শিবের এই ধনুকের বিশালত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন। একটা বিশাল গাড়ি যাতে ধনু রাখা আছে, সেই গাড়িকে পাঁচ হাজার সৈন্য ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে। এগুলো অতিশয়োক্তি অলঙ্কার, মূল কথা হল ধনুকটা খুব ভারী ছিল। রাজা জনক বলছেন – অনেকে বড় বড় বীর সীতাকে পাবার আশায় এই ধনুকে দড়ি লাগাতে এসেছিল, কিন্তু দড়ি লাগান দূরে থাক, তারা কেউই এই ধনুককে তুলতেই পারেনি। এমনকি একবার অনেক রাজারা সবাই মিলে আমাকে ঘিরে ফেলেছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল জোর করে সীতাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে। তারপর আমি এমন তপস্যা করলাম, আমার তপস্যাতে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে এমন শক্তিশালী সৈন্য দিলেন যাদের দ্বারা আমি এদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম।

এইসব কথাবার্তা চলছে আর অন্য দিকে শ্রীরামচন্দ্র কৌতুহল বশতঃ ঐ ধনুকটাকে পরখ করতে করতে বাঁ হাত দিয়ে তুলে নিলেন, তারপর যেই দড়িটা এক প্রান্তে লাগিয়ে একটু টান দিয়েছেন তখুনি ধনুকটা মাঝখান থেকে ভেঙ্গে গেল। এখানে দেখান হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি সবার থেকে অনেক বেশি। প্রথমে ধনুকটা তুলে নিলেন, তারপর দড়ি লাগালেন, পরে যখন দড়ির মাঝখানে তীর লাগিয়ে টান

দিয়েছেন ধনুকটা মাঝখান থেকে দু টুকরো হয়ে গেল। এই কাণ্ড দেখে সবাইতো অবাক হয়ে গেছেন, ধনুক ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য নয়, শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি দেখেই সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। রাজা জনকের প্রতিজ্ঞা ছিল যে ধনুকে দড়ি লাগাতে পারবে সেই সীতাকে পাবে। এখন রাজা জনক দেখলেন প্রথম ধাপটা শ্রীরামচন্দ্র পার করে দিলেন।

পরের দিকে এক জায়গায় বলা হবে শ্রীরামচন্দ্রের যখন ষোল বছর সীতার তখন এগার বছর। এখন এই এগার বছরের মেয়েকে পাওয়ার জন্য সব রাজারা মিলে রাজা জনককে ঘিরে রেখেছে, এই ব্যাপারটাতে একটু অবাক লাগে। সীতার এই সব বর্ণনা করা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের কাজ নয়, আধ্যাত্মিক পুরুষদের কাছে এগুলোর কোন মূল্য নেই। তাঁদের কাছে সব থেকে বড় কথা হল তিনি সাধনাটা কিভাবে করেছিলেন বা তাঁর সাধনা, তাঁর শক্তির প্রেরণাটা কি, আর আপামর মানুষের জন্য তিনি কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন। শাস্ত্রে বিশেষ করে ইতিহাস মূলক শাস্ত্রে আমাদের এই দিকটাতেই নজর দেওয়া উচিৎ কারণ যুক্তি বিচার দিয়ে দেখতে গেলে এর অনেক কিছুই দাঁড়াতে পারবে না। যেমন, যে কোন অবতার যখন আসেন তখন তাঁর যেমন ঈশ্বরীয় রূপের একটা দিক আছে আবার তাঁর মানবীয় রূপও রয়েছে, আর এই মানব রূপ তিনি করুণার বশবর্তী হয়েই নিয়েছেন, কিন্তু অবতারের মানবরূপে নিয়েই যদি সব সময় জোর দিতে থাকি তাহলে কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। তবে সাধারণ লোক অবতারের এই মানব রূপকে নিয়েই থাকতে চায়।

ঠাকুর যেমন জিলিপিকে নিয়ে একবার বলছিলেন যে, জিলিপি লাট সাহেবের গাড়ী। ভাব ও চিন্তনের দিক থেকে এই কথারও একটা মূল্য আছে। বাবলা গাছ দেখে মনে পড়ে গেল এই বাবলা গাছের ডাল দিয়ে মহাপ্রভুর মন্দিরের কোদালের বাঁট তৈরী হয়, যেই এই কথা মনে পড়ে গেল তখন সে ভাবরাজ্যে চলে গেল। যারই একটু চিন্তন ও ধ্যানের প্রতি আগ্রহ থাকে, সে যখন জিলিপি দেখবে তখন তার মনে পরে যাবে লাট সাহেবের গাড়ী, লাট সাহেবের গাড়ীর কথা মনে এলেই সেখান থেকে মন চলে যাবে কামারপুকুর, কামারপুকুর থেকে ঠাকুর, ঠাকুরে মন চলে এলেই সে ভাবরাজ্যে ঢুকে যাবে, এই রকমই হয়। ঠাকুর বলছেন – নিতাই আমার মাতা হাতি বলতে বলতে নিতাই খসে যায়, তারপর হাতিও বলতে পারে না, শুধু হা। মনটা পুরোপুরি ঐদিকে চলে গেল। এই সব কাহিনী, আখ্যায়িকা, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার এগুলোর একটাই উদ্দেশ্য মনটাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ঐ কাহিনী গুলিকে নিয়েই যদি সব সময় পড়ে থাকি তাহলেই সমস্যা এসে যাবে। যেটা তুলসীদাস করেছেন, তিনি রামচরিত মানস লিখেছেন, শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার করেছেন সব ঠিক আছে, কিন্তু সীতাকে স্বয়ম্বরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বাল্মীকি যেটা তিনটি শ্লোকে সীতার বিয়ে সেরে দিয়েছেন, সেখানে তুলসীদাস পাতার পর পাতা, শ্লোকের পর শ্লোক লিখেই গেছেন। কারণ সাধারণ লোক এটাই চায়। যারা আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চান তাদের জন্য এগুলো নয়, তাদের কাজ হচ্ছে এই সব কাহিনী থেকে আধ্যাত্মিক সারটাকে সংগ্রহ করে নেওয়া।

এরপর রাজা জনকের তরফ থেকে রাজা দশরথের কাছে খবর পাঠান হল – আপনার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র শিবের ধনুক ভঙ্গ করেছেন, এখন আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করতে পারি। সব খবর-টবর পেয়ে রাজা দশরথ মনের আনন্দে মিথিলাতে সব লোকজন সহ এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার বিয়ে হবে। বিয়ের আগে উভয় পক্ষ থেকে যার যার নিজের বংশ পরিচয় দেওয়া হল। রাজা দশরথ ছিলেন সূর্যবংশীয়। আমাদের পরম্পরাতে সূর্যবংশীয় আর চন্দ্রবংশীয় এই দুটো খুব প্রসিদ্ধ নামকরা বংশ, এই দুটোর নামের মধ্যে ছোট বড়র কোন ব্যাপার নেই, দুটো বংশ শুধু দুটি ধারা। পুরাণে আবার বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে এই দুই বংশ এবং অন্যান্য প্রাচীন বংশ কিভাবে কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে, তার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। চন্দ্রবংশীয় রাজার কারা, সূর্যবংশীয় রাজারা কারা, যেমন শ্রীকৃষ্ণ হলেন চন্দ্রবংশীয়, এগুলো সব পুরাণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এইভাবে পরিচয়াদির পর বিয়ে হয়ে গেল। রাজা জনকের নিজের ঔরসজাত এক কন্যা ছিল, যার নাম ঊর্মিলা, লক্ষণের সাথে ঊর্মিলার বিয়ে হল। রাজা জনকের ছোট ভাই কুশধ্বজের দুটি কন্যা ছিল, ভরত আর শত্রুঘ্নের সাথে তাদের বিয়ে দিলেন। এখানে তখনকার দিনে বিয়ে কিভাবে হত তার বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর সবাই অযোধ্যায় ফিরে যাবে।

অযোধ্যায় যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন হঠাৎ রাজা দশরথ বশিষ্ঠদেবকে বলছেন – আমরা যে এভাবে এখন অযোধ্যার দিকে যাত্রা শুরু করেছি, এই সময় এক দিকে দেখছি ভয়ঙ্কর পাখিগুলো ডাকছে আবার অন্য দিকে হরিণগুলো আমাদের ডান দিকে রেখে ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাজা দশরথ বলতে চাইছেন হরিণগুলোর ডান দিকে মানে রাজা দশরথদের বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন ভয়ঙ্কর পাখিদের কণ্ঠস্বর আর হরিণরা বাঁ দিক দিয়ে চলে যাওয়া এই দুটো যুগপৎ অশুভ আর শুভ কিছু ঘটতে যাচ্ছে তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখন যেমন সকালে উঠে এক শালিখ দেখে নেওয়া মানে আজকে দিনটা খারাপ যাবে আবার দুটো শালিখ দেখা মানে দিনটা ভালো যাবে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন একটা বেড়াল রাস্তা কেটে দিল, তার মানে অশুভ কিছু ঘটবে। ঠাকুরও এগুলো মানতেন, তিনি একদিন বলছেন – আজ সকালে উঠে অমুকের মুখ দেখেছি বলে এই গোলমালটা হয়েছে। সংস্কৃতে এই জিনিষটাকে বলা হয় নিমিত্ত। হিন্দীতে বলে শকুন, শকুন মানে ভালো অপশকুন মানে খারাপ। এই জিনিষটাকেই আবার অনেক সময় বলা হয় ফল বিচার, একটা জিনিষ হচ্ছে, সেই জিনিষটাকে দেখে বলা হবে এর কি ফল হবে।

বশিষ্ঠদেব তখন বলছেন – এই সব কিছুকে যদি ভালো করে দেখা হয় তাহলে এই যে অশুভ পাখি গুলি আওয়াজ করছে তার মানে একটা বিশাল ভয় আসছে, আর এই যে হরিণগুলো তাদের ডান দিক দিয়ে রেখে আমাদের বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে এর লক্ষণ হচ্ছে ভালো কিছু হতে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা আমাদের সবার জীবনেই একটা খুব মজার বিষয়। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন বলছেন – *নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব* – হে কেশব, আমরা যে এই যুদ্ধের জন্য এখানে সমবেত হয়েছি এর নিমিত্তগুলি সব বিপরীত দেখছি। আবার একাদশ অধ্যায়ে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন* – হে অর্জুন এই যুদ্ধে তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। হিন্দু দর্শনে নিমিত্তের তত্ত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। বলা হয় যখন ঝড় আসে, তার আগে আসে মিষ্টি বাতাস, তারপর আস্তে আস্তে জোরে হাওয়া বইতে শুরু করে, তারপর আরও জোরে বাতাস বইতে থাকে। ঠিক তেমনি, আমরা হলাম নিয়তির হাতের পুতুল। এই পুতুল কিভাবে নাচবে আমাদের জানার কথা নয়, তখন এই নিমিত্ত করে করে জানার চেষ্টা করা হয়। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আর একটা বেড়াল রাস্তা কেটে দিল, তারপরেই আমার একটা গোলমাল হয়ে গেল। এখন বেড়ালে রাস্তা কেটেছে বলে আমার গোলমালটা হয়েছে? নাকি গোলমাল হবে বলে বেড়াল রাস্তা কেটেছে? একটা বিরাট ঝড় আসছে, তার আগাম সূচক হল মিষ্টি বাতাস। এখন মিষ্টি বাতাস এলো বলে কি ঝড় এসেছে, নাকি ঝড় আসবে বলে মিষ্টি বাতাসটা এলো? ঝড় আসছে বলেই মিষ্টি বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঠিক সেই ভাবে বেড়ালটা রাস্তা কাটল বলে গোলমালটা হল, নাকি গোলমালটা হবে বলে বেড়ালটা সামনে এসেছে। এখন বেড়ালকে পাথর মেরে কি লাভ? আমি দুটো শালিখ দেখেছি বলে দিনটা ভালো যাবে, না দিনটা ভালো যাবে বলে আমি দুটো শালিখ দেখেছি? এগুলো খুবই চিন্তা ও ভাববার বিষয়।

কেন চিন্তনের ব্যাপার? ভগবান বলছেন *নিমিত্তমাত্রং ভব* – আমরা যা কিছু করছি এগুলো সব তিনি আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য হচ্ছে, এই যে যুদ্ধ হতে যাচ্ছে এর সব কিছু আগে থাকতেই ঠিক হয়ে আছে। যুদ্ধের ঝড় আসছে, আর এই যুদ্ধের ঝড়ে সব উড়ে যাবে। এখন তুমি যদি নিমিত্ত হিসেবে সামনে দাঁড়িয়ে যাও, তাহলে তোমার জয়জয়কার হবে। কি রকম জয়জয়কার হবে? আমি দিল্লী যাচ্ছিলাম এখন বেড়াল রাস্তা কেটে দিল, সেইজন্য সারা রাস্তাতে আমার নানা দুর্ভোগ হয়েছে। আমার এই ভাবনাটাই হচ্ছে মুর্খের মত, আমার দিল্লী যাওয়ার পথে দুর্ভোগ হবার ছিল বলেই বেড়াল রাস্তা কেটেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের এই পরিণাম আগে থাকতেই ভগবানের তরফ থেকে ঠিক করা ছিল।

অর্জুন শুধু মাত্র সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর তাতেই তাঁর নাম-যশ হয়ে গেল। সেইজন্য সব সময় নিমিত্ত বিচার করতে হয়। কিছু কিছু জিনিষ আছে যা নিয়তি ঠিক করে রেখেছে, এইটাই হবে।

স্বামীজী খুব সুন্দর করে বলছেন – ঠাকুরের রথ চলছে, যারা এই রথের দড়িতে হাত লাগাবে তারা ধন্য হয়ে যাবে। আর যারা এই রথকে আটকাবার চেষ্টা করবে তারা পিশে যাবে। স্বামীজী এই কথা যখন বলছেন, তখন মঠ মিশন কিছুই হয়নি। তার মানে নিয়তি এটাই ঠিক করে রেখেছে। জগন্নাথের রথের চাকা ঘুরবেই, আগে থাকতেই ঠিক হয়ে আছে, স্বামীজীও তাই বললেন রামকৃষ্ণ মিশন এই ভাবেই চলবে। তুমি এতে হাত দাও আর নাইই দাও রামকৃষ্ণ মিশন এগোবেই এগোবে। তুমি যদি হাত দাও তাহলে তুমি ধন্য হয়ে যাবে। এইটাই নিমিত্তমাত্র হওয়া। এগুলোকে নিমিত্তও বলা যায় আবার এগুলোকে লক্ষণ বা শুভ চিহ্নও বলা যেতে পারে। এই লক্ষণগুলিকে দেখে ফল বিচার করা হয়। নিমিত্ত এইভাবে দু ভাবে অর্থ করা যায়, একটা হচ্ছে লক্ষণ যেটা আগাম পরিণামের সূচক আর আরেকটা অর্থ ঈশ্বরের যন্ত্র হওয়া, তুমি এই কর্মের মাধ্যম হবে। কিসের মাধ্যম? এই যুদ্ধে যে জয় হবে তার মাধ্যম। অর্জুন না থাকলেও পাণ্ডবদের জয় হবে, কিন্তু অর্জুন যদি হাত লাগায় তাহলে অর্জুন ধন্য হয়ে যাবে। এখন লোকে বলে অর্জুনের জন্যই পাণ্ডবরা যুদ্ধে জয় লাভ করেছে, যেমন বেড়ালটা রাস্থা কেটেছে বলে গোলমালটা হয়েছে। হিন্দুরা সব সময় বলবে গোলমালটা হবার ছিল বলেই বেড়াল রাস্থা কেটেছে। সেইজন্য খারাপ কিছু লক্ষণ দেখলেই স্বস্তিবাচক মন্ত্রাদি পাঠ করতে হয়। মহারাজরা যখন কোন এই ধরণের অশুভ কিছু লক্ষণ দেখেন তখন আরও বেশি বেশি করে তাঁরা ঠাকুরের নাম করতে থাকেন। এগুলো হল আগাম সূচক, এটা দেখে তুমি জেনে গেলে যে তোমার গোলমাল হতে যাচ্ছে তাই ঠাকুরের নাম বেশি বেশি করে ওটাকে কাটানোর চেষ্টা কর।

তখনকার সমাজে নিমিত্তের এই ব্যাপার গুলো খুব ভালো ভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বাল্মীকিই প্রথম এগুলোকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বেদ-উপনিষদে পুরোপুরি দর্শনের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, ওখানে এই ধরণের কিছু পাওয়া যাবে না। এই জিনিষ গুলিকে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বাল্মীকি দেখাচ্ছেন তখনকার দিনের বড় বড় ঋষি থেকে রাজারা ও সাধারণ মানুষরা এগুলিকে মানতেন। এখানে দেখালেন রাজা দশরথও এগুলো মানতেন, এই ব্যাপারে আবার জিজ্ঞেস করছেন তাঁর গুরু ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বশিষ্ঠদেবকে – আপনিই বলুন কি হতে যাচ্ছে।

শুভ অশুভ লক্ষণের আলোচনা শেষ হতে হঠাৎ সবার মাঝখানে পরশুরামের আবির্ভাব। উনি শুনেছেন যে শিবের ধনু ভঙ্গ হয়েছে, শুনেই প্রচণ্ড রেগে তেড়েফুড়ে এসেছেন। সবাই পরশুরামকে দেখে খুব ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেছে, সবাই জানেন যে পরশুরাম হলেন ক্ষত্রিয়েদের ঘোর বিরোধী। তখন রাজা দশরথ পরশুরামের সামনে হাতজোড় করে বলছেন – ***প্রশান্তস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্চ মহাতপাঃ*** – আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি স্বাধ্যায় আর তপস্যা এই দুটোতেই সর্বদা নিযুক্ত থাকেন। আমার এই দুই সন্তান নেহাতই শিশু, এরা যদি কোন দোষ করে থাকে আপনি এদের ক্ষমা করে দিন। আপনি এত বড় তপস্বী, এত প্রতাপ আপনার, আপনি এদের উপর আর রাগ দেখাবেন না। আর আপনি হলেন শস্ত্রত্যাগী। পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আমি আর অস্ত্র গ্রহণ করব না। দশরথ বলছেন – আপনি তো শস্ত্রত্যাগী হঠাৎ আমার সন্তানের প্রাণ নিতে কেন উপস্থিত হলেন? আর যদি শ্রীরামের প্রাণ চলে যায় তাহলে আমরা কেউই বাঁচব না, কেননা শ্রীরামের জন্য আমরা সবাই প্রাণ দিয়ে দেব। আমরা যদি সবাই শ্রীরাম সহ মারা যাই তখন এটাই আপনার পক্ষে একটা বিরাট হিংসা হয়ে যাবে। আপনিই তো বলেছিলেন হিংসা হয় এই রকমের কোন কাজ আপনি আর করবেন না, কিন্তু তারপরেও আপনি কেন শস্ত্র ধারণ করছেন।

সংক্ষেপে পরশুরামের কাহিনী হল – পরশুরাম ছিলেন জমদগ্নী ঋষির সন্তান, তাঁর মায়ের নাম ছিল রেনুকা। কোন এক কারণে জমদগ্নী তাঁর পত্নী রেনুকার উপরে রেগে তাঁর সন্তানদের আদেশ দিলেন তোমাদের একজন কেউ গিয়ে মায়ের গলা কেটে দাও। কোন সন্তানই রাজী হলেন না, কিন্তু পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞাকে পালন করতে রাজী হয়ে গেলেন। তাঁর কাছে সব সময় যে কুঠার থাকত, সেই কুঠার দিয়ে মায়ের

গলাটা ধড় থেকে আলাদা করে দিলেন। গলা কেটে দিতেই বাবা খুব খুশি হয়ে গেলেন, আর বাবা ছিলেন ঋষি, খুশি হয়ে পরশুরামকে বর চাইতে বললেন। পরশুরাম প্রথম বরই চাইলেন আমার মা যেন আবার জীবনটা ফিরে পান, আর তাঁর যেন এই ঘটনাটা মনে না থাকে। শেষ পর্যন্ত তাই হল। তারপরই পরশুরাম একটা বিরাট শক্তি পেয়ে গেলেন, নানা রকমের অস্ত্রবিদ্যাতে তিনি প্রচণ্ড বিজ্ঞ ও পারদর্শি হয়ে যান।

সেই সময় কার্তবীর্যার্জুন বলে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তিনি একবার কি এক ভুল বোঝাবুঝিতে জমদগ্নিকে হত্যা করে ফেলেন। পিতার ঐভাবে মৃত্যু দেখে পরশুরাম গেছে প্রচণ্ড রেগে, কেননা তপস্যার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জমদগ্নি সমস্ত রকমের অস্ত্র ত্যাগ করে দিয়েছিলেন, নিরস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে ঐভাবে এক ক্ষত্রিয়ের হাতে নৃশংস ভাবে নিহত হতে দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন আমি এই পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করে দেব। এর পর তিনি একুশ বার সমস্ত পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। এর পরে অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু এত কিছু করার পর পরশুরামের মনে একটা ধিক্কার এসেছিল, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে এসব কি করছি, আমি আর অস্ত্র ধারণ করব না। এর মধ্যে আবার তিনি যা কিছু তাঁর ছিল সব গুরুকে দান করে দিলেন। একদিকে তিনি সারা পৃথিবী জয় করে নিয়েছিলেন। আমাদের কবিদের কাছে পৃথিবী হল একটু খানি জায়গা। গুরু পরশুরামকে বললেন – তুমি যখন সমগ্র পৃথিবী জয় করে নিয়েছ আর এখন গুরুকে সব দান করে দিয়েছ, এখন তোমার আর কোথাও নিজের বলে কিছু রইল না, কিন্তু থাকার জন্য তো একটা জায়গা চাই। তাই পরশুরামকে বলা হল এই পৃথিবীর কোথাও তুমি থাকতে পারবে না, মহেন্দ্র পর্বত পৃথিবীর বাইরে, তুমি ঐ মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে থাক। সেই থেকে পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে তপস্যাদি করতে থাকলেন। কিন্তু এই সব বলা সত্ত্বেও পরশুরামের কিন্তু শক্তির দর্প একটুও কমল না।

এখানে আসার পর রাজা দশরথের কথাতেও তাঁর মন নরম হল না। পরশুরাম বলছেন – দুটো ধনুক তৈরী হয়েছিল একটা শিবের কাছে ছিল আরেকটা বিষ্ণুর কাছে ছিল। শিবের ধনুকটা তো তোমার ছেলে ভেঙ্গে দিয়েছে। এই যে বিষ্ণুর ধনুক আমার কাছে দেখছ এটাও খুব শক্তিশালী ধনুক, হে শ্রীরামচন্দ্র তুমি এটাতে দড়ি লাগাও। এইখানে এসে বাল্মীকি আবার খুব সুন্দর একটা কাহিনীকে নিয়ে আসছেন। একবার দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন শিব আর বিষ্ণু এই দুজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। আমরা এখনও ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের খুব প্রাথমিক অবস্থাতে আছি। মানে এখনও ব্রহ্মা প্রধান আর দেবতারা তাঁর অধীনে। কিন্তু এই ছোট ছোট দেবতাদের মধ্যে শিব আর বিষ্ণু আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করেছেন। দেবতাদের প্রশ্ন হচ্ছে শিব আর বিষ্ণু এই দুজনের মধ্যে কার শক্তি বেশি। দেবতারা প্রশ্ন করার পর ব্রহ্মা কায়দা করে শিব আর বিষ্ণুর মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছেন, উদ্দেশ্য একটাই কার শক্তি বেশি যাচাই করা, যে জিতবে তারই শক্তি বেশি বলে ধরে নেওয়া হবে। তখন বিরাট লড়াই শুরু হয়ে গেছে, অনেক দিন ধরে শিব আর বিষ্ণুর লড়াই চলতেই থাকল, কেউ হার স্বীকার করছেন না। তারপর বিষ্ণু এক হুঙ্কার দিলেন, হুঙ্কার দিতেই শিব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাতেই শিবের শক্তি চলে গেল। এরপর দেবতারা, সব ঋষিরা একত্র হয়ে এই দুজনকে প্রার্থনা করলেন যে, আপনারা এবার শান্ত হন, এর বেশি আর নিজেদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা করতে যাবেন না। বাল্মীকি এখানে দুজনের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছেন।

এমনিতে বাল্মীকি ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত, যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে দেখাচ্ছেন তিনি বিষ্ণুর অংশ থেকে এসেছেন। আবার তিনি শিবেরও মহিমা কিছু কিছু বর্ণনা করছেন, তবে বিষ্ণুর মত পুরোপুরি করছেন না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য যে শিব শিথিল হয়ে গেছেন, সেইজন্য দেবতারা ঘোষণা করে দিলেন বিষ্ণুই বড়। বিষ্ণুকে বড় করতেই শিব রেগে গেলেন, রেগে গিয়ে তিনি তাঁর যত ধনুক টনুক ছিল সব বিদেহ নরেশ, মানে জনক রাজার পিতামহকে দিয়ে দিলেন। আমি এই ধনুক নিয়ে যখন জিততে পারলাম না তাই এই ধনুক আমি ছেড়ে দিলাম। বিষ্ণুও তখন তাঁর ধনুকটা জমদগ্নির পরিবারের কাছে গচ্ছিত রেখে দিলেন। এইভাবে শিব আর বিষ্ণুর ধনুক দুটো আলাদা পরিবারের কাছে জমা পড়ে গেল। শিবের ধনুক চলে গেলে

মিথিলাধিপতির পরিবারের কাছে, আর বিষ্ণুর ধনুক চলে গেলে পরশুরামের পূর্বপুরুষদের কাছে। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে শিবের ধনুক ভঙ্গ হয়ে গেছে, এখন পরশুরাম বিষ্ণুর ধনুক নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়েছেন, এই ধনুর নাম বৈষ্ণবধনু।

এখানে খুব সুন্দর একটা সংলাপ আছে। রাজা দশরথ যখন পরশুরামের সঙ্গে কথা বলছেন তখন শ্রীরামচন্দ্র – **গৌরবাদ্ যন্ত্রিতকথঃ পিতৃ রামমথাব্রবীৎ।।**১/৭৬/১। এতক্ষণ বাবার গৌরবের কথা মনে করে শ্রীরামচন্দ্র কিছু বলছিলেন না। আমাদের ঐতিহ্যতে প্রথমে থেকেই এই রীতিতে খুব জোর দেওয়া হয়, বড়দের সামনে কখন মুখ খুলতে নেই। এতক্ষণ রাজা দশরথ আর পরশুরামের মধ্যে অনেক ধরণের কথাবার্তা চলছিল তখন শ্রীরামচন্দ্রও কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু বলছিলেন না। কিন্তু যখন তুলসীদাসের রামচরিতমানসে এই ব্যাপারটা পুরো পাল্টে গেছে। লক্ষ্মণতো সেখানে পায়ে পা দিয়ে সমানে পরশুরামের সঙ্গে তর্ক করে যাচ্ছেন। আর শ্রীরামচন্দ্রও সমানে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। বাল্মীকি এখানে ভারতীয় ঐতিহ্যকে একেবারে নিখুঁত ভাবে ধরে রেখেছেন, বাল্মীকি এই ধরণের সংলাপ কক্ষণ ব্যবহার করবেন না, যেটা তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানসে করেছেন। বাল্মীকি ছিলেন তপস্বী আর প্রচণ্ড স্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তাই কোন জিনিষকে তিনি খেলো করে ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যাবেন না।

শ্রীরামচন্দ্র এবারে বলতে শুরু করেছেন, বলছেন – হে পরশুরাম! আপনি নিজের সম্বন্ধে যা কিছু বলেছেন আমি সব মানছি, আর আমিও ক্ষত্রিয় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, আমি আমার পিতৃদেবের সম্মুখে আর আপনি ব্রাহ্মণ দেবতা বলে আপনাদের সামনে আমি মুখ খুলতে চাইছিলাম না। কিন্তু আপনি এক তরফা যে তিরস্কার করে যাচ্ছেন, সেটা এখন একটা সীমারেখাকে উল্লঙ্ঘন করে যাচ্ছে, একটা সীমার পর আর তা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। আপনি যা কিছু করেছেন সবই খুব মহৎ এ ব্যাপারে আমি একমত, আপনি বলে যাচ্ছেন আমিও শুনছি। আর আমার বাবা সামনে রয়েছেন, আপনিও অত্যন্ত সম্মানীয়, আপনাদের দুজনের সম্মানের কথা ভেবে এতক্ষণ আমি চুপ করেছিলাম। কিন্তু আপনি তিরস্কারের পর তিরস্কার করেই যাচ্ছেন, এবারে তাই আমি আর চুপ করে থাকতে পারছি না।

শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলে পরশুরামের হাত থেকে ধনুটা নিয়ে তাতে বাণ সন্ধান করলেন। সন্ধান করেই তিনি বলছেন – **ইমাং বা ত্বদ্গতিং রাম তপোবলসমর্জিতান্। লোকানপ্রতিমান্ বাপি হনিষ্যামীতি মে রতিঃ।।** ১/৭৬/৭। হে পরশুরাম, এবার বলুন দুটো লোকের মধ্যে আপনার পক্ষে কোন লোকটা শ্রেষ্ঠ। আপনি একেই ব্রাহ্মণ, আর তার উপরে বিশ্বামিত্রের সাথে আপনার সম্পর্ক আছে, আবার বিশ্বামিত্র আমার গুরু। তাই আপনার উপরে আমি বাণ চালাতে পারব না। আমি আপনার উপরে বাণ চালিয়ে আপনার প্রাণ হরণ করে নিতে পারি, কিন্তু আমি আপনার প্রাণ নেব না। তাহলে আমি কি করতে চাইছি? এই জগতে দুটো লোক আছে, একটা এই লোক আরেকটি পরলোক, এই দুটো লোকের মধ্যে যে কোন একটি লোক আপনাকে বেছে নিতে হবে। পূণ্য অর্জন করে আপনি যে বর লাভ করেছেন, যার সুবাদে আপনি যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন, এই পূণ্যটা আপনার চলে যাবে, আর তা নাহলে আপনি তপস্যা করে স্বর্গলোকের জন্য যা কিছু সঞ্চয় করেছেন সব সঞ্চয়কে শেষ করে দেবে। এখন আপনিই ঠিক করুন কোনটা আপনার কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হচ্ছে।

শ্রীরামচন্দ্র যে এই বাণ সন্ধান করেছেন এটা যে শুধু কাউকে বধ করে দিতে পারে তা নয়, এই সব বাণ আসলে দৈবীগুণ সমন্বিত, এই বাণ দিয়ে তপস্বীর তপস্যা করে যত পূণ্য হয়েছে, সেই পূণ্যের নাশও করে দিতে পারে। আগেকার দিনে এই ধরণের অনেক ঘটনা আছে। তখনকার দিনে দূতেরা ছিল অবধ্য, অবধ্যতো কি হয়েছে, তার কান কেটে নাও, প্রাণে না মেরে অপমান করে ছেড়ে দিল। এই সব নানা রকমের নিয়ম ছিল, এখানেও শ্রীরামচন্দ্র বলছে, আপনার বধ করব না, কিন্তু আপনার দুটো লোকের একটা লোককে শেষ করে দেব, আপনি কোন লোকটা চান বলুন।

শ্রীরামচন্দ্র বৈষ্ণবীধনু তুলে নিতেই পরশুরাম স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, তিনি বুঝে গেছেন শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি সামান্য নয়। তারপর শ্রীরামচন্দ্রের ঐ রকম তেজোদীপ্ত কথা শুনে আরও ঘাবড়ে গেছেন, বাল্মীকি খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন – **নির্বীর্যো জামদগ্ন্যোহসৌ রামো রামমুদৈক্ষত**।।১/৭৬/১১। অর্থাৎ, জামদগ্নি পুত্র পরশুরাম শক্তিহীন হয়ে গিয়ে দশরথনন্দন শ্রীরামের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলেন। **তেজোভির্গতবীর্যত্বাজ্জামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ। রামং কমলপত্রাক্ষং মন্দং মন্দমুবাচ হ**।।১/৭৬/১২। শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমের সামনে পরশুরামের যত তেজ ছিল সব শেষ হয়ে গেল।

তেজের এটা খুব মজার ব্যাপার। এই তেজ নিয়ে বাল্মীকি রামায়ণে অনেক বর্ণনা আছে। আমাদের কবিদের কাছে এই তেজের বর্ণনা করাটা খুব প্রিয় বিষয়। একটা জায়গায় বর্ণনা আছে, শ্রীরামচন্দ্র এক স্থানে সবার তেজকে টেনে নিচ্ছেন। যতক্ষণ শ্রীরামচন্দ্র সভাতে প্রবেশ করেননি, ততক্ষণ সবাই যেন দেদীপ্যমান হয়ে জ্বলজ্বল করছেন। যেই মাত্র শ্রীরামচন্দ্র সভাতে প্রবেশ করলেন তখন তিনি সবার তেজ হরণ করে নিলেন। আসলে তেজ হরণ করা হয় না। এটা অনেকটাই এই রকম, যেমন একটা অন্ধকার জায়গায় প্রদীপ জ্বলছে, তখন ঐ জায়গাটা খুব আলোকিত থাকবে, যখন সূর্যের উদয় হয়ে গেল তখন সূর্যের আলোর বিকিরণে প্রদীপের আলোটা চাপা পরে গেল, এই যে প্রদীপের আলোটা চাপা পড়ে যাচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে যেন প্রদীপের তেজকে সূর্য হরণ করে নিল। প্রদীপের যা তেজ আছে সেই তেজই আছে, তার চেয়েও যদি বেশি আলোময় কোন বস্তু এসে যায় তখন সেই তেজটা চাপা পরে যায়। এখানে একজন মহারাজ ক্লাশ নিচ্ছেন এখন যদি এখানে প্রেসিডেন্ট মহারাজ চলে আসেন তখন সবার নজর স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর দিকে চলে যাবে। এটা এক ভাবে তেজ চাপা পরে যাওয়া হয়। দ্বিতীয় যেটা হয়, পরশুরামকে যখন ছোট করে দেওয়া হয়েছে তখন তাঁর তেজটা হরণ হয়ে গেল। যখন দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে লড়াই হয়, দুজনেই অহঙ্কারে পূর্ণ, লড়াইয়ে যখন একজন হেরে যায় তখন তার তেজটা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এর ব্যাতিক্রমও হয়, লড়াইতে হেরে গেল কিন্তু তার তেজ হরণ হল না। আলেকজান্দার যখন পুরুকে হারিয়ে দিয়ে বন্দী করে নিয়েছে তখন আলেকজন্দার পুরুকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কি রকম ব্যবহার চাও? তখন পুরু বলছেন যেমন এক রাজা আরেক রাজার সঙ্গে ব্যবহার করেন। মানে আলেকজান্দার পুরুর তেজ হরণ করতে পারল না। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও কেউ কারুর তেজ হরণ করতে পারেনি, একজন একজনকে মেরে ফেলছে কিন্তু কেউ কারুর তেজ হরণ করতে পারছে না। এখন পুরুর তেজ বা মহাভারতের যুদ্ধের কারুর তেজ হরণ হল না কেন? অর্থাৎ যারা স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত, যারা স্বধর্ম পালন করেন তাঁদের তেজ কখনই হরণ হয় না। মহাভারতের যে যুদ্ধ সবাই স্বধর্ম পালন করছেন। পরশুরাম কিন্তু স্বধর্ম পালন করছিলেন না। অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। অহঙ্কারে যারাই এগিয়ে গেছে, এগিয়ে গিয়ে হেরে গেলে তার তেজটা চলে যাবে। ঠিক তেমনি অহঙ্কারের চোটে যদি জিতেও যায় তাহলেও কিন্তু তেজ বাড়বে না, গর্বোন্মত্ত হয়ে যাবে। তেজ আসে তাদেরই যারা একমাত্র স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত। যে সব মায়েরা পরিবারে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত, রোজ রান্নাবান্না করছে, সবাইকে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করে যাচ্ছে, থালা বাসন মাজছে, ঘরদোর পরিষ্কার করছে, তাঁদের চেহারাই অন্য রকম হবে। স্বধর্মে যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে সে কোন দিন কারুর কাছে ছোট হবে না, তাকে যতই গালাগাল দিয়ে দিন, যতই নিন্দা মন্দ করুন, কোন দিন তার তেজ হরণ হবে না। স্বধর্মের থেকে যেই সরে যাবে তখন জয়ী হলে গর্বোন্মত্ত হবে আর পরাজিত হলে একেবারে শেষ হয়ে গিয়ে ভেঙ্গে পরবে।

এখানে পরশুরাম গর্বোন্মত্ত হয়ে বলছেন – কে এই রাম, যে নাকি শিবের ধনু ভেঙ্গে দিয়েছে! এই নাও বিষ্ণুর ধনু, দেখি কেমন তুমি ভাঙ্গতে পার এটাকে। তারপর তার পরিণতিও সেই রকমই হয়েছে। সেইজন্য যারা খুব বুদ্ধিমান প্রশাসক তারা কখনই কোন ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করে না। চ্যালেঞ্জ করা মানেই আমি স্বধর্ম থেকে সরে এসেছি। ভারতের পরম্পরাই হল স্বধর্ম। আবার ক্ষমা ধর্মটাও স্বধর্মের মধ্যেই আসে। আমাদের এখানে যারাই মহৎ হয়েছেন, প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন সবাই স্বধর্ম করেই পেয়েছেন। পরশুরাম যাই করে থাকুন না কেন, একুশ বার ক্ষত্রিয়দের পিটিয়ে শেষ করেছেন, এগুলো কোনটাই তিনি স্বধর্ম অনুযায়ী

করেননি, সবই তিনি ক্রোধের বশে করেছেন। পরশুরাম কিন্তু বিরাট বড় ঋষি, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তপস্যা করছে বলেই সে বিরাট বড় কিছু হয়ে গেল তা কখনই নয়। তপস্যা করে অনেক সময় ভালো কাজ করতেও পারেন আবার অনেক সময় ভালো কাজ নাও করতে পারেন। যেমন রাবণ তার যে এত শক্তি সব তপস্যার ফলে, কিন্তু খারাপ কাজের দিকেই তার প্রবৃত্তি। কুম্ভকর্ণ, ভস্মাসুর এদেরও যা কিছু শক্তি সব তপস্যার ফলে হয়েছিল।

তখন পরশুরাম বলছেন – দ্যাখো, দিনের বেলায় আমি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু গুরুর আদেশে আমাকে মহেন্দ্র পর্বতে ফিরে যেতে হয়, সেইজন্য তুমি এক কাজ কর, আমার যে দ্রুত গমন শক্তি, যার জন্য আমি যখন ইচ্ছে যেখানে খুশি চলে যেতে পারি, আমার এই শক্তিটাকে নাশ করো না। তাহলে আমি খুব দ্রুত আমার নিবাসস্থল মহেন্দ্র পর্বতে চলে যেতে পারব। তবে আমি আপনাকে একটা কথা বলছি, আপনি আমাকে নাশ করে দিন, কিন্তু একটা ব্যাপার, মধু দৈত্যকে ভগবান বিষ্ণু বধ করেছিলেন, এই মাত্র যে ধনুতে আপনি দড়ি লাগিয়ে দিয়েছেন, এই কাজ ভগবান বিষ্ণু ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, আপনিই সেই ভগবান বিষ্ণু। এই বলে পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে মহেন্দ্র পর্বতে চলে গেলেন। পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে যে অর্থে অবতার বলছেন, আমরা যেই অর্থে অবতারকে বিশ্লেষণ করি, সেই অর্থে বলছেন না। বিষ্ণুর শক্তি এই অর্থে শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার বলছেন। এখানেই বালকাণ্ড শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বাল্মীকি রামায়ণ – ১৫ই মে ২০১০

অযোধ্যা কাণ্ড

রামায়ণ ও মহাভারত মূলত মহাকাব্য, কাব্য মানেই তাতে অনেক অপ্রাসঙ্গিক জিনিষের সমাবেশ থাকবে। এই দুটি মহাকাব্যের কাহিনী ও অপ্রাসঙ্গিক জিনিষগুলি আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এবং তার ঐতিহ্য কিভাবে বিবর্তিত হয়ে হয়ে আজকের এই অবস্থাতে এসে দাঁড়িয়েছে তার সাথে সাথে তখনকার দিনে সামাজিক আচার, রীতি-নীতি গুলি কি রকম ছিল, সেগুলোকে জানাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এটি মাথায় রেখে আমরা বাল্মীকি রামায়ণ অধ্যয়ন করব।

বাল্মীকি ছিলেন তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে নিরত একজন উচ্চকোটির ঋষি। তপস্যা ও সাধনায় তিনি তাঁর নিজস্ব একটা সীমাতে পৌঁছে গেছেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনে চরম উন্নতির একটা সীমা থাকে, যতই সে চেষ্টা করুক ঐ নির্দিষ্ট সীমারেখাকে সে অতিক্রম করে যেতে পারবে না। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন কোন দিনই আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংস বা স্বামীজী হতে পারব না, কখনই সম্ভব নয়, প্রত্যেক মানুষের সম্ভবনার একটা সীমারেখা আছে, যেটাকে সে কখনই অতিক্রম করে যেতে পারেনা। উড়োজাহাজ যতই জোরে আর উঁচুতে উঠুক, চাঁদে কিন্তু যেতে পারবে না। কারণ চাঁদের যাওয়ার জন্য একটা বিশেষ ভেলোসিটি লাগে, এটাকেই এসকেপ ভেলোসিটি বলা হয়। পাখিদের মধ্যেও আকাশের উঁচুতে ওড়ার একটা সীমারেখা আছে, তার ওপরে তারা যাবে না। কাক, পায়রা, যত উপরে যাবে চিল তার থেকে বেশি উপরে যাবে, হাঁস তার থেকে আরও উপরে যায়। ঠিক তেমনি যারা খুব পড়াশোনা করে তাদেরও একটা সীমা বাঁধা আছে ৭০%, ৮০%, ৯০%র মধ্যে। যে ৭০% নম্বর পাচ্ছে সে যদি অনেক চেষ্টা করে তাহলে হয়তো মেরে কেটে ৭০% থেকে ৭২% পর্যন্ত যাবে। এটাকে যদি সে মেনে নেয় যে আমি সত্তরের ঘর পার করতে পারব না, তখন তার দুশ্চিন্তা উদ্বেগ গুলো কেটে যাবে।

কিন্তু ডান দিক বাঁ দিকে বিস্তার করার ক্ষেত্রে তার কোন সীমারেখা নেই। একটা পাখি উপরের দিকে ওড়ার একটা সীমা আছে কিন্তু একটা পাখি যদি ভারত থেকে উড়তে শুরু করে পশ্চিম দিক বরাবর

যেতে থাকে তাহলে এখান থেকে খুব সহজে আমেরিকাতেও চলে যেতে পারে। পূব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ যেখানে যত বার যত খুশি সে উড়ে যেতে পারবে, কিন্তু ওপরের দিকে গেলে সে বেশি উপরে যেতে পারবে না। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এই নিয়মটি প্রযোজ্য, এর কোন ব্যতিক্রম নেই। সাধনার জীবনেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। প্রত্যেক সাধকের একটা সীমা আছে, ঐ সীমারেখাকে একটা জন্মে সে কখনই অতিক্রম করে যেতে পারবে না। আমাদের জপ ধ্যানের একটা সীমা আছে, আমাদের যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হবে তারও একটা সীমা আছে। সীমা রেখাটা বাড়বে, এই জন্মে একটু বাড়ল, ৭০% থেকে ৭২%, পরের জন্মে তার থেকে আরকেটু বেড়ে হয়তো ৭৪% হল, কিন্তু ৭০ থেকে ৭৫% যেতে তার অনেক জন্মই হয়তো লেগে যাবে। যদি সে একেবারেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তাহলে ৭০% থেকে ৪৫% নীচে নেমে যাবে। আমাদের ঋষিরা, সাধুরা দেখতেন তাঁর শিষ্যরা যেন ৭০% থেকে খসে ১০% বা ১২% নেমে না আসে। আমরা যে এখানে এত দিন ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে নিয়ে এত কিছু আলোচনা করে আসছি, এগুলো শুনে এখানে কেউই বলবেন না যে আমার মনে বা জীবনে কোন ধরণের পরিবর্তন হয়নি, আমি যে রকম ছিলাম সেই রকমই আছি।

আমরা সবাই আধ্যাত্মিক আলোচনা করছি বলেই কি আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে? একেবারেই না। এটাই আমাদের স্বাভাবিক। চন্দন কাঠের কত সুগন্ধ, কিন্তু সেই চন্দন কাঠকে যদি অনেক দিন জলের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তখন তার মধ্যে দুর্গন্ধ এসে যায়। কঠোপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর ঠিক এই উপমাটিই দিয়েছেন। কিন্তু এই চন্দনকে যখন ঘষতে থাকে তখন তার থেকে গন্ধ নির্গত হতে থাক। এখন এই চন্দনকে ঘষেছি বলেই কি গন্ধ এসেছে? কখনই না, চন্দনের মধ্যে গন্ধ আগে থাকতেই ছিল, কিন্তু চাপা ছিল। প্রত্যেক মানুষই বিশুদ্ধাত্মা, একেবারে শুদ্ধ চৈতন্যে পরিপূর্ণ, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাত্মা। কিন্তু জাগতিক সংসর্গে পরে, সংসারের পাল্লায় পরে তার এই বিশুদ্ধ স্বভাবকে ভুলে গিয়ে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। এখন এর থেকে সে বেরোবে কি করে? তখনই দরকার হয় ঘষা মাজার। যখন ঘষা মাজা হতে থাকে তখন তার নতুন কিছুই আসছে না, তার মধ্যে যেটা স্বাভাবিক সেটাই বেরিয়ে আসতে থাকে। এই শাস্ত্র অধ্যয়নে ও চিন্তনের দ্বারা আমাদের যেটা স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব সেটাই বেরিয়ে আসে । কিন্তু এরও একটা সীমা আছে। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন সীমারেখা আছে। যেমন অনেকে শাস্ত্রও পড়ছেন আবার বিভিন্ন পেশাতে কাজও করছেন, এখন একজন বলছেন আমি আর কোন পেশাতে নিযুক্ত হব না, আমার যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থেকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করব আর ঈশ্বর চিন্তনে সব সময় নিজেকে ডুবিয়ে রাখব। আরেকজন বলছে আমার অমুক গান-বাজনা ভালো লাগে ওটাকে কি করে ছাড়ব, শাস্ত্রও পড়ব আর স্টেজে নাচ গানও করে বেড়াব। যাঁরা ঋষি, যাঁরা মহাত্মা, তাঁদেরও এই সমস্যাটা থাকে। এনারা যখন সিদ্ধির একটা সীমাতে পৌঁছে গেলেন, সেখানে পৌঁছে যাওয়ার পর তাঁর বুঝে যান যে এর পর আমি আর এগোতে পারব না। সেইখানে গিয়ে তাঁরা কিন্তু সব ছেড়ে ছুড়ে চুপচাপ বসে থাকেন না? তখন এনারা লোকসংগ্রহের কাজে নেমে পড়েন। লোকসংগ্রহ হচ্ছে, সিদ্ধিতে একটা যে ভাব তিনি পেয়েছেন, সেই ভাবটাকে সবার মধ্যে বিতরণ করতে নেমে যাওয়া। এই ভাব বিতরণের অনেক উপায় ও পদ্ধতি আছে। একটা উপায় হল, প্রবচন দেওয়া, লোকেদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গান করে প্রচার করা। আরেক ধরণের লোকসংগ্রহ হচ্ছে রামায়ণ, মহাভারতের মত কিছু রচনা করা। তাঁর আর কোন উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু তিনি ঠিক করে নিলেন, আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিকে সহজ সরল করে লোকেদের মধ্যে ছড়িয়ে দেব, এই ভাবে অনেকে বিভিন্ন শাস্ত্র রচনা করতে নেমে পড়েন। লোকসংগ্রহে যেমনি নামলেন তখন এটা হয়ে গেলে ডান দিক বাঁ দিকে ওড়ার মত, এর উন্নতির সীমারেখা আর লম্বিত আকারে থাকছে না। বাল্মীকি, ব্যাসদেব যা করেছেন এর উদ্দেশ্যই হল লোকসংগ্রহ।

তাঁদের তখন সময়ও প্রচুর এসে যায়। অবশ্য আমাদের সবারই প্রচুর সময় থাকে, কেননা যদি ভালো করে হিসাব করা হয় তাহলে দেখব যে, আমাদের পুরো সময়টাই আজে বাজে কাজেই নষ্ট হয়ে যায়। এখন যদি কারুর সময় বাঁচিয়ে বলা হয় চলুন হিমালয়ে গিয়ে এক মাস সাধন ভজন করা যাক, কিংবা হরিদ্বারে গিয়ে তিন মাসের ছুটিতে গিয়ে নির্জন বাস করে আসবেন, এঁরা কিন্তু কেউই রাজী হবেন

না। কারণ তাদের মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। প্রথম এক দিন, দুদিন, তিন দিন শুয়ে বসে কেটে যাবে, কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই বলবে একটা কিছু কাজে লাগিয়ে দিন আমাকে। এই সমস্যা সাধু সন্ন্যাসীদেরও হয়। তা নাহলে বেশির ভাগই কুড়ে হয়ে যাব। সব কিছুই করবে, সকালে জপ-ধ্যানও করবে, মন্দিরেও যাবে, কিন্তু আর বাকী সময়ের বেশির ভাগ সময় গাল-গল্প করেই কাটাবে। যারা বুদ্ধিমান সাধু তাঁরা ফাঁকা সময়টা এই ধরণের লোকসংগ্রহের কাজে নিজেকে লাগিয়ে রাখেন, একটা প্রবন্ধ লিখলেন, কি কবিতা লিখলেন, অথবা একটু চিন্তন করলেন। বাল্মীকি এই রামায়ণ রচনাতে পুরো লেগে গেলেন। তখন তিনি তাঁর মধ্যে যত প্রতিভা ছিল আর তপস্যা এবং আধ্যাত্মিক যত শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল সব এই রামকথা রচনাতে ঢালতেই সব জাহ্নবীর স্রোতের মত বেরিয়ে এল।

যদি আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে গ্রহণ করতে হয়, ভারতীয় ধর্মের ঐতিহ্য ও সত্যকে জানার উদ্দেশ যদি হয় তাহলে বাল্মীকি রামায়ণে যা কিছু লেখা হয়েছে তার সব কথাকে নেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু যদি কেউ মনে করেন শ্রীরামচন্দ্র আমার ভাব সাম্রাজ্যের সম্রাট, শ্রীরামচন্দ্রই আমার ধ্যানের, জ্ঞানের আদর্শ, তখন কিন্তু তাকে প্রত্যেকটি শ্লোক পড়ে যেতে হবে, প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ঘটনার উপর চিন্তন মনন করতে হবে। আমরা কিন্তু দেখব আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি বাল্মীকি কিভাবে দেখেছিলেন, মানবিকতার মূল্যবোধকে এবং মানব মনের গতি প্রকৃতির ধর্মকে বাল্মীকি কিভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যে সুন্দর করে এঁকেছিলেন। এগুলোকে জানার জন্য আবার রামায়ণের এত কিছু কাহিনী না জানলেও কিছু অসুবিধা হবে না। বাল্মীকির আদর্শ পুরুষ হলেন শ্রীরামচন্দ্র, আর সেই আদর্শটাকেই পাঠক পাঠিকাদের সামনে বাল্মীকি তুলে ধরছেন। কিন্তু এর সব কিছুকেই খুব আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই, সে বাল্মীকি রামায়ণের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা রামচরতি মানস বা অধ্যাত্ম রামায়ণই হোক বা মহাভারতের ক্ষেত্রেই হোক।

যেমন কথামৃতের এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন – শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করে লক্ষ্মণকে নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। লক্ষ্মণ দেখছেন রাবণের বুড়ি মা নিকষা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে দেখে দৌড়ে পালাচ্ছে। লক্ষ্মণ দেখে শ্রীরামকে জিজ্ঞেস করছেন, এখনো নিকষার কি বাঁচার শখ। তখন লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র বললেন তুমি ওকে জিজ্ঞেস করেই দেখনা। লক্ষ্মণ দৌড়ে গিয়ে নিকষাকে ধরে জিজ্ঞেস করছে, তোমার এখনও এত মৃত্যু ভয় কেন? এত শোক পেয়েও তুমি বাঁচতে চাও? নিকষা তখন বলছে – আমি কি মৃত্যু ভয়ে পালাচ্ছি? এত দিন বাঁচলাম বলেই না শ্রীরামের এত লীলা দেখলাম, আরও কত লীলা তিনি করবেন, শ্রীরামের সেই লীলা দেখার জন্য আমি আরও বাঁচতে চাই। নিকষার এই ভাব নিয়ে একটা নতুন যোগ হতে পারে। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ আর রাজযোগ, নতুন একটা যোগ এসেছে যার নাম হচ্ছে নিকষা যোগ। আমাদের শাস্ত্রে আছে সাক্ষী চৈতন্য, মানে সব কিছু দেখে যাও, নিকষা যোগে তা হচ্ছে না, দেখে যাও আর মজা লুটে যাও। জীবনমুক্তে শুধু দূর থেকে দেখে যাওয়া, কোন প্রতিক্রিয়া করবে না, নিকষা যোগের ক্ষেত্রে সাক্ষী হয়ে দেখে যাচ্ছে আবার আনন্দও করছে। নিকষা যোগে যে আছে সে বলে যাচ্ছে – লড় লড়, তোরা যত লড়বি মরবি তত আমার আনন্দ হবে।

এটা গেল নিকষা যোগের কথা, কিন্তু এখানে মূল যে কথাটা বলা হচ্ছে, ঠাকুর বলছেন শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করে লঙ্কাপুরীতে লক্ষ্মণ সহ প্রবেশ করলেন। এখানে একটা মারাত্মক ভুল তথ্য ঠাকুর দিচ্ছেন সেটাকে আমাদের ধরতে হবে, ঠাকুর কি ভুল তথ্য দিচ্ছেন? কথামৃতে ঠাকুরের এই নিকষার কথার উল্লেখ করাটা প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ, মানে যে ভক্ত সে ঈশ্বরের লীলা দেখতে চায়। মজার ব্যাপারে হল এই ঘটনাটা অসম্ভব, হতেই পারেনা। নিকষা শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে পালাচ্ছে এই ঘটনাটা আদপেই হতে পারেনা। এইজন্যই হতে পারেনা যে, আসল ঘটনা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র কক্ষণ লঙ্কায় প্রবেশ করেননি। প্রত্যেক রামায়ণে আছে শ্রীরামচন্দ্র যখন রাবণকে বধ করলেন, তখন তিনি সবাইকে বললেন – আমি বাবার আদেশ পালন করার জন্য কোন শহরে প্রবেশ করতে পারিনা, সেইজন্য লক্ষ্মণ তুমি লঙ্কায় যাও, বাকি যা কাজ তুমিই কর। এমন কি যখন কিস্কিন্ধায় বালিকে বধ করলেন তখন সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে রাজমহলে প্রবেশের জন্য

অনুরোধ করেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র বললেন – আমি পিতার আদেশে বনবাসী হয়েছি, আমি কোন শহরে প্রবেশ করতে পারিনা।

প্রত্যেক রামায়ণেই শ্রীরামচন্দ্র অনেক জায়গাতেই বলছেন পিতার আজ্ঞায় আমি বনবাসী তাই শহরে প্রবেশ করতে পারিনা। বাল্মীকি রামায়ণেও এই একই উক্তি দেওয়া আছে। তাহলে ঠাকুর এই কথাটা কোত্থেকে পেলেন? ঠাকুরই বলছেন – শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশেল আছে, চিনিটুকু নিয়ে বালিটুকু ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে লঙ্কাপুরীতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রবেশের ব্যাপারটা এসেছে স্থানীয় ভাবে যেসব রামায়ণ লেখা হয়েছে সেখান থেকে, কৃত্তিবাসের রামায়ণেও থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, আর যদি নাও থাকে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা রামায়ণের যেসব যাত্রাপালা, রামকথা গ্রামে গঞ্জে হয় সেখানেও থাকতে পারে। আর স্থানীয় এই সব যাত্রাপালা, গান খুব জনপ্রিয় হয়। ঠাকুর হয়তো এইসব যাত্রাপালাতেও দেখে থাকতে পারেন। ঠাকুর যখন শাস্ত্রের কোন ঘটনাকে উল্লেখ করছেন তখন তিনি তার ঐতিহাসিক দিকটা দেখেননি, উপমা দেওয়ার জন্য তিনি নিকষার এই ঘটনাকে তুলে এনে শুধু ব্যবহার করেছেন।

একটা কঠিণ জিনিষকে সরাসরি বলে দিলে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনা, তখন সেই কঠিণ জিনিষটাকে বোঝানর জন্য উপমার ব্যবহার করা হয়। আমরা উপমাটাকে নিয়ে ওটাকেই সত্য বলে মনে করি। উপমাটা যদি ভুল হয় তখন কিন্তু আসল ব্যাপারটাও ভুল হয়ে যাবে। যেমন গীতাতে বলছেন – যেমন নদীগুলো সমুদ্রে প্রবেশ করে ঠিক তেমনি জ্ঞানীর মধ্যে কামনা বাসনাগুলি প্রবেশ করলেও জ্ঞানীর কিছু হয় না। এই উপমাকে ভিত্তি করে একজন পণ্ডিত লিখলেন – এটা আবার কেমন উপমা হল! সমুদ্রেতো তিমি মাছ আছে, আরও কত রকমের কিছু আছে। কিন্তু ঠাকুর বলছেন উপমা একদেশীয়। এখানে একটা জিনিষকে বোঝান হচ্ছে, ইন্দ্রিয়গুলো জ্ঞানীর ক্ষেত্রে কি হয় বোঝান হচ্ছে, যেমন নদীগুলো সমুদ্রে প্রবেশ করে যায়, কিন্তু সমুদ্র তাতে কোন ভাবেই স্ফীত হয়ে ওঠে না, সমুদ্র যেমন থাকার তেমনি থাকে, ঠিক তেমনি জ্ঞানীরা ভেতরে সব কাম ক্রোধগুলি প্রবেশ করে হারিয়ে যায়, জ্ঞানীর তাতে কোন ধরণের বিকার হয় না।

এখানে ঠাকুরের কথার মাহাত্ম্য হচ্ছে, যিনি ভক্ত হন তিনি ভগবানের লীলা আস্বাদ করতে চান, তার মধ্যে নিকষা হচ্ছে একটা উপমা। যদি এখন নিকষা বলে কেউ নাই থাকত, তাহলে এই কথাকে বোঝানর জন্য অন্য কোন উপমা নিয়ে আসা হত। উপমা পাল্টালেও যে তত্ত্বটা বোঝান হচ্ছে সেটা যেমন ছিল তেমনি থেকে যাবে। সেইজন্য উপমাকে ভিত্তি করে শাস্ত্রের কথাকে প্রতিষ্ঠিত করতে নেই, কিন্তু কবিরা এই ভুলটাই করে বসেন। তাঁরা তাদের কাব্য প্রতিভা দেখানোর জন্য উপমাকে কেন্দ্র করে নিজের একটা ভাবকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। এখন নিকষার এই কাহিনী রামায়ণের কোথাও নেই, তারপর আমরা যদি বলি – কি বলছেন মশাই, ঠাকুর বলেছেন, থাকবে না মানে? তখন কিন্তু সব কিছু গোলমাল হয়ে ঠাকুরের আসল বক্তব্যটাই হারিয়ে যাবে। উপমাকে নিয়ে কখন নিজের সিদ্ধান্তকে দাঁড় করান একেবারেই ঠিক হবে না, সিদ্ধান্তকে বোঝানর জন্য উপমাটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যাপারটা খুবই সূক্ষ্ম। উপমাকেই সত্য মনে করে আমরা সর্বনাশ ডেকে আনি। উপমা দিয়ে, দৃষ্টান্ত দিয়ে কখন তত্ত্ব হয় না, তত্ত্বকে আধার করেই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। ঠাকুর যত কাহিনী বলেছেন সব কটা কাহিনীই তত্ত্বকে আধার করে। এমনকি অনেক কাহিনী বলার পর ঠাকুর নিজেই বলছেন – তোমার কি উগুনো বিশ্বাস হয়!

দৃষ্টান্ত যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে সিদ্ধান্তের কি হবে? কিছুই হবে না, সিদ্ধান্ত যেমন আছে তেমনই থাকবে। সেইজন্য যদি ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে হয় তাহলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় শাস্ত্রে কোনটা সিদ্ধান্ত আর কোনটা দৃষ্টান্ত এটাকে আগে ভালো করে বুঝতে হবে। দৃষ্টান্তটা সহজে মনে থাকে বলে আমরা দৃষ্টান্তকেই ধরে রাখি। ঠাকুরের নিকষার দৃষ্টান্ত হচ্ছে লৌকিক দৃষ্টান্ত, উনি যে রকম ঘটনা শুনেছেন সেই রকমই বলেছেন, এই তথ্য ঠিক কিনা দেখাটা তাঁর কাজ নয়, তিনি একটা তত্ত্বকে বোঝাবার জন্য এই

লৌকিক দৃষ্টান্তকে নিয়ে এসেছেন। এই লৌকিক দৃষ্টান্ত যদি না থাকত তখন তিনি অন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আসতেন। তাহলে কি আমরা নিকষাকে কথামৃত থেকে সরিয়ে দেব? কখনই সরান যাবে না, নিকষা বহাল তবিয়তে থাকবে, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এই উপমাটা নিয়েছেন তখন এই উপমাটাই শাস্ত্রীয় অনুমোদন পেয়ে গেল। নিকষা এখন আমাদের কাছে সত্য? কিভাবে সত্য? দৃষ্টান্ত হিসেবে নয় সিদ্ধান্ত হিসেবে। এখন নিকষা যোগ বলে যেটা বলা হচ্ছে এটা একটা সাক্ষী চৈতন্যের অন্য একটা পরিভাষা হয়ে গেল।

এখানে এই প্রশ্নও হতে পারে যে, বাল্মীকি যা বলেছেন সেটাই ঠিক কিনা আমরা কি করে জানব? হতে পারে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু এটা হচ্ছে বাল্মীকির ধারণা, আর তাঁর বর্ণনা সত্যের সব থেকে কাছাকাছি ছিল, তাই বাল্মীকির কথাকেই মান্যতা দিতে হবে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এই ঘটনাকে একটা উপমা রূপে নিয়েছেন, কিংবা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যেখানে উপমাগুলিকে প্রয়োগ করেছেন, সেই উপমাগুলি পুরোপুরি শাস্ত্রীয় মান্যতা পেয়ে গেছে।

আমরা জানি স্বাতী নক্ষত্রের জল যখন ঝিনুকে পরে তখন সেই জল মুক্তো হয়ে যায়। কিন্তু এখন বিজ্ঞান বলছে স্বাতী নক্ষত্রের জলে কিছুই হয় না, বালি গেলেই মুক্তো হয়। ঝিনুকের পেটের মধ্যে একটা বালির কণা চলে গেলে ওর মধ্যে একটা উত্তেজনা তৈরী হয়, ঐ উত্তেজনা থেকে সে ঐ বালি কণাতে নিজের শরীর থেকে এক ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়তে থাকে, আর ঐ পদার্থটা গিয়ে বালির কণার উপরে একটা আবরণ দিতে থাকে, যাকে বলা হয় এনামেলিং, এই আবরণটাই আস্তে আস্তে পরে মুক্তা হয়ে যায়। এখন তাই বলে কি স্বাতি নক্ষত্রের জলের উপমাটা পাল্টে যাবে? কখনই পাল্টাবে না, এই উপমাটাই থাকবে, এখানে ঠাকুর বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লিখছেন না, নিকষার ক্ষেত্রে ঠাকুর ইতিহাস লিখছেন না, তিনি আধ্যাত্মি সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্ত দিয়ে সামনে আনছেন। সাথে সাথে এটাও আমাদের জানতে হবে যে, দৃষ্টান্তটা বাস্তবে তা নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তকে আনতে হলে এটাকে এনেই বোঝাতে হবে। অথচ স্বামীজী অনেক পুরনো দৃষ্টান্তকে পাল্টে দিয়েছেন। পরে তিনি সেই সময়ের বিজ্ঞানে যে সত্যগুলো প্রমাণিত হয়েছিল সেইগুলিকে আধার করেই তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এটা স্বামীজীর পক্ষেই সম্ভব, আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই ক্ষমতা নেই। সেইজন্যই আমাদের পক্ষে উপমাকে পাল্টাতে নেই যেমন আছে তেমন ভাবেই রাখতে হবে। আবার আমাদের সত্যকেও জানতে হবে, জিনিষটা এই রকম। তাই বলে আমাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে কখনই ছাড়তে নেই, এটাই ভাবরাজ্যের সাথে বাস্তবের সমন্বয়। একদিকে বিজ্ঞান আর ইতিহাসের সত্যকেও জানতে হবে আবার সংস্কৃতি ও পরম্পরাতে যেটা সত্য সেটাকেও জানতে হবে। কারণ ভাবরাজ্যই আসল, ঠাকুর যখন নিকষার কথা বলছেন তখন সেটা ভাবরাজ্যের কথা, ঐতিহাসিক তথ্য নয়। পরে যখন জানা গেলে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাতে প্রবেশই করেননি, তাহলে লঙ্কা নিয়ে যে আমাদের এতগুলো প্রবাদ বাক্য আছে সব কি বাতিল করে দেব? লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেছে, দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে এই কথাগুলোকে কি ফেলে দেব? কখনই না, এগুলো ঐভাবেই থাকবে, কারণ এগুলো হচ্ছে cultural truth, এগুলো ঐতিহাসিক সত্য নয় কিংবা বিজ্ঞানের দিক থেকেও সত্য নয়। ঠিক ঠিক মহৎ হতে গেলে আমাদের Spiritual Truth, Cultural Truth and Scientific Truth এই তিনটে সত্যকেই জানতে হবে। তখন কি হবে? যদি তার শক্তি থাকে তাহলে সে শুধু Cultural Truth নিয়েই কথা বলবে। এখন সবাই জানে যে আকাশে যখন মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হয় তখন বিদ্যুৎ চমকায়, কিন্তু বেদে আমরা পাই, মেঘ হচ্ছে বৃত্রাসুর সে জলকে আটকে রেখেছে, ইন্দ্র তখন বজ্র ছুড়ে মারতেই বৃষ্টি হয়ে সব জল আকাশ থেকে নেমে এল। আমরা সবাই জানি সূর্য কোথাও যায়না, কিন্তু রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই বলবে সূর্য কত উপরে উঠে গেছে, কখন তো বলিনা পৃথিবী কতখানি ঘুরে গেছে রে? আমাদের এটাও জানতে হবে ওটাও জানতে হবে।

যখনই কাউকে দেখা যাবে সে ব্যাপারটা জানে না, তখন আগ বাড়িয়ে আত্মবুদ্ধিতে তাকে সংশোধন করতে যাওয়াটা কিন্তু তার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে যাবে। সে যদি শ্রীরামচন্দ্রের ইতিহাস না জানে,

তাহলে নিকষার ক্ষেত্রে এসে তাকে কখনই বলতে যাওয়টা ঠিক হবে না যে, শ্রীরামচন্দ্র তো কখন লঙ্কাতে প্রবেশই করেননি। গীতায় ভগবান বলছেন – *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্* - যারা মুর্খ তাদের কখন বুদ্ধিভেদ করতে নেই, বুদ্ধিভেদ করলে তাদের যে বিশ্বাস, তাদের যে ভক্তি, তাদের যে ভাব সেটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। তারা যেমনটি আছে তেমনটি থাকবে, জ্ঞানীরা তাদের সঙ্গে থেকে তাদের বুদ্ধিকে সায় দিয়ে দিয়ে যতটা পারা যাবে সেখান থেকে আস্তে আস্তে তুলে আনেন। শ্রীমা রামেশ্বর থেকে ফিরে এসে সেখানকার শিবলিঙ্গ নিয়ে বলছেন – যেমনটি রেখেছিলাম তেমনটিই আছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও নেই সীতা রামেশ্বরে বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে শিবের পূজা করেছিলেন। তাহলে কি শ্রীমা বানিয়ে বানিয়ে বলেছেন? হয় যিনি শ্রীমায়ের কথা নোট করেছেন তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি মা কি বলতে চাইছেন, অথবা শ্রীমা গ্রাম্য কোন রামায়ণের পালাগানে এই ধরণের কোন কাহিনী শুনেছিলেন, আর যখন নিজেকে সীতা রূপে চিন্তন করছেন তখন তাঁর মনে সেই শোনা ভাবটাই জেগে উঠেছিল। শ্রীমায়ের কথাতে যেহেতু কোন ঐতিহাসিক সত্য পাচ্ছিনা তাই বলে কি কেউ এটাকে কোন বক্তৃতাতে বা কোন রচনাতে উল্লেখ করবেন না? অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে কারণ এটা হচ্ছে Cultural Truth, সীতা এটা করেছিলেন কিনা তার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, কারণ এ দৃশ্যটা শ্রীমায়ের ভাবরাজ্যে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। সত্যি সত্যি শ্রীমা করেছিলেন কি করেননি তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ ভাবরাজ্য হচ্ছে মনের ব্যাপার। কারুর মন যদি খুব শক্তিশালী হয় আর সে যদি খুব গভীর ভাবে চিন্তা করে আমি এই কাজটা করব, তার মানে ঐ কাজটা তার করা হয়ে গেল।

ঠাকুর বলছেন কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। কিন্তু ঠাকুর এই কথা কার জন্য বলছেন? গৃহস্থদের জন্য বলা হচ্ছে এই কথা। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে মনের পাপ অত্যন্ত গর্হিত পাপ। সন্ন্যাসী যদি মনেও কোন কামিনী কাঞ্চনের ব্যাপারে চিন্তা করে তাহলে তার পক্ষে সেটা ভোগ করা হয়ে গেল। সেইজন্য আধ্যাত্মিক সাধনা সবার দ্বারা সম্ভব নয়, খুব জোর ধর্ম সাধনা হতে পারে। যারা খুব উচ্চ কোটির সন্ন্যাসী তাঁরা হচ্ছেন সবাই ভাবরাজ্যের খেলোয়াড়। ভাবরাজ্যে যদি একবার কোন নারীর মুখ দেখে মনে হয়ে যায় – আহা মেয়েটিকে দেখতে কি সুন্দর, তাতেই তাঁর সর্বনাশ হয়ে যাবে, শুধু ভেবেছে তাতেই শেষ। কারণ সন্ন্যাসীর পক্ষে মনের পাপ ততটাই খারাপ যতটা মুখে বা শরীর দিয়ে পাপ করা হয়। গৃহস্থরা পারবে না বলে ঠাকুর গৃহস্থদের আশ্বাস দেবার জন্য এই কথা বললেন, শরীর থেকে পাপ না করলেই হল। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে মনের মধ্যে কোথাও যদি একটু পাপ চিন্তা থাকে তখন তা গঙ্গা জলে এক ফোঁটা নর্দমার জল ফেলা। মনটা হচ্ছে গঙ্গাজলের মত। আধ্যাত্মিক সাধনা তাই অত্যন্ত কঠিণ সাধনা। যে সন্ন্যাস নিয়ে নিয়েছে সে ঠিক করে নিয়েছে যে আমি আর ধার্মিক ব্যক্তি নই, আমি আধ্যাত্মিক পুরুষ, ধর্ম থেকে সে এখন অনেক উপরে চলে এসেছে। মাটিতে চলা সে ছেড়ে দিল, এখন সে পাখি হয়ে গেছে। আইনস্টাইন যত বড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন, লাটু মহারাজ আলাদা জিনিষ। আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আর ধার্মিক ব্যক্তিত্বের এই তফাৎ। ধার্মিক সে মাটিতে দৌড়াচ্ছে আর আধ্যাত্মিক পুরুষ সে মাটিতে চলা ছেড়ে দিয়ে আকাশে উড়ছে, এই অবস্থায় কিন্তু মনের পাপ খুব গভীর পাপ। সে যদি মনে মনে ভাবে ওকে এক ঘুষি মারলে হয়, তাকে ঘুষি মারাই হয়ে গেল তখন। ঘুষি মারলে যা পাপ হবে, মনে চিন্তা করলেও সেই একই পাপ হবে। আধ্যাত্মিক পুরুষদের শরীরের আর কোন ভূমিকা থাকে না, সূক্ষ্ম শরীরটাই তখন তাঁর কাছে বড় হয়ে যায়। সূক্ষ্ম শরীর মানেই হচ্ছে মন বুদ্ধির খেলা।

বাল্মীকি যে এই মহাকাব্য রচনা করেছেন যাতে এগুলো পাঠ করে মানুষের মনটা এই উচ্চ আদর্শের দিকে যায়। উচ্চ আদর্শের কথা বলতে গিয়ে বলছেন শ্রীরামচন্দ্র কি রকম ছিলেন – **স হি রূপোপন্নশ্চ বীর্যবানসূয়কঃ।**২/১/৯। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রূপবান আর পরাক্রমী। শ্রীরামের পরাক্রম তো আমরা দেখে নিয়েছি – তিনি তাড়কাকে বধ করলেন, মারীচকে পরাস্ত করেছেন, সুবাহুকে বধ করলেন, জনক রাজার যজ্ঞশালায় শিবের ধনু ভঙ্গ করলেন আর পরশুরামের দর্প চূর্ণ করলেন।

এরপরে বলছেন – **স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা মৃদুপুর্বঞ্চ ভাষতে। উচ্চমানোঽপি পুরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে।।** ২/২/১০। উনি খুব শান্ত চিত্তের ছিলেন, যাদের চিত্ত ঠিক ঠিক শান্ত হয় তাঁদের কথাবার্তা সব সময় খুব মধুর হয়। তাঁরা কখন কটূবাক্য উচ্চারণ করেন না। যাঁদের চিত্ত প্রশান্ত তাঁদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। শ্রীরামচন্দ্রের গুণের বর্ণনা করে আসলে বলা হচ্ছে আমাদের কি রকম হতে হবে। এখন এই কথা শোনার পর কেউ যদি সব সময় মিষ্টি কথা বলতে শুরু করে তাহলে দেখা যাবে কিছু দিনের মধ্যে তাকে ব্লাড সুগারে ধরে নিয়েছে, টেনশান থেকে হাই প্রেসার হয়ে গেছে। কারণ তার ভেতরের রাগ অভিমানের বৃত্তিগুলোকে তো সে ছাড়তে পারেনি, ভেতরে সেই রাগ গুলো গিজ্‌গিজ্‌ করতে থাকবে। মনের এই আবেগের বিপরীত আচরণের জন্য তার হার্টের সমস্যা হয়ে যাবে। এই কারণে আজকাল ডাক্তাররা রোগীদের বলে দেন একটু বেশি রাগ হলে প্রকাশ করে দেবেন তাতে রোগ কম হবে, সব সময় রাগ চেপে রাখবেন না। তাই মিষ্টি কথা বলার আগে আমাকে *প্রশান্তাত্মা* হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। তার জন্য তাকে প্রচুর জপ ধ্যান, স্বাধ্যায় করতে হবে। এইভাবে সাধনা করে করে আগে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। তারপর যদি কেউ একটা অপমানের তীর ছোঁড়ে সেটা হজম করার ক্ষমতা আসবে। এই শ্লোকের পরের অংশে বলছেন - *উচ্চমানোঽপি পুরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে* – আবার অন্য দিকে কেউ যদি শ্রীরামচন্দ্রকে কোন কটূ কথা বা কড়া কথা বলে দেয় তিনি তার কোন প্রত্যুত্তর দেন না। তিনি কি চেপে গেলেন? আমাদের যেমন সব সময় উপদেশ দেওয়া হয়, আরে চেপে যাও, একটু চাপতে শেখ। আরে ভাই! আমরা যদি সব কিছু চেপে যেতে থাকি আমাদের হার্ট এ্যটাক হতে বেশি দেরী হবে না। আর যদি প্রত্যেক কথাতে মনের রাগ ঝেরে ফেলতে পারি তাহলে ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার, হার্ট এ্যটাকে থেকে বেঁচে যাব। কিন্তু অন্য দিকে আবার আমার বউয়ের সাতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, ছেলে তার বউকে নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে চলে যাবে, বন্ধু বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তাহলে আমি কোন দিকে যাব? এই কারণেই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রয়োজন। যখন খুব জপ ধ্যান করতে থাকবে, পূজো অর্চনা নিয়ে থাকবে, নিয়মিত স্বাধ্যায় করতে থাকবে তখন মনের শক্তি বৃদ্ধি হবে, মনের শক্তি বৃদ্ধি হলে মনের বিভিন্ন আবেগ ও বৃত্তিগুলোকে হজম করে নেওয়ার ক্ষমতা আসবে। যখনই সংসার থেকে কোন আক্রমণ আসবে তখন সেটা মনের মধ্যে এসে মিলিয়ে যাবে, মন কিছু প্রতিক্রিয়া করার সুযোগই পাবে না, প্রয়োজনও হবে না। প্রতিক্রিয়া যখনই করে দিল তখনই বুঝতে হবে সে আরও গভীর সমস্যায় পরে গেল।

শ্রীরামচন্দ্রের আরেকটি গুণের কথা বলছেন – **কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি। ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া।।** ২/১/১১। কখন যদি কেউ তাঁকে ভালোবেসে সামান্যতম একটু উপকার করে দেয় তখন তিনি তার উপরে এত তুষ্ট হয়ে যেতেন যে, পরে সে যদি একশটি অপকারও করে, ঔদার্যবশতঃ তিনি তা মনেই রাখতেন না, মাথা থেকে একেবারে নামিয়ে দিতেন। সে যে আমার একটা উপকার করেছে সেটাই তাঁর মনে চিরস্থায়ী হয়ে গেঁথে যেত আর সে যে পরে তাঁর এত অপকার করছে কিছুতেই উনি সেগুলোকে মনে জায়গা দিতেন না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যত সব প্রশাসকরা থাকেন, তাদের কাছে আপনি হাজারটা ভালো কাজ করুন মনে থাকবে না, আর একটা যদি কোন ভুল কাজ করে থাকেন সেটাই তাদের কাছে বড় হয়ে যায়। স্বামী স্ত্রীর যখন ঝগড়া হয়, স্ত্রী প্রথমেই শুরু করবে বিয়ের আগে আগে কি হয়েছে সেখান থেকে – তুমি আমাকে যেদিন দেখতে এসেছিলে আমার বাবা মা তোমাকে চা বিস্কুট দিয়েছিল, তুমি বিস্কুট খাওনি, তুমি আমার বাবা মাকে অপমান করেছিলে। মানুষ মাত্রেই অপকার আর অপরাধ গুলোই মনে রাখে আর উপকার আর ভালো কাজ গুলো ভুলে যায়। মানুষের মধ্যে যিনি ঠিক ঠিক সাধু পুরুষ তিনি কেবল উপকারটাই মনে রাখেন।

অনেক দিন আগে একজন সিনিয়র মহারাজ একবার একটা খুব দামী কথা বলেছিলেন। কথাটা হচ্ছে, তিনিই ভদ্রলোক যিনি একবার যার ব্যাপারে একটা ভালো মত প্রকাশ করেছেন বা যার ব্যাপারে তিনি একবার ভালো ধারণা করে নিয়েছেন, পরে তার হাজারটা অন্য রকম কিছু দেখলেও অন্য রকম

ধারণা তিনি কখনই করবেন না। মানে আপনি ভালো লোক, আমি আপনাকে ভালোবেসেছি, এখন আমি যদি আপনার খারাপ কিছু দেখলেও সেটা কাউকে বলব না। অন্য একজন মহারাজ শুনে প্রতিবাদ করে বললেন – একজন খারাপ কাজ করছে তাকে আমি বলব না যে আপনি খারাপ কাজ করেছেন? শুনে তিনিও জবাব দিলেন – তুমি অবশ্যই বলবে কারণ তুমি ভদ্রলোক নও। পরে সেই মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে উনি ঠিক কথাই বলেছিলেন। আমি যদি কাউকে ভালোবেসে থাকি, আর সে যদি কোন গোলমাল করে তাহলে কিন্তু আমার মুখ থেকে কখনই বেরোবে না যে আপনি গোলমাল করছেন। বাংলাতে একটা প্রবাদই আছে – ভদ্রলোকের এক কথা। শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক রূপে দেখানো হয়েছে। 'ভদ্রলোক' শব্দের সংজ্ঞার প্রতিমূর্তি হলেন শ্রীরামচন্দ্র। কেউ সামান্য উপকার করলে সেই উপকারটাই তাঁর মনের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে, আর তারপরে সে হাজারটা তাঁর অপকার করে দিলেও তিনি ঐ একটা উপকারকে কখনই ভুলতে পারবেন না। খুব কঠিণ কাজ, একমাত্র যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরাই পারেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে কি গালাগালই না দিয়েছিলেন, তারপরেই ঠাকুর গিরিশ ঘোষের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন গিরিশের খোঁজ করতে। তখন গিরিশ ঘোষ বলছেন – আমার এই দুর্ব্যবহারের পরেও যে আপনি আমাকে ভালোবেসে মনে রেখেছেন, আজ থেকে আমি মানলাম আপনি মহাপুরুষ। আপনি যদি না আসতেন তাহলে বুঝতাম আপনিও আর সবার মত অতি সাধারণ মানুষ।

বাল্মীকি রামায়ণ অত্যন্ত কঠিণ শাস্ত্র, কারণ এখানে যে আদর্শের কথা তুলে ধরা হয়েছে, এই আদর্শকে পালন করা এবং পালন করে ধরে রাখা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই কঠিণ। সত্যিই খুব কঠিণ। তাই বলে আমরা আদর্শকে কখনই নিচু করে দিতে পারিনা। এই জিনিষটা আমাদের সব সময় মাথায় রাখতে হবে। আদর্শকে আমি পালন না করতে পারি, কিন্তু আদর্শকে কখনই আমরা নিচু করে দিতে পারি না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজকাল একটা কথা খুব ব্যবহার করা হয় realistic writings, বাস্তব সম্মত কাহিনীই প্রকৃত সাহিত্য। Realistic writingsএর মানে সমাজে যেটা ঘটছে সেটাকেই সাহিত্যে তুলে দেওয়া, তাহলে তো আমি আদর্শকে নামিয়ে দিলাম। কোন অবস্থাতে আদর্শকে কখনই নামাতে নেই। তাই যদি হয় তাহলে সবাইতো মল-মূত্র ত্যাগ করে সেটাও তো বাস্তব, ওগুলোর বর্ণনা করে তো কেউ সাহিত্য তৈরী করতে যাচ্ছে না। যে জিনিষ থেকে মানুষের পতন হয়ে যায়, সেই জিনিষকে কখন সামনে নিয়ে আসতে নেই। সাহিত্যে যখন কাহিনী আনতে হবে তখন মানুষ কিভাবে লড়াই করে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে তুলে ধরতে হয়। যখন সে মার খেয়ে মরতে বসেছে তখনও সে আদর্শের কথা বলছে, আদর্শকে ছাড়ছে না। হতাশা, বিষাদে ভেঙ্গে গিয়ে যে আদর্শের কথা বলছে না, তার কথা মানুষের সামনে তুলে ধরতে নেই। সেইজন্য মনে হবে আদর্শের কথা খুব কঠিণ, ঠিক ঠিক পালন করা যায় না। তাতে কি হয়েছে, আদর্শ নাই বা পালন করতে পারলাম কিন্তু কক্ষণ আদর্শের সাথে আপোশ করতে নেই। হ্যাঁ আমি পারছি না, তাতে কি হয়েছে, তাই বলে আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেব!

যাই হোক, শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করে এসেছেন, এখনও যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হননি। যদিও তাঁর কাছে সব অস্ত্রের শক্তি এসে গেছে তাও কিন্তু তিনি অস্ত্রবিদ্যার চর্চা করে যাচ্ছেন। বলছেন অস্ত্র চালনা শিক্ষার সাথে সাথে যাঁরা উন্নত চরিত্রের, জ্ঞানের খুব উচ্চ অবস্থায় আছেন এই ধরণের মহাপুরুষদের সঙ্গ করার অবসর তিনি অবশ্যই পেতেন। আমাদের কিছু করতে বললেই আমরা বলি সময় কোথায়, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র কখন সময়ের দোহাই দিতেন না, এই শ্লোকে এটাই বলা হচ্ছে **শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈর্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ। কথয়ন্নাস্ত বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেষ্বপি।**।২/১/১২। দৈনন্দিন তাঁর নিজের যা কর্তব্য কর্ম সব তিনি করে যাচ্ছেন, অস্ত্র-শস্ত্র চালনার অনুশীলন করে যাচ্ছেন, তার মধ্যে সময় বার করে যাঁরা সজ্জন পুরুষ, তাঁদের সঙ্গ করতেন।

খুব সুন্দর ভাষা দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসা করা হচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন বুদ্ধিমান, মধুরভাষী – মিষ্টি কথা বলেন, পূর্বভাষী –পূর্বভাষী এই শব্দটা সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না, এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে,

যখনই কোন ব্যক্তি তাঁর কাছে এসেছে, সেই ব্যক্তি কথা বলার আগেই শ্রীরামচন্দ্রই কথা বলতেন যাতে আগন্তুককে ইতঃস্তত না করতে হয়, সে যেন সচ্ছন্দে নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারে। এই সুন্দর প্রথাটা আজকাল প্রায় উঠেই গেছে, কোন অফিসে পদস্থ অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রথমেই বিরক্ত হয়ে গলার স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে বলবে – কি ব্যাপার! কি চান বলুন! বলুন কি বলবেন। শ্রীরামচন্দ্র হলেন প্রিয়ম্বদ, কাউকেই ক্যাঁকক্যাঁক স্বরে তিনি সম্বোধন করতেন না, তাঁর সম্ভাষনেই আগন্তুক নিজেকে সহজ করে নিতে পারতেন। তারপরে বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র হলেন **বীর্যবান্ন চ বীর্যেন মহতা স্বেন বিস্মিতাঃ।।২/১/১৩**। শ্রীরামচন্দ্রের যে এত পরাক্রাম ছিল, কিন্তু তিনি কখন নিজের পরাক্রমের জন্য অহঙ্কার করতেন না। অহঙ্কার মানে নিজেই বুঝতে পারছে না আমার এত ক্ষমতা আছে, যেমন আজকালকার ছেলেমেয়েদের একটু যদি রূপ হয় আর তার সাথে কয়েকটা যদি ডিগ্রী পেয়ে যায়, অহঙ্কার তার ফেটে পড়বে। বিস্ময় নিজেকে নিয়েই অপরকে নিয়ে নয়। একটু যদি টাকা হয়ে যায়, ছেলে যদি IAS হয়ে যায় বিস্মিত হয়ে যায়। কাকে নিয়ে সে বিস্মিত হচ্ছে? নিজেকে নিয়ে। শ্রীরামচন্দ্র কখন নিজেকে নিয়ে বিস্মিত হতেন না। মিথ্যে কথা বলার তো তাঁর পক্ষে সম্ভবই ছিল না, তিনি বড়দের সব সময় সম্মান করতেন। আর ধর্মের রহস্য জানতেন, মানে কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম তিনি জানতেন, ইন্দ্রিয়কে তিনি সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। এখানে খুব সুন্দর একটা মন্তব্য করছেন – কুলের যে আচার, মানে যে বংশে তিনি জন্ম নিয়েছেন সেই বংশের মর্যাদাকে তিনি রক্ষা করে চলতেন, তারপর দয়া, উদার ভাব, শরণাগতের রক্ষা করা এবং ক্ষত্রিয় ধর্মকে খুব খুব গুরুত্ব দেওয়া, এই গুণগুলো স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি যদি আমার ক্ষত্রিয় ধর্ম ঠিক ঠিক পালন করি তাহলে – **মন্যতে পরয়া কীর্ত্যা মহৎ স্বর্গফলং ততঃ।।২/১/১৬**। মানে স্বর্গ প্রাপ্তি ফল হচ্ছে আমার প্রকৃত ক্ষত্রিয় ধর্ম।

এই শ্লোক গুলো বাল্মীকির নিজের রচিত শ্লোক, শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে একজন মহৎ পুরুষ রূপে, যিনি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবেন এই ব্যাপারটা এই শ্লোকে বাল্মীকি পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। এখানে এটাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, বাল্মীকি কখন শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান রূপে দেখেননি। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্রের কাছেও জীবনের উদ্দেশ্য ছিল স্বর্গপ্রাপ্তি ফল, মুক্তি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও রামায়ণের আগে উপনিষদে জ্ঞান লাভ বা মুক্তির কথা আগেই এসে গেছে কিন্তু পুরো বাল্মীকি রামায়ণে চতুর্বর্গের মধ্যে মুক্তির উপরে কিন্তু একেবারেই জোর দেওয়া হচ্ছে না। তাই এটা সহজেই বলা যেতে পারে যে, বাল্মীকি রামায়ণ উপনিষদের দর্শনের থেকে বৈদিক ধর্মের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। তার কারণ উপনিষদও তখন একটা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চলছিল, উপনিষদ তখনও এখনকার মত এতটা জনপ্রিয়তার পর্যায়ে পৌঁছায়নি। উপনিষদের জনপ্রিয়তা হয়েছে মহাভারতের সময়ে এসে। সেইজন্য উপনিষদের মোক্ষের ধারণা বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় না। তাই বাল্মীকি রামায়ণের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বর্গপ্রাপ্তি। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছিলাম যে তাকেই শাস্ত্র বলা হয়, যে গ্রন্থ এই চতুর্বর্গের যে কোন একটি বা একের অধিককে নিয়ে আলোচনা করে মানুষকে সেই দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগায়। বাল্মীকি রামায়ণ যদিও মোক্ষের কথা বলছে না, কিন্তু বাকি তিনটের, ধর্ম, অর্থ আর কামের আলোচনা করছে, তাই বাল্মীকি রামায়ণকেও শাস্ত্র বলা হচ্ছে। অন্য দিক দিয়ে বলা যেতে পারে বাল্মীকি রামায়ণ মোক্ষগ্রন্থ নয়, বাল্মীকি রামায়ণ আসলে প্রকৃত ধর্মগ্রন্থ, কারণ সে ধর্মের নির্দেশ দিচ্ছে। এখানে ধর্ম মানে স্বর্গলোক প্রাপ্তি আর অর্থ ও কাম জগতের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধিকে নিয়ে। বাল্মীকি রামায়ণে কথায় কথায় স্বর্গলোক প্রাপ্তির উল্লেখ পাই। বাল্মীকি রামায়ণ ঠিক এই কারণেই ভারতে খুব বেশি প্রচার পেলনা। আমাদের যে যাই বলুক, যত ভাবেই ধর্মের কথা বলুক কিন্তু যদি বলা হয় আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, তখন আমরা বলব – ঠাকুর বলেছেন জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। ভারতীয় ধর্মের জাতীয় আদর্শ মুক্তি লাভ করা। যদিও মুক্তি বলতে কি বোঝাতে চাইছে, কিসের থেকে মুক্তির কথা বলা হচ্ছে কেউই জানেও না, জানলেও মানতে চায় না। কিন্তু তবুও সবাই মনে করে জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি লাভ। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে মোক্ষকে নিয়ে কোন আলোচনা করেননি বলেই

সারা ভারতে বাল্মীকি রামায়ণের সেই রকম জনপ্রিয়তা হল না, যে জনপ্রিয়তা গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, উপনিষদ পেয়েছে।

তারপরে বলছেন – অমঙ্গলকারী আর নিষিদ্ধ কর্মে শ্রীরামচন্দ্রের কখন প্রবৃত্তি ছিল না। কর্ম অনেক রকমের হয়, বিধি ও নিষেধ মূলক দুই রকম কর্ম, তিনি অমঙ্গলকারী বলে নিষিদ্ধ কর্ম কখনই করতেন না। শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা কক্ষণই শুনতেন না। এটাই আমাদের কাছে এক বিরাট সমস্যা, আমাদের প্রায়ই এখানে সেখানে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা শুনতে হয়, বলা হয় যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা শোনাটাও খুব বড় পাপ কর্ম। সেইজন্য শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা কখন শুনতে নেই। শ্রীরামচন্দ্র যখন কারুর সাথে যুক্তি তর্ক করতেন তখন তিনি শাস্ত্র বিরোধী কোন কথাতে যেতেন না, কিন্তু তিনি যে কথা গুলো বলতেন সেগুলো অত্যন্ত ন্যায় যুক্ত। তিনি যখন এইভাবে যুক্তিতর্ক দিয়ে কোন কথা বলতেন তখন মনে হত যেন বৃহস্পতি স্বয়ং কথা বলছেন। বৃহস্পতি হলেন দেবতাদের গুরু। আমরা জানি শ্রীরামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র দুটো শক্তি দিয়েছিলেন, বলা ও অতিবলা। বলা ও অতিবলার অধিকারীর একটি অন্যতম ক্ষমতা হল যখন কোন বিষয়ে যুক্তিতর্ক হবে তখন তাঁর যুক্তিতর্কের সামনে প্রতিপক্ষ মাথা তুলতে পারবে না।

কিভাবে অর্থের অপচয়কে বন্ধ করে মিতব্যায়ী হতে হবে শ্রীরামচন্দ্র জানতেন। অর্থ বিভাজন কিভাবে করতে হবে তিনি জানতেন। অর্থ বিভাজনের কথা এখানে বাল্মীকি রামায়ণে যেমন আসছে তেমনি মহাভারতেও আছে। বলা হয়, সবচেয়ে ভালো অর্থ বিভাজন হবে যখন সমগ্র আয়ের এক চতুর্থাংশ দিয়ে সব খরচ মিটে যাবে। তার থেকে খারাপ হচ্ছে যখন সমগ্র আয়ের অর্দ্ধেক দিয়ে যদি সংসার চালাতে হয়, এর থেকেও খারাপ হবে যদি সংসার খরচে আয়ের তিন চতুর্থাংশ চলে যায়।

এইভাবে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রে বিভিন্ন গুণের বর্ণনা করার পর কাহিনীতে প্রবেশ করছেন। রাজা দশরথের মনে হঠাৎ কি হল, তিনি চাইলেন শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যের যুবরাজ পদে অভিষেক করিয়ে দিতে। যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হয়ে গেলে রাজা দশরথের মৃত্যুর পর শ্রীরামচন্দ্রই অযোধ্যার রাজা হবেন। রাজা দশরথ হঠাৎ বিচলিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – হে রামচন্দ্র! আমার কুষ্টি বিচার করে জানা গেছে যে আমার জন্ম নক্ষত্রকে সূর্য, মঙ্গল আর রাহু এই তিনটে গ্রহ আক্রান্ত করেছে। গ্রহের এই আক্রান্তকে রাজা দশরথ বলছেন এক ধরণের অশুভ লক্ষণ। এই লক্ষণ গুলিকে সংস্কৃতে বলা হয় নিমিত্ত। যখন একটা জিনিষ হওয়ার থাকে, আগে থাকতেই প্রথমে তার একটু একটু আভাস পাওয়া যায়। এখানে রাজা দশরথ যে গ্রহ নক্ষত্রের কথা বলছেন, এগুলো হল পূর্বাভাস। রাজা দশরথ বলছেন – এই ধরণের নিমিত্ত যখন হয় তখন রাজার মহা বিপদ আসে, হয় রাজার মৃত্যু হয় তা নাহলে রাজ্যে কিছু একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল দেখা দেয়। হে রাম! আমার চিত্তের উপরে এই বিপদের মোহের আবরণ পরার আগেই আমি চাইছি তোমাকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে দিতে – **তদ্‌যাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ।।** ২/৪/২০। মানুষের যে মতি, মানুষের যে বিপদ এ বড়ই চঞ্চল, কি হয়ে যাবে কিছুই বলা যায় না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি আমার জন্ম নক্ষত্র অশুভ গ্রহ দ্বারা আক্রান্ত হতে যাচ্ছে তাই আগে থাকতেই আমি একটা ব্যবস্থা করতে চাই। আসলে বিপদ আসার আগে লক্ষণ দেখে বুঝে নেওয়া যায়, কিন্তু কি ধরণের বিপদ আসবে বলা যায় না, তাই রাজা দশরথও বুঝতে পারছেন তাঁর একটা ভয়ানক বিপদ আসছে, তিনিও আগে থাকতেই সাবধান হয়ে গিয়ে ব্যবস্থা নিতে চাইছেন।

এখন রাজা দশরথ সব জেনে বুঝেও কি কোন ব্যবস্থা নিতে পারলেন? মিছি মিছি মন্থরাকে দোষ দিয়ে কি হবে। রাজা দশরথের নক্ষত্র আক্রান্ত হয়েছে মানে, তিনি এর আগে আগে নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল করেছিলেন। আমরা যে বলি ভগবান কারুর ভালো করছেন কারুর খারাপ করছেন, আসলে ভগবান কিন্তু কখন পক্ষপাত করেন না। আমাদের যে কর্ম সেটাই ঘুরে ঘুরে আমাদের কাছেই ফিরে আসে। গ্রহই বলুন, মন্থরাই বলুন, এগুলো সবই নিমিত্ত মাত্র। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে এইজন্য বলছেন – *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্‌*। আমাদের নিজেদের কর্মই আমাদের মারতে আসছে, অপরে কিছু করছে না। বাঁচার কি কোন

পথ আছে? যতই জ্যোতিষিরা মাদুলি দিক, গ্রহ, রত্ন ধারণ করতে বলুক, বাঁচার কোন পথ নেই। কারণ আমাদের কর্ম কখনই আমাদের ছাড়বে না। কোন রকমে যদি বাঁচিয়েও নেয়, কিন্তু সে অপেক্ষা করে থাকবে, তারপর যখন যেটা আসবে সেটা আরও মারাত্মক রূপে আসবে।

এই কথা বলার পর রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – আমি এই নিয়ে বাকি কথা কাল তোমাকে বলব। আজকের রাতটা তুমি ইন্দ্রিয় সংযম করে বধুমাতা সীতার সাথে উপোস করবে আর কুশ শয্যায় শয়ন করবে। মানে তুমি আজকে কোন ধরণের ভোগের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত করবে না। এটাই ঠিক ঠিক আদর্শ জীবনের ধর্মীয় উপাচার। জীবনের যে কোন শুভ অনুষ্ঠানের আগে, যেমন উপনয়ন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস ইত্যাদিতে এই জিনিষ গুলিকে পালন করা হয়। শিবাজী যখন রাজা হতে যাচ্ছেন তার খুব সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়, শিবাজী আসলে শূদ্র ছিলেন। শূদ্র রাজা হওয়া মানে বিরাট বিপদ। তার আগে তাই তাঁকে ক্ষত্রিয় করা হয়েছিল, সেটা করতে একশ আট ঘড়া গঙ্গাজল আনা হয়েছিল, আর সেই জল দিয়ে, এবং আরও অনেক উপাচারীয় প্রথাতে, যার মধ্যে এই উপাচারগুলোও ছিল, এক মাস ধরে শিবাজীর শুদ্ধিকরণ করা হয়েছিল।

আরও বলছেন – **ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্যাণ্যেবং বিধানি হে।**।২/৪/২৪। এই ধরণের শুভ কার্যে অনেক বিঘ্ন আসে, আর ভরত যতক্ষণ নিজের মামার বাড়িতে আছেন, তার আগেই আমি তোমার অভিষেক করে দিতে চাই। আমরা কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ পড়ছি, বাল্মীকি রামায়ণে বলা হচ্ছে, রাজা দশরথেরও মনে কোথাও ভরতকে নিয়ে একটা শঙ্কা ছিল। তাই তিনি বলছেন ভরত এখানে থাকলে কিছু গোলমাল হলেও হতে পারে, সেইজন্য ভরত মামা বাড়ি থেকে ফিরে আসার আগেই তোমাকে যুবরাজ পদে অভিষেক করিয়ে দিতে চাই। এও বলছেন – এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার ভাই ভরত অত্যন্ত সৎ পুরুষ, আচারি, তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে এবং তোমার খুবই অনুগত। তবে কি জানতো, মানুষের মন কখন স্থির থাকে না। যারা ধর্মপরায়ণ মহৎ পুরুষ তাঁরাও অনেক সময় – **সতঞ্চ ধর্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব।।** ২/৪/২৭। যাঁরা নিত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও অনেক সময় রাগ ও দ্বেষ বশতঃ অনেক গোলমাল করে বসেন, তাই ভরতের মনেও গোলমাল হয়ে যেতে পারে। বাল্মীকি যদিও রাজা দশরথের উক্তির মাধ্যমে এই কথাগুলো বলছেন, কিন্তু এটা পরিষ্কার নয় কেন তিনি রাজা দশরথের মুখে এই ধরণের সংলাপ বসালেন। কেননা তখনকার দিনে এটাই সুনির্দিষ্ট প্রথা ছিল যে, যিনি জেষ্ঠ্য পুত্র তিনিই রাজার উত্তরাধিকারী হবেন। তা সত্ত্বেও কেন রাজা দশরথের মনে ভরতের দিকে থেকে শঙ্কা আসছে আর কেন রাজা দশরথের মুখে ঐ কথাগুলো বাল্মীকি বসিয়েছেন বোঝা যায় না। পরের দিকে যত রামায়ণ রচিত হয়েছে সেখানে কিন্তু রাজা দশরথের মনে ভরতকে নিয়ে এই শঙ্কার ব্যাপারটা উল্লেখই করা হয়নি।

আস্তে আস্তে এই খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সবারি মনে স্বাভাবিক ভাবে খুব আনন্দ। মন্থরার কানেও খবর পৌঁছেছে, শুনেই তিনি দৌড়ে কৈকেয়ির কাছে এসে তাকে শ্রীরামচন্দ্রের যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হওয়ার খবর দিতেই কৈকেয়িও খুব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ভালো খবর শোনাবার জন্য নিজের গলা থেকে এক ছড়া হার খুলে মন্থরাকে উপহার দিলেন। হার দিতেই মন্থরা সেই হারটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেবতারা মন্থরাকে নিযুক্ত করেছিলেন এই ভূমিকা পালন করার জন্য। বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু কোথাও এই ধরণের কথা আমরা পাইনা। মন্থরা যে ধরণের চরিত্রের, আমি যার দাসী সে রানী হতে পারবে না এই হিংসা তার প্রচণ্ড ভাবে ছিল, বাল্মীকি ঠিক সেই চরিত্রটাই মন্থরার মধ্যে ফুটিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোথাও বলছেন না যে দেবতারা মন্থরাকে এই কাজে নিয়োগ করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণ খুব বাস্তব ও স্বাভাবিক নিয়মকে অনুসরণ করেই এগিয়ে গেছে – যেমন রাজা দশরথ নিজের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেছেন, শ্রীরামচন্দ্রকে যুবরাজ হওয়ার জন্য সব দিক দিয়ে প্রস্তুতি নিতে বললেন, সব জায়গায় খবর পাঠানো হচ্ছে, কৈকেয়ির কাছে খবর এসেছে, কৈকেয়িও শ্রীরামের যুবরাজ হওয়ার খবরে আনন্দ প্রকাশ করছেন। কিন্তু মন্থরার অন্য রকম প্রতিক্রিয়া। কারণ সে দেখছে আমি

যার সেবা করছি তিনি রাজমাতা না হলে আমার খাতির, মান সম্মান সব কমে যাবে। কৈকেয়ি এখনতো তাও রানী আছেন, কিন্তু তাঁর সৎ পুত্র যখন রাজা হয়ে অযোধ্যার সিংহাসনে বসবে তখন কৈকেয়ির আর কোন দাম থাকবে না, কৈকেয়ির দাম না থাকলে মন্থরারও খাতির থাকবে না।

এরপর মন্থরা কৈকেয়িকে নানান রকমের বুদ্ধি দিয়ে প্ররোচিত করতে শুরু করেছে। কারণ কৈকেয়ির মনে কিন্তু একটুও কোন পাপ ছিল না। মন্থরা কৈকেয়ির ও নিজের ভবিষ্যতের আশঙ্কার বশবর্তী হয়েই কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করল। কিন্তু যে কোন ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয় যে দেবতারা মন্থরার মতিটাকেই ঘুরিয়ে দিয়ে এই ধরণের জঘন্য কাজে প্রয়োগ করল। কুমন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে কৈকেয়ির মনটাকে একেবারে ঘুরিয়ে দিতে মন্থরা সক্ষম হয়ে গেল। কৈকেয়িকে তখন মন্থরা পরামর্শ দিল কোপ ভবনে চলে যেতে। দেবতাদের সঙ্গে একবার অসুরদের সংগ্রামে রাজা দশরথ দেবতাদের হয়ে লড়াই করেছিলেন। সেই সময় কৈকেয়ি রাজা দশরথকে আহত অবস্থায় খুব সেবা যত্ন করে সুস্থ করে তুলেছিল। তাতে রাজা দশরথ খুব খুশি হয়ে কৈকেয়িকে দুটো বর দিতে চাইলেন। কৈকেয়ি তখন বলেছিল – আমার এখন বর নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, ভবিষ্যতের জন্য বর দুটো তোলা থাক।

কোপ ভবনে যখন কৈকেয়ি যাবে ঠিক হয়ে গেল তখন মন্থরা তাকে ময়লা বস্ত্র পরিধান করার পরামর্শ দিয়ে বলছে – মলিনবাসিনী হয়ে মাটির উপরে এমন ভাবে শুয়ে থাকবে যাতে রাজা বুঝতে পারেন তুমি প্রচণ্ড রেগে আছ। রাজা যখন তোমার খোঁজ নিতে আসবেন তখন তুমি চোখ তুলে তাকাবে না, কোন কথা বলবে না। যেমনি তুমি দেখবে রাজা ঘরে এসেছেন তখন তুমি চোখের জল ফেলে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটোপুটি খাবে। এক মা তার মেয়েকে শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে স্বামীকে হাতে রাখতে হবে – দ্যাখ, স্বামীকে যদি হাতে রাখতে চাস তাহলে চোখের জল ফেলবি। তাতেও যদি না আসে? আরও চোখের জল ফেলবি। আর তাতেও যদি না আসে? তাহলে আর আরও চোখের ফেলতে থাকবি? তাতেও যদি না আসে? আরও আরও আরও চোখের জল ফেলবি। আসলে বলতে চাইছে চোখের জলই হচ্ছে স্বামীকে বশে আনার শেষ অস্ত্র। এটাই মন্থরা কৈকেয়িকে শিখিয়ে দিচ্ছে – **রুদন্তি পার্থিবং দৃষ্ট্বা জগত্যাং শোকলালসা।।**২/৯/২৩। যেমনি তুমি রাজা দশরথকে দেখবে তক্ষুণি তুমি শোকমগ্ন হয়ে মাটিতে লুটোপুটি খেতে থাকবে। তুমি তো মহারাজের অতি প্রিয়, তোমার ঐ অবস্থা দেখে মহারাজ আর নিজেকে সামলাতে পারবেন না। তিনি তোমাকে কুপিত অবস্থায় দেখে তিনি তোমাকে রাগাতেও পারবেন না আর ঐ অবস্থায় তোমাকে দেখতেও চাইবেন না। তুমি মহারাজার এমনই প্রিয় যে তোমার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দেবেন। কুপিত শব্দটার মধ্যে অনেক কিছু মেশানো আছে, রাগ, অভিমান, দুঃখ সব মিলিয়ে যে অবস্থাটা হচ্ছে তাকে কুপিত বলা হয়। জ্ঞানীরা বলেন মানুষ যদি অনেক দিন বদ লোকের সঙ্গ করে তখন তার নিজের বুদ্ধিও বদ হয়ে যায়। কৈকেয়িকে অধ্যাত্ম রামায়ণে এই কথাই বলা হয়েছে।

মন্থরা ছিল কুব্জা, পিঠে একটা কুঁজ ছিল। সত্যিকারের কবিতা যদি বলা যায় তাহলে বাল্মীকি রামায়ণের কবিতার কাছে কোন কবিতাই দাঁড়াতে পারেনা। বাল্মীকির যে কল্পনা, চিন্তা, আর তার প্রকাশ করার শৈলী, শব্দ চয়ন, ছন্দ সব মিলিয়ে তিনি যা রচনা করে গেছেন বিশ্ব কাব্য সাহিত্যে এখনও এমন কোন সাহিত্য রচিত হয়নি যে এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এখন মন্থরার এইসব কথা শুনে কৈকেয়ির মন হঠাৎ মন্থরার জন্য একেবারে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন – দুই বন্ধু মেলাতে গেছে। মেলাতে নানা রকমের ছবি সাজান রয়েছে। এক বন্ধু ঠাকুর দেবতার ছবি দেখছে, আরেক বন্ধু অন্য জায়গাতে একটা ছবি দেখছে যাতে একটি মেয়ে তার নিজের উপপতিকে ঝ্যাঁটা পেটা করছে। তখন এই বন্ধু চিৎকার করে অন্য বন্ধুকে ডাকছে 'আরে ওখানে কি দেখছিস, এখানে দেখে যা কি মজার ছবি'। ঠাকুর 'চিৎকার করে' কথাটা খুব সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। এটাই হয় দৃশ্যের বর্ণনাতে মানুষের রুচি ও ধারণাটাই পাল্টে যায়।

এখন এত দিন ধরে কৈকেয়ি কুব্জাকে অন্য রকম ভাবত। যারা এই ধরণের কুব্জা হত তাদের কাজ ছিল বড়লোকের বাড়ির বউদের প্রসাধনের জন্য চন্দন ঘষা, মালা তৈরী করা ইত্যাদি, মানে খুব নিম্ন ধরণের কাজ তাদের দেওয়া হত। এখন কৈকেয়ি মন্থরাকে বলছে – **প্রজ্ঞাং তে নাবজানামি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি।।**১/৯/৩৮। কৈকেয়ির এখন মাথাটা গেছে ঘুরে, সে এখন চিৎকার করে বলছে, মেলাতে বন্ধুটা যেমন চিৎকার করে বলছে 'ওরে ওখানে কি দেখছিস'। এখন হঠাৎ কৈকেয়ি মন্থরার বুদ্ধির প্রশংসা করে বলছে – আরে তোমার কী বুদ্ধি! আমি কোন দিন ভাবিইনি যে তুমি এত বুদ্ধি ধর। আমি তোমার বুদ্ধির কখনই অবহেলা করতে পারব না। বুদ্ধি দিয়ে যখন কর্তব্য ও অকর্তব্যের বিচার করা হবে তখন কুব্জানাম্ উত্তমা, মানে তুমি কুব্জাদের মধ্যে উত্তমা, শ্রেষ্ঠা। এখানেই বাল্মীকির কবিতার সৌন্দর্য শৈলী বোঝা যায়। নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলছেন না, বাল্মীকি বলছেন জগতে যত কুব্জা আছে তার মধ্যে বুদ্ধির ব্যাপারে তুমি হলে শ্রেষ্ঠতমা। তুমিই আমার সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ হিতৈষিণী, তুমি আমার সিদ্ধির কাজে সর্বদা লেগে আছ। তুমি যদি না থাকতে তাহলে আমার কি দুরবস্থাই না হত, এই যে রাজা যে চক্রান্ত করে আমাকে ফাঁসাতে চলেছে, রামচন্দ্র রাজা হয়ে গেলে আমি তো আর কোন পাত্তাই পাব না কোথাও। তুমি না থাকলে রাজার এই চক্রান্ত আমি কখনই ধরতে পারতাম না।

তবে কি জান – **সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জাঃ বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ।।**২/৯/৪০। তোমাকে ছাড়া আর যত কুব্জা এই পৃথিবীতে আছে সবাই পাপিনী। হিন্দুদের একটা ধারণা ছিল যে, শরীরের কোন অঙ্গের যদি দোষ থাকত তখন মনে করা হত আগের আগের জন্মে তার কোন পাপকর্ম করা আছে। পাপকর্ম আছে বলে সূক্ষ্ম শরীর ঠিক সেই রকম সুস্থ স্থূল শরীর পায়নি। আমি চশমা ছাড়া দেখতে পাইনা, কারণ আমি এমন কোন একটা নেত্র পাপ করেছি যার জন্য আমার দৃষ্টি শক্তি দুর্বল। আমার একটা হাত নেই কেন, হয়তো এই হাত দিয়ে এমন কোন পাপ কর্ম করেছি যার জন্য এই জন্মে আমার হাত নেই। কুব্জা যে, তার সব অঙ্গই বক্র, যত কুব্জা তারা সবাই কোন না কোন প্রচণ্ড পাপ কর্মে লিপ্ত ছিল। এই ধারণাটা আমাদের হিন্দুদের মনে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, অবশ্য ধারণাটা এখন অনেক পাল্টাচ্ছে। কৈকেয়ি এখানে মন্থরাকে বলছে – তুমি কিন্তু পাপিনী নও। তোমার এত তুখর বুদ্ধি, তুমি আমার হিতৈষিণী, তুমি কি আর পাপী হতে পার কখন। তুমি ছাড়া আর যত কুব্জা আছে সবাই পাপিনী, সবাই নিকৃষ্টা।

এখন মন্থরার প্রতি কৈকেয়ির প্রচণ্ড ভালোবাসা জেগে গেছে। যার প্রতি ভালোবাসা এসে যায় সে যদি বানরমুখীও হয় তাকে চন্দ্রমুখী মনে হবে। মন্থরার রূপের বর্ণনা করে কৈকেয়ি বলছে – বাতাসে পদ্ম গাছ যেমন নুয়ে যায়, তোমার শরীরও সেই রকম বেঁকে আছে। বেঁকে গেলেও তোমাকে কি সুন্দর দেখতে লাগছে। তোমার বক্ষদেশ কুব্জা দোষে একটু ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে, তাই তোমার কাঁধ থেকে একটু উঁচু দেখাচ্ছে। তোমার বক্ষস্থল থেকে কোমর পর্যন্ত যে অঙ্গ সেটা তোমার মুখ যেটা ফুলে রয়েছে তা দেখে লজ্জা পেয়ে সে যেন শীর্ণকায় হয়ে গেছে।

মন্থরা আসলে ভীষণ কুৎসিৎ দেখতে ছিল, সেই কুৎসিৎ রূপটাকে বাল্মীকি খুব সুন্দর কাব্যিক ভাবে ব্যঙ্গ করে বর্ণনা করছেন। তারপর কৈকেয়ি বলছেন, তোমার যে জঙ্ঘাগুলো কি সুন্দর ভাবে বিস্তৃত। অর্থাৎ বেশ মোটা মোটা পা। বাল্মীকি এমন এক নারীর বর্ণনা দিচ্ছেন যার কোন রূপ নেই, অথচ এমন সুন্দর করে বিশ্লেষণাত্মক ভাবে প্রত্যেকটি অঙ্গের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন যে, যে পড়বে সেই মজা পাবে। শেষে বলছে – হে কুব্জা, তুমি যখন আমার সামনে সামনে সিল্কের শাড়ি পরিধান করে চলফেরা কর তখন তোমাকে কি সুন্দরই না দেখায়, তাতে আমারও শোভা বেড়ে যায়।

বলছেন – **আসন্ যাঃ শম্বরে মায়াঃ সহস্রমসুরাধিপে।।**২/৯/৪৫ অসুর রাজ শম্বর – শম্বর নামে অসুর ছিল, সে সহস্র মায়া জানে, কিন্তু ঐ মায়া সবই তোমার হৃদয়ে অবস্থিত। কিন্তু মজার জিনিষ হচ্ছে তুমি সেই অসুর যত মায়া জানত তা ছাড়াও তোমার অনেক মায়া জানা আছে। আর তোমার পিঠে যে কুঁজ রয়েছে, ওর মধ্যে মতি, স্মৃতি, বুদ্ধি, ক্ষত্রবিদ্যা, রাজনীতি ইত্যাদি এই ধরণের যত রকমের মায়া

থাকতে পারে, যত রকমের বিদ্যা আছে, যত রকমের গুণ থাকতে পারে সব মজুত আছে। ফেরিওয়ালারা যখন পিঠে বোঁচকা বেঁধে নিয়ে জিনিষপত্র ফেরি করে বেড়ায় তখন সেই বোঁচকার মধ্যে কত রকমের জিনিষ থাকে, মন্থরার পিঠের যে কুঁজটা ফুলে রয়েছে কারণ ওর মধ্যে সব এই ধরণের জিনিষ মজুত আছে বলে। বাকীদের কিছু নেই বলে পিঠটা সমান থাকে।

মন্থরাকে এইভাবে অনেক প্রশংসা করে মলিনে বেশে কৈকেয়ি গেল কোপ ভবনে ঢুকে, সেখান থেকে আর বেরোল না। কৈকেয়ি দেখতে সব থেকে সুন্দরী ছিল আর বয়সও কম ছিল। রাজা দশরথও বেশি বয়সে কৈকেয়িকে বিয়ে করেছিলেন। আর বুড়ো বয়সে বিয়ে করলে কি হয় ঠাকুরের কথামৃতেই খুব সুন্দর উপমা দেওয়া আছে। দক্ষিণেশ্বরে এক বিহারী দারোয়ান ছিল, সে বুড়ো বয়সে এক নাতির বয়সী মেয়েকে বিয়ে করেছে। তার আবার বেশি পয়সা কড়ি ছিল না, দরজাটা গেছে ফুটো হয়ে, দরজা মেরামত করবার পয়সাও নেই। দরজার ফুটো গুলো কাগজ দিয়ে বন্ধ করে রাখত। পাড়ার ছোকরা ছেলেগুলো লুকিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে ছেঁদা করে দেখত। তার দুশ্চিন্তা সব সময় লেগেই থাকত যে, আমার বউকে সবাই দেখে ফেলবে। বুড়ো বয়সে যখন কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে করে তখন এই দুরবস্থাই হয়। দশরথের ঠিক এই দুরবস্থাটাই হয়েছিল।

এখন কৈকেয়িকে তার নিজের ঘরে দেখতে না পেয়ে দুশ্চিন্তায় এদিক ওদিক খোঁজ করতে করতে রাজা দশরথ কোপ ভবনে এসেছেন। কৈকেয়িকে দেখে রাজা খুব চিন্তিত হয়ে গেছেন। কৈকেয়িকে অনেক করে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কি হয়েছে, তোমাকে কে মন্দ বাক্য বলেছে, তোমাকে কে অপমান করেছে। কৈকেয়ি কোন কথার উত্তর দিচ্ছে না। কি পেলে তোমার এই রাগ, অভিমান চলে যাবে বল, তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে সব দেব, তুমি কি বর চাও আমাকে বল প্রিয়তমে। তখন কৈকেয়ি বলছে – **তৎচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়িস্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দপুরোগমাঃ।।২/১১/১৩** - তেত্রিশ দেবতা যাঁরা আছেন তাঁরা এটা শুনে নিন। বেদ ও উপনিষদে বার বার এই প্রশ্নটা এসেছে দেবতা কজন আছেন। কখন বলবেন তিন, কখন বলবেন তেত্রিশ। বৈদিক গ্রন্থে তেত্রিশ দেবতার ধারণাটা হিন্দুদের মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নিয়েছে। তিন থেকে বাড়তে বাড়তে তেত্রিশ হয়েছে, তারপর সেখান থেকে বাড়তে বাড়তে আমরা এখন বলি তেত্রিশ কোটি দেবতা। তবে বৈদিক যুগে তেত্রিশ দেবতা ছিলেন প্রধান দেবতা। এখানে কৈকেয়ি বলছে – তেত্রিশ যে দেবতারা আছেন তাঁরা শুনে নিন যে, মহারাজ আমাকে বর দিতে চেয়েছেন। এখনকার দিন হলে বলত – হে তেত্রিশ কোটি দেবতারার সবাই শুনে নিন। আর আমরা বলব – হে ঠাকুর! তুমি সাক্ষী তোমার সামনে এটা বলা হচ্ছে।

মহারাজ বর দিতে যখন অঙ্গীকার করে বসেছেন তখন কৈকেয়ি বলছে – এই রাজ্যাভিষেক হতে চলেছে, অভিষেকের ঐ সামগ্রি দিয়েই ভরতকে রাজা করা হবে আর শ্রীরাম চৌদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে যাবে। কৈকেয়ির এই কথা শুনেই রাজা দশরথের মাথা গেছে ঘুরে। রাজা দশরথ তখন বলছেন – আমি তোমার জন্য রাজলক্ষ্মী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে ত্যাগ করে দিচ্ছি, কিন্তু শ্রীরামের জন্য এই রকম কোন প্রার্থনা করো না। তারপরে তো রাজা দশরথ একের পর এক বিলাপ করে যাচ্ছেন। তারমধ্যে একটা শ্লোকে বলছেন – **মম বৃদ্ধস্য কৈকেয়ি গতন্তস্য তপস্বিনঃ। দীনং লালপ্যমানস্য কারুণ্যং কর্তুমর্হসি।।২/১২/৩৪**। হে কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, মৃত্যু আমার দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার এখন করুণ অবস্থা, আমি অত্যন্ত দীন হীন ভাবে হাত জোড় করে তোমাকে বলছি তুমি আমাকে দয়া কর। তুমি এই রকমটি করো না, শ্রীরাম তো কোন দোষ করেনি।

এই সমস্যা আমাদের প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, যে জিনিষটা আমরা করতে পারিনা, বা আমার ক্ষমতার বাইরে, সেই জিনিষ গুলিকে নিয়েই দিব্যি খাওয়ার অভ্যেস শুধু আজকেই নয় সেই রামায়ণের যুগ থেকেই আছে। দিব্যি খেয়ে বলে আমি এটা করব, তারপর দেখা যায় সে কিছুই করছে না। বিয়ের সময় স্বামী স্ত্রী অগ্নিকে সাক্ষী রেখে কত দিব্যিই তো করে, কারণ জানে যে এটা না করলে জীবন

চলবে না, দুদিন পরে কে কোথায় ছিটকে যাবে। আমরা যতই বলি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক একেবারেই আলাদা, কিন্তু স্বামী আলাদা স্ত্রী আলাদা, নিজের স্বার্থ ছাড়া জগতে কিছুই চলে না। মানুষকে সত্যিকারের দুজন ভালোবাসে, তারমধ্যে একজন হচ্ছে মা, কিন্তু মায়েদের তবুও অনেক স্বার্থ থাকে, মাও যে সব সময় নিঃস্বার্থ হবে তা নয়। আর দ্বিতীয় জন হচ্ছেন যাঁরা ঠিক ঠিক সাধুপুরুষ। সাধুপুরুষ যে কেউই হতে পারেন, তার জন্য যে সন্ন্যাসী হতে হবে তা নয়, যার অন্তঃকরণ সাধুচিত, তিনি যখন কাউকে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসার মধ্যে তাঁর কোন রকমের স্বার্থ থাকে না। গৃহীদের মধ্যে যাদের অন্তঃকরণ সাধুচিত তাদের পক্ষেও এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা অত্যন্ত কঠিণ। তাদেরও ঘর সংসার আছে, তাদের নিজের স্ত্রী, সন্তানদের দেখাশোনা করতে হয়, তখন অপরের সন্তানকে নিজের সন্তানের মত ভালোবাসা দেখাতে গেলে নিজের পরিবার থেকে অনেক ধরণের কটূক্তি শুনতে হয়, এগুলোকে এড়াবার কোন উপায় থাকে না। সন্ন্যাসীদের মধ্যে যারা সত্যিকারের সাধু তাঁদের ভালোবাসাটাই ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থ হয়। এই দুজন ছাড়া আর যত রকমের সম্পর্ক আছে, স্বামী স্ত্রী, ভাই বোন, বোন ভাই, বাবা ছেলে, ছেলে বাবা, মা মেয়ে, মেয়ে মা, এই দুটোর বাইরে আর কোন সম্পর্ক দেখা যাবে না যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আছে।

প্রত্যেকটি বিবাহিত সম্পর্ক হচ্ছে marriage of convenience, দুজনের ব্যক্তিগত কতকগুলি সুবিধা পাওয়ার পারাস্পরিক বোঝাপড়া। তারমধ্যে যেমনি যার সুবিধাটুকু মিটে যাবে সে টুক্ করে সরে পড়বে। পতিব্রতা, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা যাইই থাকুক না কেন, স্বার্থের ধাক্কা যখন আসে তখন সব ভালোবাস ছিটকে যায়। এখন আবার সবারই হাতে এসে গেছে প্রচুর টাকা পয়সা, কি স্ত্রীর হাতে কি স্বামীর হাতে, পান থেকে চুন না খসতেই ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে। দুটো মন আলাদা, কখনই এই দুটো এক হবে না। হবে, হবে না কেন, যদি কারুর মন সমুদ্রের মত বিশাল আর জলের মত তরল হয়। সাধুর মন একেবারে সমুদ্রের মত। কোন সাধু যদি কাউকে বলে, আমি তোমাকে স্নেহ করি, তখন সাধু তাকে স্নেহ করা কোন দিন বন্ধ করবেন না। শ্রীরামচন্দ্রের গুণের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল, একটা কেউ যদি উপকার করত তিনি সেটাকেই মনে রাখতেন, অপকার কি করছেন সেটাকে তিনি কখন মনে রাখতেন না। কারণ তিনি হলেন সত্যিকারে মহাত্মা, সাধারণ মানুষ পারে না।

কিন্তু তাই বলে কি শ্রীরামচন্দ্রের মনে দুঃখ, বেদনা হয়নি? প্রচুর দুঃখ ব্যাথা তিনি অনুভব করেছেন, তিনিও সেই ব্যাথা বেদনায় হা হুতাশ করেছেন। প্রথম রাত্রে যখন জঙ্গলে গিয়ে ভূমি শয্যায় শয়ন করছেন তখন তিনি মনে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলেন, হা হুতাশ করে লক্ষ্মণকে অনেক কথা বলে হাল্কা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সব দুঃখ কষ্টকেই তিনি হজম করে নিয়েছিলেন, এটাই হচ্ছে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা। গীতা উপনিষদ পড়ে আমরা মনে করি আধ্যাত্মিক পুরুষের মন পাথরের মত কঠিণ। কিন্তু তাঁরও কষ্ট অনুভব হয়, শুধু কষ্টই নয়, আমরা যে কষ্ট পাই তার লক্ষ গুণ কষ্ট তিনি অনুভব করেন। কিন্তু হজম করার শক্তিটা তাঁর প্রচণ্ড। স্বামীজীকে কত লোকের কাছ থেকে কত ভাবে প্রতারিত হতে হয়েছিল, এর একটা প্রতারিতের ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটলে আমরা কোথায় ছিটকে যাব খুঁজেই পাওয়া যাবে না। স্বামীজীও প্রচুর কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু সব কষ্টকে হজম করার শক্তি তাঁর ছিল বলে আজ তিনি স্বামী বিবেকানন্দ হতে পেরেছেন। আমরা মনে করি শ্রীরামচন্দ্র হাসি মুখে পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য বনে চলে গেলেন, মোটেই নয়, তাঁরও প্রচণ্ড মন খারাপ হয়েছিল। এতেই বোঝা যায় ভারতের আধ্যাত্মিকতার আদর্শ কি। পরে পরে ভক্তিশাস্ত্রে আমরা যে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের বর্ণনা পাই, সেখানে কিন্তু এই দুটি চরিত্রের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না। ঠাকুরেরও প্রচণ্ড কষ্ট হত। যখন শ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে হৃদয় ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে তখন কি ঠাকুরের কষ্ট হয়নি? প্রচুর কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু কি করবেন, চুপ করে ছিলেন। আবার হৃদয় যখন ঠাকুরকে কষ্ট দিচ্ছেন তখনও ঠাকুরের প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। ঠাকুর নিজের মুখে বলছেন – হৃদয় মাঝে মাঝে আমায় এমন কষ্ট দিত যে, প্রাণ ত্যাগ করব বলে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলাম। ভাবা যায়! যিনি কিনা অবতারবরিষ্ঠ, যিনি অনেকের ইষ্ট, তিনি অপরের নিপীড়ণ সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যা করবার সঙ্কল্প করেছিলেন। সংসারের জ্বালা এত তীব্র, হৃদয়তো সংসারেরই, যার জ্বালায় তিতিবিরক্ত হয়ে

অবতারবরিষ্ঠায় গঙ্গায় আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা কল্পনা করা যায়! এটাই হচ্ছে অবতারের সঠিক চরিত্র চিত্রণ। জীবনের বাস্তবতার মূল্যায়নের জন্য এগুলো আমাদের বোঝা খুব দরকার যে, কষ্ট সবারই হয়। কিন্তু কে কত তাড়াতাড়ি হজম করে নিতে পারছে তাতে বোঝা যায় তিনি কতটা আধ্যাত্মিক পুরুষ।

রাজা দশরথ কৈকেয়ির কাছে অনেক প্রার্থনা করছেন – তুমি এ রকমটি করো না। যত রকমের যুক্তি হতে পারে, সব যুক্তি দিয়ে কৈকেয়িকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন। সব বুঝিয়ে কৈকেয়িকে বলছেন – **যদি ভর্তুঃ প্রিয়ং কার্যং লোকস্য ভরতস্য চ। নৃশংসে পাপসঙ্কল্পে ক্ষুদ্রে দুষ্কৃতকারিণি।।২/১২/৬০।** কৈকেয়ি, তুমি হচ্ছ নৃশংস, পাপ সঙ্কল্প, তুমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি সম্পন্ন এবং দুষ্কৃতকারিণী। তুমি তোমার স্বামীর আর তোমার সন্তান ভরতের জন্য যদি ভালো কিছু করতে চাও, সারা জগতের যদি ভালো করতে চাও তাহলে তুমি এই সঙ্কল্প ত্যাগ কর। রাজা দশরথ কৈকেয়ির প্রতি খুব কড়া কড়া কথা প্রয়োগ করছেন। আমি তো তোমাকে সতিসাধ্বী মনে করতাম, কিন্তু তুই এত দুষ্টা! যখন কেউ বিষাক্ত মদ পান করতে যায় তখন কিছু বুঝতে পারে না, কিন্তু যখন পান করে নেয় তখন সে বুঝতে পারে যে এতে বিষ মেশান ছিল। আমিও তোর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে মনে করেছিলাম তুই কতই না ভালো নারী।

রাজা দশরথ বলছেন – আমার নিশ্চয়ই হয়তো পূর্ব পূর্ব জন্মে অত্যন্ত পাপ কর্ম করা ছিল, সেই পাপের অশুভ ফলের জন্য আজকে আমাকে এই গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এরপরে খুব একটা সুন্দর কথা বলছেন – এক ব্রাহ্মণ প্রচুর মদ পান করতে শুরু করেছে। মদ খাওয়ার লোভে একদিন সে নিজের সন্তানকেই বিক্রী করে দিয়েছে। রাজা দশরথ তাই বলছেন – যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁরা আমাকে নীচ আর ব্রাহ্মণ যেমন মদের মোহে নিজের সন্তানকে বিক্রী করে দিয়েছিল আমাকেও ঠিক তেমনি সবাই বলবে। আর রাস্থায় রাস্থায়, ঘাটে ঘাটে, অলিগলিতে লোকেরা আমার নিন্দা করবে। কি নিন্দা করবে? এক নারীর রূপের মোহে মোহাচ্ছন্ন, কামাসক্ত হয়ে নিজের ছেলেকে বনে পাঠিয়েছে।

এই যে রাজা দশরথ বলছেন – এর আগের আগের জন্মে আমি প্রচুর পাপ করেছিলাম, যার জন্য আমাকে এই পুত্রশোক গ্রাস করেছে। এখান থেকেই প্রথম আমরা পরিষ্কার জীবাত্মার বিভিন্ন দেহে গমনাগমনের ধারণা পাচ্ছি। আমি যে কর্ম করেছি সেই কর্মই আমার উপরে ঘুরে আসছে, এই ধারণাটা এই প্রথম আমরা এখানে পাচ্ছি। বেদেতো এই ধারণা আসেইনি, এমনকি উপনিষদেও এত জোরাল হয়ে আসেনি। উপনিষদেও আমরা পুনর্জন্মের কথা পাই, কিন্তু সেখানেও সরাসরি বলা হয়নি, একটু ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে একেবারে সরাসরি নিয়ে আসা হয়েছে। বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করেছেন সেই সময় কিন্তু পুনর্জন্মবাদ তত্ত্ব পুরোপুরি স্বীকৃত তত্ত্ব ছিল না। আমরা অনেকে মনে করি যে, পুনর্জন্মবাদ হিন্দুদের কাছে চিরন্তন তত্ত্ব। কিন্তু প্রথম দিকে পুনর্জন্মবাদ সেইভাবে স্বীকৃত দর্শন ছিল না, যেভাবে পরের দিকে হিন্দুদের কাছে স্বীকৃত দর্শন রূপে গণ্য হয়েছে। পরে পরে ঋষিরা এই তত্ত্বটিকে আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত করে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন, যেমন আমরা এই জায়গাতে প্রথম এই তত্ত্বের উল্লেখ পাচ্ছি। যার জন্য গীতাতে ভগবান অর্জুনকে আত্মার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে তিনটি মতবাদ এনে বোঝাচ্ছেন। এর মধ্যে একটা হচ্ছে আত্মাই সব সময় আছেন, দেহেরই একমাত্র নাশ হয়। দ্বিতীয় মত হচ্ছে শরীর যখন জন্ম নেয় তখন আত্মার জন্ম হয় আর শরীরের যখন নাশ হয়ে যায় আত্মারও তখন নাশ হয়ে যায়। তৃতীয় মতবাদ হচ্ছে – শরীর ধারণ করছে, মারা যাচ্ছে, স্বর্গে যাচ্ছে, স্বর্গ থেকে আবার জন্ম নিয়ে শরীর ধারণ করছে। এই তিনটে মতবাদই তখন ছিল। এর মধ্যে পুনর্জন্মবাদের মত কিন্তু খুব বেশি প্রচলিত মতবাদ ছিল না। তখন জনপ্রিয় ছিল মৃত্যুর পর এখান থেকে স্বর্গাদি বিভিন্ন লোকে যায়। কিন্তু তারপরে তাঁদের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু হল যে, স্বর্গাদি কি করে চিরন্তন হতে পারে! তখন আবার দেখলেন যে স্বর্গের ভোগ যেই শেষ হয়ে যাবে তাকে আবার এই পৃথিবীতে ফেরত আসতে হবে। এই ধারণাটাই আমরা প্রথম স্পষ্ট

রূপে বাল্মীকি রামায়ণে এখানে পাচ্ছি, যেখানে রাজা দশরথ বলছেন – আমি আগের আগের জন্মে প্রচুর পাপ কর্ম করেছিলাম, যার ফলে তোমার সাথে আমার মিলন হয়েছে।

রাজা দশরথ এর পর কৈকেয়িকে বলছেন – **ধিগস্তু যোষিতে নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ। ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্।**।২/১২/১০০। শেষ বয়সে রাজা দশরথের জীবনের উপর এক অকল্পনীয় বিপর্যয় নেমে এসেছে। প্রচণ্ড আঘাত পেলে মানুষের মন থেকে অনেক রকম কথা বেরিয়ে আসে, যেটা বলার নয় সেটাই বলবে, যেটা করার নয় সেটাই করতে চাইবে। আসলে মানুষ নিজের আবেগের কাছে এতই অসহায় যে সামান্য দুঃখ কষ্টেই সে নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। রাজা দশরথও অসহায় হয়ে বলছেন 'নারীদের প্রতি আমি ধিক্কার দিচ্ছি, তারা সব শঠ, মুর্খ আর স্বার্থপরায়ণ। তবে এই কথা আমি সব নারীকে উদ্দেশ্য করে বলছি না, এই অপবাদ শুধু ভরতের মায়ের নামে দিচ্ছি'। এই ভাবে একবার গালাগাল দিয়ে, একবার ভালোবাসা দেখিয়ে, একবার ভয় দেখিয়ে নানা ভাবে চেষ্ট করে যাচ্ছেন যাতে কৈকেয়ি তার মত বদলায়। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়, কৈকেয়ি কোন কথাই শুনবে না, তার আবদার থেকে এক চুলও সরে আসবে না।

এতক্ষণ রাজা দশরথই কথা বলে গেছেন, কৈকেয়ি যখন কোন কথাই শুনবে না বুঝে নিলেন তখন তিনি একটু থেমে শান্ত হয়েছেন। রাজা দশরথের কথা থামতেই কৈকেয়ি এবার শুরু করেছে। কৈকেয়ি বলছে 'আপনিই তো প্রথমে আমাকে বললেন বর দুটো নিয়ে নিতে, আর আমি দেবতাদের সাক্ষী রেখে বর চাইতেই আপনি যেভাবে মাটিতে উল্টে পড়েছেন যেন কেউ পাপ করে পশ্চাৎতাপ করছে। এ কি ধরণের আপনার আচরণ! সৎ পুরুষের মতন নিজের কথাতে স্থির থাকুন, ভদ্রলোকের এক কথা। আপনিই তো আমাকে বর চাইতে বললেন, পাপ করে মানুষ যেমন অনুশোচনা করে আপনারও কি সেই রকম অনুশোচনা হচ্ছে আমাকে বর চাইতে বলে? কৈকেয়ি বলছেন – **আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্মং ধর্মবিদো জনাঃ। সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্মং প্রতিচোদিতাঃ।**।২/১৪/৩। সত্যই ধর্ম, যাঁরা ধর্মজ্ঞ পুরুষ তাঁরাই এই কথা বলে গেছেন, তাঁরাই তো বলে গেছেন সত্যকে আশ্রয় করতে আর সত্য আচরণ করতে। আমি আপনাকে ধর্ম পালনের জন্যই প্ররোচিত করেছি, সত্য পালনের জন্যই আপনাকে বলছি, কেন আপনি তখন থেকে আমাকে অযথা আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছেন।

রাজা দশরথ যা যা যুক্তি দিয়েছিলেন, তার বিপরীত যুক্তি দিয়ে এখন কৈকেয়ি স্বামীর কথাকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছে। এক সময় সমুদ্র কথা দিয়েছিল সে তার মর্যাদাকে কখনই উল্লঙ্ঘন করবে না, সেই সত্যতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমুদ্র কক্ষণ নিজের সীমাকে উল্লঙ্ঘন করেনি। আর – **সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিতঃ। সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্।**।২/১৪/৭। *সত্যম্ এক পদম্ ব্রহ্ম* মানে ওঁ, ব্রহ্মকে যখন এক পদে বলা হয় তখন 'ওঁ' এই এক পদ দিয়েই বলা হয়, কৈকেয়ি বলছে সত্যের আরেক নাম ওঁ। ধর্মের সব কিছু সত্যে প্রতিষ্ঠিত, *সত্যেমেবাক্ষয়া বেদাঃ* – অক্ষয় বেদও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। আর *সত্যেনাবাপ্যতে পরম্,* সত্যের সাহায্য নিয়েই মানুষ পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যদি আপনার বুদ্ধি ধর্মে অবস্থিত থাকে তাহলে সত্যের অনুসরণ করুন আর আমি যে দুটি বর চেয়েছি সেই বর দুটি দিয়ে আপনি আপনার সত্য রক্ষা করুন।

যদি বিচার করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে এখানে কৈকেয়ির কোন দোষই নেই। কৈকেয়ি যে কী দোষ করেছিল সত্যিই বোঝা যায় না। ছোটবেলা থেকে কৈকেয়ির সম্বন্ধে শুনে শুনে আমাদের মনে যে একটা বিরূপ ধারণা তৈরী হয়ে গেছে, এই ধারণা থেকে বেরিয়ে না এলে আমরা কোনদিন কৈকেয়ির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারব না। কিন্তু ভালো করে বিচার করে যদি দেখা যায় তাহলে পরিষ্কার হয় না কৈকেয়ি কোথায় দোষ করেছিল। তিনি নিজের সন্তানের জন্য রাজ্য চাইছেন, এতে দোষের কি আছে! সব নারীই তাই করে আসছে। জঙ্গলে গিয়ে সীতা বলছেন আমার সোনার হরিণ চাই। নারীর যা প্রিয় জিনিষ সেটা তার

স্বামীর কাছেই চাইবে, স্বামী ছাড়া আর কার কাছে চাইতে যাবে! আবার দুর্যোধন যখন রাজ্য দিতে চাইছিল না, তখন দুর্যোধন কি দোষ করেছিল বোঝা যায় না। এই কারণেই বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারতের মত গ্রন্থকে বিদগ্ধজনরা এতো কদর করেন, এই ধরণের ঘটনার মধ্যে কোথায় যে একটা সূক্ষ্ম চিন্তার রসদ লুকিয়ে আছে যেটা সবাই ধরতে পারে না। একটু সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে আসলে কৈকেয়ি কোন দোষই করেনি, আমাদের চিরাচরিত অন্ধ ধারণাই কৈকয়িকে খল নায়িকার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। গোটা রামায়ণ জুড়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বাল্মীকি যেভাবে বড় নায়ক করেছেন, আর নায়ককে যখন কেউ কোন ভাবে কষ্ট দেয় তাতেই সে ভিলেন হয়ে যায়। তাবে হ্যাঁ, এখানে শ্রীরামচন্দ্রেরও কোথাও কোন দোষ নেই। শ্রীরামচন্দ্র এর মধ্যে ফেঁসে গেছেন। যার জন্য এখনও অনেকে মনে করেন যে শ্রীরামচন্দ্র বোকা ছিলেন। তাদের মত হল, ঐ পরিস্থিতিতে তখনই তাঁর উচিৎ ছিল বিদ্রোহ করে রাজাকে বন্দি করে কৈকেয়ির গলাটা কেটে দিয়ে সিংহাসন দখল করে নেওয়া। এটাই তাঁর একমাত্র ঠিক ঠিক ক্ষত্রিয়োচিত পদক্ষেপ ছিল। এইসব না করে কেন যে তিনি চৌদ্দ বছরের জন্য বনে চলে যেতে স্বীকার করে নিলেন বোঝা যায় না। পরের দিকে ভক্তিশাস্ত্রে অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে রাবণ বধ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বলেই তিনি এই ধরণের কোন কিছু করেননি। বাল্মীকি কিন্তু কোন মন্তব্যই করেছেন না, তিনি শুধু একটার পর একটা দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন।

কৈকেয়ির কথার জবাবে রাজা দশরথ এবার শেষ কথা বলে দিচ্ছেন – **যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ। সংত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া।।**২/১৪/১৪। বলছেন, যে মন্ত্র উচ্চারণ করে আমি তোমার হাত ধরেছিলাম আজকে তোমার এই হাত আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আর তোমার আমার থেকে যে পুত্রের জন্ম হয়েছিল, তাকেও আমি ত্যাগ করে দিলাম। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের জন্য যা কিছু এসেছে, এখনতো আর রাজ্যাভিষেক হবে না, এই অপরিসীম বেদনাদায়ক ঘটনার পর আমিও তো আর বাঁচব না, তাই শ্রীরামকে বলবে ঐ জিনিষগুলি দিয়েই যেন আমার জন্য জলাঞ্জলি দিয়ে দেয়। কিন্তু তুমি আর তোমার পুত্র ভরত যেন আমাকে জলাঞ্জলি না দেয়। এখানে লক্ষ্য করা বিষয় যে, এই ঘটনাতে ভরতের কোন দোষই নেই, কেননা তখন ভরত ঘটনাস্থলেই নেই, সে তার মামার বাড়িতে অবস্থান করছিল।

রাজা দশরথ এমনিতেই মহা গোলমেলে ছিল। সেইজন্য পরে লক্ষ্মণ রাজা দশরথকেও কটূ কথা বলতে ছাড়েননি। প্রথমে নিজেই বর দিলেন, আচ্ছা না হয় উনি ভুল করে দিয়েছেন, কিন্তু মাঝখানে কেন বলছেন যে ভরত যেন জলাঞ্জলি না দেয়! ভরতের তো এখানে কোন ভূমিকাই নেই। যেসব মানুষ মনের আবেগের দ্বারা সব সময় চালিত হয়ে চঞ্চল চিত্তের হয়, তাদের উপর যখন দুঃখ কষ্টের আঘাত আসে তখন সে এই দশরথের মতই আচরণ করে। এদের কোন কিছুকে ধরে রাখার শক্তি নেই। আজকে কারুর একটু ভালো দেখলো তো সে বুদ্ধের মত মানুষ হয়ে যাবে আবার একটু গোলমাল দেখে নিলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই হয়ে যাবে একটা জোচ্চর। আমাদের মনের আবেগ ঠিক বর্ষাকালের আকাশের মত, হঠাৎ হঠাৎ করে আকাশ ভেঙ্গে জলের ধারা ঝরে পরতে থাকবে।

এইভাবে কখন রাত অতিবাহিত হয়ে গিয়ে ভোর হয়ে এসেছে কেউ টের পায়নি। সুমন্ত্র রাজার নিদ্রা ভঙ্গ করতে এসেছেন। খুব সুন্দর করে বলছেন ‘হে রাজা, দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলি এই সময়ে যেভাবে ইন্দ্রের স্তুতি কর ইন্দ্রকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেন, এবং যার ফলে ইন্দ্র সব দানবকুলকে জয় করেন, আমিও ঠিক সেইভাবে স্তুতি বচন করে আমি আপনাকে প্রভাতে প্রবোধিত করছি’। অনেক বাড়িতে যখন ছোট বাচ্চাকে সকাল বেলা ঠাকুরমা দিদিমারা ঘুম থেকে তোলেন তখন নানা রকমের গল্প বলে বলে বাচ্চার ঘুম ভাঙ্গান। যখন একটু বড় হয়ে যায়, ফাইভ সিক্সে পড়ে তখন যদি ঘুম থেকে না ওঠে মা গিয়ে এক চড় মেরে বলে – স্কুল বাস চলে যাবে, ওঠ্, এখনো ঘুমোচ্ছিস। রাজাকে তো আর এভাবে ওঠানো যাবে না, তাই অনেক স্তুতি করে করে রাজাকে তোলা হত। মন্ত্রি সুমন্ত্র বলছেন – বেদের ছটি অঙ্গ বেদের সঙ্গে এক হয়ে যেভাবে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নিদ্রা থেকে তোলেন, সূর্য যেমন রোজ এই পুরো পৃথিবীকে ঘুম

থেকে তোলেন, ঠিক সেইভাবে আমিও আজ আপনাকে জাগ্রত করছি। এখানে বলতে চাইছেন ব্রহ্মার আগে আসছে বেদ, বেদ চিরন্তন কিন্তু ব্রহ্মা চিরন্তন নন।

সারারাত ধরে যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, রাজা দশরথ যে সমস্ত রাত একটুও ঘুমোননি সুমন্ত্রতো এত সব জানেন না। সুমন্ত্রের এই ধরণের স্তুতি বচন শুনে রাজা দশরথ বিরক্তির সুরে বলছেন – এই সব কথা বলে তুমি আমার মর্মে আঘাত করো না। সুমন্ত্র রাজার কথা শুনে খুব চমকে উঠেছেন। তখন কৈকেয়ি সুমন্ত্রের সংশয়ের ঘোর কাটাবার জন্য বলছেন – **সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ**।২/১৪/৬১। সুমন্ত্র, শ্রীরামচন্দ্রের যে সকাল বেলায় রাজ্যাভিষেক হবে সেইজন্য রাজা খুব উৎসুক হয়ে রয়েছেন, সেই আনন্দে আর উৎকণ্ঠার জন্য রাজার সারা রাত ঘুম হয়নি। সারা রাত জেগে ছিলেন বলে এখন একটু ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। তুমি এখন যাও, বরং রামকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।

সুমন্ত্র বুঝে নিয়েছেন কিছু একটা গোলমাল আছে, তিনি বলছেন 'হে ভামিনি! আপনি রানী হতে পারেন, কিন্তু আমি তো রাজার আজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন কাজ করতে পারিনা'। রাজা যদি আজ্ঞা দেন তবেই আমি শ্রীরামচন্দ্রকে ডেকে আনতে পারি। কৈকেয়ির এই ধরণের কার্যকে বলা হয় extra constitutional authority, একজন অফিসার আছে, তার একটা সাংবিধানিক ক্ষমতার এক্তিয়ার আছে। অনেক সময় দেখা যায় তার স্ত্রীরা অফিসে গিয়ে বসবে, সাহেবের যে পিওন, কেরানী আছে, সাহেব কিছু বলার আগেই স্ত্রী তাদেরকে অর্ডার দেবে – এই আমি বলছি, এই রকমটি কর। আর সাহেবগুলো সব স্ত্রীর ভয়ে সিঁটিয়ে চুপ করে থাকে। ক্লার্ক জানে আমি যার অধঃস্তন, তিনি এর অধঃস্তন। সুমন্ত্র কিন্তু তা নয়, তিনি মন্ত্রী বলে কথা, তাই সুমন্ত্র কৈকেয়িকে বলছেন 'আপনার কথাতে তো আমি শ্রীরামচন্দ্রকে ডেকে আনার জন্য রাজাকে ছেড়ে এখানে থেকে যেতে পারিনা, রাজা যদি আদেশ করেন তবেই আমি শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে ডেকে আনতে পারি'।

রাজা দশরথ তখন সুমন্ত্রকে নিজেই বললেন 'যাও, তুমি শ্রীরামকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো'। সুমন্ত্রের তখন আরও পরিষ্কার হয়ে গেল যে কিছু একটা গোলমাল আছে, কেননা এখন তো এখানে শ্রীরামচন্দ্রের আসার কথা নয়। শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক হবে বলে তিনি একটা নিয়মের মধ্যে রয়েছেন, উপোস করে আছেন, তপস্যার মধ্যে রয়েছেন।

তারপর বাল্মীকি অযোধ্যা নগরের বর্ণনা দিয়ে বলছেন সকাল থেকে সব অযোধ্যাবাসীরা কেমন উৎকণ্ঠা নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান দেখবার জন্য বসে আছে। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রকে সেইখানে, যেখানে রাজা দশরথ আর কৈকেয়ি বসে আছেন, ডেকে আনা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র এসে দেখছেন পিতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু কোন কথা বলছেন না, ভেতরে দুঃখ কিনা তাই রাজার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোচ্ছে না। শ্রীরামচন্দ্র তখন নিজেই জিজ্ঞেস করছেন 'বাবার কি হয়েছে? আমি তো কখন এই ভাবে আমার প্রতি বাবাকে এই রকম অপ্রসন্ন হতে দেখিনি। আমি কি কোন অপরাধ করেছি'? তখন খুব নির্লজ্জের মত কৈকেয়ি বলছে 'দ্যাখো রাম, রাজার কোন বিপদও হয়নি আর উনি রাগও করেননি। ওনার মনে কিছু কথা রয়েছে, তা উনি তোমার ভয়ে বা সঙ্কোচে সেই কথা বলতে পারছেন না। উনি আমাকে আগে সম্মান দিয়ে বরদান করে এখন গেঁয়ো লোকদের মত অনুশোচনা করছেন। ভদ্রলোকের মত নিজের কথাকে ধরে রাখতে পারছেন না। হে রাম, সত্যই ধর্মের মূল, তোমার প্রতি ভালোবাসা আর স্নেহের বশে আর আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে রাজা নিজের ধর্ম, নিজের সত্যকে না ত্যাগ করে দেন, এই ভয় আমার হচ্ছে'।

কৈকেয়ি কিভাবে কথাটা পেঁচিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। দশরথ দাঁড়িয়ে আছেন, কৈকেয়ি দাঁড়িয়ে আছে, শ্রীরামচন্দ্রও দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে কৈকেয়ি বলছেন 'দ্যাখোনা, এমন একটা অবস্থা যে তোমাকে তিনি এমনই ভালোবাসেন, তোমার ভালোবাসার জন্যে তিনি আমার উপরে কূপিত হয়ে যাবেন, আর আমার উপরে কূপিত হয়ে গেলে তাঁর সত্য চলে যাবে, সত্য চলে গেলে ধর্ম চলে যাবে। তোমার বাবা এখন মহা

বিপদে পরেছেন, কারণ ওনার ধর্মটা এক্ষুনি পুরো নাশ হতে যাচ্ছে’। তখন শ্রীরামচন্দ্র জানতে চাইছেন - কি ব্যাপার আমাকে সব খুলে বলুন, আর আপনি চিন্তা করবেন না – **রামো দ্বির্নাভিভাষতে** (২/১৮/৩০) – রাম কখন দু রকমের কথা বলে না। শ্রীরামচন্দ্রের এই উক্তিটি বাল্মীকি রামায়ণে অনেকবার আসবে, অন্যান্য রামায়ণেও এই উক্তিই রাখা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি? *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*।

শ্রীরামচন্দ্রকে সব ব্যাপার পরিষ্কার করে জানান হল এই এই ব্যাপার। সব শুনে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন ‘এতো অতি সাধারণ ব্যাপার। বাবা যদি এই প্রতিজ্ঞা করেই থাকেন তাতে কি আছে, আমি বাবার আজ্ঞা নিশ্চয়ই পালন করতে বনে যাব, এটা কোন ব্যাপারই নয়’। এখানে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – যদিও আমার বাবা নিজে থেকে আমাকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে বলেননি, কিন্তু হে মাতা, আমি তোমার কথাতেই এটাকে মেনে নিচ্ছি। কারণ আমার উপরে তোমার ঠিক সেই অধিকারই আছে যেভাবে আমার উপরে আমার বাবার অধিকার আছে। তবে একটা জিনিষ আমাকে খুব বেদনা দিচ্ছে, এই অতি সাধারণ একটা জিনিষ তুমি আমাকে না বলে বাবাকে কেন বলতে গেলে, আমি তো তোমাকে চিরদিনই আমার মা বলেই জানি। তুমি যদি আমাকে বলতে জঙ্গলে চলে যেতে আর ভরতকে রাজা করতে হবে, তাহলে আমি নিজে থেকেই চলে যেতাম। তার মানে তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না, আমার মধ্যে কোন গুণ তুমি দেখতে পাওনা। আমাকে যদি তুমি সত্যিই ভালোবাসতে তাহলে তুমি বাবার কাছে না গিয়ে আমার কাছে এসে সব বলতে পারতে। যাক, যা হয়ে গেছে, বাবা আমাকে নিজে না বললেও তুমি তো বলে দিয়েছ তাতেই আমি এখন খুশি হয়ে গেছি। তবে আমাকে একটু সময় দাও আমি সীতাকে আর আমার গর্ভধারিনী মাকে এই খবরটা জানিয়ে আমি এক্ষুনি জঙ্গলে চলে যাব।

শ্রীরামচন্দ্রের এই সব কথাবার্তা শুনে রাজা দশরথ তো খুব কান্নাকাটি করতে শুরু করেছেন। অন্য দিকে লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে অনুসরণ করে দরজা পর্যন্ত এসে বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনে তো প্রচণ্ড রেগে গেছেন। শ্রীরামচন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যখন যাচ্ছেন তখন দেখেন যে দরজার পাশে লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ্মণও তাঁকে অনুসরণ করে চলতে চলতে কিছু বলছেন।

এখানে একটি শ্লোকে খুব সুন্দর করে বলছেন – **ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং রাজ্যনাশোহপকর্ষতি**।২/১৯/৩২। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এত বড় রাজ্য নাশ হয়ে গেল, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের যে কান্তি, সৌন্দর্য তার একটুও পরিবর্তন হল না। স্বধর্মে যখন কেউ প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন তাঁর কোন কিছুতেই কিছু হয়না, শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যলক্ষ্মী চলে গেছে, কিন্তু তার চেহারাতে প্রতিক্রিয়ার কোন চিহ্ন মাত্র দেখা যাচ্ছে না। আমাদের পাঁচটা টাকা হারিয়ে গেলে, মোবাইল ফোন চুরি হয়ে গেল, বাড়িতে কিছু চুরি হয়ে গেলে তখনা আমাদের মনের মধ্যে কি প্রচণ্ড টেনশান এসে যায়। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের কি হচ্ছে? এই শ্লোকের পরের অংশে বলছেন – **লোককান্তস্য কান্তত্বাচ্ছীতরশ্মেরিব ক্ষয়ঃ**।। তাঁর কান্তিতে কোন পরিবর্তন হয়নি, তাঁর রাজ্যলক্ষ্মী চলে গেছে, কিন্তু যে রকম তাঁর চেহারা আগে ছিল এখনও ঠিক সেই একই চেহারা রয়েছে। তার মানে তাঁর যে কান্তি, তা কোন জাগতিক বস্তুর দ্বারা প্রভাবিত নয়, এই কান্তির পুরোটাই আসে আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে। জগতে কি এলো কি গেলো, কোনটাতেই তাঁর কিছু আসে যায় না।

বাল্মীকি রামায়ণ – ১৬ই মে ২০১০

আমরা দেখলাম কৈকেয়িকে শ্রীরামচন্দ্র বললেন শ্রীরাম দুই রকমের কথা বলে না। আর বলেছিলেন যে আমাকে না বলে আপনি কেন বাবার কাছে এই কথা বলতে গেলেন, তার মানে আপনি আমাকে ভালোবাসেন না। এইসব কথাবার্তার পর শ্রীরামচন্দ্র ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন, লক্ষ্মণ তাঁর অগ্রজের পেছনে পেছনে চলেছেন।

এদিকে কৌশল্যা সারা রাত না ঘুমিয়ে সকাল বেলায় পুত্রের মঙ্গল কামনা করে খুব সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুর পূজা করছেন – **কৌশল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থিতা সমাহিতা। প্রভাতে ত্বকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিণী।**।২/২০/১৪। এখানে বিষ্ণু এখনও ভগবান রূপে পূজিত হচ্ছেন না, তিনি এখনও দেবতা রূপেই পূজা অর্চনা পান। বেদে বিষ্ণু দেবতাকে নিয়ে মাত্র ছয়টি সূক্ত আছে, যেখানে ইন্দ্রের উপরে তিনশোর বেশি সূক্ত আছে, অগ্নি দেবতার আড়াইশর বেশি সূক্ত আছে। তার মানে, বেদে বিষ্ণু ছিলেন অতি সাধারণ এক দেবতা। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে বিষ্ণু দেবতার প্রভাব অনেক বেড়ে গেছে। কিভাবে বোঝা যাচ্ছে? এই শ্লোকে দেখাচ্ছেন কৌশল্যা সকালে সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুর পূজা করছেন। আরও যেটা গুরুত্ব তা হল শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়েছে বিষ্ণুর অংশ থেকে। ব্রহ্মা ও দেবতাদের বিষ্ণু বলছেন – আমি রাজা দশরথের পুত্র রূপে জন্ম নিচ্ছি। কিন্তু বিষ্ণুর এই জন্ম নেওয়া কিংবা বিষ্ণুর অংশে শ্রীরামচন্দ্রের শরীর ধারণ করাকে পরের দিকে পুরাণ যে অবতার তত্ত্ব নিয়ে এসেছে, তার সাথে এক করে দেওয়া যায় না। শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকি রামায়ণে অবতার নন, তিনি বিষ্ণুর অংশ। যেন বিষ্ণুর দেবতার শক্তি এইখানে জন্ম নিয়েছে। অবতার বলতে বোঝায় যখন ভগবান নিজে আসেন। কিন্তু বিষ্ণুকে বেদে বা বেদের ঠিক পরে যখন রামায়ণের যুগ শুরু হচ্ছে তখনও ভগবান বলে দেখা হচ্ছে না, তাঁকে দেবতা বলেই মানা হচ্ছে। বিদেশীরা এই দেবতা আর ভগবানকে এক বলে মনে করে। ভগবান আর দেবতার মধ্যে পার্থক্য রাখার জন্য আমরা ইংরাজীতে দেবতাদের ক্ষেত্রে গড লেখার সময় ছোট অক্ষরের 'জি' ব্যবহার করি আর ভগবানের ক্ষেত্রে বড় অক্ষরের 'জি' লিখি। শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন বড় অক্ষরের 'জি'র গড, আর বাল্মীকি রামায়ণে বিষ্ণু হলেন ছোট অক্ষরের 'জি'র গড। কিন্তু মহাভারতে আসতে আসতে বিষ্ণু বড় অক্ষরের 'জি'র গড হতে শুরু করে দিয়েছেন। পুরাণে এসে বিষ্ণু পুরোপুরি ক্যাপিটাল 'জি'র ভগবান হয়ে যান। এটি আমাদের হিন্দু ধর্মের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার চিন্তা ভাবনার একটি বিরাট বিবর্তন।

কেন এই ধরণের বিবর্তন হয় এই নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। যিনি অনন্ত তাঁকে কখন সীমিত করা যায় না। অনন্তকে আমরা যার সঙ্গেই লাগিয়ে দেব সেটাই মহৎ হয়ে যাবে। যেমন বিদ্যা অনন্ত, এই বিদ্যাকে যখন সরস্বতীর সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছি তখন সরস্বতী হয়ে যাচ্ছেন সব কিছুর দেবী। সেই অনন্ত যিনি, ব্রহ্ম, তাঁকে যখন বিষ্ণুর মুখোশটা পরিয়ে দিলাম তখন বিষ্ণু হয়ে গেলেন ভগবান। যখন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখোশ পরিয়ে দিচ্ছি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান। যিনি অনন্ত, তাঁর উপরে যাঁরই মুখোশ লাগিয়ে দেওয়া হবে তিনিই হয়ে যাবেন ভগবান। যখন অনন্তের উপরে কোন মুখোশ থাকে না তখন তিনিই ব্রহ্ম, আর মুখোশ দিলে তিনি হয়ে যান ভগবান। মুখোশ যার হবে সেই ভগবান, শিবের লাগিয়ে দিলে শিব ভগবান। বেদে কিন্তু এই জিনিষটা এতটা পরিষ্কার ছিলনা, সেইজন্য বেদে কখন ইন্দ্রকে বলছে অনন্ত, কখন অগ্নিকে বলছে অনন্ত। মহাভারতের পর থেকে এই জিনিষটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকে। উপনিষদে ব্রহ্মই অনন্ত এই ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মুখোশের ব্যাপারটা তখন আসেনি।

এখন কৌশল্যা বিষ্ণুর পূজো করছেন, পুজো করতে গিয়ে তাঁর মনটা একটু চঞ্চল হয়েছে। তারপর শ্রীরামচন্দ্রও এসেছেন। তিনি এখন চৌদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে চলে যাবেন তাই যাওয়ার আগে মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে এই অসময়ে এখানে আসতে দেখে কৌশল্যাও একটু বিস্মিত হয়ে গেছেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্র সব খুলে বলতেই কৌশল্যা একেবারে ভেঙ্গে পরেছেন। বাল্মীকি বলছেন – **তামদুঃখোচিতাং দৃষ্টা পতিতাং কদলীমিব।**২/২০/৩৩ – কলাগাছ কেটে দিলে যেমন হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পরে কৌশল্যাও ঠিক তেমনি মাটিতে অচেতন হয়ে পতিত হয়ে যেতে দেখে শ্রীরাম চৈতন্যহারা মাকে ধরে ওঠালেন। শ্রীরামের মুখে এই ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শোনার পর কৌশল্যার উপর যে মানসিক বিপর্যয় নেমে এসেছে বাল্মীকি তার অনেক বর্ণনা দেওয়ার পর এবার কৌশল্যার মুখ দিয়ে কথা বলাচ্ছেন।

কৌশল্যা বলছেন **ন দৃষ্টাপূর্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরেষে। অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামাস্থিতং ময়া।।** ২/২০/৩৮ 'হে রাম, আমি যখন আমার স্বামীকে বিবাহ করেছি তখন জেষ্ঠ্যা হওয়ার জন্য আমি ছিলাম জেষ্ঠ্যা ভার্যা। কিন্তু জেষ্ঠ্যা ভার্যা হওয়ার সুবাদে আমার যে সম্মান প্রাপ্য ছিল, যে সুখ আমার হওয়ার ছিল, পতির বীরত্বে যে কল্যাণ আমার উপর বর্ষিত হওয়ার কথা ছিল তা আমি কোন দিনই পাইনি'। যাঁরা শাস্ত্র নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁরা শাস্ত্রের অনেক ছোটখাট ব্যাপার গুলোকে ধরতে পারেন। এখানে এই কৌশল্যার কথার মধ্যেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে যখন বিয়ে করা হত, সেই বিয়ে গুলো হত ধর্মের জন্য। যার জন্য প্রথম স্ত্রীকে বলাই হত ধর্মপত্নী। ধর্মপত্নী বলা হত এই জন্য যে, যত ধর্মের কাজ হবে সেটা জেষ্ঠ্যা পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে করতে হবে। বড় রানী হলেন মহারানী, বাকি যারা হতেন তাদের অন্য নামে সম্বোধন করা হত। তাই নিয়ম অনুযায়ী কৌশল্যাই রাজা দশরথের প্রকৃত ধর্মপত্নী। কিন্তু আসল যেটা, মালাইটা খাচ্ছে অন্যজন, কৌশল্যার ভাগ্যে কিছুই জুটছে না। পায়েস যখন দেওয়া হয়েছে তখন কৌশল্যাকে অর্দ্ধেক দেওয়া হয়েছিল কারণ কৌশল্যা হলেন ধর্মপত্নী, ওঁকে দিতে হবে। কারণ ধর্মকার্য যত হবে তার প্রসাদ সব কৌশল্যারি পাওয়ার কথা, কিন্তু আসল জায়গায় দইএর অগ্রভাগ আর ঘোলের শেষ কে পেত? সেটা কিন্তু কৈকেয়িই পাবে। কারণ কৈকেয়ি দেখতে সুন্দর, বয়সও কম।

আগেকার দিনে অনেক ধরণের বিয়ে হত, এক ধরণের বিয়ে ছিল যেটা বংশ থেকে বিয়ে দেওয়া হত, এটা ছিল প্রথম বিবাহ। এর পরে যে বিয়ে হত সেটা কখন ভালোবাসা থেকেও হত অথবা রাজায় রাজায় সমঝোতার বা কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যও বিয়ে করা হত। অবশ্য এটা বলা খুব মুশকিল যে, রাজা কোন্ রানীকে ভালোবাসবেন, কোন্ রানীর কথায় রাজা ওঠাবসা করবেন। তবে ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে রাজারা সব সময় চোখ কান বন্ধ করে প্রথম রানীর উপর বেশি নির্ভর করতেন। কিন্তু মন্ত্রণা ও বুদ্ধি দেওয়ার ব্যাপারে সেই রানীই বেশি এগিয়ে থাকবে যে রানীকে রাজা বেশি ভালোবাসেন। বাল্মীকি রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের কথা বলতে কৌশল্যার কাছে না গিয়ে পৌঁছে গেছেন কৈকেয়ির ঘরে, গিয়ে দেখেন কৈকেয়ি কোপ ভবনে মাটিতে আলুথালু মলিনবাসিনী হয়ে পরে আছে। কৌশল্যা এই কথাই শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, আমি জেষ্ঠ্যা রানী হয়েও জীবনে কোন সুখ, সম্মান পায়নি, বড় আশায় দিন গুনছিলাম – *অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামাস্থিতং ময়া* – আমার স্বামী তো কোন দিন আমাকে সুখ দিলেন না, কিন্তু আমার সন্তান ভবিষ্যতে একদিন রাজা হবে তখন সুখভোগ করব, এই আশাতেই সব অপমান মুখ বুজে সহ্য করে আসছিলাম। এখন ভরত যদি রাজা হয়ে যায় আমার তখন কী দুরবস্থা হবে ভেবে পাচ্ছি না, আমার সতীন কৈকেয়ি তার বাক্যবাণে সব সময় আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেবে, এভাবে আমাকে আর কতদিন সহ্য করতে হবে কে জানে! কৌশল্যা বলছেন – **অতো দুঃখতরং কিন্নু প্রমদানাং ভবিষ্যতি। মম শোকো বিলাপশ্চ যদৃশোহয়মনন্তকঃ।।**২/২০/৪০/ – সতীনের যে কথাগুলো আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেবে, এর মত দুঃখের জীবন নারীদের আর কোন কিছুতেই হতে পারেনা, আমার দুঃখের জীবনের তো পরিসমাপ্তি কোন দিনই আর হবেনা। বাল্মীকিও দেখাচ্ছেন নারীর সবচেয়ে বড় শত্রু নারীরাই।

কৌশল্যা এর পর বলছেন – হে রাম, তুমি এখন আমার পাশে আছ তাতেই কৈকেয়ির থেকে আমার কপালে কত তিরস্কার জুটছে, আর ভরত যদি রাজা হয়ে যায়, তার সাথে তুমিও যদি জঙ্গলে চলে যাও তাহলে আমার কি দুরবস্থা হবে বুঝতে পারছ! কৌশল্যা খুব ভালো করে জানেন কৈকেয়ি রাজা দশরথের আদরিণী। স্বামীর কাছে থেকেও আমি চিরদিন তিরস্কারই পেয়ে এসেছি, কটূ বাক্যই শুনে এসেছি, এই রাজবাড়িতে আমার অবস্থা কৈকেয়ির যে দাসী তার থেকেও শোচনীয়। এই কথাগুলো আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগছে, কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি রাজা দশরথের তিন রানী ছিল, তিনি তাদের

প্রত্যেককে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, রানীদের পরস্পরের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড সৌহার্দ আর প্রেম। কিন্তু বাল্মীকি তাঁর রচনাতে পুরো বিপরীত বর্ণনা দিচ্ছেন।

কৌশল্যা এবারে বলছেন – কৈকেয়ি একেই ক্রোধী নারী, যে নারী সুন্দরী হয় তার রাগ সব সময় নাকের ডগায় বসে থাকে। বলা হয় – ক্লিওপেট্রার নাকটা যদি একটু নিচু থাকত তাহলে নাকি বিশ্বের মানচিত্রই অন্য রকম হয়ে যেত। কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে খুব আক্ষেপ করে নিজের মনের সব কথা বলেই যাচ্ছেন – কৈকেয়ি একেই অত্যন্ত রাগী আর খুব খারাপ খারাপ কথা বলে। মানে কৈকেয়ি প্রচণ্ড মুখরা। এখানে বলা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রেকে যখন যুবরাজ করা হচ্ছিল তখন তার সাতাশ বছর বয়স। আর উপনয়ন সতেরো বছর বয়সে হয়েছিল। তবে এটা ঐতিহাসিক দিক থেকে ঠিক মনে হয় না। কেননা সীতার সাথে বিয়ের পর শ্রীরামচন্দ্র কত দিন যুবরাজ না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে ছিলেন এই তথ্য রামায়ণে দেওয়া নেই। সীতার একটা উক্তিতে জানা যায় যে শ্রীরামচন্দ্রের যখন ষোল বছর তখন তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

লক্ষ্মণ এই ঘটনার সব কিছু প্রথম থেকেই দেখে যাচ্ছিলেন। যখন কৌশল্যা তাঁর নিজের সব দুঃখের কথা বলছেন তখন লক্ষ্মণ নিজেকে চুপ আর রাখতে পারলেন না, কারণ আগে থেকেই লক্ষণ রাগে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। লক্ষ্মণ তখন শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – এই সব আজেবাজে কথা বন্ধ করুন। আপনি যাবেন জঙ্গলে! তার আগে আপনি পুরো রাজসিংহাসন দখল করে নিন। আমি যতক্ষণ ধনুর্বাণ নিয়ে আপনার রক্ষায় নিযুক্ত আছি, সাক্ষাৎ কালও যদি সামনে আসে তারও কিছু করার ক্ষমতা হবে না। সমস্ত অযোধ্যাবাসীও যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, আমি অযোধ্যাকেই জনশূন্য করে দেব। আর ভরতের পক্ষে যারা যারা দাঁড়াবে আমি একাই সবাইকে শেষ করে দেব। হে রামচন্দ্র মনে রাখবেন – **মৃদুহি পরিভূয়তে**(২/২১/১১)। এই কথাটি বাল্মীকি রামায়ণের দর্শনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানে যে মানুষ নরম হয় তাকেই সবাই অবহেলনা করে। লক্ষ্মণ বলতে চাইছেন আমরা, মানে আমি আর শ্রীরামচন্দ্র এখন নরম হয়ে আছি বলে সবাই আমাদের অবহেলনা করছে। কিন্তু আমরা তো অবহেলনার পাত্র নই।

লক্ষ্মণ এখানে কতকগুলি কথা বলছেন, যেগুলো পরের দিকের অন্যান্য রামায়ণে পাল্টে যায়, কারণ এই কথাগুলো খুবই বিতর্কিত। লক্ষ্মণ বলছেন – যদি অহঙ্কারের বশে গুরু ও গুরুজনের কর্তব্য ও অকর্তব্যের জ্ঞান লোপ পায় আর তাঁরা যদি কুমার্গ অবলম্বন করে তখন গুরু বা গুরুজনকেও দণ্ড দিতে হয়। এখানে লক্ষ্মণ বলছেন গুরু, মানে যিনি দীক্ষা, শিক্ষা দিচ্ছেন, গুরুজন মানে বাবা, মা বা পিতৃস্থানীয় ও মাতৃস্থানীয়া, তাঁরা যদি অহঙ্কারের বশবর্তি হয়ে কর্তব্য ও অকর্তব্যের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, হারানর পরে যদি ভুল পথে চলতে থাকেন, তখন কিন্তু তাঁদের শাসন করতে হবে। অথচ ঠাকুর বলছেন – যদ্যাপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায় তদাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। আবার শ্রীশ্রীমা এক জায়গায় বলছেন – না, তেমন যদি কিছু হয় তবে গুরুকেও কটূ কথা বলা যায়। এই ব্যাপার গুলো খুবই বিতর্কের বিষয়, এই ধরণের পরিস্থিতির উপর ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হয়। কিন্তু লক্ষ্মণ এখানে সোজাসুজি কর্তব্য আর অকর্তব্যের জ্ঞান হারিয়ে ফেলার কথা বলছেন। তবে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কারণ আপনার আমার কাছে যেটা কর্তব্য মনে হবে অন্যের কাছে সেটা অকর্তব্য মনে হতে পারে, ধর্মও একজন থেকে আরেকজনে পাল্টে যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কোন পরিবর্তন হয় না, আমার কাছে এক রকম অন্যের কাছে আধ্যাত্মিকতা অন্য রকম হবে না। ধর্মের পরিবর্তন হয় কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন আমার কাছে সত্য কথা বলার মূল্য এক রকম অন্যের কাছে সত্য কথার মূল্য অন্য রকম। তারপর লক্ষ্মণ যে বলছেন যদি তাঁরা কুমার্গে চলেন তাদের বধ করে দাও। এটিও একটি বিতর্কের বিষয়। যদি কেউ যে কোন একটি মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে এটা জেনে রাখা উচিৎ যে অন্য কোন দিক থেকে তার পতন হবার কোন সম্ভবনাই নেই, কোন ভাবেই সে অপবিত্র হতে পারবে না। আমি যদি অন্তর থেকে সত্যকে ঠিক ঠিক ধরে রাখি, আমার সামনে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারবে না। মিথ্যে কথা বলা

সম্ভবই হবে না, বলার আগেই কেঁপে উঠবে। কারুর ভেতরে যদি কোন ধরণের কিছু গোলমাল থাকে তখনই বাইরে গোলমালটা দেখা দেবে।

লক্ষ্মণ বলছেন – আমাদের যে বাবা, তিনি কৈকেয়িতে আসক্ত চিত্ত হয়ে গেছেন, এই আসক্তির জন্য তিনি বাল্য স্বভাবে স্থিত হয়ে গেছেন। মনস্তাত্ত্বিকদের জন্য এই উক্তিটা খুব তাৎপর্য, মানুষ যখন যে কোন জিনিষের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে বালসুলভ ভাব চলে আসে, বাচ্চারা যেমন সব কিছুতেই ছেলেমানুষি করে, ভালোমন্দের বিচার করতে পারেনা, ঠিক সেই রকম হয়ে যায়, বোকার মত আচরণ করতে শুরু করে দেবে। কোন ছেলে যখন কোন মেয়ের প্রেমে পরে তখন দেখলেই বোঝা যায় যে প্রেমে পরেছে, কেমন ক্যাবলা ক্যাবলা কথাবার্তা বলতে থাকে। রাজা দশরথ একদিকে বুড়ো হয়ে গেছেন, অন্য দিকে কম বয়সী সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত চিত্ত, ফলে এর ভীমরতি ধরে গেছে। লক্ষ্মণ এই কথাটাই বলছেন। বলেই বলছেন – একে আমি অবশ্যই বধ করে দেব। তার মানে লক্ষ্মণ বলতে চাইছেন বাবা দশরথ একেই বুড়ো, তার ওপরে আবার কামাসক্ত, কদিন পরেই মরবে, ঐ কদিন আর অপেক্ষা করে কি হবে, চল আমিই খেলা শেষ করে দিই। আর ভরত যখন এসে পরবে তখন ওকে বন্দী করে কারাগারে পুরে দেব। লক্ষ্মণের এইসব কথাবার্তা নিয়ে অনেক নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, তার মধ্যে বেশির ভাগ দলেরই মত লক্ষ্মণ যা করতে চেয়েছিল ঐটাই ঠিক ছিল।

কৌশল্যা তো কান্নাকাটি করেই চলেছেন। কিন্তু লক্ষ্মণের এই কথা শুনে কৌশল্যা যা বলতে শুরু করেছেন, অনেকে ভাবতেই পারবেন না যে কৌশল্যার মত এক পতিব্রতা নারীর মুখ থেকে এই ধরণের কথা বেরোতে পারে। কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – **ভ্রাতুস্তে বদতঃ পুত্র লক্ষ্মণস্য শ্রুতং ত্বয়া। যদত্রানন্তরং তত্ত্বং কুরুষ্ব যদি রোচতে।।**২/২১/২১। হে রাম, লক্ষ্মণ যা বলছে একটু মন দিয়ে শোন, যদি তুমি মনে কর লক্ষ্মণ ঠিক বলছে তাহলে তুমি এটাই কর। এই কথা কে বলছেন? মহারানী কৌশল্যা, রাজা দশরথের ধর্মপত্নি এই কথা বলছেন। যতই আমরা ভালোবাসার কথা বলি না কেন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, ভাই বোন, বন্ধু বন্ধু কোন ভালোবাসাই কিছু নয়। মা ছেলের ভালোবাসাকে বলা হয় নিঃস্বার্থ, রাজমাতা সিন্ধিয়া ও তাঁর ছেলে একে অপরে বিরুদ্ধে মামলা লড়ে গেছেন। টাকা-পয়সাতে যখন নিজস্ব বোধ এসে যাবে তখন কেউ কাউকে ছাড়বে না।

কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – তবে একটা কথা তুমি জেনে রাখ, আমার সতীনের অধর্ম যুক্ত আদেশ মান্য করে আমাকে শোক সন্তপ্ত করে তুমি কিন্তু আমাকে ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেতে পারো না। মানে কৌশল্যা বলতে চাইছেন, লক্ষ্মণের কথাগুলো মাথায় রেখে যদি বাবাকে নাও বধ কর কিন্তু চৌদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে চলে যাবে, এটা তুমি অন্তত করেতে যেও না। তুমি যদি ধর্মই পালন করতে চাও তাহলে তুমি এখানেই থেকে আমার সেবা কর, মাতৃসেবা করে তুমি উত্তম ধর্মের আচরণ কর। তুমি তোমার বাবার কথাকে ছেড়ে দাও, এখানে থেকে আমার সেবা করলে তুমি উত্তম স্বর্গে যাবে। এইভাবে কৌশল্যা অনেক যুক্তি দেখিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন যে তুমি জঙ্গলে না গিয়েও সত্য রক্ষা করে ধর্মাচরণ করতে পারবে।

তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – মা! আমি তোমার পায়ে মাথা রেখে বলছি, আমার বাবাকে আমি যে কথা দিয়েছি তাকে উল্লঙ্ঘন করার ক্ষমতা আমার নেই। এই কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র পর পর অনেকগুলো ঘটনার কথা উল্লেখ করে উদাহরণ দিচ্ছেন। বলছেন – **নাহং ধর্মমপূর্বং তে প্রতিকূলং প্রবর্তয়ে।** ২/২১/৩৬। মা! আমি আমার বাবার কথাগুলোকে মান্য করাকেই ধর্ম মনে করছি, তবে তুমি এটা মনে করো না যে আমি কোন নতুন ধর্ম প্রচার করছি। এখানে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন *প্রতিকূলং*, মানে যে ধারাটা চলছে তার বিপরীত কোন নতুন ধারা আমি তৈরী করছি না। যেমন আমাদের আধ্যাত্মিকতার সনাতন নিয়মই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন, মানে নারীদের থেকে সব সময় দূরে থাকবে, ভোগ থেকে নিবৃত্তি। কিন্তু এখন কিছু বাবাজী নতুন স্লোগান দিতে শুরু করেছেন – সম্ভোগ সে সমাধি তক্, কাম সে রাম তক্। তার মানে *প্রতিকূলং*, যে ধারাটা চলে আসছে এরা তার বিপরীত একটা ধর্ম শুরু করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র এমন কিছু

বলছেন না যেটা অধর্মযুক্ত। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন যদি পিতার আজ্ঞাকে পালন করা হয় তাতে ধর্মের কোন উল্লঙ্ঘন হয় না।

তারপর লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র বোঝাচ্ছেন – **ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্**।২/২১/৪১। হে ভাই লক্ষ্মণ, এই সংসারে ধর্মই সব থেকে শ্রেষ্ঠ জিনিষ। আর এই ধর্ম সর্বদাই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর বারবার বলছেন – সত্যই কলির তপস্যা। হে লক্ষ্মণ, সত্যই ধর্মের প্রাণ, তুমি যদি সত্যি কথা না বল তাহলে কিন্তু তুমি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। বাবাকে আমি যে কথা দিয়েছি সেই কথা যদি আমি না রাখি তাহলে ধর্ম পালন হবে না। ধর্ম পালন না হলে তো ধর্মই শেষ হয়ে গেল। যারা ধর্মের আশ্রয় নিয়ে থাকতে চান তারা মা, বাবা ও ব্রাহ্মণ এঁদের যদি কোন কথা দিয়ে দেয় সেই কথার খেলাপ করতে নেই। এখানে কিন্তু দুটো আলাদা বিষয়, কৌশল্যা বলছেন আমার কষ্ট হবে, কৌশল্যার ব্যাপারটা তাঁর মনের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বিষয়টা অন্য ভাবে আনছেন, আমি বাবাকে কথা দিয়েছি। রামায়ণ আর মহাভারতের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবতারণা করা।

ধর্ম পরিষ্কার দুই রকমের হয়। প্রথম ধরণের ধর্মে একটা স্পষ্ট করে লাইন টেনে বলে দিচ্ছে এটা ধর্ম আর এটা অধর্ম, যাকে আমরা বলতে পারি বিধি আর নিষেধ। বিধি আর নিষেধ হবে শাস্ত্র নির্দেশিত, যেমন মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ইত্যাদি, এরা পরিষ্কার ভাবে বলে দিচ্ছেন এটা বিধি আর এটা নিষেধ, মানে এটা করবে আর এটা করবে না। যেখানে বিধি আর নিষেধ বলে দেওয়া আছে সেখানে কোন সমস্যা হয় না। যেমন বলে দিচ্ছে পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দেবে না, পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। এই ধরণের শাস্ত্র কখন মহৎ হয় না, মহৎ হয় তখনই যখন ধর্মের কোন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ হয়। কি রকম ধরণের দ্বন্দ্ব? আমি জানি যে এটা নিষেধ, কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেখানে আমাকে এই নিষেধ কর্মটা করতেই হবে, না করলে যেটা বিধি, অর্থাৎ যেটা করার কথা, সেটার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তখন আমি কি করব? এগুলিকে বলে moral crisis। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জুহুদিদের একটা দল হিটলারের ক্যাম্প থেকে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পালাচ্ছে। এরই মধ্যে এক মহিলার দু-তিন মাসের একটি ছোট্ট বাচ্চা কাঁদতে শুরু করেছে। বাচ্চাটাকে যদি কাঁদতে দেওয়া হয় তাহলে পুরো গ্রুপটা নাৎসী বাহিনীর হাতে ধরা পরে যাবে আর সবাইকে দাঁড়িয়ে বন্দুকের গুলিতে মরতে হবে। এখন একটাই রাস্তা বাচ্চাটাকে মেরে ফেলা। এখন কি করবে? একদিকে এতগুলো লোকের জীবন আর অন্য দিকে একটা দুধের শিশুকে মেরে ফেলা। এই ধরণের মোরাল ক্রাইসিসকে নিয়ে বিদেশে প্রচুর রিসার্চ হয়েছে। এখানে একটা লোক বাচ্চাটাকে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে দিল। আমি আপনি হলে কি করতাম, আমরা যেটাই বলব সেটাই মিথ্যা হবে, কেননা ঐ পরিস্থিতিতে না পড়লে আমরা কখনই বলতে পারব না আমি কি করতাম। পরের দিকে দেখা গেল ঐ লোকটি বাচ্চাটাকে মেরে পুরো গ্রুপটাকে নাৎসিদের হাত থেকে বাঁচিয়ে পালাতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু পরের দিকে জানা যায় লোকটি নিজে পাগল হয়ে গিয়েছিল। বিধি ও নিষেধের মধ্যে এই যে সুস্পষ্ট সংঘাত, একদিকে বলছে খুন করো না, আবার অন্য দিকে খুন না করলে এতগুলি লোকের জীবন সংশয় হয়ে যাবে, খুব গভীর সমস্যা। এক মহিলার ঘটনা আছে, তিনি তাঁর স্বামীকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন, এখন তাঁর স্বামীর একটা খুব বিপদ হয়েছে, স্বামীকে বাঁচানর জন্য ঐ ভদ্রমহিলাকে পর পুরুষের সঙ্গও করতে হয়েছিল। কিন্তু যে স্বামীর জন্য সে এই কাণ্ড করল, স্বামী বেঁচে ফিরে আসার পর তার স্ত্রীর দিকে জীবনে আর ফিরে তাকাল না। এখন ঐ ভদ্রমহিলা ভুল করেছিল না ঠিক করেছিল বলা খুব মুশকিল। স্বামী ফিরে আসার পর বলছে – তুমি যদি পতিব্রতা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে, তোমার মধ্যে যদি ঠিক ঠিক সতীত্ব ভাব থাকত তাহলে ঐ লোকটা তোমার কাছে এলেই ভস্ম হয়ে যেত। এখন কারটা ঠিক? আর কলিযুগে কি এইভাবে কেউ ভস্ম হয়?

বিধি ও নিষেধের মধ্যে এই ধরণের বিরোধ গুলোকে বাল্মীকি রামায়ণে আর মহাভারতে প্রচুর নিয়ে আসা হয়েছে। এটা তো গেল এক ধরণের বিরোধ, দ্বিতীয় ধরণের বিরোধে আরও বেশি সমস্যা তৈরী হয়,

যেখানে দেখা যাবে এটাও ঠিক ওটাও ঠিক, এখানে বিধির সাথে বিধির বিরোধ হয়ে যাচ্ছে। তখন আমি কোনটা করব? যেমন এখানে শ্রীরামচন্দ্র যদি রাজা দশরথের কথা শোনেন তাহলে মা প্রাণত্যাগ করবেন, আর শ্রীরামচন্দ্র রাজা দশরথের কথা না শোনেন তাহলে তিনি সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। উপনিষদে এবং স্মৃতিগ্রন্থে এই ধরণের বিরোধ পাওয়া যাবে না, এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ কোরান বাইবেলেও এই ধরণের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ পাওয়া যাবে না, সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া আছে তুমি এই এই করবে এই এই করবে না। কিন্তু ধর্মকে নিয়ে যে উভয় সঙ্কট হতে পারে বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতের আগে কেউ ভেবেই দেখেনি, এই উভয়সঙ্কটকে প্রথম আনছেন একমাত্র বাল্মীকি আর পরের দিকে ব্যাসদেব। এমনকি পুরাণেও আমরা এই ধরণের সঙ্কট পাইনা।

শ্রীরামচন্দ্র প্রথমেই ঠিক করে নিয়েছেন যে, আমি এটাতেই ঠিক থাকব, যখন তিনি যেটাতে ঠিক থাকবেন মনে মনে সঙ্কল্প করে নিয়েছেন তখন তিনি আর ওখান থেকে সরে আসেননি। যখন তিনি রাজা হয়েছেন তখন তাঁর কাছে রাজধর্ম প্রধান। দেখছেন সীতাকে নিয়ে প্রজাদের মনে খারাপ প্রভাব পড়ছে, তিনি প্রজাপালনের জন্য সীতাকে সরিয়ে দিলেন। তারপর অশ্বমেধ যজ্ঞে যখন স্ত্রী ছাড়া করা যাবে না বলা হচ্ছে তখন সবাই শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে আরেকটা বিয়ে করতে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – না, না, আমি বিয়ে করতে পারব না, আমার মন পুরোপুরি সীতার উপরে পড়ে আছে। তখন অন্য কোন উপায় না থাকাতে সীতার স্বর্ণ প্রতিমা স্থাপন করে যজ্ঞের পার্শ্বে রাখা হয়েছে। যে মানুষ প্রজাদের কথা শুনে সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, সেই প্রজারাই আবার শ্রীরামচন্দ্রকে আবার বিয়ে করতে বলছেন তখন তিনি কিন্তু প্রজাদের কথা শুনে আবার বিয়ে করছেন না। কোন্ জায়গাতে রাজধর্ম পালন করব, কোন্ জায়গায় পতিধর্ম রক্ষা করব, কোন জায়গায় পুত্রধর্ম মানতে হবে, কোন জায়গায় ক্ষত্রিয় ধর্ম ঠিক হবে, শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এগুলো পরিষ্কার ছিল। কারণ আমাদের দৈনন্দীন জীবন যাপনে সর্বক্ষণ এই ধরণের বিধি ও নিষেধের মধ্যে ধর্মের উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়। এখন যদি কেউ এসে জিজ্ঞেস করে আমি কি ঘুষ নিতে পারি, ঘুষ নিলে কি পাপ হয়ে যাবে? তাকে এখন ঘুষ নিতেই হবে, না নিলে সে বাঁচতে পারবে না, যে অর্থের পরিমাণটা সে ঘুষ নেবে সেটুকু তার অভাব আছে বলেই ঘুষ নিতে যাচ্ছে। একটা ভিখারিকে কি বলতে পারি তুমি ভিক্ষা করবে না, একেও বলা যায় না যে তুমি ঘুষ নিও না। কেউ এক টাকা দু টাকার কাঙাল আবার কেউ এক হাজার টাকার কাঙাল, কেউ আবার এক লক্ষ টাকার কাঙাল ভিখারি। ভিখারি সবাই। আর আমরা কি কাউকে ঘুষ দেব? যদি দরকার পরে দিতে হবে। কেন, আমরা কি হোটেলে টিপস্ দিই না? আমরা কি ট্যাক্সিওয়ালাকে টিপস্ দিই না? এই ধরণের টিপস্ কিন্তু হরদম্ বহু জায়গায় দিয়েই চলেছি। তখন তো বলছি না যে আমি ঘুষ দিই না আর ঘুষ নিইও না।

শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পদে পদে উভয়সঙ্কট আসছে, এত বাজে ধরণের ধর্ম সঙ্কট আসছে যে, আমরা মহাভারতেও এত জটিল সঙ্কটা পাইনা। সুগ্রীবকে কথা দিয়ে রেখেছেন বালিকে মারতে হবে, অন্য দিকে বালিকে মারতে হলে অধর্ম দিয়েই মারতে হবে, ধর্ম পথে বালিকে কখনই মারা যাবে না। তখন শ্রীরামচন্দ্র কি করছেন? তিনি ধর্ম অধর্মের দিকে গেলেনই না, আড়াল থেকে লুকিয়ে এক বাণে মেরে বালিকে উড়িয়ে দিলেন। কেন করলেন অধর্ম? কারণ তিনি সুগ্রীবকে কথা দিয়েছেন, তখন তাঁর কাছে মিত্রধর্মই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি সেখানে মনের আবেগে কিছু করছেন না, তিনি পরিষ্কার করে রেখেছেন এই জায়গাতে আমার এই ধর্ম রয়েছে, যখনই তিনি ধর্মটাকে ঠিক করে নিলেন তখন আর ওর মধ্যে কোন লুকোচুরির ব্যাপার নেই।

সব থেকে বড় ব্যাপার হল, শ্রীরামচন্দ্র যখনই কোন কর্ম করছেন তিনি সব সময়ই নির্বিকার, তাঁর মধ্যে কোন ধরণের বিকার নেই। মানুষ তিনটের জন্যই যত কর্ম করে – বিত্তৈষেণা, পুত্রৈষেণা আর লোকৈষেণা। যখন কেউ কোন মেয়ের মোহে পড়ে কিছু করে, টাকা-পয়সার লোভে পড়ে করছে বা নাম-যশের আকাঙ্খায় করছে তখন কিন্তু গোলমাল হয়ে যায়। শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্য ছেড়ে দিতে বলা হল, তিনি

রাজ্য ছেড়ে দিলেন, তখন বাল্মীকি বলছেন যে তাঁর চেহারায় তাতে কোন পরিবর্তন হল না, তাঁর শরীরের আগে যে রকম কান্তি ছিল পরেও সেই কান্তিই তাঁর শরীর থেকে বেরোচ্ছে, একেবার জ্বলজ্বল করছে।

এরপর লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – হে লক্ষ্মণ! শুধু তোমার যে ক্ষত্রিয় ধর্মে প্রতিষ্ঠা সেটাকে অবলম্বন করে তোমার এই মনোভাবকে ত্যাগ কর। এখানেও সেই উভয়সঙ্কট, লক্ষ্মণ এখন ক্ষত্রিয় ধর্মকে অবলম্বন করেছেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বলছেন এই ধরণের কাজ করো না, তোমার যে কঠোর বাণী, এগুলোকে বিচার কর। তাই বাবা যেমন যেমন বলেছেন আমাকেও সেই রকম করতে হবে। মূল কথা শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন, তুমি যেটা বলছ ঠিকই বলছ কিন্তু এটা হল ক্ষত্রিয় ধর্ম, কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম প্রয়োগের উপযুক্ত সময় নয়। এখন এটা কে ঠিক করবে? এটাকে ঠিক করে বলা যায় না। কিন্তু কে কত বড় মহাপুরুষ বোঝা যাবে তিনি এই সঙ্কট অবস্থাতে কি স্থির করেছেন তার উপরে। আমাদের মধ্যে আমি এক রকম নেব উনি আরেক রকম নেবেন। তা এখন আমি বলতে পারি আমি বুঝতে পারছি না, আপনি বলে দিন কি করব? বললেও ঠিক ঠিক বলা হবে না আর করাও হবে না, কারণ এগুলোর জন্য কোন সার্বজনীন নিয়ম নেই। এগুলোকে বোঝার জন্যই এই ধরণের শাস্ত্রের রচনা করা হয়েছে। লক্ষ্মণও অত্যন্ত সুবিবেচক, কিন্তু উনি এক রকম এখানে বলছেন, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র আরেক ধরণের কথা বলছেন। তাহলে সবার জন্য কি আদর্শ হবে? বলতে গেলে কোন আদর্শই নেই। দেখান হচ্ছে এই ধরণের উভয় সঙ্কট আমাদের সবার জীবনে যে কোন পরিস্থিতে উদ্ভব হওয়াটাই বাস্তব। উদ্দেশ্য হল তুমি সব কাজে অনাসক্ত থাকবে, কোন ব্যাপারে আসক্ত হবে না, আর যেটা শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – কঠোর হবে না।

আমরা দেখলাম কৌশল্যা, শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের মধ্যে আলোচনা চলছে। সব কথার পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বুঝিয়ে বলছেন – দ্যাখো লক্ষ্মণ, আমি জানি তুমি আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাস, আমি এও জানি তোমার পরাক্রম, তোমার শক্তি কত বিশাল, কারণ মারীচ আর সুবাহুর সাথে যুদ্ধের সময় আমি তো নিজের চোখে তোমার পরাক্রম দেখেছি। কিন্তু আমার কি উদ্দেশ্য তুমি বুঝতে পারছ না, আমার মন এখন কোন দিকে বেশি জোর দিচ্ছে বুঝতে না পারাতে তুমি এই ধরণের উল্টোপাল্টা কঠোর ধরণের কথা বলছ। তার মানে শ্রীরামচন্দ্রের মন এখন যে ধর্মের দিকে রয়েছে সেদিকে লক্ষ্মণের দৃষ্টি যাচ্ছে না।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন - **ধর্মার্থ-কামাঃ খলু জীবলোকে সমীক্ষিতা ধর্মফলোদয়েষু**।২/২১/৫৭। এই শ্লোকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, এই জীব জগতে যত প্রাণী আছে সবাই যা কিছু পায় তা পূর্বকৃত ধর্মাচরণের জন্যই পেয়ে থাকে। অর্থাৎ বলতে চাইছেন, আগের আগের জন্মে আমি যা কিছু পূণ্য কাজ করেছি বা যেমন যেমন ধর্মাচরণ করেছি, সেই পূর্ব-কৃত ধর্মাচরণ বা পূণ্য কর্মের ফল এই জন্মে তখনই ঠিক ঠিক দেবে যখন আমি এই জন্মে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকব। খুব সহজ উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যখন কোন নেতার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথা নয় কিন্তু এমন কিছু একটা পরিস্থিতি হয়ে গেল যে তাকে মুখ্যমন্ত্রী করে দেওয়া হল, বা ভালো একটা জায়গায় চলে গেল তখন এটা হয়েছে তার পূর্ব পূর্ব জন্মের যে পূণ্য কর্ম করেছিল সেটার জন্য। কিন্তু ঠিক ঠিক ফল তখনই দেবে যখন সে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে কে ভেবেছিল যে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন! শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় বারের জন্যও তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে। বলছে নেহরুর পরে তিনিই বেশি দিনের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, ইন্দিরা গান্ধীও এক নাগাড়ে এত দিন ছিলেন না। যদি তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় চলে আসেন তাহলে ভগবান জানেন কি রেকর্ড করবেন। প্রথম কথা পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি খুব ভালো কাজ করেছিলেন, আর দ্বিতীয় যেটা এই জন্মে যখন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন তখন পূর্ব-কৃত সব পূণ্য ফল পুরোদমে আসতে শুরু করবে। মাটিটা তৈরী কিনা, তাই ফসল উঠতে আরম্ভ করেছে।

আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, আমি পূর্ব জন্মে কিছু ভালো কর্ম হয়তো করে রেখেছি, এখন সেই ফল আসার সময় হয়েছে, কিসের ফল? ধর্মের ফল, অর্থের ফল, কামের ফল। এখন আমি হয়ত ঐশ্বর্য ভোগ

করতে চাইছি, কিন্তু আমি যদি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকি, সেই ঐশ্বর্য হয়ত আসবে কিন্তু যে পরিমাণে আসার কথা সেই পরিমাণে আসবে না। বর্তমান প্রজন্মের পক্ষে এখন যে প্রচুর টাকা পয়সা আসছে, এটা আসছে এর আগের আগের জন্মে যে পূণ্য গুলো করেছিল তার জন্য এখন প্রচুর টাকা পয়সা রোজগার করতে পারছে। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ধর্ম নেই বলে সবার মধ্যে কেমন অতৃপ্তির ভাব আর এই অতৃপ্তি তাদের ক্রমশ হতাশা আর অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর কয়েক বছরের মধ্যে এদের সবাইকে হতাশা গ্রাস করে নেবে। সব কিছু আছে কিন্তু ভোগ করতে পারবে না শুধু ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নেই বলে। এখানে শ্রীরামচন্দ্র তাই বলছেন – জীবনে তিনটে জিনিষ, মানে স্ত্রী, টাকা-পয়সা আর ধর্ম এই তিনটি জিনিষের ভোগ ঠিক ঠিক হবে যদি সে তখন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ধরা যাক আগের আগের জন্মে সে প্রচুর দান ধ্যান পূণ্য করেছে। এখন এই দান পূণ্যের জন্য সুখ্যাতি সহজেই হবে আর টাকা পয়সাও সহজে আসবে। কিন্তু এখন সে আর এই জন্মে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয় তখন কিন্তু এত সহজে সেই রকম সুখ্যাতি বা টাকা-পয়সা যেটা হওয়ার কথা সেটা হবে না।

মনে করুন আপনি আমেরিকাতে গেলেন। আমেরিকাতে কুমড়ো এক একটা এক মণের উপর হয়, আমাদের ভারতে খুব জোর আট থেকে দশ কিলো হবে। আপনি ওখান থেকে ভারতে ফিরে আসার সময় ঐ কুমড়োর কয়েকটা বীজ সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। এখন এখানে ঐ বীজ আপনি লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু এখানে চল্লিশ কেজির কুমড়ো ঐ বীজ থেকে হবে? কখনই হবে না। ঐ চল্লিশ কেজির কুমড়ো পেতে হলে বীজও চাই মাটিও চাই। এখানে মাটি হল ধর্ম, আর বীজ হল পূর্ব জন্মকৃত পূণ্য, আগের আগের জন্মে যে পূণ্যটা করা হয়েছে।

শ্রীরামচন্দ্র তাই লক্ষ্মণকে বলছেন – হে লক্ষ্মণ, তুমি যে এই সব অধর্মের কথা বলছ এতে কোন লাভ হবে না। তুমি যা পূণ্য করেছ সবই আসবে, সবটাই তুমি পাবে কিন্তু পুরোটাই নিকৃষ্ট ফল পাবে। আমি বলতে পারি আমি এত ভালো বীজ নিয়ে এলাম কিন্তু ফলতো আমার সেরকম হচ্ছে না। কারণ তোমার মাটিটা খারাপ বলে ভালো ফল পাচ্ছো না। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – একজন লোক যদি ধর্মে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন তার স্ত্রী তার অধীনে থাকে, অতিথি সৎকারাদির দ্বারা যে যে কাজে ধর্ম বৃদ্ধি হয় সেই সব কর্মে স্ত্রী সাহায্য করে আর প্রেয়সী রূপে কাম সাধন করে। মূল কথ বলতে চাইছেন – যতক্ষণ ধর্মে তুমি প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছ, ততক্ষণ কিন্তু তোমার ভালো জিনিষ পেলেও তোমার কোন কাজে আসবে না। তুমি এক ভালো সহধর্মিণী পেলেও কিন্তু দেখা যাবে তারা দ্বারা তুমি কিছুই ধর্ম সাধন করতে পারছ না।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – **যে কর্মে ধর্ম, অর্থ ইত্যাদি সব পুরুষার্থের সাধন না হয়, সেই কাজ কখনই করতে নেই**। শ্রীরামচন্দ্র আসলে বলতে চাইছেন, যখন কোন কর্ম করতে যাচ্ছি তখন দেখা উচিৎ এই কর্মের দ্বারা কোন একটি বা একাধিক পুরুষার্থের সাধন হচ্ছে কিনা, যদি কোন পুরুষার্থ সাধন না হয় তাহলে সেই কাজ করতে নেই। মনে করা যাক, একজন মহারাজ রাস্থা দিয়ে যেতে যেতে একটি ছেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। ছেলেটি রেগেমেগে বলল 'শালা ভণ্ড সাধু'। মহারাজ তখন ছেলেটির কলারটি ধরে গালে একটা চড় মেরে বললেন 'তুমি নিজেকে কি মনে করেছ'? এরপর মহারাজ ছেলেটিকে চড় মেরে গালাগাল দিয়ে দিলেন। এখন মহারাজ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের এই চারটে সাধনের মধ্যে কোন সাধনটা করলেন? কোন সাধনই হল না। শ্রীরামচন্দ্র এই ধরণের কাজ করতেই নিষেধ করছেন। প্রথমটা হল অধর্ম হবে এমন কাজ কখনই করবে না। দ্বিতীয়, এবার যে কাজটা করবে সে কাজের দ্বারা যেন কোন একটা পুরুষার্থের সাধন হয়। আমরা যদি নিজেদের খুব ভালো করে লক্ষ্য করি দেখা যাবে সারাদিনে আমরা যা কাজ করি তার দ্বারা কোন পুরুষার্থের সাধনই হয় না। আর তৃতীয়, সব থেকে ভালো হয় সেই কাজই করা যাতে অন্ততঃ তিনটে পুরুষার্থই সাধিত হয়। কারণ মোক্ষ সাধন আলাদা। একমাত্র সন্ন্যাসীরাই মোক্ষ সাধন যুক্ত কর্ম করবে। সন্ন্যাসী সেই কাজই করবে যেটা তাকে মোক্ষ সাধনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সন্ন্যাসী কি ধরণের বই পড়বে? মোক্ষশাস্ত্র মূলক। কি লিখবে মোক্ষগ্রন্থ। সন্ন্যাসী কি কথা বলবে? মোক্ষ কথা। কি কাজ

করবে? মোক্ষ সাধন। এ ছাড়া সন্ন্যাসীর আর কিছু নেই। সংসারীদের ক্ষেত্রে সেই ধরণের কাজই করতে হবে যে কাজে তিনটে পুরুষার্থেরই সাহায্য হবে। এই যেমন এখানে বলছেন বিয়ে যখন করবে, যখন নারী সঙ্গ করবে তখন দেখতে হবে এর দ্বারা তোমার ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেরই যেন সাহায্য হয়। ঠাকুর অবশ্য সংসারীদের জন্য মোক্ষের কথাও বলছেন, স্ত্রীরা জপ ধ্যানের সাহায্যও করে। তার মানে, স্ত্রী যদি ভালো হয়, তখন সে এমন ভাবে ঘর-সংসার চালাবে যাতে বেশি খরচ না হয়, এটাই তার অর্থ সাধন। আবার স্বামীর সুখ সুবিধার জন্য কাম সাধনও করছে, তার সাথে অতিথি সৎকার, দান, তিথি পার্বনে পূজাদি করা, এগুলো করে ধর্ম সাধনে স্বামীকে সাহায্য করে।

তার মানে, তোমার যদি ইচ্ছে হয় নারী সঙ্গ করার, তাহলে তুমি কোন্ নারীর সঙ্গ করবে? একটা ভালো মেয়ে দেখে তাকে স্ত্রী করে বাড়িতে নিয়ে এস। তখন এই তিনটে সাধনেই তার দ্বারা সাহায্য হবে। তা না করে যদি সে যে কোন একটা মেয়েকে দেখে পছন্দ হয়ে গেল, আর তাকে পাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলে, তখন ওটা কি সাধন হবে? ধর্ম বিরুদ্ধ কাম সাধন হবে আর ধর্মের হানি হবে, অর্থের অপচয় হবে। তাই শাস্ত্র বলছে যে কাজে তিনটে পুরুষার্থ সমাবিষ্ট সেই কাজটাই করবে। যদি তিনটেই না হয় তাহলে যে কোন একটা যাতে ঠিক ঠিক সমাবিষ্ট আছে সেটাই নিষ্ঠা পূর্বক করতে হবে। তাই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন – তুমি যে বলছ বাবাকে মেরে দেব, কৈকেয়ি আর ভরত এবং তাদের সমর্থনে যারাই আসবে সবাইকে জেলে পুরে দেব, এর দ্বারা তোমার কি সাধন হবে? এই তিনটের কোনটাই হবে না। তাই এই ধরণের কাজ তুমি করতে যেও না।

তারপর বলছেন – যদি দেখো শুধু ধর্মেরই সাধন হচ্ছে, তুমি যদি সেই কাজ করতে চাও তাহলে করতে পার। শ্রীরামচন্দ্র মোট তিনটে জিনিষ করতে বললেন – প্রথমে হচ্ছে যেটা অধর্ম সেটা কোন মতেই করবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে, যেটাকে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে তা হচ্ছে যে কাজে তিনটে পুরষার্থ সন্নিবিষ্ট হয়ে মিশে রয়েছে এবং তিনটেরই সাহায্য হচ্ছে তাহলে সেই কাজটা করবে। আর তৃতীয় হচ্ছে দ্বিতীয়টা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সেই কাজটাই করবে যে কাজের দ্বারা তোমার ধর্ম সাধন হচ্ছে। যদি তুমি শুধু অর্থ সাধন কর তাহলে জগতে সবার জন্য তুমি ঈর্ষার পাত্র হয়ে যাবে। আর ধর্ম বিরুদ্ধ কামে যদি আসক্ত হও তাহলে সমাজে সবাই তোমার নিন্দা করবে। কিন্তু এমন যে কাজ যাতে ধর্ম আর কাম মিশে আছে, যেমন তোমার বিবাহিত স্ত্রী আছে তার সাথে তুমি কাম সাধন করলে কোন অধর্ম হবে না, বরং বলা হচ্ছে ধর্ম হবে, এখানে ধর্ম আর কাম মিশে আছে। যখন কেউ প্রচুর টাকা রোজগার করে মন্দির বানাচ্ছে, দান করছে তখন লোকে বাহবা দিয়ে বলবে, এ খুব ভালো লোক নিজে খেটেখুটে অর্থ রোজকার করে এই সব করছেন। আর যদি শুধু টাকা দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি কর তাহলে তোমার প্রতি লোকের হিংসে হয়ে যাবে, নিন্দা হয়তো করবে না কিন্তু ভেতরে ভেতরে হিংসা করবে। বাল্মীকি রামায়ণে মোক্ষের কোন স্থান নেই, ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটেতেই বাল্মীকি রামায়ণে জোর দেওয়া হয়েছে। ধর্ম মানে, আমি এমন কাজ করব যাতে মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারি, আর এই জন্মে তোমার সুনাম হব। এই ধরণের চিন্তা ভাবনাগুলো পরে আবার মহাভারতেও পাওয়া যাবে। ব্যাসদেব বাল্মীকি রামায়ণ থেকে অনেক কিছু নিয়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তখনও লক্ষ্মণকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন, বলছেন – দ্যাখো, কৈকেয়ি তিনি আমাকে খুবই ভালোবাসেন কিন্তু বিধাতা তার মনটাকে অন্য রকম করে দিয়েছেন। আমি কৈকেয়িকে বিফল মনোরথ হতে দেবনা, তিনি যেটা সঙ্কল্প করেছেন সেটা আমি পাল্টাব না। বাল্মীকি এখানে ঠিক বিধাতা এই কথাটা বলেননি – *বুদ্ধি প্রণিতায়িনী এনেয়ং* – অর্থাৎ বলতে চাইছেন, যখন কৈকেয়ির এই রকম বুদ্ধি হয়ে গেছে, তখন আমি এই বুদ্ধির বিরুদ্ধে যাব না। আর হে লক্ষ্মণ, তুমি জেনে নিও, আমার হাতে এই রাজলক্ষ্মী এসে যখন বেরিয়ে গেল, এটাকে তুমি দৈব বলে গ্রহণ কর। তখন ভাগ্যকে দৈবই বেশি বলা হত। শ্রীরাম বলছেন – আমার যেটা মনে হয় কৈকেয়ির বুদ্ধি যে এই রকম হয়েছে এটাও দৈব। দৈব হচ্ছে কোন একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির খেলা যেটা আমার হাতে নেই। দৈব মানে ভাগ্য, কৈকেয়ি যে সত্যিকারের এই

ধরণের নারী তা নয়। যেমন একটা সাপ আমাকে ছোবল দিতেই পারে, একটা কুকুর কামড়াতেই পারে, কিন্তু আমার যে পোষা কুকুর সে যদি আমাকে কামড়ে দেয় তখন সেটা হয়ে যাবে অবাঞ্ছিত, তখন বুঝতে হবে কপালের ব্যাপার আছে। অথবা আমি যার কাছ থেকে আশা করছি না অথচ সেই জিনিষটা তার কাছ থেকে আসছে তখন বুঝতে হবে যে এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। যখনই আমরা বলি ঠাকুরের ইচ্ছাতে এটা হয়েছে, বা কপালে ছিল বলে এই রকম হয়েছে, তার মানে যেটা স্বাভাবিক ভাবে হওয়ার কথা ছিল হঠাৎ দেখা গেল সেই জিনিষটা না হয়ে অন্য রকম হয়ে গেল, বা যেটা কখনই হওয়ার কথা নয়, ঠিক সেই জিনিষটাই হয়ে গেল তখন এটাকে বলা হয় দৈব। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – একজন কাশী যাবে, সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণ পরেই রওনা হবে, তখন হঠাৎ একটা চিঠিতে খবর এল অমুকের খুব শরীর খারাপ। এখন কাশী যাওয়া বন্ধ করে দিতে হল, এটাই দৈব, তখন বলবে ঠাকুরের এটাই ইচ্ছা। যেটা অস্বাভাবিক, হওয়ার কথা নয় কিন্তু হয়ে গেল এই জিনিষগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যে জিনিষকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারিনা সেটাকেই আমরা দৈব বলে আখ্যা দিই। এই দৈবকে কেউ বলছে কপাল, কেউ বলছে অদৃশ্য কোন শক্তি, বা অপূর্বতা বলছে কিংবা ঠাকুরের ইচ্ছা বলুন, সবটাই এক। আসলে যেটা বলতে চাইছে তা হচ্ছে, স্বাভাবিক নিয়মে যেটা হল না, যেটা হবার কথা নয় কিন্তু হয়ে গেল। হঠাৎ যখন কিছু হয়ে যায় তখন এটাকে দৈব, কপাল, অদৃশ্য শক্তি, ভগবানের ইচ্ছা, যে যেভাবে খুশি বলতে পারে। কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক পুরুষ তারা সব সময়ই এই জিনিষগুলিকে বিধাতার তরফ থেকে একটা বার্তা দেওয়া হল বলে মনে করেন, মানে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া হল তুমি এই রকমটি করতে যেও না। ঠাকুর বলছেন কলিযুগে দৈববাণী হয় না, বাচ্চার মুখ দিয়ে, পাগলের মুখ দিয়ে তিনি বার্তা দেন।

এই সব বলার পর শ্রীরামচন্দ্র বলছে – **যদচিন্ত্যং তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে। ব্যক্তং ময়ি চ তস্যাঞ্চ পতিতো হি বিপর্যয়ঃ।।**২/২২/২০। যে ব্যাপারে তুমি ভাবনি সেটাই দৈব। যারা প্রাণি, আর প্রাণিদের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এখানে কিন্তু সাধারণ দেবতাদের কথা বলা হচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন বিষ্ণু। আমাদের সবারই, মানুষ মাত্রেই একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকেন, যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে মানেন তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঠাকুর। তিনি বলছেন কারুর ক্ষমতা নেই যে এই দৈবের বিধানকে আটকে দেবে, দৈবের বিধানকে মিটিয়ে দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। কৈকেয়ি যে এই রকম আচরণ করছেন এটা দৈবের জন্যই হয়েছে, কৈকেয়ির কোন দোষ নেই।

তিনি বলছেন – যখন একটা কিছু ঘটে গেল, আর হঠাৎ তার ফলও পাওয়া গেল, এর পেছনে যে কি কারণ আছে তা কোন দিন জানা যায় না। এটাও দৈব, আর এই দৈবের সাথে কখনই লড়াই করা যায় না। যেমন কৈকেয়ির এই ঘটনায় আমি ফলটা জেনে গেলাম যে, আমাকে রাজ্য ছেড়ে চোদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে চলে যেতে হবে। এর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে? কোন কারণই নেই, অথচ আমাকে জঙ্গলে চলে যেতে হবে। এই দৈবের সঙ্গে আমি কি লড়াই করব! আমাকে এখন দৈবের বিধান মাথা পেতে মেনে নিয়ে সব পালন করতে হবে। এখানে বলতে চাইছেন যে, আমি কর্মটা দেখলাম না, জানলাম না, কিন্তু হঠাৎ সেই কর্মের ভালো-মন্দ ফলটা এসে গেল।

এই জিনিষটাকেই আরো বিস্তার করে শ্রীরামচন্দ্র বলে যাচ্ছে – **ঋষয়োহপ্যুগ্রতপসো দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ। উৎসৃজ্য নিয়মাংস্তীব্রান্ ভ্রশ্যন্তে কাম-মন্যুভিঃ।।**২/২২/২৩। বড় বড় ঋষিরা, উগ্র তপস্বী যাঁরা, ঘোর তপস্যা করে নিজকে নিংড়ে দিচ্ছেন, তাঁকেও যখন দৈব ঠেলতে থাকে তখন তাঁরাও কাম আর ক্রোধের বশে চলে গিয়ে তাঁদের নিজেদের মর্যাদাকেও উল্লঙ্ঘন করে দেন। আর লক্ষ্মণ তুমি তো তাঁদের তুলনায় অতি সাধারণ একজন। এই জিনিষটা বিশ্বামিত্রের জীবনে দেখা গিয়েছিল, যেখানে কাম আর ক্রোধ বিশ্বামিত্রকে ঘিরে ফেলেছিল। হয়তো শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের কথা মাথায় রেখেই এই কথা বলছেন। ভারতের ইতিহাসে এই ধরণের ঘটনা ঋষিদের জীবনে হামেশাই দেখা যায়। ঋষিদের সাথে যদি কাম-ক্রোধ প্রেরিত কোন গোলমাল না হয়ে থাকে, তার মানে বুঝতে হবে সেই ঋষির কোন গোলমাল

আছে। এক একর জমির মাটিতে কোন বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হল, তারপরেই যদি ঠিক করে নেয় যে ঐ জমিতে এই বীজের ফসল করব না, তাহলে তাকে ঐ বীজ গুলিকে মাটি থেকে আলাদা করতে হবে। কেউ পারবে সেই বীজগুলিকে আলাদা করে তুলে আনতে? কখনই পারবে না। যদি বীজগুলিকে দেখতে হয় তাহলে ঐ জমিতে জল ছিটিয়ে দিতে হবে, জল পেয়ে গাছ হয়ে গেল। এখন সে গাছগুলোকে তুলে পরিষ্কার করে দিলেই জমিতে এখন আমি অন্য বীজ দিতে পারব।

গীতাতে এই শরীরকে বলা হচ্ছে ক্ষেত্র – *ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে*। এই শরীরটা হচ্ছে ক্ষেত্র, মাঠ। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যদি এগুলো হল বীজ। সব বীজ ভেতরে রয়েছে। জল হল বিষয় মানে সুন্দরী নারী, টাকা, পয়সা, মোদ্দা কথা ভোগের জিনিষ হচ্ছে জল। যেমনি ভেতরে জল পড়েছে তেমনি ভেতরের ক্রোধের বীজ, অহঙ্কারের বীজ, ভোগাকাঙ্খার বীজ থেকে আগাছা বেরিয়ে এসেছে। এবারে যে সাধক, তার যদি চেতনা বোধ থাকে, তার মধ্যে যখনই এই বীজ থেকে আগাছা হতে শুরু করবে তখন সে নিজেই বলবে, আরে ছি ছি ছি আমার মধ্যে এমন ক্রোধ রয়েছে! না এই ধরণের ক্রোধকে উৎপাটন করে দিতে হবে, আমি আর ক্রোধ করব না, তখন কিন্তু সে সাধনা করে করে ঐ কাম ক্রোধের আগাছাকে উপড়ে ফেলবে। সাধনা করে ভেতরের সব বীজ শেষ হয়ে যাবে। এই ব্যাপারটাকেই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন, বড় বড় ঋষিদেরও পতন হয়ে যায়।

শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে লক্ষ্মণ গেছেন আবার রেগে। তিনি আবার তাঁর মত করে যুক্তি ও ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ধর্ম সঙ্কটে এই ধরণের যুক্তি তর্কগুলি মহাভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। পাণ্ডবরা যখন বনবাসে ছিলেন তখন দ্রৌপদী, ভীম, যুধিষ্ঠির এরা সব আলোচনা করছে ক্ষমা করার ব্যাপারে। দ্রৌপদি খুব রেগে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন – কি বলে যাচ্ছেন আপনি! অসমর্থ পুরুষ যারা, যারা বীর্যহীন পুরুষর তারাই দৈব দৈব করে, আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা পুরুষার্থে বিশ্বাস করি। স্বামীজী ছিলেন ক্ষত্রিয়, আর তাঁর তেজও ছিল প্রচণ্ড, তাই তিনিও বললেন You are the maker of your own destiny. শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – না, কেউ লড়াই সংগ্রাম করে দৈবকে মিটিয়ে দিতে পারেনা। কিন্তু স্বামীজী ঐ কথাই বলতেন। স্বামীজীও ভালোভাবে জানতেন যে কেউই দৈবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেনা, কিন্তু আমাদের আপামর জনসাধারণ একেবারে তামিসকতায় আচ্ছন্ন হয়ে জড় হয়ে গিয়েছিল। অনেক ধরণের অবস্থা আছে – একটা অবস্থায় লোকেরা মাতালের মত মদ খেয়ে বন্ বন্ করে ঘুরেই চলেছে, তাদের এক পা একবার এদিকে যাচ্ছে আবার পরক্ষণেই আরেক পা অন্য দিকে যাচ্ছে। এদের মধ্যে থেকে যাদের একটু চেতনা এসে যাচ্ছে তারা বুঝে নেয় যে আমাকে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। তাঁরাও উন্মত্তের মত করছে কিন্তু মাথায় বোধটা আছে আমাকে ঐদিকে যেতে হবে। আরেক ধরণের আছে যারা পুরোপুরি বুঝে গেছে, এখন সে আর উন্মত্তের মত কাজ করেনা, যদিও মাঝে সাঝে একটু আধটু গোলমাল করে ফেলে। আরেক জন আছে যে পুরোপুরি ঐ লক্ষ্যের দিকে এগোতে শুরু করেছে। আরেক জন আছেন যিনি লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়ে শান্ত হয়ে গেছেন। আরেক ধরণের শ্রেণি আছে যারা ঐ উন্মত্তের মত কাজ করছে দেখে বলে, দূর আমি নড়াচড়া করবই না। আমাদের জীবনে সবাই এই শেষোক্ত ধরণের। যারা অপরের উন্মত্তের মত কাজ করা দেখে চুপচাপ বসে গেল তারা আর জীবনে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

প্রথমে থাকে তামসিক ভাব, উন্মত্তের মত কর্মে যারা আছে তাদের দেখে তারা বলে আরে ঐভাবে ছুটে কিছু হবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে উন্মত্তের মত, পাগলের মত কর্মের পেছনে ছুটতেই থাকে, যেমন এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যা করছে। এই উন্মত্ততা থেকে যাদের চেতনা একটু জাগ্রত হয়েছে, তারা বুঝতে পারে যে আধ্যাত্মিক সত্তাটাই মূল, এই আমি যা করছি এগুলো সব আমার সংস্কারবশতঃ করে যাচ্ছি, কিন্তু আজ হোক কাল হোক আমাকে ঐদিকেই যেতে হবে। এখান থেকে তার যাত্রা শুরু হয়, এভাবে চিন্তা করতে করতে আরেকটু উচ্চাবস্থার স্তরে চলে যায়। এখানে এসে তার কাজের ঝোঁক আরও কমে যায়। তারপরে সে বলে – না বাবা, আমি ঐটাই করব যেটা করলে আমাকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এরপরে হচ্ছে স্বামীজীর মত লোক, যাঁরা ঐখানে পৌঁছে স্থির হয়ে বসে গেলেন। স্বামীজী যেটা বলছেন You are the maker of your own destiny, এটা তাদের উদ্দেশ্যেই বলছেন যারা কিছুই করে না, তামসিকতায় পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু এই তামসিক ভাবকে সরিয়ে যখন সে কিছু করতে যাবে তখন অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারে যে, আমি যেটা করতে চাইছি সেটা মনের মত করতে পারছি না। এগুলো হচ্ছে অনেক উচ্চ অবস্থার কথা। এই কথাগুলো শুনেই লোকে বলে – আরে কপালে থাকলে আসবে, কপালে না থাকলে আমার আসবে না। এই কথা কিন্তু এখানে একেবারেই বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, তুমি যখন কিছু চেষ্টা করছ তখন হঠাৎ যদি কিছু হয় যেটা হবার কথা নয়, সেটা দৈবের জন্য। কিন্তু তাই বলে কি আমি আমার সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিয়ে দৈবের উপরে নির্ভর করে থাকব! যতই দৈবের মার আসুক, কপালের যতই দোহাই দিক, আমাকে আমার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, আমাকে লেগে থাকতেই হবে। লক্ষ্যের পথে চলাটা থামিয়ে দেওয়া চলবে না, পথটা ধরে রাখতে হবে। পথে অনেক কিছুই আসবে, হঠাৎ করে ভালো জিনিষও আসতে পারে, আবার হঠাৎ কোন খারাপ জিনিষও এসে যেতে পারে, এর মধ্যে থেকেই আমাকে পথ চলতে হবে, আমাকে সব কিছু অর্জন করে হৃষ্টপুষ্ট হতে হবে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা বলুন আর দৈবই বলুন আর কপালই বলুন এই সমস্যা আমাদের বাল্মীকির সময় থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এই সমস্যা কাদের জন্য? যারা সাধারণ মানুষ, কিন্তু যারা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাদের কাছে এগুলো কোন সমস্যাই নয়। তুমি নিজের মত কাজ করে যাও, যাই করবে তার ফল তুমি পাবে। আর ঠিক ততটাই ফল আসবে যতটা তুমি করেছ। যদি হঠাৎ করে কিছু এসে যায়, তা ভালই হোক বা মন্দই হোক, জানবে এটাই দৈব। তুমি ঐদিকে মন দিও না। কেন মন দিতে নিষেধ করা হচ্ছে? কারণ কারুর ক্ষমতা নেই দৈবকে পাল্টানোর। যখন তুমি কাজ করবে তার একটা ফল হবেই, কিন্তু ফল ততটা হয় না যতটা তুমি প্রত্যাশা করছ, প্রত্যাশার থেকে হয় একটু বেশি হবে নয়তো একটু কম হবে। কেন এই তারতম্য? এটাই দৈব। শ্রীরামচন্দ্র এই কথাই লক্ষ্মণকে বোঝাচ্ছেন – যেটার জন্য কর্ম করা হয়নি অথচ তার ফল এসে হাজির হয়ে গেছে, যেমন কৈকেয়ির এই মনের বিকার, এটা আমরা কেউই ভাবতেই পারিনি, অথচ এসে গেছে, এটাই দৈব।

লক্ষ্মণের কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের কথাগুলো এখনও মনঃপূত হয়নি। লক্ষ্মণ বলছেন – হে দাদা রামচন্দ্র! আপনি এই রকম কাপুরুষের মত কেন কথা বলছেন, ঐ দুই পাপীকে (নিজের বাবা আর সৎমা কৈকেয়িকে উদ্দেশ্য করে লক্ষ্মণ বলছেন) নিয়ে আপনার কি একটুও সন্দেহ হচ্ছে না! আপনি দিব্যি সব দৈবের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন! এদের অশুভ চক্রান্তটা আপনার নজরে আসছে না! আর এর কি প্রতিকার সেটাও আপনি ভাবতে পারছেন না! প্রতিকার বলতে লক্ষ্মণ বলতে চাইছেন, বাপকে মেরে ঐ সৎমাকে জেলে পুরে দাও। লক্ষ্মণ বলছেন – **সন্তি ধর্মোপধাসক্তা ধর্মাত্মন্ কিং ন বুধস্য।**।২/২৩/৮ – এই জগতে নিজের ধান্দা আদায় করার জন্য কত লোকই তো ধর্মের আড়ম্বর করে রেখেছে, আর আপনি এত বড় ধর্মাত্মা হয়েও এটা ধরতে পারছেন না! লক্ষ্মণ বলছেন ধর্মের মুখোশ পরে এরা অপরকে ঠকাচ্ছে। ধর্মের মুখোশের আড়ালে আজকাল যা হচ্ছে তাই দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই, কিন্তু এই সমস্যা শুধু এই যুগেরই নয় সেই বাল্মীকির আমল থেকেই চলে আসছে, আর এই সমস্যা যুগে যুগেই থাকবে। লক্ষ্মণ বলছেন দশরথ আর কৈকেয়ি তাই করছেন, পিতৃধর্ম আর মাতৃধর্মের নাম করে আমাদের প্রতারিত করছেন। আমরা সব জেনেশুনে কাপুরুষের মত সব দৈবের উপর ছেড়ে দিয়ে মুখ বুজে মার খাব নাকি! ওসব ছাড়ুন, জঙ্গলে যাওয়ার ভাবনা ছেড়ে চলুন এদের মেরে আপনি অযোধ্যার সিংহাসন দখল করে রাজ করুন। দাদা, যারা পুরুষার্থে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র তারাই ঠিক ঠিক মানুষ, যারা দৈবকে বিশ্বাস করে তার মানুষ নয়। আপনি এই যে দৈবের উপর বিশ্বাস করে আছেন, ঠিক আছে আমিই এই মুহূর্তে দেখিয়ে দেব এই সংসারে কার শক্তি বেশি দৈবের না পুরুষাকারের। আপনি বলছেন দৈবের শক্তি আছে বলেই কৈকেয়ি এই রকম দুষ্কর্ম করতে পেরেছে, কিন্তু এইবার দেখুন পুরুষাকারের খেলা, শক্তির খেলা কি জিনিষ এইবার আমি দেখাব।

লক্ষ্মণ বলছেন – **দৈবমানুষয়োরদ্য ব্যক্তাব্যক্তির্ভবিষ্যতি।**২/২৩/১৮। এখুনি সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। দৈব আর পুরুষকারের এই সমস্যা চিরদিনের জন্য আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি শক্তিমান এক্ষুণি আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। এই কথা বলার পর লক্ষ্মণ যদি বিদ্রোহ করতেন তাহলে কি হত? ভগবানই জানেন কি হত। লক্ষ্মণ এত রেগে গেছেন যে, রাগের তেজে তার চোখ থেকে জল নির্গত হচ্ছিল।

শ্রীরামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে তার চোখের জল মুছে দিয়ে খুব সুন্দর করে বলছেন – তুমি এরকম ছেলে মানুষি করো না ভাই, তুমি বাবা মার কাছে থেকে তাঁদের সেবা যত্ন কর, আমার যখন জঙ্গলে যাওয়ার কথা আমি সেই অনুসারে জঙ্গলে যাচ্ছি। এবার শ্রীরামচন্দ্র নিজের মাকে বোঝাচ্ছেন। দৃশ্যপট একই রয়েছে, কৌশল্যা যে রাজমহলে থাকতেন সেই রাজমহলে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও কৌশল্যা তিন জনকে নিয় এই দৃশ্য অভিনীত হয়ে চলেছে। কৌশল্যা এর আগে নিজের পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন – হে রাম, লক্ষ্মণ যা বলছে সেটা একটু ভেবে দেখ। মানে প্রয়োজন হলে তোমার এই বুড়ো বাপকে মেরেই দাও। বাল্মীকি ছিলেন খুব সোজা কথার মহাপুরুষ, বাস্তবে যা হবার তাই তিনি বলে গেছেন। মন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যা প্রতিক্রিয়া করে সেই ব্যাপারে বাল্মীকির কোন রাখঢাক নেই। দুঃখ, হতাশা কৌশল্যাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মণ বলছেন বাপকে, মাকে আর ভাইকে এই তিনজনকেই শেষ করে দাও। এর বিরুদ্ধে যে কথা বলতে আসবে তাকেও শেষ করে দাও। কৌশল্যা বলছেন – লক্ষ্মণ যে কথাগুল বলছে, হে রাম সেগুলো একটু ভেবে দেখো। এত কিছু হচ্ছে, তাই বলে কি শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে কোন বিকার হচ্ছিল না? একটু পরেই আমরা দেখতে পাবো শ্রীরামচন্দ্রও হা হুতাশ করে বলছেন সব সুখ ভরতই পেল। পরের দিকে শ্রীরামচন্দ্রের এত হতাশা এসে যাবে যে লক্ষ্মণকে বোঝাতে হবে যে, দাদা আপনাকে আমি বোঝাচ্ছি আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনার কাছ থেকেই যা শিখেছি সেগুলোই আপনাকে বলছি। আপনি এইভাবে হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়বেন না, এই ধরণের মনের বিকার আপনাতে শোভা দেয় না। বাল্মীকি এই গুলোকেও পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন, যদি শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা অতিমানব রূপে দেখি তখন এগুলো তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ইলিয়ড ওডিসিতে হোমার বীর যোদ্ধাদের বর্ণনা করছেন। একটা যুদ্ধে ওদের কমরেডরা মারা গেছে, রাত্রিবেলা সবাই মাংস রান্না করেছে, রান্না করে খাওয়া দাওয়া করল, খাওয়া দাওয়ার পর সবাই একত্র জড়ো হয়ে নিজেদের বন্ধুদের নাম করে করে কাঁদতে শুরু করল। হোমারের কি অপূর্ব কাব্যিক বর্ণনা ভাবা যায় না। আগে শিকার করেছে, সেই পশুকে রান্না করেছে, রান্না করে সবাই খেয়েছে, পেট ভরে খেয়ে যে বন্ধুরা মারা গেছে তাদের নাম করে কাঁদতে শুরু করল। এরা বীর যোদ্ধা কিনা, এরা মেয়েদের মত, কাপুরুষের মত কাঁদতে শুরু করল না। মনের আবেগের বর্ণনাতে এটাই সঠিক চিত্রণ। বাল্মীকিও মনের আবেগের বর্ণনাতে সত্যকে লুকিয়ে রাখেননি। যার জন্য ছোটবেলা থেকে যারা রামায়ণকে যেভাবে জেনে এসেছে, বাল্মীকি রামায়ণ পড়তে গেলে তাদের কাছে একটু অবাক হয়ে যেতে হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মাকে অনেক করে বুঝিয়ে বলছেন – মা! তুমি আমার সত্য রক্ষায় সহায় হও, তুমি এরকমটি করো না, তুমি বাবার সেবা কর। কৌশল্যা যখন বুঝে গেলেন যে শ্রীরামচন্দ্র সত্যে অটল ও দৃঢ়, তাঁকে কোন ভাবেই জঙ্গলে যাওয়া থেকে বিরত করা যাবে না, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বনে যাওয়াকে মেনে নিয়ে নানান ভাবে আশীর্বাদ দিতে শুরু করলেন। কৌশল্যা বলছেন – বৃত্রাসুরের নাশের সময় ইন্দ্রকে তাঁর মা যে যে আশীর্বাদ করেছিলেন আমিও তোমাকে সেই সব আশীর্বাদ করছি। যখন গরুড় অমৃত আনতে গমন করছিল তাঁর মা বিনতা তাঁকে যেভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন, আমিও তোমাকে সেই ভাবে আশীর্বাদ করছি। বেদের যে দেবতা ও দেবীরা ছিলেন তাঁদের আগে সন্তান হত, কিন্তু পার্বতীর অভিশাপে তাঁদের আর পরে সন্তান হত না। অমৃত সন্ধানের সময় যখন সমুদ্রের মন্থন করা হয়েছিল তখন ইন্দ্রের মা অদিতি যা আশীর্বাদ করেছিল সেই আশীর্বাদ আমি তোমাকে করছি। ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের একজন আদিত্য, আদিত্যদের মা ছিলেন অদিতি। যখন ভগবান বিষ্ণু তিন পাদ দিয়ে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে মেপে

নিলেন, সেই বামনাবতারে যে মঙ্গল কামনা করা হয়েছিল আমিও তোমার সেই মঙ্গল কামনা করছি। এটাই আমাদের আশীর্বাদ করার প্রথা, মানে, আগের আগের কোন কাজে যারা খুব সফল হয়েছেন, তাঁরা যে সব আশীর্বাদে সফল হয়েছেন, যে মঙ্গলকামনার জন্য সফল হয়েছেন সেগুলো সব তোমার উপরে দিলাম।

কৌশল্যার ওখান থেকে শ্রীরামচন্দ্র সীতার কাছে এসেছেন। সীতাকেও সব সংবাদ দেওয়ার পর তিনি সীতাকে খুব ভালো করে বোঝাচ্ছেন – আমি চৌদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে চলে যাচ্ছি, তুমি এখানে এই ক'বছর খুব ভালো ভাবে থেকো, রোজ সকালে উঠে বাবার কাছে যাবে, গিয়ে বাবাকে আগে প্রণাম করবে, ইত্যাদি। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে শ্বশুড়ের কিভাবে সেবা করতে হবে, শাশুড়ির কিভাবে সেবা করবে সব বোঝাচ্ছেন। সব কথা শুনে সীতা বলছেন – না না, আমি তোমার সাথেই জঙ্গলে যাব। শ্রীরামচন্দ্র তখন সীতাকে বোঝাচ্ছেন – তুমি একজন নারী ও স্ত্রী, তোমার জঙ্গলে যাওয়া ঠিক হবে না, ওখানে খুব কষ্ট এবং প্রতিনিয়ত বিপদ। এইসব ব্যাপারে যখন বাল্মীকির বর্ণনা আসে তখন তিনি সব কিছুকে ছাপিয়ে যান। জঙ্গলে কত রকমের কষ্ট হতে পারে তার বিশাল এক বর্ণনা, আর কোনটাই অহেতুক বর্ণনা করা হয়নি।

সীতা কিন্তু বারবার একই কথা বলে যাচ্ছেন। এই জায়গাতে সীতার কথগুলো খুবই উল্লেখনীয়। সীতা বলছেন – হে নাথ, আমার বাড়িতে অনেক ব্রাহ্মণরা আসতেন, তাঁরা কিন্তু আমার কুষ্ঠি বিচার করে আমাকে অনেকবার বলেছিলেন যে আমাকে জঙ্গলে থাকতে হবে, সেইজন্য আমি অনেক আগে থেকেই জঙ্গলে থাকার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রয়েছি। এই কথাই সীতা বলছেন – **লাক্ষণেভ্যো দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রুত্বাহং বচনং গৃহে**।২/২৯/৯। ব্রাহ্মণরা আমার শরীরের লক্ষণ দেখে বলেছিলেন যে, আমাকে জঙ্গলে থাকতে হবে। এখানে লক্ষণ বলতে অনেক কিছুর অর্থ হতে পারে, লক্ষণ মানে হস্তরেখাও হতে পারে, আবার লক্ষণ মানে শুভ চিহ্নও হতে পারে। সেই কথাই সীতা বলছেন, এই কথা অনেক দিন ধরে শুনে শুনে আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আর আপনি বললেও যা, না বললেও সেই একই জিনিষ হবে যেটা আমার ভবিতব্য সেটা হবেই। আমি আগে থাকতেই জেনে গেছি যে আমাকে জঙ্গলে যেতেই হবে, আপনি যদি নাও নিয়ে যান আমার জঙ্গলে বাস হবেই, আমার কুষ্ঠিতেই লেখা আছে, এটা থেকে আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন না। এগুলো হচ্ছে নিয়তি থেকে যেটা নির্ধারিত হয়ে আছে, এই ধারণাকে বাল্মীকি গ্রহণ করছেন।

এরপর নানা কথা বলে সীতা এমন কান্না জুড়ে দিয়েছেন যে শ্রীরামচন্দ্রও কিছুক্ষণের জন্য যেন বিমূঢ় হয়ে রইলেন। তিনি তখন সীতাকে শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করে সীতাকেও তাঁর অনুগামিনী হয়ে বনে যাবার অনুমতি দিলেন। অন্য একটি রামায়ণে বর্ণনা করা হয়েছে যে সীতা বলছেন – আমি তো শৈশব কাল থেকে রামায়ণ শুনে আসছি, সেখানে সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন 'তুমি কোন রামায়ণে শুনেছ যে সীতা রামের সঙ্গে বনবাসে যায়নি'। এতে মনে হয় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের অনেক আগেই রামকথা লেখা হয়ে গিয়েছিল। আমরা অনেকেই ছোটবেলা শুনেছিলাম যে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে জিরোর উপরে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতা নাকি তিনি সাত দিন সাত রাত টানা দিয়েছিলেন। পরে তাদের কেউ যখন রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন, তারা সিনিয়র মহারাজদের জিজ্ঞেস করছে 'আচ্ছা মহারাজ, স্বামীজী জিরোর উপর কি লেকচার দিয়েছিলেন'। যতই মহারাজরা বলেন যে স্বামীজী জিরোর উপরে কোন লেকচার দেননি, এরাও তা মানতে চায়না। তারপরে মঠ মিশনের কাজ কর্মের মধ্যে আর পড়াশোনা করে জানতে পারেন যে স্বামীজী এই ধরণের জিরো উপরে কোন লেকচারই দেননি। কিন্তু এখনও হিন্দী বেল্টের যে কোন জায়গায় গেলে এই প্রশ্ন শুনতে হয় যে স্বামীজী জিরোর উপরে কি লেকচার দিয়েছিলেন। আসল ব্যাপার হচ্ছে, রামতীর্থ বলে একজন পণ্ডিত ছিলেন, তিনি কোথাও এক ঘন্টার উপর জিরোর উপরে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আর পরে একজন একটা বই লিখেছেন রামতীর্থকে নিয়ে, তাতে রামতীর্থের সাথে স্বামীজী মিশে গেছেন। সেই থেকে হিন্দী বেল্টে অনেকের মধ্যে প্রচলিত আছে যে স্বামীজী

চিকাগোতে জিরোর উপরে একটা লেকচার দিয়েছিলেন তাও কেউ বলবে তিন ঘন্টা, কেউ বলবে তিন দিন তিন রাত আবার কেউ বলবে সাত দিন সাত রাত টানা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

আসল ঘটনা আর কল্পনা এমন ভাবে মিশে যায় যে আমরা বলতে পারিনা যে এটাই ঠিক। ঠিক তেমনি এটাই কল্প কাহিনীতে দাঁড়িয়ে গেছে যে রামকথা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের আগেই লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে বলা হচ্ছে সীতাকে হস্তরেখা বিশারদরা তাঁর হস্তরেখা বিচার করে আগেই ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যে সীতাকে জঙ্গলে বাস করতে হবে। এরপরে লক্ষ্মণও শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বনে যেতে চাইলেন, শ্রীরামচন্দ্রও রাজী হয়ে গেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র জঙ্গলে রওনা হবার আগে লক্ষ্মণকে বলছেন – ভাই লক্ষ্মণ, রাজা জনকের ওখান থেকে আমরা দুটো ধনুক নিয়ে এসেছিলাম, যেটা বরুণ দেবতা তাঁকে দিয়েছিলেন, ঐ দুটো ধনুক তুমি আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল। এর সাথে তুমি দুটো অভেদ্য কবচ, আর দুটো অক্ষয় তূণির, সাথে আরও কিছু অস্ত্র যেগুলো আমাদের আচার্য বশিষ্ঠদেবের গৃহে নিরাপদে রাখা আছে, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য এই সব জিনিষগুলো তুমি ওখান থেকে নিয়ে এসো। এগুলোর একটিও সাধারণ অস্ত্র নয়, সব কটিই দিব্যাস্ত্র। এই জিনিষ যেখানে সেখানে রাখা যায় না, যেমন আমরা ঠাকুর দেবতার ছবি খুব সামলে সুমলে রাখি।

এরপর সব মজার মজার কাহিনী আছে। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ এসেছেন শ্রীরামের দান নেবেন বলে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – আপনার হাতে যে ডাণ্ডাটা আছে সেটা আপনি যত দূর ছুড়তে পারবেন সেই পর্যন্ত যত গরু আছে আপনাকে দান করে দেওয়া হবে। সেই ব্রাহ্মণের বর্ণনা করছেন, বুড়ো হয়ে গেছে, তার আবার যুবতী স্ত্রী। বাল্মীকি রামায়ণে সব যুবতী মেয়েকে বুড়োদের সাথেই বিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই যুবতী স্ত্রীদের দাপটে এর দৌড়ে মরছে। এখন ঐ ব্রাহ্মণ কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে এমন জোর ঘুরিয়ে ছুড়েছেন যে ডাণ্ডা অনেক যোজন দূর পার করে গেছে। তখন শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণকে বলছেন – আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার সাথে মজা করছিলাম, আমি জানি আপনি গরীব হলেও আপনার অনেক সিদ্ধাই আছে, নিজের চোখে একবার আপনার সিদ্ধাই দেখার ইচ্ছে হয়েছিল, আপনি অন্যথা নেবেন না, আমি সত্যিই অবাক হয়ে গেছি এই বুড়ো বয়সেও আপনি লাঠিকে কত যোজন দূরে পার করে দিয়েছেন। সে যাই হোক ডাণ্ডা যত দূর গেছে, এর মধ্যে দশ হাজার গরু আছে, এ সবই আপনাকে দান করে দিলাম। এরপর তিনজনে মিলে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ একসাথে রাজা দশরথের কাছে আজ্ঞা চাইতে গেছেন, আমরা এবার বনে যাচ্ছি আপনি অনুমতি দিন।

বাল্মীকি রামায়ণ – ২২শে মে ২০১০

সুমন্ত্র ছিলেন রাজা দশরথের মন্ত্রী। আগেকার দিনে রাজাদের মন্ত্রীরা কখনই রাজার মোসায়েবি করত না, উপরন্তু রাজার কোন নীতি বা আদেশ যদি ভুল হত মন্ত্রী রাজাকে আগে থাকতেই সাবধান করে দিত। এটাই ভারতীয় পরম্পরার ঐতিহ্য। যদিও রাজা সব সময় ক্ষত্রিয় হতেন কিন্তু ব্রাহ্মণকে সব সময় ক্ষত্রিয়ের উপরে রাখা হত। মন্ত্রীরা সাধারণত ব্রাহ্মণই হতেন। তার ফলে রাজার মতের বিরুদ্ধে কিছু বলে দিলেও রাজা সহজে মন্ত্রী গলা কেটে দাও এই কথা বলতে পারতেন না। কারণ তখনকার দিনে ব্রহ্মহত্যার পাপ কেউ নিতে সাহস করত না।

সুমন্ত্র যখন পুরো ঘটনাটা শুনলেন তখন তিনিও কেঁদে কেঁদে মুর্ছিত হয়ে গেছেন। নিজেকে কোন ভাবে সামলে নেওয়ার পর সুমন্ত্র খুব রেগে গিয়ে কৈকেয়িকে প্রচণ্ড গালাগাল দিতে শুরু করেছেন। এমন কি রেগে গিয়ে অভিশাপ দিতেও ছাড়ছেন না। সুমন্ত্র বলছেন ‘ঠিক আছে ভরত রাজা হবে, তিনি রাজা হোন, আমরাও এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাব। তোমার এখানে কোন ব্রাহ্মণ বাস করবে না’। একটা জিনিষ আমাদের

জানা খুব দরকার, আজকে যে হিন্দু ধর্মকে আমরা ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম রূপে পালন করছি, এই হিন্দু ধর্ম কিন্তু বেদ বা উপনিষদ থেকে শুরু হয়নি। বর্তমান হিন্দু ধর্মের অনেক কিছুই, যা বেদ বা উপনিষদ ছিল না, বাল্মীকিই সেগুলো প্রথম রামায়ণেই নিয়ে এসেছেন। হিন্দু ধর্মের বর্তমান যে চিত্র যেটা বাল্মীকি তাঁর মহাকাব্যে খুব সংক্ষেপে বলে গেছেন ব্যাসদেব এই চিত্রকেই মহাভারতে খুব বড় আকারে নিয়ে এসেছেন।

আজকের টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়াতে একটা খবর বেরিয়েছে যে, পাঞ্জাবের মহামান্য হাইকোর্ট একটা রায়ে বলেছেন যে, বাল্মীকি কোন ভাবেই দস্যু হতে পারেন না। এই বক্তব্যটাই আমরা এর আগে খুব বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছিলাম কেন বাল্মীকিকে কোন মতেই বলা যায় না যে তিনি দস্যু ছিলেন। আমরা যে যুক্তি দিয়ে আমাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি তাঁর ঐতিহাসিক রায়ের ক্ষেত্রে ঠিক একই যুক্তিগুলোকেই নিয়ে এসেছেন। এটাও বলা হয়েছে যে, অনেক পরের দিকে বাল্মীকিকে দস্যু বানান হয়েছে। মানুষের এটাই স্বভাব একজনকে বড় করতে হবে, কিভাবে করবে? অপরকে ছোট করে দিন। রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের কি গোলমাল আছে সেটা কখনই বলবে না, কিন্তু তার বিরোধী দলকে অনবরত গালাগাল দিয়ে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। এখন শ্রীরামচন্দ্রকে বড় করতে হবে তাই বাল্মীকিকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইদানিং যেমন ঠাকুরকে বড় করতে হবে তাই গিরিশের উপর যত কালো রং আছে সব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়।

বাস্তব চিত্র যদি না দেওয়া হয় তাহলে সাধারণ মানুষ ধর্মের মহারণ্যে হারিয়ে যাবে। এই যেমন বলা হয় ঠাকুর পূর্ণ অবতার, স্বামীজী থেকে লাটু মহারাজ এনারা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ঠাকুর একে ছুঁয়ে দিচ্ছেন তার এই হয়ে গেল, তাকে ছুঁয়ে দিলেন তার ইষ্ট দর্শন হয়ে গেল। এই ঘটনাগুলো যখন আমরা কোন বইতে পড়ি তখন আমাদের মনের মধ্যে কোথাও একটা হীনমন্যতা এসে গ্রাস করে নেয় – আমি তো আর ঠাকুরের পার্ষদও নই আর তিনি তো আমাকে ছুঁয়েও দিচ্ছেন না, তাহলে আমার আর কি হবে! কিছুই হবে না আমাদের। আমার যখন কিছুই হবে না তখন লুটেপুটে খেয়ে বেড়াই, ধর্মের দিকে গিয়ে আর কি হবে! যে সমাজ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই যে সমাজের প্রধান অবলম্বন সেখানে যদি এই ধরণের ঘটনাগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয় তখন মানুষের মানসিক শক্তি কমে যায়। এই কারণেই এই জিনিষগুলোকে নিয়ে বেশি আলোচনা করতে নেই। স্বামীজী বারংবার নিষেধ করে গেছেন ঠাকুরের সিদ্ধাই নিয়ে বেশি আলোচনা করতে। তাঁর ক্ষমতা ছিল তো ছিল, যদি না থাকত তাতেও কিছু এসে যেত না, ধর্মে এগুলোর একেবারে কোন স্থান নেই।

যাই হোক, সুমন্ত্র কৈকেয়িকে বলে দিলেন যে, তোমার এখানে কোন ব্রাহ্মণ বাস করবে না। ব্রাহ্মণ বাস না করা মানে তোমার রাজ্যের আর কোন সম্মান থাকবে না, সবাই ব্রাহ্মণ বর্জিত দেশ বলে আখ্যা দেবে। কৈকেয়িকে সুমন্ত্র বলছেন – তুমি যা শুরু করেছ এটা হল ঠিম যেন আম গাছ কেটে নিম গাছ লাগানোর মত। মানে মিষ্টি ফল ফেলে দিয়ে তেতো ফল লাগাচ্ছ। এখানে সুমন্ত্র খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – **নহি নিম্বাৎ স্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতাং বচঃ।**।২/৩৫/১৭। নিম গাছ থেকে কখন মধু ক্ষরণ হয় না তেতোই বেরোয়, এটা হচ্ছে একটা প্রচলিত লোককথা, বাল্মীকি এখানে সেটা ব্যবহার করছেন। সুমন্ত্র বলছেন – শুনেছি তোমার মা নাকি তোমার থেকেও বেশি বদ মহিলা ছিলেন, তা তোমার মা যেখানে এত বদ সেখানে তুমি আর কি করে ভালো হবে।

এটা একটা অদ্ভুত ধারণা চলে আসছে যে, সন্তান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মায়ের মত হয়। আরেকটা মতে বলে ছেলের স্বভাব নাকি সব মায়ের মত হয় আর মেয়েরা বাবার স্বভাবটা বেশি পায়। এসবে উপর নানান রকমের মত পাওয়া যায়। সুমন্ত্র কৈকেয়ির মায়ের ব্যাপারে একটা খুব সুন্দর কাহিনী বলছেন, যে কাহিনীটা আমাদের পরম্পরার অন্যান্য কাহিনীর মধ্যেও পাওয়া যায়। এমনকি আরব্য রজনীতেও ঠিক এই কাহিনীটাই প্রথমের দিকে একটু অন্য ভাবে দেওয়া আছে।

কাহিনীটা হল, কৈকেয়ির বাবা একজন ব্রাহ্মণের কাছে, যিনি বরদানে সমর্থ ছিলেন, এমন একটা বর লাভ করেছিলেন যার দ্বারা তিনি সমস্ত পশু পাখির ভাষা বুঝতে পারতেন। একদিন জৃম্ভ নামে একটি পাখি রাত্রিবেলা যখন তিনি শয়নে ছিলেন, তখন বিকট স্বরে শব্দ করছিল, জৃম্ভ পাখির সে কন্ঠস্বর শুনে কৈকেয়ির বাবা খুব হাসছিলেন। কৈকেয়ির বাবার হাসিতে কৈকেয়ির মা খুব জোর রেগে গেছেন, মা ভাবছে আমাকে দেখে স্বামী অমন করে হাসছে, আমি কি হাসির পাত্র! তিনি স্বামীকে বলছেন – তুমি কেন হেসেছ বল, আমাকে বলতেই হবে তা নাহলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে দেব। এই একই কাহিনী ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দেশের লৌকিক কাহিনীতে জায়গা করে নিয়েছে, কিন্তু প্রথম বাল্মীকিই এই কাহিনীকে রামায়ণে নিয়ে এসেছেন। এখন সমস্যা হল, বরদানের শর্ত অনুযায়ী কেকয় নরেশ যদি বলে দেয় পাখিটা কি বলছে তাহলে তিনি মারা যাবেন। অন্য দিকে স্ত্রীকে না বললে সে আবার গলায় দড়ি দেবে। তিনি মহা সমস্যায় পড়ে গেছেন। কৈকেয়ির মা বলছেন ‘তুমি বেঁচেই থাকো আর মরেই যাও, আমাকে তোমার হাসির কারণ বলতেই হবে, যাতে তুমি আর কোন দিন আমাকে নিয়ে উপহাস করতে না পারো’। এই গুরুতর সমস্যা থেকে বেরোবার জন্য তখন তিনি একটা সেই গুরুর শরণাপন্ন হলেন যাঁর থেকে তিনি এই বর পেয়েছিলেন। গুরু সব শুনে বলছেন – **ম্রিয়তাং ধ্বংসতাং বেয়ং মা শংসীস্ত্বং মহীপতে।**।২/৩৫/২৫। তুমি তোমার বউকে গিয়ে বল, তুমি গলায় দড়ি দাও, তুমি বিষ পান কর কি ধ্বংস হয়ে যাও তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি তোমাকে বলব না। তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বল এক্ষুণি তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিচ্ছি।

সুমন্ত্র এই কাহিনীটা বলে বলছেন – এই রকম যে মহিলা নিজের স্বামীর মৃত্যু চায় তার মেয়ে আর কি রকম হবে! তোমার মা যেমন তোমার বাবাকে মেরে ফেলার মতলব করেছিল, আজকে তুমিও ঠিক তাই করছ। সুমন্ত্র কৈকেয়িকে এইভাবে অনেক রকম কথা বলছেন। এখানে বাল্মীকি অবশ্য সুমন্ত্রের মাধ্যমে অন্য কথা বলছেন - **পিতৄন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ।**।২/৩৫/২৮। ছেলেরা সব সময় বাবার মত হয় আর মেয়েরা মায়ের মত হয়। এগুলো বিভিন্ন লৌকিক মত, এসব কথার খুব একটা গুরুত্ব নেই।

এখন যা হয়, এ ওকে গালাগাল দিচ্ছে, ও একে গালাগাল দিচ্ছে, ও এর ওপর দোষারোপ করছে, এ ওর উপর দোষারোপ করে চলেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু অবিচল, তিনি চৌদ্দ বছরের জন্য মুনিবেশ, ঋষিরা যেমন বৃক্ষের ছাল পড়েন, সেই পোষাক ধারণ করে নিয়েছেন, তিনি বনে যাবেনই। অন্য দিকে সীতাও বল্কল ধারণ করবেন বলে তৈরী হয়েছেন। সীতা যখন বৃক্ষের ছাল পড়তে গেছেন তখন বশিষ্ঠ মুনি কৈকেয়ির উপর প্রচণ্ড রেগে গেছেন। রেগে গিয়ে তিনি কৈকেয়িকে বলছেন – দ্যাখো কৈকেয়ি, তোমার কোন অধিকার নেই যে তুমি সীতাকে বলবে এই ভাবে বল্কল ধারণ করবে। কারণ রাজা দশরথের কাছে তুমি যে বর চেয়েছিলে সেই বরের কোথাও সীতার নাম কোন ভাবে উল্লেখ করা নেই। সেইজন্য সীতা এই বেশ ধারণ করবে না। এদিকে রাজা দশরথও খুব রেগে গেলেন। তিনিও রেগে গিয়ে বলছেন – না, সীতা কিছুতেই বল্কল ধারণ করবে না, সীতা যেমন রাজকুমারী ছিল, সেই রাজকুমারীর বেশেই যাবে।

এবারে সীতাকে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র মাতা কৌশল্যার কাছে এসেছেন। কৌশল্যা সীতাকে দুই বাহু দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বলছেন – সীতা, তুমিই ধন্য। কেন ধন্য – **অসত্যঃ সর্বলোকেঽস্মিন্ সততং সৎকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ। ভর্তারং নাভিমন্যন্তে বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ।**।২/৩৯/২০। স্বামীর যখন ভালো সময় থাকে তখন স্বামী স্ত্রীকে সব রকম ভাবে, শাড়ি, গয়না দিয়ে, সম্মান দিয়ে রাখে। কিন্তু স্বামী যখনই কোন সঙ্কটে পড়ে তখন স্ত্রী তাকে ছেড়ে দেয়। কিরকম ভাবে ছেড়ে দেয়? আমার কি দুর্ভাগ্য যে, আমার বাবা তোমার মত এমন অভাগার সাথে বিয়ে দিয়েছেন। এই নিয়ে আমরা পরে অনেক ঘটনা পাই। একটা খুব নামকরা বই আছে ‘A Beautiful Mind’ । জন ন্যাশ বলে একজন খুব নামকরা অর্থনীতিবিদ ছিলেন, নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন। পরের দিকে ওনার মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। মানুষ যে খুব প্রতিভাবান হয়ে

যায়, extra ordinary person হয়ে যায়, তার মূলে আমাদের মস্তিষ্কে একটা সেন্টার আছে, ঐ সেন্টারটা যদি একবার চালু হয়ে যায় তখন সে extra ordinary person হয়ে যাবে। ঐ সেন্টারের ঠিক পাশেই রয়েছে insanity centre, সেইজন্য যারা extra ordinary হয় তারা কিন্তু পাগল হবেই। মেডিক্যাল পরিভাষায় বলা হয় ব্রিলিয়েন্ট হওয়া মানেই পাগল হওয়া। আমাদের মত সাধারণ পর্যায়ে যারা আছি তারা স্বাভাবিক আর যারা আমাদের থেকে ওপরে অর্থাৎ extra ordinary তারা সব সময় এ্যবনর্মাল। তার মানে মেডিক্যালের দৃষ্টিতে আইনস্টাইন হচ্ছেন এ্যবনর্মাল, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এনারা হলেন পুরো এ্যবনর্মাল। মেডিক্যাল সাইন্সকে যত সন্দেহই করি না কেন, সত্যি সত্যিই তাই হয়। আমাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের কাজ হয়ে থাকে, মস্তিষ্কের যে সেন্টার মানুষকে extra ordinary person বানাচ্ছে, ঠিক তার পাশেই insanity centre রয়েছে। আরও মজার ব্যাপার হল এই insanity centre এর ঠিক পাশেই noise centre আছে। তার মানে মানুষ যদি অনেক দিন ধরে শব্দদূষণের মধ্যে থাকে, বা সে যদি অতিরিক্ত আওয়াজের মধ্যে থাকে তাহলে আস্তে আস্তে তার মধ্যে insanity এসে যাবে, আরও যেটা ভয়ঙ্কর তা হল, এদের মস্তিষ্কের extra ordinary সেন্টারটা আর খুলবেই না, কারণ ওটা আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। এই জন্য দেখা যায় যারাই কোন কিছুতে বিরাট উন্নতি করছে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, সাহিত্যে অমর সৃষ্টি যখন হয় সেই সময় কোন না কোন ভাবে এনারা silence এ চলে যান। বেশি শব্দের মধ্যে থাকলে extra ordinary টাই চাপা পড়ে যায়। যারা খুব আওয়াজের মধ্যে থাকে তারা কখনই কোন বড় কাজ করতে পারে না, একেবারেই সম্ভব নয়।

এই যে জন ন্যাশের কথা বলা হচ্ছে, এর স্ত্রী তাকে খুব ভালোবাসত। কিন্তু যখন তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, একটা অবস্থাতে গিয়ে সে নিজেও বুঝে গিয়েছিল যে আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। ঠিক সেই সময়ে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। অদূর ভবিষ্যতে এটাই হবে। দিন এগিয়ে আসছে, যখন দেখবে স্বামীর সব ঠিকঠাক আছে তখন সব ভালোমতই চলবে। যেদিন দেখবে স্বামীর কোন কিছুর ঘাটতি হয়ে গেছে, সে যে কোন ব্যাপারেই হোক না কেন, টাকা পয়সা কমে যাচ্ছে, সমাজে প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছে, শারীরিক মানসিক সমস্যা এসে যাচ্ছে, ঐ মুহূর্তেই ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাবে। কৌশল্যা তাই বলছেন – হে সীতে, অসতী হচ্ছে এরাই, যারা স্বামীকে দুর্দিনে ছেড়ে চলে যায়, তোমার স্বামীর দুর্দিন এসে গেছে, কিন্তু তুমি শ্রীরামকে ছাড়লে না।

কৌশল্যা বলছেন – **এষ স্বভাবো নারীণামনুভূয়ঃ পুরা সুখম্। অল্পামপ্যপদং প্রাপ্য দুষ্যন্তি প্রজহাতি।।**২/৩৯/২১। যারা দুষ্টা নারী, তাদের এটাই স্বভাব। স্বামীর ভালো সময়ে খুব করে, প্রাণভরে আচ্ছা করে ভোগ করে, আর যখনই দুর্দিন আসবে তখন স্বামীকে ছেড়েই শুধু দেবে না, এমন যাচ্ছেতাই ভাবে দোষারোপ করবে, যেন স্বামীকে একই ফাঁসিকাঠে দুবার মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে। একদিকে তো বেচারা এত কষ্টে পরে গেছে তার ওপরে তার স্ত্রী এসে গঞ্জনা দিতে থাকবে। এখানে কৌশল্যার মুখ দিয়ে বাল্মীকি অসতী নারীর বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। এই দুটো বৈশিষ্ট্য বলে দিলেন। এরপরে বলছেন – **অসত্যশীলা বিকৃতা দুর্গা অহৃদয়াঃ সদা। অসত্যঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ক্ষণমাত্রবিরাগিণঃ।।**২/৩৯/২২। *অসত্যশীলা*, কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলবে, *বিকৃতা*, যদিও বিকৃত কথার অর্থ করা হয় যারা দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু ভাষ্যকাররা বিকৃত কথার অর্থ করছেন যারা সত্যকে বিকৃত চেষ্টা করে, যে চেষ্টার মধ্যে সাধুচিতো প্রচেষ্টা থাকে না। আর বলছেন *দুর্গা*, অসতীরা হচ্ছে দুর্গা, এখানে দুর্গার অর্থ করা হচ্ছে যেসব নারী দুষ্ট পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখে। এটাই সংস্কৃত ভাষার মহাসমস্যা। আমরা যদি কোন মেয়েকে বলি দুর্গা তখন বোঝা মুশকিল হয়ে যাবে যে তার প্রশংসা করছি না নিন্দা করছি। দুর্গার একটি অর্থ যিনি দুর্গ গুলিকে ভাঙ্গেন, রাক্ষস, অসুরদের যে কঠিন দুর্গ ছিল, সেগুলো যিনি ভেঙ্গে দেন তাকে দুর্গা বলা হয়। দুর্গার আরেকটি অর্থ হচ্ছে দূঃ গা, মানে বাজে লোকেদের কাছে যে যায়। *অহৃদয়াঃ* – যাদের হৃদয়টা স্বামীর প্রতি সব সময় শুকিয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় লাইনেও *অসত্যঃ* বলা হচ্ছে। আগে ছিল অসত্যশীলা, এই অসত্যের অর্থ হচ্ছে যে

নারী কথায় কথায় পর পুরুষের কাছে চলে যায়। *পাপসঙ্কল্পাঃ* – যে কাজ গুলো পাপকর্ম, সব সময় সেই কাজগুলোর পরিকল্পনাই মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। *ক্ষণমাত্রবিরাগিণঃ* – কথায় কথায় স্বামীর কাছ থেকে মনটা সরে যাবে, স্বামী একটু দোষ করল তো আর কথা নেই। হয়তো দেখাচ্ছে স্বামীর প্রতি কি ভালোবাসা, যেই একটু দোষ দেখল সাথে সাথে সব ভালোবাস উড়ে গিয়ে মুখ দিয়ে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বেরোতে শুরু করবে। কখন যে স্বামীর প্রতি ভালোবাস আসবে আর হঠাৎ কখন যে স্বামীর উপর রেগে যাবে বোঝাই যাবে না। এরাই হল প্রকৃত অসতী। এগুলো কবেকার কথা? বাল্মীকি, যিনি একজন বিরাট ঋষি ছিলেন, চার-পাঁচ হাজার বছর আগে ঋষি এই কথা লিখে গেছেন। আজকাল যা আমরা চারিদিকে দেখছি এগুলো নতুন কিছু নয়, সমাজ এই রকমই ছিল, এই রকমই থাকবে।

কৌশল্যা বলছেন – **ন কুলং ন কৃতং বিদ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ। স্ত্রীণাং গৃহ্নাতি হৃদয়মনিত্যাহৃদয়া হি তাঃ।।**২/৩৯/২৩। এই ধরণের যারা দুষ্টা নারী, এদেরকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। কি কি জিনিষ এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা? বাল্মীকি বলছেন – *ন কুলং* – উত্তম কুল, স্বামী যদি উত্তম বংশের হয় তাও সে বশে আনতে পারবে না। *ন কৃতং* – তাকে ভালো কিছু করে দিলেও বশে আনা যাবে না, কোন গরীব মেয়ে ছিল তাকে ছেলের বউ করে সংসারে নিয়ে এসেছেন, তাই বলে সে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে তা কখনই হবে না। *বিদ্যা* – তাকে যদি আপনি বিদ্যা দান করেন, বা আপনি হয়তো বিরাট পণ্ডিত, আপনার সামনে সবাই মাথা নত করে, কিন্তু সে আপনাকে দেখে সম্মান জানাবে না, অর্থাৎ বিদ্যার প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা নেই। *ন দত্তং* – আপনি তাকে বছরের পর বছর প্রচুর জিনিষ পত্র দিয়েও তাকে শোধরাতে পারবেন না, তাকে মনের মত জিনিষ দিয়েও তাকে খুশি করতে পারা যাবে না। *সংগ্রহঃ* – স্বামী তাকে ভালোবেসে আপন করে নিয়েছে, স্ত্রীর সুখ্যাতি করেও তার মন পাবে না। এখানে দুষ্টা স্ত্রীর স্বভাব নিয়ে বলা হচ্ছে, সমগ্র নারী জাতিকে নিয়ে বলা হচ্ছে না। বাল্মীকি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক। ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ করে কবিতার মাধ্যমে মানুষের মনের বিশ্লেষণ কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, এই ধারণাটা বাল্মীকিই প্রথম করে দেখিয়েছেন। অসতী স্ত্রী কি ধরণের আচরণ করেন বর্ণনা করে এবার সতী স্ত্রীর আচরণ কি রকম হবে বলছেন।

যারা সতী স্ত্রী, ভালো নারী যারা, তারা সব সময় সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, সব সময় সদাচারে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন আর শাস্ত্রের কথাকেই সর্বদা অনুসরণ করেন। শীল – এক একটা পরিবারের এক এক ধরণের সংস্কার ও ধারা থাকে, সব পরিবারের সংস্কার এক রকম হয় না, সতী স্ত্রীরা যে পরিবারে থাকেন সেই পরিবারের মর্যাদানুযায়ীই সব কিছু পালন করে পারিবারিক সংস্কার ও ধারা বজায় রাখেন। তাঁদের জন্য – **স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে।।** ২/৩৯/২৪। এই সব পবিত্র নারীদের কাছে স্বামীই দেবতা। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে এই দৃষ্টিভঙ্গী, স্বামীকে দেবতা রূপে দেখা, এই ধারণাটা আমরা প্রথম পাই বাল্মীকি রামায়ণে। পরে মহাভারতে এসে এই ধারণাগুলি আরও বিস্তৃত ভাবে প্রসার লাভ করেছে। পুরাণে এগুলোকে আরও বিস্তার করা হয়েছে। কিন্তু উপনিষদে কিছু কিছু ধারণা থাকলেও পতি পরমেশ্বর এই ধরণের কোন ধারণা পাওয়া যায় না, সেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ধর্মের বিভিন্ন উপাচারের অংশীদার। আমি যদি তোমাকে সাহায্য করি তবেই তুমি স্বর্গে যেতে পারবে। তবে উপনিষদ পুরোপুরি আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, তাই সেখানে ধর্মীয় উপাচারের আলোচনা নেই। যতটুকু যাও পাওয়া যাবে তা শুধু বৃহদারণ্যক উপনিষদেই একটু পাই। তবে হিন্দু ধর্মের যা কিছু ধারণা আমরা আজকে পাচ্ছি, তার শেকড় কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণেই পাই।

কৌশল্যা এই সব বলার পর সীতাকে বলছেন – আমার সন্তান শ্রীরামচন্দ্র এখন জঙ্গলে যাচ্ছেন, সম্পত্তি থাকুক আর নির্ধনই থাকুন তুমি কিন্তু তোমার স্বামীকে কখনই ছেড়ে চলে যেও না, পতির সেবা যত্ন করার দিকে নজর রেখো।

সীতা অত্যন্ত রূপসী, এখন তাঁর পছন্দ মত মানান সই সব অলংকারদি নিয়ে তিনি রথে উঠেছেন। অন্য দিকে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আগেই আদেশ দিয়েছিলেন যে কি কি অস্ত্র সঙ্গে নিতে হবে। লক্ষ্মণও সেই অনুযায়ী সব কিছু নিয়ে তৈরী হয়েছেন জঙ্গলে যাবার জন্য। তিন জনকে নিয়ে রথ রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে অযোধ্যা নগরীর রাজপথ ধরে জঙ্গলে চলেছেন। সেই দৃশ্য দেখে অযোধ্যা নগরীর সব লোক চোখের জল ফেলছেন। বাল্মীকি যে কত বিরাট একজন কবি এই দৃশ্যের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। অযোধ্যাবাসীরা সবাই কাঁদছেন, কি রকম কান্না তাদের তার এক বিশাল বর্ণনা দিয়েছেন বাল্মীকি। যেমন বলছেন – **নির্গচ্ছতি মহাবাহৌ রামে পৌরজনাশ্রুভিঃ**।২/৪০/৩৩। শ্রীরামচন্দ্র যখন বেরোচ্ছেন তখন অযোধ্যা নগরবাসীদের চোখ থেকে এমন জল পড়তে শুরু করেছে যে অযোধ্যা নগরের যত ধুলো উড়ছিল সেই চোখের জলে সব সিক্ত হয়ে বসে গেছে। এগুলোই ঠিক ঠিক কবির কল্পনা আর কাব্যিক বর্ণনা। আর মহিলাদের চোখ থেকে যে জল বেরোচ্ছে তার উপমা দিয়ে বাল্মীকি বলছেন – পুকুরে পদ্ম পাতার উপর জল জমে থাকে, আর মাছ গুলো যখন লাফায় তখন পদ্ম পাতা থেকে যেমন একটু একটু করে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে, ঠিক তেমনি মহিলাদের চোখ যেন পদ্ম পাতা সেই পাতা থেকে জল ঝরে পড়ছে। এর পরে একের পর এক বলে যাচ্ছেন কৌশল্যা কাঁদছেন, সুমিত্রা কাঁদছেন, আরও যারা রাজমহলের মহিষীরা ছিলেন তাঁরাও কাঁদছেন, অযোধ্যা নগরীর সব নাগরিকরা রথের সাথে সাথে চলেছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে তো আর আটকান যাবে না, তিনি তাঁর সত্যে অবিচল। এইভাবে চলতে চলতে উনি প্রথমে তমসা নদীর তীরে এসে দাঁড়ালেন। এই তমসা নদীর উল্লেখ প্রথম পাই বালকাণ্ডে যেখানে বলা হয়েছিল যে এই তমসা নদীর তীরেই বাল্মীকির আশ্রম ছিল।

তমসা নদীর তীরে প্রথম রাতটা কাটাবেন। এদিকে অযোধ্যাবাসীরাও শ্রীরামচন্দ্র, সীতা আর লক্ষ্মণের সাথে সাথে চলে এসেছেন। সবাই ঠিকই করে নিয়েছিলেন যে আমরাও শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে জঙ্গলে চলে যাব। তখন শ্রীরামচন্দ্র মধ্য রাত্রে সবাইকে নিদ্রিত অবস্থায় রেখে তমসা নদীকে পার করে ওপারে চলে গেলেন। সকালে উঠে সবাই দেখে শ্রীরামচন্দ্র নেই। তখন তারা আবার কাঁদতে কাঁদতে অযোধ্যাতেই ফিরে এসেছেন। এখানেও বাল্মীকি খুব সুন্দর বর্ণনা করে বলছেন শ্রীরামচন্দ্রের অদর্শনে সবার মনের মধ্যে কি রকম কষ্ট হচ্ছিল। আমরা যা বর্ণনা পাই তাতে দেখা যাচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র সেখান থেকে আস্তে আস্তে এলাহাবাদের দিকে চলে আসেন। কারণ শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গাকে এলাহাবাদের কাছে প্রয়াগে এসে পাচ্ছেন। বাল্মীকি এখানে গঙ্গার খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন। বলছেন – গঙ্গা নদী যখন পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, হাওয়া দিচ্ছে, সব মিলিয়ে গঙ্গার চারিদিক থেকে যে শব্দ হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যেন গঙ্গা অট্টহাস্য করছে। কোথাও তার জল নিশ্চল, কোথাও তার জল গভীর, কোথাও বেগে ধাবমান, কোথাও ধীর স্থির গতি, এইভাবে তিনি গঙ্গার এক দুর্ধর্শ বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন।

এরপরে শ্রীরামচন্দ্র এসেছে নিষাদরাজ গুহকের কাছে। নিষাদরা ছিল তখনকার দিনের আদিবাসী, যারা বন জঙ্গলে থাকত, আর গুহক ছিল তাদের স্বাধীন রাজা। নিষাদরাজ গুহকের সাথে শ্রীরামচন্দ্রের আগে থেকেই বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীরামচন্দ্র নিজের রাজ্য থেকে এইভাবে জঙ্গলে চলে এসেছেন দেখে গুহকের মনে খুব কষ্ট হল। নিষাদরাজ তখন নানা ভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন, কিভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে বাগিয়ে নিয়ে তাঁকে এখান থেকেই অযোধ্যাতে ফেরত পাঠান যায় বা এখানেই তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিয়ে তাঁর জঙ্গলে যাওয়াটাকে আটকান যায়। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র নিষাদরাজের কোন কথাতেই সায় দিচ্ছেন না। শেষে গুহক তার লোকজনদের আদেশ করলেন একটা বড় নৌকা নিয়ে আসার জন্য। গুহক মাঝিদেরও নেতা ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র এলাহাবাদের কাছাকাছি কোথাও গঙ্গার তীরে আছেন। বড় নৌকা আনা হয়েছে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা আর লক্ষ্মণকে গঙ্গা পার করে দেবার জন্য। নৌকা গঙ্গার মাঝামাঝি এসেছে, তখন সীতা হাতজোড় করে মা গঙ্গাকে প্রণাম করছেন। গঙ্গাপূজা আমরা কিন্তু বেদ বা উপনিষদে পাইনা। গঙ্গাকে পূজা করা, গঙ্গাস্তোত্র প্রথম কিন্তু বাল্মীকির কাছেই পাচ্ছি। বেদ উপনিষদে আমরা পূজা পার্বণের যেটুকু আভাস

পাই তাতে কিন্তু তখনকার দিনের পূজা উপাচার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা যায় না। কিন্তু তখনকার সময়ের যত আঞ্চলিক পূজা আর্চা, স্থানীয় সব লোক কাহিনী যত ছিল, বাল্মীকি এগুলোকে সংগ্রহ করে এই রামায়ণে উপস্থাপনা করেছেন।

গঙ্গার মাঝখানে এসে হাতজোড় করে সীতা গঙ্গার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বলছেন ‘হে মা গঙ্গে, আমার পাশে যিনি বসে আছেন ইনি হলেন রাজা দশরথের সন্তান শ্রীরামচন্দ্র। পিতার আদেশ পালন করার জন্য তিনি চৌদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে যাচ্ছেন। হে মা গঙ্গে! তোমার কাছে প্রার্থনা করি – **পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য ধীমতঃ। নিদেশং পালয়ত্বেনং গঙ্গে ত্বদভিরক্ষিতঃ।**।২/৫২/৮৩। মা, তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে তিনি যেন পিতার আদেশ ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে পারেন। এটাই হয়, মানুষ যখন খুব দুঃখ-কষ্টে পড়ে যায়, বিশেষ করে যে কষ্টে পড়ে যায় সে বেশি ছটফট করে না, কিন্তু তার আশেপাশে যারা থাকে, যারা তাকে স্নেহ করে, ভালোবাসে, তাদের ছটফটানিটা অনেক বেশি। যার ক্যান্সার হয়েছে, সে হয়তো মৃত্যুকে মেনে নিয়েছে কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনরা কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে ওঠে।

সীতা প্রার্থনা করছেন – চৌদ্দ বছর যখন অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন শ্রীরামচন্দ্র আমাকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে আসবেন, আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি সেদিন তোমাকে আমি বিশেষ ভাবে পূজো দেব। কেন করব? এই যে আপনি আমাকে ঠিক ঠিক ভাবে ফেরত নিয়ে এসেছেন – **ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্মলোকং সমক্ষসে।**২/৫২/৮৬। সীতা বলছেন হে দেবী তুমি তো তিন পথে চলে। বলা হয় গঙ্গা স্বর্গে আছে, মর্ত্তে প্রবাহিত হচ্ছে আর পাতালেও নাকি প্রবাহিত হয়, সেইজন্য গঙ্গাকে *ত্রিপথগা* বলা হয়। সীতা বলছেন – যখন আমরা সবাই ফেরত আসব, মা তখন তোমার কাছে শুধু যে আমরা মাথা নতই করব তাই নয় – **গবাং শতসহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্। ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চিকির্ষয়া।**।২/৫২/৮৮।। মা গঙ্গে! যত ব্রাহ্মণ আছেন তাঁদেরকে আমি লক্ষ লক্ষ গরু, বস্ত্র আর অন্যান্য জিনিষ তোমার নাম করে দান করব। আর তোমাকে যে বিশেষ ভাবে পূজা দেব তাতে আমি – **সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন।**২/৫২/৮৯। বাল্মীকি রামায়ণের এই শ্লোকটি খুব বিতর্কিত শ্লোক। সীতা মা গঙ্গাকে বলছেন যে আমরা যদি নিরাপদে চৌদ্দ বছর বনে কাটিয়ে ফিরে আসতে পারি তাহলে তোমার পূজা করব। এখন সীতা কিভাবে পূজা করবেন মা গঙ্গাকে? বলছেন শত শত কলস ভর্তি মদ আর মাংস ও ভাত দিয়ে তোমাকে পূজা করব।

বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে এই শ্লোকটি এক বিরাট সমস্যায় ফেলে দেয়। মা সীতা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে গঙ্গা পার হচ্ছেন আর মাঝ গঙ্গায় গিয়ে মা সীতা গঙ্গা মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করছেন, মা আমরা যদি ভালো ভাবে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি তোমাকে ঘটি ঘটি মদ আর হাড়ি হাড়ি মাংস আর ভাত অর্পণ করব। শ্রীরামচন্দ্র বৈষ্ণবদের ইষ্টদেবতা, সীতা তাঁদের ইষ্টদেবী। বাল্মীকি রামায়ণের ভাষ্যকার আর অনুবাদকদের কাছে এই শ্লোকটা একটা মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আরও বেশি মাথা ব্যাথার কারণ এই যে, বাল্মীকি রামায়ণে আর মহাভারতে কথায় কথায় এই মাংস শব্দটা আসে।

বৈষ্ণবদের কাছে মাংস আর মদ গুরুতর নিষিদ্ধ বস্তু, তাই অনুবাদকরা সুরার অনুবাদ করলেন *সুরেষু দেবেষু ন ঘটন্তে* – বলছেন দেবতাদেরও যে জিনিষ জোটে না, মানে খুব দামী শরবৎ, এমন সুন্দর পেয়ে বস্তু যেটা দেবতাদের কপালেও জোটে না। এখনকার দিনে কোকাকোলা, থাম্পস আপ যত ঠাণ্ডা পানীয় যা আছে সেটাকেই এনারা সুরা অর্থে অনুবাদ করেছেন। আর মাংসকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করে অনুবাদ করেছেন। একটা জায়গায় বলছেন, মাটিতে আলুর মত এক ধরণের কন্দ জন্মায়, তাকেই এনারা বলছেন মাংস। বাল্মীকি রামায়ণে আর মহাভারতে যেখানে যেখানে মাংস শব্দ এসেছে সেখানে সেখানে গীতা প্রেসের যত অনুবাদ হয়েছে সেখানে তারা অনুবাদ করে দিলেন যেন ভাত আর আলু সেদ্ধ। মা সীতা হলেন রাজরানী, তিনি মা গঙ্গাকে ভাত আর আলু সেদ্ধ কেন দিতে যাবেন বোঝা যায় না। এটাই সংস্কৃত

ভাষার এক বিরাট সমস্যা। মাংস বলতে কি বোঝায়? পাঠার মাংস না আলু সেদ্ধ? গীতা প্রেস থেকে যত অনুবাদ হয়েছে সেখানে মাংস কথা যত বার এসেছে তারা সেটাকে মিষ্টি আলু বলে চালিয়ে দিয়েছেন। পরের দিকে আরও সমস্যা হয়ে যাবে যখন বলবে শ্রীরামচন্দ্র একটি কালো হরিণ শিকার করে নিয়ে এসেছেন, আর সেই হরিণের মাংস রান্না করা হয়েছে। এটাকেও এরা এমন ভাবে অনুবাদ করে দিয়েছে যে এক ধরণের কালো রঙের কন্দকে শ্রীরামচন্দ্র নিয়ে এসেছেন, সীতা সেটাকে পুড়িয়ে চটকে রান্না করেছেন।

আসলে ভারতবর্ষে হিন্দুরা, এমনকি ব্রাহ্মণরাও আগে মাংসভোজী ছিলেন। কিন্তু যারা উচ্চমানের যোগী পুরুষ ছিলেন তাঁরা কিন্তু মাংস ভক্ষণ থেকে সব সময় দূরে থাকতেন, কারণ যোগ সাধনা করে করে তাঁদের শরীর এমন হয়ে যেত যে, সেই শরীর মাংস গ্রহণ করতে পারত না। আর পরের দিকে বৌদ্ধরা নিয়ে এল অহিংস ধর্ম, যেখানে পশুবধ তাদের কাছে অধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে পরের দিকে যত ধর্মগ্রন্থ লেখা হয়েছে সেই সব শাস্ত্রে মাংস, ডিম জাতীয় আমিষ খাদ্যের উল্লেখ বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য দিকে ভারতে মাংসের যে পরম্পরাটা থেকে গেল তখন তারা এই মাংসাদিকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন যারা তন্ত্র সাধনা করছেন তাদের জন্য, আর বাকী সবাইকে বানিয়ে দেওয়া হল নিরামিশাষী। কিন্তু আসল ঘটনা হল ভারত প্রথম থেকেই মাংসভোজী ছিল।

আরেকটা ব্যাপার আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, বাল্মীকির মত ঋষি কখনই কূট শ্লোক ব্যবহার করবেন না। ব্যাসদেবই বলুন, বাল্মীকিই বলুন, এনারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কখনই কূট শ্লোক ব্যবহার করতেন না। কূট শ্লোক মানে জেনে শুনে কখন কোন সংশয় তৈরী করে দেওয়া। মহাভারতে কয়েকটি শ্লোককে কূট শ্লোক বলে গণ্য করা হয়, সেখানে কূট শ্লোকের অর্থ হচ্ছে গভীর, তত্ত্বের দিক থেকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু সেখানে কোন সংশয় তৈরী করার জন্য কোন শব্দকে ব্যবহার করা হত না, মানে বলতে চাইছে একটা জিনিষ কিন্তু লেখার সময় অন্য একটা জিনিষ বলছে, আর ইচ্ছে করে পাঠক পাঠিকাকে অন্য দিকে নিয়ে যাবে, এই ধরণের কাজ বাল্মীকি আর ব্যাসদেব কখনই করবেন না। বাল্মীকি এখানে পরিষ্কার সুরা বলতে যা বোঝায়, মাংস বলতে যা বোঝায়, সেই শব্দটাকেই ব্যবহার করছেন অথচ এর দুটো শব্দের অর্থ অন্য রকমের হবে, এই জিনিষ এনারা কখনই করবেন না। বাল্মীকি কোথাও বলছেন না যে মাংস হচ্ছে এক ধরণের কন্দ, অথচ যখন কন্দের কথা আসবে তখন আবার কন্দকে কন্দই বলছেন। কিন্তু মানুষের মনের ভাব বিভিন্ন রকমের, বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীরামের ভাব এক রকম, তাদের কাছে শ্রীরামকে মাংসভোজী বললে তাদের ভাবের হানি হয়ে যাবে, তাই যারা এইভাবে অনুবাদ করেছেন তারাও কিছু যে ভুল করেছেন তা নয়। ঠাকুর বলছেন বাড়িতে মাছ এসেছে, মা দেখছেন তার পাঁচ ছেলের পাঁচ রকমের পছন্দ, তাই কারুর জন্য মাছের কালিয়া, কারুর জন্য মাছ ভাজা, কারুর জন্য মাছের শুক্তো ইত্যাদি করলেন। গুজরাটের লোকেরা মাছ মাংসের নাম শুনলেই আঁতকে ওঠে। এখন আমাদের কথামৃতের যে গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে সেখানে এই মাছকে অনুবাদ করেছে বেগুন বলে – কারুর জন্য বেগুনের ঝাল, কারুর জন্য বেগুন ভাজা, কারুর জন্য বেগুনের শুক্তো ইত্যাদি। লোকের মনের যে ভাব, অনুবাদ করার সময় তাদের সেই মনের ভাব সব সময় মাথায় রেখে অনুবাদ করতে হয়। স্বামীজী বারবার করে বলছেন – ঠাকুরের কথা যখন ভক্তদের সামনে বলা হবে তখন কিন্তু ভক্তদের ভাবকেও মাথায় রাখতে হবে। ভাবতে হবে ঠাকুর নিজে যদি তখন থাকতেন তখন তিনি কি করতেন। যেমন কথামৃতে ঠাকুরের যে সব ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, ঐ ধরণের ভাষা তিনি মেয়েদের সামনে কখনই ব্যবহার করতেন না। মানুষ যখন যে স্থান কাল পাত্রে থাকে তখন সেই অনুসারেই কথা বলে। এখন সেই কথা গুলোই যখন ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে যাবে তখন সেই কথাগুলোকে উপস্থাপন করবার সময় সেই স্থান, কাল ও পাত্র বিচার করে একটু ভেবে চিন্তে উপস্থাপন করতে হয়।

স্বামীজীর বক্তৃতা যখন অনুবাদ হচ্ছিল তখন আলেকজাণ্ডার নামে এক অনুবাদকের সাথে স্বামী বিরজানন্দের কিছু কিছু জিনিষের অনুবাদের ক্ষেত্রে অনেক মত পার্থক্য হয়েছিল। স্বামী বিরজানন্দজী

বলছেন আমাদের যে হিন্দু শাস্ত্রের পরম্পরা তার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বামীজীর এই কথা এই ভাবে অনুবাদ হবে। আলেকজাণ্ডার, যিনি স্বামীজীকে জানতেন, তাঁর অনেক সঙ্গ করেছেন, তিনি বলছেন – স্বামীজী কখনই এই ভাষা প্রয়োগ করবেন না। যেমন সংস্কৃতে আছে – সা বিদ্যয়া বিমুক্তয়ে, বিদ্যা সেটাই যে বিদ্যা মুক্তি প্রদান করে। স্বামীজী এই কথার ইংরাজী অনুবাদ করলেন Education is the manifestation of the perfection all ready in man, এই কথার সাথে সংস্কৃত শ্লোকটির কোন সম্পর্কই নেই। কঠোপনিষদে আছে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্য নিবোধত, স্বামীজীর এর অনুবাদ করলেন Arise awake and stop not till the goal is reached. আদপেই কিন্তু কঠোপনিষদের মন্ত্রে এই কথা বলা হচ্ছে না। স্বামীজী কি করছেন? তার ভাবের অনুবাদের সাথে সাথে ভাষ্যটাও বলে দিচ্ছেন। স্বামীজী ছিলেন একজন প্রকৃত ঋষি, তাই উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত এই মন্ত্রের যে মূল ভাব তাকে অক্ষুন্ন রেখে একটা নতুন দিককে উন্মোচন করে দিচ্ছেন। স্বামীজীর অনুবাদটাই যেন মন্ত্রের ভাষ্য হয়ে এই মন্ত্রের ভাবকে আরও সমৃদ্ধ করে দিচ্ছে। স্বামীজী যেভাবে অনুবাদ করেছেন তা সাধারণের পক্ষে করা সম্ভবই হবে না। এখানে যে মাংস সুরাকে কায়দা করে অর্থটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে এটা কোন দোষের নয়।

আরেকটা ব্যাপার হল সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃতের একটা শব্দের অনেক রকম অর্থ হয়। যেমন আমরা এর আগে দুর্গা শব্দের অর্থ দেখলাম, দুর্গা মানে মা দুর্গা, দুর্গা মানে যে দুর্গ জয় করেছেন, আবার দুর্গা মানে যারা দুষ্ট পুরুষের কাছে যায়। তাই কাউকে যদি দুর্গা বলা হয় তখন তাকে প্রশংসা করছে না নিন্দা করছে বোঝাই যাবে না। সংস্কৃত ভাষার এটি এক মারাত্মক সমস্যা, সেইজন্য যার যেমন খুশি নিজের মনের মত করে অনুবাদ করে দিয় যাচ্ছেন।

এবার শ্রীরামচন্দ্র ঠিক ঠিক নিজের রাজ্য থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। গঙ্গার ওপারে চলে যাওয়ার পর শুরু হয়েছে অন্য এক অচেনা রাজ্য। এবার শ্রীরামচন্দ্রের মনে খুব কষ্ট অনুভব হতে শুরু হয়েছে। তিনি চিরদিনই সুখ সাচ্ছন্দে লালিত পালিত হয়ে এসেছেন, শারীরিক কষ্ট কাকে বলে তিনি কখন অনুভব করেননি। কিন্তু এখন তাঁকে মাটিতে শুতে হচ্ছে, এছাড়া তো এখন আর কোন উপায় নেই। অজানা অচেনা রাজ্যে তিনি কোথায় কি পাবেন! এর আগের দিন তাও নিষাদরাজ কিছু ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, এখন তো তিনি গঙ্গা পেরিয়ে এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্র খুব দুঃখ করে লক্ষ্মণকে বলছেন – দ্যাখো, কৈকেয়ি তো আমাদের কায়দা করে সরিয়ে দিল, বাবাকে রক্ষা করার জন্য আমরা এখন আর কিছুই করতে পারব না। ভরতের নিষ্কন্টক রাজ্য ভোগের জন্য এক্ষুনি তাকে রাজা করতে গিয়ে কৈকেয়ি আমাদের বাবাকে না মেরেই বসে। বাবা এখন সত্যিই অনাথ হয়ে গেছেন, তার উপর তাঁর এখন বৃদ্ধাবস্থা, আমরাও কাছে নেই, কে তাঁকে রক্ষা করতে আসবে কে জানে! তবে কি ভাই লক্ষ্মণ জানো, আমার উপরে এই যে বিপদ এসেছে, আর বাবার মনের এই বিচিত্র ভ্রান্তি দেখে আমার মনে হচ্ছে ধর্ম আর অর্থের থেকে কামের শক্তি অনেক বেশি। শ্রীরামচন্দ্রের বক্তব্য হল, আমাদের যে চারটে পুরুষার্থ – ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে মোক্ষের কোন স্থান নেই, ধর্ম, অর্থ আর কামই বাল্মীকি রামায়ণের প্রধান লক্ষ্য। তাই শ্রীরামচন্দ্র সব জায়গায় বলছেন ধর্ম, অর্থ আর কামের সামঞ্জস্য করতে হবে। কিন্তু এখন লক্ষ্মণকে বলছেন – ভাই, চারিদিকের অবস্থা দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে ধর্ম আর অর্থের কোন দাম নেই, আসল শক্তিমান হল কাম। ঠাকুর কথায় কথায় বলছেন কামিনী-কাঞ্চন, কামিনী মানে কাম আর কাঞ্চন মানে অর্থ। এই জগতকে চালাচ্ছে কামিনী আর কাঞ্চন। ধর্ম সাধনের উদ্দেশ্য স্বর্গে যাওয়া আর মোক্ষ সাধন করা হয় মুক্তির উদ্দেশ্যে। এখন ধর্ম আর মোক্ষকে সরিয়ে দিলে থেকে যাচ্ছে কাম আর অর্থ। আমার মতে এই দুটোর মধ্যে কামই শেষ কথা।

আজকের খবরের কাগজে একটা খবরে প্রকাশিত হয়েছে যে বিজ্ঞানীরা artificial life generate করেছে। এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিরাট আলোড়ন পরে গেছে। এই আবিষ্কারের মধ্যে বিজ্ঞানের বায়োলজি যুক্ত আছে আর অন্য দিকে কৃত্রিম উপায়ে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের হিন্দু

ধর্মেরও একটা নিজস্ব মত আছে। বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার হিন্দুদের কাছে কোন সমস্যাই হবে না, কিন্তু এই ব্যাপারে খ্রীশ্চান বা মুসলমানদের কাছে সমস্যা হবে। কেননা হিন্দুদের কাছে যোনি ছাড়া জীবের সৃষ্টি কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে কোন জীবের সৃষ্টিকে কল্পনা করা যায় না। কেননা হিন্দুদের মধ্যে অযোনিজের অনেক উদাহরণ আছে, দ্রোণাচার্য ছিলেন অযোনিজ, সীতা, দ্রৌপদী এনারাও অযোনিজ। হিন্দুদের মধ্যে এই ধরণের ঘটনা ভুরি ভুরি আছে। ব্রহ্মাকে আমাদের আদি সৃষ্টিকর্তা বলা হয়, কিন্তু ব্রহ্মা যখন প্রথম সৃষ্টি করেন তখন মন দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। যখন দেখলেন মন দিয়ে সৃষ্টি করতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে, তখন তিনি প্রজাপতিকে সৃষ্টি করে পুরুষ আর নারীতে আলাদা করে দিয়ে বলে দিলেন তোমরা সৃষ্টি করতে থাক। তিনি দেখলেন এই পদ্ধতিতে সৃষ্টিটা অনেক তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে। সেইজন্য হিন্দুদের কাছে যে কোন পদ্ধতিতে সৃষ্টিটা যদি তাড়াতাড়ি হয়, সেটাকে গ্রহণ করতে তাদের কোন রকম আপত্তি নেই। যোনি হচ্ছে একটা সহজ পথ, কিন্তু ল্যাবোরটরির পথ দিয়ে বা ক্লোনিং যদি করা হয়, মন দিয়ে যখন সৃষ্টি করা হয় তখন এগুলো কঠিন পথ হয়ে যায়। খ্রীশ্চান আর ইসলাম এইখানেই মার খেয়ে যায়, যে কাজগুলো ভগবানের নয় সেই কাজগুলো তারা ভগবানের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। ভগবানের কাজ একেবারেই ভিন্ন, তিনি আছেন বলেই এগুলো হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন কর্মাধ্যক্ষ। এই কথাটাই আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন কর্মাধ্যক্ষ। এই জগতে যা কিছু হচ্ছে তার অধ্যক্ষতাতেই সব কিছু হচ্ছে। রেলওয়েতে এত কাজ হচ্ছে, রেলমন্ত্রী কি গিয়ে সব কাজ করছেন? তিনি রেল দফতরের সমস্ত কর্মের কর্মাধ্যাক্ষ, কিন্তু কাজ অপরে করছে। রেলমন্ত্রী আছেন বলেই সব কাজ হচ্ছে। রেলওয়ে মন্ত্রণালয় যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে রেলের সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। ভগবান ঠিক সেই রকম কর্মাধ্যাক্ষ, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কাজ হচ্ছে। রেলমন্ত্রী আছেন বলেই রেলগাড়ি চলছে, কিন্তু রেলমন্ত্রী নিজে এসে রেলগাড়ি চালাচ্ছেন না। এখন যে কৃত্রিম উপায়ে জীব সৃষ্টির নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে তার জন্য আমরা বলতে পারিনা যে সৃষ্টিকর্তার উপরে খোদগারি করা হচ্ছে। কারণ এটাও তাঁর ইচ্ছেতেই হয়েছে, আসলে তিনি যে সব কিছুর কর্মাধ্যক্ষ। এই জগতে কোন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে কামের বিরাট ভূমিকা, কাম না থাকলে এই জগতের কিছুই সৃষ্টি হত না, কাম দিয়েই সৃষ্টি কার্য চলছে। শ্রীরামচন্দ্র তাই কামকে এত শক্তিমান বলছেন।

শ্রীরামচন্দ্র চোখের জল ফেলে বলছেন – হে লক্ষ্মণ দ্যাখো, আমার বাবার মত এত অজ্ঞ পুরুষ এই জগতে কেউ কী আছে? আমার মত একজন আজ্ঞাকারী সন্তানকে স্ত্রীর প্রতি কাম বশতঃ ত্যাগ করে দিতে পারে! শ্রীরামচন্দ্রের মুখে এই ধরণের সংলাপ আমাদের কাছে অবাক লাগে। সমস্ত রামায়ণ জুড়ে শ্রীরামচন্দ্র অনেক বার নিজের দুঃখকে এইভাবে অভিব্যক্ত করে গেছেন। কিন্তু পরের দিকে গিয়ে যখন শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের মুখে এই ধরণের কথা শোভা পায়না, হয় তিনি তাহলে নাটক করছেন না হলে এগুলো সব ফালতু কথা। কথামৃতের সাথে যদি কোন ধর্মগ্রন্থের মিল থাকতে পারে তাহলে একমাত্র বাল্মীকি রামায়ণের সাথেই মিল পাওয়া যাবে। কিন্তু পুরানাদি শাস্ত্রের সঙ্গে যখন তুলনা করতে যাব তখন কথামৃতের সাথে কোন মিল পাওয়া যাবে না। এই যে অবতারের চোখে জল, এটা একেবারে বাস্তব চিত্র, তবে হ্যাঁ, তিনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে এই সব ব্যাথা বেদনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু সরিয়ে নিলে লীলা পোষ্টাই হবে না, লীলা পোষ্টাই করতে হলে এগুলোকেও দরকার। অক্ষয় মারা যাবার পর ঠাকুর বলছেন – অক্ষয়ের জন্য আমার বুকের ভেতরে যেন গামছা নিঙরোচ্ছে। তবে কি ঠাকুর এগুলো বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলছেন? একেবারেই না। সত্যি সত্যিই ঠাকুরের ভেতরে মৃত্যুজনিত প্রচণ্ড বিয়োগ ব্যাথা হচ্ছে, ব্যাথাটা যেন তার বুককে গামছা নিঙরোনর মত মোচড় দিচ্ছে। কিন্তু তিনি যদি মনটা ওখান থেকে তুলে নেন তাহলে আর গামছা নিঙরাবে না। ঠিক আছে আমি নরেন রাখালের থেকে মন তুলে নিচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাধিতে চলে গেলেন, তাঁর চুল দাড়ি সব সজারুর কাঁটার মত সোজা হয়ে গেল। এর ফলে কি হবে, জগৎ আর চলবে না। যদি জগৎ চালাতে হয় তাহলে এইভাবে চলবে। তখন তাঁর প্রত্যেকটি হাসি, প্রত্যেকটি কান্না একেবারে বাস্তব। কিন্তু আমাদের

যেমন কর্ম সৃষ্টি হয় অবতারের ক্ষেত্রে সেই রকম কোন কর্ম সৃষ্টি হয় না, এটাই অবতারপুরুষ আর সাধারণের একমাত্র তফাৎ।

এইসব বলে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – যাক্, কৈকেয়ি আর ভরতই ভাগ্যবান, তারাই এখন অযোধ্যায় রাজ করুক। আর কৈকেয়িই হচ্ছে ঠিক ঠিক সৌভাগ্যবান স্বামীর সৌভাগ্যবতী স্ত্রী। মানে বলতে চাইছেন আমার সীতার সৌভাগ্য নেই, তাই তাঁকে আজ জঙ্গলে থাকতে হচ্ছে। আর ভরতও সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর স্বামী, সেইজন্য সেই এখন অযোধ্যার রাজা হতে যাচ্ছে, সম্রাটের মত থাকবে। আমার এই রকমই ভাগ্য যে বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তাঁকে ফেলে আমাকে জঙ্গলে চলে আসতে হয়েছে, এবার ভরত বসে বসে ছড়ি ঘোরাবে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – যে মানুষ ধর্ম আর অর্থকে ত্যাগ করে শুধুমাত্র কামকে নিয়ে চলে, তার দুরবস্থা কিন্তু আমার বাবার যেরকম দূরবস্থা হয়েছে সেই রকমই হয়। হে লক্ষ্মণ দ্যাখো, কৈকেয়ী এখন ক্ষমতাশালীনি হয়ে তার মাথা ঘুরে গেছে, কেননা তার ছেলে ভরত এখন রাজা হতে যাচ্ছে। এখন সে যা খুশি করতে পারে, আমার মা কৌশল্যা আর তোমার মা সুমিত্রাকে অনেক কষ্ট দিতে পারে, এমন কি সে তাদের বিষ পর্যন্ত খাইয়ে দিতে পারে। তাই তোমাকে বলছি, আমার কপালে যা আছে হবে, তুমি তাড়াতাড়ি এখান থেকে অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে তোমার মা আর আমার মাকে যে করেই হোক রক্ষা করার চেষ্টা কর। শ্রীরামচন্দ্র নিজে এই কথা বলছেন – **ক্ষুদ্রকর্মা হি কৈকেয়ী দ্বেষদন্যায়মাচরেৎ।**২/৫৩/১৮। হিংসায় বশীভূত হয়ে কৈকেয়ি যে কোন গর্হিত কর্ম করে দিতে পারে, তুমি অযোধ্যা নগরীতে ফিরে গিয়ে আমাদের মায়েদের বাঁচাও।

শ্রীরামচন্দ্রের অন্য একটি কথায় হিন্দু ধর্মের আরেকটি ধারণার উল্লেখ পাচ্ছি। তিনি বলছেন – হে লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই আমার মা আগের জন্মে কোন নারীদের তাদের পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই আমার মার সেই পাপ কর্মের ফলেই আজকে তাঁকে আমার মত পুত্রের বিচ্ছেদ সহ্য করতে হচ্ছে। এই উক্তি যদিও শ্রীরামচন্দ্র মনের তীব্র কষ্ট থেকে করছেন কিন্তু এইটাই পরবর্তি কালে হিন্দু ধর্মে একটা পূর্ণাঙ্গ দর্শন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কারণ এই ধারণাগুলো এর আগে এত বেশি পরিষ্কার ভাবে ছিল না। আমার মা নিশ্চয়ই আগে কাউকে কষ্ট দিয়েছিলেন বলে আজকে তাঁকে এই কষ্ট পেতে হচ্ছে। এই ধারণাটা সত্যি কি মিথ্যে আমরা বিচার করতে পারিনা, তবে ঠাকুরও বলেছেন যে যেকালে অনেকে বলেছে তাহলে সত্যি হবে, কিন্তু ঠাকুর কোথাও এর উপরে জোর দিচ্ছেন না। বাল্মীকি রামায়ণ থেকেই এই ধারণাটা শুরু হয়। কি সেই ধারণা? আমি যে এখন কষ্ট পাচ্ছি, এই জন্মে আমি এমন কিছু করিনি যার জন্য এই কষ্টটা আমাকে এখন পেতে হচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি এর আগের জন্মে এমন কিছু করেছিলাম যার ফলে এখন এই কষ্টটা পাচ্ছি।

শ্রীরামচন্দ্র আবার বলছেন – আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি কোন মা যেন আমার মত সন্তানকে জন্ম না দেয়, যে বুড়ো বয়সে নিজের মাকে এইভাবে কষ্ট দিচ্ছে। আমি যে এভাবে বেরিয়ে এসেছি তাতে আমার মা যে অসহায় হয়ে গেছে, মার সেবা করতে পারলাম না, আমি হলাম মায়ের অভাগা সন্তান। শ্রীরামচন্দ্র দুঃখের চোটে এইভাবে কথা বলছেন। তিনি কাকে কাকে সমালোচনা করছেন? নিজের বাবাকে, কৈকেয়িকে, কৌশল্যাকে, নিজেকে। সবাইকে পরের পর দোষারোপ করে যাচ্ছেন, কাউকেই বাদ দিচ্ছিন না। নিজের কপাল, পুরুষার্থ সব কিছুর উপর দোষারোপ করে যাচ্ছেন।

শ্রীরামচন্দ্র এবার অন্য ভাবে বলছেন – হে লক্ষ্মণ, আমি যদি রেগে যাই ইচ্ছে করলে আমি সমস্ত ভূমণ্ডলকে নিজের অধীনে নিয়ে আসতে পারি, অযোধ্যা আর কি। কিন্তু আমি জানি পারলৌকিক হিত সাধনের জন্য, স্বর্গলোক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই ধরণের কর্ম কোন কাজে আসে না। সেইজন্য আমি এই কাজ কখনই করতে যাব না। **এতদন্যচ্চ করুণং বিলপ্য বিজনে বহু। অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তূষ্ণীমুপাবিশৎ।**।২/৫৩/২৭। শ্রীরামচন্দ্র এই সময় এই ধরণের অনেক কথা বলতে বলতে করুণায় বিলাপ

করছেন আর তাঁর বদন অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে মুখটা বিষাদে ভরে গেছে, আর চুপচাপ বসে আছেন। রাত অনেক হয়ে গেছে তবুও তিনি ঘুমোতে যাচ্ছেন না।

তখন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন – দাদা, আপনি এই ধরণের বিলাপ করবেন না। আপনি যেভাবে বিলাপ করে নিজেকে সন্তপ্ত করছেন এ জিনিষ আপনার মত মানুষে শোভা পায়না। এসব কথা বলে এবং আপনি নিজে সন্তপ্ত হয়ে সীতা আর আমার মনে খুব কষ্ট দিচ্ছেন। আপনার মুখের দিকে তাকিয়েই আমার এতটা পথ পেরিয়ে এসেছি, এতটা এসে আপনিই যদি নিজে খেদ করতে থাকেন তাহলে আমাদের কি হবে ভেবে দেখেছেন! আপনি যদি এই রকম আচরণ করেন তাহলে আমাদের খুব মুশকিল হবে, এটাকে ভবিতব্য বলে মেনে নিন। এইসব বলে লক্ষ্মণ শয্যা তৈরী করে দাদাকে শান্ত করে শুইয়ে দিল। অধ্যাত্ম রামায়ণ কিংবা রামচরিতমানসে আমরা এই ধরণের দৃশ্য একেবারেই পাইনা। কিন্তু বাস্তবে শ্রীরামচন্দ্র খুবই কষ্ট পেয়েছেন আর তাঁর বহিঃপ্রকাশও করেছেন। পরের দিকেও শ্রীরামচন্দ্রের এই ধরণের কষ্ট পাওয়া আর বিলাপ করার দৃশ্য আসবে।

এরপরে শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থল পার করে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন। সেখান থেকে তাঁরা আস্তে আস্তে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সীতা যেখানে যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে কোন মাহাত্মপূর্ণ স্থান দেখলে বা কোন বিগ্রহ আছে দেখলে সেখানেই তিনি প্রার্থনা করছেন। এই রকম একটা জায়গায় শ্যামবট বলে একটা বিশাল বট বৃক্ষ ছিল, তাঁর কাছে গিয়েও সীতা হাতজোড় করে প্রার্থনা করছেন, সেই রকম যখন যমুনা পার হচ্ছেন সেখানেও গঙ্গার কাছে যেভাবে প্রার্থনা করেছিল যমুনার কাছেও প্রার্থনা করছেন – হে মা যমুনা আমরা যদি ঠিক ঠিক ফিরে আসতে পারি তাহলে তখন তোমার নামে আমি এত গরু দান করব ইত্যাদি।

শ্রীরামচন্দ্র, সীতা আর লক্ষ্মণ যখন যাচ্ছেন তখন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন ‘হে লক্ষ্মণ, তুমি সীতাকে নিয়ে এগিয়ে এগিয়ে চল, আর আমি তোমাদের পশ্চাতে ধনুর্বাণাদি অস্ত্র নিয়ে সব দিক রক্ষা করতে করতে এগোচ্ছি। পথে যেতে যেতে সীতা যা যা ফল চাইবে, যা যা ফুল চাইবে, যা কিছু তার পছন্দ হবে তুমি সব কিছু সঙ্গে সঙ্গে আহরণ করে এনে দিও’। তিনজনে চলেছেন আগে আগে লক্ষ্মণ, মাঝখানে সীতা আর সবার শেষে শ্রীরামচন্দ্র। যেতে যেতে যা কিছু সীতার নজরে আসছে সবিস্ময়ে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করছেন ওটা কি ফল, এটা কি ফুল, ওটা কি পাখি। সুন্দর কিছু দেখছেন, নতুন কিছু দেখছেন কৌতুহল ও বিস্ময় প্রকাশ করে শ্রীরামচন্দ্রকে সব কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন আর শ্রীরামচন্দ্রও সীতার কৌতুহল নিবৃত্ত করে চলেছেন।

এখানে বাল্মীকি রামায়ণের সাথে তুলসীদাসের রামচরিতমানসের একটা বড় পার্থক্য ধরা পড়ে। তুলসীদাস বলছেন আগে শ্রীরামচন্দ্র, মাঝাখানে সীতা আর সবার পেছনে লক্ষ্মণ, ব্রহ্ম আর জীবের মাঝখানে যেমন মায়া, সীতা ঠিক সেই রকম শ্রীরাম আর লক্ষ্মণের মাঝখানে। কিন্তু বাল্মীকি তাঁর মূল গ্রন্থে আদপেই এভাবে বলছেন না, তিনি বলছেন লক্ষ্মণ সবার আগে, তারপর সীতা আর সীতার পেছনে শ্রীরামচন্দ্র। আরেকটা ধারণা আমাদের মধ্যে আছে যে লক্ষ্মণ সীতার মুখের দিকে কোন দিন তাকায়নি, তিনি শুধু সীতার পায়ের দিকেই তাকাতেন। এই ধরণের বর্ণনাও বাল্মীকি কোথাও দিচ্ছেন না, বরঞ্চ বাল্মীকি দেখাচ্ছেন সীতা যা চাইছেন লক্ষ্মণই সব যোগাড় করে দিচ্ছেন। যদিও পরের দিকে সীতার প্রতি লক্ষ্মণের এই ধরণের আচরণ নিয়ে নানান রকমের কাহিনী তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে এসব কাহিনী কোন স্থান পায়নি।

শ্রীরামচন্দ্ররা এবার চিত্রকূট পর্বতে পৌঁছে গেছেন। ওখানে তাঁর সাথে বাল্মীকির দর্শন হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, শ্রীরামচন্দ্র যখন জঙ্গলে গেছেন তখন বাল্মীকি একজন ঋষি। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা আর লক্ষ্মণ বাল্মীকির চরণে মাথা নত করে প্রণাম করলেন। বাল্মীকিও সাদর আপ্যায়ন করে তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন, মানে তখনও বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের কথা জানতেন না।

বাল্মীকিকে নিয়ে যে কাহিনী তৈরী হয়েছে যে তিনি মরা মরা জপ করে একজন ঋষি হয়ে গেলেন, এগুলো আদপেই সত্য নয়। বাল্মীকি তখনই একজন নামকরা ঋষি হয়ে গিয়েছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন।

চিত্রকূটে এসে বসবাস করার জন্য একটা কুটির তৈরী করা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন **ঐণেয়ং মাংসমাহৃত্য শালাং যক্ষ্যামহে**।৩/৫৬/২২। হে লক্ষ্মণ তুমি যাও, গিয়ে এণা নামের হরিণের পবিত্র ভালো মাংস নিয়ে এসো, বাস্তু পূজায় আমরা এই মাংস দিয়ে যজ্ঞ করে ভুরি ভোজন করব। এখানেও ভাষ্যকার বলছেন এই মাংস বলতে বোঝাচ্ছে বিশেষ ধরণের কন্দমূল। পরে কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র আরও পরিষ্কার করে বলছেন – **মৃগং হত্বানয় ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণেহ শুভেক্ষণ**।৩/৫৬/২৩ তুমি এক্ষুনি গিয়ে একটা মৃগং হত্যা, মানে একটা হরিণকে মেরে তার মাংস নিয়ে এস, এখানে কোন সন্দেহের অবকাশই নেই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে একটা হরিণকে মেরে নিয়ে আসতে বলছেন, তার মাংস অর্পণ করে এই কুটিরের ভিত্তি স্থাপন হবে। এর অনুবাদ করা হচ্ছে একটা বিশেষ ধরণের কন্দমুলকে উপড়ে নিয়ে এসো। অনুবাদকরা কিছুতেই মাংসকে মাংস আর হরিণকে হরিণ বলবেন না। তারপরেই বাল্মীকি বলছেন লক্ষ্মণ তখন – **স লক্ষ্মণঃ কৃষ্ণমৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্**।৩/৫৬/২৬। লক্ষ্মণ তখন একটা কালো হরিণকে মেরে তার মাংস নিয়ে এসেছে। এটাকে অনুবাদ করা হচ্ছে কালো বাকলের যে কন্দ, মিষ্টি আলুর মত এক ধরণের কন্দ যার রঙ কালো, সেই ধরণের একটা কন্দকে লক্ষ্মণ উপড়ে নিয়ে এসেছেন। বাল্মীকি পরিষ্কার বার বার কৃষ্ণমৃগং, কৃষ্ণমৃগং বলে যাচ্ছেন, কিন্তু অনুবাদকরা কিছুতেই এটাকে হরিণ বলে মানবেন না। বাল্মীকি তারপরে বলছেন **তত্তু পক্বং সমাজ্ঞায় নিষ্টপ্তং ছিন্নশোণিতম্**।৩/৫৬/২৭, মানে হরিণের মাংসটা রান্না করে তারপর অর্পণ করা হয়েছে। এটাকে এনারা অনুবাদ করলেন ঐ কন্দকে আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে অর্পণ করা হয়েছে। লক্ষ্মণ তখন বলছেন – **অয়ং সর্বঃ সমস্তাঙ্গঃ স্বস্থাঙ্গ শৃত কৃষ্ণমৃগো ময়া**।৩/৫৬/২৮ – মানে কালো হরিণের মাংস খেলে শরীরের সমস্ত অঙ্গের সমান শক্তি বৃদ্ধি হয়, শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়। তারপর বলছেন - দেবতা দেবশঙ্কাস – বলছেন এই মাংস দিয়ে আমি বাস্তু দেবতার পূজা করলাম। অনুবাদকরা বলছেন – কন্দমূল খেলে সমস্ত শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়।

কিন্তু মূল কথা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্ররা সবাই এখন জঙ্গলে আছেন, কুটির বানান হয়েছে, কুটির তৈরী করতে বাস্তু দেবতার পূজা করতে হয়েছে, জঙ্গলে আর কি দিয়ে পূজা করবেন, সেখানে তো আর পূজার সব উপকরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু হরিণ খুব সহজে পাওয়া যায় বলে হরিণের মাংস দিয়ে বাস্তু দেবতার পূজা করা হল। যেখানে যে রকম জিনিষ পাওয়া যাবে তাই দিয়ে পূজা দিয়েছেন। আবার যখন রাজা দশরথের শ্রাদ্ধকর্ম করছেন তখন একটা ফল নিয়ে এসে তার শাঁস চটকে পিণ্ড বানিয়ে পিণ্ডদান করছেন। এমন কি এক জায়গায় সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে বলবেন – হে রামচন্দ্র, আমরা জঙ্গলে বাস করছি, এখানে আপনি যখন তখন হিংসা কর্ম করছেন, এই হিংসা কর্ম বন্ধ করুন। মানে মাংস খাওয়ার জন্য যখন তখন হরিণ মারতে হচ্ছে, তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ ক্ষত্রিয় রাজকুমার, জঙ্গলে ফলমূল আর আলু সেদ্ধ খেয়ে কোন রকমে শরীর রক্ষা করা যায় কিন্তু রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। মাংস না খেলে তাদের শরীরে শক্তি আসবে কি করে!

এদিকে অযোধ্যায় রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রের মত পুত্রের শোকে কাতর হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। তিনি নিজেই বিলাপ করে তাঁর উপর যে একটা অভিশাপ হয়েছিল তার কাহিনী বলছেন। শ্রবণকুমার নামে এক ঋষিপুত্র ছিল, তার বাবা আর মা অন্ধ ছিলেন, শ্রবণকুমারই বাবা-মাকে দেখাশোনা করতেন। একবার শ্রবণকুমার বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন। যেতে যেতে এক জায়গায় তাঁরা রাত্রিবাস করছেন। বাবা-মার জন্য জল আনতে রাত্রিবেলা শ্রবণ কুমার এক নদীর ধারে গেছেন। সেই রাতে রাজা দশরথও ঐ জঙ্গলে শিকারের জন্য গিয়েছেন। শ্রবণকুমার যখন জল ভরছেন তখন কলসিতে জল ভরার আওয়াজ শুনে দশরথ ভেবেছেন কোন বুনো হাতি কিংবা হরিণ জল খেতে এসেছে। তখন তিনি

শব্দভেদী বাণ মেরেছেন, তীর গিয়ে শ্রবণকুমারের বুকে বিঁধে যেতেই সে ছটফট করছে। রাজা দশরথ এগিয়ে গিয়ে দেখে এক ঋষিকুমার তীরবিদ্ধ অবস্থায় ছটফট করতে করতে মারা গেছে। শ্রবণকুমারের বাবা-মা যখন শুনলেন দশরথের তীরে তাঁদের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে তখন তাঁরা রাজা দশরথকে অভিশাপ দিলেন – তুমিও ঠিক এইভাবে সন্তানের শোকে মারা যাবে। এই কাহিনী বলতে বলতে রাজা দশরথ তাঁর প্রাণ ত্যাগ করলেন।

বাল্মীকি রামায়ণ – ২৩শে মে ২০১০

শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে অযোধ্যা থেকে চলে এসেছেন। তিনি খুব কষ্ট করে প্রথম রাত কাটালেন চিত্রকূটে। এদিকে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যা ছেড়ে চলে যাবার কিছু দিনের মধ্যে রাজা দশরথও শরীর ত্যাগ করে দিয়েছেন। এর আগে তিনি খুব দুঃখ করে বলছিলেন যে তাঁর উপর একটা অভিশাপ ছিল।

মানুষ পূর্ব পূর্ব জন্ম থেকে তার কর্মের ফল বহন করে নিয়ে আসে এই ধারণাটা হিন্দুদের চিন্তা-ভাবনাতে ঠিক ঠিক স্থান করে নিয়েছে এই বাল্মীকি রামায়ণে এসে। বাল্মীকি রামায়ণ নতুন কিছু মানুষের মনে ঢোকায়নি, লোকেদের মনে আগেই এই ধারণাটা ছিল কিন্তু এই ধারণাটা লিখিত প্রথম পাই বাল্মীকি রামায়ণে। যেমন শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ করে বলছেন – নিশ্চয়ই আমার মা গত জন্মে অনেক সন্তানদের তাদের মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করেছিলেন বলে এই জন্মে তাঁকেও আমার থেকে বিচ্ছেদের কষ্ট পেতে হচ্ছে। অন্য দিকে রাজা দশরথ বলছেন শ্রবণকুমারের বাবা আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন বলে আমার আজ এই অবস্থা হয়েছে। আমরা জানিনা মানুষ এই জন্মে যে কষ্ট বা সুখ পাচ্ছে এর জন্য কতটা পূর্বজন্ম দায়ী। কিন্তু কোন ঋষি মুনি বা গুরুজন যদি কোন অভিশাপ দিয়ে দেন তাহলে সেই অভিশাপ লাগবেই লাগবে। আর দ্বিতীয় কথা আজকে আমি যে অবস্থাতে রয়েছি এর জন্য পুরোপুরি দায়ী হল আমি আগের আগের জন্মে যা যা কাজ করেছি, যেরকম চিন্তন করেছি তারই ফলশ্রুতি আমার আজকের এই অবস্থা। আবার এই জন্মে আমি যা যা করছি, যে ধরণের চিন্তন করছি আগামী জন্মে সেই অনুসারে আমার শরীর হবে। এই ধারণাটা প্রথম বাল্মীকি রামায়ণেই আমরা পাই। এই ধারণাটাই মহাভারতে গিয়ে আরও ব্যাপক ভাবে হিন্দুদের মনে প্রসার লাভ করেছে। মহাভারত থেকে আস্তে আস্তে হিন্দুদের মনে এই ধারণাটা স্থায়ী ভাবে বসে গেছে। হিন্দু দর্শন মাত্রই পুনর্জন্মবাদের দর্শন। হিন্দু দর্শন থেকে যদি পুনর্জন্মবাদকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হিন্দু দর্শনের অনেক তত্ত্বই টিকবে না, তখন নতুন করে হিন্দু দর্শনকে দাঁড় করাতে হবে। অথচ কথামৃতে দেখা যায় ঠাকুর এই ব্যাপারে খুব একটা জোর দিচ্ছেন না। ঠাকুর যে মনে প্রাণে মেনে নিচ্ছেন তাও নয় আবার পুনর্জন্মবাদকে মানছেন না তাও নয়। ঠাকুরের মূল বক্তব্য হচ্ছে মানব জীবনের যে উদ্দেশ্য তার জন্য পুনর্জন্মের চিন্তা করার দরকার নেই। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারের ক্ষেত্রে তিনি পুনর্জন্মের উল্লেখ করছেন, যেমন বলছেন – আগের জন্মে কিছু দান-ধ্যান করা থাকলে এই জন্মে টাকা-পয়সা হয়। আমাদের সমস্যা এই যে, আমরা ভাবি ধর্ম কর্ম আগামী জন্মে করা যাবে, এই জন্মে সুখভোগ যা করবার ভালো করে করে নিই। কিন্তু ঠাকুর উল্টোটা বলছেন – তুমি অনেক সৌভাগ্যে এই মানব শরীর পেয়েছ তাই এই জন্মে তুমি প্রাণপনে ঈশ্বর দর্শনের চেষ্টাতে নিজেকে লাগিয়ে দাও, এর মধ্যে যে সুখ ভোগ তোমার হচ্ছে, সেটা গত জন্মের পূণ্যের জন্য হচ্ছে। আর এই জন্মে যদি সুখভোগ না হয় তাহলে বুঝতে হবে গত জন্মে তুমি দান ধ্যান করোনি। ঠাকুর তাই বলছেন তুমি ঐদিকে বেশি মন দিও না, এই জন্মেই যো সো করে ঈশ্বর দর্শনের চেষ্টা করে যাও।

এই ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক উল্টো। যখন কাউকে একটু ধর্ম কর্ম করার দিকে মন দিতে দেখা যায় তখন বেশির ভাগ লোকই তাদের উদ্দেশ্য করে বলে এদের আগের জন্ম ভালো কিছু করা আছে, আমাদের কি আর এত কিছু করা সম্ভব! আবার যখন দেখে তার জাগতিক কোন ভাল কিছু হচ্ছে তখন বলবে আমি কত পরিশ্রম করেছি, কত খাটাখাটনি করেছে বলে আজকে আমার অবস্থা পাল্টেছে। ঠিক

উল্টোটা হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের কারুরই এই ধরণের মনোভাব হওয়া উচিত নয়। যারা খুব নিষ্ঠার সাথে দিনের পর দিন একজনের কাছে শাস্ত্র পাঠ করছে তাদের বোঝা দরকার যে যোগক্ষেম, মানে জাগতিক উন্নতি তাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। প্রথমে মন এটা মানতে চাইবে না, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে, শাস্ত্রের অর্থকে অনুধাবনের সাথে বিচার করে করে এই ধারণাটাকে শোধরাতে হবে এবং সাথে সাথে কিছু কিছু জিনিষের থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। যে জিনিষ গুলো না হলে শরীর ভেঙ্গে পরবে, মন অস্থির হয়ে যাবে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে, ঐ জিনিষ গুলির সংস্রব থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিতে হবে। আগেকার যাঁরা জ্ঞানী ছিলেন তাঁরা ঠিক এই জিনিষটাই করতেন, যে জিনিষটা না হলেই নয় ঐ জিনিষটাই শুধু রাখতেন, তার বাইরে আর কিছু রাখতেন না। তাঁদের খাওয়া দাওয়া, পোশাক, আভূষণ সবই যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই করতেন। কিন্তু তাঁদের সবই থাকত, টাকা পয়সাও থাকত, বাড়িও থাকত, কিন্তু লোককে দেখাবার জন্য এগুলো রাখতেন না। এখন বলবে, যে সম্পত্তি লোকেদের দেখাতেই পারলাম না, সেই সম্পত্তি কিসের সম্পত্তি। মানুষ একটা সামান্য জিনিষের জন্য কত অর্থ ব্যয় করে ভাবতেই পারা যায় না। কিছু দিন আগে একটা লেখাতে বেরিয়েছিল এক ভদ্রলোক তার গাড়ির জন্য একটা স্পেশাল নম্বর পছন্দ করার জন্য দশ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। মোটর ভেহিকেলসের লোকেরা বুঝে গেছে এরা লোক দেখানিতে যাবেই, তাই এরা কতকগুলি স্পেশাল নম্বরকে আলাদা করে রেখে দেয় বিক্রী করবার জন্য। এই লোক দেখানো জিনিষ করতে নেই। অর্থোপার্জন মানেই কোথাও একটা অসদুপায় লেগে আছে। অসদুপায় কম হলেও অর্থ বেশি থাকলে মনের শান্তি সে হারাবে। এমন এক চাকরি নিয়েছে যেখানে অনবরত ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। এর ফলে মনটা চঞ্চল হয়ে থাকে। মনে শান্তি না থাকলে, মন যদি চঞ্চল থাকে তখন যে মন দিয়ে উচ্চ চিন্তন করবে সেই মনকে আর উচ্চ চিন্তনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় না। সেইজন্য গৃহস্থরা যখন আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে আসেন তাদেরকে এটাই বলতে হয় যে, যে জিনিষটা না হলেও চলে যাবে সেই জিনিষ গুলিকে ছেড়ে দিতে হবে। এটি না করলে কিন্তু বিপদ অবশ্যাম্ভি, শুধু যে আধ্যাত্মিক পথে চলতে চাইছে তারই বিপদ নয়, যারা সাধারণ জীবন যাপন করতে চায় তাদের পক্ষেও বিপদ। এরাই বুড়ো বয়সে প্রচুর কষ্ট পান, একদিকে জগতের মায়া ছাড়তে পারেন না বলে জগতকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে, ততই জগৎ তাঁর কাছে থেকে প্রতি নিয়ত সরে সরে থাকে। সেইজন্য প্রথম থেকেই প্রস্তুতি না নিলে বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে আর সামলাতে পারেন না।

বাল্মীকি রামায়ণের উদ্দেশ্য এটাই। ভোগীরা যেভাবে জগৎকে লুটেপুটে নিচ্ছে, তারা মনে করে যে মরে গেলে আমার সব শেষ, জগৎ চলে গেলে আমার সব শেষ, তাই এখন যত পার লুটেপুটে নাও। ঠিক তেমনি যোগের ব্যাপারেও আমাদের সেইভাবে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। আধ্যাত্মিক পথের সাধককেও সর্বদা মাথায় রাখতে হবে আমরা একেকটা মুহুর্ত চলে যাচ্ছে, কত দিন বাঁচব জানিনা, তাই তাড়াতাড়ি করে অন্য দিকে মন না দিয়ে যোগ সাধনা করে এই জীবনেই যাতে নিজের স্বরূপে অবস্থিত হতে পারি। পঁচিশ তিরিশ বছরের আইআইটি পাশ করা ছেলেরা অর্থ উপার্জন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সেইভাবে সাতান্ন আটান্ন বছরেও কি কেউ পুরোপুরি সব কিছু ছেড়েছুড়ে যোগ সাধনে ঝাপিয়ে পড়ছে? হয় না, এই বয়সে আরও নানা দিক থেকে আকর্ষণ চলে আসে, একটু নাতি দেখে আসি, নাতনিটা কত বড় হল, কতদিন দেখিনা। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের বক্তব্য এটাই, জগতে যা কিছু ভোগের জিনিষ আছে, এক একটা জিনিষের ভোগের জন্য এক এক ধরণের শরীরের প্রয়োজন। একজন মানুষ যে জিনিষগুলিকে ভোগের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় যত ভালো ভোগ করতে পারে, মনুষ্যেতর প্রাণীরা তার থেকে অনেক বেশি ভাল ভোগ করতে পারে। মানুষের শরীর এসব ভোগের জন্য নয়। বাল্মীকি রামায়ণেই বলা হবে, এই মানব শরীর আর তার শক্তি ভোগের জন্য নয়। আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের সেই সংস্কারই তৈরী হয়নি যে শরীরের ভোগের পরিমাণগত ও বস্তুগত দিকটার পরিবর্তন করে শরীরের যা উপযুক্ত তাকে তাই দেব। কিন্তু শাস্ত্র পাঠ করে যখন বুঝে নেওয়া যায় তখন আস্তে আস্তে সেই সংস্কারকে পালটানো দরকার এবং শরীরের উপযুক্ত সংস্কার তৈরী করতে প্রচেষ্ট হওয়া উচিৎ।

শাস্ত্র শ্রবণের পর শাস্ত্রের বাক্য ও উপদেশকে যদি কাজে না লাগান হয় তাহলে কিন্তু এই শাস্ত্র পাঠের কোন সার্থকতা নেই। শাস্ত্রের কথা এবং আচার্য বা গুরুর মুখের কথা শুনে শুনে আমাদের এই শরীর মনকে আত্মচিন্তনের দিকে প্ররোচিত করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে যেটা আমার না হলে নয় সেটুকুর বাইরে আমি আর কিছুতেই যাব না। আমার যদি দুটো জামা প্যান্টে চলে যায় আমি তিনটে জামা প্যান্ট কিছুতেই করাব না। আমার যদি এক জোড়া জুতোতে হয়ে যায় আমি আর দ্বিতীয় জোড়া জুতো রাখব না। যারা অনেক জামা প্যান্ট জুতো ব্যবহার করছে, তারা কেউ ভেবেও দেখে না যে রাস্তার লোক বা নিজের লোক কেউ ফিরেও দেখেনা আর চিন্তাও করে না আমি কি পড়ছি আর কি পড়ছি না। আমরা মনে করি আমার অনেক কিছু থাকলে লোকে প্রশংসা করবে, লোকে বড়লোক ভাববে, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে দেখবে। কিন্তু কারুর মাথা ব্যাথা নেই এই জেনে যে আমার কখানা শাড়ি আছে আর কত জোড়া জুতো আছে। আমি যদি একই রঙের দুটো মাত্র জামা ব্যবহার করি তাতে আমার খরচাও অনেক কমে যাবে। এগুলো সবার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু এই কারণেই বলা হচ্ছে যে, আমাদের হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য কিন্তু প্রথম থেকে এই দিকেই ইঙ্গিত দিয়ে এসেছে – তোমার ভোগকে কমিয়ে সাধারণ জীবন যাপন কর আর উচ্চ চিন্তনে নিজেকে সব সময় নিয়োজিত রাখ। কেউ দিয়ে দিল, বা কোন ভাবে এসে গেল সেটা ঠিক আছে, কিন্তু মনকে ঐদিকে কোন ভাবেই যেতে না দেওয়াটাই সাধনা।

রাজা দশরথ শরীর ত্যাগ করেছেন। বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র ও আরও অনেকে ঋষি মুনিরা রয়েছেন, সবাই ভেবে দেখলেন অযোধ্যায় একজন কাউকে তো রাজা করতে হবে। কেননা রাজা বিহীন রাজ্যে অনেক ধরণের বিপদ হতে পারে। রাজার প্রাথমিক কাজ রাজ্যের বাইরে থেকে যদি আক্রমণ আসে তাকে আটকানো আর রাজ্যের ভেতরে যদি কোন অশান্তি হয় তাকে দমন করে শান্তি দেওয়া। তাই রাজাহীন রাজ্যের খুবই বিপদ। বাল্মীকি এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন রাজা না থাকলে কি কি বিপদ হতে পারে – রাজা যদি না থাকে তাহলে সেই রাজ্যে ঠিকমত বৃষ্টি হয় না। বেদের সাথে এই ধারণাটার একটা যোগসূত্র পাওয়া যায়। দেবতাদের রাজা হলেন ইন্দ্র, আর পৃথিবীর মাটিতে যিনি রাজা তিনি হলেন দেবতাদের প্রতিনিধি। দেবতাদের প্রতিনিধি না থাকলে সেই রাজ্যে দেবতারা যে যে কাজে সাহায্য করেন সেই কাজগুলো তখন বন্ধ হয়ে যাবে। বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, রাজা না থাকলে তাই বৃষ্টি হয় না, বৃষ্টি না হলে রাজ্যের কৃষিকার্য ব্যাহত হয় আর কৃষি উৎপাদন কমে যায়।

রাজা যদি না থাকেন তাহলে সেই রাজ্যে সন্তান বাবার নিয়ন্ত্রণে থাকে না, নারী অর্থাৎ স্ত্রীও স্বামীর অধীনে থাকে না। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক, যেটা সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক সত্যের উপর আধারিত, রাজা না থাকলে এই আধারটাই নষ্ট হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মত এত পবিত্র সম্পর্কই যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন আর অন্য কোন সম্পর্কই ঠিক ভাবে থাকবে না। লোককল্যাণের জন্য যে কাজ গুলো করা হয় যেমন – রাস্তাঘাট তৈরী করা ও মেরামত করান, জলাশয় তৈরী করা, পান্থনিবাস স্থাপন করা ইত্যাদি কর্মোদ্যগগুলো নষ্ট হয়ে যায়। রাজা না থাকলে কি কি হয় তার এক বিরাট লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। আরও আছে, যেমন যুবতী মেয়েরা সন্ধ্যের পর পার্কে গিয়ে খেলাধুলো করতে ভয় পায়, কি না কি হয়ে যেতে পারে, যুবকরা যাদের নিত্য শরীরচর্চা, বাণ চালনা ইত্যাদির অভ্যেস করার কথা, রাজার অবর্তমানে এগুলোর অভ্যেস করা তারা ছেড়ে দেয়, এমনকি তারা যে হঠাৎ করে তীর্থাদি যাত্রায় বেরিয়ে যাবে সেই ভাবে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এখন যেমন ট্রেনে যেতে সবারই আতঙ্ক, কোথায় মাওবাদীরা ট্রেন উড়িয়ে দেবে কোন ঠিক নেই। রাজা না থাকলে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কোনটাই থাকে না। রাজা না থাকলে বর্ণাশ্রম প্রথা ভেঙ্গে পড়ে। মানুষের যে মর্যাদার সীমা তাকে লঙ্ঘন করে যায়। রাজা রাজ্যের সত্য ও ধর্মকে ধরে রাখে, রাজাই যদি চলে যায় তাহলে সেই সত্য আর ধর্মকে রক্ষা করার কেউ না থাকাতে এই দুটোর অধঃপতন হয়ে যায়।

এই সব আলোচনার পর তখন বশিষ্ঠ মুনি লোক পাঠালেন ভরতের মামার বাড়িতে ভরতকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসার জন্য। অন্য দিকে যেদিন রাজা দশরথ মারা গেছেন সেদিন ভরতের ঘুম হচ্ছিল না, তখনকার দিনে তো আর মোবাইলও ছিল না আর কোরিয়ার সার্ভিসও ছিল না। মামার বাড়িতে ভরত খুব আনন্দেই ছিল, তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য – **বাদয়ন্তি তদা শান্তিম্ লাসয়ন্ত্যপি চাপরে।** ভরতের বন্ধুরা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ভরতকে আনন্দ দিত, আর অনেকে নৃত্যাদি করেও আনন্দ দিত। আর **নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ।।**২/৬৯/৪। অন্য অনেক বন্ধুরা অনেক রকম নাটক প্রহসন করত।

সাহিত্যের সমালোচকরা বলেন যে সাহিত্যে নাটকের উদ্ভব গ্রীক দেশ থেকে প্রথম এসেছে। কোথা থেকে এনারা এই তথ্য পেলেন? কারণ নাটকে যে পর্দার ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা বলি যবনিকা, এই যবনিকা শব্দটা এসেছে যবন থেকে, গ্রীস দেশের লোকেদের আগে ভারতের লোকেরা বলত যবন। নাটকের ব্যাপারে বিদ্বজ্জনদের এটা একটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ। কিন্তু বাল্মীকি এখানে পরিষ্কার নাটক ও প্রহসনের কথা উল্লেখ করেছেন, তাহলে বাল্মীকি কি গ্রীস সভ্যতার পরে? না কি বাল্মীকি এগুলো সব নিজের থেকে বানিয়ে বানিয়ে লিখেছেন? বাল্মীকির কি গ্রীস দেশ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল? আসলে তা নয়। ভারতের আধুনিক সমালোচকদের বাল্মীকি রামায়ণকে খুটিয় খুটিয়ে পড়ার মত ধৈর্য নেই। এখন যদি তাদের বাল্মীকি রামায়ণের এই অংশটা দেখানো হয় তখন বলবে এই নাটক সেই নাটক নয়। সেতো সবাই জানে, নাটকের বিভিন্ন রূপ হতে পারে, একাঙ্ক নাটক বলা হয়, পূর্ণাঙ্গ নাটক বলে, কাব্যনাটক বলে, তারপরে কোনটাতে মেক আপ দেয় কোনটাতে মেক আপ করে না, আবার আজকের দিনে যাত্রাও নাটকেরই একটা আলাদা রূপ, নাটক অনেক রকমের আছে। কিন্তু নাটকের যে ধারণা সেটার তো কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এখন তিন হাজার বছর আগে যে নাটক হত সেই ধরণের নাটক আর তার উপস্থাপনা কি আধুনিক যুগেও একই থাকবে? এর তো পরিবর্তন হতে বাধ্য। আমাদের প্রধান সমস্যা হল আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে ভুলে গেছি। বাপ-ঠাকুর্দার সম্পত্তিকে যখন ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগাভাগি করে তখন তিন আঙ্গুল জমির জন্য ভাই ভাইকে খুন করতেও দ্বিধা করে না, কিন্তু আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা এত বিশাল ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দিয়ে গেছেন সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার ইচ্ছেই কারুর না। আর সাহেবরা যা বলে দিচ্ছে সেটাই সবার কাছে বেদবাক্য হয়ে যাচ্ছে।

ভরত তখন বলছেন 'আমার মন খুব দুশ্চিন্তাতে রয়েছে, রাত্রে আমি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। আমি আমার বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম তাঁর মুখটা যেন কালো হয়ে গেছে, চুলটা খোলা, আর দেখছি তিনি পাহাড় থেকে গড়িয়ে নীচে একটা নোংরা দুর্গন্ধ যুক্ত পচা গোবরে ভর্তি গর্তের মধ্যে পড়ে গেছেন, আর দেখছিলাম যেন তেল দিয়ে অঞ্জলি দিচ্ছেন আর সেই তেল পান করছেন, আর মাঝে মাঝে হাসছেন। বাবা যে হাতিতে চলাফেরা করেন দেখছি সেই হাতির দাঁত ভেঙ্গে গেছে, যেখানে সব সময় আগুন জ্বলে দেখছি সেখানে আগুন আর জ্বলছে না। স্বপ্নে দেখছি আমার বাবা গলায় লাল রঙের মালা গলায় পড়েছেন, লাল রঙের চন্দন লেপন করেছেন, তিনি যেই রথে করে যাচ্ছেন সেই রথে ঘোড়ার বদলে গাধা লাগান আছে আর সেই রথে তিনি খুব বেগে দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছেন। আর লাল রঙের শাড়ি পরা এক স্ত্রী, দেখে মনে হচ্ছিল কোন রাক্ষসী, আমার বাবাকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ভারতীয় মনস্তত্ত্বে স্বপ্নের বিরাট একটা ভূমিকা আছে। সেখানে স্বপ্নে দেখা সব জিনিষকে বিশ্লেষণ করে বলা হয় যে এই জিনিষ দেখার এই অর্থ হয়। এই যে এখানে ভরত বলছেন বাবাকে দেখছেন তিনি যেন খুব বেগে দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছেন বা লাল বস্ত্রের কোন স্ত্রী আছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তার মানে তাঁর মৃত্যু আসছে। এগুলোকে অনেকে বিশ্বাস করেন আবার অনেকে বিশ্বাস করেন না। পাশ্চাত্য দার্শনিক ফ্রয়েডের স্বপ্ন বিচারের উপরে একটা বই আছে। এগুলো যে একেবারে সত্য হবে তা বলা যায় না, আবার একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। স্বপ্নের কোন কোন ঘটনা মিলে যায় আবার অনেক কিছুই মেলে না। তবে দেখা যায় যারা জপ-ধ্যান বেশি করেন, মন যদি ঠিক ঠিক পবিত্র হতে শুরু করে তখন তাদের প্রায়ই

স্বপ্নে ঠাকুর দেবতার দর্শন, ইষ্ট দর্শন, এগুলো নিয়মিত হতে শুরু করে। অনেক বয়স্ক মহারাজদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে মহারাজ আপনার কি ঠাকুরকে দর্শন হয়েছে? তখন তাঁদের অনেকেই বলেন যে স্বপ্নে দর্শন হয়েছে। এটা এমন কিছু আহামরি কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু স্বপ্নে যখন ইষ্টের দর্শন হয় তখন এটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তার মনে এখন পবিত্রতার ভাব আসছে আর তিনি ঈশ্বর চিন্তন করছেন। এসব কিছুই করছে না, আর হঠাৎ স্বপ্নে ঠাকুরকে দেখে নিল, এর কোন দাম নেই। ঠাকুর আবার কথামৃতে একজনকে জিজ্ঞেস করছেন – স্বপ্নে কি দেখ?

এইসব বলার পর ভরত আবার বলছেন – আমার মনে হচ্ছে হয় শ্রীরামচন্দ্র, বা লক্ষ্মণ অথবা বাবা দশরথ এদের মধ্যে কারুর একজনের মৃত্যু নির্ধারিত। এখানে বাল্মীকি বলছেন, কেউ যখন স্বপ্নে কাউকে দেখে যে সে রথে আরোহণ করে যাচ্ছে, আর সেই রথকে গাধা টানছে এবং দক্ষিণ দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝে নিতে হবে যে সেই ব্যক্তি আর বেশি দিন বাঁচবে না। ইতিমধ্যে অযোধ্যা থেকে দূত এসে গেছে, ভরতের কাছেও খবর গেছে যে এক্ষুনি ভরতকে অযোধ্যাতে ফিরে যেতে হবে, সেখান থেকে তার ডাক এসেছে। দূতকে কিন্তু রাজা দশরথের মৃত্যুর খবর দেওয়ার জন্য নিষেধ করা হয়েছিল। ভরতও সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। কেকয় রাজা, ভরতের মামা, ভরতের সাথে কিছু জিনিষ দিয়ে দিলেন, তার মধ্যে কিছু ভালো বড় বড় কুকুর দিলেন নিয়ে যাওয়ার জন্য দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে কুকুর দেওয়ার প্রথা হিন্দুদের মধ্যে ছিল, যেটা মুসলমানদের মধ্যে একেবারেই নেই।

ভরত এবার অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করেই দেখছেন অযোধ্যা নগরীটা কেমন যেন থমথমে দেখাচ্ছে। ভরত সারথিকে বলছেন – আমার অযোধ্যা নগরীকে আগের মত প্রসন্ন দেখাচ্ছে না। যে নগরীতে শ্রীরামচন্দ্রের মত পুরুষ, রাজা দশরথের মত বীরের বাস সেই নগরীর বাড়ি ঘর সবই ঠিক আছে কিন্তু কেন যেন মাটির একটা ঢিপির মত মনে হচ্ছে। ভরত যেটা বলছেন এই জিনিষটা অনেক সময়ই দেখা যায়, যখন কোন গ্রামে বন্যা হয়ে অনেক লোক মারা যায় তখন সেই মৃত্যু গ্রামের মধ্যে একটা ছাপ ফেলে যায়, গ্রামের মানুষ-জনকে দেখলেই বোঝা যায় যে এই গ্রামে কেউ না কেউ মারা গেছে। গত প্রেসিডেন্ট মহারাজের শরীর যখন চলে গিয়েছিল, তার পরের দিন তাঁর পার্থিব শরীরকে দাহ করা হবে, বেলুড় মঠে তখন দশ হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছে। এত লোকের সমাগম কিন্তু সমস্ত বেলুড় মঠটা জুড়ে একটা গম্ভীর ভাব ধারণ করে আছে, কোথাও কোন ধরণের হৈচৈ নেই। সেই সময় মাইকে জুতো রাখা নিয়ে একটা ঘোষণা হওয়া মাত্রই সেই সৌম্য ভাবটা কেটে গেল। মৃত্যু যেখানে হয় সেখানে অন্য ধরণের একটা ছাপ এসে পরে। আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে বাল্মীকি কি ভরতকে গিয়ে দেখেছিলেন? তা নয়, ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বর দিয়েছিলেন তুমি যখন যা যা জানতে চাইবে তুমি তোমার দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে জেনে যাবে। আর দ্বিতীয় যে কথা সেটা আমাদের সবারই খুব ভালো করে অনুধাবন করা উচিৎ তা হল, বাল্মীকি ছিলেন বিরাট বড় ঋষি আর তপস্বী, তিনি জগতের অনেক কিছুই দেখেছেন, জগতকে জানেন, তিনি জগতকে যতটুকু দেখেছিলেন আর কিছুটা তাঁর কল্পনাকে তার সাথে মিলিয়ে উনি বর্ণনা করে গেছেন। বর্ণনা যেখানে করছেন সেখানে মানব মনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটাকেও তিনি প্রয়োগ করেছেন, মানে, যেখানে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় সেখানে এই রকমটিই হয়।

ভরত সারথিকে বলছেন – হে সারথি! রাজার যখন বিনাশ হয়ে যায় বা মৃত্যু হয়ে যায় তখন বাচ্চা বয়স থেকে আমি যা যা লক্ষণ বা চিহ্নের কথা শুনে এসেছি, এখন অযোধ্যার চারিদিকে তাকিয়ে আমি সেই সব লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি। যেমন **সম্মার্জনবিহীনানি পুরুষাণ্যুপলক্ষয়ে। অসংযতকবাটানি শ্রীবিহীনানি সর্বশঃ।।২/৭১/৩৭।** গৃহস্থদের বাড়িতে ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছে না, আর কেমন রুক্ষ আর শ্রীহীন দেখাচ্ছে। বাল্মীকি এখানে শ্রী বিহীন যদিও বলছেন, কিন্তু ‘শ্রী’ শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে লক্ষ্মী, শ্রীহীন মানেই বোঝায় সেখানে লক্ষ্মী বা ঐশ্বর্যের অভাব। বাল্মীকির সময়ে লক্ষ্মীর এই ধারণা তখনও আসেনি।

লক্ষ্মী পৌরাণিক যুগে এসেছেন। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রী বলতে বোঝাচ্ছে আভিজাত্য, ঐশ্বর্য বা সংস্কার, কিন্তু পরের দিকে শ্রী মানে হয়ে যায় লক্ষ্মী।

ভরত বলছেন – অযোধ্যা নগরীর সবার ঘরের দরজা কেন খোলা পড়ে আছে? কোথা থেকেও কোন সুগন্ধ আসছে না, বাড়িগুলো যেন ধুপ ধুনোর সুগন্ধ থেকে বঞ্চিত। যে বাড়িতে পূজা আর্চা হয় সেই বাড়ি থেকে একটা সুন্দর দিব্য গন্ধ আসে। ভরত বলছেন সব কিছুই যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, আর দেবমন্দির গুলিও সুসজ্জিত নয়, কোন মানুষকেও মন্দিরে দেখা যাচ্ছে না। মন্দিরে যত দেব প্রতিমা রয়েছে সেখানে কারুরই পূজা হচ্ছে না, যজ্ঞশালায় কোন যজ্ঞ হচ্ছে না, বাজারে কোন কিছুই কেনাবেচা হচ্ছে না, আর সবাইকেই যেন কেমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। এদের চেহারার মধ্যে কেমন দীন হীন ছাপ আর সবারই চোখে জল দেখছি। আসলে ভরতকে তো কিছু বলা হয়নি, কিন্তু অযোধ্যা নগরীর ঘরবাড়ির অবস্থা দেখে, লোকেদের মুখচোখ দেখে ভরত কিছু আন্দাজ করে নিয়েছেন।

ভরত এসে প্রথমে কৈকেয়ির রানীমহলে প্রবেশ করেছেন, কৈকেয়ি তখন সুবর্ণময় আসনে বসেছিলেন, ভরতকে দেখা মাত্রই হুড়মুড় করে উঠে দৌড়ে এসেছেন। বাল্মীকি এখানে বলছেন কৈকেয়ি তখন লোভে মোহিত হয়ে আছে, কারণ সে এখন রাজমাতা হতে চলেছে। কৈকেয়ি ভরতকে জড়িয়ে ধরে বলছে – **যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ। রাজা মহাত্মা তেজস্বী যাযজুকঃ সতাং গতিঃ।।২/৭২/১৫।** তোমার বাবা দশরথ বিরাট বড় মহাত্মা ছিলেন, প্রচণ্ড তেজস্বী ছিলেন, যশস্বী ছিলেন ইত্যাদি। সমস্ত প্রাণির যা গতি হয়, তোমার বাবা দশরথও সেই গতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। ভরত এই প্রথম তার বাবার মৃত্যু সংবাদ পেল। খবর পেতেই প্রচণ্ড মর্মাহত হয়ে কৈকেয়িকে জিজ্ঞেস করছেন – বাবার কি হয়েছিল? আমাকে তো কোন খবরই দেওয়া হয়নি। আর আমার দাদা শ্রীরামচন্দ্রই বা কোথায়? ভাই লক্ষ্মণকেও দেখছি না, সেই বা এই বিপদে কোথায় গেল? তখন কৈকেয়ি খুব আনন্দে বলতে শুরু করল – **স হি রাজসুতঃ পুত্র চিরবাসা মহাবনম্। দণ্ডকান্ সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণানুচরো গতঃ।**।২/৭২/৪২। – হে পুত্র! রাজকুমার শ্রীরাম, তিনি বল্কল ধারণ করে সীতাকে সঙ্গে করে দণ্ডক বনে চলে গেছে, আর লক্ষ্মণও তাদের অনুগমন গেছে। এই কথা শুনতেই ভরতের প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেছে।

ভরত যখন শুনলেন শ্রীরামচন্দ্র বল্কল ধারণ করে বনবাসী হয়ে গেছেন, তখন তাঁর প্রথম মনে হল – আমার দাদার চরিত্রের পতন হয়ে গেল নাকি, চরিত্রের পতন না হলে তো কেউ জঙ্গলে যেতে পারে না! চরিত্র মানে ধর্ম থেকে পতিত হয়ে গেছেন কিনা। কি কি কারণে ধর্ম থেকে পতন হয়? ভরত এক এক করে তখন বলছেন – শ্রীরামচন্দ্র কোন ব্রাহ্মণের সম্পত্তি হরণ করে নিয়েছেন কিনা? দ্বিতীয় হচ্ছে, তিনি কোন নিষ্পাপ ধনী বা দরিদ্রকে হত্যা করেছিন কিনা? তৃতীয়, কোন পর নারীর সঙ্গে তিনি সমাগম করেছেন কিনা? এই তিনটে কারণে ধর্ম থকে পতিত হয়ে যায়। খুব সুন্দর বাল্মীকি ভরতের মুখ দিয়ে বলছেন **তৎচ্ছ্রুত্বা ভরতস্ত্রস্তো ভ্রাতুশ্চারিত্রশঙ্কয়া।** ২২/৭২/৪৩। শ্রীরামচন্দ্র জঙ্গলে চলে গেছেন আর শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের পতনের আশঙ্কায় ভরত ত্রস্ত হয়ে গেছেন। গীতায় ভগবান বলছেন – *অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে – ২/১১* – শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে এই যে ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, কৃপাচার্য এদের যদি চারিত্রিক পতন হয়ে যেত তাহলে এদের জন্য শোক করার কারণ থাকত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মানুষ মরে যাচ্ছে তা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু শোক করছেন না, কিন্তু মানুষের যদি চরিত্রের পতন হয়ে যায় সেই নিয়ে তিনি আতঙ্কিত। মহাভারতের ভাব হচ্ছে তুমি ধর্মের জন্য মরে যাও তাও ভাল কিন্তু চরিত্র থেকে যেন তোমার পতন না হয়ে যায়। ভগবান একটু পরেই অর্জুনকে বোঝানর জন্য বলছেন – *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে* ২/৩৪– যিনি সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁর যদি চরিত্রের পতন হয়ে যায়, আর তার জন্য তাঁকে অপমানিত হয় মাথা নিচু করে কলঙ্কিত হয়ে সমাজে চলে ফিরে বেড়াতে হবে, এর চেয়ে ভালো হবে তাঁর মরে যাওয়া। আমাদের হিন্দু ধর্মে যে ধারণা প্রথম থেকে চলে আসছে তাতে আমার চরিত্র বা ধর্ম থেকে যদি পতন হয়ে যায় তাহলে আমি আমার জীবন যাত্রার যে লক্ষ্য অর্থাৎ মুক্তির পথ থেকে

অনেকটা পিছিয়ে গেলাম। সেইজন্য হিন্দু ধর্মে কেউ মৃত্যুকে ভয় পায়না, ভয় করে নৈতিক পতন হয়ে যাওয়া থেকে। শ্রীরামচন্দ্রের বনে যাওয়ার খবর পেয়ে ভরতও তাই আঁতকে উঠেছেন। তাঁর বাবা দশরথের মৃত্যুর জন্য যতটা শোক হওয়ার কথা তার থেকে দাদার বুঝি কিছু নৈতিক পতন হয়ে গেছে এই ভেবে বেশি শোক হচ্ছে।

আর দেরী না করে কৈকেয়ি ভরতকে সব পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন। খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন – **অথাস্য চপলা মাতা তৎ স্বকর্ম যথাযথম্**।২/৭২/৪৬। কৈকেয়ির বয়স কৌশল্যার থেকে তখন অনেক কম, তাই তার চপল স্বভাব এখন যায়নি। চপল স্বভাবের জন্য সে আর কারুর জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই তার সন্তানকে বলে দিয়েছে – শুধু তোমারই জন্য আমিই এই বন্দোবস্ত করেছি – তুমি সাম্রাজ্য পাবে আর রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বলে চলে যাবে। কৈকেয়ির কাছে এই কথা শুনতেই ভরতের মাথা সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেল। নিজের গর্ভধারিণীকে প্রচণ্ড গালাগাল দিতে শুরু করেছেন। বাল্মীকি ভরতের মুখ দিয়ে কৈকেয়িকে বিরাট লম্বা গালাগালের বর্ণনা দিয়েছেন।

ভরত কৈকেয়িকে বলছেন – মা! শ্রীরামচন্দ্র চিরকাল তোমাকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করে এসেছেন, আর তুমি এত পাপনিশ্চয়া, তোমার মনের মধ্যে এত পাপ জমে আছে! তুমি এতই নিকৃষ্ট যে তোমাকে ত্যাগ করে দিতে আমার এক মুহুর্তও লাগবে না। আমাদের রাজবংশের পরম্পরাতেই ঠিক হয়ে আছে যিনি জেষ্ঠ্য সন্তান হবেন তিনিই রাজা হবেন। ভরতের এই কথাতে বোঝা যায় যে, ভারতের অন্যান্য যে রাজ্য ছিল সেখানে যে জেষ্ঠ্যই রাজা হবে তার কোন বাঁধা নিয়ম ছিল না, বলছেন আমাদের বংশে এই নিয়মই ছিল। ভরত বলছেন – **রাজ্যাদ্ ভ্রংশস্ব কৈকেয়ী নৃশংসে দুষ্টচারিণী। পরিত্যাক্তাসি ধর্মেণ মা মৃতং রুদতী ভব।**।২/৭৪/২। ভরত নিজের মাকে এই কথা বলছেন। এগুলো সবই কবির বর্ণনা, কবি যখন কাউকে তুলবেন তখন একেবারে আকাশে তুলে দেবেন, আবার যাকে নামাতে চাইবেন তাকে পাতালের কীটে নামিয়ে দেবেন। নিজের মাকে ভরত যেরকম ভাষায় গালাগাল দিচ্ছেন সেটা ভেবে বাল্মীকির কোন কিছুই হচ্ছে না। ভরত বলছেন – তুমি এক নৃশংস নারী। হে দুষ্টচারিণী! তুমি যা করেছ এতে তুমি ধর্মকেই পরিত্যাগ করেছ *পরিত্যাক্তসি ধর্মেণ*। সেইজন্য তুমি এখন আর মৃত মহারাজের জন্য চোখের জল ফেলো না। এখানে বাল্মীকি আধখানা বাক্যে বলছেন – *মা মৃতং রুদতী ভব* – যেহেতু তুমি ধর্ম থেকে পতিতা হয়ে গেছ তাই মৃত স্বামীর জন্য অশ্রুপাত করো না অথবা আমাকে মৃত মনে করে তুমি সারাটা জীবন চোখের জল ফেলতেই থাক। এটাই কাব্যিক অলঙ্কার – *মা মৃতং রুদতী ভব*, এর দুটো অর্থই করা যায়। তুমি ধর্ম থেকে পতিত হয়ে গেছে সেইজন্য তুমি তোমার মৃত স্বামীর জন্য চোখের জল ফেলো না, এর আরেকটা অর্থ হতে পারে তুমি সারা জীবন এখন কাঁদতেই থাক, *মা মৃতং* মানে আমি মরে গেছি এই ভেবে সারা জীবন কাঁদতে থাক। এরপরেই ভরত নিজের মাকে বলছেন – তুমি আগুনে গিয়ে পুড়ে মর বা নিজেও দণ্ডকারণ্যে চলে যাও যেখানে তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে পাঠিয়েছ, বা গলায় দড়ি দিয়ে তোমার প্রাণ ত্যাগ করে দাও। তুমি মরে গেলে আমার আর কিছু আসবে যাবে না। যত দিন শ্রীরামচন্দ্র এই অযোধ্যার মাটিতে পা না রাখছেন ততদিন আমি তোমার এই কলঙ্ককে মানতে পারব না। তুমি এখন তোমার যা খুশি কর।

ভরতের রাগ আর থামছে না। মাকে একের পর অভিশাপ দিয়েই চলেছেন, পর পর অভিশাপ দিতেই থেকেছেন, আর কত রকমের অভিশাপ হতে পারে বাল্মীকি রামায়ণ না পড়লে কল্পনা করা যাবে না, পুরো একটা অধ্যায় জুড়ে খালি অভিশাপই দিয়ে গেছেন, চারশোর উপর অভিশাপ দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে। এর মধ্যে একটা যেমন হচ্ছে – যে তোমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছে আর যার বুদ্ধি ও প্রেরণা রাজা দশরথকে এই রকম কাজ করতে বাধ্য করেছে এই ধরণের মানুষ যেন কৃতঘ্ন হয়, সমস্ত সৎপুরুষরা তাকে ত্যাগ করুন, সে নির্লজ্জ হয়ে যাক, এই জগতে সে সবার বিদ্বেষের পাত্র হোক, তার বাড়িতে সন্তান থাকুক, দাসদাসী থাকুক অথচ খাবার সময় সে যেন একাই আহার করে। ভরতের এই অভিশাপ এখন আমাদের সবার লেগে গেছে। এখন সবার বাড়িতে অনেক মানুষ আছে কিন্তু খাবার সময় মানুষ এখন একাই খায়।

খুব কম পরিবারেই দেখা যায় যেখানে স্বামী স্ত্রী সন্তানরা, ঠাকুরমা, দাদু সবাই একসাথে খেতে বসে। এই অভিশাপ ভরত দিয়ে গেছেন। ভরত অভিশাপ দিচ্ছেন – সে যেন তার সন্তানের মুখ না দেখা, তার কাম পূর্ণ হবার আগেই সে যেন মরে যায়। রাগের প্রকোপে ভরত অভিশাপ দিয়েই চলেছে – যে এই রকম করেছে সে যেন কাম আর ক্রোধের বশীভূত হয়ে সে যেন সব সময় মদ্যপান, নারী সমাগম আর জুয়া খেলাতেই অতিবাহিত করে। মানে এরা সব সময় মেয়েদের পেছন দৌড়াবে, মদ খাবে আর জুয়া খেলবে। যার অনুমতিতে শ্রীরামচন্দ্রকে জঙ্গলে যেতে হয়েছে তার যেন কখন ধর্মে মতি না হয় আর সব সময়ই যেন অধর্মতেই লিপ্ত থাকে এবং অসৎ পাত্রেই যেন সে দান করতে থাকে। ভরত কিন্তু মায়ের নাম করে কিছু বলছেন না। জল যারা নোংরা করে, অপরকে যে বিষ প্রয়োগ করে তাদের যে পাপ লাগে, যারা আমার প্রিয়তম দাদাকে জঙ্গলে পাঠিয়েছে ঐসব পাপ যেন তাদেরও লাগে।

কত আর অভিশাপ দেবে! সব অভিশাপ দেওয়ার পর আর কী করার আছে ভরতের! তাঁকে তো রাজা দশরথের মৃতদেহ সৎকার করতে হবে। আস্তে আস্তে সব কথা পরিষ্কার হতে লাগল মন্থরাই এই বুদ্ধি কৈকেয়িকে দিয়েছিল। এই কথা জানতে পেরে মন্থরার উপর শত্রুঘ্ন প্রচণ্ড রেগে গেছে। রেগে গিয়ে সে মন্থরার চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে তাকে বধ করবার জন্য। তখন আবার ভরত গিয়ে শত্রুঘ্নকে বোঝাতে লাগলেন – দ্যাখো শত্রুঘ্ন! তুমি এভাবে ক্রোধিত হয়ে যেওনা – **অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি।**।২/৭৮/২১। নারী মাত্রই অবধ্যা, নারীর বধ কখনই করা যায় না। আমাদের শাস্ত্রে যখনই অভিশাপাদি দেবে তখন এই কথাই বলে নারী হত্যার পাপ যেন তার লাগে। তবে কি জান শত্রুঘ্ন, আমি আমার মাকেই বধ করে দিতাম, কিন্তু আমি যদি মাকে বধ করে দিই তাহলে আমি ভালোভাবেই জানি যে, শ্রীরামচন্দ্র জীবনে আর আমার মুখ দেখবেন না। আমাকে লোকে মাতৃঘাতিণী বলে সবাই সম্বোধন করবে। এসব না হলে আমি অনেক আগেই আমার মায়ের গলা টিপে মেরে দিতাম।

এদিকে বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র অন্যান্য সব রাজপদাধিকারি ব্যক্তিরা তোড়জোর শুরু করে দিয়েছেন ভরতকে খুব তাড়াতাড়ি অভিষেক করে দিয়ে রাজার দায়ীত্ব বুঝে নিতে হবে। কিন্তু ভরত রাজসিংহাসন প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বলছেন ‘আমরা সবাই মিলে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে আসব’। সবাই এখন ভরতের প্রস্তাব মত শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করেছেন। ভরত আবার শ্রীরামচন্দ্র যেভাবে জঙ্গলে গেছেন সেইভাবে যাবেন না, তিনি সৈন্য সামন্ত সঙ্গে নিয়ে যাবেন। রাজ পরিবারের লোকেরা সবাই রওনা হওয়ার আগে একদল সৈন্য আগে রওনা হয়ে গেছে। অগ্রবর্তী সৈন্যরা আগে গিয়ে তাঁবু খাটানো, খাওয়ার দাওয়ার ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ঠিকঠাক করে রাখত। আধুনিক যুগেও যখন সৈন্যরা যায় তার আগে একটা অগ্রবর্তী বাহিনী চলতে থাকে। মুঘল আমলেও আকবর যখন কোথাও যেতেন তখন তাঁর সাথে দুটো তাঁবু যেত, আকবরের জীবনীতে এই রয়েল টেন্টের বিরাট বর্ণনা আছে। আকবরের পরের দিকে যেসব বাদশারা এসেছিলেন তারাও এই প্রথা চালু রেখেছিলেন। রাজার তাঁবু থাকত বিশাল, তাতে শোবার ঘর থেকে অফিস ঘর পর্যন্ত সব কিছুই থাকত, এই রকম দুটো তাঁবু থাকত। মনে করুন কলকাতা থেকে দিল্লী যাচ্ছে, এখন আগে থেকে সব প্ল্যানিং হয়ে আছে। আজকে সকালে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে বিকেলের দিকে বর্ধমান পৌঁছাবেন। এখন আগের দিনই বাদশার রয়েল টেন্ট বর্ধমান চলে যাবে। বাদশা যখন বিকেলে বর্ধমান গিয়ে পৌঁছাবে গিয়ে দেখবেন তাঁর বাড়ি তৈরী হয়ে আছে। বর্ধমান থেকে বাদশা পরের দিন বিকেলে ধানবাদ পৌঁছাবেন, তার আগেই আরেকটি রয়েল টেন্ট নিয়ে সৈন্যরা আগের দিন ধানবাদ চলে যাবে, ধানবাদে এসে বাদশা পরের দিন বিকেলে দেখবে সেই একই প্যালেস যেই রকমটি বর্ধমানে ছিল। সব কিছুরই তাদের দুটো করে সেট থাকত। এখানে যা ছিল সেখানেও তাই থাকবে কোন কিছুই অন্য রকম থাকত না। শুধু অফিসিয়াল কাগজপত্র বাদশার সঙ্গে সঙ্গে যেত। কিন্তু অন্য যারা পার্ষদরা বাদশার সঙ্গে যেতেন তাদের দুটো তাঁবু থাকত না। এদের জিনিষপত্র সব একটাই সেট থাকত আর সেটা তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেত।

সৈন্যদের যখন একটা বিরাট গ্রুপ চলবে তখন তাদের আগে আগে একটা অগ্রবর্তি গ্রুপ যাবে, তারা আগে আগে গিয়ে রাস্থা ঘাট তৈরী করে নেবে, খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে রাখবে ইত্যাদি। ভরতও ঠিক এই ভাবেই অগ্রসর হলেন শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য। ভরতের অগ্রবর্তি বাহিনী এগিয়ে গেল সব রাস্থা পরিষ্কার করার জন্য, কেননা ভরতের সঙ্গে শত শত রথ যাবে, হাতি যাবে, চতুরঙ্গী বাহিনী যাবে। এইভাবে ভরতরা সবাই চলতে শুরু করেছে।

এখন অযোধ্যার যত নাগরিক অধিবৃন্দ ছিল তারাও সব ছুটে এসে বলছে, আমরাও শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে যাব। এখানে বাল্মীকি একটা বিরাট তালিকা দিয়েছেন কারা কারা যাচ্ছে। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় সেই যুগে কি ধরণের লোক ছিল, তারা কি কি পেশায় নিযুক্ত থাকত। মণিকাররা যোগ দিয়েছে, মণিকারদের কাজ ছিল মণি, মুক্তা, দামী পাথর দিয়ে অলঙ্কার বানান। কুম্ভকাররা এলেন, যারা সূতোর কাজ করেন, যারা শস্ত্র তৈরী করতেন, চন্দন কাঠের যারা কাজ করতেন, হাতির দাঁতের কাজ যারা করতেন, যারা চুল বানাত, যারা আতর বানাত, যারা স্বর্ণকার, যারা কার্পেট বানাত, গরম জল দিয়ে যারা স্নান করানর কাজ করতেন, তখনকার দিনে গরম জলে স্নান করানোর বিশেষজ্ঞ দল ছিল, আজকের দিনে যেটা গীজারের কাজ, তারপর যারা বৈদ্য ছিলেন, যারা ধুপদ, ধুপদ হচ্ছে ধুপ, ধুনো তৈরীর ব্যাপারে আলাদা একটা জাতিই ছিল যারা এই কাজে বিশেষজ্ঞ ছিল, তারপর এলেন শৌণ্ডিকরা, শৌণ্ডিক হল যারা মদের কারবার করত, তারপর এলেন ধোপা, দর্জি, নট, যারা নাচগান দেখিয়ে বেড়াত, এরা সবাই মিলে চলেছে। প্রায়ই লোকেরা ভুল করে মনে করে জাতি আর বর্ণ এই দুটো আলাদা। জাতিটা হচ্ছে পেশা, ইংরাজীতে বলা হয় guild যেমন শোনা যায় ট্রেড গীল্ড, যারা এক ধরণের কাজ কারবার বংশ পরম্পরায় করে আসছে। এখনকার দিনে যে ডাক্তার তার তিন পূর্বপুরুষ ছিল ডাক্তার এখন তার ছেলে যদি ডাক্তারি না করে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায় কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু তখনকার দিনে এদের নিয়ম ছিল প্রথম কথা তুমি সেই পেশাতেই থাকবে তোমার বাবা ঠাকুর্দা যে পেশাতে ছিলেন। আর যদি তুমি পেশা পাল্টাতে চাও, তাহলে তুমি যে পেশাতে যাবে সেই পেশাতে যিনি অভিজ্ঞ তার কাছে তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যেমন মনে করা যাক এক ডাক্তার পরিবারে এক ছেলে ঠিক করল আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব, সে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার এডমিশন টেস্টে পাশ করলে তাকে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করিয়ে দেবে। কিন্তু তখনকার দিনে সাধারণত পূর্বপুরুষের পেশাকে পাল্টাবার জন্য অনুমতি দেওয়া হত না। যদি দেখা যায় তার এই পেশাতে উৎসাহ নেই বা কুশলতা নেই তখন তার পছন্দের পেশাতে পাঠিয়ে দেওয়া হত ঠিকই, কিন্তু তার গোত্রটা পাল্টে দেওয়া হত। তোমার এখন এদিকের সাথে আর কোন সম্পর্ক রইল না, তোমার যিনি গুরু হবেন তাঁর গোত্রটাই তোমার এসে যাবে। একটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে, এখন তাকে কোথায় বিয়ে দেওয়া হবে? মেয়েটি যে ধরণের কাজের পরিবেশে বড় হয়েছে সেই ধরণের পরিবেশেই পাঠান হবে। এখন যদি তাকে ঐ ছেলেটির সাথে আগের গোত্র বিচার করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের পেশাতে মিল হবে না। ভারতে যে বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীর দেখাশোনার ব্যাপারটা চলে আসছে তার উদ্দেশ্যই ছিল যাতে দুজনের পেশা ও পরিবেশে সামঞ্জস্য থাকে এবং বিয়ের পর পেশাগত কাজের ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগিতা থাকে। এই মেয়ে এই পরিবেশে বড় হয়েছে, রাজকুমারী নয় বছর থাকতে থাকতে তাকে আরেকটা রাজভবনে পাঠিয়ে দাও, সেখানে শাশুড়ি তাকে নিজের মেয়ের মত বড় করবে। এখন পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ডাক্তারী পাশ করা মেয়ে বিয়ে করছে এক ইঞ্জিনিয়ারকে, আবার ছেলে হল ব্রাহ্মণ মেয়ে হল কায়স্থ, কোথাও কোন মিল পাওয়া যাবে না, যার ফলে কিছু দিনের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে।

এখানে জাতি বলতে বোঝাচ্ছে পেশা। এই জাতিগুলিকে আবার অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করা ছিল। তার মধ্যে কিছু কিছু কাজকে বলা হত ব্রাহ্মণ, কিছু কিছু কাজকে বলা হত ক্ষত্রিয়, সেই রকম কিছু কিছু কাজকে বলা হত বৈশ্য। আমরা শূদ্র বলতে এখন যেটা বুঝি অস্পৃশ্য, তখন কিন্তু তা ছিল না। যারাই পরিচর্যার কাজ করছে, মানে অপরের সেবার কাজ করছে সবাইকেই শূদ্রের মধ্যে গণ্য করা হত। কিন্তু পরে যখন আর্যরা বিভিন্ন দিকে বিস্তার করতে আরম্ভ করলেন, তখন যারা নতুন বহিরাগতরা আর্যদের মধ্যে

প্রবেশ করতে আরম্ভ করল তখন তাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট কাজ ঠিক করে না দেওয়ার জন্য সবাইকে শূদ্র করে দিল। তখন শূদ্র বলতে খারাপ কিছু ছিল না। অনেক পরের দিকে শূদ্রদের প্রতি একটা বিরূপ দৃষ্টি নেওয়া শুরু হয়। এর পেছনেও কারণ আছে। তখন দেখা হত কে কি কাজ করছে। তুমি যদি শুধু শিক্ষার কাজ কর তাহলে তুমি ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ আর যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত যত কাজ করা মানে ক্ষত্রিয়, যেখানে টাকা পয়সার লেনাদেনা সেখানে বৈশ্য, আর তোমার কাজ যদি শুধু এই তিন বর্ণের লোকেদের সেবা করা হয় তাহলে তুমি শূদ্র। বেদেই আমরা দেখি একটি জায়গায় বলা হচ্ছে – আমার বাবা ব্রাহ্মণ, আমার মা বৈশ্য আমি পরিচর্যার কাজ করছি। ইদানিং হাসপাতাল গুলিতে যারা নার্সের কাজ করছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে এদের সবাইকে শূদ্র রূপেই গণ্য করা উচিত। কিন্তু পরের দিকে সমস্যা হল, আর্যরা যত এগোতে শুরু করেছে, নতুন নতুন অনার্য জাতি গুলি আর্যদের মধ্যে মিশে যেতে লাগল তখন আর্যরা তাদের কি কাজ দেবে? তাই তাদের সবাইকে তারা শূদ্র বানিয়ে দিল। এখন নতুন যারা শূদ্ররা আর্যদের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকল, তাদের সঙ্গে নিজেদের একটা দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আর্যরা একটা সীমা টেনে দিলেন। যেমন শূদ্রদের আমরা বেদ জানতে দেব না, বেদে কোন অধিকার দেব না। এর ফলে হিন্দুদের মধ্যে যারা আসল শূদ্র ছিল তারাও বঞ্চিত হয়ে গেল আর অন্য দিক থেকে নতুন শূদ্ররাও পুরনো শূদ্রদের অন্য চোখে দেখতে থাকল। শঙ্করাচার্য যখন দেখলেন এতে অনেক সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তখন অনেক শূদ্র জাতিকে তিনি ক্ষত্রিয় বানিয়ে দিলেন, কেরালাতে অনেক শূদ্রকে তিনি ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যেও নিয়ে এসেছিলেন। সেইজন্য জাতি ও বর্ণ সব সময় দুটো আলাদা জিনিষ।

অযোধ্যার সব জাতি ও বর্ণের লোকেরা ভরতের সঙ্গে চলেছে। শ্রীরামচন্দ্র যে পথ দিয়ে গিয়েছেন সেই পথকে অনুসরণ করেই সবাই চলেছে। শ্রীরামচন্দ্র যখন নিষাদ রাজ্যের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন তখন নিষাদরাজ গুহকের সাথে তাঁর খুব সখ্যতা হয়েছিল। নিষাদরাজ খবর পেয়েছে ভরত বিরাট বাহিনী নিয়ে আসছেন। নিষাদরাজ তার লোকজনদের ডেকে বলছে – আমাদের কাছে পাঁচশ খানা নৌকা আছে, প্রত্যেকটি নৌকাতে একশ জন করে যোদ্ধা তৈরী হয়ে থাক। মানে, পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে গুহক প্রস্তুত করে রাখলেন। এটাও বাল্মীকির কবিতার বর্ণনা, পঞ্চাশ হাজার সৈন্য বলাতে একটু খটকা লাগে। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে তৈরী করে নিষাদরাজ বলে দিলেন – যত রকমের অস্ত্র-শস্ত্র হতে পারে সব সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাক। যদি বুঝি ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে আক্রমণ করতে আসছে তাহলে আমরা তার আগেই নদীর চারিদিক ঘিরে নিয়ে ভরতের সব সৈন্যদের শেষ করে দেব। ভরত নিষাদরাজকে দেখেই কাঁদতে শুরু করেছে। শুধু যে কাঁদছেন তাই নয়, ভরত বলছেন – হে নিষাদরাজ! তুমি আমাকে দেখাও শ্রীরামচন্দ্র কোথায় রাত্রিবাস করেছিলেন, ভাই লক্ষ্মণ কিভাবে ছিলেন। সব জায়গা গুলো দেখে ভরত অশ্রুপাত করে চলেছেন। ভরত খুব দুঃখ করে শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র নিষাদরাজকে বলছেন – হে গুহক! যে শ্রীরামচন্দ্রের মৃগচর্মের উপরে বিশেষ চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত সুসজ্জিত শয্যার উপরে শয়ন করা অভ্যাস তাঁকে কিনা এই তৃণশয্যায় শয়ন করতে হয়েছিল। এই ঘাসের উপর নিশ্চই আমার বৌদি সীতা শয়ন করেছিলেন, কারণ আমি দেখছি এখানাকার ঘাসে সুবর্ণ কণা লেগে রয়েছে। আমাদের অবশ্য জানা নেই সোনার অলংকার থেকে সোনার রেণু ঘাসের উপরে লেগে থাকতে পারে কিনা অথবা সীতার ব্যবহৃত সোনালি রঙের কোন অঙ্গরাগও ঘাসে লেগে থাকতে পারে। তবে কবির কল্পনা মনে করলে ঠিকই আছে বলতে হবে। পরে তুলসীদাস ও অন্যান্য যাঁরা রামায়ণ রচনা করেছেন তাঁরাও বাল্মীকির এই কাব্যিক বর্ণনাগুলিকে আক্ষরিক ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

আমাদের বেদে রাক্ষস, দানব, অসুর বলতে বোঝাত যাদের মধ্যে প্রাণশক্তি বেশি। এদেরকেই বাল্মীকি বানিয়ে দিলেন যারা ঋষিদের বিরোধী তারাই রাক্ষস, দানব ইত্যাদি। সেখান থেকে বানিয়ে দিলেন যারা ঋষিদের বধ করে তাঁদের মাংস খায়। সবাই তাই মনের মধ্যে রাক্ষস দানবের ব্যাপারে এই মনোভাবকেই গেঁথে নিয়েছে। বাল্মীকি আদিকবি, তিনি যখন এই কথা বলেছেন তা সত্যিই হবে। এখনতো রাক্ষস মানেই যারা মানুষের মাংস খায়। বেদে কোথাও কিন্তু এই ধরণের বর্ণনা ছিল না। রাক্ষস দানবদের

সম্বন্ধে যত আজগুবি ধারণা সব বাল্মীকির কাছ থেকে এসেছে। যেমন সক্রেটিস লিখে দিলেন মেয়েদের পুরুষদের থেকে কম দাঁত হয়, পুরুষদের বত্রিশ আর মেয়েদের আটাশটি। বার্ণাড'শ খুব মজা করে বলেছিলেন – এই দাঁতের সংখ্যা বলার আগে সক্রেটিস একবার মিসেস সক্রেটিসকে বলতে পারতেন – একবার মুখটা হাঁ করো তো দেখি তোমার কটি দাঁত। যেহেতু সক্রেটিস বলে দিয়েছিলেন, সেইজন্য অনেক বছর, প্রায় একশ বছর মানুষের মনে এটাই বদ্ধ ধারণা ছিল।

যাই হোক গুহক বুঝতে পেরেছেন ভরতের অভিপ্রায়। বুঝতে পেরেই তিনি খুব খাতির যত্ন করেছেন। নিষাদরাজ্য থেকে এরপর ভরত এসে পৌঁছেছেন ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে। কিছু দিন আগে শ্রীরামচন্দ্রও ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে এসেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন সীতা আর লক্ষ্মণ সহ। এখন ভরত এসেছেন বিরাট চতুরঙ্গী সেনাবাহিনী নিয়ে। ভরদ্বাজ মুনি ভরতকে বলছেন – **কিমিহাগমনে কার্যং তব রাজ্যং প্রশাসতঃ। এতদাচক্ষ্ব সর্বং মে ন হি মে শুধ্যতে মনঃ।।**২/৯০/১০। আমিতো যা শুনেছি সেই অনুসারে তুমি তো এখন রাজা, তা তুমি ঠিক ভাবে রাজ্য চালাতে পারছ তো। তা হঠাৎ রাজ্য ছেড়ে এত লোকজন নিয়ে এখানে আসার তোমার হেতু কী? কি এমন তোমার বিপদ হয়েছে আমাকে সব খুলে বল। তোমার মনের হাবভাবে আমার মন কিন্তু শুদ্ধ হতে পারছে না, আমি ঠিক ঠিক শান্তি পাচ্ছিনা তোমাকে দেখে। তার মানে ভরদ্বাজ বলছেন ভরতের মনে কিছু গোলমাল আছে। ভরদ্বাজ মুনি বলছেন – এমনতো নয় যে শ্রীরামচন্দ্র আর সীতাকে বিনা কোন অপরাধে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে নাশ করে, কোন উপায়ে বধ করে তুমি নিষ্কন্টক রাজ্য চালাতে চাইছ। ইতিহাসে আমরা এই ধরণের অনেক নজির পাই, সাজাহান, ঔরঙ্গজেব যখন দিল্লীর মসনদে বসেছিল তখন এদের মনে সব সময় ভয় থাকত যে, এদের ভাইরা কোন গুপ্ত আক্রমণ করে ঝামেলা না সৃষ্টি করে। এই ভয়ে এরা কাউকে অন্ধ করে দিয়েছে, কাউকে গলা কেটে দিয়েছে নয়তো আফিং খাইয়ে খাইয়ে তাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। ভরদ্বাজ এই কথাটাই বলছেন – শ্রীরামচন্দ্রের দিকে থেকে তোমার যাতে কোন আশঙ্কা না থাকে সেইজন্য তুমি শ্রীরামচন্দ্রের কিছু খারাপ করতে চাইছ নাতো?

ভরদ্বারজের কথা শুনে ভরত মনে খুব আঘাত পেয়ে কাঁদতে শুরু করেছেন। ভরতের সব কথা শুনে ভরদ্বাজ মুনি বলছেন – আসলে আমি তোমার মনের সব কথাই জানি। কিন্তু যাতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তোমার ভাব আরও গভীর হয়, সেই কারণেই তোমার মুখ থেকে এই কথাগুলো বার করালাম। মানুষের মধ্যে যদি কোন ভাব থাকে সেই ভাবটাকে যদি মুখে প্রকাশ করে বলতে থাকে তাহলে সেই ভাবটা আরও পাকা হয়। একটা ছেলে মেয়ের মধ্যে অনেক দিন ধরে ভালোবাসা চলছে, কিন্তু দেখা হলেই বলে আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। সে কি ভালোবাসছে না? ভালোবাসে ঠিকই, কিন্তু ভালোবাসার কথা মুখে যত বলবে ভাবটাও তত পাকা হতে থাকে। সেইজন্য খারাপ কথা, অশুভ কথা মুখে বলতে নেই। এখন আমি একজনকে আচার্যকে ভালোবাসি, একজন এসে সেই আচার্যের নামে খুব নিন্দা করে অনেক কথা বলে বলছে এই ধরণের আচার্যকে কোন শিষ্যই ভালোবাসতে পারেনা। আমি তখন প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলব – না, আমি তাকে জানি, তিনি কখনই এই রকম নয়, আমি তাঁকে প্রচণ্ড ভালোবাসি, আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে তাঁর প্রতি, তাঁকে আপনি যতই খারাপ বলুন আমি তাঁকে ভালোবাসি, বেশ করি, কে কি মনে করল আমি তোয়াক্কা করি না। এতে আমার মনের ভাবটা আরও পাকা হয়ে গেল।

এরপর ভরত বলছেন – হে মুনিবর! আপনার এখানে সব তপস্বীরা থাকেন তাই আমার সেনাবাহিনীদের নিয়ে এখানে আসিনি, ওদের সব দূরে বাইরে অপেক্ষা করতে বলেছি। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে ওদের এখানে নিয়ে আসতে পারি। ভরদ্বাজ মুনির অনুমতি পাওয়ার পর সব সৈন্যদের নিয়ে আসা হয়েছে। এখন একেই তো মুনির ছোট্ট আশ্রম, তার ওপর এত লোক, আবার সব রাজ অতিথি, কিন্তু এত লোককে আপ্যায়ন করার পর তাদের খাওয়া দাওয়ার কি উপায় হবে? বেদে বলা হয় যে, বেদের মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা হয় তাহলে সেই মন্ত্রের শক্তি কাজ করতে শুরু করে দেয়। ভরদ্বাজ তখন

বেদমন্ত্র পাঠ করতে শুরু করেছেন – আমি বিশ্বকর্মা তৃষ্টা, এই দেবতাকে আবাহন করছি, আমার মনে ইচ্ছে হয়েছে ভরতের এই সেনাবাহিনীর অতিথি সৎকার করব, তিনি যেন সব ব্যবস্থা করেন। আমি ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের সমস্ত দেবতাদের আহ্বাণ করে প্রার্থনা করছি আমি এই বিশাল সেনাবাহিনীদের তাদের মনের মত করে আদর যত্ন করতে চাই, দেবতারা যেন এর ব্যবস্থা করেন। পিতৃগণ, আকাশে, পূর্ব পশ্চিম সহ সমস্ত দিকে যত নদী আছে তাদের সবাইকে আমি আবাহন করে বলছি তাঁরা যেন সবাই এখানে উপস্থিত হন। ভরদ্বাজ এখানে যাদের যাদের উদ্দেশ্য করে আবাহন করে উপস্থিত হতে বলছেন তার মানে এই নয় যে পশ্চিম দিকে যত নদী আছে সবার গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে, এঁরা সকলে যে শরীরে উপস্থিত হবেন, সেই সব শরীর হচ্ছে দিব্য শরীর। প্রত্যেকটি জিনিষরই একটা ভৌতিক শরীর আর একটি দিব্য শরীর থাকে। নদী তার ভৌতিক শরীর নিয়ে আসছে না, তার দিব্য শরীর নিয়ে আসছে।

ভরদ্বাজ মুনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছেন – এই নদী গুলিকে আবাহন করছি তাঁরা যেন সুরা নিয়ে আসেন, কেউ যেন আখের রস নিয়ে আসেন, কেউ শরবৎ, কেউ শুধু ঠাণ্ডা মিষ্টি পানীয় জল নিয়ে আসেন। প্রত্যেকটা নদীর এই সব পানীয়ের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা আছে। নদী একদিকে হচ্ছে প্রবাহিনী, আবার অন্য দিকে এঁরা প্রত্যেকেই দিব্যশক্তির অধিকারী। ভৌতিক রূপে আমরা দেখছি গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, গোদাবরী ইত্যাদি কিন্তু এঁদের দিব্য রূপ হচ্ছে দ্রবণত্ব। তাঁদের দিব্যশক্তিতে তাঁরা যে কোন ধরণের পানীয় প্রস্তুত করে নিতে পারেন। ভরদ্বাজ মুনি তাই বিভিন্ন নদীর দিব্যরূপকে আবাহন করে বিভিন্ন পানীয়ের ব্যবস্থার দায়ীত্ব দিয়ে দিলেন। কেউ আনবে সুরা, কেউ আনবে আখের রস, কেউ শরবৎ। ভরদ্বাজ মুনি মন্ত্র উচ্চারণ করে বলছেন – আমি বিশ্বাবসু ও হাহাহুহু, হাহাহুহু এনারা হচ্ছে ঋষি, এনারা নাট্যকলা, নৃত্যাদি শাস্ত্রে পাঙ্গব হতেন। অপ্সরা, দেবগন্ধর্ব সবাইকে আহ্বাণ করছি এখানে এসে সেনাবাহিনীদের মনোরঞ্জন দেওয়ার জন্য। ঘৃতাচী বলে একজন খুব সুন্দরী ও নামকরা অপ্সরা ছিলেন। ব্যাসদেব, যিনি ঋষি ছিলেন, বিয়েথা করেননি, এই ঘৃতাচীকে দেখেই তাঁর মনে প্রবল কামবেগের উদয় হয়েছিল। ঘৃতাচী তো ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে টিয়াপাখির রূপ ধারণ করে নিয়েছিল। ব্যাসদেব তখন যজ্ঞে অগ্নির মন্থন করতে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর মনের দৃষ্টি ঘৃতাচীর দিকে গিয়ে তাঁর মনে সন্তান লাভের ইচ্ছে জেগে উঠেছে। ব্যাসদেব ছিলেন খুব উচ্চকোটির ঋষি, তিনি ঘৃতাচীকে দেখে দেখে তাঁর বাসনাকে একটা ভৌতিক রূপ দিয়ে যজ্ঞের অগ্নিতে স্থাপন করলেন। সেইখান থেকেই শুকদেবের জন্ম হয়। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে ঘৃতাচী শুকদেবের জননী। অন্য দিকে অগ্নিতে শুকদেবের জন্ম হওয়াতে তাঁকে অযোনিজ বলা হত।

ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, বিশ্বকেশী, অলভূষা, হেমা, সোমা, নাগরত্না এনারা সবাই ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত সব অপ্সরা, এদের সবার নাম করে ভরদ্বাজ মুনি মন্ত্র পাঠ করছেন – যত অপ্সরা ইন্দ্রের সেবা করেন, সবাইকে আমি আবাহন করছি। যেমন ইংরাজী নিমন্ত্রণ পত্রে বলা হয় – I request the pleasure of your attendance, আপনাকে প্রার্থনা জানাই আপনার উপস্থিতি যেন আনন্দদায়ক হোক, আবাহন করার অর্থ তা নয়, এখানে অর্ডার করা হচ্ছে।

ভরদ্বাজ মুনি আবাহন করে বলছেন – **বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপ-প্রচ্যুতানি চ। সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ।।২/৯১/২১**। স্বর্গের যত রকমের বিচিত্র মালা যেন এখানে এসে হাজির হয়, বিভিন্ন রকম বাহারের ও রঙের ফুল যেন এখানে এসে হাজির হয়। *সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ*– সব থেকে উৎকৃষ্ট ও দামী সুরা যেন এখানে চলে আসে, *মাংসানি বিবিধানি চ* – এখানে এসে আবার গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, পরিষ্কার মাংস বলা হচ্ছে কিন্তু পরের দিকের অনুবাদকারীরা কিছুতেই মাংসকে মাংস বলতে রাজী হবেন না, তাই এখানে মাংসের অনুবাদ করা হচ্ছে নানা রকমের ফল। এই সব বলার পর ভরদ্বাজ মুনি – **এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাহপ্রতিমেন চ। শিক্ষাস্বরসমাযুক্তং সুব্রতশ্চাব্রবীন্মুনিঃ।।২/৯১/২২**। এইভাবে আবাহনের পর ভরদ্বাজ মুনি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করছেন। কিরকম

ভাবে পাঠ করছেন, তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে *শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্ সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ* – বর্ণ, স্বর, মাত্রা, শব্দোচ্চাণ-প্রযত্নঃ, সমরূপে উচ্চারণ ইত্যাদি হল শিক্ষাবিষয়ক। এখানে বলা হচ্ছে ভরদ্বাজ মুনি শিক্ষা ও স্বরকে একত্র ভাবে প্রয়োগ করে বেদের মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। শিক্ষাতে বেদমন্ত্রের ঠিক ঠিক উচ্চারণ কি ভাবে করতে হবে বলা হয়েছে। যখন ঠিক ভাবে উচ্চারণ করা হবে তখন ঐ জিনিষটাই এসে হাজির হয়ে যাবে। ভরদ্বাজ একটা একটা বস্তুর উপর ধ্যান করে উচ্চারণ করছেন সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিষ এসে হাজির হয়ে যাচ্ছে।

বাল্মীকি এর পরে বিশাল বর্ণনা করছেন কি কি জিনিষ স্বর্গ থেকে হাজির হয়েছে। বলছেন যত রকমের দামী দামী চাদর, আসন সব এসে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে যেন এক বিরাট ভোজ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সৈন্যদের বিশ্রামের জন্য নদীর ধারে হাজার হাজার বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে, বিশ্বকর্মাকে আবাহন করা হয়েছে কিনা। সবার মনোরঞ্জনের জন্য চারিদিকে সব মিলিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার স্বর্গের দিব্য অপ্সরা নারীরা এসে গেছেন। তারা এসে সব নানা রকমের নৃত্য করতে শুরু করেছে। **বিল্বা মার্দঙ্গিকা আসংশ্ছম্যাগ্রাহা বিভীতকাঃ**।২/৯১/৪৯। বলছেন এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে বিল্ববৃক্ষরা মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে, বটবৃক্ষরা তাল দিচ্ছে, পিপ্পল গাছ সেই তালে নৃত্য করছে। এখন বুঝুন বাল্মীকি কি বলতে চাইছেন, মানে এমন আনন্দের ফোয়ার উঠেছে যে বৃক্ষরাও নৃত্য করতে শুরু করেছে। এখানে বৃক্ষের সূক্ষ্মরূপ হতে পারে বা শুধু কাব্যিক বর্ণনা হতে পারে। বৃক্ষগুলি কোনটা কুজ্বা, কেউ বা বামন হয়ে গেছে। এইভাবে গাছগুলো নানান রূপে রূপান্তরিত হয়ে গেছে শুধু ভরতের সৈন্যদের আনন্দ বর্ধনের জন্য। এর ওপর যত স্ত্রীলিঙ্গ গাছ ছিল আর যত লতা বৃক্ষ ছিল সব নারীর রূপ ধারণ করে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে এসে হাজির হয়েছে।

বলছেন – **সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সঞ্চ বুভুক্ষিতাঃ। মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছত**।।২/৯১/৫২। এর সবাই পরিবেশন করতে আরম্ভ করেছে, যারা সুরপান করতে চাইছে তাদের সুরা পরিবেশন করছে, যারা ক্ষুধার্ত হয়ে পায়েস খেতে চাইছে তাদের পায়েসে দিচ্ছে, যারা মাংস খেতে চান তারা মাংস নিতে পারেন। কিন্তু অনুবাদ করছে যারা ফল খেতে চান তার ফল নিতে পারেন। বলছেন প্রত্যেক পুরুষ পিছু সাত আট জন করে সুন্দরী নারী সেবা করতে শুরু করেছে। কেউ অঙ্গরাগ লাগাচ্ছে, কেউ স্নান করাচ্ছে। এই সব খাওয়া দাওয়া আর নারীদের সেবা পেয়ে যাদের ঘোড়া দেখার দায়ীত্বে ছিল, তাদের আর হুঁশ নেই ঘোড়া কোথায়, যাদের হাতি দেখার কাজ তাদের খেয়াল নেই হাতি কোথায় চলে গেছে, মানে সব বেহুঁশ হয়ে গেছে। বেছে বেছে যে কাউকে সেবা করছে তা নয়, সবাইকে ছোট থেকে বড় যত সৈন্য আছে সবারই সেবাতে লেগে গেছে।

এই রকম স্বর্গীয় খাওয়া-দাওয়া, আর এই রকম বিশাল রাজকীয় আদর যত্ন সেবা পেয়ে সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে – আমরা আর অযোধ্যা ফিরে যাচ্ছি না, দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতেও আর যাচ্ছি না। ভরত সুখে থাকুক, শ্রীরামচন্দ্রও সুখে থাকুক, আমরা এই দিব্য সুখে আনন্দে আছি ভাই, আমরা এদিকেও ফেরত যাচ্ছি না আর জঙ্গলের দিকেও যাচ্ছি না। এই সব বলে বলে সারা রাত সবাই খুব আনন্দ করছে আর একে অপরকে বলছে – ভাই এই সুখ ছেড়ে কি আর দণ্ডকারণ্যে যাওয়া যায়! এই সুখ ছেড়ে কে আর অযোধ্যায় ফিরে যাওয়া যাবে। আমরা এখানেই সারা জীবন থেকে যাব। বলছেন – **প্রতপ্তপিঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ূর-কৌক্কুটৈঃ**।।২/৯১/৭০। যারা আরও নিম্ন পদাধিকারি সৈন্য তাদের জন্য আছে হরিণ, ময়ূর আর মুরগির মাংস। আমাদের ধারণা যে হিন্দুরা মুরগির মাংস খেত না, কিন্তু এখানে বাল্মীকি পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, মুরগির মাংসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনেক পুষ্করিণীও তৈরী করা হয়ে গেছে যাতে সব সুরাতে পূর্ণ। এইভাবে রাতভর এলাহি খাওয়া-দাওয়া আর আনন্দ করার পর সবাই কখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে তার হুঁশও নেই। সকালে সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখে সব হাওয়া, কোথাও কিছু নেই। সব অতিথি সৎকার হয়ে গেছে তখন ভরদ্বাজ হাতজোড় করে বলছেন – আপনারা

আমাদের এত সেবা করলেন, আপনাদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবার আপনারে নিজের নিজের জায়গায় ফেরত চলে যান। এখন সেই রাতে সত্যিকারের কি হয়েছিল এটা জানার কারুর কোন উপায় নেই। এটা স্বপ্ন হতে পারে, মরীচিকা হতে পারে, কিছু একটা হতে পারে।

এরপর ভরত রাজপরিবারের সদস্যদের সাথে ভরদ্বাজ মুনির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। পরিচয়াদির পর ভরত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম থেকে সবাইকে নিয়ে চিত্রকূটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ অবস্থান করছেন। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অত সৈন্য নিয়ে ভরতের দল এগিয়ে চলেছে। এত লোকজন দেখে বন্য পশুগুলি সব এদিক ওদিক পালাতে শুরু করেছে। বনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। বনের এই নিস্তব্দতা ভঙ্গ হওয়াতে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন – একটু এগিয়ে দ্যাখো তো কি ব্যাপার। লক্ষ্মণ একটা গাছে উঠে দেখতে পেল প্রচুর সেনা এগিয়ে আসছে। লক্ষ্মণ অবাক হয়ে বলছে 'আরে, এতো দেখছি বিরাট সৈন্যবাহিনী, আবার সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নকেও দেখা যাচ্ছে। ভরত যখন সৈন্য নিয়ে আসছে তখন নিশ্চয়ই কোন বদ মতলব আছে। ভরতকে এক্ষুণি বধ করে দেওয়া দরকার'। লক্ষ্মণ বলছেন – **পূর্বাপকারিণং হত্বা ন হ্যধর্মেণ যুজ্যতে। পূর্বাপকারী ভরতস্ত্যাগেহধর্মশ্চ রাঘব।।**২/৯৬/২৪। আগে যে অপকার করেছে তাকে বধ করে দিলে কোন অপরাধ হবে না। লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – এই ভরতকে আমি এক্ষুনি বধ করে দিচ্ছি, তারপর আপনি শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে অযোধ্যার সাম্রাজ্য শাসন করুন। লক্ষ্মণ অনেক যুক্তি দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন ভরতকে কেন সে বধ করে দিতে চাইছে।

তখন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন – হে লক্ষ্মণ, নিজের বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় ও হিতৈষীদের নাশ করে যে সম্পত্তি পাওয়া যায়, সেই সম্পত্তি হচ্ছে বিষ মিশ্রিত খাবারের মত। তোমার এই ধরণের প্রস্তাব কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। আমি যদি ইচ্ছে করি তাহলে স্বর্গের ইন্দ্রত্ব পর্যন্ত আমি আমার শক্তি দিয়ে পেয়ে যেতে পারি, আমার যা সামর্থ আছে তা দিয়ে আমি পুরো পৃথিবীর শাসন ভার অধিকার করে নিতে পারি। কিন্তু অধর্মের পথ অবলম্বন করে আমি ইন্দ্রপদ লাভকেও তুচ্ছ মনে করি। হে লক্ষ্মণ, ভরত তোমাকে কবে কি অপ্রিয় ও কটূ কথা বলেছে যার জন্য তুমি এই ধরণের অধর্ম কাজের কথা চিন্তা করছ। কৈকেয়ি যাই করে থাকুক কিন্তু ভরত কবে তোমার প্রতি কি দুর্ব্যবহার করেছে, তোমার কি এমন ক্ষতি করেছে যার জন্য এই হঠকারী চিন্তা তোমার মনকে আশ্রয় করেছে। আমি জানি ভরতের মনে কোন ধরণের কুমতলব বা খারাপ অভিসন্ধি নেই। তা যদি ভরতই এখানে এসে থাকে তাহলে আর কোন চিন্তা নেই, আমি ভরতকে বলব, হে ভরত, লক্ষ্মণ বড্ড বেশি রাজ্য রাজ্য করছে, তা তুমি এক কাজ কর তুমি এই রাজ্যটা লক্ষ্মণকে ছেড়ে দাও। তাহলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে, কারণ আমারতো রাজা হবার কোন ইচ্ছাই নেই। আমি যদি এই কথা ভরতকে বলি তাহলে ভরত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য ছেড়ে দেবে। শ্রীরামচন্দ্রের এই ধরণের স্পষ্ট মন্তব্যে লক্ষ্মণ প্রচণ্ড লজ্জায় পড়ে গেছেন। এত লজ্জায় পড়ে গেছেন যে পরে লক্ষ্মণের মুখ দিয়ে আর একটি বাক্যও স্ফুরিত হল না।

ভরত শ্রীরামচন্দ্রের সামনে এসেছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে ঐ মুনিবেশে দেখছেন, দেখতে দেখতে ভরত আর নিজেকে সামলাতে পারল না। শ্রীরামচন্দ্রের বুকের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে হাপুস নয়নে শুধু কাঁদতেই থাকল। ভরত খুব সুন্দর বলছেন – **বাসোভির্বহুসাহস্রৈর্যো মহাত্মা পুরোচিতঃ। মৃগাজিনে সোহয়ামিহ প্রবস্তে ধর্মমাচরন্।।**২/৯৬৩২। যাঁর হাজার হাজার বস্ত্র ছিল তিনি মাত্র দুটো মৃগচর্ম ধারণ করে আছেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রথমে বল্কল পরিধাণ করেছিলেন, বল্কল হল গাছের ছাল। কিন্তু এখন মৃগচর্ম পড়ে আছেন। ঋষিরা দুটোই পড়তেন, মৃগচর্মও পড়তেন আবার বল্কলও পরিধাণ করতেন। বলছেন – যাঁর মস্তক সব সময় নানা রকমের ফুলের মালা দিয়ে শোভিত থাকত, সেই মাথা এখন কি করে এই জটার ভার সহন করছে। এইভাবে ভরত নানা ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের আগেকার কথা বলে দুঃখ করছেন,

তারপর একবার শুধু আর্য এটুকু উচ্চারণ করেই আর কিছু বলতে পারলেন না, চুপ করে নীরবে চোখের জল ফেলতে থাকলেন।

এর পরের সর্গটা খুব মজার, শ্রীরামচন্দ্র প্রশ্নের মাধ্যমে ভরতের কাছে খবর নিচ্ছেন অযোধ্যার সব ঠিক আছে কিনা। এই ধরণের কাব্যিক শৈলী পরে মহাভারতেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন বলছেন – হে ভরত, এমন তো নয় যে অসময়ে নিদ্রার বশীভূত হয়ে যাও। মানে, মানুষ রাত্রেই ঘুমোয়, এখন অসময়ে ঘুমোয় যখন শরীর খারাপ থাকে বা দুর্বল থাকে, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র জানতে চাইছেন ভরত তোমার শরীরের সব কুশলতো। বলছেন – সময় হলেই নিদ্রা থেকে জাগরিত হও তো? তুমি রাত্রিবেলা বিশেষ প্রহরে অর্থসিদ্ধির বিচার কর কিনা। ভরত এখন রাজা কিনা, তাই রাজার প্রধান কাজ রাজ্যের অর্থের বৃদ্ধি কিভাবে হবে চিন্তা করা। তার মানে রাত্রের শেষ প্রহরে রাজা চিন্তা করবে কিভাবে অর্থ আয় করে রাজকোষকে ঠিক রাখা যাবে। এইভাবে বাল্মীকি রাজধর্ম পালনের ব্যাপারে খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন। রাজা যদি হাজারটে কিংবা দশ হাজার মুর্খকে নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে প্রয়োজনের সময় এরা রাজার কোন কাজে আসবে না। কিন্তু যদি একটি মাত্র সুরবীর মন্ত্রী পাশে থাকে তাতেই রাজার অনেক মঙ্গল হবে। এই পুরো সর্গ জুড়ে শুধু বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে একজন দক্ষ ও সফল প্রশাসক হওয়া যায় তার উপরে।

বলছেন – **কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে। অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।।**২/১০০/৩৮। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, হে ভরত! এমনতো নয় যে তুমি কখন নাস্তিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গ কর। এখানে শব্দটা হচ্ছে লোকায়তি, লোকায়তি বলতে বোঝায় যারা সস্তার তত্ত্ব কথা বলেন। সাধারণ মানুষ মাত্রেই মৃত্যুধর্মা, মানে যে জন্ম নিয়েছে তাকে মরতে হবে। যারা মৃত্যুধর্মা তারা একটা সস্তা দর্শনকে দাঁড় করিয়ে দেয়। এরা বলে মরে যাওয়ার পরে কে দেখেছে যে সে আবার ফিরে এসেছে, কে দেখেছে যে সে আবার জন্ম নিয়েছে। তাই যত দিন বেঁচে আছ আনন্দে থাক, ভোগ করে যাও। এগুলোই সস্তার মতবাদ। যারাই এই ধরণের মতবাদ প্রচার করে এদেরকে বলা হয় লোকায়তি, সাধারণ লোকেদের মধ্যে এই ধরণের মতবাদ খুব জনপ্রিয় হয়। এর আরেকটা নাম চার্বাক দর্শন। আজকাল যেমন অনেকে স্লোগান দেয় 'শক্তির উৎস হবে বন্দুকের নল থেকে'। এটাই হয়ে গেল লোকায়তি মত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্লোগান দিলেন 'ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর'। কিন্তু আমার প্রথমে ঈশ্বরকেই ত্যাগ করে দিই। যেখানেই এই জনপ্রিয় মতের জোয়ার চলবে সেখানে যদি কেউ ঈশ্বরের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে বলবেন, তখনই বলবে ওসব বুড়ো বয়সে হবে। যখন খাবার শক্তি থাকবে না, আনন্দ ফুর্তি করার ক্ষমতা থাকবে না তখন ঈশ্বরের কথা ভাবা যাবে। সাধারণ মানুষ এই লোকায়তি মত আর বিশ্বাসকে নিয়েই চলে। যেমন বলা হয় ধর্ম হল সমাজের আফিং, এগুলো শুনতে খুব ভালো লাগে, কারণ ধর্ম পালন করা আর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা খুব কঠিণ কিনা। একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, যিনি এক সময় একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের বলতেন – এদের মাথা খারাপ তা নাহলে কেউ বলতে পারে নারী সঙ্গ করব না! এই কথা বলে তিনি খুব হাততালিও পেতেন। কেননা এটাই তো সব মানুষ চাই, যার জন্য কথাগুল খুব জনপ্রিয় হয়ে যেত। এই ধরণের মতকেই বলছেন লোকায়তি মত। মানুষ যেটা ভাবছে সেটাকেই একটা ফিলজফি দাঁড় করিয়ে দিল। ফ্রয়েড বলে দিল, মানুষের যে যৌন আকাঙ্খা, এই আকাঙ্খাই সমাজ তৈরী করে। এটা আর নতুন কি কথা, সমস্ত পশু, পাখি কীট পতঙ্গ সবার নামেই তো এই একই কথা বলা যায়। আবার একটা মত বলছে অর্থই হচ্ছে প্রধান চালিকা শক্তি।

শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে প্রশ্ন করে জানতে চাইছেন – হে ভরত যারা এই ধরণের লোকায়তি, সস্তার তত্ত্ব কথা বলে বেড়ায়, তাদের সঙ্গ করো না তো? এরা হচ্ছে – *অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ*। এরা মানুষকে পরামার্থ থেকে বিমুখ করে অনর্থের দিকে নিয়ে যায়। এদের বুদ্ধি বাচ্চাদের বুদ্ধি। বাচ্চার যে কথাগুলো খুব সহজে বুঝে নেয় বড়রা সেই কথাগুলোকেই খুব সুন্দর ভাষা দিয়ে একটা দর্শন আর যুক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। আর কি – *পণ্ডিতমানিনঃ* – এরা আসলে মুর্খ কিন্তু নিজেকে পণ্ডিত মনে করে এবং

লোকেদের মধ্যে নিজেকে পণ্ডিত বলে জাহির করে। সাধারণ মানুষের মনের চাহিদা অনুযায়ী কথা বলে দেয় বলে এরাই খুব জনপ্রিয় হয়। যে ডাক্তার রোগীর ইচ্ছানুসারে ওষুধ দেয় সেই ডাক্তারের খুব পসার হয়। মানুষ নিজের মনের কথাই শুনতে চায়। কঠিণ জিনিষ কেউ শুনতে চায় না, কঠিণ জিনিষ কেউ পালন করতে চায় না, বলে – একটু সহজ করে বলুন, সহজে কোনটা করা যায় সেটা বলুন, শর্টকাট কি আছে সেটা আমাকে দেখান। যারাই সহজ করে বলে, যারাই সহজ পথটা দেখায় তারাই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এটাই শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলছেন – তুমি এদের পাশে রেখে তোমার সর্বনাশ ডেকে আনছ না তো।

বলছেন **ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যামানেষু দুর্বুধাঃ। বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে।।**২/১০০/৩৯। এই ধরণের লোকেদের বিদ্যা, জ্ঞান সবই বেদবিরোধী। যেমন ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর, সত্যের জন্য সব ত্যাগ করা যায় কোন কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। এরা বলবে – ধ্যাৎ, ছাড়ো তো, এগুলো বুড়ো বয়সে দেখা যাব, বা আগামী জন্মে দেখা যাবে। তারপরে বলছেন –ধর্মশাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তারা তার্কিক বুদ্ধি দিয়ে *নিরর্থং প্রবদন্তি তে* নিরর্থক বকর বকর করে যাবে। কি রকম? এরা হচ্ছে *বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীম্* – এমন এমন তর্ক করবে যে তোমার মাথা ঘুরিয়ে দেবে। ধর্মশাস্ত্রই তো সব কিছু বলে দিয়েছে কোনটা করব কোনটা করব না, সেখানে আপনার আমার বুদ্ধি দিয়ে হবে না। তর্কের দ্বারা কোন কিছুর বিচার হয় না, ধর্মশাস্ত্রের দ্বারাই বিচার হবে। যার বুদ্ধি আছে সে তর্ক দিয়ে আরেকজনকে হারিয়ে দিতে পারে, তাতে কিছু হবে না, ধর্মশাস্ত্রই ঠিক করে দেবে কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়, বুদ্ধি দিয়ে তর্ক দিয়ে ঠিক করা যাবে না।

এবারে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – হে ভরত! যদি বড়লোক আর গরীবের মধ্যে লড়াই বিবাদ ইত্যাদি লেগে যায়, আর তার বিচারের জন্য যদি তারা রাজদরবারের শরণাপন্ন হয়, তখন এমন তো হয় না যে তোমার অফিসাররা বড়লোকদের কাছ থেকে অনেক উৎকোচ নিয়ে বড়লোকের অনুকূলে রায় দিয়ে দিচ্ছে? মানে তোমার অমাত্যরা সব সময় নিরপেক্ষ ভাবে সব বিচার করে রায় দিচ্ছে তো? আমাদের দেশে ঘুষের সমস্যা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। বলছেন **তানি পুত্র পশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ।।** ২/১০০/৫৯ – নিরপরাধ মানুষকে যদি দণ্ড দিয়ে দেওয়া হয়, সেই দণ্ড ভোগের সময় তার যে চোখের জল পড়বে, সেই চোখের জলে রাজার সন্তান আর পশুর হানি হয়ে যায়। ভারতীয় ঐতিহ্যে সন্তান আর পশুকে, প্রচণ্ড মূল্যবান বলে মনে করা হত। পশু বলতে আবার গরুকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। এই দুটোকেই তখনকার মানুষ সম্বল মনে করত। এখন যেমন ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দিয়ে বিচার করা হয় কে কত বড়লোক, আগেকার দিনে টাকা পয়সাকে অত গুরত্ব দিত না, তখন দেখত কার কত পশুধন আছে, সে গরু হোক, ঘোড়া হোক কিংবা হাতী হোক।

এরপর শ্রীরামচন্দ্র ধর্ম, অর্থ আর কামের উপর ভরতকে বিরাট লম্বা ভাষণ দিচ্ছেন। বলছেন রাজার চৌদ্দ রকমের দোষ আছে, হে ভরত, তুমি সেই ধরণের কোন দোষ করছ না তো? এর মধ্যে রাজার প্রথম দোষ হল নাস্তিকতা, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা' রাজা যেন এই ধরণের কথা কখন না বলে। রাজার অসত্য কথা বলা, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, দীর্ঘসূত্রতা মানে আজ থাক কাল করব, কালকে না হলে পরশু করব, জ্ঞানী পুরুষের সঙ্গ না করা, আলস্যতা এই ধরণের নানা দুর্গুণের বিরাট ফিরিস্তি দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, হে ভরত, তুমি এই সব করছ না তো। রাজার এই ধরণের সুগুণ দুর্গুণের কথা রাজাদের সব সময় মনে থাকত না, রাজার মন্ত্রীরা সাধারণত ব্রাহ্মণ হতেন, তিনি এই সব মুখস্ত করে রাখতেন আর রাজাকে সময় সময় মনে করিয়ে দিতেন।

শ্রীরামচন্দ্রের সব কথা শোনার পর ভরত একে একে সব খবর দিয়ে রাজা দশরথের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে বললেন – আমাদের পরমপূজ্য পিতৃদেব আমাদের ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন, সব ক্রিয়া কর্মাদি হয়ে গেছে, আপনি এবার অযোধ্যায় ফিরে চলুন, আমরা আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই

এসেছি, আপনি এখন এই সাম্রাজ্যের রাজ্যভার সামলান। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শ্রীরামচন্দ্র খুব কষ্ট পেয়ে চোখের জল ফেলছেন। তারপর তিনি ও লক্ষ্মণ মিলে পিতার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি অর্পণ করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন – **ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে। পিতুশ্চকার তেজস্বী নির্বাপং ভ্রাতৃভিঃ সহ।**।২/১০৩/২৯। আগে আগে যে মাংস শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল এখানে কিন্তু আর মাংস শব্দ বলছেন না বদরী মিশ্রিত ইঙ্গুদি ও তিলবাটার পিণ্ড, ইঙ্গুদি কি ফল আমাদের জানা নেই, তবে বদরী এক ধরণের বুনো কুল, এখানে বলা হচ্ছে দুটো তিনটে ফলের শাঁস মিশিয়ে পিণ্ড তৈরী করে বাবার নামে পিণ্ড দান করা হল। আগে পরিষ্কার মাংস শব্দটা বলা হয়েছিল কিন্তু এখানে মাংস কেন বলা হল না? কারণ পিণ্ড দানে মাংস ব্যবহার করা হয় না। পিণ্ড দান করে শ্রীরামচন্দ্র ভরত আর লক্ষ্মণের দুই হাত ধরে কাঁদতে শুরু করলেন। চারজন ভাই মিলে এমন কান্না শুরু করলেন যে দূরে যে সৈন্যরা রয়েছে তারাও সেই কান্না শুনে বলছে নিশ্চয়ই ভরত আর শ্রীরামচন্দ্রের মিলন হয়েছে তাই এত কাঁদছেন। গ্রাম দেশে এখনও দেখা যায় যখন কেউ মারা যায় মেয়েরা চিৎকার করে এমন কাঁদে যে অনেক দূর থেকে সেই কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। কান্না নিয়ে একটা মজার কাহিনী আছে, বাড়িতে কেউ মারা গেলে কতক্ষণ আর কাঁদবে, আবার অনেক পরিবারে এমন কোন লোকই নেই যে কাঁদবে। সেইজন্য এক সময় কাঁদার জন্য লোক ভাড়া পাওয়া যেত। তখনকার দিনের হিসাবে এক টাকা করে দেওয়া হয়েছে চারজন মেয়ে এসে কাঁদবে, মেয়ে চারটি এসে এমন কান্না শুরু করেছে, নানান সুরে কাঁদছে, কান্না আর থামে না। বাড়ির লোকেরা এবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বাড়ির লোকেরা বলছে এবার তোমাদের কান্না থামাও। মেয়ে চারজন তখন বলছে – কান্নার জন্য এক টাকার আর কান্না বন্ধ করার জন্য দু টাকা। বাড়ির লোকদের বাধ্য হয়ে তখন দুটো টাকা দিয়ে কান্না বন্ধ করতে হল।

যাই হোক অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর সবাই শান্ত হয়েছেন। ভরত যে শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন এবারে সেই নিয়ে অনেক কথাবার্তা চলছে, সব শেষে শ্রীরামচন্দ্র তখন বুঝিয়ে বলছেন – **নাত্মনঃ কামকারো হি পুরুষোহয়মনীশ্বরঃ। ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি।**।২/১০৫/১৫। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – জীব ঈশ্বরের মত স্বাধীন নয়। বাল্মীকি রামায়ণে ঈশ্বরের ধারণা আসতে শুরু হয়ে গেছে। ঈশ্বর হচ্ছেন, যিনি সব কিছুর নিয়ন্তা। বলছেন জীব স্বাধীন নয় বলে কাল তাকে নাচাতে থাকে। সেইজন্য আমাদের কি করা উচিৎ? সমস্ত সংগ্রহের যে শেষ, সেটা হচ্ছে বিনাশ, যে কোন জিনিষের বিনশ্যতি হচ্ছে শেষ কথা। যারই জন্ম হয়েছে তারই বিনাশ হবে। যতই লৌকিক উন্নতি হোক তার পরিণাম পতন, যত সংযোগ আছে তার শেষ পরিণতি বিয়োগ আর মৃত্যুই প্রত্যেক জীবনের ইতি।

এখানে দেখার জিনিষ হল, যিনি মহাপুরুষ আর যিনি সাধারণ, কষ্ট দুজনেরই হয়, মহাপুরুষ যিনি তিনি এই কষ্ট থেকে তাড়াতাড়ি নিজের সাম্য ভাবকে ফিরে পান, সেই তুলনায় সাধারণ পুরুষদের সময় অনেক বেশি লাগে। ঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজী এনারাও অনেক কষ্ট পেতেন, আমরা অনেক সময় ভাবি মহাপুরুষদের কোন কষ্ট হয় না। এইজন্য রামায়ণের সিরিয়ালে বা অন্যান্য রামায়ণে দেখাবে না যে শ্রীরামচন্দ্র ভরত লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন, তাহলে তো শ্রীরামচন্দ্রের ভগবানত্ব থাকবে না। কিন্তু ভগবানত্ব যদি থাকে তাহলে তিনি কাঁদবেন, কিন্তু কি হয়, এনারা নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন।

শ্রীরামচন্দ্রও নিজের সাম্য ভাবে ফিরে এসে ভরতকে বোঝাচ্ছেন – হে ভরত, তুমি বৃথা শোক করো না। মানুষের আয়ু ক্রমাগত ক্ষীণ হতেই থাকে, মৃত্যু ছায়ার মত তার সাথে সব সময়ই চলছে। মানুষ যেখানেই পৌঁছে যাক না কেন, যদি কোন লম্বা তীর্থাদিতেও চলে যায় মৃত্যু তার সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে, মৃত্যুকে নিয়েই আবার বাড়িতে ফিরে আসে। শ্রীরামচন্দ্র খুব সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন – মানুষ সূর্যোদয় দেখে খুশি হয় আবার সূর্যাস্ত দেখেও খুশি হয়, কিন্তু সে একবারও ভাবে না যে, প্রত্যেক দিন তার জীবন থেকে একটা করে দিন হ্রাস হয়ে যাচ্ছে। যদি তার জীবনের উদ্দেশ্য হয় যোগের তাহলে যোগের সম্ভবনা কমে

গেল, যদি জীবনের উদ্দেশ্য ভোগ হয় তাহলে ভোগের সুযোগ কমে গেল। যারা বুড়ো হয়ে গেছে, দৃষ্টি শক্তি চলে গেছে, নড়াচড়া করতে পারেনা, তাকে দেখার কেউ নেই, শুধু কষ্টই ভোগ করে যাচ্ছে তখন খালি ভাবে, আরেকটা দিন চলে গেল, আমি মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি এই কষ্টের দিনগুলি থেকে একটা দিন তো কমল। যদি এরা পুনর্জন্মে নাইই বিশ্বাস করে তাহলে এত কষ্ট সহ্য না করে এরা কেন আস্তে করে গড়িয়ে গড়িয়ে গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করছে না! তাও করতে পারবে না। কারণ মনের মধ্যে সেই বিশ্বাসটাও নেই যে, মৃত্যুই শেষ। দেহের প্রতি সমস্ত মানুষের প্রচণ্ড আসক্তি, রাজযোগে একে বলছে অভিনিবেশ। মানুষের নিজের শরীরের প্রতি আসক্তিটা সহজে যেতে চায় না।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – যেমন নদীর জল প্রবাহ একবার চলে গেলে আর ফিরে আসেনা, ঠিক তেমনি মানুষের জীবন থেকে যে একটি দিন চলে গেল সেটি আর ফিরে আসবে না। সেইজন্য নিজেকে **আত্ম সুখে নিয়োক্তব্যঃ**(২/১০৫/৩১) নিজেকে আত্ম কল্যাণে সব সময় নিযুক্ত রাখতে হয়। যদি আত্ম কল্যাণে না লাগাও তাহলে সময়টা চলে যাবে। আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকিয়ে হিসেব করি সারা দিন চব্বিশ ঘন্টা ধরে এক মাসে মোট সাতশ কুড়ি ঘণ্টা আমরা কি কাজে বেশি ব্যয় করছি, কতটা অর্থ সাধনে ব্যয় করলাম, কতটা কাম সাধনে লাগালাম, কতটা ধর্ম সাধনের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করলাম, মোক্ষ সাধন না হয় ছেড়েই দিলাম, ভালো করে হিসেব করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ সময় নিরর্থক সাধনেই ব্যয় হয়েছে। আত্মকল্যাণ মানে ধর্মসিদ্ধি, কামসিদ্ধি ও অর্থসিদ্ধি। মোক্ষসিদ্ধির তো কোন প্রশ্নই নেই, বাকি তিনটে সিদ্ধিরও কোনটারই সাধন হয় না। সংসারে জড়িয়ে থাকার জন্য কর্তব্যের খাতিরে কয়েকটা দৈনন্দীন রুটিন কাজ সবাইকেই করতে হয়, কিন্তু এই কাজগুলোকে কোন সিদ্ধির মধ্যেই ধর্তব্য নয়, এগুলোকে করতেও কেউ বারণ করছে না। সংসারের কর্তব্য কর্মও করতে হবে কিন্তু নিজের আত্মকল্যাণ কিসে হবে তার কথা সব সময় মনে রেখে কাজ করতে বলা হচ্ছে। আমি যখন নিজের সন্তানের সেবা করছি, যখন নিজের স্ত্রীর বা স্বামীর সেবা করছি তখন কি ভাবছি যে আমি এটা ধর্ম সাধনের মাধ্যমে আমার আত্মকল্যাণের চেষ্টা করছি? বাড়িতে গিন্নী বলল ঘরে আনাজ কিছু নেই। আমি থলে নিয়ে চললাম বাজারে সবজী কিনতে, এই বাজারে যাওয়াটা কি আমি ধর্ম সাধন মনে করে করছি? আমি যাকে অগ্নি সাক্ষী করে নিয়ে এসেছি, তার শরীর যাতে সুস্থ থাকে, মন প্রসন্ন থাকে সেই ভেবে আমি বাজার থেকে ভালো জিনিষটা নিয়ে আসব, তাদের সুখি রাখতে পারলে আমি আরও ধর্ম সাধনে মন দিতে পারব, বাজারে সব্জী কিনতে যাওয়া এটাও আমার ধর্ম সাধন। এতে আমার বাড়ির লোকের প্রতি যে কর্তব্য সেটা পূরণ করছি যাতে আমি নিজেকে আরও উন্নত ব্যক্তি বলে মনে করতে পারি। অফিসে সংসারে যেখানেই যে কাজ করছি, এই কাজের মধ্যে দিয়ে আমি নিজকে একজন ভদ্র ও উন্নত মানসিকতার নাগরিক বলে মনে করছি। এখন সাতশ কুড়ি ঘন্টার মধ্যে আমি কত ঘন্টা এই ভাবে সচেতন হয়ে কাজ করছি চিন্তা করলেই ধরা যাবে আমি সত্যিই ধর্ম সাধন করছি না নিরর্থক সাধন করছি। কিন্তু আমরা যেখানে যে কাজই করছি সেটা আমাদের কাছে যেন বিরক্তিকর কাজ মনে হয় – ওঃ আবার বাজার যেতে হবে! ওঃ আবার এত ফাইল দেখতে হবে! এই মনোভাব নিয়ে যখন কিছু করা হয় তখন এগুলোই হয় নিরর্থক সাধন। আগেকার দিনে দিদিমা ঠাকুরমারা সন্ধ্যে বেলায় তুলসী তলায় প্রদীপ দিতেন। ঐটুকু কাজের জন্য সেই বিকেল থেকে সলতে তৈরী করছেন, ঘি লাগাচ্ছেন, প্রদীপটা পরিষ্কার করছে, সব কাজ কি নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতেন। এটাই ঠিক ঠিক ধর্ম সাধন, তাঁদের মাথায় রয়েছে যে সন্ধ্যে বেলায় আমাকে তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবানের কাছে পরিবারের সবার মঙ্গল চিন্তন করতে হবে। এই কাজগুলো তাঁর কাছে কোন বোঝা বলে বা চাপিয়ে দেওয়ার মত মনে হয় না। এখনও গ্রাম দেশে দেখা যায় অল্প বয়সী যুবতী মেয়েরা বিকেল বেলায় ঝাঁটা নিয়ে দৌড়াচ্ছে মন্দিরে ঝাড়ু দিতে, একবার এ ঝাঁটা দিচ্ছে, আরেকবার ও ঝাঁটা দিচ্ছে। কেন দিচ্ছে? ওদের বিশ্বাস এক বছর মন্দিরে ঝাঁটা দিলে ভালো বাড়িতে বিয়ে হবে। বাড়িতে হয়ত ঝাঁটা দিচ্ছে না, মন্দিরে গিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে, কিন্তু নিষ্ঠা ছিল, এটাও ধর্ম সাধন।

হিসেব করলে দেখতে পাব আমাদের বেশির ভাগ কাজই নিরর্থক সাধন। ফলে কি হচ্ছে? আমাদের জীবনে অশান্তি লেগেই আছে। শ্রীরামচন্দ্র এটাই ভরতকে বোঝাচ্ছেন, ধর্ম সাধন ছাড়া অন্য কিছু করবে না, হে ভরত, আত্মকল্যাণ, নিজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দাও, কারণ প্রতি মুহূর্তে তোমার জীবন থেকে দ্রুত বেগে আয়ু কমে আসছে।

ভরত কিন্তু তবুও শ্রীরামচন্দ্রকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন অযোধ্যাতে ফিরে যাবার জন্য। আপনাকে এই ভাবে জঙ্গলে পাঠিয়ে আমাদের বাবা রাজা দশরথ বিরাট অন্যায় কাজ করেছেন, আপনি ফিরে চলুন। শ্রীরামচন্দ্র কোন কথাই শুনবেন না। ইতিমধ্যে জাবালি বলে একজন ব্রাহ্মণের উদয় হয়েছে। ইনিও শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্য গ্রহণের অনুরোধ করছেন। জাবালির যা বক্তব্য তাতে সন্দেহ হয় এই সর্গটা কি বাল্মীকি নিজে রচনা করেছিলেন, না কি পরে কেউ লিখেছেন। কেননা এর মধ্যে কোন ভাবে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করা হয়েছে। এই জাবালির উল্লেখ মহাভারতেও পাওয়া যায়। এই সব মনে করে অনেকে মনে করেন বাল্মীকি রামায়ণে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। জাবালিও একটা লোকায়িত মতের অবতারণা করে শ্রীরামচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন। জাবালি বলছেন – এখানে মানুষ একা জন্ম নেয় একাই মরে, কে কার সঙ্গে থাকে! সেইজন্য হে রামচন্দ্র, আপনি বাবাকে নিয়ে যে এত কিছু বলছেন এগুলো না বলে অযোধ্যায় ফিরে চলুন।

তখন শ্রীরামচন্দ্র জাবালির কথা উত্তরে বলছেন – ঋষিরা সব সময় সত্যকেই সম্মান দিয়েছেন। সত্যবাদী মানুষ অক্ষয় পরমধাম প্রাপ্ত হয়। বলছেন – **উদ্বিজন্তে যথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ। ধর্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্বস্য চোচ্যতে।**।২/১০৯/১২। সাপ থেকে যেভাবে মানুষ আতঙ্কিত হয়, ঠিক তেমনি যে মানুষ মিথ্যে কথা বলে তাকে সবাই ভয় পায়, কেননা কখন সে কি বলবে কোন ঠিক নেই। আর, সত্যাশ্রিত ধর্মই এই সংসারের সব কিছুর মূল। বলছেন – **সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ। সত্যমুলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্।**।২/১০৯/১৩। সত্যই হচ্ছে ঈশ্বর। সত্যের ভিত্তির উপরেই ধর্ম সর্বদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, সত্যই সব কিছুর মূল। সত্য থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। এই জন্য দেখা যায় পরের দিকে স্বর্গে সত্যলোক বলে একটা আলাদা লোকের কল্পনা করা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র সত্যের মহিমা বলে যাচ্ছেন – দান, যজ্ঞ, হোম, কঠোর তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন এই সব কিছু সত্যের উপর আধারিত। সেইজন্য সবাইকে সত্যপরায়ণ হওয়াই একমাত্র আবশ্যক। বলছেন – আগে আমি সত্য পালনের প্রতিজ্ঞা করে পরে লোভ, মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ বিবেকশূন্য হয়ে আমি সত্যের মর্যাদা ভঙ্গ করব না। তার অর্থ, শ্রীরামচন্দ্র বলতে চাইছেন, আমি বাবাকে আগে বলে দিলাম আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমাকে আপনি যে আজ্ঞা করবেন আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এখন কেন আমি সেই প্রতিজ্ঞাকে ভাঙতে যাচ্ছি? লোভ, মোহ আর অজ্ঞানের জন্যই ভাঙতে যাচ্ছি।

আসলে মানুষের যে ধর্ম থেকে পতন হয়, এই তিনটে কারণেই পতন হয় – লোভ, মোহ ও অজ্ঞান। সেইজন্য ধর্ম বলতে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন সত্য। যে কোন ধর্মই সত্যের আশ্রিত, সত্যই সব ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে। অহল্যার কাছে যখন দেবরাজ ইন্দ্র এসেছেন তখন তাঁর মনে একটা লোভ এসেছিল। কিসের লোভ? আমাকে দেবতাদের শ্রেষ্ঠ যিনি সেই ইন্দ্র চাইছেন, আমি দেবরাজের সঙ্গ করতে পারব। এই লোভের জন্যই তিনি নিজেকে ইন্দ্রের কাছে সমর্পণ করে অধর্মকে ডেকে নিয়ে এলেন। মোহ মানে একটা আশা, এখন যা আছি এর থেকে আরও ভালো কিছু পাব। বাড়িতে যখন একটি শিশুর জন্ম হয় তখন তাকে দেখে বাবা মা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আমার সন্তান যদি বিরাট কেউ নামকরা কিছু হয়, এটাই মোহগ্রস্ত হওয়া। একটা আশা করা – আমার ছেলে বড় হবে, মানুষ হবে এই আশা করাটা অন্য জিনিষ, কিন্তু মোহগ্রস্ত হচ্ছে সন্তান বড় কেউ হবে আমাদের দেখাশুনা করবে, লোকে বলবে আপনার ছেলে কত নাম করেছে। আর তৃতীয় হল অজ্ঞান, জানে না, বোঝে না, সেই থেকে অজ্ঞান। এই তিনটে কারণে মানুষ পদস্খলিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র এই কথাই বলছেন – বাবাকে আমি কথা দিয়েছি সত্য পালনের, এখন এই লোভ, মোহ আর অজ্ঞানবশতঃ আমি কেন পতিত হব।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন ‘বড় বড় ঋষিরা বল্কল ধারণ করেছেন, জঙ্গলে থেকেছেন যাতে এই ধর্মের সাধন হয়। সেইজন্য আমি এই ধর্মকে কোন দিন ছাড়ব না’। সংসারে থাকতে গেলে দুটো চারটে মিথ্যে কথা সবাইকেই বলতে হয়। যারা সমাজে আছেন তাঁদের পক্ষে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা খুব কঠিণ। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র রাজা, তোমাকে কে বাধা দেবে, তুমি কেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।

বলছেন ‘যে ধর্মকে ধর্মের মত মনে হয় অথচ আসলে সেই ধর্মই একটা অধর্মের রূপ নিয়ে আসে, যেটাকে নীচ, ক্রুর, লোভী, পাপাচারী পুরুষরা সেবন করে থাকে, সেই ধর্ম যদি ক্ষাত্র ধর্মও হয় তা আমি ধারণ করব না সত্যের জন্য’। এই কথার উৎস হল, জাবালি আগে শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছেন – আপনি হলেন ক্ষত্রিয়, আপনার ধর্ম শাসন করা, এই বেশে জঙ্গলে কাটান আপনার কাজ নয়। এখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – ক্ষত্রিয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য কি? ক্ষত্রিয় ধর্মের মহত্ব কি? কারা পালন করেছে এই ক্ষত্রিয় ধর্ম? মহাজনরা যে পথে গিয়েছেন সেটাই পথ। দেখতে গেলে কেউই ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করেনি। কারা পালন করেছে এই ক্ষত্রিয় ধর্ম – **ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈর্লুব্ধৈশ্চ সেবিতং পাপাকর্মভিঃ।**।২/১০৯/২০। যারা ক্ষুদ্র, নিম্ন ধরণের মানুষ, যারা নৃশংস, লোভী আর পাপকর্মা এরাই ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করে। সত্যের পালন কারা করেছেন? যাঁরা সর্বত্যাগী, গৈরিক বসন ধারণ করে বেরিয়ে গেছেন। সেইজন্য আপনি আমাকে বোঝাতে আসবেন না যে, ক্ষত্রিয় ধর্মই শ্রেষ্ঠ। তাই বলে মনে করবেন না যে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে যাচ্ছি, আমি সত্যের সাধন করছি। এই সত্যের সাধন কারা করেছিলেন? বড় বড় মুনি ঋষিরা। আপনি আমাকে কোনটা করতে বলছেন? ক্ষত্রিয় ধর্ম। তা ক্ষত্রিয় ধর্ম কাকে মহাপুরুষ বানিয়েছে? আমি মহাপুরুষদের প্রদর্শিত ধর্ম পথেই অবিচল থাকব।

এরপর শ্রীরামচন্দ্র খুব সুন্দর একটা শ্লোকের দ্বারা পাপের ব্যাখ্যা করছেন – **কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সম্প্রদার্য তৎ। অনৃতং জিহ্বয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম পাতকম্।**।২/১০৯/২১। পাপের প্রথম জন্ম হয় মনে, অর্থাৎ মানুষ প্রথম পাপ করে মনে। মনে পাপ করার পর সে বাণীর দ্বারা পাপ করতে শুরু করে, তারপর আস্তে আস্তে যখন পাপে নিজেকে সম্পৃক্ত করে দিল, তারপর সে শরীর দিয়ে পাপ করতে শুরু করে। যারা অফিসে কাজ করেন তাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা ঘুষ নেয়। যাদের আপনি জানেন যে এরা ঘুষ নেয় তারা কিন্তু প্রথমের দিকে মনে মনে ঠিক করে যে এত লোকে ঘুষ নিচ্ছে আমি কেন ঘুষ না নিয়ে থাকব, আমিও ঘুষ নেব। এই ভাবে সে মনে মনে ঠিক করে নিল আমি ঘুষ নেব। তারপরেই যে সে ঘুষ নিতে শুরু করবে তা নয়, এবার সে মুখে বলতে শুরু করবে – সব ব্যাটাই চোর, আমিও শালা ঘুষ নিয়ে দেখিয়ে দেব, ওসব সৎ লোকদের আমার জানা আছে! এমন ভাবে বলবে যে তার সহকর্মীরা বিশ্বাস করতে চাইবে না। আসলে মানুষ প্রথমেই পাপ কাজ করতে পারেনা, কারণ মানুষ স্বভাবতঃ কখনই পাপী নয়, মানুষ অমৃতের সন্তান। সেইজন্য পাপকাজ কিছু হলেই লাফিয়ে ওঠে, বুকের মধ্যে ছ্যাঁক করবে। সেই কারণে প্রথমে বাড়িয়ে বাড়িয়ে অনেক কিছু বলতে শুরু করে – আমি দেখিয়ে দেব ঘুষ কিভাবে নিতে হয়। এইভাবে বলে বলে সে দেখিয়ে দেবে সে যেন কত বাড় পাপী। এখন আস্তে আস্তে যখন মনের মধ্যে এই বোধটা এসে গেল যে আমি পাপী, তখন সে সত্যি সত্যি ঘুষ নিতে শুরু করবে। লোকে জানলেও এতে তারা আর আশ্চর্য হবে না। মনের পাপ সরাসরি শরীর দিয়ে বেরোয় না। প্রথমে মনের পাপ বাণীতে মানে কথার মাধ্যমে জানান দিতে থাকে, তারপর যখন দেখে এতে রপ্ত হয়ে গেছে, তখন সে শরীরের সাহায্যে সেই পাপ কাজ করতে থাকে। এখন এই তিনটের যে কোন একটাকে যদি আটকে দেওয়া যায় তাহলে সবটাই আটকে যাবে।

একজন সন্ন্যাসীর যদি পতন হওয়ার থাকে, সেও প্রথমে মনে মনে পাপ করতে থাকে, তারপর সে মুখে মুখে বলতে থাকবে – আরে যা কিছু আছে সব ফাক্কা, ভোগ ছাড়া কিছু নেই ইত্যাদি, মানে আস্তে আস্তে তার জমি তৈরী হচ্ছে। মুখে যখন এসে গেছে তখন বুঝে নিতে হবে তার পতনের কিন্তু আর বেশি দেরী নেই। মনের পাপটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ মনের পাপ সে নিজেই বুঝতে পারে। তিনটে পাপের পতনও তিন রকমের হয়।

এই ভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে সবাই নানা ভাবে বুঝিয়ে চলেছেন যে পিতাকে তিনি যে কথা দিয়েছেন সেই সত্য থেকে তিনি সরে যাবেন না। শেষ পর্যন্ত কেউই তাঁকে রাজী করাতে পারলেন না, তিনি সত্যে অবিচল। এদিকে ভরতও গোঁ ধরে বসে আছেন যে তিনি সিংহাসনে বসবেন না। কিন্তু রাজ্য তো আর রাজা ছাড়া চলতে পারবে না। তারপরে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া হল। ভরত স্বর্ণ ভূষিত একটি পাদুকা বার করে শ্রীরামচন্দ্রের চরণের তলায় রাখতে তিনি তাতে পা রাখলেন। এই পাদুকা শ্রীরামচন্দ্রের নিজের ছিল না, ভরত সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভরত বললেন 'আমি শ্রীরামচন্দ্রের এই পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজকার্য চালাব। এই পাদুকাই শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধি স্বরূপ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। শ্রীরামচন্দ্রই রাজ করবেন আমি তাঁর অনুগত ভৃত্যের মত সব কাজ করে যাব'। শ্রীরামচন্দ্রের সেই পাদুকা মস্তকে ধারণ করে ভরত সবাইকে নিয়ে অযোধ্যাতে ফিরে এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্রও সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে চৌদ্দ বছরের জন্য সেখানেই থেকে গেলেন।

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র যেখানে ছিলেন কিছু দিন পর থেকে সেখানে নানা রকমের উৎপাতাদি হতে শুরু হয়েছে। ওখানকার যত ঋষিরা ছিলেন তাঁরাও দেখছেন যখন থেকে শ্রীরামচন্দ্র এখানে এসেছেন তখন থেকেই রাক্ষসাদির উৎপাত অনেক বেড়ে গেছে, তাই সব ঋষিরা ঐ অঞ্চল ছেড়ে অন্য দিকে চলে যেতে শুরু করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন ঋষিদের এভাবে ছেড়ে দেওয়াও উচিৎ হবে না। ঋষিদের যাতে রাক্ষসাদিরা কোন ক্ষতি করতে না পারে, সেইজন্য তিনিও ঋষিরা যে পথ দিয়ে এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেই পথ দিয়ে ঋষিদের অনুসরণ করে চলেছেন। ঋষিদের শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – আপনারা যে চলে যাচ্ছেন এতে রাস্তায় তো রাক্ষসরা অনেক রকম উৎপাত করতে পারে, আমরাও তাই আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। এইবার শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলেন। এত দিন সবাই চিত্রকূটে ছিলেন, এখান থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে আরও দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অযোধ্যাকাণ্ড এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বাল্মীকি রামায়ণ – ৫ই জুন ২০১০

অরণ্যকাণ্ড

অযোধ্যা কাণ্ডের শেষ অংশে আমরা দেখেছিলাম ভরত শ্রীরামচন্দ্রের সাথে দেখা করে আবার অযোধ্যায় ফিরে গেছেন। এবার শ্রীরামচন্দ্র জঙ্গলের আরও গভীরের দিকে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন। ওখানে যেসব মুনি ঋষিরা থাকতেন তাঁরা নানা কারণে খুব সমস্যার মধ্যে ছিলেন, সেই কারণে তাঁরা সকলেই ঐ অঞ্চল ছেড়ে অন্য দিকে চলে যাচ্ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও তখন ঠিক করলেন যে আমরাও এনাদের পথ অনুসরণ করতে করতে এগোব।

ভারতের পাহাড়ে জঙ্গলে আদিমকাল থেকেই বিভিন্ন অনার্য আদিবাসী জাতি ও উপজাতিরা বসবাস করে আসছিল। মুনি ঋষিরা তপস্যার জন্য লোকালয়ের সংস্রব ত্যাগ করে যেসব জঙ্গলে থাকতেন সেখানকার স্থানীয় আদিবাসী জাতিদের সাথে তাঁদের একটা বিচিত্র সম্পর্ক ছিল। এরা আজকের ভীল জাতিই হোক আর যে জাতিই হোক না কেন, আজকে আমরা জানছি যে রাক্ষস বলতে অনার্য আদবাসীদের দিকেই এনারা ইঙ্গিত করছেন। আসলে অনার্য আদিবাসীরা এসে মাঝে মাঝে মুনি ঋষিদের উপর নানা ধরণের উৎপাত করত। তার অন্যতম কারণ হল এরা মুনি ঋষিদের ভয়ও পেত। এরা হল সাধুবাবা, ঋষিদের বিচিত্র বেশভুষা, তাঁদের নানা রকমের যৌগিক ক্রিয়াকাণ্ডকে এরা সন্দেহের চোখে দেখত, ঋষিদের মধ্যে কত রকমের যোগশক্তি থাকতে পারে বলা যায় না, যোগশক্তি দিয়ে এনারা অনেক কিছু করে দিতে পারেন, তাই ঋষিদের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য এরা সুযোগ পেলেই ঋষিদের আক্রমণ করে বসত।

যার জন্য বলছেন – *উচ্ছিষ্টং বা প্রমত্তং বা তাপসং ব্রহ্মচারিণম্*। *উচ্ছিষ্টং* – মানে যে ব্রহ্মচারীকে অশুদ্ধ বা নিষিদ্ধ জায়গায় দেখতে পাওয়া যেত বা যে অসাবধান থাকত তাদেরকে এই আদিবাসী জাতিগুলো আক্রমণ করত। এখানে এর দুটো অর্থ দেওয়া আছে। একটা অর্থ হল – মনের মধ্যে যে রাক্ষস গুলো রয়েছে সেই রাক্ষস গুলো এই ধরণের, মানে যারা অসাবধান, কিংবা যারা ভুলভাল কাজ কর্ম করে, তাদের গ্রাস করে নেয়। এর দ্বিতীয় অর্থ হল – জঙ্গলে যেসব অনার্য আদিবাসীরা, ভীল জাতির মত লোকেরা ছিল তারা যখনই দেখত, ঋষিরা নিজেদের পথ থেকে সরে আছেন, তখনই তাঁদের আক্রমণ করত। এই অনার্য আদিবাসীরাই যে বাল্মীকির দৃষ্টিতে রাক্ষসাদির বর্ণনাতে স্থান করে নিয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতের বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ পায়ে হেঁটে নর্মদা পরিক্রমা করতে যান। নর্মদা পরিক্রমাতে নর্মদা নদীর এক পার ধরে হাঁটতে থাকেন, হেঁটে হেঁটে গুজরাটের যেখানে সমুদ্রে গিয়ে নর্মদা মিশছে সেই পর্যন্ত গিয়ে নৌকা করে নর্মদার অন্য পারে চলে আসেন। সেখান থেকে আবার নর্মদার উৎসের দিকে হাঁটতে থাকে। কারুর ছয় মাস, কারুর এক বছর লাগে এই পুরো নর্মদা পরিক্রমা করতে, অনেকে আবার দু-বছর ধরে পরিক্রমা করেন। নর্মদা পরিক্রমার পথে একটা জায়গা আছে যেখানে প্রচুর ডাকাত আছে। তীর্থযাত্রীর যা কিছু থাকবে সব এই ডাকাতরা লুট করে নেবে। যদি কেউ কায়দা করে বলে আমার কিছু নেই, তারপর যদি তারা কিছু পেয়ে যায় তার কাছে, তখন মারধোরও করতে ছাড়বে না। এই ডাকাতদের আবার মামা বলে সম্বোধন করতে হবে। মানে এই ডাকাতরা হচ্ছে নর্মদা নদীর সব ভাই, নর্মদা যদি মা হন তাহলে এরা হবে মামা। বেশ কিছু বছর আগে বেলুড় মঠের এক মহারাজও গিয়েছিলে নর্মদা পরিক্রমা করতে। অনেক দিন ধরে পরিক্রমা করে যখন ফিরে এসেছেন, তখন সবাই দেখছে তিনি চশমা ব্যবহার করছেন না। একজন মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনার চশমা কোথায়। তখন জানা গেল যে, তিনি যখন ঐখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ভীলরা তাঁকে ঘিরে নিয়েছিল। ওনার কাছে কিছুই ছিল না। কিছু না পেলে ওরা ছেড়ে দেব। সেই সময়ে ওদের একজন বলল যে এই চশমটা আমার খুব ভালো লাগছে। ভালো লাগতেই সেই লোকটা চশমাটা কেড়ে নিয়েছে। চশমাতে ভালোই power ছিল, সুস্থ লোক চোখে দিলে কিছুই দেখতে পারবে না, কিন্তু সেতো এরা বুঝবে না। যেহেতু ভালো লেগেছে তাই কেড়ে নিয়ে চোখে লাগিয়ে হিরোর মত সেজে চলে গেল। সাধু সন্ন্যাসীদেরও এরা ছাড়ত না। এরা আবার এই ধরণের কাজের জন্য নিজেদের খুব গর্বিত মনে করত, তুমি নর্মদা মাঈয়ার উপর যখন ভরসা করে বেরিয়েছ, তখন ভরসা করেই চল, এগুলো কেন সাথে রেখেছ। ইদানিং কালে এই ধরণের উৎপাত অনেক কমে গেছে। পুলিশ প্রশাসন দিয়ে এদের অনেক নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। আগে এটাই এদের একমাত্র জীবিকা ছিল। চিত্রকূটের দিকে এখনও অনেক ডাকাত আছে।

এখান থেকেই শুরু হয় অরণ্যকাণ্ড। অরণ্যকাণ্ড মানে যা কিছুর বর্ণনা সব শ্রীরামচন্দ্রের এই অরণ্যবাসের উপরেই করা হয়েছে। যদিও অযোধ্যাকাণ্ডেও এরা আগে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের অনেকটাই এসে গিয়েছিল, কিন্তু এবার পুরোটাই জঙ্গলকে নিয়ে। এইভাবে এনারা জঙ্গলের পথ দিয়ে চলেছেন। যেতে যেতে একটা জায়গায় বিরাধ নামে এক রাক্ষস তাঁদের আক্রমণ করে বসেছে। বিরাধ প্রথমেই সীতাকে হাতের মুঠির মধ্যে ধরে নিয়ে নিজের হাঁটুর উপরে বসিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে – **যুবাং জটা-চীরধরৌ সভার্যৌ ক্ষীণজীবিতৌ।**।৩/২/১০। এক দিকে তোমরা জটা আর চীর ধারণ করেছ, চীর মানে এখানে বোঝাচ্ছে গেরুয়া বস্ত্র, মানে তোমরা এক দিকে যোগীর বেশ ধারণ করেছ আবার অন্য দিকে একটা মেয়েকে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরছ?

এই সমস্যা শুধু আজকের নয় আগেও ছিল। মেয়ে মহিলাকে নিয়ে যোগীদের ঘোরাঘুরিটা আমাদের সমাজ কখনই ভালো নজরে দেখে না। সাধু সন্ন্যাসীদের নারীদের সাথে মেলামেশাকে ভারতীয় পরম্পরাতে খুব আপত্তিকর বলেই মনে করা হয়। যখন তুমি ধর্মের পথে চলে এসেছ তখন তোমার আর কোন মেয়ে মহিলার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখা চলবে না। বিরাধ এটাই বলছে। তুমি একদিকে যোগীর বেশ ধারণ

করে আছ আবার অন্য দিকে তোমার সাথে নারী, শুধু তাই নয়, তোমার সাথে ধনুর্বাণাদি অস্ত্রও রয়েছে। সাধুগিরির আড়ালে এটা কি ধরণের তোমার ছলনা? তোমার জীবন নাশের দিকে চলে এসেছে, এই ধরণের ছলনা, ধাপ্পাবাজী কখনই চলতে পারেনা। বিরাধ বলছে – **কথং তাপসয়োর্বাঞ্চ বাসঃ প্রমদয়া সহ।**।৩/২/১১। – ভাণ করছ যেন তোমরা কত বড় তপস্বী, আর বাস করছ একটা নারীর সঙ্গে! **অধর্মচারিণৌ পাপৌ কৌ যুবাং মুনিদূষকৌ।**৩/২/১২। মুনি ঋষিদের নামে কলঙ্ক লেপনকারী তোমরা দুজন কে? আসলে তোমরা অধর্মচারী আর পাপী। বিরাধ নামে এক রাক্ষস এই কথা শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে। কোনটাই খাপ খাচ্ছে না, একদিকে মুনিবেশ, আবার সাথে একজন নারী, তার উপরে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র।

বিরাধ তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বলছে – আমি বিরাধ, আমার কাজই হল এই জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সব মুনি ঋষিদের ধরে ধরে মেরে এদের মাংস খাওয়া। বাল্মীকি ছিলেন কবি, কবিদের স্বভাবই হল কোন জিনিষের যখন বর্ণনা করবেন তখন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করবেন। এদিকে সীতাকে হরণ করে নিয়েছে এক রাক্ষস, সীতার কপালেই ছিল থেকে থেকে হরণ হয়ে যাওয়া। সীতাকে এইভাবে হরণ করে নেওয়াতে শ্রীরামচন্দ্র খুব কষ্ট পেয়ে লক্ষ্মণকে বলছেন – হে ভাই লক্ষ্মণ, কৈকেয়ির যা যা অভিষ্ট ছিল সব পূরণ হয়ে গেল, যা যা ভেবে আমাকে জঙ্গলে পাঠিয়েছে তার সব সার্থক হয়ে গেল। আমি বেঁচে থাকতে সীতাকে কেউ স্পর্শ করছে, এর থেকে বেশি দুঃখের আর কোন কিছু কি হতে পারে! আমার রাজ্য চলে গেছে, আমার বৃদ্ধ বাবা আমার শোকে মারা গেলেন, আর শেষ অবধি আমার প্রাণ বলতে যেটুকু ছিল সেই সীতাকেও এখন অপহরণ করে নিয়েছে।

শ্রীরামচন্দ্রের এই কষ্টের কথা শোনার পর লক্ষ্মণ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলছেন – **রাজ্যকামে মমঃ ক্রোধো ভরতে য বভূব হ।**৩/২/২৫। 'দাদা! আমাদের রাজ্য হরণ হওয়ার পর ভরতের উপর আমার যে প্রচণ্ড ক্রোধ জেগেছিল, সেই ক্রোধটা এখন আমি বিরাধের উপরে প্রয়োগ করব'। এর আগে লক্ষ্মণ রেগে গিয়ে বলেছিল, বাবাকে বেঁধে রাখব আর ভরতের পক্ষে যারা দাঁড়াবে তাদের আমি মেরে উড়িয়ে দেব। ভারতের মনোবিজ্ঞানে মনের যে কোন বৃত্তির ব্যাপারে এটা একটি খুব উল্লেখযোগ্য ধারণা। একজনের কারুর উপর খুব রাগ হয়ে গেল, তারপর সেই রাগটা কোন কারণে পরে যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাতে কিন্তু তার ওই রাগটা পুরোপুরি বেরিয়ে যাবে না। আমাদের শাস্ত্রকারদের একটা মত ছিল, যেটা মহাভারতে এমন কি পুরাণেও দেখা গেছে, ঐ রাগটা হয়ত কমে গেল কিন্তু ভেতরে থেকে যাবে, বেশ কিছু দিন পরে হঠাৎ যদি অন্য কোন একটা পরিস্থিতি এল, তখন ঐ রাগটা পুরোপুরি ওখানে গিয়ে লাগিয়ে দেবে। এই ব্যাপারটা এই নয় যে দুজনের মধ্যে ঝগড়া চলছে তার মাঝখানে আরেকজন হস্তক্ষেপ করল তখন তার উপরে গিয়ে রাগটা মেটাতে থাকল। একটা হাসির গল্প আছে, দুজন ট্রেনে খুব ঝগড়া করছে, একজন আরেকজনকে বলছে – এমন মার মারব যে তোমার চৌষট্টিখানা দাঁতই ভেঙ্গে দেব। তখন পাশের থেকে আরেক সহযাত্রী বলছে – দাঁততো বত্রিশ খানা হয়, তা চৌষট্টি খানা কি করে ভাঙবেন। তখন সে বলছে – আম জানি যে আপনি আমাদের মাঝখানে ঢুকবেন, তাই আপনার বত্রিশটা দাঁতও ধরে নিয়ে বলেছি। এখানে এই রাগের কথা বলা হচ্ছে না। ভরতের উপরে লক্ষ্মণের রাগ অনেক দিন আগে হয়েছিল, আর সেই রাগটা এখনও ভেতরে ঘুমিয়ে আছে, মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে মনে পড়ছে। এত দিন পরে ভরতের উপর তার সেই রাগের কথা মনে পড়ে গেল।

বিরাধকে শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ দুজনে মিলে বাণ মারতে শুরু করেছেন। কিন্তু দেখছেন বাণ মেরে বিরাধকে কিছুই করা যাচ্ছে না। তখন বিরাধ নিজের পরিচয় দিয়ে বলছে – **তপসা চাভিসম্প্রাপ্তা ব্রহ্মণো হি প্রসাদজা। শস্ত্রেণাবধ্যতা লোকেহচ্ছেদ্যাভেদ্যত্বমেব চ।**।৩/৩/৬। – আমি তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে অভিষ্ট বর লাভ করেছি। সেই বরের কল্যাণে আমাকে কেউ বধ করতে পারবে না, আর – *শস্ত্রেণ অবধ্যতা* – শস্ত্র দিয়েও কেউ আমাকে বধ করতে পারবে না, আমি অভেদ্য। এখন তোমরা দুজনে মিলে যাইই কর না কেন আমার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারপর বলছে – যা হয়ে গেছে ভুলে

যাও, তোমরা দুজনে আমাকে যে আক্রমণ করেছিলে সেটা আমি ক্ষমা করে দিচ্ছে, শুধু তোমাদের এই মেয়েটাকে আমার কাছে ছেড়ে প্রাণ নিয়ে চলে যাও, আমি তোমাদের কিছুই করব না। বিরাধের কথায় কোন কর্ণপাত না করে দাদা-ভাই মিলে বিরাধকে আক্রমণ করেই যাচ্ছে। কিন্তু বিরাধের কিছুই করতে পারছেন না, কারণ তার ব্রহ্মার বর আছে কিনা। বিরাধ তখন এত রেগে গেছে, শেষে সে দুই হাতে দুই মুঠোর মধ্যে দুজনকে ধরে নিয়েছে, আর সীতাকে বগলের মধ্যে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে, ভাব এই যে, নাও এবার দেখাচ্ছি তোমাদের মজা। সে এক বিচিত্র অবস্থা।

এই বিচিত্র কাণ্ডের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন – দ্যাখো ভাই, এই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে আমাদের এমনিতেই যাবার কথা, আমি ভাবছিলাম সীতাকে নিয়ে আমি কিভাবে যাব, আর এই জঙ্গলে আমরা রাস্তাঘাটও ভালো জানিনা। এই রাক্ষস যখন আমাদের বাহন হয়ে গেছে, এর দ্বারাই আমরা যতটা পারি এগিয়ে যাই, এতে আমাদের মঙ্গলই হয়েছে। ইতিমধ্যে সীতা ভয় আর আতঙ্কে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছেন। সীতা যখন ঐভাবে কান্নাকাটি করছেন শ্রীরামচন্দ্র দেখছেন এতো মহা বিপদ হল। শ্রীরামচন্দ্র তখন সব ঠিক করে লক্ষ্মণকে বলছেন – ভাই লক্ষ্মণ, একে তো কিছুই করা যাচ্ছে না। দুই ভাই নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ আলোচনা করেও ঠিক করতে পারছেন না কীভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। তারপর সব কিছু ঠিক করে হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্র বললেন – চল, এক কাজ করা যাক, এর হাত দুটোকেই আগে কেটে ফেলি। হাত দুটো কেটে দেওয়া হল। হাত কেটে দেওয়ার পর বিরাধকে বারবার আক্রমণ করে যাচ্ছেন, আঘাত করে যাচ্ছেন, বিরাধের রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু তাতেও বিরাধের কিছুই হচ্ছে না। তখন আবার দুজনে মিলে ভাবছেন কি করা যায়। অনেক চিন্তা ভাবনা করার পর শ্রীরামচন্দ্র বললেন – **শস্ত্রেণ যুধি নির্জেতুং রাক্ষসং নিখনাবহে।**।৩/৪/১০। লক্ষ্মণ! এর ব্রহ্মার বর আছে বলে একে আমরা কোন শস্ত্র দিয়ে বধ করতে পারব না, চল আমরা পুকুরের মত একটা বড় গর্ত তৈরী করে রাক্ষসটাকে সেই গর্তের মধ্যে কবর দিয়ে দিই। এই বিরাধই একমাত্র রাক্ষস যাকে শ্রীরাম বধ করতে পারলেন না, সেইজন্য রামনামে একটি পদে বলা হচ্ছে দুষ্ট বিরাধ বিনাশন রাম, বিরাধকে শ্রীরামচন্দ্র বধ করতে পারলেন না, বর থাকলে আর মারবেন কিভাবে কিন্তু বিনাশ তো করা যায়। কি করে বিনাশ করবেন? তাড়াতাড়ি করে একটা বিশাল গর্ত খুঁড়ে ঐ গর্তের মধ্যে বিরাধকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। হয়তো আগে থেকেই কোন গর্ত ওখানে খোঁড়া ছিল। যাই হোক, যখন গর্ত খোঁড়া হচ্ছে তখন শ্রীরামচন্দ্র বিরাধকে মাটিতে ফেলে ওর গলাতে পা দিয়ে চেপে রেখেছেন যাতে সে নড়েচড়ে পালিয়ে না যায়। শ্রীরামচন্দ্রের ঐ শক্তি দেখে বিরাধ তখন বলছে – দেখুন আপনার শরীরে যা শক্তি তা একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। বিরাধ এর আগে সবার সাথে মারপিট করে বেড়াত, সেইজন্য কার কত শক্তি ওর ভালো জানা আছে। বিরাধ বলছে – আপনার এই শক্তি আমি মোহ বশতঃ বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমি হলাম এক অভিশপ্ত গন্ধর্ব। আপনার হাতে আমার বিনাশ হতে যাচ্ছে, এবার আমি মুক্তি পেয়ে যাব। শেষ পর্যন্ত ঐ গর্তের মধ্যে বিরাধকে জীবন্ত কবর দিয়ে দেওয়া হল।

এখানে একটা মজার ব্যাপার বলা হচ্ছে – **অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনঃ**।৩/৪/২৩। যারা রাক্ষস যোনির তাদের যদি কবর দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারা সনাতন গতি লাভ করে। এই শ্লোকটা খুব মজার ব্যাপার। এই শ্লোকটিকে অনেক ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, মুসলমান, খ্রীশ্চানরা সব রাক্ষস যোনির, এদের কবর দিয়ে দেওয়া হয় বলে এরা Eternal Heaven এ যায়। এখানকার শব্দটা হচ্ছে *লোকাঃ সনাতনাঃ*, মানে সনাতন লোকে যায়। রাক্ষসদের মেরে পুড়িয়ে দেওয়া একটা ব্যাপার কিন্তু রাক্ষসদের যদি মেরে মাটিতে কবর দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের সনাতন গতি হয়। সনাতন গতি বলতে আসলে কি বলতে চাইছে ঠিক পরিষ্কার নয়। বাল্মীকি রামায়ণ প্রায় বেদের সময়কার, সেইজন্য রামায়ণে এমন অনেক শব্দ আছে যার অর্থ ঠিক পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না। তবে বক্তব্য হচ্ছে, রাক্ষসদের এইভাবে একটা গতির উপায় করা যায়, আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে হিন্দুদের সব

সংস্কার পুড়িয়ে করা হয়, কিন্তু এখানে একজন জীবন্ত লোককে গর্তে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এবার তাকে মাটি চাপা দেওয়া হবে। প্রশ্ন হতে পারে কাউকে জীবন্ত মাটিতে কবর দিয়ে মেরে ফেলা, শ্রীরামচন্দ্র কি কখন এই ধরণের অধর্মের কাজ করতে পারেন? সেইজন্য এই কথা বলে দেওয়া হচ্ছে, তিনি যখন বিরাধকে পুতে দিলেন তখন তার সনাতন গতি হয়ে যাচ্ছে, তাই এতে কোন দোষ নেই।

যেমনি শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ বিরাধকে তুলে গর্তে ফেলতে যাচ্ছেন তখনই সে আবার বিকট চিৎকার করতে শুরু করেছে। এই চিৎকার করাটাও এখানে ঠিক খাপ খায় না। কারণ একটু আগেই বিরাধ বলছে আমি এক অভিশপ্ত গন্ধর্ব, আপনার হাতে মরলে আমার মুক্তি হবে। যাই হোক বিরাধকে গর্তে ফেলে ওপর থেকে মাটি পাথর সব চাপা দিয়ে তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হল। তারপর যখন অনেক পাথর মাটি আচ্ছা করে গর্তের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল, তখন শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে বিরাধের শরীরটা ছিল হাতির মত বিশাল, আর তার কবর দেওয়ার যে গর্ত খোঁড়া হয়েছিলে সেটাও ঐ রকমই বড় ছিল। বুনো হাতিকেও ঠিক এভাবেই ধরা হয়। বাল্মীকি বুনো হাতি ধরার এই ধারণাটা কোত্থেকে পেলেন বলা মুশকিল? হয়তো তিনি জঙ্গলে বুনো হাতি ধরা দেখে থাকবেন বা কোথাও শুনে থাকবেন, আর সেটাকেই তিনি তাঁর কাব্যে কাহিনীর মধ্যে খুব সুন্দর ভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। জঙ্গলে যেখান দিয়ে বুনো হাতিরা চলাচল করে সেখানে একটা বড় গর্ত করে তার ওপরে গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তারপর এমন ভাবে আওয়াজ করা হয় যে, হাতি গুলো ঐ পথ দিয়েই পালাতে থাকে। বন্য পশুরা বুঝতে পারে কোথায় গর্ত থাকতে পারে, কিন্তু তখন প্রাণের ভয়ে এমন ভাবে পালাতে থাকে যে ওদের আর গর্তের কোন হুঁশ থাকে না, কোন উপায়ও থাকে না বলে ওই গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে ফেঁসে যায়। তারপর পোষা হাতি দিয়ে ওদেরকে ওখান থেকে টেনে তোলা হয়। একটা হাতিকে গর্তে ফেলা দেওয়া যত সহজ তার থেকে হাতিকে সেই গর্ত থেকে তোলা খুব শক্ত। তখন আবার গর্তের এক দিকে স্লোপিং করে মাটি কেটে দেওয়া হয়। তারপর তিন চারটে পোষা হাতি দিয়ে টেনে তোলা হয়। নিজের ঘর শত্রুকে যতক্ষণ না কাজে লাগান যায়, ততক্ষণ কাউকে দাবানো খুব কঠিণ। বিশেষ করে বুনো হাতি কিছুতেই বশ হতে চায় না। পরে তিন চারটে পোষা হাতি দিয়ে এই বুনো হাতিকে ঘিরে ফেলা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়ে হাতিকেই বুনো হাতিকে বশে আনার কাজে লাগান হল। একটা বলে যে, জংলী হাতির সামনে যদি মেয়ে পোষা হাতিকে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন সাধারণতঃ সে মেয়ে হাতিকে আক্রমণ করে না।

এইভাবে বিরাধের বিনাশ হল। এরপরে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে এলেন। গানে আছে ‘শরভঙ্গ মুনি সুতিক্ষ্ণার্চিত রাম’। শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে যখন শ্রীরাম আর লক্ষ্মণ গেছেন, তখন দেখছেন আকাশ থেকে স্বর্গের একটা রথ নেমে এসেছে। অনেক কিছুর বর্ণনা দেওয়ার পর দেখাচ্ছেন শরভঙ্গ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – আমি যা তপস্যাদি করেছি তার ফলে আমি স্বর্গে যাব, কিন্তু আমি খবর পেয়েছি যে আপনি আমাদের ধারে কাছেই কোথাও আছেন, তখন আমি ভাবলাম আপনার দর্শন না হওয়া পর্যন্ত আমি শরীর ছাড়ব না। শরভঙ্গ মুনি বলছেন – হে শ্রীরামচন্দ্র, আপনি শুধু আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকুন। তারপর উনি একটা চিতা তৈরী করলেন, আগুন প্রজ্বলিত করলেন, অগ্নিতে ঘৃত অর্পণ করে তিনি সেই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। শরীরে অগ্নির তাপে যে জ্বলন হচ্ছিল শ্রীরামচন্দ্রের দিকে যে তিনি তাকিয়ে আছেন, আর শ্রীরামচন্দ্র যে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে ছিলেন তাতেই তার শরীরের সেই তীব্র জ্বলনের অনুভূতি হওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

বাল্মীকি বলছেন, সাপ যেমন নিজের পুরনো খোলস ছেড়ে দেয় শরভঙ্গ মুনি ঠিক সেইভাবে নিজের শরীরটা ছেড়ে দিলেন। যোগীর কাছে দেহটা হল একটা খোলস মাত্র। সবার চোখের সামনে সব কিছু আগুনে ভস্ম হয়ে গেল। ভস্ম যখন হয়ে গেল তখন সবাই দেখছেন সেই পোড়া ছাই থেকে দিব্য শরীর ধারণ করে একজন মুনি বেরিয়ে এসেছেন, সেই দিব্য শরীরটা জ্বলজ্বল করে দীপ্যমান হয়ে আছে। এই যে

এখানে বাল্মীকি যে ভাবে এই জিনিষটার বর্ণনা দিচ্ছেন, এখান থেকেই হিন্দুদের মনে সূক্ষ্ম শরীরের ধারণা খুব গভীর ভাবে এসে গেছে। এর আগে এই ধরণের বর্ণনা আমরা অন্য কোথাও পাইনা। বাল্মীকি এই ধরণের অনেক বর্ণনা থেকেই পরবর্তিকালে মহাভারত রচনার সময় ব্যাসদেবও বিভিন্ন জায়গায় এই একই ধরণের অনেক কিছু বর্ণনা করার প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই সূক্ষ্ম শরীরের ধারণা কতটা ঠিক ঠিক সত্য আর কতটা কল্পনা এগুলো বলা খুব মুশকিল।

কিছু দিন আগে ইন্টারনেটের একটি সাইটে একটা প্রবন্ধে একজন বলছেন – জড়ভরত যিনি এত বড় তপস্বী ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর সময়টুকুতে শুধু হরিণের চিন্তা করতে করতে মারা গেলেন বলে তিনি হরিণ হয়ে জন্মালেন। কিন্তু কোথাও তো বর্ণনা করা হয়নি যে তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন না নরকে গিয়েছিলেন। গীতাতেও এই একই কথা বলা হচ্ছে – *অন্তকালে যে মামেব স্মরণমুক্ত্বা কলেবরম্*, মৃত্যুর সময় যে যেমন যেমন চিন্তা করবে সে সেই রকম শরীর পাবে। কিন্তু মাঝখানে স্বর্গটা কোথায় গেল বা নরকই বা কোথায় গেল সেই কথা তো কেউ বলছেন না। কারণ আমাদের পরম্পরাতেই বলা হয় মরার পরে সবাই হয় স্বর্গে যায় নয়তো নরকে যায়, কিন্তু গীতা বা জড়ভরতের ক্ষেত্রে তো স্বর্গ বা নরকে যাওয়ার ব্যাপারটা মিলছে না। আসলে এগুলো সবটাই যে ঘড়ির কাঁটার নিয়মে চলবে তা কখনই হয় না। ঋষি মুনিরা পরিষ্কার দেখেন এই স্থূল শরীরের পেছনে একটা সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে। তাঁদের সূক্ষ্ম শরীরকে তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পান। তাঁরা যখন এর ব্যাখ্যা করবেন তখন কিভাবে করবেন? তাই এনারা বিভিন্ন ভাবে বোঝাবার জন্য কখন স্বর্গ, নরক, কখন পুনর্জন্মাদির কথা বলে ব্যাখ্যা করেন। এভাবে না বোঝালে হিসেবে ঠিক মিলবে না। এই জন্মে আমি ভালও করেছি খারাপও করেছি। এখন মরার পর আমি আগে স্বর্গে যাব না নরকে যাব, স্বর্গে গিয়ে কত দিন সেখানে থাকতে হবে, তারপরে আমার আবার শরীর হবে সেটা কিভাবে হবে, এত সব চিন্তা করলে সত্যিই আমরা কোন কুল কিনারা পাইনা, এগুলো নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করতে গেলে জীবনের উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে যাবে।

যাই হোক, শরভঙ্গ ঋষি যখন শরীর ত্যাগ করে দিচ্ছিলেন, সেখানে তখন অনেক ঋষি মুনিরাও শরভঙ্গ ঋষির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানে বাল্মীকি একুশ ধরণের ঋষি মুনিদের বর্ণনা দিয়েছেন। এদের মধ্যে একদল ঋষিদের বলা হত বৈখানস, ব্রহ্মার পায়ের নখ থেকে এঁদের জন্ম হয়েছে, দ্বিতীয় বালখিল্য – ব্রহ্মার চুল থেকে জন্ম, এঁরা খুব উচ্চকোটির ঋষি, তৃতীয় সংপ্রক্ষাল – এরা কোন ধরণের সঞ্চয় করেন না, খাওয়ার পর পাথরের থালাটাও ফেলে দেবে, ভগবানের চরণ প্রক্ষালনে এঁদের উৎপন্ন হয়েছে। চতুর্থ মরীচি – এনারা শুধুমাত্র সূর্য আর চন্দ্রের কিরণ পান করেই জীবন ধারণ করেন, অন্য আর কিছুই খাবেন না। অনেকটা আমাদের গাছপালার মত। পঞ্চম অশ্মকুট্টা – এনারা কাঁচা আনাজ ও ডাল, চাল, গম ইত্যাদি দানা শস্যকে পাথরে ভেঙ্গে খাবেন, রান্না করা কোন জিনিষ খাবেন না, এটাই তাঁদের তপস্যা। ষষ্ঠ পত্রাহারী – বৃক্ষ লতাদির পাতা খেয়েই জীবন ধারণ করেন, পাতা ছাড়া অন্য কিছু খাবেন না। সপ্তম দন্তোলুখলী – যত রকমের শক্ত খাদ্য বস্তু আছে সেটাকে অন্য কিছু দিয়ে না ভেঙ্গে দাঁত দিয়েই ভেঙ্গেই খাবেন, নরম সুস্বাদু কোন খাবার গ্রহণ করবেন না। অষ্টম হলেন উন্মজ্জক ঋষি – এনারা গলা পর্যন্ত জলে নিমজ্জিত হয়ে তপস্যা করেন। নবম অশয্যা – এই ধরণের ঋষিরা বিছানায় কখনই শোবেন না, যদি শুতে হয় তাহলে মাটিতেই শুয়ে পড়বেন। দশম অনবকাশি – এঁদের কোন অবকাশ নেই, সব সময়ই কোন না কোন সৎকর্ম করে যাচ্ছেন, কখনই কর্ম করা থেকে ছাড়া পায়না। একাদশ জলাহারী – কেবল জলপান করেই জীবন ধারণ করে থাকেন। এই রকম কোন ঋষি হাওয়া খেয়ে থাকেন, কেউ ফাঁকা মাঠে থাকেন, কেউ পর্বতের শিখরদেশে মানে ঊর্দ্ধস্থানেই সব সময় থাকেন, স্থণ্ডিলশায়ী মানে যজ্ঞস্থলেই শয়ন করে যাঁরা তপস্যা করেন, সব সময় ভিজে বস্ত্র পরিধান করে থাকেন, একদল ঋষি যাঁরা সর্বদাই জপ করে যাচ্ছেন, কেউ পঞ্চাগ্নিসেবী – এনারা গরমের সময় ফাঁকা জায়গায় চারটি দিকে আগুন জ্বলবে তার মাঝখানে বসে থাকবে, তাঁর চারটে দিকে চারটে অগ্নির তাপ আর মাথার উপর সূর্যের তাপ নিয়ে তপস্যা করে। শ্রীশ্রীমাও এই তপস্যা করেছিলেন, পাঁচটি তাপকে সহ্য করে তপস্যা করা হয়

বলে এই তপস্যার নাম পঞ্চতপা। আরেক ধরণের আছেন তপোনিষ্ঠ – সব সময় ঈশ্বরের দিকে নিজের মনটাকে লাগিয়ে রেখেছেন।

এই রকম একুশ ধরণের ঋষিদের বর্ণনা করে বলছেন – **সর্বে ব্রাহ্মা শ্রিয়া যুক্তা দৃঢ়যোগসমাহিতাঃ**।৩/৬/৬। – এই যে এত ধরণের ঋষিরা ছিলেন এনারা সবাই দৃঢ়ভাবে যোগ সাধনায় থাকতেন আর সবাই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন। অমুক ভালো অমুক খারাপ এসব কিছুই নয়। সবাই সমান, সবাই ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন। যত রকমের ঋষিদের বর্ণনা করা হয়েছে, এনারা সবাই মিলে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – আমরা সবাই এই জঙ্গলে আছি, কিন্তু রাক্ষসদের প্রচণ্ড অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ ও উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি। এর আগেও বলা হয়েছে যে বাল্মীকি রামায়ণে ঋষিদের সাথে রাক্ষসদের একটা বিচিত্র ধরণের সম্পর্ক। ঋষিরা এত দিনে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে একজন ঠিক ঠিক ক্ষত্রিয়কে পেয়েছেন, ঋষিরা শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – আপনি যদি আমাদের রক্ষা না করেন তাহলে আমাদের আর কোন উপায় নেই। শ্রীরামচন্দ্র তখন ঋষিদের আশ্বাস দিয়ে বলছেন – পিতার আজ্ঞাতে আমাকে এখন থেকে জঙ্গলেই থাকতে হবে, আপনারা সবাই নিশ্চিন্ত থাকুন, সব রকম ভাবে আপনাদের রক্ষা করার জন্য আমি আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাব। এখান থেকে শ্রীরামচন্দ্ররা সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে এসেছেন। সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে সবাই রাত্রিযাপন করে পরের দিন সুতীক্ষ্ণ মুনির অনুমতি নিয়ে শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের দিকে চলতে থাকলেন।

সেই সময় সীতা শ্রীরামচন্দ্রকে মধুর বাক্যে বলছেন 'এই জগতে তিন ধরণের ব্যসন হয়'। ব্যসন বলতে যে কোন নেশাকে বোঝায়। নেশার সংস্কৃত শব্দ হল ব্যসন। যে কাজ বারবার করতে ভালো লাগে, যে জিনিষটা বারবার ভোগ করতে ইচ্ছা করে অথচ সেই কাজটা খারাপ কাজ, সেই জিনিষটা ভোগ করা খারাপ সেটাই ব্যসন। সবাই নিষেধ করছে এটা করো না, কিন্তু তাও করে যাচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রে খুব নামকরা ব্যসন হল জুয়া খেলা, যুধিষ্ঠিরের মধ্যে যেটা প্রবল ছিল। কিন্তু নেশা বলতে আমরা সাধারণত যেটা বুঝি, যেমন ভাং খাওয়ার নেশা, মদ খাওয়ার নেশা, এগুলো করলে মন একটু অন্য স্তরে চলে যায়, কিন্তু ব্যসনে ঠিক যে মনটা অন্য দিকে চলে যাচ্ছে তা নয়। ব্যসনে কি হচ্ছে, এই কাজটা করে আমার একটা মজা লাগে। সীতা বলছেন প্রথম ব্যসন হল মিথ্যা ভাষণ। মিথ্যে কথা বলাটা একটা রোগ, একটা ব্যসন। মিথ্যে কথা বলার অনেক রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়, যারা খুব মিথ্যে কথা বলে, দেখা যায় বেশির ভাগ সময় তারা অকারণেই মিথ্যে কথা বলে। যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় – তুমি কোন দিক থেকে আসছ, সে তখন মনে মনে ভাবতে শুরু করবে 'নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে, তা নাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেন'। সে যদি পূব দিক থেকে এসে থাকে তাহলে বলবে আমি উত্তর দিক থেকে আসছি। মিথ্যে কথা বলাটা একটা গভীর নেশা। দ্বিতীয় ব্যসন বলছেন – *পরদারাভিগমনং*, পরস্ত্রীর সাথে বাস করা। অপরের স্ত্রীর প্রতি আসক্তিটাও একটা ব্যসন। যাদের মধ্যে এই ব্যসন একবার এসে যায় তখন এই রোগ থেকে কিছুতেই তারা বেরিয়ে আসতে পারেনা, একটা নেশার মত তাকে গ্রাস করে নেয়। তৃতীয় ব্যসন বলছেন – *রৌদ্রং পরপ্রাণাভিহিংসনম্*, রৌদ্রতাতা বলা হয়, রৌদ্রতাতা হচ্ছে কোন শত্রুতা নেই, অকারণে ক্রুর আচরণ করবে, অপরকে কষ্ট দিতেই তার ভালো লাগে। কিছু বাচ্চা ছেলে ফড়িং ধরতে পারলে ওর ডানা গুলো ছিঁড়ে দেবে, এতে যে বাচ্চাটার কোন লাভ হচ্ছে তা নয়, আর ফড়িংটা যে তাকে কামড়াতে এসেছে তাও নয়। অপর প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া এটাই একটা রোগ। পাড়ার চ্যাংড়া ছেলেগুলো রাস্তা দিয়ে কোন বয়স্ক মানুষ যাচ্ছেন, চেনে না জানে না, অকারণে তাকে একটা কটূ কথা বলে মজা করবে। অনেকে আছে একটা ঢিল তুলে কুকুর বেড়ালকে অকারণে ঢিল মারবে, কোন প্রাণী না পেলে লাইটপোস্টের বাল্বটাকে ঢিল মেরে ভেঙ্গে দেবে। এগুলো করে তার কোন লাভ নেই, কিন্তু এই ধরণের ক্রূর আচরণ করতে তাদের ভালো লাগে। সীতা বলছেন এটাও একটা ব্যসন।

এই জগতে অনেক ধরণের ব্যসন আছে, যেমন যুধিষ্ঠিরের জুয়া খেলা, কিন্তু সীতা বলছেন এই তিনটে ব্যসন খুবই গুরুতর – মিথ্যা ভাষণ, পরস্ত্রী গমন ও ক্রুর আচরণ। তিনটি ব্যসনকেই একই

জায়গাতে রাখা হয়েছে। এইসব বলে সীতা বলছেন – হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনার মধ্যে প্রথম দুটো জিনিষ মিথ্যাভাষণ আর পরস্ত্রী গমন কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু তৃতীয় যে ভয়ঙ্কর ব্যসনের কথা বলা হচ্ছে – **তৃতীয়ং যদিদং রৌদ্রং পরপ্রাণাভিহিংসনম্**।৩/৯/৯। 'অন্য প্রাণিকে হিংসা করা, কষ্ট দেওয়া, এই যে রৌদ্র ভাব, এই ব্যসন কিন্তু আপনার ভেতরে এসে গেছে। অথচ দেখুন আপনার কোন ধরণের মোহ নেই, কারুর প্রতি আপনার বৈরীভাব নেই, কারুর প্রতি ঝগড়া বিবাদ আছে তাও নয়'। বাচ্চা ছেলের হাতে যদি খেলনা বন্দুক ধরিয়ে দেওয়া হয় তখন সেটা নিয়ে এর দিকে একবার তাক করবে ওর দিকে একবার তাক করে দুম্ দুম্ করে গুলি ছোঁড়ার মত আওয়াজ করতে থাকবে। সীতা বলতে চাইছেন শ্রীরামচন্দ্রেরও এই রকম অবস্থা হয়ে গেছে। সীতা এখানে পরিষ্কার করে বলছেন না যে, শ্রীরামচন্দ্র শুধু পশুদের প্রতিই এই ধরণের হিংসা করছেন কিনা। বলছেন *বনচরান্*, বনচরানের আবার দুই রকমের অনুবাদ হতে পারে – এখানে বন্যপশুও হতে পারে আবার রাক্ষসও হতে পারে। যারা ভীল জাতি তাদের দেখলেই হয়তো শ্রীরামচন্দ্র বাণ চালিয়ে দিচ্ছেন। সীতা বলছেন – যেমন ইন্ধন আগুনের শিখাকে বাড়িয়ে দেয়, ঠিক তেমনি যারা তেজস্বী পুরুষ তাদের কাছে যখন অস্ত্র-শস্ত্র থাকে তখন তাদের পরাক্রমটা বেড়ে যায়।

সীতা এর পর একটা কাহিনীর অবতারণা করে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – পুরাকালে এক ঋষি ছিলেন, তিনি একাধারে মহাবীর, তেজস্বী ও পবিত্রচিত্ত আবার বিরাট বড় তপস্বীও ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই ঋষির থেকে স্বভাবতই খুব ভীত ছিলেন। ইন্দ্রের মাথায় একটাই চিন্তা কি করে এর তেজ ও তপস্যার শক্তিকে আটকানো যায়। একদিন ইন্দ্র এক যোদ্ধার রূপ ধারণ করে এসে সেই তপস্বীকে বলছেন 'আমি খুব বিপাকে পরে আপনার শরণাপন্ন হয়ে এসেছি, আপনি যদি আমার এই তলোয়ারটা গচ্ছিত রাখেন'। তলোয়ারটা দেখতে খুব সুন্দর, ইন্দ্র তপস্বীর কাছে সেই তরোয়ালটা রেখে চলে গেলেন। এখন তপস্বী দেখছে তরোয়ালটা আশ্রমে মিছিমিছি পড়ে রয়েছে, দেখতেও খুব সুন্দর। তারপরই তপস্বী ভাবছে 'এবার থেকে যখন জঙ্গলে যাব তখন এই তরোয়ালটা সঙ্গে নিয়ে গেলে হয়। আমাকে বেশ রাজার মত দেখাবে'। ভাবনা চিন্তা করে তপস্বী এখন থেকে কোমরে তলোয়ারটা গুজে যেতে শুরু করেছে। জঙ্গলে গিয়ে ফলমূল কুড়িয়ে জোগাড় করছেন, আর পাশে তলোয়ারটা রাখা আছে। এবারে তলোয়ারের তন্মাত্রার যে আকর্ষণী শক্তি, সেটা তপস্বীর উপরে কাজ করতে শুরু করেছে। তলোয়ারটাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে দিনের পর দিন বইতে বইতে তার মনটা আস্তে আস্তে ক্রুর হয়ে গেল, আর তপস্যার যা কিছু ফল ছিল সব তাতেই নাশ হয়ে গেল। শুদ্ধু তলোয়ারের নিরত সান্নিধ্যে বসবাসের জন্য মুনিকে নরকে গমন করতে হল। এই জন্য বলা হয়, যে বস্তুর সংসর্গে আমরা থাকব সেই বস্তুর ধর্ম আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে এসে যাবে। কারণ প্রত্যেকটি জিনিষ একটা বিশেষ তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী হয়, সেই জিনিষের সঙ্গে বেশি দিন থাকলে তার তন্মাত্রাও আপনার আমার মধ্যে চলে আসবে। সেইজন্য যারা সাধক হতে চান, তাদেরকে অপরের জামা কাপড় বা অপরের ব্যবহৃত যে কোন জিনিষ ব্যবহার করতে খুব কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়। ঠাকুর এইজন্য গৃহীদের বলতেন বাড়িতে ঠাকুর দেবতার ছবি রাখতে, কিন্তু রজোগুণীরা কুইনের ছবি রাখে।

সীতার সব কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – হে সীতে, আমি ঋষি মুনিদের কথা দিয়েছি তাদের রক্ষা করার, সেইজন্য যদিও আমি তোমার কথাকে আমি খুব গুরুত্ব দিই, তুমি যা বলেছ তাকে সম্মান জানিয়ে বলছি আমাকে কথা রাখতেই হয়। আর তুমি এটা মনে রেখো – **কামং তপঃপ্রভাবেণ শক্তা হন্তুং নিশাচরান্**।৩/১০/১৩। এই যে যত ঋষিরা আছেন, এঁদের যা তপস্যা আছে তাতে এনারা ইচ্ছে করলেই সব রাক্ষসদের ভস্ম করে দিতে পারেন। কিন্তু তা তাঁরা করবেন না, কারণ তাহলে তাঁদের তপস্যার সব ফল নষ্ট হয়ে যাবে। এনারা কখনই নিজেদের তপস্যার ফলকে এই সামান্য প্রাণী হিংসা দিয়ে নাশ হয়ে যেতে দেবেন না।

আমরা প্রথমেই বলেছি যে বাল্মীকি রামায়ণের মূল ভাবই হল তপস্যা, তপস্যাই বাল্মীকি রামায়ণের মূল বক্তব্য। এখানে এই তপস্যারই আরেকটি দিককে বর্ণনা করা হল। যে তপস্যাই করে থাকুন না কেন,

সেই তপস্যার ফলকে ঋষিরা সাধারণ জিনিষে লাগিয়ে নষ্ট করতে চাইতেন না। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – আমি আমার প্রাণত্যাগ করে দেব, তোমাকেও ত্যাগ করে দিতে পারি, লক্ষ্মণকেও ছেড়ে দেব কিন্তু আমি যেটা কথা দিয়েছি সেই সত্যকে কক্ষণই ত্যাগ করব না।

এরপরে শ্রীরামচন্দ্র এই আশ্রম সেই আশ্রম ঘুরে ঘুরে সময় অতিবাহিত করছেন। একদিন সুতীক্ষ্ণ ঋষিকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন 'হে মুনিবর, শুনেছি অগস্ত্য ঋষি এদিকেই কোথাও অবস্থান করছেন, আমি তাঁর দর্শন লাভ করতে খুব আগ্রহী'। আমাদের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অগস্ত্য মুনি খুবই বিখ্যাত একজন যোগী পুরুষ। এখানে যেমন অগস্ত্য মুনির উল্লেখ পাচ্ছি, মহাভারতেও তাঁর অনেক কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে অনেক জায়গাতে অগস্ত্য মুনির পূজাও করা হয়। বলা হয় তিনিই নাকি প্রথম দক্ষিণ ভারতে বেদের ধর্ম নিয়ে গিয়েছিলেন। অগস্ত্য মুনির চেহারা খুব ছোটখাটো ছিল, দেখতে খুব একটা আহামরি কিছু ছিলেন না। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে দেখেন গাছের ডালে কয়েকজন মানুষ উল্টো হয়ে ঝুলে আছে। অগস্ত্য মুনি গিয়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করছেন যে আপনারা কারা, আর এভাবে কেন ঝুলে রয়েছেন? তখন ওনারা বললেন 'আমরা হলাম তোমার পূর্বজ, তোমার সন্তান হয়নি বলে আমরা পুত নামক নরকে পরে রয়েছি, স্বর্গে যেতে পারছি না। তুমি যদি সন্তানের জন্ম দাও তাহলে আমাদের মুক্তি হবে'।

অগস্ত্য মুনি সেখান থেকে তখন গেলেন এক রাজার কাছে। রাজার এক মেয়ে ছিল, যার নাম লোপমুদ্রা, দেখতে খুব সুন্দরী। রাজা অগস্ত্য মুনিকে দেখেই ভাবছেন, এই কুৎসিৎ দেখতে বেঁটে বামুন, এর সাথে আমার এই সুন্দরী কন্যার কি করে বিয়ে দেব! তখন রাজা কতক গুলি শর্ত দিলেন অগস্ত্য মুনিকে। কিন্তু অগস্ত্য এত বড় ঋষি আর যোগী ছিলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে সব কটা শর্তকে অবলীলায় পূরণ করে দিলেন। রাজার আর কিছু করার ছিল না। তিনি লোপমুদ্রাকে অগস্ত্য মুনির হস্তে সমর্পণ করে দিলেন। লোপমুদ্রাও স্বামীকে প্রচণ্ড ভালোবাসত আর শ্রদ্ধা করত।

শঙ্করাচার্য তাঁর একটি ভাষ্যে বলছেন, ব্রাহ্মণদের যে এত সম্মান করা হয়, পূজো করা হয় তার কারণ অগস্ত্য মুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ বংশের ছিলেন বলে ব্রাহ্মণরা অগস্ত্য মুনির বংশধর। অগস্ত্য মুনির কিরকম যোগ ক্ষমতা ছিল তার একটা নমুনাই যথেষ্ট হবে। অসুররা বার বার দেবতাদের আক্রমণ করত। দেবতারা পাল্টা অসুরদের তাড়া করে আক্রমণ করলেই অসুরগুলো পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রে লুকিয়ে পড়ত। পুরাণের এই তথ্যকে অবলম্বন করে স্বামী দয়ানন্দ বলে দিলেন ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার লোকরাই অসুর জাত, সমুদ্রের ওপারের লোক কিনা। যাই হোক, দেবতারা গিয়ে অগস্ত্য মুনিকে সব বলল। অগস্ত্য মুনি বললেন ঠিক আছে, তিনি গঙ্গাসাগরের কাছে সমুদ্রের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের গণ্ডুষ দিয়ে পুরো সমুদ্রকে পান করে নিলেন। সমুদ্রের সমস্ত জল পান করে নিতেই অসুরদের আর লুকোবার জায়গা থাকল না, তখন দেবতারা এসে অসুরদের শেষ করে দিল। পরে এই সমুদ্রকে ভরাট করার জন্য আবার গঙ্গাকে অবতরণ করাতে হল।

অগস্ত্যা মুনিকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে, তার মধ্যে ইল্বল আর বাতাপির কাহিনী খুব বিখ্যাত। ইল্বল আর বাতাপি এই দুই ভাই ছিল ঘোরতম ব্রাহ্মণ বিরোধী রাক্ষস। এরা কোন ব্রাহ্মণ দেখলেই সাধারণ মানুষের রূপ ধারণ করে খুব বিনয়ী হয়ে সেই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে এমন দেখাত যেন তারা ব্রাহ্মণদের খুব ভক্তি করে। ব্রাহ্মণরাও বুঝতে পারত না, তখন এরা ব্রাহ্মণকে বাড়িতে আপ্যায়ন করে এনে মাংস রান্না করে খাওয়াত। বাতাপি হয়ে যেত ছাগল আর ইল্বল তাকে কেটে মাংস রান্না করে ব্রাহ্মণকে খাইয়ে দিত। তারপর ইল্বল যখন বাতপির নাম ধরে ডাকত – বাতপি বেরিয়ে এসো। সঙ্গে সঙ্গে বাতপি গোটা ছাগল হয়ে ব্রাহ্মণের পেট চিরে বেরিয়ে আসত। এই ব্যাপারে এদের সিদ্ধাই ছিল। এই করে করে তারা অনেক ব্রাহ্মণকে মেরে খেয়ে নিয়েছে।

এখন অগস্ত্য মুনির কাছে এদের খবর গেছে। ইল্বলের কাছে অগস্ত্য মুনি কিছু টাকা চাইতে গিয়েছিলেন নিজের বিয়ের ব্যাপারে খরচ করার জন্য। অগস্ত্য মুনিকেও নিয়ে গিয়ে বাতাপির মাংস খেতে

দিয়েছে। অগস্ত্য মুনিও পুরো মাংস খেয়ে নিয়েছেন। খেয়েই এক জোর ঢেকুর তুলেছেন। ইল্বল যথারীতি বলছে – বাতাপি বেরিয়ে এসো। অগস্ত্য মুনি তখন বলছেন – বাতাপি আর বেরোবে কোত্থেকে ওকে আমি হজম করে নিয়েছি। শুধু যে হজম করে নিয়েছেন তাই নয়, অগস্ত্য মুনি পুরো ব্যাপারটা আগে থাকতেই জানতেন। ইল্বলতো প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ে গিয়ে বলছে – ঠিক আছে, আপনি যা চান আমি তাই দেব। মানে অগস্ত্য মুনি যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যায় তার চেষ্টা করছে। যার এই রকম যোগ শক্তি সে আমাকেও অনেক কিছু করে দিতে পারে।

হিন্দুদের পৌরাণিক ধারণা যে সূর্য মন্দরাচল পর্বতকে পরিক্রমা করে। এদিকে বিন্ধ্যাচলের খুব অভিমান হয়েছে, সুর্য মন্দরাচলকেই কেন শুধু পরিক্রমা করবে, আমি তার থেকে কিসে কম আছি, আমাকে কেন সূর্য পরিক্রমা করবে না। তখন সবাই বলল যে মন্দরাচল অনেক উঁচু বলে তাকেই সূর্য পরিক্রমা করে। বিন্ধ্যাচল তখন বলছে ঠিক আছে আমিও উঁচু হব, এই কথা শুনে সেও বাড়তে শুরু করেছে। বাড়তে বাড়তে সে যদি উঁচুতে উঠে যায় তাহলে সূর্যের পরিক্রমার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, সূর্যের পরিক্রমার পথ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। বিন্ধ্যাচলতো এখন অভিমানে ফুঁসছে, ওকে আটকাবে কে? তখন সবাই মিলে অগস্ত্য মুনির শরাণাপন্ন হয়ে বলছে – হে অগস্ত্য মুনি আপনিই একমাত্র পারেন এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে। অগস্ত্য মুনি তখন ঠিক করলেন যে, তাঁর পত্নি লোপমুদ্রাকে নিয়ে দক্ষিণ দেশের দিকে যাত্রা করবেন। দক্ষিণ দেশে যেতে গিয়ে বিন্ধ্যাচলকে বলছেন ‘ওহে বিন্ধ্যাচল, আমি যে ওপারে দক্ষিণ দেশে যাব, তোমার মাথাটা নিচু না করলে আমি ওপারে যাব কি করে, তুমি পথ দাও’? বিন্ধ্যাচল তখন হাতজোড় করে বলছে ‘কি করতে হবে প্রভু আজ্ঞা করুন’। ‘তুমি মাতা নত কর, এত উঁচু করলে আমি যাব কি করে। আর দক্ষিণ দেশ থেকে যত দিন না ফেরত আসি তুমি মাথা নত করেই থাকবে, কেননা আমাকে ওপারে আবার ফিরে যেতে হবে তো’। বিন্ধ্যাচল মাথা নিচু করে দিল, আর অগস্ত্য মুনিও দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন, কিন্তু আর দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারত ফিরে এলেন না। সেই থেকে বিন্ধ্যাচল এখনও মাথা নত করেই আছে, কবে অগস্ত্য মুনি আবার ফেরত আসবেন বলে। যাঁর এত যোগশক্তি, যাঁর বাসস্থান উত্তর ভারত, কিন্তু তিনি জগতের কল্যাণের জন্য নিজের বাসভূমিকে ছেড়ে সেই যে দক্ষিণ ভারত চলে গেলেন আর ফিরে এলেন না। এটা হচ্ছে একটা বর্ণনা যে কিভাবে দক্ষিণ ভারতে বেদের ধর্ম গিয়েছিল। অগস্ত্য মুনিই নিয়ে গিয়েছিলেন, দক্ষিণ ভারতে ওনার নাম কুরুস্বামী। ওদের ভাষায় কুরুস্বামীর অর্থ বেঁটে সাধু।

এই অগস্ত্য মুনি শ্রীরামচন্দ্রের সময় তখনও বেঁচে আছেন। বাল্মীকি রামায়ণে যে কজন ঋষির নাম পাওয়া যায়, তারমধ্যে বাল্মীকি একজন বড় ঋষি ছিলেন, আর বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য মুনিও খুব নামকরা ঋষি ছিলেন। এই চার জন ছিলেন সব চাইতে নামকরা ঋষি, পরের দিকে বাল্মীকি ঐতিহাসিক চরিত্র রূপে উঠে এলেও অগস্ত্য, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পৌরাণিক চরিত্র রূপেই থেকে গিয়েছিলেন। বশিষ্ঠ, বাল্মীকির উল্লেখ আমরা বেদেও পাই, তার মানে তখনও বেদের কাল চলছিল। খুব নামকরা অনেক ঋষি তখন ছিলেন। মহাভারতে আমরা ব্যাসদেব আর যাজ্ঞবল্ক্যকে পাই খুব বড় ঋষি রূপে।

অগস্ত্য মুনি যখন শুনলে তাঁর আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র আসছেন, শুনতেই তিনি নিজের শিষ্যদের নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। **তং দদর্শাগ্রতো রামো মুনীনাং দীপ্ততেজসম্**।৩/১২/২২। মুনিদের মধ্যে প্রদীপ্ততেজা এক ঋষিকে দেখিয়ে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন ‘এই যে ঋষির তেজ বেরোচ্ছে, এই তেজ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ইনিই সেই মহাত্মা অগস্ত্য মুনি’। অনেক ঋষি মুনি ছিলেন, সবাইকে একই রকম দেখতে লাগছে কিন্তু এনার চেহারার মধ্য থেকে একটা আলাদা ধরণের তেজ বেরোচ্ছে, এই তেজই তাঁকে সবার থেকে আলাদা করে দিচ্ছে।

অগস্ত্য মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে খুব সম্মান ও আদরের সঙ্গে আপ্যায়ন করে অনেক কথাবার্তা বলার পর বলছেন ‘হে রামচন্দ্র আমার কাছে অনেক অস্ত্র-শস্ত্র রাখা আছে, বিষ্ণুই আমার কাছে রেখে এই অস্ত্রগুলো

রেখে গিয়েছিলেন, এই অস্ত্র-শস্ত্র গুলো তুমি এখন রেখে দাও তোমার কাজে লাগবে। ভগবান বিষ্ণু নিজে এগুলো ব্যবহার করেছিলেন’। শ্রীরামচন্দ্র সব অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করলেন। পরে রাবণ বধের সময় শ্রীরামচন্দ্র এই অস্ত্রগুলোই ব্যবহার করেছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তখন অগস্ত্য মুনিকে জিজ্ঞেস করছেন যে এখানে বসবাসের উপযুক্ত জায়গা কোথায় আছে, যেখানে জল, ফল-মূলের প্রাচুর্য আছে। তখন অগস্ত্য মুনি বললেন যে কাছেই পঞ্চবটী নামে একটি মনোরম জায়গা আছে সেখানে থাকলে তোমাদের সকলেরই সব দিক দিয়ে সব রকমের সুবিধা হবে। তারপর সীতাকে দেখে অগস্ত্য মুনি খুব খুশি হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – **এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামা সৃষ্টে রঘুনন্দন।** হে রঘুনন্দন, সৃষ্টির আদি কাল থেকে স্ত্রীকুলের স্বভাব হল **সমস্তমনুরজ্যতে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ।।**৩/১৪/৫। যতক্ষণ তাদের মনের মত জিনিষটা চলে ততদিনই তারা সেই জিনিষের প্রেম করে, যেদিন বিষম হয়ে যায় সেদিন তাকে ছেড়ে দেয়। এখানে ভাষ্যকাররা বলছেন – যতদিন স্বামীর ভালো সময় যায়, মানে অর্থ, মান, স্বাস্থ্য, সব ঠিক থাকবে ততদিনই তারা স্বামীর কাছে থাকে, স্বামীর যদি এসব চলে যায় তখন তারাও তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সব স্ত্রীই তা নয়, অন্য রকমও দেখা যায়, এটা সাধারণ ভাবে যা হয়ে থাকে। তারপরে বলছেন – **শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা।**৩/১৪/৬। স্ত্রীদের বলছেন এদের মধ্যে বিদ্যুতের চপলতা, শস্ত্রের তীক্ষ্ণতা আর বায়ুর মত দ্রুতগামীতা বিরাজ করে। কিন্তু হে রামচন্দ্র, আপনার সীতার মধ্যে এই তিনটি দোষ নেই, এই তিনটি দোষ থেকে সীতা মুক্ত। সেইজন্য আপনার সব কিছু খুবই ভালো হবে, কোথাও আপনার কোন অসুবিধা হবে না। এক জায়গায় বলা হয়েছে যে অগস্ত্য মুনির স্ত্রী লোপমুদ্রা সীতাকে দিব্য অঙ্গরাগ দিয়েছিলেন।

অগস্ত্য মুনির আশ্রম থেকে শ্রীরামচন্দ্র সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে এবার পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তখন পথে জটায়ুর সঙ্গে পরিচয় হল। জটায়ু এক বিরাট পাখি, অত বড় পাখি দেখে সবাই বিস্মিত হয় চমকে উঠেছেন। শ্রীরামচন্দ্র গিয়ে জটায়ুকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় পেয় জটায়ু খুব খুশি হয়েছে। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে তখন সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির বিবরণ দিচ্ছেন – যত প্রজাপতি আছেন, প্রজাপতিদের যে বিভিন্ন নারীদের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, তাদের থেকে কার কার কি কি সন্তান হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছেন। রামায়ণ আর মহাভারতে এই ধরণের বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও পুরাণে এর অনেক বিরাট বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন বলছেন অদিতি, দিতি, দনু, কাল এনারা সবাই খুব নামকরা স্ত্রী, আর এঁরা সবাই কাশ্যপ মুনির স্ত্রী। অদিতির গর্ভে তেত্রিশ দেবতার জন্ম হয় – বারো জন আদিত্য, আট জন বসু, এগারো জন রুদ্র আর দুজন হচ্ছে স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ঠিক তেমনি দিতি থেকে জন্ম নিয়েছে দৈত্যরা, সেইজন্য দেবতা আর দৈত্যরা সৎভাই। শ্রীরামচন্দ্রের আর লক্ষ্মণের যা সম্পর্ক, দেবতা আর দৈত্যদের ঠিক একই সম্পর্ক। যারা দানব এদের মা দনু, দনুর সন্তান মানে কাশ্যপ এদের পিতা। শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ এবং শ্রীরামচন্দ্র আর ভরতের যা সম্পর্ক, একই সম্পর্ক দেবতা আর দানবদের। খ্রীশ্চানদের পরম্পরাতেও এই একই জিনিষ দেখতে পাওয়া যায়, যে Saturn আর ভগবান দুজনেই ভাই ভাই সম্পর্ক। বিনতাও ছিলেন কাশ্যপের স্ত্রী, বিনতার থেকে গরুড় আর অরুণের জন্ম হয়। এই বংশ থেকেই জটায়ুর জন্ম, জটায়ুর আরেক ভাই সম্পাতি। এই সব বর্ণনা করে জটায়ু বলছেন আমি হলাম আপনার বাবা রাজা দশরথের বন্ধু। যখন দেবাসুর সংগ্রাম হয়েছিল তখন জটায়ু, দশরথ এনারা সবাই এক সঙ্গে দেবতাদের হয়ে অসুরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

এরপরে সবাই পঞ্চবটীতে গোদাবরী নদীর তীরে এসে পৌঁছেছেন। তখন হেমন্ত কাল, শীত আসব আসব করছে। কালিদাসের ঋতুসম্ভারে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা আছে, এখানেও একই ভাবে বাল্মীকি ঋতুর বর্ণনা করছেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে দেখিয়ে দেখিয়ে হেমন্তের মিষ্টি হাওয়াতে যে প্রকৃতির মধ্যে মনোরম ভাব বিরাজ করছে তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। হাতির দল যাচ্ছে, একটা হাতির জল তেষ্টা পেয়েছে, সে

জলের ধারে এসে নিজের শুড়টাকে জলে এগিয়ে দিয়ে পিছিয়ে আসছে, জলের মধ্যে এখন একটা ঠাণ্ডা ভাব এসে গেছে।

অন্যান্য রামায়ণ থেকে বাল্মীকি রামায়ণ অনেক বেশি বাস্তবানুগ, কিন্তু যারা ভক্তিরস আস্বাদন করতে চান তাদের পক্ষে অন্য রামায়ণের মধ্যেই ডুবে থাকতে হবে। বাল্মীকি রামায়ণে ভক্তির উপাদান অনেক কম, এখানে কথায় কথায় দেখা যায় শ্রীরামচন্দ্র মুনি ঋষিদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করছেন, অন্য রামায়ণে এই ধরণের দৃশ্য কখনই দেখানো হবে না। বরঞ্চ উল্টো করে দেখানো হয়েছে, কারণ সেখানে প্রথম থেকেই শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান বলে দেখানো হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণেও অনেক সমস্যা আছে, যেমন অনেকে অভিযোগ করেন যে পরের দিকে বাল্মীকি রামায়ণে অনেক কিছু প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

বাল্মীকি রামায়ণের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ বেশির ভাগই পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মাথা থেকে এসেছে। আর দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশের কিছু কিছু পণ্ডিতরাও তাদের সুরে সুর মিলিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে কত রকমের ধাপ্পাবাজী আছে সেগুলো কে প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিছু দিন আগে এক বাঙ্গালী পণ্ডিত একটা বই লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছেন গীতার যে সাতশটি শ্লোক তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় তিন খানা আলাদা আলাদা বইকে সংযুক্ত করে গীতা নামে একটা বইয়ে দাঁড় করান হয়েছে। তিনি প্রত্যেকটি শ্লোককে ধরে ধরে দেখিয়ে দিচ্ছেন প্রথম যে গীতা ছিল তাতে এই কটি শ্লোক ছিল, দ্বিতীয় গীতাতে এই কটি শ্লোক যোগ হয়েছে আর তৃতীয় গীতাতে এই কটি শ্লোক সংযুক্ত হয়েছে। তাতে উনি নিজের বেশ কয়েকটি যুক্তি দেখিয়ে বলতে চেয়েছেন যে এই শ্লোক কয়টি এই কারণে এই গীতাতে ছিল, আগের গীতাতে এই শ্লোক গুলি এই এই কারণে ছিল না, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা যখন শঙ্করাচার্যের ভাষ্য পড়ি তখন মনে হবে যে, মূল গীতাতে এমন একটি শ্লোকও নেই যেটাকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। শঙ্করাচার্যই তো আজ তেরশ কি চৌদ্দশ বছরের আগে গীতার ভাষ্য রচনা করে গেছেন। শঙ্করাচার্যের ভাষ্যতো তাঁর নিজের হাতে লেখা, সেখানে তো কেউ কারচুপি করে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে বলতে পারবে না। শঙ্করাচার্যেরও অনেক আগেকার যাঁরা ঋষি মুনিরা ছিলেন তাঁদের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বেশি ছিল। কারণ তখন তো আর এত ছাপা বই পাওয়া যেত না। এখন একজন গুরু কিছু রচনা করেছেন, লিখে তিনি তাঁর শিষ্যকে দিয়ে বলে দিলেন – দেখো বাপু, আমি এই জিনিষটা রচনা করেছি। এখন তাঁর শিষ্য সেই রচনার মধ্যে দুটো পাতা নিজে লিখে ঢুকিয়ে দিতে পারবে? এই জিনিষ এখন যদিও সম্ভব হতে পারে কিন্তু তখনকার দিনে একেবারেই সম্ভব ছিল না।

একটা জিনিষ হতে পারে, যখন বাল্মীকির মত ঋষিরা কিছু রচনা করতেন তখন ওনারা এক দিনে যত পাতাই লিখুন না কেন, এই রকম বিশাল গ্রন্থ রচনা অনেক দিন ধরেই লেখা হতে থাকত, যার ফলে নিজেরা অনেক সময় ভুলে যেতেন প্রথমের দিকে কি কি জিনিষ লিখেছিলেন। তার ফলে অনেক জিনিষের পুনরুক্তি হয়ে যেত, বা একই জিনিষের অন্য ধরণের বিবৃতি হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল না। বাল্মীকি রামায়ণকেই ধরা যাক, রামায়ণ যে কাব্যিক আঙ্গিকে ও যে ছন্দে লেখা হয়েছে তাতে কম করে হলেও বাল্মীকির রামায়ণ রচনা করতে দুই থেকে তিন বছর সময় লাগতে পারে। এখন বাল্মীকি রামায়ণে চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে, এই চব্বিশ হাজার শ্লোককে দু-বছরে লিখতে তাঁকে প্রত্যেক দিন প্রায় তিরিশ চল্লিশটা করে শ্লোক রচনা করতে হবে। এছাড়া তাঁকে সারা দিনে অন্য কাজও করতে হচ্ছে, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সাধন-ভজন, শিষ্যদের উপদেশ দেওয়া, তারপর খাওয়া-দাওয়া করাও আছে, এই সব পঞ্চাশটা জিনিষ করে ধরে নিলাম তিনি প্রতিদিন গড়ে তিরিশটার উপর শ্লোক রচনা করতেন। এই সমস্যাটা পণ্ডিতরা মাথাতেই নিতে চায় না। যে কোন কবি, তিনি যত বড় প্রতিবভাবনই হোন না কেন, বাল্মীকির মত শব্দ চয়ন করে, সেই শব্দকে ছন্দে নিবদ্ধ করে একটা ভাবকে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাহিনীকে টেনে নিয়ে যাওয়া, আর যাই হোক দিনে তিরিশটি শ্লোক রচনা করা অত্যন্ত কঠিণ ও অবাস্তব মনে হবে, আর বাল্মীকি লিখেছিলেন তালপত্রে, তখনও ভুজ্যপত্র আসেনি। একেকটি তালপত্রে তিনটে কি চারটে করে শ্লোক লেখা হত, এখন এই চব্বিশ হাজার শ্লোক লিখতে কত তালপত্র লেগেছে হিসেব করলেই চোখের সামনে বিশাল তালপাতার

স্তূপ ভেসে উঠছে। আমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় তিন মাসে আগে আপনি এই সময় কোথায় ছিলেন বলতে পারবেন? তিন মাস কেন, গত রবিবার আমি সকালে কার কার সঙ্গে কি কি কথা বলেছি বলতে পারব না। এখন বাল্মীকি প্রথম দিকে যা লিখেছিলেন এক বছর পর তার কি সেটা মনে থাকার কথা? আর ঐ তালপাতার স্তূপ থেকে সেই দিনের লেখাকে বার করাও সময়ের দরকার। সেইজন্য পরের দিকে লেখার সাথে আগের লেখার সঙ্গে কোন কোন জিনিষ একটু এদিক সেদিক হতেই পারে। তারপর তিন চার হাজার বছর পর আমরা ছাপা অক্ষরে বাল্মীকি রামায়ণকে হাতে নিয়ে পাতা উল্টে উল্টে বলছি এখানে এই শ্লোকের সাথে আগের শ্লোকের ভাব মিলছে না, এই কথার সাথে আগের কথা মিলছে না। বাল্মীকির লিখতে দুই তিন বছর লেগেছে আমার টানা পড়ে যেতে বড় জোর দুটো দিন লাগছে। দুই বছর ধরে লেখা আর দুদিনে পড়ার মধ্যে তফাৎ তো থাকবেই।

Interpolation বলতে আসলে কি বোঝায়? আমি যদি কিছু রচনা করে কাউকে দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে কেউ যদি তাতে কিছু সংযোজন বা সংশোধন করে দেয় তখন সেটাকে কেউ Interpolation বলবে না তখন বলবে সম্পাদনা করা হয়েছে, তার মানে ঐ রচনাটাই মৌলিক রচনা হয়েই সমাদৃত হবে। অন্য দিকে আমি কয়েকজনকে আমার রচনা দিলাম আবার অন্য কয়েকজনকেও শোনালাম। এখন এক দুজন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে যা ছিল সেটাকেই রেখে দিলেন। আবার কেউ মনে করল এই জায়গাটা ঠিক মত লেখা হয়নি, এই ভাবে লিখলে ভালো হত এই মনে করে সে পাঁচটা শ্লোক আরও যোগ করে দিল। প্রথম জন আবার তার শিষ্যদের সেই রচনা দিয়ে দিল, তার শিষ্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, গুরু যেমনটি দিয়েছে সে ঠিক তেমনটিই রেখে দিয়েছে। কিন্তু আরেকজনের শিষ্য সেই রকম নিষ্টাবান নয়, সে এখন আরও পাঁচটা শ্লোক নিজের মত যোগ করে দিয়েছে। তার মানে তিনি যে পাঁচটা শ্লোক যোগ করেছিলেন তার সাথে তাঁর শিষ্যের যোগ করা পাঁচটা শ্লোক তো কখনই এক হবে না। আজ থেকে প্রায় তিন চার হাজার বছর আগে বাল্মীকি রামায়ণ রচিত হয়েছিল। এখন যদি প্রতি একশ বছরে একশটি করে শ্লোক পাল্টায় তাহলে এত বছর পরে কত শ্লোক পাল্টানোর কথা? অথচ সারা ভারত আমরা ঘুরে যত বাল্মীকি রামায়ণ পাই তার সব কটিতে একই শ্লোক, একই ভাবে সাজানো রয়েছে দেখতে পাই। বাল্মীকি রামায়ণের যত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে প্রত্যেকটিতে একই সংখ্যা আর একই শ্লোক পাওয়া গেছে, কোথাও কোন অমিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি Interpolation হয়ে থাকে তাহলে এই জিনিষটা কি করে সম্ভব হল? তখন এইসব পণ্ডিতরা বলবে – এক সময় যখন খুব বন্যা হয়েছিল তখন যত বাল্মীকি রামায়ণের পাণ্ডুলিপি ছিল সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শুধু এটাই বেঁচে গেছে।

কবীর দাসের ভজন, দোহা এগুলো খুব নামকরা। আগেকার দিনে যাদের হাতের লেখা খুব সুন্দর থাকত, তাদেরকে কবীর দাসের মত কবিরা অনুরোধ করতেন তাঁর লেখাগুলোকে কপি করে দেবার জন্য। এরাও সময় নিয়ে কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অনুলিপি করে দিত। সব অনুলিপি করা হয়ে যাওয়ার পর তাদের লিখতে হত – আমি শ্রদ্ধা সহকারে যা লিখেছি সব ঠিক লিখেছি। যদি জেনেশুনে কিছু ভুল লিখে থাকি তাহলে আমি যেন মহাপাতক হই। অজান্তে যদি কোন দোষ করে থাকি আমি গুরুর কাছে ক্ষমা চাইছি। এই কথাগুলো তাকে দিব্যি খাওয়ার মত লিখতে হত যে মূল যে পাণ্ডুলিপি ছিল তার কোন পরিবর্তন আমি করিনি। সেইজন্য কবীর দাসের যত দোহা আছে সব মূল পাণ্ডুলিপিতে যা ছিল তাই আছে।

কিছু দিন আগে একজন বৃটিশ নাগরিক ইন্টারনেটে রামায়ণের সার্চ করতে করতে বাল্মীকি রামায়ণের খোঁজ পেয়ে বাল্মীকি রামায়ণকে ভালোবেসে ফেলেছেন। চারিদিকে সার্চ করে করে দেখছিলেন বাল্মীকি রামায়ণের ভালো কোন অনুবাদ পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু পরে দেখছেন বাল্মীকি রামায়ণের একটাও ভালো অনুবাদ নেই, তখন তিনি নিজেই এর অনুবাদ করতে শুরু করে দিলেন। ইনি নিজে একজন জার্নালিস্ট, এনার বাবা ছিলেন আবার বিজ্ঞানী। নিজে কায়দা করে জার্নালিস্ট হয়ে ভারতে চলে আসেন। ওনার অনুবাদ আধুনিক স্টাইলে হলেও খুব একটা আহামরি কিছু হয়নি, কিন্তু তাঁর মধ্যে সততা আছে। একটা জায়গায় খুব মজা করে বলছেন – হিন্দুদের আমরা অসম্মান করি কি করে? যখন আমার পূর্বপুরুষরা

জংলী অবস্থায় বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত আর কাঁচা মাংস খেত, তখন বাল্মীকি এই রামায়ণ রচনা করেছিলেন, এদেরকে প্রশ্ন করার অধিকার কি আমাদের আছে? এই বৃটিশ নাগরিক খুব সততার সাথে একটা কথা বারবার বলছেন – যখনই আমি হিন্দু ধর্মকে বুঝতে যাচ্ছিলাম, যখনই মনে হল এই জিনিষটাকে ধরে ফেলেছি, তখনই দুম্ করে এমন আরেকটা জিনিষ এসে যেত যে পুরো ব্যাপারটাই ছিটকে বেরিয়ে যেত। ভদ্রলোক বলছেন – হিন্দু ধর্মে যতক্ষণ না জন্ম নেবে তত দিন হিন্দু ধর্মের কিছু বোঝা যাবে না, আর ভারতকে বুঝতে গেলে আগে হিন্দু ধর্মকে বুঝতে হবে।

ইলিয়ড আর ওডিসি এই দুটো মহাকাব্য মিলিয়ে যা আছে তার থেকে অনেক বেশি জিনিষ ও আরও গভীর ভাব সমূহ বাল্মীকি রামায়ণে দেওয়া আছে। এই জিনিষগুলোকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা হজম করে নিতে পারেনা, কারণ এরা হচ্ছে শাসকবর্গ। যারা শাসকবর্গ হয়, শাসিতরা তার থেকে কোন ক্ষেত্রে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হবে, এটা তারা কোন ভাবেই মানতে পারবে না। যদি দরকার পরে তাহলে তারা ইতিহাসকে নতুন করে রচনা করে পাল্টে দিতে চাইবে।

ভারতের ঐতিহ্য ও তার সংস্কৃতির সমালোচনা করার আগে ভারতের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যতা আর তার রীতিনীতিকে ঠিক ঠিক বুঝতে হবে, তার মধ্যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল গুরুকে উল্লঙ্ঘন না করা। মনুস্মৃতিতে আছে – ব্রহ্মহত্যা পাপ, মানে ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ। ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হল গুরুতল্পবাদ, মানে গুরুর বিছানায় শোওয়া। গুরুর বিছানায় শোওয়া মানে গুরু পত্নীর সাথে অন্য রকমের সম্পর্ক রাখা। আসলে আগেকার ব্রাহ্মণরা তিন চারটে বিয়ে করত। অনেক সময় হত কি, গুরু বৃদ্ধ হয়ে গেছেন কিন্তু তার কণিষ্ঠ বধুটি একেবারেই অল্প বয়সী, আর শিষ্য হয়তো তার এই গুরুপত্নীর থেকে বয়সে কিছুটা বড়। এখন এই গুরুপত্নীর সাথে শিষ্যের সম্পর্ক হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। এই সম্পর্ককেই ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ বলে ধরা হচ্ছে। আমরা এত শাস্ত্র পড়েছি, কিন্তু কোথাও একটাও ঘটনা পাওয়া যাবে না যে শিষ্য ও গুরুপত্নীর সাথে এই ধরণের কিছু হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, অনেকে যারা গুরুপত্নীর এই সম্পর্কের ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করছেন তখন এই অর্থেই ব্যাখ্যা করা হয় যে – গুরু যেটা লিখিত আকারে শিষ্যকে দিয়েছে, যেমন বাল্মীকি দিয়েছিলেন, সেই লেখাকে শিষ্য যদি কোন ভাবে পাল্টে দেয়, বা কিছু বাদ দিয়ে দেয়, বা নিজের কিছু লেখাকে ঢুকিয়ে দেয় তখন শিষ্যের সেই একই পাপ হবে, এটাই গুরুতল্পবাদ হয়ে যাচ্ছে। শিষ্যরা কক্ষণই তাই এই জিনিষ করতে যাবে না।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন ম্যালেরিয়া জলের দ্বারা সংক্রামিত হয়। সেইজন্য তিনি জল ফুটিয়ে খেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমরা আজকে জানি মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। এখন বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট স্বামীজীর এই কথাটাকে পাল্টে দিয়ে যুগপোযোগী করার জন্য স্বামীজীর লেখাটা ভুল বলে কি কেটে পাল্টে দেবেন? কক্ষণই করবেন না। খুব প্রয়োজন হলে ওখানে একটা স্টার মার্ক দিয়ে নীচে ফুটনোটে লিখে দেবেন – স্বামীজীর সময় এটাই মত ছিল, স্বামীজী সেই মতের কথাই এখানে বলেছেন। স্বামীজী যেটা বলেছিলেন আসলে তা বিজ্ঞানের একটা মত, কিন্তু সেই মতের ওপরে পরে অনেক গবেষণা হয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের সময় কোন বিজ্ঞানীর কথাই বলা হয়নি, সবই আধ্যাত্মিক মূলক কথা। সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণে interpolation হওয়ার কোন কথাই নয়।

এরপর পঞ্চবটীতে শূর্পণখা আগমন, শ্রীরামচন্দ্রকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। শূর্পণখা শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে – **অহং প্রভাবসম্পন্না স্বচ্ছন্দবলগামিনী। চিরায় ভব ভর্তা মে সীতয়া কিং করিষ্যসি।**।৩/১৭/২৫ – আমি কিন্ত খুব প্রভাবশালী, আমি ইচ্ছে মত যেখানে খুশি চলে যেতে পারি, তুমি চিরদিনের মত আমার পতি হও, সীতাকে নিয়ে তুমি কি করবে? কেননা সীতা হচ্ছে – **বিকৃতা চ বিরূপা চ ন সেয়ং সদৃশী তব। অহমেবানুরূপা তে ভার্যারূপেণ পশ্যমাম্।**।৩/১৭/২৬ - বলছেন, হে রাম, ঐ যে মেয়েটি তোমার সাথে রয়েছে যে বিকৃতা, বিরূপা, দেখতে কুৎসিৎ, এ তোমার যোগ্য নয়,

অথচ আমায় দেখ, আমিই তোমার যোগ্য। **ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্। অনেন সহ তে ভ্রাতা ভক্ষয়িষ্যামি মানুষীম্।**।৩/১৭/২৭ – সীতা বিরূপা নারী, অসতী, করালা মানে ভীষণা, ভয়ঙ্করী দেখতে, আর *নির্ণতোদরীম্* শব্দের অর্থ যে মেয়ের পেট ভেতরে ঢুকে গেছে। আসলে ভারতীয় সংস্কৃতিতে মোটা পেটওয়ালা মেয়েক সুন্দরীর মধ্যে গণ্য করা হয় না। সুন্দরীর যে হবে তার পেট আর কোমরের সুসামঞ্জস্যতা থাকবে, রোগা হয়ে পেট ঢুকে যাবে না আবার মোটা ভুরিযুক্ত পেটও থাকবে না। শূর্পণখা বলছে এই বিরূপা, অসতী, রোগাপ্যাটকা মেয়েটিকে আর তোমার ভাই লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করে নেব তারপর তুমি আমার সাথে যথেচ্ছ ভাবে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াবে।

লক্ষ্মণ তখন সব শুনে একই শ্লোক বলছে যেটা শূর্পণখা বলেছিল – *ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্* এটা বলছে শূর্পণখা। লক্ষ্মণ বলছেন – **এতাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্**। ৩/১৮/১১ – তুমি ঠিকই বলেছ, সীতা তাই। বাল্মীকির কবিতার এটাই মাধুর্য। সংস্কৃতে এই ধরণের অলঙ্কারকে বলা হয় যমক অলঙ্কার, একই শব্দ আমি এক অর্থে বলছি, সেই শব্দই আপনি অন্য অর্থে বলছেন। শূর্পণখা যে যে শব্দগুলো বলেছিল লক্ষ্মণ ঠিক একই শব্দ গুলো দিয়ে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে।

শূর্পণখা সীতাকে বলছে বিরূপা, মানে দেখতে কুৎসিৎ, লক্ষ্মণও বলছেন হ্যাঁ ঠিকই বলেছ মা সীতা বিরূপা, এখানে সংস্কৃত ভাষার শব্দার্থের খেলা চলে এসেছে, বিরূপার অর্থ হয় বিশিষ্ট রূপা। বাংলা বা সংস্কৃতে ধাতু, প্রত্যয় আর উপসর্গ এই তিনটে মিলিয়ে শব্দ রচনা করা হয়। কোন কোন শব্দের অর্থকে জোর দেওয়ার জন্য দুটো থেকে তিনটে উপসর্গ লাগিয়ে দেওয়া হয়। যেমন সন্ন্যাস শব্দ, সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্ পূর্বক, তারপরে আসছে 'নি' এটাও উপসর্গ, শেষে আসছে 'অস্', অস্ মানে ক্ষেপণে, ক্ষেপণে মানে ফেলে দেওয়া। অস্ ধাতু, মানে যিনি ফেলে দিয়েছেন, 'নি' নিঃশেষে, তারপরে আবার সম্ উপসর্গ লাগিয়ে দিল, মানে সম্যক্ রূপে নিঃশেষে সব ফেলে দেওয়া, তখন হয়ে যাচ্ছে সন্ন্যাস – সম্+নি+অস্, অস্ হচ্ছে ধাতু, কিন্তু যখনই 'নি' বলে দিচ্ছে তখনই কিন্তু হয়ে গেল ফেলে দেওয়া, 'সম্' যখন দিয়ে দিচ্ছে তখন আরও জোর এসে যাচ্ছে। এই অস্ থেকে আমরা আরও শব্দ তৈরী করে দিতে পারি। এখানে বিরূপ শব্দের রূপ হচ্ছে যার রূপ আছে, রূপবতী, কিন্তু যখন তার আগে 'বি' উপসর্গ এসে যাচ্ছে তখন দুই রকমের অর্থ হয়ে যাবে, একটাতে বুঝতে হবে যে তিনি শুধু রূপবতীই নন, বিশেষ ভাবে রূপবতী, আরেকটা হয় যে তার রূপ বিকৃত।

সংস্কৃতের এই জটিলতাকে নিয়ে অনেক মজার গল্প আছে। একবার সংস্কৃতের ব্যাকারণ পড়া একটি ছেলে জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে চিৎকার করে কারা যেন বলছে 'ব্যাঘ্র' 'ব্যাঘ্র', মানে বলতে চাইছে বাঘ আসছে পালাও। তখন সে 'ব্যাঘ্র' শব্দের বুৎপত্তি করতে বসে গেল। ব্যাঘ্র হচ্ছে ঘ্রাং ধাতু, ঘ্রাং ধাতু মানে ঘ্রাণ নেওয়া, এমন কিছু পশু আসছে যেটা আমাকে শুঁকে চলে যাবে। বাঘ যখন এসে সংস্কৃত ব্যাকারণ পড়া ছেলেটিকে ঝাঁপিয়ে ধরেছে, তখন বেচারা মরার আগে চেঁচাচ্ছে – 'কশ্চিৎ হননে'। তখন তার পাণিনির ব্যাকারণ মনে পড়েছে কখন কখন ঘ্রাং ধাতু হননেও ব্যবহার করা যায়।

লক্ষ্মণও বলছে বিরূপা মানে বিশিষ্ট রূপা। আর অসতী, এখানে অসতীর অর্থ করা হয়েছে – *ন সতী যস্য সমানা*, মানে যার মত সতী আর কেউ হয় না। করালা কথার অর্থ ভয়ঙ্করী বা কঠোর, এখানে লক্ষ্মণ অর্থ করছেন যার শরীরের গঠন ঢেউ খেলানো, যেটা নারী শরীরের সৌন্দর্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যার জন্য সীতার এতো সৌন্দর্য। নির্ণতোদরীর অর্থ করে লক্ষ্মণ বলতে চাইছেন, সীতার কোমর সরু হওয়ার জন্য সীতার পেট মনে হচ্ছে ভেতরে ঢুকে আছে, মেয়েদের কোমর যত সরু বা পাতলা হবে ভারতে সেই নারীর সৌন্দর্যকে তত মর্যাদা দেওয়া হবে।

এরপরে শূর্পণখা একই শ্লোক বলছে – **ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম। বৃদ্ধাং ভার্যামবষ্টভ্যাং ন মাং ত্বং বহুমানসে।।**৩/১৮/১৫। ওগুলোই আবার বলছে। বলে বলছে সীতা এখন বুড়ি হয়ে গেছে। এত কথা বলে বুঝেছে যে, আমার কথাতে কাজ হচ্ছে না, এই মেয়েটাকে নিয়েই যত গোলমাল। তখন সে সীতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সীতাকে শেষ করার জন্য। শ্রীরামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে বলছেন – **ক্রূরৈরনার্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন। ন কার্য্য পশ্য বৈদেহীং কথঞ্চিৎ সৌম্য জীবতীম্।।**৩/১৮/১৯। বাল্মীকি রামায়ণ শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, সবারই জন্য প্রচণ্ড শিক্ষামূলক। সমাজে পরিবারে কার সাথে কখন কীভাবে ব্যবহার করতে হবে জানা না থাকলে খুব বিপদে পড়ে যাবার সম্ভবনা থাকে। এই শ্লোকটি আমাদের সবার জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – যারা ক্রূর কর্মা, নিষ্ঠুর, অনার্য, অনার্য মানে অশিক্ষিত গেঁয়ো এদের সঙ্গে কক্ষণ পরিহাস করতে নেই, মজা করতে নেই। যারা খুব সম্ভ্রান্ত ও অত্যন্ত ভদ্র বাড়ির লোক তারা নিজেদের চাকর-বাকরদের সঙ্গে কখনই মজা করা, ইয়ার্কি মারা, ঠাট্টা করা, এগুলো করতে যাবে না।

আগেকার দিনে, আজ থেকে একশ বছর আগে নিজের সম্মানের জায়গাটাকে নিজেকেই ঠিক রাখতে হত। ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের সাথেই মেলামেশা করতেন অন্যদের সাথে মিশতে যেতেন না। ইদানিং কালে এখন সবাই সবার সাথে মেলামেশা করছে। এখানে শ্রীরামচন্দ্র *পরিহাসঃ* এই শব্দটা ব্যবহার করছেন, কথা বলতে নিষেধ করছেন না, শ্রীরামচন্দ্রও নিজে নিষাদরাজ গুহকের সাথে কথা বলেছেন, মিশেছেন এবং বন্ধুত্বও করেছেন কিন্তু পরিহাস করতেন না। পরিহাস করা মানে, আমি আমার হৃদয়কে তোমার দিকে খুলে দিলাম, এরপরেই কিন্তু তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ হওয়া শুরু হয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – লক্ষ্মণ তুমি এই পরিহাস করাতে সীতার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। এগুলোই পরে গিয়ে খুব বিপজ্জনক কাণ্ডের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শূর্পণখার শ্রীরামের প্রতি আসক্তি যাই থাকুক না কেন, এই পুরো কাহিনীর পরিণামের মূলে লক্ষ্মণের শূপর্ণখার সাথে মজা করতে যাওয়া। লক্ষ্মণ যখন শূর্পণখার সঙ্গে মজা করতে গেল, তখন শূর্পণখার মনে একটা আশা বেঁধে গেল, আশা যেই বেঁধে গেছে তখন তার সাহসও এসে গেল। এরপর যে কাহিনী আছে আমরা মোটুমুটি সবাই জানি। লক্ষ্মণ রেগে গিয়ে তলোয়ার দিয়ে শূর্পণখার নাক আর কান কেটে দিয়েছে।

শূর্পণখা তখন ঐ অবস্থাতে ভাই খর আর দূষণের কাছে গিয়ে সব জানিয়েছে। শূপর্ণখা খর আর দূষণের বোন। এখানে খর আর দূষণের বোন বলা হচ্ছে শূর্পণখাকে আবার রাবণেরও বোন বলা হয়েছে। অন্য দিকে আবার খর ও দূষণকে রাবণের ভাই বলা হচ্ছে না। আবার রাবণকে বলা হয় ব্রাহ্মণ সন্তান কিন্তু খর ও দূষনকে বলা হয় অনার্য। সেইজন্য এদের সাথে রাবণের যে ঠিক কি সম্পর্ক বোঝা যায় না। মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাই বোন হতে পারে।

শূর্পণখা ওখান থেকে চলে যাওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন 'দ্যাখো, আমার এই ডান হাতটা বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে, তার মানে বিরাট যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, আর আমি এই যুদ্ধে জয়লাভ করব'। লক্ষ্মণকে আরও বলছেন 'পঞ্চবটীর কাছেই একটা গুহা আছে, তুমি সীতাকে নিয়ে সেই গুহাতে লুকিয়ে রাখো। কেননা যুদ্ধ হলে অনেক রাক্ষসরা আসবে, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তুমিও নেমে পড়বে, আমিও নেমে যাব, তখন সীতাকে এভাবে প্রকাশ্যে খোলা জায়গাতে একা রাখাটা নিরাপদ হবে না। সেইজন্য তুমি সীতাকে নিয়ে যাও আমি একাই লড়াই করছি'। কিছু পরেই খর আর দূষণ মাত্র দুটো মানুষকে মারার জন্য চৌদ্দজন রাক্ষসকে পাঠিয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র যখন চৌদ্দজন রাক্ষসকে মেরে দিয়েছে, তখন এরা চৌদ্দ হাজার রাক্ষস পাঠাল। চণ্ডীতেও এই ব্যাপার দেখা যায়, প্রথমে কম লোক যাচ্ছে তারপরে তার থেকে একটু বেশি লোক তারপর আরও বেশি সৈন্য পাঠাচ্ছে। খর ও দূষণ দেখছে এই দুজন কোন মামুলি যা তা মানুষ নয়।

বাল্মীকি বলছেন – সমস্ত গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণদের নিয়ে দেবতারা শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ দর্শনের অভিলাষে সেখানে হাজির হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছেন – **স্বস্তি গো ব্রাহ্মণানাঞ্চ লোকানাং চেতি সংস্থিতা।**৩/২৪/২১। গরু, ব্রাহ্মণ ও সমস্ত লোকের স্বস্তি হোক। গরুকে একটা পূজার স্থান দেওয়া, এটা বাল্মীকিই প্রথম শুরু করেছিলেন। বেদের সময় আমরা অনেক উল্লেখ পাই যে তখন ব্রাহ্মণরা বাছুরের মাংস খেতেন। কিন্তু বাল্মীকির সময়ে গোহত্যা বন্ধ হয়ে গরুর পূজা করা শুরু হয়ে গেছে। বাল্মীকি বিরাট করে সুন্দর যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছেন। বলছেন যেভাবে সমুদ্রে এসে সব নদী মিশে যায়, শ্রীরামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত বাণ সমূহ নদীর মত যেন চৌদ্দ হাজার রাক্ষস রূপী সমুদ্রে মিশে গিয়ে সব রাক্ষসদের প্রাণ হরণ করে নিচ্ছে। এইভাবে চৌদ্দ হাজার রাক্ষসদের সাথে দূষণও মারা গেল।

এরপর রাক্ষসদের সেনাপতি ত্রিশিরা এসে শ্রীরামচন্দ্রকে একাই আহ্বাণ করে যুদ্ধ করতে বলছে। ত্রিশিরা খুব বলশালী ও শক্তিমান ছিল, সে এসে এমন বাণ চালাতে লাগল যে, তিনটে বাণ শ্রীরামচন্দ্রের কপালে এসে বিঁধে গেছে। শ্রীরামচন্দ্র তখন চমকে উঠলেন, তিনি নিজে একজন বড় যোদ্ধা, বাণের শক্তি দেখে তিনি বুঝে নিলেন যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কতটা শক্তিশালী ও পরাক্রমী। তিনি ত্রিশিরাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন – যেমন মানুষকে ফুল দিয়ে আদর করা হয়, তোমার বাণগুলো আমাকে ফুলের মত আদর করছে। মানে তোমার বাণে কোন শক্তি নেই, এই বার্তাই শ্রীরামচন্দ্র ত্রিশিরাকে পাঠালেন। এবার তুমি আমার পরাক্রম দেখ।

ত্রিশিরা মারা যেতে খর নিজেই এবার শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে। চণ্ডীতে যেমন শুম্ভ নিশুম্ভ বধে শুম্ভ শেষে এসেছিল। প্রধান যোদ্ধারা একেবারে শেষেই আসে। খর যুদ্ধ করতে আসতেই শ্রীরামচন্দ্রকে অগস্ত্য যে বৈষ্ণবী ধনু দিয়েছিলেন, তিনি সেই ধনুকটা নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। শ্রীরামচন্দ্র খরকে বলছেন – তুমি তোমার যত সেনা তোমার হয়ে যুদ্ধ করে মারা গেল, তাদের সাহায্য নিয়ে এতদিন তুমি অনেক দুষ্কর্ম করে এসেছ। যারা কঠোর দুষ্কর্ম করে তাকে সেইভাবেই শেষ করে দেওয়া উচিৎ যেভাবে মানুষ বিষধর সাপকে শেষ করে দেয়। বিষাক্ত সাপকে যেমন কেউ বিশ্বাস করে না, তোমাকেও কখন বিশ্বাস করতে নেই।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – **লোভাৎ পাপানি কুর্বাণঃ কামাদ্বা যো ন বুধ্যতে। হৃষ্টঃ পশ্যতি তস্যান্তং ব্রাহ্মণী করকাদিব।**।৩/২৯/৫। যে জিনিষটা প্রাপ্ত হয়নি সেটাকে পাবার ইচ্ছা করাকে বলা হয় কাম। কামের সংজ্ঞা হল – যেটা আমার নেই সেটা আমি পেতে চাইছি। আর যেটা আমি পেয়ে গেছি, সেটাই আরও বেশি বেশি করে পেতে চাইছি, এটাকেই বলা হয় লোভ। কাম আর লোভের তফাৎ হল – কামে আমি এখনও পাইনি কিন্তু পেতে চাইছি, লোভ হল, আমি পেয়েছি কিন্তু আর বেশি বেশি পেতে চাইছি। শ্রীরামচন্দ্র এটাই বলছেন – মানুষ যখন কাম আর লোভ বশতঃ প্রেরিত হয়ে কোন কিছু করে তখন কি হয় – ব্রাহ্মণী নামের পোকা যেভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাদেরও সেই দুর্দশা প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণী পোকার আরেক নাম রক্তপুচ্ছিকা, যখন তুষারপাত হতে থাকে তখন এই পোকাগুলো ঠাণ্ডা বরফ কণাগুলো খেয়ে বসে, ঠাণ্ডা বরফের কণা খেতে পোকাগুলো খুব ভালোবাসে, কিন্তু ঠাণ্ডা খেলেই পোকাগুলো মরে যায়, ঠাণ্ডা বরফের কণা এদের কাছে বিষের মত। বলছেন কাম আর ক্রোধ বিষের মত মানুষকে নাশ করে।

একে অপরের প্রতি বাণ চালাচ্ছে। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – তুমি যত যাই কর, যতই তুমি তোমার পরাক্রম দেখাও না কেন, আজকে তোমাকে আমি শেষ করব। খরও শ্রীরামচন্দ্রের মুখে এই ধরণের কথা শুনে খুব রেগে গিয়ে বড় বড় শালবৃক্ষ তুলে শ্রীরামচন্দ্রকে আক্রমণ করছে। এইভাবে অনেকক্ষণ লড়াই চলতে চলতে শেষে শ্রীরামচন্দ্র হাজার বাণে খরকে বিদীর্ণ করে দিলেন। খর যখন কাহিল হয়ে পড়েছে তখন তিনি একটি শর, যেটি এক সময় ইন্দ্রের কাছে ছিল, সেই বাণ দিয়ে খরের দেহকে ভস্মীভূত করে দিলেন। যে সমস্ত পূণ্যাত্মা ঋষিরা যুদ্ধটা অবলোকন করছিলেন তখন তাঁরা বললেন – **অহো বত মহৎ**

কর্ম রামস্য বিদিতাত্মনঃ।।৩/৩০/৩২। এই শ্লোকটি খুব উল্লেখনীয় একটি শ্লোক। শ্রীরামচন্দ্র, যিনি তাঁর আত্মস্বরূপকে জানেন, তাঁর এই কর্মটি, এই যে খর আর দূষণকে বধ করে দিলেন, এটি অতি মহৎ কর্ম। এখানে *বিদিতাত্মনঃ* শব্দটি বলা হয়েছে, যিনি নিজের আত্মাকে জানেন, যাঁর নিজের স্বরূপের জ্ঞান আছে। স্বরূপ জ্ঞান যখন হয়ে যায়, তখন একটা অবস্থার পর তাঁর অনাসক্তি এসে যায়, তাঁর স্বার্থবুদ্ধি বিনাশ হয়ে যায়। এই স্বার্থবুদ্ধি যখন নাশ হয়ে যায় তখন তাঁর মধ্যে বিশাল শক্তি চলে আসে, তাঁকে আর কোন ভাবেই নাশ করা যায় না।

যখনই কোন জিনিষ কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য করা হয় তখন সেই সম্পত্তির অস্তিত্বের সঙ্কট থাকবে। যেমন হিন্দু ধর্ম কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সেইজন্য হিন্দু ধর্মের নাশ হবার কোন সম্ভবনা নেই। কিন্তু খ্রীশ্চান ধর্ম থেকে যিশুকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে খ্রীশ্চান ধর্মের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। ইদানিং কালে ইউরোপের বড় বড় চার্চগুলি বিশাল আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে, দেখা যাচ্ছে কোন বড় বড় চার্চে লোকই আসছে না। এই আর্থিক সঙ্কট থেকে বাঁচবার জন্য চার্চগুলোকে বার বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এখানে কেউ এই জিনিষ কল্পনাই করতে পারবে না। দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে সব বিগ্রহ সরিয়ে দিয়ে হোটেল কাম বার বানাবে কেউ চিন্তাই করতে পারবে না। তার কারণ খ্রীশ্চান ধর্মের উপর যুক্তিবাদীদের এত আক্রমণ হচ্ছে যে, এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সেখানে সেই মানুষই নেই, যার ফলে চার্চগুলোর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাই হারিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি ইসলামের উপরে যখন এই ধরণের আক্রমণ হবে তখন তাদেরও এই অবস্থা হবে, কিন্তু হিন্দুদের কিছুই হবে না। হিন্দুদের উপরে আক্রমণ কাকে সামনে রেখে করবে, কেউ নেই, সবাই অনাসক্ত।

এই একই জিনিষ আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও বলা যায়। এই দেশ কার? কারুরই নয়, আবার সবারই দেশ, কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কিন্তু পাকিস্থান শুধু মুসলমানদের দেশ। মুসলমানদের আক্রমণ করলে পাকিস্থান শেষ হয়ে যাবে। ভারতবর্ষ হিন্দুদেরও দেশ, মুসলমানদেরও দেশ, খ্রীশ্চানদেরও দেশ, সবারই দেশ, বাঙ্গালীদেরও দেশ, গুজরাটি, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা সবারই দেশ, আবার কারুরই দেশ নয়, এও এক ধরণের অনাসক্ত। পৃথিবীর সব দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে কিন্তু ভারতের কিছুই হবে না, এই অনাসক্তের যে প্রচণ্ড শক্তি, সেই শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে এমন কোন শক্তি সারা ব্রহ্মাণ্ডেও নেই। শ্রীরামচন্দ্র হলেন *বিদিতাত্মনঃ*, *বিদিতাত্মনঃ* হওয়ার জন্য তাঁর মধ্যে বিরাট শক্তি। শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে যা শক্তি, সেই শক্তির সমান অন্য কেউ যদি শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় তাহলেও শ্রীরামচন্দ্রকে পরাস্ত করতে পারবে না, কারণ শ্রীরামচন্দ্র *বিদিতাত্মনঃ*, তিনি আত্মজ্ঞানী, সেইজন্য তিনি অনাসক্ত, অনাসক্ত কর্মের এটাই মূল রহস্য, তার ভেতরে অনন্ত শক্তির দুয়ার খুলে যায়।

অকম্পন বলে রাবণের এক মন্ত্রী ছিল, খর, দূষণ, ত্রিশিরা আর সব রাক্ষসরা মারা যেতেই অকম্পন সেখান থেকে কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে লঙ্কায় রাবণকে সব খবর দিয়েছে। অকম্পনের মুখে সব খবর শুনেই রাবণ ক্রোধে লাল অগ্নিবর্ণ হয়ে বলছে ‘চল এই সীতাকেই অপহরণ করে নিই’। তারপরেই নিজের পরিচয় আর ক্ষমতার বর্ণনা করে বলছে – **কালস্য চাপ্যহং কালো দহেয়মপি পাবকম্। মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে।**।৩/৩১/৬। আমি কালের কাল, আমি আগুনকেও পুড়িয়ে দিতে পারি, মৃত্যুকে আমি মৃত্যুধর্মা বানিয়ে দিয়ে তাকেই মৃত্যুর মুখের মধ্যে গুঁজে দিতে পারি। আমি সেই রাবণ, আমাকে এভাবে অপমান করেছে! আমার বোনকে অপমান করেছে! এটাই বাল্মীকির কাব্যিক প্রতিভার একটা ঝলক।

বাল্মীকি রামায়ণ – ৬ই জুন ২০১০

কয়েকটি বিষয়কে আমাদের মাথার মধ্যে খুব ভালো করে বসিয়ে নিতে হবে, এই বিষয়গুলো যদি আমরা ঠিক ঠিক না বুঝতে পারি তাহলে ইতিহাস মুলক শাস্ত্রের যে ভাব ও রহস্য সেটা আমরা ধরতে পারব না, যদিও বুঝতে পারি তাহলেও সেটাকে ধরে রাখাতে পারবো না, আমাদের স্মৃতি থেকে পুরোপুরি হারিয়ে যাবে। সব কিছুরই কিছু নিয়ম আছে, ফিজিক্সের কিছু নিয়ম আছে, কেমেস্ট্রির কিছু নিয়ম আছে, বায়োলজির কিছু নিয়ম আছে। বিজ্ঞানীরা যখন চিন্তা করে গবেষণা করে করে যখন একটা নিয়ম খুঁজে পেলেন, জিনিষটা কিভাবে চলছে, যেমন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কেন? এই একটাকে নিয়ে যখন বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন চিন্তা ভাবনা করতে করতে বুঝতে পারল যে এটাই Static Electricity, এর পর যখন এর নিয়মটাকে জেনে নিয়ে বুঝে নিল জিনিষটা কি। তখন তার সার তত্ত্বটাকে নিয়ে অন্য জায়গাতে প্রয়োগ করে দিয়ে সেখান থেকে নানান জিনিষ তৈরী করা শুরু হয়ে গেল। বিদ্যুৎ কি, এর তত্ত্বটাকে যখন বুঝে নিল তখন এই বিদ্যুতের সাহায্যে আজ কত কিছু করা সম্ভব হচ্ছে, আলো দিচ্ছে, বাতাস দিচ্ছে, গরম রাখছে, ঠাণ্ডাও রাখছে। অথচ আমরা আগে জানতামই না, যে শক্তি আলো দিতে পারে সেই শক্তিই আবার বাতাসও দিতে পারে।

ঠিক তেমনি মানুষের মনের যে ধর্ম, মানবীয় যে গুণ, দুর্গুণ এগুলোকে যখন বুঝে নেওয়া যাবে তখন মনের সেই ধর্মকে অনেক ভাবে কাজে লাগান যাবে। যে কোন মানুষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব তৈরী হয় মনের একগুচ্ছ ধর্ম ও আবেগ দিয়ে। একই লোকের মধ্যে মনের অনেক রকম ধর্ম দেখা যাবে। আমরা বলি ভদ্রলোকের এক কথা, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, কোন ভদ্রলোকেরই এক কথা হয় না, তার কথা সব সময় দুই হবে। মানুষ তো আর মেশিন নয় যে সব সময় একই কথাই বলে যাবে। যেমন এই মাইক্রোফোন, এর কাজ হচ্ছে ধ্বনিকে বিস্তার করে দেওয়া, যখনই এর সামনে কোন শব্দ করা হয়ে সে শব্দটাকে বড় করে বিস্তার করে দেবে, এটাই এর একমাত্র কাজ, এছাড়া সে আর কিছু করতে পারেনা। একটা চাকার কাজ শুধু ঘোরা। জড় থেকে যেমন যেমন জৈব পদার্থের দিকে অগ্রসর হবে তেমন তেমন তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ এসে যাবে, আমাকে বাঁচতে হবে, এই তাগিদটা তাকে কিছু কিছু জিনিষকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নিতে বাধ্য করে। এখান থেকে বিবর্তন হতে হতে যত সে উপরের দিকে উঠতে থাকে ততই কিন্তু তার স্বাধীনতার পরিধিটা বিস্তার করতে থাকে। মেশিনের মত সে আর বাঁধা থাকেনা। মানুষের স্তরে এসে যখন সে পৌঁছায়, এখন পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যে পর্যন্ত মানবজাতি পৌঁছেছি, সব থেকে বেশি স্বাধীনতা সে এখানে এসেই পায়।

এই মুহুর্তে আমি যে রকম আচরণ করছি, ঠিক পর মুহুর্তেই আমার সেই আচরণটা পাল্টে যেতে পারে। একটা খুব মজার ঘটনা আছে, এক মহিলা ভক্ত এক মহারাজের কাছে এসে খুব কাঁদছেন। কিছু দিন আগে তার স্বামী মারা গেছেন, সেই শোকে তিনি কাঁদছেন। মহারাজ তাকে কাঁদতে দিয়েছেন। কাঁদছে, কেঁদেই চলেছে। হঠাৎ মহারাজ মহিলাকে জিজ্ঞেস করে বসেছেন – তোমার নাতির খবর কি মা? নাতির কথা শুনতেই মহিলার কান্নাটা প্রশমিত হয়ে গেল, গলার স্বর পাল্টে গেল, ঠোঁটের কোণে একটু খুশির রেশ নিয়ে মহিলা বলে উঠলেন 'মহারাজ! আমার নাতির কথা জিজ্ঞেস করছেন? আর বলবেন না, ওর মুখ চেয়েই তো বেঁচে আছি। কি সুন্দর হয়েছে, এখনই যা দুষ্টুমি শিখেছে না কি বলবো আপনাকে'। ব্যস্, সব কান্না কর্পূরের মত উবে গিয়ে মুখে হাসি ফুটে উঠল। এই হচ্ছে মানুষ, যার এক অঙ্গ সর্বক্ষণ কাঁদছে আরেক অঙ্গ সব সময় হাসছে। মনের যে এই বৈপরিত্য ধর্ম, কাঁদছে আবার হাসছে এটা মানুষের মধ্যেই পাওয়া যাবে, কিন্তু যারা মেশিনের মত তাদের মধ্যে এই মুহুর্তে খারাপ এই মুহুর্তে ভালো কখনই লক্ষ্য করা যাবে না, যেটা হয়ে গেছে সেটাই চলবে, যতক্ষণ ঐ জিনিষটা তার ঐ অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ তার মধ্যে অন্য কিছু প্রতিক্রিয়া হবে না।

যাঁরা খুব বিচক্ষণ দার্শনিক হন, বা কবি হন, তাঁরা মানুষের মনের এই বিভিন্ন বৈপরিত্য জিনিষ গুলিকে খুব ভালো করে নিরিক্ষণ করেন, লক্ষ্য করে করে দেখেন এর মধ্যে মনের কি কি ধর্ম কাজ করছে, এই ধর্মগুলির পেছনে কি কি কারণ থাকতে পারে, একবার যখন বুঝে নিলেন তার উৎস হল এই জায়গাটা, তখন সেটাকে আধার করে তিনি একটি নতুন চরিত্রকে সামনে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সাহিত্যিকরা যে উপন্যাস রচনা করেন, উপন্যাসের ইংরাজী শব্দ হচ্ছে নভেল, নভেল শব্দের আরেকটি অর্থ হয় নতুনত্ব, যেমন নভেল প্রজেক্ট, নতুন ধরণের পরিকল্পনা। উপন্যাস যা নতুনত্বও তাই। উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে যদি নতুনত্ব না থাকে তাহলে কেউ সেই উপন্যাস পড়বে না। আমার আপনার জীবনের কাহিনী নিয়ে যদি উপন্যাস লেখা হয়, তাহলে দুই এক পাতা পড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। অথচ জগতে যা কিছু বলার রামায়ণ আর মহাভারতে সব কিছুই বলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাও তো নতুন উপন্যাস লেখা হচ্ছে, অনেক উপন্যাসেই নতুনত্বের আস্বাদ দিচ্ছে। কি করে দিচ্ছে? কিছুই নয়, মনের যে ধর্মগুলো আছে সেই ধর্মগুলোকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে, নিয়ে তার একটা নতুন রূপ দিয়ে দিচ্ছে, ঘটনার কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে না।

ব্যাসদেবকে নিয়ে একটা কাহিনী আছে। ব্যাসদেব একবার তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটা মেলায় গিয়েছেন। সেখানে একটা লোক মেলায় আগত লোকেদের শূয়োরের আওয়াজ নকল করে শুনিয়ে পয়সা রোজগার করছে। আমরা সিনেমাতেও এই একই জিনিষ করছি, অমিতাভ বচ্চনকে সিনেমায় দেখতে যাচ্ছি কেন, সে একটা হিরোর রোল করছে কিংবা ক্রিমিনালের রোল করছে দেখার জন্য, কিন্তু পাড়ায় যদি খবর হয়ে যায় একটা ক্রিমিনাল এসেছে লোকে দরজা বন্ধ করে দেবে। অথচ সেই ক্রিমিনালকে দেখার জন্য আমরা পয়সা খরচা করে সিনেমা হলে যাচ্ছি। এখানেও মেলাতে শূয়োরের আওয়াজ করে বলে লোকে পয়সা দিয়ে দেখতে যাচ্ছে। ব্যাসদেব মেলাতে একটা নোটিশ টাঙালেন – এখানে সত্যিকার শূয়োরের আওয়াজ শোনান হয়। তারপর টিকিট বেচা শুরু করেছেন। অন্য দিকে ব্যাসদেবের এক শিষ্য কোথা থেকে একটা শূয়োরকে ধরে নিয়ে এসেছে। যখন সবাই টিকিট কেটে ঢুকেছে দেখছে একটা শূয়োরকে নিয়ে এসে মারছে আর ব্যাটা চেঁচাচ্ছে, লোকে রেগে মেগে ঢিল মেরে বেরিয়ে গেছে, সব ধাপ্পাবাজী। ব্যাসদেব তখন সব শিষ্যদের বলছেন – দেখলে আসল জিনিষকে কেউই দেখতে চায়না, নকলকেই সবাই দেখতে চায়। কিন্তু যে শূয়োরের আওয়াজ করছে, শূয়োরের আওয়াজ তো সবাই জানে, কিন্তু সেই শূয়োরের আওয়াজের যে সার, সেটাকে নিয়ে একটা নতুন ভাবে বার করছে, তাতেই লোক আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার এই ক্ষমতাকে সম্মান জানান হচ্ছে।

বাল্মীকি ব্যাসদেব এনারা তাঁদের অমর সাহিত্যে এই কাজটাই করেছেন, তাঁদের তৎকালীন সমাজে যারা ছিল তাদের মানবিক গুণগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন। একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তার সব ক্ষমতা আছে কিন্তু তার আর লোভ থামছে না, তখন এই গুণটাকে রাবণের মধ্যে স্থাপন করে দিলেন। গতকাল আমরা আলোচনা করেছিলাম, যে জিনিষটা আমার কাছে নেই অথচ সেটা পাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে, তখন তাকে বলছেন কাম, আর যেটা আমার আছে সেটা আরও বেশি করে পেতে চাইছি, তাকে বলছেন লোভ। কাম আর লোভ মানুষকে যখন আক্রমণ করে তখন আর তাকে আটকানো যায় না। বাল্মীকি এই মানবিক ধর্মগুলিকে টেনে নিয়ে নতুন একটা চরিত্র তৈরী করে তাতে প্রয়োগ করে দিচ্ছেন। তাই এই চরিত্রগুলিকে যখন ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেখতে যাই তখন কিন্তু অনেক কিছুই হিসেবে মিলবে না। যেমন শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় বংশের রাজকুমার, তিনি এত দিন জঙ্গলে ফল-মূল খেয়ে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছেন, তাঁর কি পেট খারাপ হয়নি? এগুলো হিসেবে কখনই মিলবে না। তাহলে কি বাল্মীকি রামায়ণ কি পুরোপুরি কাল্পনিক? কখনই না, পুরোপুরি কাল্পনিক হলে বাল্মীকি রামায়ণ এতদিন ধরে চলতই না, অনেক আগেই জনমানস থেকে হারিয়ে যেত।

যখন রামজন্ম ভূমি নিয়ে চারিদিকে নানান বিতর্ক হচ্ছিল, তখন অনেক যুক্তিবাদী নেতা শ্রীরামচন্দ্রকে তো কাল্পনিক একটা চরিত্র বানিয়ে অনেক বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি রচনা করে বাজারে ছেড়ে

দিলেন। কিন্তু এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবি বা যুক্তিবাদীরা জগতের একটা মৌলিক জিনিষকে ভুলে গেছেন বা জেনেও না জানার ভাণ করে আছেন, তা হল জগতে ধাপ্পাবাজী বেশি দিন চলে না, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। পুরো গোটা একটা আমকে যদি মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়, তখন আমের চামড়া, আমের শাঁস সব পৃথিবী শুষে নেবে, আর আমের যেটা বীজ পড়ে থাকবে সেই আঁটি থেকে নতুন গাছ বেরিয়ে আসবে। সারতত্ত্ব যদি না থাকে পৃথিবী তাকে কদিন পরেই শুষে নেবে, তার কোন খোঁজই পাওয়া যাবে না আর। ধাপ্পাবাজি, চালবাজী, বিশেষ করে আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে যদি হয়ে থাকে, ভারতের মাটিতে কক্ষণ তা দাঁড়াতে পারবে না। ভারতের মাটিতে জোর বাতাস চলছে, যে বাতাসে গমের গম আলাদা আর গমের আবর্জনা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেটাকে অতিরঞ্জিত বলা হচ্ছে, হ্যাঁ অতিরঞ্জিত আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে কাব্যের অঙ্গ, কাব্যের বৈশিষ্টিই এই যে তার অনেক কিছুই বাস্তবের সাথে মিলবে না, কিন্তু কবিতার স্বার্থে যখন ব্যবহার করা হয় তখন তা কাব্যের মাধুর্যকে অনেক উচ্চ আঙিনায় নিয়ে যায়। কিন্তু উপনিষদে এই ধরণের কোন অতিরঞ্জিত কিছু নেই। এই জিনিষগুলিকে আমাদের মাথায় রেখে বাল্মীকি রামায়ণকে বুঝতে হবে। রাবণের সত্যি সত্যি দশটা মাথা ছিল কিনা তার হিসেব মেলাতে গেলে কাব্যের রস আস্বাদন থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। রাবণের যে দশটি মাথার কথা বলা হচ্ছে, এই দশটি মাথাকে দশটি ইন্দ্রিয়ের প্রতীক রূপে মেনে নিলে আর কোন সমস্যাই থাকে না। শঙ্করাচার্যের অসুর শব্দের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। অসুর হচ্ছে যারা অসুতে রমণ করে, অসু মানে প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের প্রাণ শক্তিতে অসুররা রমণ করে বলে তাদের অসুর বলা হয়। তার মানে দেবতা আর অসুর দুজনেরই শক্তি আছে, কিন্তু অসুররা ইন্দ্রিয় শক্তির উপর বেশি নির্ভর করে আর দেবতারা দাঁড়িয়ে আছে আত্মশক্তির উপর বেশি ভরসা করে। ইন্দ্রিয় শক্তি আর আত্মশক্তি, এই দুটো শক্তিই অসুর আর দেবতাদের আলাদা করে দেয়।

বাল্মীকি এখানে বলছেন – **এবমুক্তো দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।**৩/৩১/৩। রাবণ দশগ্রীব, এখন দশগ্রীব রাবণের ডাকনামও হতে পারে, যেমন অনেকের নাম পাঁচকড়ি, তার মানে কি তার গলায় পাঁচটা কড়ি ঝুলছে? পাঁচকড়ি, সাতকড়ি এই ধরণের নাম অনেকেরই থাকে। সেই রকম হয়তো রাবণের আরেকটা নাম দশগ্রীব। পরের দিকে দশগ্রীব নাম দেখে রাবণের দশটা মাথা লাগিয়ে দিতে পারে। আবার দশটা মাথা কেন হয়েছে? নিজের মুণ্ডু কেটে কেটে শিবকে বা ব্রহ্মাকে দশবার অর্পণ করেছে করেছে বলে তার দশটি মাথা। আবার বলবে দশটা মাথা মানে দশটি ইন্দ্রিয়। এগুলি খুব বেশি আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। আমাদের ইতিহাসমূলক শাস্ত্র রামায়ণ আর মহাভারত আর পুরাণের বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে নানান ধরণের কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। মহাভারতে কল্পনার দৌড়টা একটু কম কিন্তু রামায়ণ আর পুরাণে কথায় কথায় কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তাই সব কিছুকে বাস্তবের সাথে মিলিয়ে নিতে গেলে আমরা কাব্যের মাধুর্যকে হারিয়ে ফেলব।

এর আগে আমরা দেখলাম শূর্পণখা গিয়ে রাবণকে সব বলেছে, শূর্পণখা রাবণের কি রকম বোন হয় আমাদের জানা নেই। সব কথা শুনে রাবণ বলছে –**কালস্য চাপ্যহং কালো দহেয়মপি পাবকম্। মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে।।**৩/৩১/৬। আমি কালের কাল, আমি আগুনকেও পুড়িয়ে দিতে পারি, আর মৃত্যুকে মৃত্যুর মুখে ঢুকিয়ে দিতে পারি। এটাই ঠিক ঠিক কাব্যিক বর্ণনা। বাল্মীকি এখানে রাবণের শক্তি ও তার সেই শক্তির বাহ্যিক রূপকে কাব্যিক ব্যঞ্জনা দিয়ে বর্ণনা করছেন। আমি কালের কাল, আমি আগুন, যার কাজ সবাইকে পুড়িয়ে দেওয়া আমি সেই আগুনকেও পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে পারি, আর মৃত্যুকে মৃত্যুর মুখে গুঁজে দিতে পারি, এই শ্লোকে রাবণের চারিত্রিক বৈশিষ্টের একটি বিশেষ দিককে উন্মোচন করে দেওয়া হচ্ছে, সেই দিকটি হল রাবণের দাম্ভিকতা। রাবণের শক্তি আছে আর তার শক্তির বোধও আছে, এই জিনিষটাকে যে ভাবে বাল্মীকি প্রকাশ করেছেন এটাই ঠিক ঠিক কাব্যিক বর্ণনার মাধুর্যতা। একটা বিশাল জিনিষকে ইঙ্গিত করে পুরো ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে রাবণের

শক্তির বর্ণনা, রাবণের অহঙ্কারের বর্ণনা করছেন না, ছোট্ট একটা কথা বলে দিলেন আর তার ভেতর থেকে একটা বিরাট জিনিষের বর্ণনা বেরিয়ে এল।

রাবণ তখন তার মন্ত্রী অকম্পনকে আরও বিস্তারিত ভাবে সব পরিষ্কার করে বলতে বলছে। অকম্পন সব বৃত্তান্ত রাবণকে নিবেদন করছে – আমি আমার চর মারফৎ সংবাদ পেয়েছি যে অযোধ্যা থেকে এক রাজকুমার পিতার আজ্ঞা পালনের জন্য তাঁর স্ত্রী ও ভাইকে নিয়ে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে এসেছে, ইত্যাদি সব কাহিনী বলা হল। অকম্পন কিন্তু রাবণকে সাবধান করে শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে বলছে – **অসৌ রামস্তু সীদন্তীং শ্রীমানভ্যুদ্ধরেন্মহীম্**।।৩/৩১/২৪। এই পৃথিবী যদি সমুদ্রে ডুবে যেতে থাকে, শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু এই পৃথিবীকে নিজের বাহুবলে সমুদ্র থেকে টেনে তুলে নিয়ে আসার ক্ষমতা রাখেন। **ভিত্ত্বা বেলাং সমুদ্রস্য লোকানাপ্লাবয়েদ্ বিভুঃ। বেগং বাপি সমুদ্রস্য বায়ুং বা বিধ্মেচ্ছরৈঃ**।।৩/৩১/২৫। আবার তিনি ইচ্ছে করলে সমুদ্রের মর্যাদাকে ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে তার জল দিয়ে প্লাবিত করে দিতে পারেন। তাঁর বাণ দিয়ে সমুদ্রের বেগ আর বায়ুর গতিকে স্তম্ভিত করে দিতে পারেন।

এর আগে রাবণ তার নিজের ক্ষমতা, শক্তির বর্ণনা দিয়েছে। তারপর অকম্পন শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি ও ক্ষমতার উল্লখ করে রাবণকে যেন সচেতন করে দিচ্ছে। এখন তুলনা করলে কাকে বেশি শক্তিশালী বলে মনে হবে? কেউই বড় নয়, এটাই কবির কাব্য কুশলতা, কাব্যিক রসকে আস্বাদনের জন্য পাঠক-পাঠিকাকে এক অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছেন। এটাই কবিতার মাধুর্য। বাল্মীকি কিন্তু কারুর পক্ষ অবলম্বন করছেন না, দুজনেরই শক্তি তিনি দেখিয়ে দিলেন। আগে যে সুর আর অসুর সম্বন্ধে বলা হল তাতে বলা হয়েছে, অসুররা প্রাণশক্তি, শরীরের শক্তি, ইন্দ্রিয়ের শক্তির সাহায্যে চলাফেরা করে। যত কাহিনী এগোবে তত এটা প্রকাশিত হবে যে, রাবণ ছিলেন আসুরিক শক্তিতে শক্তিমান, কারণ সে প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে চলে। শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি আর রাবণের শক্তি দুজনেরই সমান, এমন কি রাবণ শক্তির ব্যাপারে শ্রীরামচন্দ্রের থেকে কিছুটা উঁচুতে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র আত্মশক্তিতে বলীয়ান, আত্মশক্তির জন্য রাবণ উঁচুতে থাকলেও শ্রীরামচন্দ্রের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল।

অকম্পন রাবণকে বলছে – প্রভু! আপনি শ্রীরামচন্দ্রের সাথে কোন ভাবেই পেরে উঠবেন না, কিন্তু এঁর প্রাণ সীতাতে অবস্থান করছে। একটা কাজ করা যেতে পারে, কোন রকমে সীতাকে যদি এঁর কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই শ্রীরামচন্দ্রের সব ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। আপনি বদলা নিতে চাইছেন তো, আপনি এই ভাবে মারামারি করে, যুদ্ধ করে কোন দিন শ্রীরামচন্দ্রকে বদলা দিতে পারবেন না।

মহাভারতে দ্রোণাচার্য কত বড় যোদ্ধা ছিলেন, যতক্ষণ তাঁর হাতে অস্ত্র থাকবে কেউ তাঁকে হারাতে পারবে না। কিন্তু যে মুহুর্তে তিনি শুনলেন অশ্বত্থামা মারা গেছে তাঁর সব শক্তি শেষ হয়ে গেল। এই গুলোকে কল্পনা করেই আমাদের দেশে বাচ্চাদের জন্য রাক্ষস খোক্কসের গল্প তৈরী হয়েছে। একটা রাক্ষস ছিল তার প্রাণ একটা ভ্রমরে ছিল, সেই ভ্রমর আবার একটা কৌটার মধ্যে রাখা ছিল, সেই কৌটা একটা বিরাট দৈত্যের শিয়রে রাখা ছিল। রাজকুমার আর রাক্ষসকে মারতে পারছে না, এক পরীর কাছে রাক্ষসের প্রাণ কোথায় আছে জেনে যায়, রাজকুমার এখন অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কোন ভাবে সেই দৈত্যের কাছে পৌঁছে গেছে, দৈত্য কখন ঘর থেকে বেরোবে নজর রাখছে, দৈত্য বেরিয়ে যেতেই রাজকুমার সেই কৌটা থেকে ভ্রমরটাকে ধরে প্রথমে তার ডানাটা ছিঁড়ে দিল, তারপর একটা ঠ্যাং টেনে ফেলে দিল, তারপর তার মুণ্ডুটাকে আলাদা করে দিতেই রাক্ষস মরে গেল। এটাই এখানে বলা হচ্ছে। অনেক বীর্যবান, অত্যন্ত পরাক্রামশালী পুরুষ আছেন যাঁদের প্রাণ অন্য জায়গায় থাকে। ঐ জায়গাটাকে যদি কোন ভাবে আয়ত্তে করে নেওয়া যায়, তখন যত বড় শক্তিমানই হোক না কেন সে কাবু হয়ে যাবে।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ হলেন সীতা। সীতাকে তিনি এতই ভালোবাসেন যে সীতা ছাড়া যেন শ্রীরামচন্দ্র থাকতে পারবেন না। তাই অকম্পন বলছে 'শ্রীরামচন্দ্রকে যদি কাবু করতে চান তাহলে সীতাকে ওঁর কাছ

থেকে সরিয়ে দিন। এটাই হবে আমাদের সব থেকে সুপরিকল্পিত কৌশল’। যে ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে মারীচকেও দরকার। তাই মারীচের ডাক হয়েছে। মারীচকে সব বলা হল। মারীচ সব শুনে রাবণকে বলছে ‘আরে! এ আপনি কি করতে যাচ্ছেন! আপনাকে যে এই বুদ্ধি দিয়েছে, সে রাক্ষসের শৃঙ্গটাই উৎখাৎ করে দিতে চাইছে – *শৃঙ্গং ছেত্তুম*’। গরুর শক্তি শিংএ, গরুর শিং বা হরিণের শিং যদি উপড়ে নেওয়া হয় তাহলে আর রইল কি। মারীচের বক্তব্য হল রাক্ষস বংশের যে শৃঙ্গ সেটাই রাবণ কেটে দিতে চলেছে সীতাকে হরণ করে। মারীচ রাবণকে আরও বলছে ‘তোমার নিশ্চয় কোন ঘরশত্রু আছে যে তোমাকে এই ধরণের পরামর্শ দিচ্ছে। তোমার সর্বনাশ করার জন্য কেউ তোমাকে অত্যন্ত বিষধর সর্পের দাঁতটা উপড়ে দিতে বলছে। শ্রীরামচন্দ্রের যে ভার্যা তাকে তুমি হরণ করতে চাইছ মানে বিষধর সাপের দাঁতে হাত দিতে চলেছ’। মারীচ খুব সুন্দর করে বিরাট হাতির সঙ্গে তুলনা করে শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা করছে ‘শ্রীরামচন্দ্র হলেন গন্ধযুক্ত গজরাজ’। কিছু কিছু হাতি হয় যার কান থেকে গন্ধ বেরোয়। হাতির কান থেকে যখন স্রাব বেরোয় তখন সেটা একটা মুক্তা হয়ে যায়, তাকে বলা হয় গজমুক্তা। হাতির কানে যে মুক্তা হয় বলে নাকি এই মুক্তা প্রচণ্ড মূল্যবান, একমাত্র দেবতারাই নাকি এই মুক্তা ব্যবহার করেন। সব হাতির মুক্তা হয় না, যেসব হাতির সত্তর আশি বছর হয়ে গেছে সেইসব হাতির কোন একটা হাতি থেকে এই মুক্তা পাওয়া যায়। ঐ হাতি যেখানে দাঁড়াবে, তার শরীর থেকে যে গন্ধ বেরোবে, সেই গন্ধ পেলেই অন্যান্য সব হাতিরা পালিয়ে যাবে। ঐ হাতিকে বলা হয় গজরাজ, গজরাজ হাতি তাকেই বলা হয় যার কান থেকে গন্ধ বেরোয়। আর আশি বছরের হাতি মানে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী, কোন হাতি তার কাছে এসে দাঁড়াবে না। হাতির সঙ্গে তুলনা করে মারীচ বলছে ‘হাতির শুড় হয়, শ্রীরামচন্দ্র যে বংশে জন্ম নিয়েছেন সেই বংশ হল তাঁর শুড়’। এগুলো সব কাব্যিক কল্পনা। ‘শ্রীরামচন্দ্রের যে প্রতাপ, এটাই হচ্ছে তাঁর মদ’। মানে হাতির কান দিয়ে যে স্রাব নির্গত হয়, যেটা থেকে গজমুক্তা হয়। শ্রীরামচন্দ্রের যে হাত, এই বাহু দুটো এতো শক্তিশালী আর শোভনীয় যে এটাই হল হাতির দাঁত।

তারপরেই আবার সিংহের সাথে তুলনা করে মারীচ বলছে – শ্রীরামচন্দ্র হলেন সিংহের মত। যখন তিনি যুদ্ধভূমিতে শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়চেতা হয়ে পরাক্রমের মত দাঁড়িয়ে যান, এটাই হল সিংহের কেশরের মত তেজ সদৃশ। এই সিংহের সামনে হরিণ যেমন অসহায়, তেমনি এই রাক্ষস যারা এরাও শ্রীরামচন্দ্রের সামনে সেই হরিণের মত, তিনি যেন রাক্ষস বধের জন্যই দাঁড়িয়েছেন। তাঁর প্রত্যেকটি বাণ হল সিংহের যে বিভিন্ন অঙ্গ, সেই অঙ্গ স্বরূপ। আর ওনার যে তলোয়ার সেটাই সিংহের দাঁত। এগুলো সবই কবির কাব্যিক কল্পনাশ্রয়ী বর্ণনা।

এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের তুলনা করে মারীচ বলছে ‘হে রাবণ! আগে যা হয়ে গেছে সব ভুলে গিয়ে এখন শান্তিতে থাক, তুমি তোমার লঙ্কাতেই নির্বিঘ্নে রাজ করতে থাক, এর বাইরে আর কিছু আস্ফালন করতে যেওনা, জঙ্গলে শ্রীরামচন্দ্র যেমন আছেন থাকুন’। মারীচের কথা শুনে রাবণ তো মারীচের উপর খুব রেগে গেছে। রেগে গিয়ে সে তার কুড়িটি হাত আর দশটি মাথাকে দেখিয়ে নিজের কীর্তির কথা বলতে আরম্ভ করেছে ‘আমি বাসুকিকে পরাস্ত করেছি, তক্ষককে পরাজিত করে তার প্রিয় ভার্যাকে কেড়ে নিয়ে এসেছি, কুবেরকে পর্যদস্তু করে তার সব কিছু কেড়ে নিয়েছি, আর আমার মুণ্ডু দিয়ে ব্রহ্মার তপস্যা করে ব্রহ্মার বর পেয়েছি’। মুণ্ডু কাটা তপস্যা এখান থেকেই এসেছে। রাবণই প্রথম মুণ্ডু কেটে তপস্যা করেছিল, নিজের মুণ্ডু কেটে উৎসর্গ করেছিল। এই সব বলে বলছেন – ব্রহ্মা আমাকে বর দিয়েছনে যে যুদ্ধক্ষেত্রে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ, সর্প এরা কখনই আমাকে পরাস্ত করতে পারবে না।

রাবণ যতই লম্ফঝম্ফ করুক না কেন মারীচের সব কথা শুনে ভেতরে ভেতরে রাবণ একটু দমে গেছে। রাবণ যে দমে গেছে সেটা শূর্পণখা বুঝে ফেলেছে। সে আবার রাবণের কাছে এসে চেঁচামেচি শুরু করে রাবণকে উত্তেজিত করেছে ‘সীতার মত রূপসী নারী এই ত্রিভুবনে কোথাও নেই, সে তোমারই একমাত্র উপযুক্ত, তুমি ওকে তুলে নিয়ে এসে তোমার কাছে তোমার বউ বানিয়ে রেখে দাও’। তখন রাবণ আবার মারীচের কাছে গেছে।

এবার মারীচকে গিয়ে রাবণ সোজাসুজি বলেই দিল 'আমার সীতাকে চাই, আমি ওকে বিয়ে করব'। প্রথম রাবণ যখন মারীচের কাছে গিয়েছিল তখন শ্রীরামচন্দ্রকে একটা বদলা নেবার জন্য গিয়েছিল। এবার কিন্তু রাবণ বদলার জন্য মারীচের কাছে আসেনি, এখন সে পুরোপুরি সীতাকে পাওয়ার প্রলোভনে পড়ে এসেছে। সেইজন্য গীতায় ভগবান বলছেন মানুষের শত্রু দুটি – কাম আর ক্রোধ। প্রথমে তাকে ক্রোধ দিয়ে উৎসাহ আনতে চেয়েছিল, এই দ্যাখো আমাকে কি করেছে, আমার ভাইকে মেরেছে, আমার বোনকে অপমান করেছে। তখন এটা খুব একটা জমল না। যখন জমল না তখন এবার নিয়ে আসা হল কামকে। শূর্পনখা রাবণের মধ্যে কাম বৃত্তিটাকে জাগিয় দিল – যদি সীতাকে তুমি পেয়ে যাও তোমার খুবই ভালো হবে, সীতাতো তোমার মত পুরুষেরই যোগ্য, সীতা কখনই বনচর রামের যোগ্য হতে পারে না। এসব শোনার পর রাবণের কামবৃত্তিটা চাগিয়ে উঠেছে। রাবণের কামবৃত্তি রাবণকে আবার মারীচের কাছে টেনে নিয়ে এসেছে।

মারীচ আবার রাবণকে বোঝাচ্ছে – **সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।** হে রাবণ তুমি রাজা, তুমি শক্তিমান, তোমার সামনে তোমাকে মিষ্টি কথা বলার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসবে, কিন্তু – **অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা ভোক্তা চ দুর্লভঃ।।**৩/৩৭/২। তোমার যেটা হিতকর হবে, তোমার মঙ্গলের জন্য অপ্রিয় কথা বলার মত লোক আর সেটা শুনে সহ্য করার মত লোক সহজে পাওয়া যায় না। মারীচের এই উক্তিটি খুব সুন্দর ও মূল্যবান – মিষ্টি মিষ্টি কথা সবাই বলতে পারে, যার কাছে থেকে কোন কাজ আদায় করতে হবে, তার কাছে আমি খারাপ যাতে না হয়ে যাই সেইজন্য মিষ্টি কথা বলার লোক অনেক পাওয়া যাবে। কিন্তু তার ভালো করার জন্য, তার মঙ্গলের জন্য দুটো অপ্রিয় কথা বলতে আমরা পিছপা হয়ে যাব। কারণ অপ্রিয় কথা বলা খুব কঠিণ। আমরা যে কারুকে অপ্রিয় কথা বলি সেটা তার দোষ দেখে তাকে হেয় করার জন্য, অপমান করার জন্য বলি, কিন্তু কারুর উপকারের জন্য, কারুর ভালোর জন্য অপ্রিয় কথা বলার মত লোক খুব কম। কারণ অপ্রিয় কথা বলার পর তার যে প্রতিক্রিয়া হবে সেটাকে সামলবার ক্ষমতা আমাদের নেই। ঠিক তেমনি, অন্য দিক দিয়ে যাকে ভালোর জন্য বলা হল সেও শুনে সেই কথাকে হজম করে নিজেকে শোধরাবার জন্য যে চেষ্টা করবে, সেই রকম মানুষও দুর্লভ।

মারীচ রাবণকে বলছে - **অযুক্তচারশ্চপলো মহেন্দ্রবরুণোপমম্।**৩/৩৭/৩। তুমি নিজেকে এত অহঙ্কারী মনে কর যে তুমি কোন গুপ্তচর নিয়োগ করোনি। আবার অন্য দিকে *চপলঃ*, তোমার বুদ্ধি চপল, তোমার বুদ্ধি শান্ত নয়। একদিকে তোমার মন ছটফট করছে সীতার জন্য, অন্য দিকে তুমি যে তোমার শত্রুর খবরাখবর নেবে তারও কোন উপায় নেই, কারণ তুমি কোন গুপ্তচরই নিয়োগ করনি। তুমি কিন্তু তোমার মৃত্যুকে ডেকে আনছ, যে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছ সে হচ্ছে *মহেন্দ্রবরুণোপমম্*, ইন্দ্র আর বরুণের মত। তুমি কোন খবরই রাখোনি যে লোকটা কে, তুমি কোন দিকে এগোচ্ছ বুঝতে পারছ না। মারীচ রাবণকে সাবধান করে বলছে 'তুমি কিন্তু নির্ঘাৎ ফেঁসে যাবে, এখনই তুমি কিন্তু সাবধান হয়ে যাও। আর তোমাকে যারা বলছে যে শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর বাবা ত্যাগ করে দিয়েছে, তারা কিন্তু ঠিক বলছে না – **ন চ পিত্রা পরিত্যাক্তো নামর্যাদঃ কথঞ্চন। ন লুব্ধো ন চ দুঃশিলো ন চ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ।।** ৩/৩৭/৮। শ্রীরামকে তার বাবা রাজ্য থেকে বার করে দেননি, আর তিনি কখনই তাঁর মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করেননি'। সাধারণত যারা জেলে যায় তাদের আমরা অপরাধী বলেই মনে করি, কেউ যদি এসে বলে আমি এই কদিন জেলে খেটে এসেছি, শুনলেই আমরা আঁৎকে উঠব। কিন্তু সে হয়তো কোন সত্যাগ্রহ করেছিল, অনশনে বসেছিল, কি আইন অমান্য করেছিল, এগুলোতেও যে জেল হতে পারে আর এরা যে অপরাধী নয়, এই ব্যাপারটা আমরা সহজে মেনে নিতে পারিনা। মারীচ এটাই রাবণকে বোঝাতে চাইছে – কেউ জেলে গিয়েছিল শুনলে যেমন আমরা আঁৎকে উঠি, ঠিক তেমনি শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্য থেকে তার বাবা বার করে দিয়েছিল বলে তুমি আঁৎকে উঠছ। কখনই তা নয়, তিনি তাঁর মর্যাদা কখনই উল্লঙ্ঘন করেননি। শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁরা বাবা রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দেননি। আর *ন লুব্ধো ন চ দুঃশিলো ন চ*

ক্ষত্রিয়পাংসনঃ – তিনি লোভী নন, তাঁর এমন কোন ধরণের দূষিত আচার ব্যবহার নেই যেটা দেখে কেউ তাঁকে দুশ্চরিত্র বলতে স্পর্ধা করবে। আর তুমি যে মনে করছে শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্ক, কিন্তু তা নয়, তিনি তাঁর নিজের মা কৈকেয়ি আর বাবা দশরথকে প্রিয় করার জন্য নিজে থেকেই রাজপ্রাসাদের সুখ ভোগ ত্যাগ করে দণ্ডক বনে প্রবেশ করেছেন। তোমার এগুলো সব ভুল ধারণা, কোথা থেকে তুমি শুনেছ যে বাবা শ্রীরামচন্দ্রকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, সে কলঙ্কিত, সে মর্যাদাচ্যুত, আদপেই এই সব কথা ঠিক নয়'।

বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী থেকে সন্ন্যাস হওয়ার পর ভিক্ষা করতে হয়। একজন সন্ন্যাসী এই রকম এক বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেছে। বাড়ির একটা বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে বলছে – ও মা, একজন ভিক্ষে নিতে এসেছে, এ কিন্তু সাধারণ ভিখারি নয়। তখন সেই মহারাজ বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করছে – তুমি কি করে বুঝলে আমি সাধারণ ভিখারি নই। বাচ্চাটি মহারাজকে বলছে – সাধারণ ভিখারি হলে চশমা থাকত না। কিন্তু ভিখারি আর সন্ন্যাসীর মধ্যে কি তফাৎ? ভিখারি ভিক্ষা করে পেটের দায়ে, তার আর অন্য কোন পথ নেই, সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করে নিজের ইচ্ছেতেই, সে নিজেই ভিক্ষাপাত্র তুলে নিয়েছে, তাকে কেউ জোর করে ভিক্ষা করতে বাধ্য করেনি। 'শ্রীরামচন্দ্রকে বাধ্য করে রাজ্য থেকে কেউ জোর করে তাড়িয়ে জঙ্গলে পাঠায়নি। তিনি নিজেই রাজী হয়েছেন বলে বনে এসেছেন। হে রাবণ, তুমি এটা ভালো করে বুঝে নাও। শ্রীরামচন্দ্র নিষ্ঠুর প্রকৃতির নন, তিনি কখন কঠোর কাজ করেন না, তিনি জ্ঞানী পুরুষ, মুর্খ নন, তাঁর ইন্দ্রিয় সব সময় তাঁর বশীভূত, মানে তিনি হচ্ছেন জিতেন্দ্রিয়। আর – **অনৃতং ন শ্রুতং চৈব নৈব ত্বং বক্তুমর্হসি।**।৩/৩৭/১২। আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি যে তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন। সেইজন্য তুমি যে শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাপারে উল্টোপাল্টা কথা ভেবে রেখেছে, আর নিজের মত কল্পনার জগত তৈরী করে এই সব কাজ, যা করবে বলে ভাবছ, খবরদার করতে যেও না, একেবারেই তুমি ফেঁসে যাবে। দ্যাখো বাপু, তুমি ভালো করে শুনে রাখো – **জীবিতঞ্চ সুখঞ্চৈব রাজ্যঞ্চৈব সুদুর্লভম্**।৩/৩৭/২২ – তুমি অনেক সৌভাগ্যে এই সুদুর্লভ রাজ্য লঙ্কাকে পেয়েছ, যদি তুমি তোমার সারা জীবন ব্যাপী সব কিছু ভোগ করতে চাও, যদি সুখে থাকতে চাও, নিজের প্রিয়জনদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে থাকতে চাও তবে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কোন অপরাধ করতে যেও না'। এইসব কথা বলার পর মারীচ তার অভিজ্ঞতার কথা বলছে। সেই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যখন শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গিয়েছিলেন তখন মারীচ শ্রীরামচন্দ্রের যে পরিচয় পেয়েছিল সেই কথা মনে করে রাবণকে বলছে।

'হে রাবণ! তখন শ্রীরামচন্দ্র তো নেহাত একটা বাচ্চা ছেলে'। বাল্মীকি রামায়ণ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্রের বয়সের হিসেব যদি করা হয় তাহলে দু-রকমের হিসেব পাওয়া যাবে। যখন বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রম থেকে শ্রীরামচন্দ্র মারীচকে বাণ মেরেছিল তখন একটা হিসেবে শ্রীরামচন্দ্রের বয়স ছিল ষোল বছর, আরেকটা হিসাবে মাত্র বারো বছর হয়। বাল্মীকি সব সময় শ্রীরামচন্দ্রকে সুকুমার এই সম্বোধন করে গেছেন। মারীচ তার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে রাবণকে বলছে 'তখন তো শ্রীরামচন্দ্র নেহাতই বাচ্চা, আর তখনও ভালোমত অস্ত্র-শস্ত্র চালাতে শেখেনি, সবে সেগুলোর অনুশীলন করছিল। আর ওই বয়সেই শ্রীরামচন্দ্র আমাকে এমন বাণ মেরেছিল, সেতো আমাকে প্রায় শেষ করেই দিয়েছিল, আমি তো মরেই যেতাম। সেইজন্য তোমাকে বলছি, শ্রীরামচন্দ্র এখন সাবালক হয়েছেন, আর সব অস্ত্র-শস্ত্রেই নিপুণতা, দক্ষতা অর্জন করে নিয়েছেন, তুমি এইসব দুর্বুদ্ধি করে হঠকারিতা করতে যেওনা। শ্রীরামচন্দ্র একবার আমায় একটা ভোঁতা বাণ মেরেছিল তাতেই আমার যা অবস্থা হয়েছিল, আমার তো মরে যাওয়ারই কথা ছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে আমি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছিলাম। তারপর থেকে আমি এক সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করে যাচ্ছি – **ইহ প্রব্রজিতো যুক্তস্তাপসোহহং সমাহিতঃ**।৩/৩৯/১৪। আমি এখন তপস্যায় মন দিয়ে নতুন জীবন যাপন করছি। শ্রীরামচন্দ্র আমাকে মেরেছিল কিন্তু আমি মরিনি বলে একজন পরিব্রাজক হয়ে গেলাম।

'এই যে তুমি আমাকে সীতা হরণের মত তোমার এই দুষ্কর্মে সাহায্য করার কথা বলছ, তাতেই আমি ভয়ে কাঁপছি। আর – **অপি রামসহস্রাণি ভীতঃ পশ্যামি রাবণ। রামভূতমিদং সর্বমরণ্যং প্রতিভাতি মে।।**৩/৩৯/১৬। সেদিন থেকে ভয়ের চোটে চারিদিকে আমি হাজার হাজার রামকে দেখতে পাচ্ছি। জঙ্গলের যত গাছপালাকে আমার মনে হয় ঐ বুঝি ওখানে রাম দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে শ্রীরামচন্দ্র এমন বাণ মেরেছিলেন যে সেই থেকে আমি – **রামমেব হি পশ্যামি রহিতে রাক্ষসেশ্বর**। হে রাবণ, আমি যখন একা একা বসে থাকি তখন আমি চারিদিকে যেন শ্রীরামচন্দ্রকে দেখি, ভালোবেসে নয়, ভয়ের চোটে, আমাকে এমন মার মেরেছিলেন'।

তারপর বাল্মীকি খুব সুন্দর একটা বর্ণনা দিচ্ছেন, যেটা পরে তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানসে নিয়েছেন – **রকারাদীনি নামানিরাম রামত্রস্তস্য রাবণ। রত্নানি চ রথাশ্চৈব বিত্রাসং জনয়ন্তি মে।।**৩/৩৯/১৮। হে রাবণ, শ্রীরামচন্দ্র আমাকে এমন মার মেরেছিল যে, সেই থেকে 'র' নামের যত শব্দ হতে পারে, সব শব্দেই আমার এখন ভয় এসে গেছে। আমি 'রত্ন' 'রথ' আর 'র'কার বলতে যা যা শব্দ হতে পারে 'র' নামেই আমি ভয়ে কাঁপতে শুরু করি। রামের ভয় নয়, রামের প্রথম অক্ষরেই ভয় করতে থাকে। তোমার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে তুমি যাও, গিয়ে রামের সঙ্গে যুদ্ধ ভূমিতে লড়াই কর। আমাকে যদি জীবিত দেখতে চাও তাহলে তুমি আমার সামনে রামের নামটি উচ্চারণ করো না।

মারীচের কথা শুনে রাবণতো প্রচণ্ড রেগে গেছে, রেগে গিয়ে খুব করে মারীচকে গালাগাল দিয়ে বলছে – **বাক্যমপ্রতিকূলং তু মৃদুপূর্বং শুভং হিতম্।**৩/৪০/১০। মারীচ, তুমি মনে রাখবে যখন রাজার সামনে কোন কথা বলবে সেই কথা যেন সব সময় রাজার অনুকূল কথা হয়, মধুর হয়, উত্তম হয়, হিতকর হয় আর সম্মানযুক্ত হয়। আর তুমি এটা ভালো করে মনে রেখ যে, রাজা কক্ষণ অপ্রিয় কথা শোনার জন্য তোমার কাছে আসবে না।

মহাভারতেও এক জায়গায় বলছে, রাজাকে যদি কেউ অপ্রিয় কথা শুনিয়ে দেয়, সে যদি রাজার অত্যন্ত প্রিয়জনও হয় কিংবা তার পুত্রও যদি হয়, রাজা তাকে ক্ষমা করবে না। অনেক অধঃস্তন কর্মচারী প্রায়ই এসে খুব গর্ব করে বলে, বস্‌কে শুনিয়ে দিয়েছি। বস্ হচ্ছে রাজাতুল্য, তুমি তার কর্মচারী, বস্ কিন্তু তোমার এই অপ্রিয় কথা শোনার জন্য বসে নেই, তোমাকে সরিয়ে দেওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। অপ্রিয় কথা একমাত্র সহ্য করে স্বামীর কথা স্ত্রী আর স্ত্রীর অপ্রিয় কথা স্বামী, সেখান কোন পথ থাকে না। কিন্তু অফিসের বস্ আর রাজা এরা কখন অপ্রিয় কথা ক্ষমা করবে না। রাবণ বলছে 'মারীচ, মনে রাখবে রাজা সব সময় সম্মানের কাঙাল। রাজার কথাকে লঙ্ঘন করে যদি তুমি রাজাকে কোন অপ্রিয় কথা বল তাহলে বুঝে নাও তোমার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়েছে'। রাবণ মারীচকে সাবধান করে দিচ্ছে।

রাবণ বলছে পাঁচ জন দেবতার গুণ রাজার মধ্যে সর্বদা থাকে। যে রাজা বা আজকের দিনে যে কোম্পানির বস্, এদের প্রত্যেকের মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, যম ও বরুণ এই পাঁচ জন দেবতার গুণ থাকবে। অগ্নির প্রতাপ, যারা ডিএম বা থানার ওসি হয় তাদের কি প্রতাপ! ডিএম এর গাড়ি আসতে দেখলেই সবাই রাস্তা ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয় ইন্দ্র, ইন্দ্রের পরাক্রম, বস্‌দের প্রচুর ক্ষমতা ও শক্তি দেওয়া থাকে, সেই ক্ষমতা দিয়ে সবাইকে দাবিয়ে রাখে। সোম দেবতার সৌম্য ভাব – একদিকে এদের এত প্রতাপ ও পরাক্রম অন্যদিকে সব সময় এদের মধ্যে খুব সৌম্য ভাব থাকে।

যখন হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল তখন জাপানের রাজা দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুতে কেঁদে ফেলেছিলেন। তখন জাপানের লোকেরা এ্যটম বোমার নাম শুনেছিল কিন্তু এটা কেমন বস্তু, আর তার কি ক্ষমতা জানত না। তখন জাপানের রাজা সব অফিসারদের ডেকে বললেন যে, আমরা আত্মসমর্পণ করব। কিন্তু অফিসাররা বলল, না আমরা জাপানের প্রত্যেকটি নাগরিক দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে দেব কিন্তু আত্মসমর্পণ করব না। রাজা তখন বলছেন – দ্যাখো, দেশের মানুষ আমার সন্তান,

এদেরকে আমি এভাবে মরতে দিতে পারিনা। কিছু অফিসার রাজি হলেন না। রাজা অফিসারদের বলে দিলেন – তোমরা রেডিওতে আমার বার্তা দিয়ে দাও যে, আমরা আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি। সেই দিন পর্যন্ত এর আগে জাপানের কোন লোক রাজার কন্ঠস্বর শোনেনি। রাজা নিজেও জানেন না যে রেকর্ডিং কিভাবে হয়, জাপানে রাজাকে ভগবানের মত দেখা হয়। রাজাকে সরাসরি রেডিওতে বলতে দেওয়া হবে না, তাই রাজার ভাষণ আগে রেকর্ডিং করা হয়েছে। রাজা জানতেন না কিভাবে রেকর্ডিং করতে হয়, তিনি তো খুব চেঁচিয়ে নিজের বার্তা সারা দেশবাসীকে জানিয়ে দিচ্ছেন। যাই হোক রেকর্ডিং করা হয়েছে। তারপর রেডিওতে ঘোষণা করা হল রাজার তরফ থেকে সংবাদ আছে। পুরো জাপান অবাক হয়ে গেছে, রাজার কন্ঠস্বর শোনা মানে যেন ভগবানের কথা শোনা। রেডিওতে যখন রাজার কথা প্রচার করা হচ্ছে তখন সারা জাপান স্তব্দ হয়ে গেছে। সেই সময় কিছু জাপানী যারা রাজার কন্ঠস্বর রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করার বিরোধী ছিল তারা রেডিও স্টেশনের উপর আক্রমণ চালাল যে রাজার কথা মানে ভগবানের কথা, তার কথাকে কোন ভাবেই সামনে নিয়ে আসা যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কিছু করতে পারেনি, তার আগেই কিছু রক্ষী তাদের ঘিরে ফিলেছিল, কিন্তু তাদের কাছে তরোয়াল ছিল সেই দিয়ে নিজেদের পেটটা চিরে দিয়ে আত্মহত্যা করে দিল। রাজার প্রতি তাদের যে বিশ্বাস সেটাকে তারা কিছুতেই ভাঙতে দিতে চায়না। যাই হোক, রাজার মন কত প্রজাবৎসল, আমার সন্তানদের আমি এভাবে মরতে দেবনা। রাজার সম্মানের জন্য জাপান আত্মসমর্পণ করতে চাইছে। এই হচ্ছে সৌম্য ভাব।

চতুর্থ যম, মানে দণ্ড, ন্যায় বিচার করে অপরাধিকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া। যমরাজ যেমন দণ্ড দেন, সেই গুণ রাজার মধ্যেও আছে। পঞ্চম বরুণ, বরুণ দেবতা হলেন রত্নধাতম্, বরুন দেবতা সবাইকে রত্ন দেন, রাজাও যার যা প্রাপ্য ঠিক ঠিক ভাবে সেই প্রাপ্য তাকে দিয়ে দেন। এই পাঁচটি দেবতার পাঁচটি গুণ রাজার মধ্যে সব সময় বিদ্যমান।

রাবণ মারীচকে খুব ভয় দেখিয়ে বলছে 'তুমি যদি আমাকে সহায়তা না কর তাহলে আমার হাতেই তুমি মরবে'। শেষে মারীচ বলছে ঠিক আছে 'শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টি যখনই আমার উপরে পড়বে আমি তো আর বাঁচব না, কিন্তু তুমি যে দুষ্কর্ম করতে যাচ্ছ এতে তোমার সব কিছু, তোমার কুল বংশ সমেত তুমি নিজেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে যাবে'।

যাই হোক, মারীচ এবার কপট হরিণ সেজে পঞ্চবটীর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সীতার নজরে এসেছে। লক্ষ্মণ কিন্তু সেই হরিণ দেখেই সন্দেহ করেছেন, দাদা শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন 'দাদা! এই হরিণকে আমার রাক্ষস মারীচ বলেই মনে হচ্ছে'। লক্ষ্মণ কি করে বুঝতে পারল আমরা জানিনা। কারণ এই রকম বিচিত্র হরিণ আজ পর্যন্ত কোথাও দেখা যায়নি, তাই কিছু বদ মতলব করে রাক্ষস মারীচের কপট হরিণ রূপ ধারণ করাটা অসম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বলছেন 'সীতা যখন চেয়েছে তখন এই মৃগকে জীবিতই আমার চাই'। এর পরের কাহিনী আমাদের সবারই জানা।

শ্রীরামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে বলছেন – **অর্থী যেনার্থকৃত্যেন সংব্রজত্যবিচারয়ন্। তমর্থমর্থশাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রাহুরর্থাঃ সুলক্ষ্মণ।**।৩/৪৩/৩৪। যে জিনিষকে সম্পাদন করার জন্য মানুষ বিচার না করেই নেমে পড়ে সেটাকেই অর্থ বলা হয়, যেমন টাকা-পয়সা। টাকা-পয়সা আয় করা মানে, মানুষ প্রথমেই টাকা পয়সা আয় করতে নেমে পড়ে, তখন মানুষ ভাবে না আমার কি হবে আর কি হবে না। এই যে অদ্ভুত মৃগ এটা এখন অর্থ সম্পাদন, এর সম্পাদন আমাদের করতেই হবে। একে ধরতেই হবে, যদি রাক্ষস হয় তাহলে সে বধ হবে, আর যদি হরিণ হয় তাহলে সীতা খুশি হবে।

এইসব কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র হরিণ ধরতে এগিয়ে গেলেন। এখানে এসে আবার একটু খটকা লাগে। মারীচ শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর নকল করে চিৎকার করে চেঁচাতে শুরু করেছে – হা সীতে, হা লক্ষ্মণ। মারীচ যখন জানেই যে সে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে মারা যাবে, রাবণকে যে এতক্ষণ এত জ্ঞান উপদেশ দিল সেই মারীচই এখন আবার এভাবে রামের গলা নকল করে হা লক্ষ্মণ করে চেঁচাবে এটা যেন ঠিক খাপ খায়

না। এই কাণ্ডের পর মনে হয় মারীচ যেন শেষ মুহূর্তে রাবণেরই পক্ষ অবলম্বন করে নিয়েছিল বা তার এই মনোভাবও হতে পারে যে, শ্রীরামচন্দ্র আমাকে ঐভাবে মেরেছিল, ঠিক আছে মরার আগে একটা বদলা নিয়ে নিই। সে যখন জানতই যে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে আমাকে মরতেই হবে তখন তাঁর ক্ষতি না করলেই পারত অথবা এটাও মারীচ ভেবে থাকতে পারে যে, ঠিক আছে আমাকে যখন মরতেই হচ্ছে, তখন এই কাজ করে যদি সীতাকে রাবণ হরণ করতে পারে তাহলে শ্রীরামের হাতে রাবণের বংশেরও নাশ হবে, ঠিক আছে আমি মরছি এবার তোরাও মর।

বাল্মীকি রামায়ণে এই সোনার হরিণের কাহিনীতে বোঝা যায় যে, এই কাল, প্রারব্ধ কত বিরাট আকারে আমাদের জীবনের সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। সীতা একজন দেবী আবার রাজকুমারী, তিনি কি জানতেন না যে সোনার হরিণ বলে কিছু হয় না! শ্রীরামচন্দ্র, যাঁকে অবতার বলে সবাই পূজা করছে, তিনি কি জানেন না যে সোনার হরিণ বলতে কিছু হয় না! তাও তিনি হরিণ ধরতে ছুটে গেলেন। ভক্ত বলবে এটাই শ্রীরামচন্দ্রের লীলা, তাহলে যে কেউ তো বলতে পারে আমার চোখের জলটাও লীলা। কিন্তু এগুলো তা নয়, এটাও সত্য ওটাও সত্য, কোনটাই মিথ্যা নয়। লীলাটাও সত্য, এই লীলা মিথ্যা কিছু নয়। যেটা কঠিণ সত্য তা হচ্ছে প্রারব্ধ, প্রারব্ধ যখন কাউকে ঘিরে ফেলে, তখন আর কিছুই করার থাকে না।

যাঁরা আধ্যাত্মিক বিচার ধারাকে নিয়ে এগিয়ে চলেন, তাঁদের এই জায়গাতে এসে কিছু জিনিষকে বুঝতে হবে। দুটো শক্তি সব সময় কাজ করে চলেছে – একটা জাগতিক বা সাংসারিক শক্তি, দ্বিতীয় দৈবী বা ঈশ্বরীয় শক্তি। জগত সংসারে ভালো হোক মন্দ হোক, যাই হোক না কেন সব সময় ঈশ্বরকে ধরে রাখা। এই সংসার যখন আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে আছাড় মারছে তখনও তাঁর নামকে ধরে রাখা আবার সংসার যখন আমাকে মালা পরাচ্ছে তখনও তাঁর নামকে ধরে রাখা। সর্ব ক্ষেত্রে, প্রতি মুহূর্তে যদি তাঁকেই ধরে রাখা যায়, তাঁর নাম করা যায় তখন কি হয়, আস্তে আস্তে এই প্রারব্ধগুলি আপনা থেকেই ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে, জগৎ তখন তার কাছে অন্য রকম হয়ে যায়। আর বাইরে যা কিছু হয় সব প্রারব্ধ অনুসারেই হয়ে থাকে। সীতা মারীচ রূপী সোনার হরিণ দেখে বলছেন 'এই হরিণকে যদি ধরে আনা হয়, তখন আমি একে আদর করব, এর সাথে খেলব, অযোধ্যায় যখন ফিরে যাব তখন ভরতকে দেখাব, আমার শাশুড়ি মাতাদের দেখাব। তিনি কি জানতেন না যে সোনার হরিণ বলে কিছু হয় না। এই লোভটুকু যদি সীতার না থাকত তাহলে আর এত বড় কাণ্ডও হত না, বাল্মীকি রামায়ণও আর রচিত হত না। যেমন তার আগে লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে ব্যঙ্গ করার পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন – লক্ষ্মণ, যারা অনার্য তাদের সাথে কখন হাস্য পরিহাস করবে না। হাস্য পরিহাস করলে কি পরিণাম হয় এই দ্যাখো, সীতার এখনই প্রাণ চলে যেত। আমরা অনেক সময় ভাবি লক্ষ্মণ যদি শূর্পণখার নাক কান না কাটত তাহলে এত বড় কাণ্ড আর হত না। সীতা যদি শ্রীরামচন্দ্রকে সোনার হরিণ ধরে আনবার জন্য না পাঠাতেন তাহলেও হয়তো এত কিছু হত না। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, লক্ষ্মণ যদি শূর্পণখার নাক কান না কাটত, সীতা যদি শ্রীরামচন্দ্রকে বাধ্য না করতেন সোনার হরিণ ধরে আনবার জন্য, তবুও এখন যা হয়েছে এগুলো হতই। কারণ প্রারব্ধ ঘিরে নিয়েছে। যখন প্রারব্ধ কাউকে ঘিরে নেয়, তখন এক দিক আটকালে আরেক দিক দিয়ে আসবে, সেই দিক আটকালে অন্য দিক দিয়ে আসবে। প্রারব্ধ থেকে কোন ভাবেই বাঁচা যাবে না।

যখন প্রারব্ধ ঘিরে নেয় তখন দুটি হাত ছেড়ে দিয়ে শুধু ঠাকুরের নাম করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। প্রারব্ধ থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এই প্রারব্ধকে যত আটকাতে যাবে তত বেশি সে আছাড় মারবে। যত হাত তুলে দিয়ে বলা যাবে, মা তুই যত মারার মার, তত প্রারব্ধ কম মারবে। জগতে সব কিছুর সঙ্গে লড়াই করা যায়, কিন্তু প্রারব্ধের সাথে লড়াই করে কেউ জিততে পারেনি। ইংরাজীতে একটা কথাই আছে You can fight anything, but you cannot fight your destiny. ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

শ্রীরামচন্দ্রের ঐ চিৎকার শুনে সীতা অস্থির হয়ে পড়েছেন, কেননা সীতাও তো শ্রীরামচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। লক্ষ্মণকে বলছেন তুমি তোমার দাদার খবর নাও, নিশ্চয়ই তাঁর কোন বিপদ হয়েছে। সীতার কথা শুনেও লক্ষ্মণ গেল না, কেননা শ্রীরামচন্দ্র তার উপর সীতার রক্ষার দায়ীত্ব দিয়ে গেছেন। লক্ষ্মণ সীতার কথাকে উপেক্ষা করে শ্রীরামচন্দ্রের খবর নিতে গেলেন না। তখন সীতা লক্ষ্মণকে বলছেন 'তুমি অত্যন্ত নৃশংস, প্রথম থেকেই আমার প্রতি তোমার পাপপূর্ণ মনোভাব। আর সেইজন্যই তুমি চুপি চুপি শ্রীরামচন্দ্রের সাথে জঙ্গলে এসেছ, কারণ কোন না কোন দিন তুমি আমাকে একা পাবেই। বা এমনও হতে পারে ভরত তোমাকে কৌশল করে এখানে পাঠিয়েছে'। সীতা ভুলে গেছেন যে, শ্রীরামচন্দ্র যখন বনবাসে এসেছেন তখন ভরত অযোধ্যাতেই ছিল, শঙ্কা আর সংশয়ের আবর্তে মাথা খারাপ হলে যা হয়ে থাকে। সীতা এমন হয়ে গেছেন যে, যা নয় তাই বলে যাচ্ছেন লক্ষ্মণকে। সীতার মূল বক্তব্য হল লক্ষ্মণ চাইছে রাম মরে যাক যাতে সে সীতাকে অধিকার করে নিতে পারে। সীতা বলে চলেছে 'কিন্তু আমি প্রাণ দিয়ে দেব, তবুও আমি তোমার মত নীচ, ক্ষুদ্র মনের লোকের সাথে কখনই বাস করব না'।

লক্ষ্মণ তখন সীতাকে বলছেন 'হে দেবী **বাক্যমপ্রতিরূপং তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি।** নারীদের মুখে অনুচিত ও প্রতিকূল বাক্য উচ্চারিত হওয়াটা আশ্চর্যের কিছুই নয়'। আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে বাল্মীকি বলে গেছেন যে মেয়েদের মুখের কোন লাগাম নেই, অনুচিত ও প্রতিকূল কথা বলা তাদের স্বাভাবিক। আর কি বলছেন? **স্বভাবস্ত্বেষ নারীনামেষু লোকেষু দৃশ্যতে।**।৩/৪৫/২৯। 'নারীদের এই ধরণের স্বভাবজোনিত দৃশ্য এই লোকে প্রায়ই দেখা যায়। উচিৎ কথা আর অনুকূল কথা নারীরা কখনই বলবে না। মেয়েদের এটা কোন বংশগত রোগ নয়, এটা তাদের জাতিগত রোগ'। লক্ষ্মণ এই কথা বলেই থেমে যাচ্ছেন না, লম্বা শ্লোক দিয়ে বাল্মীকি লক্ষ্মণের বক্তব্যকে অনেক দূর টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। লক্ষ্মণের মূল বক্তব্য – স্ত্রীরা বেশির ভাগই বিনয়াদি ধর্ম থেকে বিরত। সেক্সপিয়রের খুব নামকরা একটা কথা আছে – মেয়ে যদি রেগে যায়, তখন তার যে রাগ, নরকে এই রকম কোন আগুনই নেই যে সেই আগুন কোন স্ত্রীর আগুনকে টেক্কা দিতে পারবে। শ্রীমার সঙ্গে মজা করতেই শ্রীমা একটু রেগে গেছেন তখন ঠাকুর বলছেন – ওরে সাপের ল্যাজে পা পরেছে। খ্রীশ্চানদের কাছে নরক হচ্ছে আগুনের জায়গা। হিন্দুদের মধ্যে নরকে আগুন থাকবে, এই ধরণের কোন ধারণা ছিল না, পরে খ্রীশ্চানদের থেকে এটা এসেছে। তারপর লক্ষ্মণ বলছেন মেয়েরা চঞ্চলমতি। এই একটু আগে সীতা বলছেন – লক্ষ্মণ তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে এখানে রক্ষা করবে। একটু পরেই বলছেন – তোমার মধ্যে কুমতলব, তুমি আমাকে অধিকার করে নিতে চাও।

মেয়েদের স্বভাব কি রকম? লক্ষ্মণ বলছেন, মেয়েরা হচ্ছে কঠোর, যে কোন কটূ কথা বলে দিতে পারে। বাড়িতে ঝগড়া লাগাতেও মেয়েরা। 'হে দেবী! আপনার এই কথাগুলো মনে হচ্ছে যেন কেউ তপ্ত লোহা গলিয়ে আমার কানে ঢেলে দিয়েছে। যাই হোক, আমার দাদা আমাকে আদেশ করেছিলেন আপনাকে রক্ষা করার জন্য, আমি – **উপশৃণ্বন্তু মে সর্বে সাক্ষিণো হি বনেচরাঃ।**।৩/৪৫/৩১। এই বনভূমিতে যত বনচর আছে, গাছপালা, পশু, পাখি আপনাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি, দেবী সীতা আমার প্রতি এতো কঠোর কথা বলেছেন, এনার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, এই যে ইনি আমাকে সন্দেহ করেছেন, কিন্তু আমি জানি সাধারণ নারীদের যে মন্দ স্বভাব হয়, সেই স্বভাবকে অবলম্বন করেই তিনি এই ধরণের কঠোর কথা বলেছেন। দেবী সীতার মধ্যে এই জিনিষ আমি কল্পনাই করতে পারিনা। কিন্তু যাই হোক, হে সুমুখি! আপনার কথা মত শ্রীরামচন্দ্র যেখানে আছেন, আমি সেইখানেই যাচ্ছি, কিন্তু আমি জানি আমি খুবই অন্যায় করছি, কারণ এভাবে আপনাকে একা রেখে চলে যাওয়াটা আমার পক্ষে একেবারেই ঠিক নয়। আর – **রক্ষন্তু ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রং বনদেবতাঃ। নিমিত্তান হি ঘোরাণি যানি প্রাদুর্ভবন্তি মে।**।৩/৪৫/৩৪। এই বনের সব দেবতারা যেন আপনাকে রক্ষা করেন, কারণ আমি চারিদিকে অশুভ চিহ্ন সকল দেখছি'। নিমিত্ত নিয়ে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। ঝড় আসার আগে প্রথমে মিষ্টি বাতাস দিতে থাকে,

তখন বোঝা যায় যে ঝড় আসছে। এখন ঝড় আসবে বলে মিষ্টি বাতাস দিচ্ছিল, না কি মিষ্টি বাতাস বইতে শুরু করেছে বলেই ঝড় এল। দর্শনে এটি এক বিরাট সমস্যা। এটাই নিমিত্ত। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন*। শ্রীকৃষ্ণও একই কথা বলছেন, যুদ্ধে এরা সবাই মারা যাবে, এদের আগেই মারা হয়ে গেছে, তুমি যুদ্ধ করলেও এরা মরবে, তুমি যুদ্ধ না করলেও এরা সবাই মরবে, তাই হে অর্জুন এখন তুমি শুধু নিমিত্ত হয়ে যুদ্ধ করে এদের মার। তোমার জন্যে এসব কিছুই হবে না, মাঝখান থেকে তুমি যদি যুদ্ধে দাঁড়াও তাহলে তোমার সুনাম হবে। স্বামীজীও এক জায়গায় বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের রথ চলছে, যারা এর বিরোধিতা করবে তারা পিষে যাবে, আর যারা এই রথের দড়িতে হাত লাগাবে তারা ধন্য হয়ে যাবে। যারা হাত লাগাচ্ছে তার জন্য কি রথ চলছে? রামকৃষ্ণ মিশনে যদি দু-তিনশ সন্ন্যাসী নাও থাকে তবুও এই রথ এইভাবেই চলবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাতে সারা জগত এমনিতেই প্রভাবিত হবে।

ব্রাজিলে ওখানকার স্থানীয় এক ভদ্রলোকের হাতে কিভাবে ঠাকুরের উপরে স্বামী অভেদানন্দের ছোট্ট একটা লেখা এসেছিল। ১৯১২ সালে যখন ভারতেই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা কেউ জানত না, তখন তিনি ঐ বইটিকে পর্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করে, নিজের পয়সা খরচ করে ছাপিয়ে অনেকে মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। পরে তাঁরা সেখানে কয়েকজন অনুরাগী ভক্তকে নিয়ে একটা প্রাইভেট আশ্রম তৈরী করেন। সেই সময় তারা কে বিবেকানন্দ, কে শ্রীমা এইসব কিছুই জানতেন না। কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলো তাঁর এত ভালো লেগে গেছে যে সে নিজে পয়সা খরচ করে ঐটা ছাপিয়ে দিয়েছেন। আজ সেখানে বেলুড় মঠের কেন্দ্র হয়ে গেছে। এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের রথ চলছে, তাঁর নিমিত্ত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মসভায় ভাষণ দিলেন। চিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজী বক্তৃতা না দিলে শ্রীরামকৃষ্ণের রথ কি চলত না? দিব্যি চলত।

রাবণতো সীতাকে হরণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে, কিন্তু লক্ষ্মণ দেখছে - *নিমিত্তান হি ঘোরাণি যানি প্রাদুর্ভবন্তি মে*, ঘোর নিমিত্ত সব দেখতে পাচ্ছি। এখন লক্ষ্মণ নিমিত্ত গুলো দেখছেন বলেই গোলমালটা হবে, না গোলমাল হবে বলেই তিনি নিমিত্ত গুলো দেখছেন। বেড়াল রাস্তা কেটেছে বলে খারাপ কিছু হবে, না খারাপ কিছু হবার ছিল বলেই বেড়াল রাস্তা কেটেছে। তাহলে বেড়ালকে মেরে কি লাভ? গীতাতে এই নিমিত্ত শব্দ দু-বার এসেছে, একবার অর্জুন ভগবানকে বলছে – *নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরাতানী চ কেশব* – হে কেশব! আমি চারিদিকে সব অশুভ লক্ষণ দেখছি। আবার শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্*, হে অর্জুন তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। শাস্ত্রের এই কথাগুলো আমাদের গভীর ভাবে অনুধ্যান করতে হয়।

লক্ষ্মণ বেরিয়ে যেতেই রাবণ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক যোগীর ছদ্মবেশ ধারণ করে সীতার সামনে এসে দঁড়িয়েছে। রাবণের পরিধাণে কাষায় বস্ত্র, মাথায় শিখা, হাতে ছাতা, পায়ে পাদুকা, কাঁধে একটি দণ্ড, আর হাতে কমণ্ডুলু। কাষায় মানে গৈরিক রঙের বস্ত্র। এই ধরণের সাজ বলে দিচ্ছে রাবণ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে সীতার সামনে এসেছে। রাবণের আগমন দেখে সমস্ত বৃক্ষরা পাতা নাড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে, বাতাস তার প্রবাহকে স্তব্দ করে দিয়েছে, যে গোদাবরী নদী অত্যন্ত বেগে বয়ে চলে, সেও রাবণের ভয়ে তার বেগকে প্রশমিত করে দিয়ে মৃদু মন্দ গতিতে বইতে শুরু করেছে। এগুলো আসলে সব কাব্যিক বর্ণনা। সীতাকে দেখে রাবণ সীতার রূপের খুব প্রশংসা করতে শুরু করেছে। রাবণের মুখ দিয়ে বাল্মীকি সীতার রূপের এক দুর্ধর্শ বর্ণনা দিয়েছেন। বিদেশীরা বলে হিন্দুরা চিরকাল সংসার মিথ্যা বলেই কাটিয়ে জগতের ব্যাপারে উদাসীন থেকে গেল। কিন্তু বাল্মীকি, যিনি একজন ঋষি, তিনি যা সীতার বর্ণনা দিয়েছেন তা একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার রূপের যেভাবে বর্ণনা করে, তার থেকেও বেশি। বিভিন্ন দেশে নারীর রূপের সৌন্দর্য বোধ বিভিন্ন রকম হয়, ভারতীয় নারীর রূপের যে আদর্শ সৌন্দর্য তার বর্ণনা রাবণের মুখ দিয়ে বাল্মীকি দেখাচ্ছেন। এই ধরণের বর্ণনা কিছু কিছু পাওয়া যায় কালিদাসের কুমারসম্ভবে।

যদিও সীতার পক্ষে ছদ্মবেশী রাবণকে চিনতে পারার কথা নয়, কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে রাবণের মুখে তাঁর রূপের প্রশংসা শুনেও সীতা কিছু আন্দাজ করতে পারলেন না যে কি হতে চলেছে। বরঞ্চ একজন পুরুষের মুখে নিজের রূপের সুখ্যাতি শোনার পরেও সীতা বসার জন্য একটি আসন পেতে রাবণকে উপবেশন করার অনুরোধ করে কিছু ফলমূল গ্রহণ করতে বললেন। বলছেন – **ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমং ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতা।।৩।৪৩।৩৬।** এই জঙ্গলে যা ফুলমূল পাওয়া যায় তাই দিয়ে অর্পণ করে ব্রাহ্মণ অতিথির সৎকার করছি। তারপর রাবণ সীতার পরিচয় জিজ্ঞেস করছে। সীতা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন – যখন কৈকেয়ি শ্রীরামচন্দ্রকে জঙ্গলে পাঠিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স পঁচিশ থেকে একটু বেশি ছিল। আর আমার জন্ম থেকে বনগমন পর্যন্ত আঠার বছর অতিবাহিত হয়েছে। তার মানে শ্রীরামচন্দ্র থেকে সীতা সাত বছরের ছোট ছিলেন। এই হিসাবে শ্রীরামচন্দ্রের ষোল বছরে যখন বিয়ে হয়েছিল তখন সীতার মাত্র নয় বছর বয়স ছিল। কিন্তু রামচরিতমানসে তুলসীদাস সীতাকে অনেক বড় দেখিয়ে সীতাকে দুর্গামন্দিরে প্রার্থনা করিয়েছেন। মারীচ যখন রাবণের কাছে শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা করেছিল তখনও সে শ্রীরামচন্দ্রের বয়সের এই হিসাবই দিয়েছিল।

এসব হতে হতে রাবণ নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করে বলছে **যেনা বিত্রাসিতা লোকাঃ সদেবাসুরামানুষাঃ। অহং স রাবণো নাম সীতে রক্ষোগণেশ্বরঃব।**।৩/৪৭/২৬। আমি সেই রাবণ। আমি অনেক জায়গা থেকে অনেক সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে এসেছি, কিন্তু তোমার রূপের কাছে এদের রূপ কিছুই নয়। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, তোমাকে আমি লঙ্কপুরীতে নিয়ে গিয়ে আমার রাজমহলে আমার রাজমহিষী করে রাখব। মহিষী মানে রানীদের মধ্যে যিনি প্রধানা।

সীতাও তখন বলছেন – আমি সিংহী, কারণ শ্রীরামচন্দ্র সিংহ, তুমি তার সামনে একটা শেয়াল। শ্রীরামচন্দ্রের সাথে রাবণের তুলনা করে বলছেন – বনের সিংহ আর শেয়াল, সমুদ্র আর ছোট্ট নদী, আর অমৃত আর ঘোলের যা পার্থক্য শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তোমার একই পার্থক্য। তুমি আমাকে পাবার আশা পরিত্যাগ কর। সোনা আর কাঁচ, চন্দন মিশ্রিত জল আর পচা পাঁক, হাতি আর বেড়াল এদের মধ্যে যা তফাৎ তোমার আর শ্রীরামচন্দ্রের সেই একই তফাৎ। সীতা এখানে একটা খুব সুন্দর কথা বলছেন 'মাছি যদি একবার ঘি খেয়ে নেয় তাহলে মাছি আর বাঁচেনা'। ঘিয়ে আজকাল অনেক ভেজাল দেওয়া থাকে, কিন্তু ঘি খাঁটি কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য মাছিকে ব্যবহার করা হয়। গ্রাম দেশে রুটিতে ঘি লাগিয়ে খোলা জায়গায় রেখে দেওয়া হয়, ঐ রুটিতে যদি মাছি বসে তাহলে বুঝতে হবে ঘি খাঁটি নয়, আর যদি মাছি না বসে তাহলে বোঝা যাবে যে এটা শুদ্ধ ঘি। এটা সত্যি সত্যিই দেখা যায় যে খাঁটি ঘিয়ের গন্ধে মাছি পালিয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে কিভাবে এটা এসেছে জানা নেই, কিন্তু বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশের লোকেরা জানে যে মাছি যদি কোন ভাবে খাঁটি ঘি খেয়ে নেয় তাহলে মাছি আর বাঁচবে না, ঘিয়ের শুদ্ধতাই ওর মৃত্যুর কারণ। এমনিতেও বলা হয় যে কুকুরের পেটে ঘি সয় না। কুকুরের ব্যাপারটা কতটা সত্যি জানা নেই, কিন্তু মাছির মুখে একটু ঘি লাগলেই মাছি মরে যাবে। সীতা রাবণকে বলছেন – তুমিও যে আমাকে নিয়ে যাবে বলছ, তুমি আমাকে হজম করতে পারবে না, মাছির মত মরে যাবে।

তখন রাবণ নিজের বিকট রূপ ধারণ করে সীতাকে জোর করে টেনে পুষ্পক রথের উপরে তুলে নিল। পুষ্পক রথকে গাধা বা খচ্চর টানত, পুষ্পকযান যাদুগুণ সম্পন্ন আর আকাশমার্গে চলত। পুষ্পকযানের আসল মালিক হলেন কুবের, রাবণ কুবেরের থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিল। দেবতারা তো আর পায়ে হেঁটে কোথাও যান না, তাঁদের নিজস্ব যান থাকত। পুষ্পক যানকে যে কেউ চালাতে চাইলেই চালাতে পারবে না, এর যে মালিক হবে সেই একমাত্র তাকে চালাতে পারবে। মালিক যেখানে তাকে যেতে বলবে, আকাশমার্গ দিয়ে সেখানে সে চলে যাবে। রাবণ যখন মারা গেল তখন পুষ্পক রথ বিভীষণের অধীনে চলে এসেছিল, তখন আবার সে বিভীষণের আজ্ঞাই পালন করত। লঙ্কাযুদ্ধের পর বিভীষণ তাকে আজ্ঞা করছে আমাদের

সবাইকে অযোধ্যায় নিয়ে চল। শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার মনে করা হলেও তাঁর কথা মত পুষ্পক রথ চলবে না, নিজের মালিকের কথাতেই চলবে।

সীতাকে এখন রাবণ সেই পুষ্পকযানে তুলে নিয়েছে। সীতা বিলাপ করতে শুরু করেছেন, খুব উচ্চস্বরে রাবণকে বলছেন 'রাবণ! যারা অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির নিষ্ঠুর খারাপ স্বভাবের পুরুষ তারা কিন্তু তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে পায়না, সময় লাগে। যেমন ফসল ফলে গেলেও পাকতে সময় লাগে। তোমারও শাস্তি হবে, আর তুমি মরবে। আর যত দেবতারা আছে, এই বনের যত দেব-দেবী আছেন সবাইকে আমি প্রণাম করে জানাই যে রাবণ আমাকে এই ভাবে বলপূর্বক টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যত পশুপাখি আছে সবাইকে হাতজোড় করে বলছি আমি তাদের সবার শরণে আছি, আমার এই করুণ অবস্থার যেন তারা সাক্ষী হয়ে থাকে।

এই দিকেই জটায়ু পথেই কোথাও ছিল, তার আগে শ্রীরামচন্দ্রের সাথে তাঁর পরিচয় হয়ে গেছে। এইভাবে রাবণ সীতাকে পুষ্পকযানে অপহরণ করে নিয়ে যেতে দেখে জটায়ু বলছেন – **ন তৎ সমাচরেদ্ধীরো যৎপরোহস্য বিগর্হয়েৎ। যথাত্মনস্তথান্যেষাং দারা রক্ষ্যা বিমর্শনাৎ।**।৩/৫০/৮। হে রাবণ, যারা ধীর পুরুষ তারা কখন এমন কাজ করে না যাতে অপরে নিন্দা করতে পারে। যেমন নিজের স্ত্রীকে পর পুরুষ থেকে রক্ষা করা স্বামীর ধর্ম, ঠিক তেমনি অপরের স্ত্রীকেও রক্ষা করা সমস্ত পুরুষের ধর্ম। এখানে হিন্দুদের মূল্যবোধের ধর্মকে জটায়ুর মাধ্যমে উপস্থাপনা করা হচ্ছে। কী সেই মূল্যবোধ? তুমি নিজের স্ত্রীকে সব সময় রক্ষা করবে এবং পরের যে স্ত্রী তারও সম্মান তোমাকে রক্ষা করতে হবে।

আজকাল খবরের কাগজে যে ধরণের খবর প্রকাশিত হচ্ছে, আর সত্যিই চারিদিকে যেসব কাণ্ড হচ্ছে সেগুলো পড়ার পর মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে যায়। আমাদের কত উচ্চ মূল্যবোধ ছিল, নারীদের কত সম্মান করা হত, নারী অপহরণ হিন্দুদের মধ্যে কখনই ছিল না। ভারতে এই ধরণের ঘটনার প্রথম সূত্রপাত হয় যখন বিদেশী বিধর্মীরা ভারতে আক্রমণ শুরু করেছিল। কেননা বিদেশীরা তাদের নিজস্ব সৈন্য সিপাহী দিয়ে লুঠতরাজ করছিল। নিজেদের স্ত্রীদের তারা কাছে পেত না বলে রাস্তাঘাটে মেয়েদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করল, বাড়ি থেকে মেয়েদের তুলে নিয়ে যেত। ইদানিং সমাজের বাঁধন একেবারেই আলগা হয়ে গেছে। সমাজের শীর্ষে যারা রয়েছে, যারা ক্ষমতাবান, যারা রাজা, তারা ধর্ম, অর্থ ও কামের জন্য যে ধরণের আচরণ করবে সাধারণ মানুষ সেই ধরণের আচরণই অনুকরণ করে। তাই রাজারা যখনই ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটে জিনিষের কোন আচরণ করবে তখন তাদের শাস্ত্র বিরোধী কিছু করতে নেই।

জটায়ু বলছেন 'যে জিনিষে কামের প্রাধান্য থাকে তখন তার থেকে যে দোষ হয়, সেই দোষের কখনই পরিমার্জন করা যায় না, এই দোষকে পরিমার্জন করা খুবই কঠিণ। তাই রাবণ তুমি এই দোষযুক্ত কর্ম করা থেকে বিরত হও। বোঝা তুমি ততটাই বইবে যতটা তুমি তুলতে পারবে। যে কার্যে না ধর্মের বৃদ্ধি হয়, না কীর্তির বৃদ্ধি হয়, না যশ প্রাপ্তি হয়, বরঞ্চ উল্টে শরীরেরই কষ্ট হয়, সেই কার্য কখনই করতে নেই। ততটাই তুমি আহার করবে যতটা করলে তুমি হজম করতে পারবে। তুমি যে এই সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, এতে না তোমার ধর্ম সাধন হবে, না কীর্তি বাড়বে, না যশ হবে, শুধু শরীরের অকারণ পীড়ন হবে। এই কাজ তুমি করতে যেও না'। এগুলোই ছিল তখনকার দিনের সাধারণ মূল্যবোধ, যেগুলো বাল্মীকি এখানে উল্লেখ করছেন।

আধ্যাত্মিকতা আর সাধারণ মূল্যবোধ দুটোই পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। মূল্যবোধের যে উচ্চাবস্থায় আধ্যাত্মিকতার ভাব জাগ্রত হয় সেই মূল্যবোধই সাধারণ নিম্ন অবস্থায় আচরণ করতে হয়। আমাদের দৈনন্দিন আচরণ বিধি আর আধ্যাত্মিক জীবন এই দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কিছু আচরণ বিধি ঠিক করে দিলে তারা প্রশ্ন করে এটা কেন করব। এই আচরণ বিধি যদি ঠিক থাকে পরে এই আচরণই তাকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। যে মানুষ অপরকে সম্মান করতে জানে না, সে কোন দিন নিজেকে সম্মান করতে পারবে না। যে অপরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, যে কাউকে

শ্রদ্ধা করে না, তার মধ্যে কখনই আত্মশ্রদ্ধা আসবে না। যার আত্মশ্রদ্ধা নেই তার শান্তি কি করে হবে! তার আধ্যাত্মিক অনুশীলনই বা কি করে হবে! আত্মশ্রদ্ধার কথা কেন বলা হচ্ছে? ভেতরে আত্মশ্রদ্ধা থাকলে তবেই আত্মজ্ঞান হবে। আত্মজ্ঞান হলে কি হবে? আমার ভেতরে যে আত্মা আছেন, যে ঈশ্বর আছেন, তিনিই সর্বত্র আছেন। আমি অপরকে কেন শ্রদ্ধা করতে যাব? সেও মারা যাবে, আমিও মারা যাব। শ্রদ্ধা অপরকে এই জন্যই করা হয় তার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ আছেন, তার ভেতরে সেই শুদ্ধ আত্মা বিরাজ করছেন, যে নারায়ণ, যে শুদ্ধ আত্মা আমার মধ্যেও বিরাজ করছেন। সবার মধ্যে সেই শুদ্ধ আত্মাকে কে দেখেছেন? যাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে, যিনি আত্মজ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরদ্রষ্টা তিনিই সবার মধ্যে ঈশ্বরকেই দেখেন। যে জিনিষকে আত্মজ্ঞানী স্বাভাবিক দেখছেন, সেটাকেই সাধারণ অবস্থায় লোকেরা অনুশীলন করে। যখন আমি শুনলাম সবার মধ্যে সেই ভগবানই বিরাজ করছেন, তখন সবাইকে সম্মান করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে, এরপর কাউকে আর অপমান করা যাবে না। যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁরা সবাইকে সেইজন্য সম্মান দিয়ে কথা বলেন। সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলাটাই সমাজে আমাদের আচরণের মাধ্যমে অনুশীলন করতে হবে। কিন্তু আজকের সমাজ এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মশ্রদ্ধার ভাব অনে নীচে পড়ে গেছে, আত্মশ্রদ্ধা না থাকাতে তারা কাউকে সম্মান করতেও ভুলে গেছে। তার ওপর প্রচুর অর্থের যোগানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভোগের উপকরণও প্রচুর এসে গেছে। দিনে দিনে এই প্রাচুর্যতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, যার ফলে শ্রদ্ধার ব্যাপারটাই হারিয়ে যাচ্ছে। আত্মশ্রদ্ধা শূন্য মানে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তুমি একজন মৃত। আধ্যাত্মিকতার মৃত্যু মানে সে একটা অসুর, রাক্ষস জাতীয় জীব। অসুরদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই সমাজ দিনে দিনে অবক্ষয়ের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

এরপর জটায়ুর সাথে রাবণের বিরাট যুদ্ধ হল। এই যুদ্ধে জটায়ুর ডানা কাটা পড়ল, শেষ পর্যন্ত জটায়ু আর রাবণের সাথে পেরে উঠল না, আকাশ থেকে জমিতে এসে পড়ে রইল। সীতাকে রক্ষা করার জন্য আর কারুর এগিয়ে আসার রইল না, রাবণ নির্বিঘ্নে তাকে নিয়ে চলল। পুষ্পকযান থেকে পাহাড়ের এক জায়গাতে সীতা দেখছেন কিছু বানর বসে রয়েছে। তাদের দেখে সীতা কিছু নিজের আভূষণ খুলে নিজের বস্ত্রের কিছু অংশ ছিঁড়ে পুটলি করে নীচে বানরদের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। ঐ বানরদের মধ্যে সুগ্রীব, হনুমান এঁরাও বসে ছিলেন। তাঁরা সেই আভূষণ গুলি পেলেন। তারপর সবাই জানেন যে সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নিয়ে যাওয়ার পর রাবণ সীতাকে বলছেন – তোমাকে আমি বার মাস সময় দিলাম, এই বারো মাসের মধ্যে তুমি আমার স্ত্রী হবার জন্য তৈরী হয়ে যাও, তারপরেও যদি তুমি আমার স্ত্রী হতে রাজী না হও তাহলে এই রাক্ষসীরা তোমাকে টুকরো টুকরো করে রান্না করে আমার প্রাতঃরাশে দিয়ে দেবে।

অন্য দিকে ব্রহ্মা রাবণের এই সব কাণ্ড দেখে ইন্দ্রকে বললেন – যাও ইন্দ্র, তুমি গিয়ে সীতাকে রক্ষা কর। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র এসে সীতার সামনে দাঁড়িয়েছেন, এখানে বাল্মীকি বর্ণনা দিচ্ছেন – **অরজোহম্বরধারী চ নম্লানকুসুমস্তথা।**(৩/প্রক্ষিপ্ত স্বর্গ/১৯) – তাঁর চোখের পাপড়ি নড়ছে না, আকাশে নিরাধার। দেবতারা হলেন নিরাধার কিন্তু মানুষরা আধারি, আমাদের পা মাটিতে রাখতে হয়, ইন্দ্রের বস্ত্রে কোন ধূলো বা মলিনতা নেই। গলার মালার ফুল অম্লান ও সতেজ রয়েছে। সীতা বুঝতে পেরেছেন যে ইনিই সেই দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। মহাভারতে নল-দময়ন্তীর কাহিনীতে দেবতাদের এই বৈশিষ্ট্য গুলিকেই আবার নিয়ে আসা হয়েছে। দেবতাদের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রথম বাল্মীকিই উল্লেখ করেছিলেন। যাই হোক ইন্দ্র তখন সীতার হাতে একটা পায়েসের পাত্র দিয়ে বললেন 'হে দেবী, তুমি এই পায়েসটুকু খেয়ে নিলে তোমার হাজার বছরে আর ক্ষিদে পাবেনা, জল তৃষ্ণা পাবেনা'। এই পায়েস খাওয়ার জন্য সীতাকে তাই আর রাবণের অন্ন জল গ্রহণ করতে হয়নি।

বাল্মীকি রামায়ণ – ১২ই জুন ২০১০

রাবণ এসে সীতাকে তো অপহরণ করে নিয়ে গেছে। অন্য দিকে শ্রীরামচন্দ্র দেখছেন লক্ষ্মণ সীতাকে একা ফেলে রেখে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। লক্ষ্মণকে দেখেই শ্রীরামচন্দ্র বিচলিত হয়ে পড়েছেন, লক্ষ্মণকে দেখেই বলছেন 'হে লক্ষ্মণ, তুমি কি করে সীতাকে পঞ্চবটীতে একা ফেলে এখানে চলে এলে, তোমাকে তো বারণ করা হয়েছিল সীতাকে কোন ভাবেই একা ফেলে রেখে না আসতে'। তারপর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্য করছেন চারিদিকে যে লক্ষণ গুলো দেখা যাচ্ছে তার কোনটাই শুভ ইঙ্গিত করছে না। অনেক লক্ষণের মধ্যে দেখছেন দিনের বেলায় শেয়াল ডাকছে, আরও এই ধরণের অনেক অশুভ লক্ষণ দেখে বলছেন – আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা গোলমাল হতে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ তখন শ্রীরামচন্দ্রকে বিস্তারিত ভাবে সব ঘটনা বলল।

শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ পঞ্চবটীতে ফিরে এসে দেখছেন সীতা নেই। ভেবেছেন সীতা হয়তো মজা করার জন্য কোথাও ইচ্ছে করে লুকিয়ে আছে। শ্রীরামচন্দ্র চারাপাশে সীতাকে অনেক অন্বষণ করতে করতে নাম ধরে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু কোথাও সীতার কোন সাড়া পাচ্ছেন না। আস্তে আস্তে তাঁর মনে সীতাস্কে নিয়ে অনেক ধরণের আশঙ্কা জেগে উঠল। তন্নতন্ন করে খুঁজেও যখন শেষ পর্যন্ত সীতাকে পাওয়া গেল না, তখন শোকে, দুঃখে শ্রীরামচন্দ্রের চোখ দুটো লাল হয়ে গেল। শোকে এমনই কাতর হয়ে উন্মত্ত হয়ে গেলেন যে, তিনি বৃক্ষ, বৃক্ষের ফুল, বৃক্ষের ডালে যে পাখিরা বসে আছে তাদের সবাইকে আকুল হয়ে নানান রকম প্রশ্ন করে সীতার কথা জানতে চাইছেন – **অশোকা শোকাপনুদ শোকোপহতচেতনম্।**৩/৬০/১৭। অশোক বৃক্ষকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – হে অশোক বৃক্ষ! তোমার নাম অশোক, শোক দূর করা তোমার বৈশিষ্ট্য, আর এই দেখ আমার মধ্যে এমন শোক এসেছে যে শোকে আমার চেতনাই লুপ্ত হতে বসেছে, তুমি কিছু একটা কর। হাতিকে দেখে বলছেন – হে হাতি! তুমি আমার সীতাকে কোথায় দেখেছ বল, তোমার শুড়ের মতই আমার সীতার কোমর। হাতির শরীর ও অন্য নানা রকমের বর্ণনা করে সীতার সাথে হাতির তুলনা করছেন।

শোকে মানুষ উদভ্রান্ত হতেই পারে, উদভ্রান্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শ্রীরামচন্দ্রের এই ধরণের আচরণ আমাদের কাছে একটু অস্বাভাবিক ও বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু প্রচণ্ড শোকের গভীরতায় মানুষের কি ধরণের আচরণ করতে পারে বাল্মীকি তারই একটা কাল্পনিক রূপকে কাব্যিক ঢঙে বোঝাতে চাইছেন। ঠাকুরও মানুষের শোকের কথা কথামৃতে উল্লেখ করেছেন, স্বামীর কাছ থেকে যখন স্ত্রী হারিয়ে যায় বা স্ত্রীর কাছে থেকে যখন স্বামী চিরদিনের মত হারিয়ে যায় তখন তাদের যে শোক হয় কথামৃতে ঠাকুরও তার উল্লেখ করছেন। শ্রীমায়ের জীবনে কত শোক এসেছিল, সংসারের এই শোক তাপকে ভুলবার জন্য তিনি তো একবার বৃন্দাবনেই চলে যান। এতো গেল যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদের শোক, কিন্তু যারা সাংসারিক তাদের জীবনে যে শোক আসে তাতে তারা যে কষ্ট পায় তা কল্পনাই করা যায় না।

শোক মাত্রই অতি কষ্টদায়ক, সংসারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলছেন – শোক আর মোহই সংসার। শোক মানে – একটা জিনিষ আমার হাত থেকে চলে গেছে, আর মোহ হল – যে জিনিষটা আমার কাছে নেই সেই জিনিষকে আমি পেতে চাইছি। শোক আর মোহ এই দুটোকে নিয়েই সংসার। এই দুটোই অপূর্ণতার লক্ষণ। আমাদের সবারই মধ্যে অপূর্ণতা। এই অপূর্ণতাই শোক আর মোহ রূপে ঠিক ঠিক প্রকাশ পায় – একটা জিনিষ নেই সেটা পেতে চাইছি, আর একটা জিনিষ আমার ছিল সেটা চলে গেছে। যে মানুষের শোক আর মোহ নেই সেই তো মহাপুরুষ। মানুষের যত দুঃখ-কষ্ট এই দুটো জিনিষ থেকেই আসে। শোক আর মোহে উভয় ক্ষেত্রে আমাদের দুটো হাতই রিক্ত থাকে – হাতে যেটা ছিল সেটা চলে গেছে, আর হাতে একটা জিনিষ নেই সেটা পেতে চাইছি, কিন্তু পাওয়া যেতে পারে, দুটো ক্ষেত্রেই রিক্ত।

যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছেন তাঁদের মনের মধ্যে কি কোন মোহ আছে যে আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারি, কিংবা পেলে বা মারাদোনার মত ফুটবলার হব? এগুলো নিয়ে আমাদের কারুরই মোহ হবে না, কারণ আমি জানি চেষ্টা করলেও এর কোনটাই আমি হতে পারব না। মোহ হয় যেটা আমি পেতে পারি, যেটা আমি হতে পারি। তবে একটা স্তরে গিয়ে প্রত্যাশাও বাড়তে পারে, যে আগে একটা মোষ চড়াত সে যদি কোন রকমে একটা এমপি হয়ে যায় তখন সে আশা করে আমি মন্ত্রী হলেও হতে পারি। মন্ত্রী হলে এরপর সে আশা করতে পারে আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেও হতে পারি। এই চাওয়া পাওয়ার প্রত্যাশার মাত্রাটা ধাপে ধাপে বাড়ে। সেইজন্য বলে মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। যে বাচ্চা বয়সে মোষ চড়াত সেখান থেকে যেমন যেমন উঠতে থাকে তেমন তেমন তার মোহটাও বাড়তে থাকে। আর যেমন যেমন ধাক্কা খেতে থাকে তেমন তেমন কষ্টও পেতে থাকে। শ্রীরামচন্দ্রও এখন এই শোকের করাল রূপের বশীভূত হয়ে গেছেন।

এতক্ষণ যাবৎ শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটীর কাছাকাছিই সীতার খোঁজ করছিলেন। পঞ্চবটীতে সীতার কোন সন্ধান না পেয়ে এবার তিনি এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে ছুটে যাচ্ছেন। কোথাও তিনি সীতার শাড়ির রঙের মত কিছু দেখলেই উদভ্রান্তের মত দৌড়ে সেখানে চলে যাচ্ছেন। আবার কখন কোথাও একটুও কোন ইঙ্গিত না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে উঠছেন। শ্রীরামচন্দ্র এখন কখন উদ্‌ভ্রান্ত আবার কখন বিভ্রান্ত, মানে সীতার কোন কিছুর সঙ্গে মিল দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বাচ্চাদের মত লাফিয়ে উঠছেন, কাছে গিয়ে যখন দেখছেন এটা সীতা নয়, তখন আবার বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্র এখন নানান ভাবে বিলাপ করে যাচ্ছেন।

শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করে লক্ষ্মণকে বলছেন – হে লক্ষ্মণ, এই জঙ্গলে সীতাকে সর্বদা আমার পাশে পেয়েছিলাম বলে আমি যা কিছু হারিয়েছি, আমার রাজ্য হারিয়েছি, আমার রাজপুরীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য হারিয়েছি, সীতা কাছে থাকার জন্যই সব কিছু হারাবার শোক তাপ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল, এগুলো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কাছ থেকে সীতার বিয়োগ হয়ে যাওয়ায় আবার সব পুরনো শোক তাপগুলো উঠে এসেছে। যেন শুকনো কাঠের সংযোগে নির্বাপিত আগুন আবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছে। শ্রীরামচন্দ্র বলতে চাইছেন – শুকনো লতাপাতার স্তুপ আগুন জ্বলে জ্বলে নিবে গেছে, কিন্তু ভেতরে এখনও একটু আগুন যেন ছাই চাপা হয়ে রয়েছে, তার মধ্যে যদি এখন শুকনো লতাপাতা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আগুন আবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠবে। এখানে আগুন মানে শোক। শ্রীরামচন্দ্রের কিসের দুঃখ? অযোধ্যা হারিয়েছেন, বাবাকে হারিয়েছেন, রাজসুখ হারিয়েছেন। সীতা সঙ্গে আছে বলে এই দুঃখ কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। এখন সীতা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়াতে আবার সেই দুঃখটা তাঁর চাড়া দিয়ে উঠেছে। শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করেই চলেছেন, আর সীতার বর্ণনা করছেন। বাল্মীকি একজন ঋষি ছিলেন ঠিকই কিন্ত তিনি যেভাবে এসবের নিখুঁত বর্ণনা করেছেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাঁর শৃঙ্গার রস আর সৌন্দর্য বোধের সাঙ্ঘাতিক জ্ঞান ছিল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত শ্রীরামচন্দ্র চারিদিকে সীতার অন্বেষণ করে চলেছেন। হঠাৎ তাঁরা দেখতে পেলেন শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে দেখে দুটো হরিণ বার বার মুখটা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এগিয়ে দিয়ে যেন বলতে চাইছে আপনারা আরও দক্ষিণ দিকে যান। পশুরাও যেন বুঝতে পেরেছে কি ঘটে গেছে আর শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দুজনে কাকে খুঁজছেন এটাও যেন বুঝে গেছে।

হরিণের ইশারাকে সম্বল করে দুজন এবার আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। লঙ্কার অবস্থান নিয়ে অনেক বিতর্ক চলে। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে মনে করেন মধ্যপ্রদেশের বস্তার অঞ্চলকেই বাল্মীকি লঙ্কা বলে জানতেন, কারণ বাল্মীকির ধারণা এই অতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আবার অনেক পণ্ডিতরা এই ধারণার সাথে একমত নন। আমরা যদি মনে নাও করি যে ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বর দিচ্ছেন তুমি যা দেখতে চাইবে বুঝতে চাইবে, চিন্তা করলেই সব দেখে নিতে পারবে, কিন্তু যারা লেখক হন, কবি হন তারা দশ দেশের দশ রকম কথা জানেন। এনারা লোকেদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন, কিংবা হাঁটতে হাঁটতে

দেশ ভ্রমণে যেতেন, যেতে যেতে বিভিন্ন মানুষ জনের সাথে তাঁদের পরিচয় হত, বিভিন্ন মানুষের থেকে নানান জিনিষের ধারণা করে নিতেন। আবার অন্য দিকে আমরা পাই অগস্ত্য মুনি ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভারতে পৌঁছে গেছেন, তারপর আরও অনেকেই দক্ষিণ দেশে ঘুরে আবার ফিরেও এসেছেন, বাল্মীকি তাদের কাছেও অনেক বর্ণনা শুনেছেন, সেই বর্ণনা থেকে তিনি তাঁর কল্পনার দ্বারা অনেক কিছুকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। আরও মজার ব্যাপার হল, আজকের শ্রীলঙ্কা কিছু দিন আগে পর্যন্ত পুরোপুরি হিন্দু দেশ ছিল, আর ওদের যে রাবণের প্রতি বিশেষ কোন ভক্তি ছিল তাও নয়।

শ্রীলঙ্কার এই পরিবর্তনের পেছনে দুটো জিনিষ প্রধান – প্রথমতঃ শ্রীলঙ্কায় ভগবান বুদ্ধের প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় বিস্তার করাতে পরের দিকে শ্রীলঙ্কাবাসী জনসংখ্যার বেশির ভাগই পরের দিকে বৌদ্ধ হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়তঃ সম্রাট অশোকের ছেলে আর মেয়ে মহেন্দ্র আর সঙ্ঘমিত্রা শ্রীলঙ্কাতে বসবাস করতে থাকেন। প্রথম দিকে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্মী খুবই কম ছিল কিন্তু পরের দিকে অনেকেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চল যেটা ভারতের দিকে, সেই অঞ্চলটা হিন্দুদের প্রাধান্য। অন্য দিকে দক্ষিণাঞ্চলের বেশির ভাগই বৌদ্ধ। বৌদ্ধ হলেও এরা কিন্তু রাম, সীতা, হনুমানের পূজা করে। পরের দিকে নীচু জাতের পেরিয়ার বলে একজন ছিলেন, তিনি সেখানে ব্রাহ্মণদের হাতে খুব নিপীড়ত হন। তারপর থেকেই তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। সেউ থেকেই দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে হিন্দী ভাষাকে গালাগাল, হিন্দু ধর্ম, হিন্দুদের গালাগাল দেওয়া, উত্তর ভারতের যত নেতা ছিল তাদের গালাগাল দেওয়া প্রচণ্ড ভাবে শুরু হয়ে গেল। এই ডিএমকে দল পেরিয়ারের হাতেই তৈরী, যে ডিএমকে থেকে আবার এডিএমকে বেরিয়েছে। পেরিয়ারের উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু ধর্মের যা কিছু ভালো আছে সেটাকে সমূলে নাশ করা। আর এই নাশ করার কাজ কোন লুকোচুরি করে করা হচ্ছিল না, একেবারে প্রকাশ্যেই করা হচ্ছিল। এইভাবে চলতে চলতে হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ হতে হতে একটা সময় থেকে এরা বলা শুরু করল যে রাবণ ছিলেন দক্ষিণ ভারতের লোক আর রামায়ণ হল উত্তর ভারতের লোকেরা যে দক্ষিণ ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল তারই কাহিনী। তামিলদের মধ্যে এখনও অনেকেই এই ধারণা পোষণ করে। অথচ শ্রীরামচন্দ্রের যত নামকরা মন্দির সব দক্ষিণ ভারতেই স্থাপিত হয়েছে। আর রামভক্ত সারা দেশে ছড়িয়ে আছে, কৃষ্ণভক্ত থেকে রামভক্ত ভারতবর্ষে অনেক বেশি।

এই প্রশ্নগুলোকে যদি ঠিক ঠিক যুক্তি ও তথ্য দিয়ে আলোচনা করা যায় তাহলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বেরিয়ে আসবে, তা হল উত্তর ভারতের দক্ষিণ ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করা আর তার জন্য দুই অঞ্চলের লড়াই হওয়াটা মোটেই সঠিক তথ্য নয়। তার কারণ অগস্ত্য মুনি দক্ষিণ ভারতে তার অনেক আগেই চলে গেছেন, তাঁর সাথে বেদের যজ্ঞাদিও চলে গিয়েছিল। আর রামায়ণেও বর্ণনা আছে যেখানে মেঘনাদ, ইন্দ্রজিৎ এরা সবাই শক্তি পাওয়ার জন্য বৈদিক যজ্ঞ করছে। এখন গবেষণা অনেক উন্নত হয়েছে, এই উন্নত গবেষণার ফলশ্রুতিতে দ্রাবিড় দেশ বলে যে আলাদা একটা দেশ ছিল, এই তত্ত্বটাই উঠে গেছে। বরঞ্চ যেটা বেশি করে গবেষণার মাধ্যমে সামনে এসেছে তা হল বৈদিক যুগ থেকেই ভারত এক অখণ্ড দেশ ছিল। তবে বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীলঙ্কার যা বর্ণনা আছে তারপর আর কোন সন্দেহই হয় না যে আজকের শ্রীলঙ্কাই রামায়ণের বর্ণিত লঙ্কা। পণ্ডিতদের একাংশ কি করে বার করলেন যে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলাকেই রামায়ণে লঙ্কা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে সত্যিই এর কোন রহস্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

যাই হোক, শ্রীরামচন্দ্র দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছেন, হরিণ দুটিও একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে আবার কিছু পরে পরে থেমে যাচ্ছে, একটু দাঁড়িয়ে আবার কিছুটা এগিয়ে থেমে যাচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্রকে যেন বলতে চাইছে তোমরা আমাদের পেছনে পেছনে এসো। যেতে যেতে শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন রাস্তায় কিছু ফুল পড়ে রয়েছে। গাছের নীচেই ফুল থাকার কথা, কিন্তু জঙ্গলে রাস্তার মাঝখানে ফুল দেখেই একটু আশার আলোতে শ্রীরামচন্দ্র উৎফুল্ল হয়ে বলছেন – আরে এতো সীতার ফুল, আমি নিজের হাতে সীতার চুলে লাগিয়েছিলাম। এখন তিনি বুঝতে পারলেন যে সীতাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। শ্রীরামচন্দ্র ভাবছেন এই

যত পাহাড় গুলো আছে এরা হয়তো সীতাকে কোথাও তাদের গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন আমি সমস্ত পাহাড়কেই শেষ করে দেব।

শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে নানা রকমের কল্পনা করে যাচ্ছেন, এই হতে পারে সীতার, নয়তো এটা হতে পারে। এই সব ভাবতে ভাবতে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন – হে লক্ষ্মণ! এইবার দ্যাখো আমি এক্ষুণি এমন বাণ ছাড়ব যে এই তিনলোককে আমার বাণ দিয়ে এমন ভাবে ঘিরে ফেলব যে এই তিনলোকে যত প্রাণী আছে তারা কেউ আর নড়াচড়া করতে পারবে না। যত গ্রহ আছে তাদের গতি থেমে যাবে। এই বাণের প্রভাবে চাঁদ লুকিয়ে যাবে, অগ্নি, মরুৎগণ, সূর্য এদের সবার তেজ হরণ হয়ে যাবে। পাহাড়ে যত চূড়া আছে সব আমি চূর্ণ করে দেব। যত জলাশয় আছে তার সব জল শুষে নেব, এমনকি সমুদ্রকেও আমি নাশ করে দেব। যদি এক্ষুণি আমি সীতাকে ফিরে না পাই, তাহলে আমি পুরো জগৎকে ধ্বংস করে দেব। আমি সমগ্র চরাচরকে বাণে এমন ভাবে ভরিয়ে দেব যে কোন পাখি আর ডানা বিস্তার করে আকাশে উড়তে পারবে না, কোন পশু নড়তে পারবে না, সব কিছুরই নাশ হয়ে যাবে। এইসব বলেই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দেখিয় বলছেন – এই দ্যাখো লক্ষ্মণ এইবার আমি শুরু করছি।

শ্রীরামচন্দ্রের এই অগ্নিশর্মা চেহারা আর কথা শুনে আবার বাণ চালাবার জন্য উদ্যোগ নিতেই লক্ষ্মণ খুব ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ে গিয়ে লক্ষ্মণ বলছেন – **পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তঃ সর্বভূতহিতে রতঃ। ন ক্রোধবশমাপন্নঃ পকৃতিং হাতুমর্হসি।**।৩/৬৫/৩। হে রামচন্দ্র! আপনি চিরদিন মৃদু স্বভাবের মানুষ, আপনি জিতেন্দ্রিয়, নিজের ইন্দ্রিয়কে জয় করে রেখেছেন আর আপনি *সর্বভূত হিতে রতঃ*। এই যে লক্ষ্মণ বলছেন *সর্বভূতহিতে রতাঃ*, এটাই আধ্যাত্মিকতার শেষ লক্ষণ। কেউ যদি আমাদের জিজ্ঞেস করে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ কি? আধ্যাত্মিকতার একটাই লক্ষণ, একজন মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আছে কিনা একটা জিনিষ দিয়েই বোঝা যাবে। সেই জিনিষটা, সেই লক্ষণটা কী? *সর্বভূতহিতে রতঃ।* যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ একটা পিঁপড়ে থেকে শুরু করে দেবতা পর্যন্ত, সবারই মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকবেন। যদি কেউ অপরের মঙ্গল চিন্তা করে না সে কখন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হতেই পারবে না। কোন কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে সমস্ত প্রাণীর প্রতি করুণার অভাবই ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার মূল কারণ। তাঁরা প্রথমেই বলে দিলেন আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যারা ভিন্ন মত পোষণ করবে তাদের নির্বিচারে হত্যা কর। এখানেই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিকতার বিচারে অন্যান্য ধর্ম হিন্দু ধর্মের কাছে দাঁড়াতেই পারে না। আবার কিছু কিছু ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রধান প্রবক্তার মধ্যে এই ধরণের কোন জেহাদ না থাকলেও পরবর্তী কালে তাঁর অনুগামীরা তরোয়াল দিয়ে তাদের ধর্মকে অনুসরণ করতে বাধ্য করত। কিন্তু ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে হিন্দুদের এই ধরণের কোন পন্থাই অবলম্বন করতে দেখা যায়নি। হিন্দু ধর্ম প্রথম থেকেই বলে আসছে অহিংসা পরমো ধর্ম। তাহলে অনেকে বলতে পারে হিন্দুদের তো ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় ছিল, তারা তো অস্ত্র চালাত। হ্যাঁ, হিন্দুদের ক্ষত্রিয় একটা বর্ণ ছিল ঠিকই, এরা সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, যদি কেউ আক্রমণ করে তখন তারা নিজেদের রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করবে, যুদ্ধ যেটা করবে সেটাও আবার ধর্মযুদ্ধ করবে, অধর্ম যুদ্ধ করবে না। এর বাইরে আর কোন ব্যাপারে হিন্দু অস্ত্র ধারণ করবে না। হিন্দু ধর্মের উচ্চ আদর্শই হল *সর্বভূতহিতে রতাঃ*, এটাই আধ্যাত্মিকতার প্রধান লক্ষণ। যদি কেউ বলেন আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছি, আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, কি করে বুঝব তিনি সত্যি না মিথ্যা বলছেন? এর একটাই পরীক্ষা, সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলে তিনি কি নিজেকে নিয়োজিত করছেন? ঠাকুরের জীবনের দিকে তাকালে কোথাও দেখা যাবে না যে তিনি কাউকে ছোট করছেন, কাউকে অপমান করছেন, কাউকে কষ্ট দিচ্ছেন। স্বামীজীর জীবনও একই রকম ছিল। তবে কাউকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যখন দেখলেন একে একটা ধাক্কা দিলে এর ভালো হবে, তখন একটা ধাক্কা দিতেন। তার মানে তিনি পুরোপুরি শান্ত, কিন্তু তাই বলে তিনি এটাকে ধরে রাখবেন না। একেই ঠাকুর বলছেন, ফোঁস করবি কিন্তু বিষ ঢালবি না।

ফোঁস করা মানে আত্মরক্ষা করা। আত্মরক্ষার জন্য আমাকে সব রকম ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ আমি তো এখনও আত্মজ্ঞানী হইনি। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান, তা ঈশ্বর দর্শনেই হোক আর ব্রহ্মজ্ঞানেই হোক। আত্মজ্ঞান যতক্ষণ কারুর না হচ্ছে ততক্ষণ তাকে প্রাণপনে তার নিজের শরীর, মন ও বুদ্ধিকে রক্ষা করে যেতে হবে। সুষম খাদ্য আহার করা, ভালো পরিষ্কার জামা কাপড় পরিধান করা, উপার্জন করা, ভোগ করা সব কিছুই তাকে করতে হবে। কেন এগুলো করতে হবে? আত্মজ্ঞান এখনও হয়নি বলে। বেশির ভাগ লোক বাইরে সন্ন্যাসীর মত হাবভাব, দীনহীন কাঙালীর মত সাজ কিন্তু ভেতরে কামনা-বাসনা সব গিজ্‌গিজ্‌ করছে। এই দুমুখো আচরণের জন্যই কোন দিকেই কিছু হয় না, না আধ্যাত্মিক না জাগতিক অভ্যুদয়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তুমি ফোঁস করবে কিন্তু বিষ ঢালবে না, মানে কারুর ক্ষতি তুমি করবে না। তোমার আত্মজ্ঞান হোক আর নাইই হোক ক্ষতি তুমি কারুর করবে না। যখন আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে তখন তোমার শরীর থাকল কি থাকল না, মন রইল কি রইল না, তাতে কিছু আসে যায় না। তখন কিন্তু সে *সর্বভূতহিতে রতঃ*, যে তোমার ক্ষতি করতে আসবে তারও তুমি ভালো করবে। তার আগে বলা হয়েছিল যে তোমার ক্ষতি করতে আসছে তাকে ফোঁস করে আটকাবে।

এইসব বলে লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, সেইজন্য আপনি আপনার ক্রোধকে সম্বরণ করুন। শ্রীরামচন্দ্র যেটা করতে চাইছেন এটা বিষ ঢালা হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ বলছেন – **একস্য নাপরাধেন লোকন্ হন্তুং ত্বমর্হসি**।৩/৬৫/৬। একজন কেউ দোষ করেছে তার জন্য আপনি সমস্ত বিশ্বের প্রাণীকূলকে বিনাশ করে দেবেন! ইংরেজদের সময় রেলওয়েতে পিটুনি ট্যাক্স চালু করা হয়েছিল। তখনকার দিনে ট্রেনে কেউ চেন টানলে ধরার উপায় ছিল না কে চেন টেনেছে। কিন্তু যে গ্রামের কাছে চেন টানা হত সেই গ্রামের সবারই ওপর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর ধার্য করে দিত। তোমাদের গ্রামে চেন টানা হয়েছে তাই গ্রামের সবাইকে ফাইন দিতে হবে। এটাকে বলা হত পিটুনি ট্যাক্স। গ্রামের লোকরা ঠিক জানত বা বুঝতে পারতো কে চেন টেনেছে, এখন সবাইকে যাতে ট্যাক্স দিতে না হয় সেইজন্য আসল লোককে ধরে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে শুরু করল। আস্তে আস্তে চেন টানাও বন্ধ হয়ে গেল।

যাই হোক, মাটিতে রথের চাকার দাগ দেখে বুঝেছেন এখানে কেউ রথ নিয়ে এসেছিল। লক্ষ্মণ বলছেন 'দাদা আপনি এইভাবে ক্রোধ করবেন না, আগে আমরা বার করি কে রথ নিয়ে এখানে এসেছিল। এরপর আমরা সীতাদেবীকে উদ্ধার করার সব রকমের প্রচেষ্টা চালাব, কিন্ত আপনি এভাবে রাগ ও ক্রোধে বশীভূত হয়ে ভেঙ্গে পড়বেন না। শীল, স্বভাব, সাম, নীতি, বিনয় ও ন্যায় – যত ভালো ভালো উপায়গুলো আছে, এই সমস্ত উপায়গুলোই আমার গ্রহণ করে সীতাদেবীর অন্বেষণ করব, তারপরেও যদি সীতাদেবীকে না পাওয়া যায় তখন ন হয় সমস্ত লোকের সংহার করা যাবে। আমরা তো এখনও কোন চেষ্টাই করলাম না, চেষ্টা না করেই কারুর বিনাশের চিন্তা করাটা উচিৎ কাজ হবে না'। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের এখনও ক্রোধ প্রশমিত হয়নি, আর লক্ষ্মণ তাঁকে বুঝিয়েই যাচ্ছেন।

লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন – **আশ্বসিহি নরশ্রেষ্ঠ প্রাণিনঃ কস্য নাপদঃ**।৩/৬৬/৬। – হে রাজন্! হে নরশ্রেষ্ঠ! এই জগৎ সংসারে এমন কে আছে যার উপর কোন আপদ বিপদ আসে না? যারই জন্ম হয়েছে তার উপরই বিপত্তি আসে। যেমন কোথাও আগুন জ্বলছে, সেই আগুনের তাপ কিছুক্ষণের জন্য গায়ে স্পর্শ করে আবার চলে যায়, আপদ, সমস্যা এগুলোও এভাবেই আসছে, স্পর্শ করে চলে যাচ্ছে, আর তার জন্য এত রাগ আর ক্রোধ করার কি আছে! অগ্নি একটু স্পর্শ করেছে বলে আপনি যদি সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেন তাহলে এই প্রজাকুল কার কাছে আশ্রয় নেবে! কারণ আপনি তো রাজা। বাচ্চাকে যদি কেউ মারতে আসে বাচ্চা ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু মা যখন নিজেই বাচ্চাকে মারে তখন বাচ্চা কোথায় যাবে? বাচ্চা আরও বেশি করে মাকে জড়িয়ে ধরে, কিংবা মায়ের শাড়ির আঁচলে নিজেকে জড়িয়ে নেয়, মা ছাড়া বাচ্চার আর তো কোথাও যাবার নেই। আপনি তো প্রজাদের মা, আপনি

সবারই শরণদাতা, আর আপনিই যদি এভাবে সমস্ত লোককে বিনাশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে আপনার বাচ্চারা যাবেটা কোথায়! আপনি হলেন বিশ্ববন্দিত জগন্মাতা।

লাটু মহারাজ স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করছেন – ভাই লোরেন, তুমি এত জায়গায় গেলে, এত জায়গায় ঘুরলে, পৃথিবীর পূজা হয় এটা কি তুমি কোথাও দেখেছে? আসলে ভূদেবীর পূজা কোথাও হয় না। বাল্মীকি বলছেন – সর্বলোক নমহস্তুতা কে? **যা চেয়ং জগতো মাতা সর্বলোকনমস্কৃতা।**৩/৬৬/১০। আমরা যেমন শ্রীশ্রীমাকে বলছি জগন্মাতা, বাল্মীকি এইখানে জগন্মাতা বলতে পৃথিবীকে সম্বোধন করছেন। যত প্রাণি ও জীব আছে সবারই মাতা হলেন এই পৃথিবী। লক্ষ্মণ বলছেন – **অস্যাশ্চ চলনং ভূমের্দৃশ্যতে কোশেলশ্বর।**।৩/৬৬/১০। ইনি সব কিছুকে ধারণ করে আছেন। এই পৃথিবীও মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে। বাল্মীকি তখনও জানতেন না যে পৃথিবী সব সময়ই চলছে, তিনি জানতেন পৃথিবী মাঝে মাঝে চলছে। অথবা বাল্মীকি ভূমিকম্পের কথাও বলতে পারেন। যে পৃথিবী সবাইকে ধারণ করে আছে সেও মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। ধর্মের যারা প্রবর্তক, সংসারের যারা নেত্র, এই সূর্য আর চন্দ্র, যাঁদের কল্যাণে এই প্রকৃতি দাঁড়িয়ে আছে, এরা এত শক্তিশালী কিন্তু এদেরকেও রাহু আর কেতু গ্রাস করে নেয়। যারা বড় বড় সুরবীর, মহাপুরুষ আর – **সুমহান্ত্যপি ভূতানি দেবাশ্চ পুরুষর্ষভ।**৩/৬৬/১২। মানুষ, দেবতা বা ভূত, ভূত বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে কোন জীব, দেখা যায় এরাও দৈব থেকে মুক্ত হতে পারেনা। তাই যারা সাধারণ দেহধারী প্রাণি তাদের আর কি কথা। **মৃতায়ামপি বৈদেহ্যাং নষ্টয়ামপি রাঘব।**/৩/৬৬/১৪। – হে রাঘব, যদি সীতা মরে যায়, কি নষ্টা হয়ে যায় তাহলে কি করবে – **শোচিতুং নার্হসে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা।**।৩/৬৬/১৪। প্রাকৃত লোক যারা, সংসারী লোক যারা, যারা ভুক্ত হয়, আপনি দয়া করে তাদের মত শোক করবেন না। হারানোর কথা ছেড়েই দিন, আমরা তো এখন সীতাকে খুঁজিইনি, খোঁজা তো পরে হবে, যদি আমরা সীতার মৃতদেহও পাই, তাহলেও আপনি প্রাকৃত মানুষের মত শোক করবেন না।

প্রাকৃত শব্দের মানে হয় মুর্খ, যারা অতি সাধারণ লোক। প্রাকৃত শব্দ এসেছে প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতি শব্দের ইংরাজী অর্থ natural বা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা অনেক সময় বলি be natural, মানে স্বাভাবিক হও। তাহলে এখানে স্বাভাবিক হওয়ার অর্থ হবে, তুমি মুর্খ হয়ে যাও, যেমনটি জন্মেছিল বোকা মুর্খ, তেমনটি হয়ে যাও। যখন কাউকে সংস্কার করা হয়, মানে তাকে ভাষা শেখানো হচ্ছে, ব্যবহার শেখানো হচ্ছে, সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কৃতি শেখানো হচ্ছে, বুদ্ধি বাড়ান হচ্ছে তখন সে হয়ে যাচ্ছে প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃত। সংস্কার করা মানে যখন তাকে ঘষা-মাজা করা হচ্ছে। যতক্ষণ সুসংস্কৃত করা হয়নি ততক্ষণ তারা কি অবস্থায় থাকবে? প্রাকৃত অবস্থাতেই থাকবে, যেমনটি জন্মেছিল তেমনটিই আছে, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। কারণ তার কোন পড়াশোনা নেই, কালচারাল কোন কিছু নেই, তার বড় হবার প্রবণতা নেই, তখন যা হোক তা হোক করে একটু খাওয়া-পড়া হলেই হয়ে গেল, শোওয়া-বসার একটা জায়গা হলেই হল আর তার সাথে একটা বিয়ে হয়ে গেলেই সব কিছু মিটে গেল।

এই অবস্থায় যখন এদের বউ মরে যায়, টাকা চলে যায়, ঘরবাড়ী চলে যায় তখন চিৎকার করে কাঁদবে। এটাই লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন, সীতা যদি মরেও যায়, তাহলেও আপনি দয়া করে এদের মত আচরণ করবেন না। এরা প্রাকৃত, এদের কোন সংযম নেই, কোন সংস্কার করা হয়নি। যারা ভদ্র ও অপ্রাকৃত তারা সহজে মুখ খুলবে না। হে শ্রীরামচন্দ্র – *শোচিতুং নার্হসে* – এই কথাই নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ বোঝাতে চাইছেন 'সীতা যদি মরে গিয়েও থাকে আপনি প্রাকৃত পুরুষের মত আচরণ করবেন না, এই ধরণের আচরণ আপনার মত পুরুষের পক্ষে একেবারেই শোভা পায় না। দাদা এর আগে আপনি অনেক বার এই একই কথা আমাকে অনেক বলে বলে বুঝিয়েছিলেন'। লক্ষ্মণ যখন রেগে বলেছিল বাবাকে জেলে ঢুকিয়ে দেব আর ভরতের হয়ে যে দাঁড়াবে তাকে মেরে ফেলব, তখন শ্রীরামচন্দ্রই লক্ষ্মণকে বুঝিয়ে শান্ত করেছিলেন। কিন্তু শোক তাপ পেয়ে পেয়ে শ্রীরামচন্দ্রের এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে তিনি আর এই কষ্ট নিতে পারছেন না। লক্ষ্মণ বলছেন 'দাদা, আপনাকে উপদেশ দেওয়ার ক্ষমতা স্বয়ং বৃহস্পতি, যিনি

দেবতাদের গুরু, এত বড় জ্ঞানী, তার মধ্যেও নেই, আপনি এমনই জ্ঞানী পুরুষ। আপনি আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে যা যা কথা আগে আগে বলেছিলেন সেই কথাই আমি আপনাকে বলছি'।

এইভাবে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে রাস্তায় আহত মুমূর্ষু জটায়ুর সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের দেখা হয়েছে। জটায়ু শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন 'আমার রাবণের সাথে যুদ্ধ হয়েছে, সীতাকে সে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে রাবণকে আটকাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমার ডানা কাটা যেতে আকাশে আর থাকতে না পেরে আমি এখানে পড়ে গেছি'। সব খবর দিয়ে জটায়ু ঐখানে মারা গেল। শ্রীরামচন্দ্র বিধিবৎ জটায়ুর মৃতদেহের দাহ সংস্কার করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ আরও এগিয়ে যেতেই কবন্ধ নামে আরেকটি রাক্ষসের সাথে দেখা হয়েছে। এই কবন্ধের আবার এক লম্বা কাহিনী আছে। কবন্ধ অমরত্ব লাভ করেছিল। কবন্ধের উপর একবার বজ্র চালান হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু অমরত্বের বর ছিল তাই সে মরল না, কিন্তু ওর মাথাটা ঢুকে গেলে পেটে। এর মুণ্ডু বলে কিছু ছিল না। এখন কবন্ধ খাবে কি করে, কারণ মাথাটা ঢুকে গেছে পেটে। তখন তার হাত দুটোকে এক মাইল লম্বা করে দেওয়া হল, আর বলে দেওয়া হল এই এক মাইলের মধ্যে যা কিছু প্রাণি ধরতে পারবে সেই সব প্রাণিকে তুমি গ্রাস করতে পার। কবন্ধ একটা জায়গায় পরে থাকত, নড়াচড়া করতে পারত না, হাতের নাগালে যখন কোন জীবজন্তু এসে যেত সেটাকেই ধরে সে খেয়ে নিত। জঙ্গলে যেসব পশুপাখিরা থাকে তারাও বুঝে যায় কোথায় আমার বিপদ আছে, কোথায় গেলে আমি মারা যেতে পারি, কোথায় থাকলে আমার বাঁচার সম্ভবনা নিশ্চিত। কবন্ধের এলাকার মধ্যে ঢুকে গেলে বিপদ হতে পারে এই ব্যাপারটাও পশুপাখিরা এতদিনে বুঝে গেছে। ভুল করে যদি কোন পাখিটাখি এসে পরে তখন কবন্ধ তাদের খেয়ে বেঁচে থাকে।

কবন্ধের এই বিচিত্র কাহিনীকে অনেকে মনে করতে পারেন এটা কবির একটা নিছক কল্পনা মাত্র। কবির কল্পনা যদিও বা হয়ে থাকে কিন্তু তার মধ্যেও কোথাও একটা বাস্তবতা থাকা চাই। কল্পনা যাই হয়ে থাকুক না কেন, সব কল্পনারই একটা উৎস থাকে। কবির মনে কবন্ধের এই কল্পনাটা কিভাবে এসেছে? পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে আমরা জানছি আগেকার দিনে অসুররা ছিল। এখন অসুর বলে কিছুই ছিল না এই একটি কথা দিয়ে সমস্ত অসুরকুলকে কখনই অস্বীকার করা যাবে না। কিছু একটা সত্যতা ছিল যেটা দেখে কবির মনে অসুরের কল্পনা জেগেছিল। এখানে কবন্ধের কাহিনীতেও ঠিক তাই হয়েছে। বাল্মীকি হয়তো অজগর সাপের কথা শুনেছেন বা নিজে দেখে থাকবেন। এরপর তিনি অজগর সাপের কিছু বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে এই কবন্ধের মত একটা চরিত্রকে কাব্যিক শৈলী দিয়ে অঙ্কন করেছেন। অজগর এক জায়গাতে তার বিরাট শরীর নিয়ে পড়ে থাকে, আর তার মুখের সামনে যা প্রাণি এসে পড়বে তাকেই টেনে নিয়ে গিলে নেয়। কবন্ধের হাত দুটোকে অজগরের সাপের দেহের সাথে কল্পনা করা হয়েছে। এই একই ধরণের ধারণা মহাভারতে নহুষের কাহিনীতেও নিয়ে আসা হয়েছে। যাঁরা কবি হন, আর তিনি যদি গভীর অনুভূতি সম্পন্ন হন তখন তাঁরা কোন একটা জিনিষকে দেখে তার বৈশিষ্ট্যটাকে নিয়ে আরেকটা জিনিষের উপরে ফেলে দেবেন, যার উপরে ফেলে দিলেন সেখান থেকে আরেকটা নতুন চরিত্র তৈরী হয়ে যাবে। বাল্মীকি অজগর সাপের বৈশিষ্ট্যকে কবন্ধের উপরে ফেলে দিয়ে একটা কাহিনীকে তৈরী করে দিলেন। যখন একজনের বৈশিষ্ট্য আরেকজনের উপরে ফেলে দেওয়া হয় তখন পরের চরিত্রটাকে একটা অদ্ভুতই মনে হবে, যেমন এখানে কবন্ধকে মনে হচ্ছে।

কবন্ধের নীচের অংশটাই শুধু আছে, উপরের মাথাটাই নেই। কবন্ধের সীমানায় প্রবেশ করতেই সে শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে তার হাত দিয়ে ধরে নিয়েছে, এবার দুজনকে গিলে খেয়ে নেবে। অজগরও ঠিক তাই করে, ওর এক্তিয়ারের মধ্যে যে চলে আসবে সে আর বাঁচতে পারবে না, আর তাকে গোটাই গিলে ফেলবে। কবন্ধও গোটা গিলে ফেলে। অনেক দিন আগে খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল রাঁচির ঐদিকে কোন আদিবাসী এলাকায় একটা অজগর সাপ মানুষের একটা বাচ্চাকে গিলে ফেলেছিল। বাচ্চাটার

মায়ের চেঁচামেচিতে পাড়ার লোকরা সঙ্গে সঙ্গে এসে অজগর সাপটাকে ঘিরে ফেলে পেটটা চিড়ে বাচ্চাটাকে বার করে নিয়ে আসে। দেখা গেল বাচ্চাটা তখনও বেঁচে রয়েছে, জীবন্তই বার করে আনা হয়েছিল। আসলে যে এ্যাসিড দিয়ে হজম হতে থাকে সেই এ্যাসিডের ক্রিয়া তখনও বাচ্চাটার উপর শুরু হয়নি।

শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে কবন্ধ তার দুই হাত দিয়ে ধরে নেওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র টের পেয়ে গেছেন এর হাতে প্রচণ্ড শক্তি, আর এর যত শক্তি সব হাতেই। তিনি লক্ষ্মণকে বলছেন 'ভাই এর হাত দুটোকে তরোয়াল দিয়ে কেটে দিলেই হবে'। হাত কেটে দিতেই কবন্ধ অবাক হয়ে বলছে 'আপনারা কারা? আপনাদের এত শক্তি যে আমার হাতকে কেটে দেওয়ার মত বল আপনাদের শরীরে আছে? কবন্ধ তখন তার নিজের কাহিনী বলতে আরম্ভ করেছে। 'আমি হলাম দেবলোকের একজন বাসিন্দা, কিন্তু অভিশাপের ফলে আমার এই অবস্থা হয়েছে। তবে অভিশাপ থেকে মুক্তির কথা জানতে চাইলে বলা হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্র এসে যখন তোমার হাত কেটে দেবে তখন তুমি অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আমি হচ্ছি গন্ধর্বকুলের একজন'। শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ তাঁদের পরিচয় দিলেন আর সীতাকে যে রাবণ অপহরণ করে নিয়ে গেছে সেই খবরও কবন্ধকে জানিয়ে দিয়ে বললেন 'আমরা সীতার অন্বেষণে করতে করতে এখানে এসে পৌঁছেছি। কবন্ধ তখন বলছেন 'আমিও সীতাকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করব – **দিব্যমস্তি ন মে জ্ঞানং নাভিজানামি মৈথিলীম্।**।৩/৭১/২৭। কিন্তু আমি এখন পশুর শরীরে আছি বলে আমার দিব্যজ্ঞানের ক্ষমতাটা নেই, সেইজন্য আমি সীতার ব্যাপারে কিছুই বলতে পারব না। কিন্তু কোন রকমে যদি আমার এই শরীরের দাহ হয়ে যায়, তাহলে আমি আমার পূর্বের গন্ধর্ব শরীর ফিরে পাব, তখন ওই গন্ধর্ব শরীরে আমি কিন্তু আপনাদের সাহায্য করতে পারব। সেইজন্য যে করেই হোক – **অদগ্ধস্য হি বিজ্ঞাতুং শক্তিরস্তি ন মে প্রভো।**৩/৭১/২৯। এই শরীর যতক্ষণ না আমার নাশ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ আমি আপনাকে কোন ভাবেই সাহায্য করতে পারছি না'।

আমরা আগেও আলোচনা করেছিলাম যে, এক একটা শরীরের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য। দুই তিন মাসের বাচ্চা পেটের উপর ভর দিয়ে প্রথম চলতে শুরু করে, সাপও তো এই ভাবে সারা জীবন চলে, কিন্তু কোন বাচ্চাই বড় হয়ে গেলে সাপের মত চলতে পারবে না, সে যখন আরেকটু বড় হয় তখন হাত পা দিয়ে হামাগুড়ি দেয়। শ্রীকৃষ্ণের হামাগুড়ি নিয়ে কত লীলাকাহিনী, ভজন আছে। আমাদের এই শরীর ও মন, এই দিয়ে আমার এই জগতেরই জ্ঞান হতে পারে, আমি যদি চাই আমি হরিণের মত ছুটব, ঘোড়ার মত লাফাব, আমি কিন্তু পারব না। ঠিক তেমনি আমি যদি ভাবি আমার দিব্যজ্ঞান হোক, এখানে বসে বসে দেখতে পাবো দিল্লীতে এখন কি হচ্ছে, তাহলে কি আমি পারব জানতে? কখনই পারব না। কিন্তু এখানে বসে দিল্লীর খবর জানা কি সম্ভব? হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব। যখন যোগ সাধনা করতে থাকবে তখন তার এই শরীর আর মন পাল্টাতে শুরু করে। যখন এই শরীরটা পাল্টাতে থাকে তখন সে অন্য জিনিষের জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারবে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – এই শরীর এই মন দিয়ে কিন্তু ঈশ্বর দর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, তার জন্য অন্য শরীর আর অন্য মন দরকার। এই তত্ত্বকেই এখানে বাল্মীকি খুব সোজা সাপ্টা কথাতে কবন্ধের মুখ দিয়ে বলছেন আমার এই শরীরটাকে দাহ করতে হবে। যিশুও বলছেন – the old man has to die, এই কথাই কবন্ধ অন্য ভাবে বলছে – *অদগ্ধস্য হি বিজ্ঞাতুম*। আমার এই শরীর না পুড়ে যাওয়া পর্যন্ত আমার সেই শক্তি নেই যে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব। এই শরীর মন দিয়ে আমি জানতেই পারব না যে কোথায় কি হচ্ছে। যখন আমার দিব্য শরীর দিব্য মন এসে যাবে তখন আমি সব জানতে পারব। কবন্ধের দিব্য শরীর ও মনেরও ক্ষমতা সীমিত, ঐ শরীরেও সে জানতে পারবে না যে সীতা কোথায় আছে। তবে হ্যাঁ, আপনাকে কে সাহায্য করতে পারবে, কার কাছে গেলে আপনার ভাল হবে, সেটা আমি বলতে পারব। কবন্ধ শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি সীতা কোথায় আছে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে সুগ্রীবের সাথে দেখা করার কথা কবন্ধই বলেছিল। এদেরও ক্ষমতা সীমিত, সেইজন্য দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ এদের সর্বজ্ঞ বলা হয় না।

তখন শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ একটা চিতা সাজিয়ে তার উপরে কবন্ধকে চাপিয়ে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল। কবন্ধের স্থূল শরীর যখন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখন সেই ভস্ম থেকে দেখতে পেলেন আলাদা একটা দিব্য শরীর বেরিয়ে এসেছে। দিব্য শরীরধারী সেই কবন্ধ এখন বলছে – আমি দেখতে পাচ্ছি সুগ্রীব বলে একজন আছে, আপনি তার কাছে চলে যান। সুগ্রীবও আপনার মতই দুঃখে রয়েছে। দুটো মেয়ের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। এদের একজন বিদেশীনি আরেকজন বিরহীনি, মানে একজনের স্বামী তাকে ছেড়ে বিদেশে রয়েছে, আরেকজন নিজের স্বামীকে ছেড়ে বিদেশে বসে আছে। এদের দুজনের মিল খুব হবে। নরেন যখন দক্ষিণেশ্বরে হাজরার কাছে বসে থাকত তখন ঠাকুর বলতেন, এরও দেনা আছে ওরও দেনা আছে, নরেনের টাকা-পয়সা নেই আর হাজরার অনেক দেনা বাকী পড়েছে। সুগ্রীবও নিজের বউকে হারিয়েছে, শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর সীতাকে হারিয়েছে। তাই কবন্ধের দিব্য শরীর বলছে তোমাদের দুজনের বন্ধুত্ব হয়ে গেলে বেশ একটা কিছু হবে।

কবন্ধের কাছ থেকে সুগ্রীবের কথা শোনার পর শ্রীরামচন্দ্র ঠিক করলেন যে আমাদের সুগ্রীবের কাছেই এখন যাওয় উচিৎ। যখন এনারা এগিয়ে চলেছেন, যেতে যেতে পথে একটা সরোবর দেখছেন, এই সরোবরের নাম পম্পা। পম্পা সরোবরের কাছে শবরীর আশ্রম। শবরী ছিলেন একজন আদিবাসী মহিলা। শবরী শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে দেখে প্রণাম করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে জিজ্ঞেস করছেন – **কচ্চিতে নির্জতা বিঘ্নাঃ কচ্চিত বর্ধতে তপঃ। কচ্চিত্তে নিয়তঃ কোপ আহারশ্চ তপোধনে।**।৩/৭৪/৮। হে তপস্বীনি তুমি কি নির্যিতা বিঘ্না, অন্তর জগতের যত বিঘ্ন আছে সব বিঘ্নকে কি তুমি জয় করে নিয়েছ? আর তাতে কি তোমার তপস্যা উচ্চ মার্গে পৌঁছেছে? হে তপস্বীনি! তুমি কি তোমার ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছ? শ্রীরামচন্দ্র আরও জিজ্ঞেস করছেন – *আহারশ্চ তপোধনে* – তোমার খাওয়া দাওয়াকে কি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছ? কারণ খাওয়া-দাওয়া, মানে নিজের জিভকে যতক্ষণ না সংযত করা যাবে ততক্ষণ যোগ হবে না। ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চন না ত্যাগ হলে কিছুই হবে না, কামিনী-কাঞ্চন তো আছেই, কিন্তু তার সাথে যদি সাধক জীবনে জিহ্বাকে সম্বরণ না করা থাকে তাহলে বিরাট বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। জিহ্বার লোভ খুব মারাত্মক, ঠাকুর তাই বারবার বলছেন – যারা সত্ত্বগুণী, যারা জপধ্যান করে, তপস্যা করে তারা খাওয়া দাওয়ার বিরাট আয়োজন কখনই করবে না। তাদের খাওয়ার কোন আড়ম্বর থাকে না। শরীর রক্ষার জন্য একটু ঝোল ভাত হয়ে গেলেই তাদের চলে যাবে। সাধকের হাতে রয়েছে মাত্র চব্বিশ ঘন্টার সময়, আর এর বেশির ভাগ সময় যদি আহারের আয়োজন করতেই চলে যায় তাহলে তার আসল কাজগুলো কখন করবে। দ্বিতীয় কথা, যেসব খাবার গ্রহণ করছে সেগুলো হজম করার জন্য শরীরের শক্তির দরকার। এইটুকু তো আমাদের শরীরের শক্তি সেই শক্তিটুকু যদি হজম করতেই চলে যায় তাহলে জপধ্যান করার শক্তি পাবে কোথা থেকে!

শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞেস করছেন – **কচ্চিতে নিয়মাঃ প্রাপ্তা কচ্চিতে মনসঃ সুখম্। কচ্চিতে গুরুশুশ্রুষা সফলা চারুভাষিণি।**।৩/৭৪/৯। 'হে তপস্বীনি! তোমার গুরু যা যা নিয়ম পালন করতে বলেছেন আর গুরুর কাছে যা যা নিয়ম নিজের জন্য পালন করবার জন্য তুমি অঙ্গীকার করেছ, সেগুলি ঠিক ঠিক পালন করতে পারছ তো'? আমরা অনেক সময় উৎসাহ বশতঃ অনেক কিছুর অঙ্গীকার করে বসি, আমি অমুক করব, তমুক করব। তারপর কিছু দিন পরে হয় ভুলে যাই নয়তো করার সামর্থ থাকে না। শ্রীরামচন্দ্র এই প্রশ্নগুলি করে বুঝে নিচ্ছেন যে শবরীর জীবনে সুখ শান্তি আছে কিনা, কারণ এগুলো যিনি পালন করেন তিনিই জীবনে ঠিক ঠিক সুখ শান্তি পান। তারপরেই শবরীকে প্রশ্ন করে জানতে চাইছেন, তোমার মনে সুখ আর শান্তি আছে কিনা। সুখ আর শান্তি যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে মন চঞ্চল। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় মশাই আপনি সুখ শান্তিতে আছেন তো? সবাই বলবে – কোথায় আর শান্তিতে আছি। কেন শান্তিতে নেই মানুষ? কারণ গুরুবাক্য আর গুরু প্রদত্ত যে নিয়মগুলোকে জীবনে অবলম্বন করা হয়েছে সেগুলো পালন করতে থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই মনে সুখ শান্তি এসে যাবে। আর অন্য দিকে দেহ

আর ইন্দ্রিয়ের ছটফটানি যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলেও শান্তি এসে যাবে। অশান্তির দুটি কারণ – প্রথম কারণ দৈহিক বা কায়িক, এটা ভোগ করতে চাই সেটা ভোগ করতে চাই, যতক্ষণ ভোগের সামগ্রী ঠিকমত পেয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ দেহের খুব ভালো লাগবে, যখন ভোগের সামগ্রী কাছে না পায় তখন মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। সাধনা ও তপস্যা দিয়ে এই ভোগ বাসনাগুলিকে দাবড়াতে হবে। আমাদের অনেকেই একটা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের সংস্কৃতিতে বড় হয়েছি, আর সবারই মোটামুটি একটা বয়সও হয়ে গেছে, যার ফলে ভোগের বাসনাগুলো এখন দাবানই আছে কিন্তু তবুও আমাদের মনে শান্তি নেই। তখন বুঝতে হবে এই অশান্তি আধ্যাত্মিক কারণে হচ্ছে। অশান্তির দ্বিতীয় কারণ আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক কারণ মানে গুরু যে আদেশগুলো দিয়েছেন সেগুলো পালন করা হচ্ছে না। আদেশ মানে গুরু কি আমাকে ঘাড়ে ধরে বলেছেন তোকে এগুলো করতেই হবে? তিনি আদেশ করেছেন এগুলো করতে, আমিও অঙ্গীকার করেছি এগুলো পালন করব বলে। এখন আমি সেগুলো পালন করছি না, তখন আমার মনটা অজান্তেই খুঁতখুঁত করতে থাকবে। গুরুবাক্য মানে, সব শিষ্যদের গুরু যে নির্দেশাবলী বলে দেন, রোজ খুব ভোরে উঠে এক ঘণ্টা করে জপধ্যান করবে, রোজ ঠাকুরের সামনে শাস্ত্রপাঠ করবে, কিছুক্ষণ মনে মনে পাঠ করবে। এগুলো আমরা গুরুর কাছে নিজেরাই নিয়ম করেছি। একদিকে আমরা পালন করছি কিন্তু মন এখনও বিষয় বাসনা তৃপ্তি করার জন্য চঞ্চল, তাহলেও অশান্তি হবে, আবার অন্য দিকে আমার এই জগতে সেই ধরণের কোন কিছু চাহিদা নেই, কিন্তু নিয়মগুলো পালন করছি না, তাতেও অশান্তি হবে।

সব শেষে শবরীকে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি যে এতদিন গুরুকে সেবা করেছ, তার ফল পুরোপুরি পেয়েছ কিনা। ফল পুরোপুরি পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, যখন আমরা কোন সাধুসেবা করছি তার একটা ফল সব সময় আছে, এতে আপনার মঙ্গল হবে। যদি দেখা যায় সাধুসেবা করেও আমার মঙ্গল হচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও কিছু গোলমাল আছে, কারণ গুরুসেবার ফল হবেই হবে, হতে বাধ্য। ফল যদি না দেয় তাহলে আমার ভেতরেই কিছু গণ্ডগোল আছে। মন যদি চঞ্চল থাকে, তুমি যদি গুরুবাক্য পালন না কর, তোমার যদি ইন্দ্রিয় সংযম না হয়ে থাকে, আর আধ্যাত্মিক জীবনের যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো যদি ঠিক মত পালন না করা হয়, তখন গুরু যতই আশীর্বাদ করুন না কেন, যতই তিনি কৃপা করুন না কেন তাতে কিছুই হবে না। এটাই শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে জিজ্ঞেস করছেন।

তখন শবরী বলছেন – আমার সব সফল হয়ে গেছে, আর আপনার যে সৌম্য দৃষ্টি আমার উপরে পড়েছে তাতেই আমি ধন্য হয়ে গেছি। এখানে এটা বলা খুব মুশকিল যে, শবরীর এই অংশটি বাল্মীকি রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত অংশ কিনা, কেননা শ্রীরামচন্দ্রকে সব জায়গাতে দেখানো হয়েছে অতিমানব রূপে। এর আগে শ্রীরামচন্দ্র অহল্যার কাছে গেছেন, ঋষিদের কাছে গেছেন, সবার কাছে গিয়ে তিনি প্রণাম করছেন। এখানে আমরা প্রথম দেখতে পাই যে, শবরী এসে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করছেন। শবরীর শ্রীরামচন্দ্রকে জানার কথাই নয়, আর শ্রীরামচন্দ্ররেও অতিমানব রূপে শবরীকে জানার কথা নয়। সেইজন্য মনে করাটা অসংগত হবে না যে এই অংশটা বাল্মীকি রামায়ণে পরে কেউ সংযোজন করেছেন।

শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে সেখানকার সব কিছুর সঙ্গে পরিচয় করালেন, শ্রীরামচন্দ্রকে খুব নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সৎকার করিয়েছেন। এসব করার পর শবরী আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্ম নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে এমন কয়েকটি কথা বললেন যে কথাগুলো শুনে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ খুব অবাক হয়ে গেলেন। একজন আদিবাসী নারী, জঙ্গলে এভাবে একাকী পড়ে আছেন, আর এখানে অবস্থান করে গুরুর সেবা করেছেন, একা একা তপস্যা করেছেন, আর কি অদ্ভূত ভাবে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি হয়ে গেছে।

শবরী তখন বলছেন 'আমি আপনাদের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলাম, আমার জীবন আজ সার্থক হয়েছে, এবার আমি শরীর ত্যাগ করে অক্ষয়লোকে চলে যাব'। বাল্মীকি রামায়ণে একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হল, এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কোথাও উল্লেখ করা হচ্ছে না। বাল্মীকি রামায়ণে বিভিন্ন লোকের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে অক্ষয়লোকও একটি লোক। বলা হয় অক্ষয়লোক ব্রহ্মলোকের খুব

কাছাকাছি, যদিও ব্রহ্মলোক সব থেকে উচ্চলোক। শবরী তখন নিজেই অগ্নি প্রজ্বলিত করে নিজের দেহকে সেই অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দিলেন। এদের কাছে দেহকে অগ্নিতে বিসর্জন দেওয়া যেন অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। তারপর দেখা গেল সেই অগ্নিপ্রজ্বলিত দেহ থেকে এক দিব্য শরীর নিষ্ক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে স্বর্গের দিকে চলে গেল। শবরীর আশ্রম থেকে এগোতে এগোতে এবার শ্রীরামচন্দ্র পম্পা সরোবরের তীরে পৌঁছালেন। এখানে এসে অরণ্য কাণ্ডের সমাপ্তি হয়ে গেল।

কিষ্কিন্ধা কাণ্ড

এরপর শুরু হচ্ছে কিষ্কিন্ধা কাণ্ড। কিষ্কিন্ধা ছিল বালী আর সুগ্রীবের রাজধানী। কিষ্কিন্ধা নগরী কোথায় ছিল এখন আর বলা যাবে না। বর্ণনা দেখে মনে হয় অন্ধ্রের নীচের দিকে হবে। এখানে গোদাবরীর নদীর উল্লেখও পাওয়া যাচ্ছে।

পম্পা ছিল তখনকার দিনের খুব প্রসিদ্ধ বিরাট বড় এক সরোবর। শ্রীরামচন্দ্রের মন এখনও সীতাকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। পম্পা সরোবরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই মনোরম। যেখানেই সুন্দর যা কিছু দেখছেন সবেতেই শ্রীরামচন্দ্রের মন চঞ্চল হয়ে উঠছে। মনের এই চাঞ্চল্যতাকেই যোগের ভাষায় বলা হয় শোভন অধ্যাস। সাধক বা যোগীর চিত্তে সৌন্দর্য্য বোধ সুপ্তাবস্থায় রয়েছে, যখন বাইরের কোন সুন্দর জিনিষ বা দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে, তা মানুষের শরীর হতে পারে বা ভালো কোন দৃশ্য হতে পারে, এই সুন্দর দৃশ্য তার মনের সেই সুপ্ত সৌন্দর্য্য বোধের উপর গিয়ে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে একটা দাগ ছেড়ে দেয়, এটাকেই বলা হয় শোভন অধ্যাস। বাইরের যে সৌন্দর্য্য সেটা ভেতরে এসে চাড়া দিয়ে এই সৌন্দর্য্যটাকে জাগিয়ে দেয়, তখনই যোগী তাতে আটকে যায়। এখন শ্রীরামচন্দ্রের যে সৌন্দর্য্য বোধ, সেই বোধটা একমাত্র সীতাকে নিয়ে, কারণ তিনি সীতাকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন। যখনই শ্রীরামচন্দ্র বাইরে সুন্দর কোন কিছু দেখছেন, বাইরের এই সুন্দর দৃশ্যটা হল বাইরের উত্তেজনা, বাইরের এই উত্তেজনা তাঁর ভেতরের সৌন্দর্য্য বোধটাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য বোধ যাকে নিয়ে সে এখন তাঁর কাছে নেই, ফলস্বরূপ তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে।

বাচ্চারা মা ছাড়া কিছুতেই থাকবে না। এখন মা হয়তো কোথাও গেছে, বাচ্চাকে লজেন্স, খেলনা ইত্যাদি দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা হয়েছে। কিছুক্ষণ ওই ভাবে থাকার পর হঠাৎ কোন ভাবে যদি মা শব্দটা তার কানে যায় তখনই ভ্যাঁ করে মায়ের জন্য কাঁদতে শুরু করে দেবে। বাইরের মা শব্দটা উত্তেজনা রূপে বাচ্চার ভেতরে তার মায়ের প্রতি যে ভালোবাসা আছে, সেটাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্র যখন পম্পা সরোবরের কাছে গেছেন তখন ছিল চৈত্র মাস। আসলে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রকে অবলম্বন করে, তাঁর যে সৌন্দর্য্য বোধ ছিল, সেই বোধ দিয়ে তিনি বসন্ত ঋতুর বর্ণনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনাকে একটার একটা শ্লোকের মধ্যে সাজিয়ে গেছেন। অবশ্য বাল্মীকি অনেক জায়গাতেই বিভিন্ন মাসের ও বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা করেছেন। এখানে চৈত্র মাসে দক্ষিণ ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কেমন রূপ ধারণ করে তার বর্ণনা করছেন। পুরুষ কোকিল আর মেয়ে কোকিল কিভাবে আনন্দে কন্ঠস্বরকে পঞ্চমে নিয়ে গান করছে, হরিণ-হরিণী কিভাবে লাফালাফি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতিরা হাতিনীদের সাথে কিভাবে চরে বেড়াচ্ছে, এই রকম নানান দৃশ্যের বর্ণনা করে গেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র দেখছেন পম্পা সরোবরে খুব সুন্দর সুন্দর প্রচুর পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয়ে চারিদিকের শোভাকে আরও বর্ধিত করে দিয়েছে। পদ্ম ফুল দেখে শ্রীরামচন্দ্রের আবার সীতার কথা মনে পড়ে গেছে, আমার সীতা পদ্মফুল কত ভালোবাসত, সীতার কথা মনে পড়তেই আবার তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে শুরু করেছে। এই হয়, কেউ যদি কাউকে খুব ভালোবেসে থাকে আর তার সাথে যদি চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তখন তার যে জিনিষগুলো প্রিয় ছিল সেই জিনিষগুলো দেখলেই তার কথা মনে পড়ে

যায় তখন আর সে তার চোখের জল আটকে রাখতে পারে না। বাল্মীকি মানুষের এই আবেগগুলোকে খুব সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন।

তারপর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন ‘একদিন তো চৌদ্দ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তারপর আমি যখন অযোধ্যায় ফিরে যাব তখন মা কৌশল্যা যখন সীতার কথা জিজ্ঞেস করবে তখন আমি কি উত্তর দেব’! শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন ‘দ্যাখো লক্ষ্মণ, সীতাকে ছাড়া তো আমি বেঁচে থাকতে পারব না, তাই তুমি এক কাজ কর, তুমি অযোধ্যাতে ফিরে যাও আর সেখানে ভরতকে জানিয়ে দিও যে আমি মারা গেছি’। শ্রীরামচন্দ্রের নামের আগে পুরুষোত্তম শব্দ ব্যবহার করা হয়, আর এই শব্দ বাল্মীকিই প্রথম ব্যবহার করেছেন। অনেক জায়গায় পুরুষোত্তম শব্দ শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এটা ঠিক নয়, শ্রীকৃষ্ণ আসলে ছিলেন যোগীশ্বর। মর্যাদা পুরুষোত্তম বলতে শ্রীরামচন্দ্রকেই বোঝায়। লক্ষ্মণ এই কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন ‘হে পুরুষোত্তম রাম – **সংস্তম্ভ রাম ভদ্রং তে মা শুচঃ পুরুষোত্তমঃ।৪/১/১১৬।** হে রামচন্দ্র! আপনি সাধারণ লোকেদের মত চিন্তা করবেন না, তাদের বুদ্ধির মত আপনার বুদ্ধির মতি করবেন না, আপনার মত যাঁরা পূণ্যাত্মা, সাধুপুরুষ তারা কখনই উৎসাহহীন হয়ে পড়েন না। বাচ্চাদের উৎসাহ ক্ষণিক, কোন ব্যাপারে এই উৎসাহ এল, পর মুহূর্তেই আবার সেই উৎসাহ চলে যাবে। একটা জিনিষ করতে গেলে প্রাণ দিয়ে করতে শুরু করবে, তারপর পাঁচ মিনিট পরেই সব উৎসাহ শেষ হয়ে যায়।

যারা সাধনার জীবনে প্রবেশ করে প্রথমেই এমন তেড়েফুড়ে লেগে পড়বে যেন ভগবান এক্ষুনি মন্ত্রপূত সর্পের মত তার পায়ে এসে পড়বে। তারপর কদিন পর দেখা যায় তার গুরুর দেওয়া মন্ত্রটাই ভুলে যায়। কিন্তু যারা প্রকৃত সাধুপুরুষ তাঁরা একবার যেটাকে ধরে নেবেন সেটাকে না শেষ করে ছাড়বেন না, উৎসাহহীন কখনই হবেন না। তিনি যে কষ্ট করে ধরে আছেন তা নয়, এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য, তিনি লেগে থাকবেন। ঠাকুর জাত চাষার কথা বলছেন, যত অনাবৃষ্টি হোক সে চাষ করা বন্ধ করবে না। আর যে জাত চাষা নয় সে বৃষ্টি না হলে তার উৎসাহ হবেই না। জাত চাষা কখনই নিজের জীবিকা পাল্টাবে না। এটাই সাধুপুরুষের লক্ষণ। আমাদের অধ্যাত্মে যা কিছু আছে তার সার হল গীতা, গীতাতে ঠিক এই কথাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন সাত্ত্বিক কর্তা সব সময় ধৃতি আর উৎসাহ সমন্বিত। ধৃতি মানে লেগে থাকা, উৎসাহ সব সময় থাকবে। এই দুটো কাদের থাকবে? যারা সাত্ত্বিক পুরুষ, যারা আধ্যাত্মিক পুরুষ। যারা রজোগুণী বা তমোগুণী তারা এই দুটোকে ধরে রাখতে পারেনা। ঠাকুর অনেক বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই ব্যাপারে বলেছেন, যেমন – একজন কুয়ো খুড়ছে, কিছু খোড়ার পর সেখানে পাথর বেরিয়েছে, তখন আরেক জায়গায় গিয়ে খুড়তে থাকবে, সেখানে যখন আবার বালি বেরিয়েছে তখন আরেক জায়গায় খুড়তে যাবে। কিন্তু যার ঠিক ঠিক সাত্ত্বিক গুণ আছে সে কিন্তু এক জায়গাতেই লেগে থাকবে তা পাথরই বেরুক আর বালিই বেরুক, যতক্ষণ না জল বেরোবে ততক্ষণ ছাড়বে না।

আমরা মূল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছি, কিন্তু একটু সরে গিয়ে আমাদের কিছু কিছু তত্ত্বের বিষয়কে না জানলে বাল্মীকি রামায়ণের অন্তর্নিহিত সার জিনিষ গুলিকে ধরতে পারব না। বাংলায় একটা কথা আছে ‘ব্যস্ত’, মানে আমি এখন কাজে ব্যস্ত আছি। ব্যস্ত শব্দের বিপরীত শব্দ তাহলে কি হবে? ব্যস্তের যে বিপরীত শব্দ সেটা মানুষ কখন ব্যবহার করে না। ব্যস্ত শব্দের বিপরীত হচ্ছে সমস্ত। মানুষ যখন চারটে জিনিষকে নিয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয় ব্যস্ত। আর যখন একটা জিনিষকে নিয়ে থাকে, যেমন পতিব্রতা নারী বলে আমার সমস্ত কিছু তোমাকে দিলাম, তার মানে তার অন্য আর কিছু নেই। আর আজকালকার মেয়েরা সব সময় ব্যস্ত, এক সঙ্গে চারজনকেই দিয়ে যাচ্ছে – শরীরটা একজনকে দিচ্ছে, ভালোবাসা আরেকজনকে দিচ্ছে, মনটা আরেকজনকে দিচ্ছে, টাকা আরেকজনকে দিচ্ছে। কিন্তু স্বামী অন্ত প্রাণ যে নারী সে বলে আমার মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও বিষয় সমস্ত তোমাকে দিলাম।

আমাদের কিছু কাজের কথা বললে বলি আমি এখন একটা অন্য জিনিষ নিয়ে ব্যস্ত আছি, কখনই বলি না যে আমার সমস্ত কিছু এখন এতেই লেগে আছে, আমরা বলি না যে আমার পুরো সময়, আমার

পুরো মন, প্রাণ, শক্তি সব এতেই লেগে আছে, কিন্তু আমরা বলি ব্যস্ত। ব্যস্ত হচ্ছে যখন মন একের অধিক বিষয়ে লেগে থাকছে, কিন্তু একটা জিনিষেই যখন মন লেগে থাকে তখন আমরা বলি সমস্ত। জীবনে যদি আমরা ঠিক করে নিই যা করব একটা জিনিষই করব তবেই সমস্ত মন প্রাণ শক্তি ওতেই লেগে থাকবে, তবেই জীবন সার্থকতার মুখ দেখতে পারবে। যখন কম্প্যুটারে কাজ করছে তখন টেবিলে কফি কাপও রাখা আছে, কম্প্যুটারে কাজ করছে আবার মাঝে মাঝে কফি কাপে একটা চুমুক দিয়ে আবার কম্প্যুটারে আঙুল চালাচ্ছে। এর পরে এসে গেছে ফাস্ট ফুড, কাজও করে যাচ্ছে আবার ওর মধ্যে এক চামচ মুখেও দিয়ে দিচ্ছে। কোন কিছু খাওয়াও একটা পূজার মত, জাপানীদের কাছে চা পান করা রীতিমত একটা পূর্ণাঙ্গ পূজা উপাচার, একটা ধর্মীয় কাজ। এখানে আমরা কাজও করছি আবার চাও খাচ্ছি। তার ফলে দুটোর মধ্যে কোনটাই ঠিক ঠিক হয় না। এক সঙ্গে অনেক কাজ করাটা অত্যন্ত খারাপ। আধ্যাত্মিক পুরুষদের কাছে এটাই হয়ে যায় বিষতুল্য। যখন যে কাজটা করব তখন ঐ কাজটাই করব, যখন কম্প্যুটারে কাজ করছি তখন শুধু ঐ কাজই করব, যখন চা খাব তখন চা'ই খাব, অন্য দিকে তখন তাকাব না। যখন খেতে বসেছি তখন অন্য দিকে আর মন দেওয়া যাবে না, বা তাকাবও না, খাওয়াতেই মনটাকে লাগিয়ে রাখতে হবে। দ্বিতীয়, যেটা ধরা হয়েছে সেটাকে আর কক্ষণ ছাড়ব না। ধৃতি আর উৎসাহ নেই মানে সত্ত্বগুণের অভাব। সত্ত্বগুণের অভাব মানে, শাস্ত্রের জ্ঞান সে গ্রহণ করতে পারবে না। সত্ত্বগুণ না থাকলে মস্তিষ্ক কখনই শাস্ত্রের জ্ঞান ধারণা করতে পারবে না। যখন এক সঙ্গে অনেক কাজ করছে তখন বুঝতে হবে মন একাগ্র নয়। আর যখন একটা কাজ কিছুক্ষণ করার পর ছেড়ে দেয় তখন বুঝতে হবে তার ধৃতির অভাব, ধৃতির অভাব মানে মন এখনও সেই রকম শক্তিশালী নয়।

এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে একটা কাজে হাত দেবার পর যদি দেখা যায় সেই কাজটা করে আমার কোন উপকারে আসছে না, কাজটা পছন্দ মত হচ্ছে না, তখন তো তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিৎ কিনা? এটা একটা আলাদা বিষয়। প্রথম কথা যদি দেখা যায় এই কাজে আমার কোন লাভ নেই, তাহলে আগে দেখতে হবে আমি এই কাজটা হাতে কেন নিয়েছিলাম। অন্য দিক দিয়ে বলতে গেলে বলা যায়, মনকে যদি শক্তিশালী করতে হয় তাহলে যে কাজগুলো পছন্দের নয় সেই কাজগুলিতে মনকে বেশি একাগ্র করতে হবে। নিজের পছন্দের মত কাজ তো যে কেউ করতে পারে, বাচ্চারাও করে দেবে। বিছানার চাদর সমান করে পাতা, জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখা এগুলো সবার কাছেই অত্যন্ত অপছন্দের কাজ, বাড়ির মেয়েরাও করতে চায় না, মায়েদের কাছে অপছন্দ নয়, কেননা মায়েদের মন অনেক ধীর স্থির হয়, মায়েরাই এই কাজগুলো দীর্ঘকাল ধরে করে থাকেন।

যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি বলছেন - *স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ* – বছরের পর বছর দীর্ঘকাল ব্যাপি নিষ্ঠার সঙ্গে যখন যোগের সেবা করবে তখন যোগের ফল পেতে থাকবে। আমরা সাধারণ জীবনে এই ধরণের নিষ্ঠা কাদের মধ্যে দেখতে পাই? আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা করত, আর করেন সব মায়েরা। যেদিন তার সন্তানের জন্ম হচ্ছে সেইদিন থেকে মা তার সন্তানকে বছরের পর বছর লালন করে যাচ্ছেন, কম করে ধরলেও সাত থেকে আট বছর এক ভাবে সব কিছু লালন পালন করে তার বাচ্চার জীবনকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ধারার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। যেমন যেমন বাচ্চা বড় হতে থাকে তার প্রতি মায়ের নিয়ন্ত্রণের ধারাটাও পাল্টাতে থাকে। বাচ্চার জন্ম থেকে স্কুল যাওয়া পর্যন্ত তার খাওয়া, শোওয়া, পড়া, পোশাক, তার মেলামেশা, খেলাধূলা সব কিছুকে মা দীর্ঘদিন ধরে নিরলস ভাবে নিজের হাতে নিয়ন্ত্রণ করে বাচ্চার জীবন ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেইজন্যই আমাদের সমাজে মায়েদের স্থান সবার উপরে। মায়েদের এই কাজগুলো যে সব সময় খুব পছন্দের কাজ বলে করে যাচ্ছেন তা নয়, এই কাজ করতে গিয়ে তাদের নিজস্ব অনেক পছন্দের কাজকে ত্যাগ করতে হচ্ছে, অনেক সখ-আহ্লাদও ছেড়ে দিতে হচ্ছে শুধু বাচ্চাকে মানুষ করার জন্য। যাদের মধ্যে মাতৃত্ব বোধ নেই তাদের কাছে একটা বাচ্চাকে ছেড়ে দিন এক ঘন্টা পরেই সে অস্থির হয়ে গিয়ে হয়তো বাচ্চার গালে দুটো চড়ই মেরে দেবে।

দিনে দিনে এই মাতৃসুলভ উৎকর্ষতা দ্রুতগতিতে অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে, যার ফলে ইদানিং বাচ্চাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। মা যদি ছেলেকে শাসন করতে যায় তাহলে ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে দিচ্ছে। মা যদি ছোটবেলা থেকে বাচ্চাকে মাতৃত্বের সমস্ত গুণ দিয়ে আদর আর অনুশাসনের মধ্যে ধরে রাখে তাহলে কখনই সে গলায় দড়ি দিতে যাবে না। কিন্তু আজকাল ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে এত আত্মহত্যার ঘটনা হচ্ছে এর মধ্যেও কোথাও মায়েদের একটা অবহেলা রয়েছে।

মূল কথা হল যখন কোন একটা অপছন্দের কাজ, ঝাঁটা দেওয়া, বিছানা করা, কাপড় কাচা দীর্ঘ দিন করে যাচ্ছে তখন তার মন একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলতে শুরু করে। মনকে নিয়ন্ত্রণ করার এটাই একটা সহজ উপায়, এই অপছন্দের কাজটা যদি আমাকে করতে হয়, তাহলে ঐটাই করব নিষ্ঠার সাথে, সমস্ত প্রাণ মন ঢেলে, দীর্ঘকাল ধরে। তাই বলে এখন একজন প্রফেসরের কাছে মাটি কোপান অপছন্দের কাজ বলে তিনি যদি মাটি কোপাতে যান তাহলে সেটাও ঠিক হবে না, মাটি কোপানর কাজ কোন দিক দিয়েই তার মনকে সুসংস্কৃত হতে সাহায্য করবে না। লক্ষ্মণ এটাই এখানে বলছেন ‘হে শ্রীরামচন্দ্র, আপনি উৎসাহ হারাবেন না। উৎসাহ হারানটা সাধারণ লোকের ধর্ম। আপনার মত যাঁরা সাধুপুরুষ, মহাত্মা তাঁরা কখনই উৎসাহ হারান না।

এরপরে লক্ষ্মণ বলছেন ‘স্বজনবিয়োগ সবাইকেই সহ্য করতে হয়। সেইজন্য স্বজনের প্রতি আপনি বেশি আসক্তি রাখবেন না’। মনে রাখতে হবে লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে এই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন – **অতিস্নেহপরিষ্বঙ্গাদ্ বর্তিরার্দ্রাপি দহ্যতে।**।৪/১/১১৬। তেলের সংস্কৃত শব্দ হচ্ছে স্নেহ, স্নেহ মানে ভালোবাসা। বাংলায় ব্যঙ্গ করে বলা হয়ে – তুই কি খুব তেল মারছিলি? তেল মারা মানে? এখানেও একই অর্থে সবটাই হচ্ছে। যেখানে সম্পর্কের মধ্যে সঙ্ঘাত আছে সেখানে তেল দিলে স্লিপ করতে থাকে। আবার অন্য দিকে স্নেহ মানেও তাই, আমার তার প্রতি স্নেহ আছে, তার মানে তার আর আমার সম্পর্কটা খুব স্লিপারি, অর্থাৎ সম্পর্ক মসৃণ ভাবে চলেছে। গাড়ির চাকায় যদি ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হয় তখন চাকায় তেল দিলে চাকাটা সহজ হয়ে চলতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ক্যাঁচকোঁচ করছে একটু তেল দিয়ে দাও সম্পর্কটা ভালো চলতে থাকবে। মা-ছেলের সম্পর্ক বা একজন যুবক ও যুবতীর মধ্যে কি করে সম্পর্ক এত দৃঢ় হয়? স্নেহ, তেলটাই হচ্ছে স্নেহ, তেলের মত এমন পিচ্ছিল জিনিষ আর নেই। তাই লক্ষ্মণ বলছেন ‘প্রদীপের যে সলতে তাকে যদি জলে ভিজিয়ে আচ্ছা করে তেলের মধ্যে চুবিয়ে রেখে আগুন দেওয়া হয় তেল সেই ভেজা সলতেকেও জ্বালিয়ে দেবে। যে জিনিষটা জ্বলার কথা নয় সেই জিনিষকেও স্নেহ জ্বালিয়ে দেবে, দাদা সেইজন্য স্বজনের প্রতি বেশি স্নেহ রাখবেন না’। এটা কিন্তু বাস্তব যে, লক্ষ্মণের স্বজনদের প্রতি বিশেষ স্নেহ কোন দিন ছিল না। শুধু দাদাকেই প্রচণ্ড ভক্তি করত কিন্তু স্নেহ বলতে যা বোঝায় সেটা কারুর প্রতি কোন দিনই ছিল না। বলছেন *অতিস্নেহপরিষ্বঙ্গাদ্* অতিস্নেহ কখনই করা উচিৎ নয়। কেন নয়? কারণ স্বজনের বিয়োগ অতি অবশ্যম্ভাবি।

স্বাস্থ্যং ভদ্রং ভজস্বার্য ত্যজ্যতাং কৃপণা মতিঃ। অর্থো হি নষ্টকার্যার্থৈরযত্নেনাধিগম্যতে।। ৪/১/১২০।। ‘দাদা! আপনি স্বাভাবিক হন, স্বস্থ হন, আপনি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন’। এখানে স্বস্থ কথার খুব গভীর তাৎপর্য রয়েছে। স্বস্থ মানে, আমরা কারুর সঙ্গে দেখা হলে প্রথমে জিজ্ঞেস করি আপনি সুস্থ আছেন তো? সংস্কৃত ভাষার মধ্যে অনেক রস লুকিয়ে আছে, যদি ঠিক ঠিক সংস্কৃত ভাষার চর্চা করা হয় তখন বোঝা যায় যে এক একটি শব্দের কত সুন্দর সুন্দর অর্থ হয়। বাংলায় সুস্থ মানে স্বাস্থ্য ঠিক আছে কিনা, স্বাস্থ্য আসলে হচ্ছে ‘স্বস্থ’ আছেন কিনা, স্বস্থের ‘স্ব’ মানে নিজে ‘স্থ’ মানে থাক, অর্থাৎ আপনি নিজের স্বাভাবিক স্থিতিতে ঠিক আছেন কিনা। আর অস্বস্থ মানে আপনি নিজের অস্বাভাবিক অবস্থায় আছেন। যখন জ্বর হয় তখন আপনি নিজের মধ্যে আর নেই, মানে এখন অস্বস্থ অবস্থায় রয়েছেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন ‘এই যে আপনি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে আপনি রেগে যাচ্ছেন, শোক করছেন এগুলো বলে দিচ্ছে যে এখন আপনি অস্বস্থ অবস্থায় আছেন, আপনার স্বাভাবিক স্থিতিতে আপনি নেই’।

'আপনি যে এই দীনতাপূর্বক, কৃপণামতির মত আচরণ করছেন, এগুলো করবেন না'। কৃপণ মানে নিজেকে ভেতরের দিকে ছোট করে নিচ্ছে, বাংলায় কৃপণ শব্দের মানে যে নিজের হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে নিচ্ছে। মূলতঃ কৃপণ শব্দের এটাই সঠিক অর্থ, নিজের বিরাটত্বকে ছোট করে ফেলছে। লক্ষ্মণ বলছেন 'যার টাকা-পয়সা নষ্ট হয়ে গেছে, যার ইচ্ছাশক্তি শেষ হয়ে গেছে, একটা চেষ্টা করেছিল কোন ব্যাপারে কিন্তু সফলকাম না হওয়াতে সেই ইচ্ছাশক্তিটাও হারিয়ে গেছে, তারাও যদি উৎসাহ পূর্বক কোন কিছুর ব্যাপারে নতুন করে উদ্যোগ না নেয়, যদি শারীরিক পরিশ্রম না করে তাহলে তো সে আর কোন দিন কোন কিছুই পাবে না'। কেউ অনেক কষ্ট করে টাকা পয়সা অর্জন করার পর কোন কারণে তার সেই টাকা পয়সা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তারপর সে যদি আমার কপালে এই রকমই ছিল বলে পরিশ্রম করা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে তাহলে আর কোন দিনই তার টাকা পয়সা আয় করার কোন সম্ভবনাই থাকবে না। লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে ঠিক এই কথাই বলতে চাইছেন 'দাদা! এই নিরুৎসাহ ভাব দেখানোটা বন্ধ করুন, উৎসাহের মত অমূল্য কিছু নেই, নিজেকে তুলে ধরার ইচ্ছাশক্তির থেকে বড় শক্তি আর কিছু নেই। উৎসাহই আসল প্রেরণা শক্তি। উৎসাহী আর উদ্যোগী পুরুষের কাছে এই সংসারে কোন কিছুই দুর্লভ নয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা উৎসাহ সেটা চঞ্চলতার লক্ষণ, ভক্তিযোগে আছে ভক্তিমান যারা হয় তার উৎসাহী হন, সেখানে উৎসাহী মানে চঞ্চল। অনেক সময় বলা হয় – কি খুব উৎসাহ দেখাচ্ছ, তার মানে চাঞ্চল্যতা প্রকাশ করছে। এখানে লক্ষ্মণ চাঞ্চল্যতার কথা বলছেন না, অন্তর্শক্তির কথা বলছেন, নিজেকে ধরে রাখার ক্ষমতা। লক্ষ্মণ বলছেন – আমরা শুধু উৎসাহকে অবলম্বন করে দেবী সীতাকে খুঁজে বার করব। লক্ষ্মণ উৎসাহকে এখানে ধৃতির অর্থে বলছেন।

লক্ষ্মণ বলছেন – **ত্যজ্যতাং কামবৃত্তত্বং শোকং সন্ন্যস্য পৃষ্ঠতঃ**।৪/১/১২৩। – একটা জিনিষকে হারিয়ে কামী পুরুষরা যেমন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে সেই রকম আপনি করবেন না, কামীদের মত আপনি আচরণ করবেন না। লক্ষ্মণ এই সব বলার পর শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন – **ত্যজ্য শোকঞ্চ মোহঞ্চ রামো ধৈর্যমুপাগতম্।**।৪/১/১২৪। 'আমি শোক আর মোহ ত্যাগ করছি। শোক আর মোহকে যিনি ত্যাগ করতে পেরেছেন তিনি তো সমগ্র বিশ্ব জয় করে নেবেন'। বাল্মীকিও শ্রীরামচন্দ্রের মুখে এই কথাটা ব্যবহার করলেন। গীতাতে অর্জুন বলছেন – *নষ্ট মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদন্ময়াচ্যুত* – আপনার কৃপাতে আমার মোহ নাশ হয়ে গেছে।

বাল্মীকি রামায়ণ – ১৩ই জুন ২০১০

পম্পা সরোবরের কাছে শবরীর সাথে শ্রীরামচন্দ্রের দেখা হয়েছে। শবরীর অক্ষয়লোকে গমনের পর সেখান থেকে শ্রীরামচন্দ্র এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মনে এখন একটাই চিন্তা কি করে সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করা যায়, কেননা কবন্ধ তাঁকে বলেছে সুগ্রীবেরও স্ত্রী হরণ হয়ে গেছে, আপনারা দুজন একে অপরকে সাহায্য করতে পারবেন। পম্পা সরোবরের কাছেই ছিল ঋষ্যমূক পর্বত, সেই পর্বতে সুগ্রীব তার সাঙ্গোপাঙ্গ অন্যান্য বানরদের সাথে অবস্থান করছেন। শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ সেই পম্পা সরোবরের কাছাকাছিই রয়েছেন। দূর থেকে শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের গতিবিধি দেখে সুগ্রীবের মনে আশঙ্কা হল। দেখছেন একদিকে এনারা দুজনে ঋষির বেশে চীর ধারণ করে আছেন। চীর মানে গাছের বল্কল। অথচ তাঁরা আবার অস্ত্র ধারণ করে আছেন। ঋষির বেশে অস্ত্র ধারণ করে থাকা সুগ্রীবের কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। সুগ্রীব মনে করছে ঋষির বেশ ধারণ করেছে এইজন্যই, যাতে আমরা এদের চিনতে না পারি।

আসল ব্যাপার হল সুগ্রীব তার দাদা বালীর ভয়ে এই ঋষ্যমূক পর্বতের শিখরে আশ্রয় নিয়েছেন, বালী এই পর্বতে আসতে পারবে না, কারণ বালীর উপর এক অভিশাপ আছে, এই পর্বতে পা রাখলেই বালীর মৃত্যু হবে। মানুষের মনে ভয় থাকলে যা হয়ে থাকে, চারিদিকেই সে ভয়ের জিনিষই দেখতে পায়।

এর আগে দেখেছিলাম, মারীচ বলছে ‘শ্রীরাম আমাকে এমন মার মেরেছিলেন যে আমি ‘র’ অক্ষরে যা কিছু আছে রত্ন, রথ শুনলেই আমি ভয়ে কাঁপতে শুরু করি’। সুগ্রীবেরও সেই অবস্থা, কোন অচেনা লোক, বা সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই সে মনে করে বালী বা তার কোন গুপ্তচর আসছে। মনের ভেতরে যেটা সব সময় চিন্তন হতে থাকে সেই জিনিষটাই বাইরে প্রকাশ পায়। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে এত বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন যে, যেখানেই সীতার মত কিছু দেখছেন তখনই বাচ্চা ছেলের মত উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন, ঐ বুঝি সীতা। যখনই কোথাও সীতার মত কিছু দেখতে পাচ্ছেন না তখনই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। এটাই মানুষের স্বভাব। শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের এই বৈপরীত্য সাজ-পোশাক আর দুজন অচেনা মানুষকে দেখে সুগ্রীব তাঁর মন্ত্রী হনুমানকে বলছেন – তুমি এই দুজনের কাছে গিয়ে একটু খোঁজ করে দেখতো এদের কি উদ্দেশ্য।

বাল্মীকি বলছেন – **কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ।**।৪/৩/২। হনুমান ভাবছেন, আমি যদি বানর রূপ ধারণ করে দুজনের সম্মুখে দাঁড়াই তাহলে এনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না, আমাকে ও আমার কথাকেও কোন গুরুত্ব দেবেন না। আমি যে সংবাদ নিয়ে তাঁদের কাছে যাচ্ছি, আমি যে সুগ্রীবের মন্ত্রী, বানর রূপ দেখে নিলে তাঁরা বিশ্বাস করবে না। সেইজন্য আমাকে এক ভিক্ষুকের রূপ ধারণ করে তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই শ্লোকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হনুমান যখন শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের কাছে গেছেন তিনি যেন তাঁর লেজ গুটিয়ে অদৃশ্য করেই গেছেন, তারপর মুখের আকৃতি পাল্টে দিয়েছেন। মহিলারা যেমন গাড়ি থেকে নামার আগে মুখে একটু ফেস পাউডার মেখে মেক আপ করে নেয়, হনুমানও যেন একটা মেক আপ করে নিল। এগুলো সবই কবির বর্ণনা, চাঞ্চল্য ত্যাগ করে একটা ভদ্র বেশে গুণীজনদের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। এই শ্লোকটাকে নিয়ে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয় যে বানর, ভাল্লুক যাদের বলা হচ্ছে, এরা অনেকটা তামিল টাইগার্স, ব্ল্যাক ক্যাটস্, ব্ল্যাক প্যান্থারদের মত একটা ট্রুপসের নাম, যারা সেই সময় হয়তো লেজ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াত। হনুমান, সুগ্রীব, বালী এরা কোন ভাবেই জঙ্গলের পশু বানর হতে পারেনা। সত্যিই যদি বানর বা ভাল্লুক হত তাহলে মানুষের ভাষাতো বলতে পারবে না। খুব হলে ওখানকার স্থানীয় আদবাসী হতে পারে। অথবা জঙ্গলে বসবাসকারী কোন ধরণের আদিবাসীও হতে পারে। স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন রাজস্থানে ঘুরছেন তখন ওখানকার সাধুরা তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন লঙ্কা মে কৌন রাজ করতা হ্যায়। স্বামী অখণ্ডানন্দ বলছেন অংরেজ। সাধুরা বলছেন – আরে অংরেজ নেহি, বিভীষণ রাজ করতে হ্যায়। যারা মুর্খ তারা জানে লঙ্কায় এখনও রাক্ষসরাই আছে।

আলবেরুনি একজন নামকরা ঐতিহাসিক পর্যটক ছিলেন। ভারতের ওপরে ওনার একটা বই আছে যাকে ভারতের সব থেকে নির্ভরযোগ্য প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ বলে গণ্য করা হয় আর এই গ্রন্থের সমস্ত তথ্যকে পণ্ডিতরা খুব ভরসা করেন। ভারতে তিনি এসেছিলেন ঠিকই, যদিও পুরো ভারতবর্ষ ঘোরেননি কিন্তু ভারতের উপর প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন। ঐ বইতে তিনি বলছেন ভারতের লোকরা দক্ষিণ দেশের শ্রীলঙ্কার মানুষদের খুব ভয় পায়। নাবিকরা জাহাজ করে যখন মাল নিয়ে যেত তখন তারা সমুদ্রের পারে মাল রেখে দিত, শ্রীলঙ্কার লোকেরা রাত্রে এসে সেই মাল নিয়ে যেত। আলবেরুনির এই তথ্যগুলো একেবারেই ঠিক নয়, কেননা সম্রাট অশোক যখন ভারতবর্ষ শাসন করছেন তখনই তিনি নিজের মেয়েকে সিংহল দ্বীপে পাঠিয়েছিলেন। কিছু লোকের মুখে শুনে আলবেরুনি এই আজগুবি কথা লিখেছিলেন। কোথায় আফগানিস্থান আর কোথায় সিংহল, সূদুর আফগানিস্থান থেকে তিনি সিংহল দ্বীপের সব খবর নিচ্ছেন।

ঐ সময়েরই লেখা হর্ষের দশকুমার চরিতম্ বলে একটা বই আছে, সেখান বর্ণনা আছে মথুরার একজন লোক কিভাবে লঙ্কায় পৌঁছে গিয়েছিল। বলছে যে ঐ লোকটি মথুরায় একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে এমন ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পরেছিল যে গুণ্ডারা তাকে খুব মেরেছে। এমন মার মেরেছে যে লোকটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেছে। লোকটি মরে গেছে ভেবে গুণ্ডারা লোকটিকে ফেলে রেখে চলে গেছে। লোকটিও কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে একটা মরা গরুর পেটের ভেতরে ঢুকে আশ্রয় নিয়েছে। ইতিমধ্যে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। বৃষ্টি পড়ে পড়ে জলে ভিজে মরা গরুর পেটটা ফুলে গেছে, চামড়া মোটা হয়ে মুখটা বন্ধ হয়ে

যাওয়াতে লোকটা আর গরুর পেট থেকে বেরোতে পারছে না। বৃষ্টির জলে ভাসতে ভাসতে কিভাবে যমুনার জলে এসে পড়েছে। ভাসতে ভাসতে যমুনা থেকে গঙ্গায় পড়ল, গঙ্গা থেকে গঙ্গাসাগরে পড়ল, গঙ্গাসাগর থেকে ভাসতে ভাসতে শ্রীলঙ্কা পৌঁছে গেল। লঙ্কার রাক্ষসরা দেখছে একটা মরা গরু, তারা আবার গরুর পেটটা চিরেছে, দেখছে সেখান থেকে আবার একটা মানুষ বেরিয়ে এসেছে। হর্ষ তখন বর্ণনা করছেন – রাক্ষসরা যখন দেখল গরুর পেট থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে এসেছে, তখন ওদের মনে পড়ে গেলে হাজার বছর আগে শ্রীরামচন্দ্র নামে একজন মানুষ এসে তাদের কিভাবে মেরেছিল। মনে পড়তেই সেই ভয়ে এরা কাঁপতে শুরু করেছে। এই রকম একজন অসহায় মানুষ কত দিন না খেয়ে রয়েছে, তাকে দেখেও রাক্ষসরা ভয়ে কাঁপছে। দৌড়ে গিয়ে তারা বিভীষণকে খবর দিয়েছে। বিভীষণ তো শুনেই ভাবছে ওরে বাবা, মানুষ মানে শ্রীরামচন্দ্রের বংশের লোক এসে গেছে আবার। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন একজন মানুষ লঙ্কায় পৌঁছে গিয়েছিল। তাকে দেখে বিভীষণের শ্রীরামচন্দ্রের কথা মনে পড়ে যায়, এও সেই শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর। এগুলো সবই কাল্পনিক কাহিনী, কথা ও কাহিনী বাড়তে বাড়তে অনেক রূপ ধারণ করে নেয়। পরে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা বোঝা খুব কঠিণ হয়ে যায়।

বাল্মীকি রামায়ণ অধ্যয়ন করার সময়, সঠিক ইতিহাস জানার সময় আমাদের মাথা থেকে এই ধারণাকে একেবারে ফেলে দিতে হবে যে সুগ্রীব, হনুমান এরা বানর বা ভাল্লুক ছিলেন। কিন্তু যখন আবার ভাব রাজ্যে ঢুকব, সাধনা যখন করব তখন হনুমানকে আবার বানর বানিয়ে নিতে হবে, হনুমানের একটা লেজও রাখতে হবে। অনেক উচ্চ শিক্ষিত আধুনিক যুগের ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখেন এমন এমন সন্ন্যাসীরাও হনুমান চালিশা পাঠ করেন যাতে মনে একটা শক্তি আসে।

এখানে বাল্মীকি বলছেন বানরের রূপ হনুমান ত্যাগ করলেন, কিন্তু হনুমানের লেজটি কোথায় যাবে? যাই হোক, হনুমান শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন 'আপনারা কারা? আপনাদের ধনুক দেখতে অতি সুন্দর ও বিচিত্র'। চিত্র থেকে বিচিত্র, যখন বিশেষ রূপে চিত্রিত করা হয় তখন বিচিত্র বলে। 'ধনুক যেমন দেখতে সুন্দর ও বিচিত্র তেমনি খুব সুলক্ষণ। জংলী লোকেরা যে ধরণের ধনুক ব্যবহার করে সেই রকম নয়। ধনুক দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এর অনেক ব্যবহার হয়েছে। আপনাদের ধনুকে আবার সোনা লাগান রয়েছে। বলা হয় ধনুকে যদি সোনা লাগান থাকে তাহলে ধনুকের শক্তি বেড়ে যায়'।

হনুমান বলছেন 'আপনারা এত উন্নত মানের সুন্দর সুন্দর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঘুরছেন অথচ যোগীবেশ ধারণ করে আছেন? আপনাদের মধ্যে এই বৈপরিত্য কেন'? হনুমান আরও অনেক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। প্রশ্ন করে বলছেন 'আপনাদের আমি বার বার প্রশ্ন করে যাচ্ছি কিন্তু আপনারা আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিচ্ছেন না। তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি এখানে কাছে সুগ্রীব নামে একজন বানররাজ আছেন, যিনি একজন বড় ধর্মাত্মা পুরুষ, আমি সেই সুগ্রীবেরই দূত, তিনিই আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন, আমার নাম হনুমান। আমি হলাম – **হনুমান নাম বানরঃ**'। হনুমান নিজেকে বানর বলছেন মানে বানর এখানে একটা আদিবাসী বা কোন জাতির নামও হতে পারে। কর্মকার, স্বর্ণকার, বণিক যেমন বিভিন্ন জাত হয়, যারা পাখি, জন্তু ধরে বেড়ায় তারাও একটা জাতি, বানরও সেই রকম কোন জাতি হতে পারে।

হনুমান বলছেন 'সুগ্রীব আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছেন। আমি হলাম বায়ুদেবতার বানর জাতীয় পুত্র'। হনুমানের মায়ের নাম অঞ্জনী। একবার অঞ্জনীকে দেখে বায়ুদেবতা খুব মুগ্ধ হয়ে যান। পৌরাণিক কাহিনীতে প্রায়ই দেখা যায় আমাদের ঋষি বা দেবতারা সুন্দরী নারী দেখলেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। বায়ু দেবতা অঞ্জনীকে দেখে মুগ্ধ হয়েই বলছেন আমি তোমার সঙ্গ করতে চাই। অঞ্জনী বলছে 'তা কি করে সম্ভব আমি তো একজনের বিবাহিতা স্ত্রী'। বায়ু দেবতা বলছেন 'না না, আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইছি না, তোমাকে আমার বায়ুর শক্তি রূপে আমি আলিঙ্গন করছি। মানে এই স্থূল শরীর দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন করব না'। অঞ্জনীকে বায়ু দেবতা বোঝাচ্ছেন 'তুমি যে মনে করছ তুমি দুশ্চরিত্রা হয়ে যাবে, কিন্তু দুশ্চরিত্রা তুমি হবে কি করে, যদি শরীর শরীরের সাথে সংস্পর্শ হয় তবেই তো তুমি দুশ্চরিত্রা হবে। কিন্তু

আমি বায়ু রূপে তোমাকে স্পর্শ করছি'। তখন অঞ্জনীর আর কিছুর বলার বা করার ক্ষমতা ছিল না। সেখান থেকে হনুমানের জন্ম হল, সেইজন্য তার নাম হল অঞ্জনী পুত্র পবনসূত হনুমান, পবন আর অঞ্জনীর পুত্র।

উপনিষদে প্রায়ই একটা আলোচনা আসে, মুখ্য দেবতা সম্বন্ধে – দেবতাদের মধ্যে কে প্রধান। তখন সব সময়ই বলা হবে প্রাণ। আমাদের শরীরের যত গুলো ইন্দ্রিয় আছে তাদের প্রত্যেকটির একজন করে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। দেবতা বলতে বোঝায় যিনি আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলিকে চালনা করছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হচ্ছে মুখ্য দেবতা হচ্ছেন প্রাণ। প্রাণকে যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন তাঁকে বায়ু রূপে বোঝান হয়, বায়ুই প্রাণের মাধ্যম। কিন্তু প্রাণের মাধ্যম সব সময়ই যে বায়ু হবে তা নয়, যেমন কুম্ভক, যখন নিঃশ্বাস নিয়ে বন্ধ করা বা নিঃশ্বাস ছেড়ে দম বন্ধ করে রাখা হয়, তখন এই প্রাণশক্তি যেখানে খুশি প্রয়োগ করা যায়। তবে অনভিজ্ঞ যোগীরা কুম্ভক করতে গেলে তাদের মাথার বিকৃতি এসে যাবে, গুরুর কাছে আগে অনেক দিন অভ্যেস করে নিতে হয়। কারুর শরীরে যখন রোগ ব্যাধি হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বিকৃত থাকে তখন বুঝতে হবে তার সেই অঙ্গে প্রাণশক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এই প্রাণশক্তিকে প্রয়োগ করে যে কোন ধরণের রোগ, যে কোন ধরণের বিকৃত অঙ্গ, যে কোন ধরণের দুর্বলতাকে নিরাময় করা যায়। সমস্ত রকমের শারীরিক ব্যাধি, দুর্বলতার মূলে প্রাণশক্তির অভাব বা প্রাণশক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। কারুর যদি পেট খারাপ হয় বুঝতে হবে তার হজমের প্রাণশক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। শরীরে হাত বা পা বা শরীরের কোন অঙ্গ খুব বেশি মাত্রায় ফুলে উঠেছে, তার মানে প্রাণশক্তি ওখানে বেশি পরিমাণে প্রবাহিত হচ্ছে, যতটা যাওয়ার কথা তার থেকে বেশি যাওয়ার ফলে প্রাণের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। প্রাণের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া মানেই শরীরের নানা রকমের গোলমাল হবে।

এই প্রাণ মুলতঃ বায়ুকে নিয়েই চলে। সেইজন্য সংসারে যা কিছু আছে সব চলে গেলেও যতক্ষণ বায়ু থাকবে জীবন চলতে থাকবে, কিন্তু বায়ু যদি একবার চলে যায় তাহলে জীবনের স্পন্দনও স্তব্দ হয়ে যাবে। এই বায়ু দেবতার পুত্র হচ্ছেন এই হনুমান, বায়ু দেবতা তাঁর সব শক্তি এই পুত্রের উপর ঢেলে দিলেন। কোন কিছুতেই হনুমানকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারবে না।

হনুমানের সব প্রশ্ন শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ শুনছেন। শ্রীরামচন্দ্র খুব মৃদু স্বরে যাতে হনুমান না শুনতে পান, তেমন করে লক্ষ্মণকে বলছেন – **ন নৃদ বেদ বিনীতস্য**। 'হে লক্ষ্মণ! এই হনুমান যে ভাষাতে কথা বলছে, যে ঋকবেদ পাঠ করেনি সে কিন্তু এই ভাষাতে কথা বলতে পারবে না। **ন অযজুর্বেদ ধারিণঃ** – যে যজুর্বেদকে ধারণা করেনি সেও এই ভাষায় কথা বলতে পারবে না। **ন সামবেদ শক্যং** – যে সামবেদ অধ্যয়ন করেনি তার কথার মধ্যেও এই ধরণের ভাষা পাওয়া যাবে না'।

ঋক, সাম ও যজুর্বেদ এই তিনটি বেদের কথা বাল্মীকি এখানে বলছেন। এই তিনটি বেদ উপযুক্ত আচার্যের কাছে যাঁর রীতিমত অধ্যয়ন করা নেই তাঁর ভাষা এত সুন্দর হতে পারে না। আমরা এর আগে প্রাকৃত শব্দের আলোচনা করছিলাম, প্রাকৃত শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে সংস্কৃত। প্রাকৃত শব্দের একটা অর্থ হয় স্বাভাবিক, মানে যেমনটি জন্মেছিল তেমনটিই রয়েছে, জন্মের পর থেকে এর কোন রকম সংস্কার করা হয়নি। প্রাকৃতর উল্টো হল সংস্কৃত, মানে জন্মের পর তার অনেক সংস্কার করা হয়েছে, সংস্কার করা হয়েছে মানে তাকে অনেক শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া হয়েছে। হনুমানেরও অনেক সংস্কার করা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আরও বলছেন 'এ নিশ্চয়ই অনেকবার ব্যাকরণ পড়েছে, কারণ **বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্**।।৪/৩/২৯। তখন থেকে এই হনুমান অনেক কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এর মুখ থেকে একটা অশুদ্ধ শব্দ বেরোয়নি'। মঠের একজন সিনিয়র মহারাজ প্রায়ই জুনিয়র মহারাজদের বলতেন 'বেশি কথা বলতে যেওনা, বেশি যদি কথা বল তাহলে ভেতরে থেকে চুনোপুটি সব বেরিয়ে আসবে। যাঁরা অতি বিদ্বান তারা মুখ খোলেন না, আবার যারা অতি মুর্খ তারাও মুখ খোলে না, মুখ খুললেই ধরা পড়ে যাবে। এক মুর্খ জামাই শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে, তাকে বাড়ি থেকে সব বুঝিয়ে টুঝিয়ে দিয়ে বলে

দিয়েছে, একেবারেই চুপ করে থাকবি না, দুই একটা কথা বলবি। কি কথা বলবে সে, কথা বলতে তো জানেই না। শ্বশুর মশাইর সাথে হাঁটতে বেরিয়েছে, একটু কথা বলতে হয়, কি কথা বলতে হবে ভেবে পাচ্ছে না, তাই জিজ্ঞেস করছে – শ্বশুর মশাই আপনার কি বিয়ে হয়েছে? যেমনি মুখ খুলেছে তেমনি তার চুনোপুটি বেরিয়ে এসেছে’।

যে কোন মানুষকে যদি কিছুক্ষণ কথা বলতে দেওয়া হয়, তখন তার সেই কথা বলার মধ্যে সে যে সব শব্দ চয়ন করছে, আর সেই শব্দের ব্যাকরণ ব্যবহার করছে, তাতেই তার শিক্ষা সংস্কৃতির মান ধরা পড়ে যাবে, বোঝা যাবে সে কেমন প্রশিক্ষণ পেয়েছে। যদি দেখা যায় কথার মধ্যে শব্দ চয়ন ঠিক নেই, তার মানে তাকে ঠিক জায়গায় উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা ঘষা মাজা করা হয়নি। আমরা বাড়িতে যে ভাবে, যে ভাষায় কথা বলি, কর্মক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সেই ভাষাতেই কথা বলি। কিন্তু অপরিচিত কোন সম্মানিত লোকের সামনে আমরা সেই ভাষাতে কথা বলিনা। হনুমানকে দেখিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – হনুমান এত কথা বলছে কিন্তু ব্যাকরণে কোথাও এতটুকু ভুল নেই। সংস্কৃত ভাষার ব্যকরণ যে কত কঠিন সেই ব্যাপারে আমাদের মোটামুটি সবারই একটু অভিজ্ঞতা আছে।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন ‘হনুমান যখন কথা বলছে তখন তার মুখ, চোখ, ললাট, ভ্রু এবং অন্যান্য কোন অঙ্গে কোন দোষ দেখা যাচ্ছে না, যা বলার পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাবে বলে যাচ্ছে’। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা যার সঙ্গেই কথা বলুক, কথা বলার সময় কত ভাবে ঘাড় নাড়াবে, চোখ, ভুরু, হাত নাচাবে, কতবার কোমর ঘোরাবে ঠিক নেই। ব্যাঙ্গালোরে একজন ফরাসী ভদ্রলোক একটা এয়ারক্রাফট কোম্পানী খুলেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি দুই ধরণের হাল্কা এ্যারোপ্লেন বানাচ্ছেন, তার মধ্যে একটি মডেলের নাম হনুমান দিয়েছেন। ভারত সরকারের অনেক রকমের ঝামেলার জন্য বছরে যা তিরিশ চল্লিশটা এ্যারোপ্লেন এরা তৈরী করছে, তার সবটাই বিদেশে বিক্রী করে দিচ্ছে। একটা সমীক্ষাতে বলছে যে ছোট এয়ারক্রাফটের মধ্যে বিশ্বে এদের তৈরী এয়ারক্রাফটই সব থেকে মজবুত। এই কারখানা করার সময় যখন প্রথম এরা ভারতে এসেছিল ভারতকে ওদের ভালো লেগে গিয়েছিল। জে.আর.ডি.টাটা তখনও বেঁচে ছিলেন, জে.আর.ডি. টাটারও এ্যাভিয়েশনে প্রজেক্ট ছিল। এরা ভারতে প্রথম এসে ঠিক করল টাটাকে গিয়ে তাদের নতুন এই প্রজেক্ট সম্বন্ধে জানাবে।

টাটা খুব ব্যস্ত মানুষ ছিলেন, তাও তিনি এদের সময় দিয়েছেন দেখা করার। এই দুজন ফরাসী ভদ্রলোক টাটার কাছে গেছে। টাটাকে সব বুঝিয়ে এরা বললেন ‘আমরা ভারতে হাল্কা এয়ারক্রফট বানাতে চাই, ভারতে এই ধরণের এয়ারক্রাফট তৈরী হয় না, আমরাই প্রথম এই ধরণের প্রজেক্ট তৈরী করতে যাচ্ছি। ভারতে একবার দুবার ঘুরে আমাদের এই দেশ খুবই ভালো লেগেছে বলেই এই জিনিষে হাত দিয়েছি’। পরে এক সাংবাদিকের কাছে ফরাসী এই দুজন বর্ণনা দিচ্ছেন ‘আমরা অতক্ষণ ধরে প্রজেক্ট নিয়ে এত কথা বললাম কিন্তু টাটা আমাদের একটা কথাও শোনেননি, শুধু আমার বন্ধু যে সব ব্যাপারটা ওনাকে বোঝাচ্ছিল তিনি তার চোখের দিকে শুধু তাকিয়ে ছিলেন। চোখের দিকে তাকিয়ে টাটা যেন মেপে নিচ্ছিলেন এরা যা বলছে করতে পারবে কিনা। দশ মিনিট কথা বলার পর যখন আলোচনা শেষ হল তিনি শুধু বললেন – ঠিক আছে সব শুনলাম কিন্তু আমি আপনাদের পার্টনারশিপে যেতে পারব না, আমাদের অসুবিধা আছে। বলেই একটা লিস্ট দিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন যে এদের কাছে আপনারা চলে যান, গিয়ে আমার নাম করবেন এরাই আপনাদের সাহায্য করবে’। এই ঘটনাটা হচ্ছে ১৯৭০ সালের, অত বছর আগে টাটা কয়েক লক্ষ টাকার একটা চেক লিখে এমনি গিফট দিয়ে বলে দিলেন এটা আমার তরফ থেকে। এরা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন একটা মহিন্দার জীপ তাদের কাছে গিফট হিসাবে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। টাটা এদের একটা কথাও শুনছিলেন না, শুধু তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে মেপে নিচ্ছিলেন তারা যে কাজটা করতে যাচ্ছে তাতে এদের কত দম আছে।

শ্রীরামচন্দ্রও তাই বলছেন ‘দ্যাখো! **অন্যেষ্বপি চ সর্বেষু দোষঃ সংবিদিতঃ ক্বচিৎ।।** ৪/৩/৩০ – কথা বলার সময় এঁর কপাল, ভুরু, চোখের মধ্যে কোন ধরণের দোষ নেই। তার মানে এর মধ্যে কোন প্রকার ছল চাতুরি নেই, পুরোপুরি সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে’। এর আগে বললেন এর ব্যাকরণে কোন দোষ নেই তার মানে হনুমান খুবই শিক্ষিত ও রুচীবান, তার আগে বললেন এর বেদ অধ্যয়ন করা আছে, কারণ যে ভাষা হনুমান ব্যবহার করছে সেটা সুসংস্কৃত, জংলী নয়, সংস্কৃত ভাষা এর রক্তেই মিশে আছে। প্রথমে হচ্ছে শব্দ চয়ন, তারপরে শব্দের ব্যাকরণ, তৃতীয় এর হাবভাবে কোন দোষ নেই। শেষে বলছেন ‘হনুমান কম সময়ে খুব অল্প কথাই বলেছে, কিন্তু এই অল্প কথা দিয়েই স্পষ্ট ভাবে নিজের অভিপ্রায়কেও বুঝিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে হনুমান কি চাইছে দুটি কথাতেই বুঝিয়ে দিয়েছে’। যাদের মধ্যে কোন জটিলতা থাকে না, চিন্তাভাবনা গুলো খুব পরিষ্কার, তারা দুটি কথাতেই সব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পারে। বড় বড় অফিসে কর্তা ব্যক্তিদের কাছে একটা কয়েক কোটি টাকার প্রজেক্ট নিয়ে দেখা করতে গেলে কতটুকু সময় দেবে, ঘড়ি ধরে হয়তো পাঁচ-দশ মিনিট সময় দেব, কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যে আপনার সব কিছু বুঝিয়ে বলে দিতে হবে আপনি কি করতে চাইছেন। আপনার দুটো কথাতেই এরা ধরে নেবে আপনি কি করতে চাইছেন, আপনার কতটা ক্ষমতা আছে।

বাল্মীকি মানুষের এই গুণটাকেই হনুমানের মধ্যে আরোপ করে দেখিয়ে দিলেন। কতটা মার্জিত, যুক্তি সম্মত, স্পষ্ট আপনার ভাষা। একটা কথাতেই বুঝে নেবে আপনার প্রশিক্ষণটা কেমন হয়েছে। হনুমানের কি কি প্রশিক্ষণ হয়েছে? শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের দুটো কথাতেই বুঝে নিয়েছেন যে – এর বেদ পড়া, ব্যাকরণ ভালো মত রপ্ত করেছে, কথা বলার সময় শরীরের সব অঙ্গ গুলো সংযত, খুব অল্প কয়েকটি শব্দে, একটি কি দুটি বাক্যে বলে দিচ্ছে আমি কেন আপনাদের কাছে এসেছি। যখন হনুমান কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করছে তখন সেটা আমার কাছে পরিষ্কার, আর এটাও সে বুঝে নিচ্ছে যে সে যেটা বলছে আমি বুঝে নিতে পেরেছি, তাকে বলতে হচ্ছে না যে – আপনি বুঝলেন তো আমি কি বলতে চাইছি। হনুমান থেমে থেমে কথা বলছে না, শব্দগুলিকে ভেঙ্গে, উপড়ে দিয়ে বাক্য তৈরী করছে না। কিছু কিছু শিক্ষিত লোক বেশি স্টাইল করে ইংরাজী বলার সময় শব্দগুলোকে এমন চিবিয়ে চিবিয়ে বলবে, মনে হবে সরষেকে যেমন পিষে পিষে তেল বার করা হয়, ঠিক সেই ভাবে শব্দগুলিকে পিষে পিষে যেন তেল বার করছে। হনুমান কোন শব্দকে এমন ভাবে কখনই উচ্চারণ করছে না যাতে কর্ণকটূ হয়। ভাত খাওয়ার সময় যদি দাঁতে কাঁকড় পড়ে তখন কেমন লাগে? ঠিক তেমনি যখন লোকেরা কথা বলে, কিছু কিছু শব্দ আছে, কিছু কিছু উচ্চারণ বিধি আছে, সেগুলো যদি বিধি মত উচ্চারণ না করা হয় তখন ভাত খাওয়ার সময় দাঁতে কাঁকড় পড়ার মত মনে হবে।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন ‘এনার বাণী হৃদয়ে অবস্থিত’। মানে হনুমান যে শুধু গলা দিয়ে কথা বলছেন তা নয়, নাক দিয়ে উচ্চারণ করছেন তা নয়, কথা বলার সময় হনুমানের গলা খুব উঁচুও নয় আবার নীচু স্বরেও বলছেন না। গুপীগাইন বাঘাবাইনে যেমন বলছে – ফিস্‌ফিস্‌ করে কেন কথা বলছ, কানে বাতাস লাগছে না! হনুমান ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে না, আবার খুব চেঁচিয়েও বলছেন না। গলার স্বর একেবার সমান। এইগুলোই বুঝিয়ে দেয় একজন মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও আত্মবিশ্বাস কতটা আছে। যাঁরা এগুলো নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা কারুর সাথে পাঁচ মিনিট কথা বললেই বুঝে নেবেন লোকটি কতটা জটিল, কত প্যাঁচ আছে, সরল কতটা, বোকা কতটা, মানে তার পুরো এ্যনাটমিটা বলে দেবেন। আবার কি ধরণের পেশায় সে নিযুক্ত আছে সেটাও বোঝা যায়।

শ্রীরামচন্দ্রও বুঝে নিয়েছেন যে হনুমান এমন একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ, যাঁকে বিশ্বাস করা যায়, যাঁর সাথে প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। সুগ্রীবের নাম শুনে শ্রীরামচন্দ্র খুব খুশি হয়েছেন, বলছেন ‘আমি তো সুগ্রীবকেই খুঁজতে এসেছি’। সুগ্রীবের যে দূত তাঁর প্রথম পরীক্ষা তো হয়েই গেছে, তিনি হচ্ছেন পরিষ্কার মনের মানুষ, সুসংস্কৃতবান এবং জ্ঞানী। তিনটেই তাঁর আছে।

সুগ্রীবের কাছে খবর গেছে, খবর পেয়ে সুগ্রীব নিজেই শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসেছেন। সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন 'হে রামচন্দ্র! আমরা জাতিতে বানর আর আপনি হলেন নর জাতি, যদি আমাদের মধ্যে মৈত্রী হয়ে যায়, তাতে আমারই উপকার বেশি হবে, আপনি হচ্ছে মানবজাতি, আমাদের থেকে মানুষ উচ্চশ্রেণীর প্রাণী'। আসলে সুগ্রীব তো জানেনই না এঁরা কারা, কি জন্য এখানে এসেছেন, মৈত্রী করার জন্যই যে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এঁরা জানেই না। সুগ্রীব তখন বলছেন 'আপনি যদি আমার বন্ধুত্ব চান, এই আমি আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলাম'। এদিকে তখন হনুমান যে ভিক্ষুক রূপ ধারণ করেছিল সেই ভিক্ষুক রূপ ত্যাগ করে আবার নিজের হনুমান রূপ ধারণ করে নিয়ে দুটো কাঠে অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন। হনুমান খুব একগ্র চিত্তে অগ্নিকে স্থাপিত করলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে আগুন জ্বালালেই আগুন স্থাপিত হয়ে যায় না। এখন সিগারেটে আগুন ধরালেই কি অগ্নিদেবতা হাজির হয়ে যাবেন? না, অগ্নিদেবতা আসবেন না। অগ্নিদেবতাকে স্থাপিত করতে হয়। এই যে বাতাস বইছে, এই বায়ুতে কি প্রাণ আছে? না, নেই। প্রাণকেও স্থাপিত করতে হয়। যখন আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি তখন বায়ুর উপর চেপে প্রাণটা চলে। ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ছবি বাড়িতে নিয়ে টাঙালেই হয় না, যতক্ষণ না ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে স্থাপিত না করা হয় ঐ ছবির কোন দাম নেই। ঠিক তেমনি আগুন জ্বালিয়ে অগ্নিদেবতাকে আহ্বাণ করে স্থাপিত করতে হয়।

হনুমান অগ্নিকে স্থাপিত করার পর সুগ্রীব আর শ্রীরামচন্দ্র দুজনে মিলে ঐ অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করলেন, বিয়ের সময় বর আর বউ যেমন অগ্নির চারিদিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে, শ্রীরামচন্দ্র ও সুগ্রীব দুজনেও ঠিক সেইভাবে প্রদক্ষিণ করলেন। তুলসীদাসের রামচরিতমানসে এই দৃশ্যের খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে অগ্নিকে সাক্ষি রেখে কোন কাজ করা আমাদের খুব প্রাচীন প্রথা। রামকৃষ্ণ মিশনে যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে বিদ্যার্থি হোম হয়। দুজনে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করার পর বলছেন – **মে হ্যেকং দুঃখং সুখঞ্চ নৌ**।৪/৫/১৭। আজ থেকে তোমার দুঃখ আমার দুঃখ তোমার সুখ আমার সুখ। এই হল শ্রীরামচন্দ্র আর সুগ্রীবের মিলন। খুব সুন্দর একটা দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমাদের প্রধান বিষয় তা হল হনুমানের সংস্কৃতি আর তাঁর ভাষা, ব্যবহার।

এখন হনুমান কি সত্যিই বানর ছিলেন? আজকার Dog School গুলিতে কুকুর গুলোকে ট্রেনিং দেওয়া হয় তখনকার দিনে কি Monkey School ছিল, যেখানে হনুমানকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল? বানরদের ঐ স্কুলে হনুমান বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন? আসলে হনুমান কখনই বানর ছিলেন না, এটাই একমাত্র হতে পারে তখন বানর নামে কোন জাতি ছিল, যারা বনে জঙ্গলে বা পাহাড়ে টাহাড়ে বাস করত। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের পর যখন সুন্দরকাণ্ডে আসবে তখন বাল্মীকি সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের নাম কোথাও উল্লেখ করেননি। বাল্মীকি রামায়ণ পুরোটাই রামকথা, কিন্তু একমাত্র সুন্দরকাণ্ডে একটি বারও শ্রীরামচন্দ্রের নাম করা হয়নি। সুন্দরকাণ্ড একমাত্র হনুমানকেই উৎসর্গ করা হয়েছে। এতক্ষণ যে কাহিনীর মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি তার বেশির ভাগই শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে। শুধু একটি জায়গায়, যেখান রাবণ সীতাকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে সেখান শ্রীরামচন্দ্র নেই। সুন্দরকাণ্ডে যেভাবে হনুমানের বীরত্ব, শক্তির বর্ণনা করেছেন, পরিষ্কার বোঝা যায় হনুমানের প্রতি, তাঁর জাতির প্রতি বাল্মীকির কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বাল্মীকিরও নিশ্চয়ই কোন ধারণা ছিল যে আমি কার সম্বন্ধে সুন্দরকাণ্ডে বর্ণনা করছি, একটা বানরের সম্বন্ধে আমি নিশ্চয় লিখছি না।

এবার শ্রীরামচন্দ্র আর সুগ্রীবের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন 'আমি তো এক সাধারণ বানর, বানর স্বভাবেই চঞ্চল, কিন্তু আমি একি দেখছি! আপনি একজন মানুষ, কিন্তু আমি বানর হয়ে আমার স্ত্রীর জন্য তো এত বিলাপ করছি না যতটা আপনি করছেন মা সীতার জন্য, আপনি একদম ধৈর্য হারাবেন না। যখন কোন মানুষের শোক হয়, অর্থের সঙ্কট হয় এবং প্রাণান্তকারী ভয়ের উদ্ভব হয় – এই তিনটে ক্ষেত্রে যখন সে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কিভাবে এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, তখন সে কিন্তু কোন দিন কষ্ট পায় না'।

সুগ্রীব তিনটে অবস্থার কথা বলছেন – শোক, অর্থ সঙ্কট আর ভয়। এই তিনটে ক্ষেত্রে বুদ্ধি দিয়ে যে বিচার করে এখন আমি কি করতে পারি, কি করা উচিৎ, তার কিন্তু আর কোন কষ্ট আসে না। কিন্তু মানুষ পারেনা, এই তিনটে অবস্থাতে মানুষ অসহায় হয়ে নিজেকে ছেড়ে দেয়, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে একটা চিন্তা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে *'তাঁর ইচ্ছে হলে হবে'*, এই ভাবটাই আমাদের পুরো জাতিকেই সর্বনাশ করে ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের দর্শনে কোথাও এই কথা বলা হয় না। এখানে বলা হচ্ছে এই তিনটে হলে নিজের বুদ্ধিকে লাগাতে হবে। সুগ্রীব বলছেন – যে মানুষ সব সময় ভয়ে আতঙ্কিত, তার নৌকা যেন জলে ডুবে গেছে, শোকের তাপে যেমন জীবনটা ডুবে যায়, যেমন নৌকার মধ্যে জল ভর্তি হয়ে গেলে নৌকা ডুবে যায়।

এর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে জিজ্ঞেস করছেন 'শুনেছি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল? কেন হয়েছিল'? সুগ্রীব তখন বলছেন 'দাদা আমার বউকে নিয়ে নিয়েছে'। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – **উপকারফলং মিত্রং বিদিতং মে মহাকপে**।।৪/৫/২৫। বন্ধুত্বের ফল হচ্ছে উপকার আর শত্রুতার ফল হচ্ছে অপকার। আমি আর তুমি যদি বন্ধু হই, তাহলে আমি তোমার উপকার করব তুমি আমার উপকার করবে। যদি আমরা একে অপরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হই তাহলে আমি তোমার ক্ষতি করতে চাইব তুমি আমার ক্ষতি করতে চাইবে। আমি তো তোমার সাথে বন্ধুত্ব করে নিয়েছি, এবার দ্যাখো, আমি এক্ষুনি বালির বধ কিভাবে করতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছি, তুমি জেনে নাও বালির আয়ু শেষ হয়ে গেছে।

বালি আর সুগ্রীবের শত্রুতার কাহিনী সংক্ষেপে এই রকম, দুন্দুভি নামে এক অসুর ছিল। দুন্দুভি মাঝে মাঝেই বালির সঙ্গে লড়াই করতে আহ্বাণ জানাত। একবার এই রকম চ্যালেঞ্জ করাতে, বালি তখন সুগ্রীবকে নিয়ে দুন্দুভিকে তাড়া করেছে, তাড়া খেয়ে দৌড়ে দৌড়ে অনেক দূরে একটা পাহাড়ের গুহার মধ্যে দুন্দুভি ঢুকে গেছে, বালিও সেই গুহার মধ্যে ঢুকে গেছে, ঢোকার আগে সুগ্রীবকে বলেছে – আমি যতক্ষণ না ফিরে আসে তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক। এইভাবে অনেক দিন কেটে গেল, সুগ্রীব ভাবল দাদা হয়তো মারা গেছে, আবার দেখছে গুহার মুখ থেকে রক্তের ধারা নেমে আসছে। সুগ্রীব নিশ্চিত হল যে দাদা নিশ্চয়ই দুন্দুভির হাতে মারা গেছে। কিন্তু সুগ্রীব কেন যে ধরে নিল যে আমার দাদাই মারা গেছে, এখানেও একটু সন্দেহ জাগে। যাই হোক, সুগ্রীব গুহার মুখটা একটা বড় পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে রাজধানীত এসে রাজা হয়ে বসে গেল। কিন্তু বালি দুন্দুভিকে বধ করে এসে দেখে গুহার মুখটা পাথর দিয়ে বন্ধ করা আছে। বহু কষ্টে পাথরটাকে সরিয়ে এসে আবার দেখল সুগ্রীব রাজা হয়ে বসে গেছে। তখন বালির তো সুগ্রীবের উপর প্রচণ্ড রাগ চড়ে গেছে, মেরেই ফেলতে যায়, যাই হোক সুগ্রীবকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে আর ওর বউকে হরণ করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। বালির উপর এক মুনির অভিশাপ ছিল যে বালি ঋষ্যমূক পাহাড়ে গেলেই বালির মৃত্যু হবে, সেইজন্য বালি ঋষ্যমূক পাহাড়ের ধারে কাছে কখন যেত না, সুগ্রীবও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোদের নিয়ে ঐ ঋষ্যমূক পাহাড়েই আশ্রয় নিয়েছে।

সুগ্রীব আর শ্রীরামচন্দ্রের যখন কথাবার্তা চলছে তখন সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে বালির ব্যাপারে বুঝিয়ে দিচ্ছেন 'হে রামচন্দ্র! বালিকে আপনি সামান্য কিছু মনে করবেন না, বালির কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি। এই যে এখানে দুন্দুভির মৃত শরীরটা পড়ে আছে, এই শরীরটাকে বালি এক লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলেছিল। আপনি যদি ঐ রকম শক্তি দেখান তাহলে বুঝতে পারব যে আপনার মধ্যেও বালির মত শক্তি আছে'। তখন শ্রীরামচন্দ্র করলেন কি, তার পায়ের আঙুলের আংটা দিয়ে একটু ঠেকিয়ে দিতেই ওটা অনেক দূরে ছিটকে গিয়ে পড়েছে। এগুলোকে বলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। তখন সুগ্রীব বলছেন 'বালি যখন পা দিয়ে টোকা দিয়েছিল তখন তো এই মরা শরীরটা শুকনো ছিল না, এখনকার তুলনায় অনেক ভারী ছিল, এখন তো এটা শুকিয়ে গেছে। আপনি এক কাজ করুন, এই যে বিরাট সাত খানা পর পর শাল বৃক্ষ আছে বালি বাণ দিয়ে এক সাথে সবটাকে বিঁধে দিত'। শ্রীরামচন্দ্র তখন একটা বাণ নিয়ে এমন ভাবে সন্ধান করে ছাড়লেন যে, সাত খানা শাল বৃক্ষকে এক সাথে ছেঁদা করে বাণটা আবার তাঁর কাছে ফেরত চলে এল। অনেক

জায়গায় বর্ণনা করা হয় তীরটা সাতটা লোককে ভেদ করতে করতে পাতালে চলে গিয়েছিল। পাতাল থেকে আবার সাতটা লোক পরিক্রমা করে আবার শ্রীরামচন্দ্রের তূণের মধ্যে ঢুকে গেছে। এবার সুগ্রীব বলছেন ‘হ্যাঁ, এবার আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনিই পারবেন বালিকে বধ করতে’।

এবার আরম্ভ হবে বালি আর সুগ্রীবের লড়াই। বালি আর সুগ্রীবকে দেখতে একই রকম, কেউ না বলে দিলে বোঝা মুশকিল কে বালি আর কে সুগ্রীব। শ্রীরামচন্দ্রও বুঝতে পারছেন না, বাণটা কার উপর চালাব। এদিকে বালি সুগ্রীবকে উল্টে ফেলে খুব মার দিতে শুরু করেছে। সুগ্রীব তখন প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে কোন রকমে আবার নিজের জায়গায় ঋষ্যমূক পাহাড়ে চলে এসেছে। সুগ্রীব তো ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছে। শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন ‘এই যে বললেন আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, কিন্তু আমি তো আজ মরতে মরতে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছি’। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন ‘দ্যাখো, তোমাদের দুই ভাইকে একই রকম দেখতে বলে আমি বুঝতে পারছিলাম না কে সুগ্রীব আর কে বালি। এক কাজ কর একটা মালা তোমাকে দিচ্ছি, তুমি গলায় সেই মালাটা পরে নাও, তাহলে যুদ্ধের সময় আমি তোমাকে চিনতে পারব।

এইসব বলে শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে আবার বালির কাছে পাঠাতে চাইছেন, কিন্তু সুগ্রীব একটু আগে বালির হাতে এমন মার খেয়েছে যে ঐ মারের কথা ভুলতে পারছে না, ভয়ে আর যুদ্ধ করতে যেতেই চাইছে না। কিন্তু বারবার শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে বোঝাতে চাইছেন যে এই কারণে গোলমাল হয়ে গেছে, তোমাকে আর বালিকে আলাদা করে সনাক্ত করতে পারছিলাম না। এখনতো আর এই গোলমাল হবে না, যেমন করে সাত খানা শাল বৃক্ষকে আমি এক বাণে ভেদ করেছি, ঠিক সেইভাবে এইবার বালি মারা গেছে এটা তুমি বুঝে নাও।

মাঝ রাত্রে গিয়ে সুগ্রীব আবার বালিকে যুদ্ধের জন্য হুমকি দিয়েছে। সুগ্রীবের গলা শুনতেই বালি এবারে লাফিয়ে উঠেছে, মনে মনে বলছে তখন শুধু পিটিয়েছিলাম এবার সুগ্রীবকে আর বেঁচে ফিরে যেতে দেব না। বালির বউ তারা তখন বালিকে সাবধান করে দিয়ে বলছে – আপনি আপনার ক্রোধকে ত্যাগ করুন। কিভাবে? **শয়ানাদুত্থিত কাল্যং ত্যজ ভুক্তামিব স্রজম্।**।৪/১৫/৭। আগেকার দিনে রাজারা যখন রাত্রে শয়ন করতে যেতেন তখন তাঁরা গলায় খুব সুন্দর সুন্দর মালা পড়তেন, যাতে ভালো গন্ধ পাওয়া যায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মালাগুলো ফেলে দিতেন। কালিদাসের বর্ণনাতেও পাওয়া যায়, নায়িকারা গলায় মালা দিয়ে বিছানায় যেত। আমাদের কাছে এখন ভাবতে কেমন লাগে যে গলায় মালা দিয়ে কি করে এনারা শুতে যেতেন। যাই হোক, তারা বালিকে বলছেন – মানুষ যেমন ঘুম থেকে উঠে রাতের বাসি মালাকে ফেলে দেয়, আপনিও এই ক্রোধটাকে ফেলে দিন। কিছু হোক না হোক, আপনি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, এই মাঝ রাতে আপনি সুগ্রীবের সঙ্গে লড়াই করতে যাবেন না। আপনি যদিও শ্রেষ্ঠ বীর ও সুগ্রীব কোন দিনই আপনার কাছ থেকে জয় লাভ করে ফিরে যেতে পারবে না, তবুও এই অসময়ে মধ্য রাত্রে আপনি দুম্ করে বেরিয়ে যাবেন না। আপনার মনে রাখা দরকার যে, এই সুগ্রীবকে কিছুক্ষণ আগে আপনি প্রচণ্ড মেরেছেন, কিন্তু এই রাতে কোন্ সাহসে ভর করে সে আবার আপনার সাথে লড়াই করতে এসে গেছে! কথামৃতে আছে একজন সাধারণ প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। সবাই বুঝে নিয়েছিল যে এর পেছনে কোন ক্ষমতাবান লোক আছে, হয়তো অন্য জমিদার আছে। বালির স্ত্রী তারাও বালিকে এই জিনিষটাই বোঝাতে চাইছে, সুগ্রীবের পেছনে নিশ্চয়ই কোন শক্তি আছে তা নাহলে এত রাত্রে সাহস করে ও এখানে এসে তোমাকে হুমকি দিয়ে লড়াই করতে চাইত না। তুমি এই মাঝ রাত্রে এখন বেরিয়ে গিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে মারামারি করতে যেও না, কাল সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

বালি তো তারার কোন কথাই শুনতে চাইছে না, এক্ষুণি গিয়ে সুগ্রীবকে শেষ করে দেবে। তারা তখন আবার বালিকে বলছে – একদিন রাজকুমার অঙ্গদ জঙ্গলে গিয়েছিল। সেখানে গুপ্তচরদের কাছে সে শুনতে পেয়েছে এখানে অযোধ্যার রাজকুমার রাম আর লক্ষ্মণ এসেছে। রামের স্ত্রী সীতার অপহরণ হয়ে

গেছে। আমার মনে হচ্ছে এই রাম আর লক্ষ্মণ নিশ্চয়ই সুগ্রীবের সঙ্গে রয়েছে, তা নাহলে সুগ্রীব এতটা সাহস দেখাতে আসবে না।

বালি তারার কথা শুনে তারাকে খুব ধমক দিয়ে বলছে 'শ্রীরামচন্দ্রের কথায় তুমি কোন চিন্তা করো না, শ্রীরামচন্দ্র হলেন ধর্মের জ্ঞাতা, আর কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় আছে। উপরন্তু তাঁর সাথে তো আমার কোন ধরণের বিরোধ নেই, তিনি কেন আমার সাথে লড়াই করতে আসবেন, তুমি এই সব উদ্ভট চিন্তা ভাবনা ত্যাগ কর'। তারাকে এই সব কথা বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে সুগ্রীবের সাথে লড়াইয়ে নেমে পড়েছেন। দুজনে যখন লড়াই শুরু হয়ে পুরোদমে চলতে লাগল তখন শ্রীরামচন্দ্র ঐ বাণটা ছাড়লেন, বাণটা গিয়ে বালির বুকে বিঁধে গেছে, বালিও উল্টে পড়েছে। এখানে বলা হয়েছে বালির বুকে শ্রীরামচন্দ্রের বাণ লেগেছিল, কিন্তু বালি আর সুগ্রীব দুজনে কুস্তি লড়ছিলেন, তাই খুব অবাক লাগে বালির বুকে কিভাবে বাণ লাগতে পারে। হয়তো কুস্তি লড়তে লড়তে যখন একে অপরকে ঘুষি মারছিল তখন বুকটা খোলা থাকতে পারে।

মাটিতে পড়ে যেতেই বালি শ্রীরামচন্দ্রকে প্রচুর অপবাদ ও গালাগাল দিতে শুরু করেছে। আমি তো আপনার সাথে যুদ্ধ করছিলাম না, আপনি কেন আমার উপর এইভাবে আড়াল থেকে বাণ মারলেন? সব লোকে আপনার এত প্রশংসা, আপনি একজন রাজা, রাজধর্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া রাজার ধর্ম, ইন্দ্রিয় সংযমাদি হচ্ছে রাজার গুণ, আমি তো আপনাকে এসব ব্যাপারে বিশ্বাস করেছিলাম, আমার স্ত্রী তারা যখন আমাকে সাবাধান করে দিয়েছিল, তখন আমি এই বিশ্বাস করেই বেরিয়ে এসেছিলাম। আপনাকে আমি আজই প্রথম দেখছি, কিন্তু আগে আপনার কথা আমি শুনেছি, আপনি একজন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ বলেই বিশ্বাস করে ভেবেছিলাম আপনি এই ধরণের কাজ কখনই করতে যাবেন না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আপনি হচ্ছেন – **ধর্মধ্বজমধার্মিকম্**। ধর্মধ্বজ বলতে ভণ্ডকে বোঝায়, সংস্কৃতে ভণ্ড শব্দ নেই, সংস্কৃতে ভণ্ডকে ধর্মধ্বজ বলে। ধ্বজ মানে পতাকা। এলাহাবাদ, হরিদ্বার ও অন্যান্য জায়গায় যখন কুম্ভ মেলা হয় তখন সাধুরা বড় বড় বাঁশে পতাকা লাগিয়ে রাখেন, কোন পতাকায় হাত, কোন পতাকায় বানর, কোনটায় বাঘ ইত্যাদি ছবি দেওয়া থাকে। ঐ পতাকা দেখে ভক্তরা বুঝে নেয় যে আমার পাণ্ডা কোথায় আছে। যুদ্ধের সময়ে এই ধরণের ধ্বজা লাগান থাকত, অর্জুনের পতাকা ছিল কপিধ্বজঃ। ঐ ধ্বজ দেখে তার সৈন্যরা সেইভাবে অবস্থান করত। মেলাতে কে কত বড় সাধু? যার ধ্বজা যত উঁচু। এখন সেই সাধু যদি ভণ্ড হয় তখন বলবে তার পতাকাটাই আছে ভেতরে ফাঁক্কা, ধর্মের পতাকাটাই আছে ধর্ম কিছু মাত্র নেই। সেই থেকে এসে গেছে ধর্মধ্বজ। বালি এটাই শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – হে রাম, আসলে তুমি অধার্মিক, তুমি লোকদের দেখাচ্ছ তুমি কত বড় ধার্মিক, কিন্তু আসলে তুমি একটা ধর্মধ্বজ। তুমি নিজে পাপী হয়ে সাধুবেশ ধারণ করেছ, ছাই চাপা আগুনের মত, আমি বুঝতে পারিনি যে লোককে ঠকানোর জন্যই তুমি এই সাধুবেশ ধারণ করেছ।

আমি হলাম জাতিতে বানর, জঙ্গলে থাকি আর ফলমূল খাই, আর আপনি হচ্ছেন মানুষ, আপনার সাথে আমার শত্রুতা হবার কোন সম্ভবনাই নেই, কিন্তু কেন আপনি আমাকে এইভাবে লুকিয়ে বধ করতে এসেছেন। নীতি, বিনয়, দণ্ড, অনুগ্রহ, কৃপা, এগুলোই রাজধর্ম, বিভিন্ন সময় আর পরিস্থিতিতে রাজাকে এই ধর্ম অনুসারে পদক্ষেপ নিতে হয়। আপনার যখন এই ইচ্ছে ছিল যে সুগ্রীবের সাহায্যে আপনি সীতাকে উদ্ধার করবেন, আপনি একবার যদি আমাকে বলতেন তাহলে রাবণকে বধ না করে, যুদ্ধ না করেই আমি তাকে গলায় দড়ি বেঁধে আপনার পায়ের কাছে এনে হাজির করাতাম। বালি অবশ্য এর আগে আগে অনেকবার রাবণকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করেছিল।

শ্রীরামচন্দ্রেকে নিয়ে যে রামকথা তাতে এই বালি বধের ব্যাপারটাতে শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জনের দ্বারা বিভিন্ন ভাবে অনেক অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু এইসব অভিযোগের আদপেই কোন দাম নেই। বাল্মীকিও এই জায়গাতে এসে যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন, তিনিও এর কোন ঠিক ঠিক উত্তর দিতে

পারেননি। প্রথম কথা হচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্র একজন আত্মজ্ঞানী পুরুষ। গীতাতে বলছে – *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। আত্মজ্ঞানীর কাছে কোন বোধই নেই কে মরেছে আর কে মেরেছে। আত্মজ্ঞানীকেও কেউ মারলে তাঁর কিছু যায় আসে না। আবার যিনি অবতার পুরুষ তাঁকে কর্মের কোন দোষ স্পর্শ করেনা। তিনি এখন একজনের সাথে অগ্নিসাক্ষী করে বন্ধুত্ব করেছেন, বন্ধুত্ব স্থাপন করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বন্ধুর শত্রুকে বধ করবেন, এরপরে তাঁর কাছে ধর্ম অধর্মের আর কোন ব্যাপার থাকছে না। কিন্তু আমার আপনার ক্ষেত্রে এই কর্মের দোষ স্পর্শ করবে। ঠাকুর বলছেন – যাঁর ঠিক আত্মজ্ঞান হয়েছে তার কখন বেতালা পা পড়বে না। আজ থেকে একশ বছর আগে যে নিয়ম-কানুন ছিল এখন সেই নিয়ম-কানুন অনেক পাল্টে গেছে। প্রতি দিনই পার্লামেন্টে বিল আসছে আর আগের নিয়ম বাতিল হয়ে নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। এক সময় ব্রাহ্মণরা ছিল ক্ষমতার শীর্ষে, সেখান থেকে ব্রাহ্মণরা সরে গিয়ে ক্ষমতার শীর্ষে ক্ষত্রিয়রা চলে এল, এখন তো শূদ্ররাই বেশি উচ্চ পদে বসে আছে, একশ বছর আগে কেউ কি ভেবেছিল এক শূদ্র নারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে, কিন্তু আজকে এই ধরণের নেতারাই ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্বের দৌড়ে নাম লিখিয়ে রেখেছে। তাই একটা বিশেষ কালের, একটা বিশেষ দেশে এবং একটা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে যেটা করা হয়েছে তার বিচার কখনই অন্য কালে এবং অন্য দেশে করতে নেই। বালিহত্যার ঘটনাকেও সেইভাবেই সেই দেশ ও কাল অনুযায়ী দেখতে হবে।

তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন 'আমরা হলাম রাজা, জঙ্গলে যত পশুপাখি আছে তার উপর আমার অধিকার আছে। আর তুমি হলে একটা বানর, তোমার শিক্ষাদীক্ষা বেশি কিছু নেই, সজ্জন মানুষদের ধর্ম খুব সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয়'। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – **হৃদস্থঃ সর্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্**।।৪/১৮/১৫। 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যিনি অন্তর্যামীর রয়েছেন, তিনিই জানেন মানুষের কোনটা শুভ আর কোনটা অশুভ। আমি শুভ করেছি না অশুভ করেছি এটা নির্ধারণ করবার তোমার কোন অধিকার নেই'। কারণ শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয় এই ব্যাপারে পরিষ্কার, তাই তিনি যে বলছেন আমি যেটা করছি এটাতে আমি কোন দোষ করছি না। ঠাকুরও এই কথা বলছেন – যেটা করলে মন খুঁতখুঁত করে সেটাই পাপ আর বাদ বাকী কিছুই পাপ নয়। সেইজন্য মন যদি একবার খুঁতখুঁত করে কক্ষণ সেই কাজ করতে নেই। কিন্তু মন যদি পরিষ্কার থাকে, এটা আমাকে করতেই হবে আমার আর কোন উপায় নেই, শ্রীরামচন্দ্রও দেখছেন এটা আমাকে করতেই হবে, এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।

শ্রীরামচন্দ্র আরও বলছেন – তাছাড়া তোমাকে মারার আরেকটি কারণ বলছি, তুমি তোমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বলপূর্বক অপহরণ করে তার সাথে সহবাস করছ, এটা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। কিরকম গর্হিত কর্ম – **ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ**।।৪/১৮/২১। শ্রীরামচন্দ্র এই তিনজনের সাথে সহবাস করাকে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলছেন – নিজের মেয়ে, নিজের বোন এবং ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী হল কন্যা সমান। শ্রীরামচন্দ্র এই নিয়মকে মাথায় রেখেই বালি বধে এগিয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে পরে সুগ্রীব বালির স্ত্রী তারাকেই বিয়ে করে নিয়েছিল, তখন কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র আর কিছু বলেননি। মনুস্মৃতিতে দাদার স্ত্রীকে মাতৃ সমান দেখার কথা বলছে। কিন্তু পরের দিকে অবশ্য স্মৃতিকাররা বৌদিকে বিয়ের ব্যাপারে অনেকগুলি শর্ত রেখে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে কখনই এই মত পাল্টান হয়নি, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী কন্যা সমান। শ্রীরামচন্দ্রের সময় – এই তিনজনের সাথে যে সহবাস করবে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। এর পরের শ্লোকেই বলছেন – **প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ**।৪/১৮/২২। স্মৃতিতে এই ধরণের অপরাধীর একটাই দণ্ড, তা হচ্ছে মৃত্যু। আমিও তাই তোমাকে মৃত্যু দণ্ড দিলাম।

এরপরেই শ্রীরামচন্দ্র বালীবধের আসল যুক্তি দিচ্ছেন 'দ্যাখো বালী! সুগ্রীবের সাথে আমার আগেই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, লক্ষ্মণের প্রতি আমার যে ভাব, সুগ্রীবের প্রতি আমার সেই একই ভাব। আর আমি সুগ্রীবকে কথা দিয়েছি তার স্ত্রী ও রাজ্যপ্রাপ্তি করিয়ে দেব। এই অবস্থায় আমার কথা থেকে আমি কোন

ভাবেই সরে আসতে পারি না’। এরপর শ্রীরামচন্দ্র আরও অনেক যুক্তি দেখাচ্ছেন, আমরা হলাম ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়দের পশুপাখি শিকার করা একটা স্বাভাবিক কর্ম, তুমি তো বানর, তোমাকে শিকার করার অধিকার আমার আছে। বাল্মীকি যদিও এই যুক্তি গুলি দিচ্ছেন কিন্তু এই কথাগুলো যদি ঠিক ঠিক যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নেওয়া হয়, তা হলে তিনি বানরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেলেন কেন। যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছি আর তার ভাইকে আমি শিকার করব, এই যুক্তিকে কিছুতেই মানা যায় না। আসল যুক্তি হল আমি সুগ্রীবকে আমার ভাইয়ের মত গ্রহণ করেছি আর তাকে আমি কথা দিয়েছে, এর পর আর কোন কথা চলতে পারেনা।

অযোধ্যাতে লক্ষ্মণ যখন বলেছিলেন দশরথকে বেঁধে কারাগারে পুরে দেব আর ভরতের সব লোককে মেরে শেষ করে দেব, শ্রীরামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে এই কাজ করতে নিষেধ করে বলেছিলেন কোন কোন পরিস্থিতিতে ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয় ধর্মের কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হয়। এটাই বাল্মীকি রামায়ণের মাধুর্য্য। আমাদের জীবনে কোন কোন সময় দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, এটাও ঠিক ওটাও ঠিক, যেমন সত্য কথা বলা সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কখন এমন একটা সঙ্কট আসে যখন মিথ্যা কথা বলাটা খুবই দরকার আবার অন্য দিকে মিথ্যা বললে সত্যের হানি হয়ে যাচ্ছে, তখন কি করবে? কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য এগুলো ছোটবেলাতেই আমরা শিখে নিয়েছি, বিদ্যাসাগরে বইতে কোন ছোটবেলায় পড়েছি সদা সত্য কথা বলিবে, অপরের দ্রব্য না বলিয়া নেওয়া অপরাধ। কিন্তু যখন একটা দ্বন্দ্ব মূলক পরিস্থিতিতে পরস্পর বিরোধী ভাব এসে যায়, তখন কি করব বোঝা যায় না, তখন এটাও ঠিক মনে হবে আবার ওটাও ঠিক মনে হবে। এই কারণেই সাধুসঙ্গের কথা বলা হয়। আমি সচ্চরিত্র থাকবো কিনা, আমি চুরি করতে পারি কিনা, এগুলো জানার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই কেউ সাধুদের কাছে আসে না। সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পরস্পর বিরোধী ভাব এসে যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়, তখন কোন কাজটা করা ঠিক হবে আর কোন কাজ করা ঠিক নয়, এই সমস্যা সমাধানের জন্যই সাধুর কাছে আসা। বালিকে মারাটা ঠিক আবার বালিকে না মারাটাও ঠিক, কোনটা করতে হবে? বালিকে যদি না মারি তাহলে সুগ্রীবকে যে কথা দিয়েছি সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে, যদি বালিকে এইভাবে লুকিয়ে মারা হয় তাহলে ক্ষত্রিয় ধর্মের হানি হয়ে যাবে। কি করবে এই অবস্থায়? কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র পরিষ্কার, আমি কথা দিয়েছি, আমার কথার দাম আছে – *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, রাম দুই রকমের কথা বলে না। শ্রীরামচন্দ্রের প্রচণ্ড গোঁ ছিল, একবার যে কথা দিয়ে দিয়েছেন সেই কথা থেকে থেকে তাঁকে আর সরান যাবে না। সুগ্রীবকে কথা দিয়ে দিয়েছি, আমি বালিকে মেরে সুগ্রীবের স্ত্রীকে তার হাতে সমর্পণ করে দেব আর তাকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজা করে দেব। এখন বালিকে মারব, কি দিয়ে আর কিভাবে মারব এটা আর এখন শ্রীরামচন্দ্রের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। শ্রীরামচন্দ্রের সব যুক্তি শোনার পর বালি এখন ভাবতে বসেছে, আমি তো মরতে যাচ্ছি এখন আমার বউয়ের কি হবে আর আমার ছেলে অঙ্গদেরই বা কি হবে।

বালিকে এভাবে মারা যেতে দেখে বালির যত অনুগামী বানররা ছিল তারা সব ভয়ে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে গিয়েছে, কয়েকজন আবার তারার কাছে ছুটে এসে বালির খবর দিয়েছে। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে একটা মন্ত্র আছে তাতে পাঁচ জন নারীর নাম নিয়ে প্রার্থনা করা হয়, এই পাঁচ নারী হচ্ছেন ঠিক ঠিক সতী। এই পাঁচ জন নারীর মধ্যে বালির স্ত্রী তারাও আছেন, আবার রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীও আছেন আর বাকি তিন জন হলেন দ্রৌপদী, অহল্যা ও কুন্তি। এই পাঁচ জন নারীর মধ্যে মন্দোদরী বাদে সবারই নামের সাথে একের অধিক পুরুষের সংসর্গ যুক্ত হয়ে আছে। এই পাঁচ জন নারীকে পবিত্র বলে মানা হয়, কিভাবে মানা হয় আমাদের জানা নেই, হয়তো আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে বিচার করে বলা হতে পারে।

খবর পেয়ে তারা বালির কাছে ছুটে এসে বিলাপ করে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। তখন হনুমান তারাকে বলছেন – **শোচ্যা শোচসি কং শোচ্যং দীনং দীনানুকম্পসে**।৪/২১/৩। ওহে তারা! তুমি তো নিজেই শোচনীয়া, শোচনীয়া মানে তোমাকে দেখেই লোকে দুঃখ করবে, তুমি আবার অপরকে নিয়ে কিসের দুঃখ করছ। হনুমান আসলে বলতে চাইছেন, বালি এখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, এখনও মারা যায়নি,

বালির দিকে তাকিয়ে তুমি কী শোক করছ! তুমি নিজের দিকে তাকাও। তোমার যা অবস্থা তাতে তোমাকে নিয়েই অপরের শোক করার কথা। তুমি নিজেই হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছ, তুমি আবার অপরকে কি করে দয়া দেখাতে যাচ্ছ! কিন্তু তার থেকেও মূল্যবান কথা বলছেন 'জলে যে বুদ্বুদ সৃষ্টি হয় তা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, এই রকম বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী শরীরে থেকে কোন্ জীব আছে যার জন্য শোক করা যেতে পারে। মৃত্যুই একমাত্র অবশ্যাম্ভি শেষ পরিণাম, একটু আগে বা একটু পরে, তাকে নিয়ে শোক করার কি আছে!

সুইজারল্যাণ্ডের বসবাসকারী এক ভারতীয় তার বয়স পয়ষট্টি হবে, ফোনে তার এক পরিচিত জনকে বলছেন 'আমার এক কাকা, আশি বছর বয়স হয়েছিল, কানাডায় থাকতেন কিছুদিন আগে মারা গেছেন। দুঃখের কথা এই যে শেষ বয়সে তাঁর ছেলেরা কেউ কাকার দেখাশুনা করল না, কিন্তু কাকার যত টাকা পয়সা সব এরাই পাবে'। এই ভদ্রলোকের, শুধু এই ভদ্রলোকেরই বা কেন, পাশ্চাত্যে বসবাসকারী ভারতীয়দের মানসিকাতার এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এরা ভোগের সময় পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে গ্রহণ করে, কিন্তু মৃত্যুর সময় ভারতীয় মূল্যবোধকে টেনে নিয়ে আসে। ভদ্রলোকের যে কাকা মারা গেলেন, তিনি নিজেও দেশ থেকে বাবা মাকে ছেড়ে বিদেশে গিয়ে অনেক টাকা রোজগার করে একা ভোগ করতে চাইলেন। সেখানে গিয়ে তার দেশের পরিবারের লোক, তার গ্রামের লোকেদের কি হল না হল একবারও খোঁজ নেওয়ার কথা দূরে থাক, ভাবলেনও না। আজকে আমেরিকার মূল্যবোধে বলছে, ছেলে যখন রোজগার করতে শুরু করল তখন বাপ-মাকে ছেড়ে চলে যায়। কাকা তো ভোগের জন্য আমেরিকায় পাড়ি দিলেন, এখন তার ছেলেমেয়েরা তাকে মৃত্যুর সময় দেখল না বলে অভিযোগ করার কোন কারণ নেই, এটাই তো আমেরিকার জনজীবনের স্বাভাবিক চিত্র।

হনুমান তারাকে এই জিনিষটাই বোঝাচ্ছেন। আর বলছেন, তোমার ছেলে অঙ্গদ বেঁচে আছে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার এই শোককে প্রশমিত কর। তুমি একজন বিদুষী নারী, সাধারণ মেয়েদের মত আচরণ তোমার মধ্যে অশোভনীয়। এই সব বলে হনুমান তারাকে খুব লম্বা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তি কালে এগুলোই আমাদের ভারতের মূল্যবোধে দাঁড়িয়ে গেছে। বিদেশীদের কাছে এই জীবন নিয়ে আবার অনেক রকমের সমস্যা এসে যায়। তাদের কাছে এই জীবনটা যে কোন ভাবেই হোক এসে গেছে, মরে যাওয়ার পর কিছু লোক বলবে মৃত্যুর পর জীবন চিরদিনের মতে শেষ হয়ে গেল, আবার কিছু লোক বলবে মৃত্যুর পর তুমি যেমন যেমন কাজ করেছ সেই অনুসারে তোমার হয় অনন্ত স্বর্গ বাস হবে নয়তো অনন্ত নরক বাস হবে। তৃতীয় আর কোন সম্ভবনা নেই। ভারতীয়দের কাছে এগুলো কিছু নয়, তুমি আবার ফিরে আসবে, হয়তো অন্য কোন শরীরে ফিরে আসবে, তোমার আবার প্রিয়জনদের সাথে মিলন হবে।

হনুমান বলছেন 'তারা! তুমি বিদুষী, তুমি ভালো করেই জানো জীবন আর মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। আমরাই অনুমান করে বলি যে আমরা সবাই একশ বছর বাঁচব, কিন্তু কোন মানুষেরই বাঁচা মরার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। সেইজন্য সব সময় শুভ কর্ম করে যাও, আর বেশি কান্নাকাটি, হা-হুতাশ, এই ধরণের লৌকিক ব্যবহারের দিকে বেশি নজর দিও না'। হনুমান যে কথা বলছেন এটাই ঠিক ঠিক ভারতীয় দর্শন। রামায়ণ পাঠে একটা অত্যন্ত সহজ কথা আছে – সীয়ারাম সীয়ারাম সীয়ারাম কহিয়ে। যেহি বিধি রাখে রাম তেহি বিধি রহিয়ে। এই দুটো লাইনে আমাদের জীবনের সমস্ত তত্ত্বের সার দেওয়া আছে। কি সার? তুমি রাম নামটি করে যাও, শুভ আর অশুভ জীবনে নিজের মত আসবে আবার চলে যাবে, যেহি বিধি রাখে রাম, ভগবান যেরকমটি রাখবেন, ভালো মন্দ যা আসার আসবে তুমি কিন্তু ভগবানের নামটিকে ছেড়ো না।

হনুমানও এই কথাই বলছেন, তুমি শুভ কর্ম করে যাও। শুভ কর্ম মানে রাম নাম, ঠাকুরের নাম করা। আর বাকি যত লোক ব্যবহার, লোক ব্যবহার মানে, কান্নাকাটি করা, রাগারাগি করা, লম্পটগিরি করা ইত্যাদি। এই সব কখনই করতে নেই, যেটুকু কান্নাকাটি, দুঃখ প্রকাশ না করলেই নয় ততটুকুই করা উচিৎ। এই ধরণের লোক ব্যবহার সাধারণ লোকেরা করে, কিন্তু যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, যাঁরা ধর্ম পথে চলতে

চাইছেন তাঁদের এই ধরণের লোক ব্যবহারের দিকে মন দিতে নেই। যাঁরা শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করতে আচার্যের কাছে যান, তারাও যদি এই ধরণের লোক ব্যবহার করেন, তারা যদি অল্পেতেই অধৈর্য হয়ে পড়েন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পরেও লম্পটগিরি করে বেড়ায় তখন সাধারণ লোকেরা বলবে – শাস্ত্র পড়েই এর যখন এই অবস্থা তাহলে আমাদের শাস্ত্র পড়ে আর কি হবে! যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসছেন তাদের দেখেই তো সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারবে, ধর্ম কি, শাস্ত্র কি, শ্রীরামকৃষ্ণ কে।

বালি তখন সুগ্রীবকে ডেকেছেন, সুগ্রীবকে ডেকে বলছেন – তুমি অঙ্গদকে নিজের ছেলের মত দেখবে। বালি দেখল আমি তো আর বাঁচব না, মৃত্যুকে বালি এখন নিশ্চয় করে নিয়েছেন। পুত্র অঙ্গদকে শেষ কথা বলে দিচ্ছেন – দ্যাখো, জীবনে যদি শান্তি চাও তাহলে কারুর সঙ্গে বেশি প্রেম করবে না আর কারুর প্রতি প্রেমের সর্বথা অভাব যেন না থাকে। এই দুটোই মনুষ্য জীবনের মহান দোষ। **ন চাতিপ্রণয়ঃ কার্যঃ কর্তব্যোঽপ্রণয়শ্চ তে। উভয়ং হি মহাদোষং তস্মাদন্তরদৃগ্ ভব।**।৪/২২/২৩। হে অঙ্গদ, তুমি অন্তরদৃগ্ ভব, মানে তুমি বাইরের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভেতরের দিকে দৃষ্টি দাও। উর্দুতে একটা এই ধরণের খুব সুন্দর সায়ের আছে, বাংলা করলে যার অর্থ হবে – কারুর সঙ্গে এতো বন্ধুত্ব করো না, যে সে সরে গেলে ভয় হবে পাছে তোমার ক্ষতি হয়ে যায়, আর কারুর সঙ্গে এমন দূরত্ব রেখো না, পরে বন্ধুত্ব হয়ে গেলে নিজের উপরে যাতে লজ্জা না হয়। অর্থ হচ্ছে, আমি একজনকে সব সময় অপমান করছি, কথায় কথায় হেয় করছি, কিন্তু আগামীকাল এমন একটা কিছু হয়ে গেল যে তার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তখন মনে হবে – ইস্ এর সাথেই কি খারাপ ব্যবহার করেছিলাম! ভেবে আমার নিজেরই খারাপ লাগবে। সেইজন্য বালি বলছেন – কাউকে বেশি কাছে টেনো না, এত কাছে নিয়ে এসো না যে দূরে গেলে তোমার কষ্ট হবে, আবার এতো কাউকে দূরে ঠেলে দিও না যে, কোন দিন কাছে এলে নিজের উপর লজ্জা হবে। তাই কে বন্ধু থাকবে আর কে তোমার বন্ধু থাকবে না, সেটা বড় কথা নয়, আসল কাজটি হল তোমার অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে রাখো। বালি জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজের সন্তানকে উদ্দেশ্য করে আমাদের সবার জীবনের জন্য একটি মোক্ষম কথা বলে গেলেন।

বালি মারা গেছে। তারাকে অনেক সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে, অনেক করে বোঝান হচ্ছে কিন্তু তারার বিলাপ বন্ধ হচ্ছে না। এদিকে আরেক কাণ্ড, বালি মারা যেতেই সুগ্রীবের মধ্যে প্রচণ্ড অনুতাপ এসে তাঁকে দগ্ধ করতে লাগল, শ্রীরামচন্দ্রকে সুগ্রীব বলছেন ‘হে রামচন্দ্র! আমি তখন রাজ্য চেয়েছিলাম ঠিকই, আমার স্ত্রীকে ফিরে পেতে চেয়েছিলাম এটাও ঠিক, এখন কিন্তু আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। এখন আমি আর এসব কিছুই চাইনা, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করে যাব কিংবা জলে ডুবে মরব’। অন্য দিকে তারা শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে ‘আপনি আমার স্বামীকে যে বাণ দিয়ে বধ করলেন, সেই বাণ দিয়ে আপনি আমাকেও শেষ করে দিন, আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না’। এক কঠিন পরিস্থিতি, একদিকে সুগ্রীবকে শোক অনুতাপ গ্রাস করে নিয়েছে, রাজ্য, স্ত্রী সব কিছুর উপর ঘেন্না ধরে গেছে, আর অন্য দিকে তারাও শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন আপনিই আমাকে তীর চালিয়ে মেরে ফেলুন।

তখন শ্রীরামচন্দ্র সান্ত্বনা দিয়ে তারাকে বোঝাচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন ‘বিধাতাই এই নিয়ম ঠিক করে রেখেছেন এই নিয়মকে কেউই উল্লঙ্ঘন করতে পারেনা, সবাই তাঁর অধীন। তুমি এখন শান্ত হয়ে যাও, ধৈর্য ধর, কিছুদিন পরে দেখবে তোমার জীবন আবার সুখ আর আনন্দে ভরে গেছে। তোমার পুত্র তো রয়েছে, সে এখন যুবরাজ হয়ে গেছে। আর – **ধাত্রা বিধানাং বিহিতং তথৈব ন শূরপত্ন্যঃ পরিদেবয়ন্তি**।৪/২৪/৪৪ – যারা বীরের পত্নি তারা কিন্তু বিধাতার বিহিত বিধানকে নিয়ে এই ভাবে বিলাপ করে না’। এতক্ষণ এত কথা বলে তারাকে সবাই সান্ত্বনা দিচ্ছিল, কিন্তু তারার মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যখন এই দুটো কথা বললেন সঙ্গে সঙ্গে তারা শান্ত হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন – চাপরাশ না থাকলে যতই লেকচার দাও কেউ নেবে না। ঢোড়া সাপ ব্যাঙ ধরেছে, ব্যাঙটা ডেকেই যাচ্ছে, সাপেরও কষ্ট ব্যাঙেরও কষ্ট। কিন্তু জাতসাপ হলে তিন ডাকেই ব্যাঙের শেষ হয়ে যেত। যিশু যেমন সেই

মেয়েটিকে বলেছেন, যাকে সবাই পাপী বলে সাব্যস্ত করেছিল, Go, and sin no more, মেয়েটির জীবন পরিবর্তন হয়ে গেল। ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে বলছেন – ঐ পথ ছেড়ে দাও। ব্যস্, অঙ্গুলিমালের নতুন পথ চলা শুরু হয়ে গেল।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – যাঁরা সাধুদর্শী বিবেকী পুরুষ, তাঁরা ধর্ম, অর্থ ও কাম ক্রমে ক্রমে সবই পান, তুমি লেগে থাক, সৎ কর্ম আর ধর্ম পথে লেগে থাক তুমিও সব পাবে। হে তারা, আমি মেরেছি বলে বানররাজ বালি তাঁর শরীর থেকে মুক্তি হয়ে তাঁর শুদ্ধ রূপের সত্তাকে পেয়ে গেছেন। মানে বলতে চাইছেন বালি স্বর্গ চলে গেছেন। তিনি যা কিছু পাওয়ার স্বর্গে সবই পেয়ে যাবেন, তাই তুমি এভাবে আর বিলাপ করো না। শ্রীরামচন্দ্রের কথাতে তারা শান্ত হয়ে গেল।

এরপর সুগ্রীব হয়ে গেল কিষ্কিন্ধা রাজ্যের রাজা আর অঙ্গদ যুবরাজ। শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ দুজনে আবার জঙ্গলে ফিরে গেলেন। কিষ্কিন্ধা নগরের বাইরেই আছেন, পিতার আদেশ রয়েছে তাই নগরের ভেতরে প্রবেশ করবেন না। সব কিছু ভালোয় ভালোয় মিটে যাওয়ার পর দুই ভাই প্রস্রবণ গিরিতে বসে আছেন সুগ্রীবের অপেক্ষায় কবে সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষায় থেকে থেকে সীতার কথা চিন্তা করছেন আর চোখের জল ফেলছেন। যাদের অন্তরে গভীর ভালোবাসা আছে, যারা একজনকে অত্যন্ত প্রাণ ঢেলে ভালোবেসেছে তারাই একমাত্র বুঝতে পারবে শ্রীরামচন্দ্রের কি রকম শোক হয়েছিল! সীতা কোথায় থাকতে পারে এই ব্যাপারে এতদিন তিনি ছিলেন অন্ধকারে, কিন্তু এখন জেনে গেছেন সীতাকে রাবণ নিয়ে গেছে, লঙ্কা আক্রমণ করে রাবণকে পরাজিত করলে সীতাকে পাওয়া যাবে এই ভেবে তখন তিনি যেন অনেকটা শান্তি পেলেন, একটা কিছু করার রাস্থা পাওয়া গেছে। তা নাহলে চিন্তায় চিন্তায় অনিদ্রায় থেকে থেকে শেষ হয়ে যেতেন। এই ধরণের শোক মানুষকে শেষ করে দেয়। শ্রীরামচন্দ্রকে এইভাবে শোকাভিভূত হয়ে চোখের জল ফেলতে দেখে আবার লক্ষ্মণ বলছেন – দাদা, আপনি এই ভাবে ভেঙ্গে পড়বেন না। যারা এই ধরণের শোক করতে থাকে তাদের সমস্ত মনোরথ, মনস্কামনা নিষ্ফল হয়ে যায়। আপনি জ্ঞানী পুরুষ, এগুলো আপনার সবই জানা, তাই আপনি এরকমটি করবেন না।

এরপর বর্ষাকাল এসে গেছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আকাশ পুঞ্জিভূত মেঘে ছেয়ে আছে, প্রকৃতি বৃষ্টির জলে স্নাত হয়ে সিক্ত বসনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এইভাবে বিরাট করে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বর্ষা ঋতুতে প্রকৃতি যে রূপ নিয়েছে তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। আসলে ভারত প্রচণ্ড গরমের দেশ, মরুভূমিতেও এই রকম গরম পড়ে না। ভারত থেকে ইংরেজ চলে গেল এই কারণে, ভারতের গরমকে ওরা সহ্য করতে পারল না। ভারতে প্রথমে এসেছিল মুসলমানরা, ওরা চেয়েছিল ভারতে রাজা হয়ে থাকবে আর এখানকার সব কিছু নিজদের দেশে চালান করবে। কিন্তু ওরা আর ভারত থেকে ফিরে গেল না, ভারতেই স্থায়ী হয়ে বসে গেল। আবার অন্য দিকে নিজেদের ইসলাম সাম্রাজ্যও স্থাপন করতে পারল না। মুসলমানদের পরে ইংরেজরা এল, মুসলমানদের মত এখানেই স্থায়ী ভাবে থাকতে পারল না, তাদের সবাইকে শেষে সব কিছু ছেড়ে ভারত থেকে পালিয়ে যেতে হল। বলা হয় ইংরেজ নাকি ভারতের গরমকে সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেছে। ভারতে যখন বর্ষাকাল আসে, যখন বৃষ্টি নামে তখনই ভারতে থাকার মত অবস্থা আসে। বাকি সময় ভারত থাকার মত দেশই নয়। কিন্তু বৃষ্টিটা আছে বলে সারা বছরের কষ্টটাকে পুষিয়ে দেয়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে চার মাস ধরে এই ধরণের বর্ষাকাল পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অনেক বিদেশি এই চার মাস বর্ষা ঋতুতে ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করার জন্য ভারত পরিক্রমা করতে আসেন। শ্রীরামচন্দ্রের মুখ দিয়ে বাল্মীকিও বর্ষা ঋতুর বিরাট বর্ণনা করে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে হনুমান অনেক বানর সৈন্যকে একত্রিত করতে শুরু করে দিয়েছেন, কারণ শ্রীরামচন্দ্রের কাজ করতে হবে। এদিকে বর্ষা ঋতু বিদায় নিতেই শরৎ ঋতুর আবির্ভাব হয়েছে। অন্য দিকে সুগ্রীবের দিক থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই, কোন হেলদোলও দেখা যাচ্ছে না। এবার শ্রীরামচন্দ্র আর থাকতে না পেরে লক্ষ্মণকে বলছেন – লক্ষ্মণ, তুমি কিষ্কিন্ধায় গিয়ে সুগ্রীবকে বল, কখন কাজে হাত লাগাবে, তা নাহলে যে

বাণ দিয়ে বালিকে শেষ করেছিলাম সেই বাণ দিয়ে সুগ্রীবকেই না শেষ করতে হয়। লক্ষ্মণও খুব রেগেমেগে কিষ্কিন্ধা নগরের বাইরে সিংহদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে খুব চেঁচামেচি শুরু করেছেন। লক্ষ্মণের ঐ ক্রোধ আর চেঁচামেচি দেখেই যত বানর ছিল সব ভয়ে ঐখান থেকে পালিয়েছে। বানরগুলো তো জানে ইনি কে, আর এর কি ক্ষমতা। ততক্ষণে সুগ্রীবের কাছেও খবর চলে গেছে, সুগ্রীবও ভয়ে ভয়ে নিজের সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ঘাবড়ে গিয়ে সুগ্রীব বলছেন – আমার শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ থেকে ভয়ের কিছু নেই কিন্তু বিনা অপরাধে যদি বন্ধু কুপিত হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেটা ভয়ের কারণ হবে। মানে সুগ্রীব বলতে চাইছেন, আমি যদি আগে থাকতে আমার মিত্রের রাগের কারণ জেনে যাই তাহলে ভয়ের কারণ থাকে না, শত্রুরা এরকম বিনা কারণে রেগে যেতে পারে, কিন্তু মিত্র যদি কোন কারণ ছাড়াই রেগে যায় তাহলে কিন্তু সাবধান হতে হবে।

বাল্মীকি এখানে সুগ্রীবের মুখ দিয়ে একটা খুব সুন্দর শ্লোকে বলছেন – **সর্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্**।৪/৩২/৭। বলছেন – বন্ধুত্ব স্থাপন করা অতি সহজ, কিন্তু বন্ধুত্বকে ধরে রাখা অর্থাৎ বন্ধুত্বকে প্রতিপালন করা দুষ্করং, খুব কঠিন। ভারতে যে কোন সম্পর্ক স্থাপন করার সময় এইজন্য অগ্নিকে সাক্ষী রেখে করা হয়। দুম্ দাম্ করে এর তার সঙ্গে বন্ধু কখনই বানাতে নেই, আর বন্ধুত্ব বানালেও সেই বন্ধুত্বের কোন দাম থাকে না।

এবার লক্ষ্মণ কিষ্কান্ধা নগরীর ভেতরে ঢুকেছেন, কিষ্কিন্ধার শোভা দেখতে দেখতে রাজমহলের দিকে এগিয়ে চলেছেন। রাজমহলের ভেতরে ঢুকেই দেখছেন সামনে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এত দিনে তারা এখন সুগ্রীবের বউ হয়ে গেছে। এই হচ্ছে নারীচরিত্র। যে তারা কিছু দিন আগে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছিলেন, যে বাণ দিয়ে আপনি আমার স্বামী বালিকে বধ করেছেন, সেই বাণ দিয়ে আপনি আমাকেও শেষ করে দিন যাতে মৃত্যুর পরেও আমি প্রিয়তম স্বামী বালির কাছে থাকতে পারি। আর তার কয়েক মাস পরেই সেই তারা নিজের দেবরের বউ হয়ে ভোগের সাগরে নিমজ্জ হয়ে গেছে। এখন তারা লক্ষ্মণ আসার আগে রাতভর সুগ্রীবের সঙ্গে মদ পান করেছে। বাল্মীকি বর্ণনা দিচ্ছেন – **মদবিহ্বলাক্ষী**, মদ পান করে করে তারার চোখ দুটো লাল আর **নিবৃত্তলজ্জা**, তারার নারীসুলভ লজ্জাবোধ চলে গেছে, মদ পান করে আছে বলে তার আর চক্ষুলজ্জা বলে কিছু নেই। তখন তারার স্নেহজনিত নির্ভিকতা আছে কিন্তু ভয়টয় কিছু নেই।

লক্ষ্মণ তখন তারাকে বলছেন – হে তারা! তুমি যে সুগ্রীবের সঙ্গে মদ খেয়ে মত্ত হয়ে পতিতে আসক্ত হয়ে পড়ে আছ, আর এই ভাবে থাকার জন্য তোমার যে ধর্ম আর অর্থের লোপ হয়ে গেছে এই দিকে কি তোমার কোন দৃষ্টি নেই? তোমরা কথা দিয়েছিলে শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করবে, কিন্তু এত দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও তোমরা কিছুই করছ না। লক্ষ্মণ অনেক কথা বলার পর তারা এইবার লক্ষ্মণকে বোঝাচ্ছে 'হে লক্ষ্মণ! আপনি যে এইভাবে রাগে বশীভূত হয়ে গেছেন, তার মানে আপনার একেবারেই সাংসারিক জ্ঞান নেই। একজন মানুষ যে কামাসক্ত হয়ে আছে, যার মনে কাম জাগ্রত হয়ে গেছে, তাকে কখনই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। মানুষকেই এই অবস্থায় নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না, সেখানে একটা বানরকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন'! বাল্মীকি বলছেন – **কামরতির্মনুষ্যঃ**, যে মানুষের মধ্যে কাম বাসনা জেগে গেছে তার দেশ, কাল, অর্থ, ধর্ম এগুলোর কোনটারই জ্ঞান থাকে না। তারা বলছে 'এই যে সুগ্রীব এত বছর ভোগ থেকে দূরে একা একা পড়েছিল, এখন সেই ভোগের সুযোগ তার সামনে এসেছে, সে এখন তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এতে অবাক হওয়ার কি আছে'। এখানে মজার ব্যাপার হল, যে তারা টানা এত ভোগের মধ্যে ছিল সেও সুগ্রীবের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যাই হোক, লক্ষ্মণ শেষ পর্যন্ত সুগ্রীবের সামনে গিয়ে পৌঁছেছেন, পৌঁছেই আচ্ছা করে সুগ্রীবকে গালাগালি দিতে শুরু করেছেন।

লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে বলছেন – যে মানুষ গোহত্যা করে, মদ্যপান করে, চুরি করে, ব্রত ভঙ্গ করে, এই সব কিছুর প্রায়শ্চিত্তের বিধান পণ্ডিতের করে গেছেন, কিন্তু – **কৃতঘ্নে নাস্তি নিস্কৃতিঃ**, যে কৃতঘ্ন তার কোন

নিস্তার নেই, মানে তার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নেই। এটা কিন্তু সত্যিই আশ্চর্যের যে, যারা কৃতঘ্ন, বন্ধুর প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে, বন্ধুকে অন্তর্ঘাত করেছে, কোথাও কোন স্মৃতিতে তাদের প্রায়শ্চিত্তের কোন বিধানের কথা বলা হয়নি। অনেকেই সু-সা-মে-রির কাহিনী জানেন, সংক্ষেপে হচ্ছে দুই বন্ধু ছিল, ওরা দুজনে এক পাহাড়ে ঘুরছিল, একটা গাছের উপরে এক বন্ধু বিশ্রাম নিচ্ছিল। সেই সময় একটা ভাল্লুক এসে যে বন্ধু জেগে ছিল তাকে বলছে তোমার ঐ বন্ধুকে ঠেলে ফেলে দাও তাহলে তুমি বেঁচে যবে, আমি একে তুলে নিয়ে চলে যাব। সেই বন্ধু ভল্লুকের কথা শুনল না। তারপরে অন্য বন্ধু জেগে পাহাড়া দিচ্ছে আরেক জন ঘুমোচ্ছে। ভাল্লুকটা আবার এসেছে। এসে বলছে তোমার ঐ ঘুমন্ত বন্ধুকে ঠেলে ফেলে দাও আমি ওকে তুলে নিয়ে যাই, তা নাহলে আমি তোমাকেই নিয়ে যাব। এই বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে আর ভাল্লুক নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু তারপর থেকেই এই বন্ধুটির মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। এই বন্ধুটি ছিল রাজকুমার। রাজার ছেলে, তাই অনেক চিকিৎসা চলতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। তারপরে একজন বিজ্ঞজনের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। বিজ্ঞ ব্যক্তি সব শুনে তাকে জিজ্ঞেস করছে – তুমি কি মিত্রদ্রোহ করেছিলে? ছেলেটিও ঘাড় নেড়ে বলছে হ্যাঁ। ছেলেটি সব সময় সু-সা-মে-রি এই চারটে অক্ষর বলতে পারত, এই চারটে অক্ষর দিয়ে একটা করে বাক্য আছে, যাতে বলা হচ্ছে – হ্যাঁ, আমি কৃতঘ্ন, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এরপরে ছেলেটিকে বলা হল যে গাছে এই দুষ্কর্মটি করেছিলে সেই গাছের তলায় নিয়ে যেতে। গাছের কাছে এসে ছেলেটি ক্ষমা চেয়েছে। তারপর থেকে আস্তে আস্তে তার বাকশক্তি ফিরতে থাকে। এখানে পারস্পরিক কোন বোঝাপড়া করে একটা চুক্তির মত বিয়ে করলাম বা বন্ধুত্ব করলাম তার কথা বলা হচ্ছে না, যেখানে সত্যিকারের পারস্পরিক হৃদ্যতা থেকে বন্ধুত্ব তৈরী হয়, সেই বন্ধুত্বের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। এই বন্ধুত্বের মাঝখানে যদি কোন চিটিং হয়, প্রতারণা হয় তাহলে কেউ বাঁচাতে পারবে না, সে শেষ হয়ে যাবেই যাবে।

ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করছেন মানব জীবনের কি উদ্দেশ্য। সাহিত্যিক ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিচ্ছেন – আহার নিদ্রা আর মৈথুন। লক্ষ্মণের কথা শেষ হতেই তারা আবার লক্ষ্মণকে বোঝাচ্ছে 'আহার, নিদ্রা আর মৈথুন এই তিনটে জিনিষ মানুষ আর পশুতে সমান। সুগ্রীব এত দিন ধরে যে দুঃখ ভোগ করেছে, চিরকাল যে ওকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, এখন সে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এইবার শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাতে তিনি ভোগের সুযোগটা এত দিন পরে হাতের কাছে পেয়েছে, তাই আপনাকে বলছি, আপনি এই রকম অযথা রাগ করবেন না'।

সুগ্রীব জেনেশুনে লক্ষ্মণের কাছে তারাকে এগিয়ে দিয়েছিল, বুঝে গিয়েছিল যে লক্ষ্মণ প্রচণ্ড রেগে আছে, আর লক্ষ্মণ বেশিক্ষণ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবেন না। যখনই কেউ রেগে থাকে তার দিকে হয় কোন মহিলাকে আর তা না হলে একটা বাচ্চাকে এগিয়ে দিতে হয়, যাতে রাগটা প্রশমিত হয়। এটা ঠিকই বাচ্চা বা মহিলাকে এগিয়ে দিলে রাগটা একটু কমে যায়। সুগ্রীবও তাই করেছেন, তাড়াতাড়ি করে তারাকে এগিয়ে দিয়েছেন। তারার অবস্থা তখন আরও খারাপ, মদের নেশার ঘোরে তার অঙ্গ থেকে যে বস্ত্র স্খলিত হয়ে রয়েছে সেই দিকে তার কোন হুঁশ নেই। লক্ষ্মণ লজ্জা পেয়ে গেছে। লক্ষ্মণের একদিকে ক্রোধ অন্য দিকে লজ্জা, দুটো বিপরীত হয়ে আছে, আস্তে আস্তে তাঁর ক্রোধটা প্রশমিত হতে থাকল। তারা যখন দেখল লক্ষ্মণের ক্রোধ অনেক শান্ত হয়ে গেছে তখন সে সুগ্রীবের দিকে লক্ষ্মণকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এটাই করতে হয়। যখন কেউ কারুর উপর খুব রেগে থাকে তখন দুম্ করে তার মুখোমুখি হতে দিতে নেই। তার আগে কায়দা করে তার রাগটাকে অনেক কমিয়ে নিতে হয়। প্রেসার কুকারের স্টীম অনেকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রেসারের ঢাকনা খুলতে হয়।

লক্ষ্মণের সাথে সব মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে হাজির হয়ে ক্ষমা-টমা চেয়ে নিয়ে বলছেন 'সেই রকমের কিছু নয়, বর্ষার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল বলে আমরা তৈরী হতে পারছিলাম না, কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা চারিদিকে খবর পাঠিয়ে সমস্ত বানর, ভাল্লুকদের জড়ো করতে শুরু করে দিয়েছি।

এরপরে বাল্মীকি তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদী ও দেশের নাম দিচ্ছেন। এক এক করে নদীর নাম করে যাচ্ছেন, ভগীরথী, গঙ্গা, সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতি, সিন্ধু, শোণ, মহি, কালমহী, তখন ভারতে যত নদী ছিল তাদের অনেক নাম এখানে পাওয়া যাচ্ছে। বানরগুলিকে বলা হচ্ছে যত নদী আছে তার সব তটদেশে নদীর আশেপাশে সব জায়গায় সীতার সন্ধান করবে। তারপর বিভিন্ন দেশের নাম বলা হচ্ছে, ব্রহ্ম দেশ, মাল দেশ, বিদেহ, মালব, কাশি, কোশল, মগধ, পুণ্ড্র, অঙ্গ দেশে অনুসন্ধান করবে।

সব রাক্ষসরা যেখানে যেখানে থাকে সব খোঁজ নাও। যেসব রাক্ষসদের পা পর্যন্ত কান কাপড়ের মত ঝুলে আছে, *ওষ্ঠকর্ণম্* - ঠোঁট পর্যন্ত যাদের কান ছড়িয়ে আছে, *ঘোরলোহমুখ*, যাদের মুখ লোহার মত কঠিণ, *একপাদকাঃ* – যেসব রাক্ষসদের একটাই পা কিন্তু প্রচণ্ড বেগে চলে, যেসব রাক্ষসরা নরমাংস ভোজী, ছূঁচের মত যাদের শিখা, যেসব রাক্ষসরা কান্তিমান, সব রাক্ষসই যে বিভৎস কিম্ভূত কিমাকার হবে তার কোন মানে নেই, কিছু রাক্ষস কান্তিমানও হয়। আবার কিছু রাক্ষস প্রিয়দর্শন। কিছু কিছু রাক্ষস আছে যারা কাঁচা মাছ খায়। ইদানিং কালে জাপানের লোকেরা ছোট ছোট মাছ কাঁচা খায়। যেসব রাক্ষসরা দ্বীপবাসী, যেসব রাক্ষস জলের ভেতরে থাকে, যেসব রাক্ষসদের শরীর নিচের অংশটা মানুষের মত উপরের অংশটা ব্যাঘ্রের মত। এই ধরণের যত প্রাণি, রাক্ষস যেখানে যেখানে আছে সব জায়গায় গিয়ে সীতার সন্ধান করে আস। আর জাভা, সুমাত্রা, যেখানে সোনার খনি আছে সেখানে যবে, এই রকম অনেক জায়গার নামে করে বলা হচ্ছে সব জায়গাতে গিয়ে খোঁজ কর, কোন জায়গাই অনুসন্ধান থেকে যেন পরে বাদ না চলে যায়।

বানরদের এক একটা দলে ভাগ করে বিভিন্ন দিকে পাঠানো হচ্ছে, কাউকে পূর্ব দিকে, কাউকে দক্ষিণ দিকে, কাউকে পশ্চিম, কাউকে উত্তর দিকে পাঠান হচ্ছে। সবাই এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে আমরা কোথাও সীতাকে খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু হনুমানকে দেখে শ্রীরামচন্দ্রের মনে হচ্ছে যদি কেউ সীতার খোঁজ পায় তাহলে এই হনুমানই পাবে। তাই হনুমানকে নিজের নামাঙ্কিত সুন্দর আংটিটি দিলেন। সুগ্রীব আর হনুমানের বারবার মাথায় আসছে খুব সম্ভবত সীতাকে দক্ষিণ দিকেই পাওয়া যাবে। সেইজন্য তাদের যে শ্রেষ্ঠ দল, তাদের দক্ষিণ দিকেই পাঠান হচ্ছে, হনুমানও সেই দলের মধ্যে আছেন। অঙ্গদ এই দলের দলপতি।

এতো ভরসা করে সব থেকে শ্রেষ্ঠ ও সেরা বানরদের দক্ষিণ দিকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তারাও কোথাও সীতার সন্ধান না করতে পেরে হতাশ হয়ে পড়েছে। সব বানরেরা ঠিক করল তারা প্রায়োপবেশন করবে। কারণ অঙ্গদ বলছে ‘আমার কাকা সুগ্রীব একজন শঠ, ক্রূর, নৃশংস ধরণের পুরুষ, আমাদের এক মাসের সময় দেওয়া হয়েছিল, এক মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, এখন যদি সীতাকে না পেয়ে ফিরে যাই তাহলে কাকা আমাকে বধ করে দেবেন। সুগ্রীব এটাই মনে মনে চাইছে, আমার মাকে এইভাবে দখল করে নিয়েছে, আর কোন ভাবে যদি আমাকে শেষ করে দিতে পারে তাহলে আমার কাকা নিষ্কন্টক রাজ্য ভোগ করবে। সীতার অনুসন্ধানের ব্যার্থতার একটা ভালো সুযোগ পেয়ে যাবে সুগ্রীব, আমি আর তাই ফেরত যাচ্ছি না। আমি এইখানেই উপোস করে প্রায়োপবেশন করে মৃত্যুকে বরণ করে নেব’।

হনুমান দেখছেন অঙ্গদ এই ভাবে হতাশায় আর দুঃখে ভেঙ্গে পড়ছে, কিছু কিছু বানরও অঙ্গদের সঙ্গে সহমত হয়ে যাচ্ছে, আবার কিছু কিছু বানর পালিয়ে যাবার চেষ্টায় আছে। তখন হনুমান এক দিকে অঙ্গদকে বোঝাচ্ছেন, আবার অন্য দিকে বানরদের ভয়ও দেখাচ্ছেন। অঙ্গদরা যেখানে প্রায়োপবেশন করে মরবে বলে ঠিক করেছে তার কাছেই সম্পাতি, জটায়ুর দাদা, অবস্থান করছিল। সম্পাতি শুনতে পাচ্ছে যে বানর গুলো প্রায়োপবেশন করবে, শুনে বলছে – বাঃ, যেমন যেমন বানর গুলো মরবে তেমন তেমন আমি এদের ভক্ষণ করব। মানুষ প্রারব্ধ বশতঃ সব কিছু পায়, আমিও আমার প্রারব্ধ বশতঃ অনেক দিন পর বেশ ভুরীভোজ করতে পারব।

হনুমান, জাম্বোবান বার বার করে অন্যান্য বানরদের উৎসাহ দেবার জন্য বলছেন যে জটায়ুর মত একটা পাখি যদি শ্রীরামচন্দ্রের সীতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে, আমরা এত বীর বানর থাকতে কেন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ব। বানরদের মুখে জটায়ুর নাম শুনে সম্পাতি চমকে উঠেছে। সম্পাতি কোন রকমে বানরদের মাঝে গিয়ে সব ব্যাপার শুনলেন। তখন সম্পাতি বানরদের নিজের কাহিনী বলে বলছে – আমি বরুণ লোকের সব কথা জানি, ভগবান বিষ্ণু যখন বামন অবতার হয়ে যেখানে যেখানে তিনি পা রেখেছিলেন সেখানকার কথা আমি সব জানি। অমৃত-মন্থন ও দেবাসুরের সংগ্রাম যেটা হয়েছিল আমি সেটাও জানি। এগুলোর উল্লেখ আমরা বাল্মীকি রামায়ণে অনেক আগেই পেয়েছি। সম্পাতি এই সব বলে বোঝাতে চাইছে যে সে খুব প্রাচীন, তার অনেক বয়স হয়েছে এবং প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী।

এই সব বলে সম্পাতি বলছে – দ্যাখো, আমার জ্ঞান দৃষ্টি আছে, সেই জ্ঞান দৃষ্টিতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা সীতার দর্শন পাবেই। সম্পাতি বলছে – আকাশের প্রথম মার্গ হল চড়ুই পাখিদের। চড়ুই, পায়রা, শালিখ, ময়না এরা মাটিতে চাল গম খুঁটে খুঁটে খায়। তার ওপরের মার্গ কাক জাতীয় পাখিদের। যারা বৃক্ষের ফল খায় তারা কাকেদের থেকে আকাশের আরও এক ধাপ ওপরে যায়। এরও ওপরে হচ্ছে চিল পাখিদের মার্গ। চিলের ওপরে যায় বাজপাখি। এদের সবার ওপরে চলে গৃধ্নরা, সেইজন্য এরা অনেক দূরের জিনিষ দেখতে পায়। কোথাও কিছু মরলেই এরা সেখানে সহজে পৌঁছে যায়। পঞ্চাশ কিলো মিটার দূরে যদি একটা ইঁদুর নড়ে তাহলে গৃধ্নের চোখের নজরে পড়ে যাবে, এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ক্ষমতা, যেটা আমরা কল্পনাই করতে পারব না। সম্পাতি বলছে – আমাদেরও ওপরের মার্গ হচ্ছে হাঁসেদের। সাইবেরিয়ান হাঁস সবচেয়ে উচ্চতা দিয়ে উড়ে যায়। ওরা হাজার কিলোমিটার উপর দিয়ে দিনের পর দিন উড়ে যাচ্ছে, কোন খাওয়াদাওয়া নেই, সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ওখানে খাবে কি, অথচ ওদের শরীরের ওজনের কোন ঘাটতি হয় না। প্রাণি বিজ্ঞানীদের কাছে এটা একটা বিরাট প্রশ্ন। তারপর বলছেন – হাঁসের ওপরে যায় গরুড় পাখি। আমি সেই গরুড় পাখি।

সম্পাতি তখন নিজের যৌবন কালের এক কাহিনী বলছে – একবার ভাই জটায়ুকে নিয়ে উড়তে উড়তে সূর্যের অনেক কাছে চলে গিয়েছিলাম। অত দূর পর্যন্ত উড়ে আর সূর্যের তাপে জটায়ু খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভাইকে সূর্যের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্য আমার দুটো ডানার তলায় নিয়ে উড়ছিলাম। আমরা এত ওপরে চলে গিয়েছিলাম যে, সূর্যের তাপে আমার ডানা দুটোও শেষ পর্যন্ত জ্বলে গেল। সেই থেকে আমি ডানা বিহীন হয়ে এখানে পড়ে আছি আর আমার ভাই জটায়ুর আর কোন খোঁজ পেলাম না। এই সব কাহিনী বলে সম্পাতি হনুমানদের বলল যে, পূর্ব জন্মে আমরা নিন্দিত কিছু কর্ম করেছিলাম বলে এখন মাংসাহারী রাক্ষসে পরিণত হয়েছি। আমি তোমাদের সাহায্য করে আমি আমার ভাইয়ের প্রতি শত্রুতার প্রতিশোধ নেবো। আমাদেরও গরুড়ের মত বহুদূর পর্যন্ত দেখার দৃষ্টিশক্তি আছে, আমি এখানে বসেই রাবণ আর সীতাকে দেখতে পাচ্ছি। এখন এই লবণাক্ত জলের সমুদ্রকে পার হবার কোন উপায় তোমরা দেখো।

দক্ষিণে এসে সবাই বিরাট সমুদ্রের সামনে এসে পড়েছে, এখন এই সমুদ্রকে কিভাবে পার করা হবে সেই চিন্তাতে সব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এখনকার দিনের অনেক পণ্ডিত গবেষকরা বলছেন বানরেরা লঙ্কায় সাঁতার কেটে গিয়েছিল, কেউ বলছেন তখনকার দিনের যে ছোট ছোট নৌকগুলো ছিল, তাতেও যেতে পারেন, এই ধরণের নানা রকমের তথ্য দিচ্ছেন। স্বামীজী নিজে বলছেন যে, রামেশ্বরমের যেখানে সেতুবন্ধন হয়েছিল সেখানে বছরের কোন কোন সময় সমুদ্রের জল অনেক দূর চলে যায়, তখন হেঁটেই চলে যাওয়া যায়। আসলে শ্রীলঙ্কা আর ভারত একই ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল, প্রাকৃতিক নিয়মে এই দুটো ভূখণ্ড আলাদা হয়ে যায়। এখন শ্রীলঙ্কা আর ভারতের মধ্যে সমুদ্রের যতটা ব্যবধান শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে এতটা ব্যবধান ছিল না। মোটামুটি সাঁতরে চলে যাওয়া যেত। এখনও রামেশ্বরমের কাছে রামসেতুতে খুব বেশি জল নেই। সেইজন্য হনুমানের পক্ষে লঙ্কায় চলে যাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না।

এখন সমুদ্রের তীরে এসে সবাই সবার ক্ষমতার বিবরণ দিচ্ছে, কে কতটা লাফাতে পারবে। জাম্বোবান তখন হনুমানকে বলছেন – হনুমান এখানে একমাত্র তুমিই পারবে এই সমুদ্রকে লঙ্ঘন করতে। তুমি হচ্ছ কেশরীনন্দন বায়ুর পুত্র। তোমার এত শক্তি যে তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন সকাল বেলায় পূব আকাশের লাল রঙের সূর্যকে একটা ফল ভেবে সূর্যকে খেতে গিয়েছিলে। তা দেখে ইন্দ্র তোমার উপর বজ্র চালিয়েছিল, সেই থেকে তোমার মুখটা একটু বেঁকে গেছে, সেইজন্য তোমার নাম হয়েছে হনুমান। তোমার উপর বজ্র চালানর জন্য বায়ু দেবতা খুব রেগে গিয়েছিলেন। এত রেগে গিয়েছিলেন যে তিনি নিজেকে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড থেকে গুটিয়ে নিলেন, আমি আর নড়ব না চড়ব না। বাচ্চা ছেলে যেমন অভিমান করে বলে আমি খাবো না, বায়ু দেবতাও অভিমান করে বলছেন আমি আর নড়ব না। বায়ু যদি নিজেকে একটা জায়গায় বদ্ধ করে রাখে তখন প্রাণ বায়ুর গতিও স্তব্দ হয়ে যাবে। বায়ুর কাজই হচ্ছে চলার, বায়ু না চললে প্রাণী জগতই শেষ হয়ে যাবে। বায়ুর প্রবাহ স্তব্দ হয়ে যেতেই দেবতারা সবাই ভয় পেয়ে গেছেন।

এই সব কাহিনী বলে জাম্বোবান হনুমানকে বলছেন – হে হনুমান, তোমার মৃত্যু তোমার ইচ্ছার অধীন। তোমাকে কেউই মারতে পারবে না। তোমার পরাক্রমের সামনে এই জগতের কেউই দাঁড়াতে পারবে না। ঝাঁপ মারার ক্ষেত্রে তোমার সমান আর কেউই হতে পারবে না। মুনি ঋষিদের তুমি ছোটবেলাতে খুব বিরক্ত করতে বলে তাঁরা তোমার এই শক্তির কথাকে তোমার স্মরণ থেকে বিস্মৃত করে দিয়েছিলেন। তবে কেউ যদি এই শক্তির কথা তোমাকে মনে করিয়ে দেয় তাহলেই তোমার এই শক্তি আবার পুনরায় মনে পড়ে যাবে আর সেই শক্তির প্রয়োগও তুমি করতে পারবে।

জাম্বোবান নিজের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলছেন – যখন বামন অবতারে ভগবান নিজের পা এগিয়েছিলেন, সেই সময় এক ঝাঁপ দিয়ে আমি এই পৃথিবীকে একুশ বার পরিক্রমা করেছিলাম, তখন আমার প্রচণ্ড শক্তি ছিল। এখন আমি দুর্বল হয়ে গেছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে সম্পাতিও সেই বামন অবতারের কথা বলছেন আর জাম্বোবানও বামন অবতারের কথা বলছেন। জাম্বোবান বলছেন – যখন সমুদ্র মন্থন হয়ে অমৃত বেরিয়েছিল তখনও আমার মধ্যে অনেক শক্তি ছিল। কিন্তু আমি এখন অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার এখন আর সেই শক্তি নেই। কিন্তু তুমি হলে বায়ু পুত্র, তোমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না, তোমার মধ্যে সব শক্তি আছে। স্বামীজী এই বাণীই সবার জন্য বারেবারে বলেছেন। সব শক্তি তোমার ভেতরেই আছে, এই আত্মশক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শক্তি, এই শক্তিকে জাগাও।

জাম্বোবান বলাতে হনুমানের সব মনে পড়ে গেল। মনে পড়তেই তিনি নিজের শরীরের কলেবরকে বড় করতে শুরু করলেন, তাঁর লেজটাকে বার বার ঘোরাতে শুরু করেছেন। সিংহ, বাঘ যখন কোন শিকার করতে ঝাঁপ দিতে যায় তখন সে তার লেজটাকে যেমন আস্তে আস্তে নাড়তে থাকে, হনুমানও ঠিক সেই ভাবে তাঁর লেজটাকে ঘোরাতে আরম্ভ করেছেন। হনুমান মহেন্দ্র পর্বতের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সেখান থেকেই ঝাঁপ মেরে লঙ্কায় যাবেন বলে ঠিক করেছেন। মহেন্দ্র পর্বতে উঠে তিনি নিজের শরীরকে বাড়াতে বাড়াতে বিশাল করে দিয়েছেন, এবার তিনি দুটো পা দিয়ে পাহাড়ের উপর চাপ দিতে শুরু করলেন। মহেন্দ্র পর্বতের জঙ্গলে, গুহায় যত প্রাণী আশ্রয় নিয়েছিল তারা সব ভয়ে চিৎকার করতে শুরু করেছে, বড় বড় পাথর গুলো ছিটকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিল। বড় বড় সাপ, যারা কখনই বাইরে বেরোয় না, তারাও নিজের নিজের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে ভয়ে। হনুমানের পায়ের চাপে পাহাড়টা নড়ছে, সেই সঙ্গে গর্ত থেকে বেরিয়ে থাকা বিভিন্ন রঙের সাপ গুলোও নড়ছে, মনে হচ্ছে যেন মহেন্দ্র পর্বতে হঠাৎ কেউ রঙবেরঙের পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে। যেসব ঋষি মুনিরা মহেন্দ্র পর্বতে থেকে তপস্যাদি করতেন, তার এই বিকট চেঁচামেচিতে তাঁদের ধ্যান ধারণা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখছেন কি হয়েছে।

হনুমান এখন মনটাকে পুরো একাগ্র করে ঝাঁপ মারার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে পা টাকে মহেন্দ্র পর্বতের উপরে চেপে রেখেছে। এইবার শুধু ঝাঁপ মারার জন্য সব রকম ভাবে নিজেকে তৈরী করে নিয়েছেন। সুন্দরকাণ্ডে গিয়ে তিনি ঝাঁপ মারবেন। কিষ্কিন্ধা কাণ্ড এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

বাল্মীকি রামায়ণ – ১৯ই জুন ২০১০

সুন্দরকাণ্ড

আজ আমরা সুন্দরকাণ্ডে প্রবেশ করব। সুন্দরকাণ্ড আলোচনা করার আগে কয়েকটি জিনিষ আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। ভারতবর্ষে যত রামায়ণ লেখা হয়েছে সব রামায়ণের ভিত্তি বাল্মীকি রামায়ণ। বাল্মীকি রামায়ণকে আধার করে পরবর্তিকালে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাব ও শৈলীতে যত রামকথা রচিত হয়েছে, আর কোন সাহিত্যকে কেন্দ্র করে পরবর্তী যুগে এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়নি। বাল্মীকি রামায়ণের সমতুল্য রচনা বিশ্ব সাহিত্যে একটিই আছে, তা হল হোমারের ইলিয়ড ওডিসি। প্রথমে ইলিয়ড ওডিসি ছিল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ, দেবতাদের কার্যকলাপের প্রতিই বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। হোমার ছিলেন ছশ খ্রীষ্টাব্দের লোক। পরের দিকে এই গ্রন্থের ধর্মীয় ব্যাপার গুলোকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন যে ইলিয়ড ওডিসি লিখিত আকারে পাওয়া যায় তাতে ধর্মীয় ব্যাপার প্রায় নেই বললেই হয়, একটা কাহিনীর মত শুধু থেকে গেছে।

পাশ্চাত্য জগতে এখন যদি বাইবেলকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে অন্য কোন গ্রন্থ পাওয়া যাবে না, যে গ্রন্থ প্রতি গৃহে গৃহে পাঠ করা হয়। ভারতবর্ষে যেমন ঘরে ঘরে গীতা পাঠ করা হয়, চণ্ডী পাঠ করা হয়, আবার এর সাথে মোটা মোটা রামায়ণও পাঠ করা হয়। মজার ব্যাপার হল বাল্মীকি রামায়ণে ইলিয়ড ওডিসির মত ধর্মীয় তত্ত্ব খুবই কম, কিন্তু যা কিছুর বর্ণনা বাল্মীকি রামায়ণে করা হয়েছে তা সামাজিক ও মানবিকতার মূল্যবোধের নিরিখেই করা হয়েছে। অথচ পরে পরে আমাদের যত ঋষি মুনিরা এসেছেন তাঁরা এই রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব, ধর্মীয় ভাব স্বাধীন ভাবে ঢেলে দিয়ে গেছেন।

এই রকমই একটি রামায়ণ হচ্ছে অধ্যাত্ম রামায়ণ। আবার এই অধ্যাত্ম রামায়ণকে অবলম্বন করেই রচিত হল তুলসীদাসের রামচরিতমানস। অন্য দিকে দক্ষিণ ভারতে রচিত হল স্কন্দ রামায়ণ। স্কন্দ রামায়ণের কাহিনী আবার বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী থেকে অনেক আলাদা। পরবর্তিকালে যত রামায়ণ রচিত হয়েছে প্রত্যেকটি রামায়ণের নিজস্ব আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীরামচন্দ্রের পর যে চরিত্রের প্রতি ভারতবর্ষের মানুষের বেশি অনুরাগ, সেই চরিত্রটি আর কেউ নন, তিনি হলেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে যত বৈচিত্র্যময় আর যত সংখ্যায় রামকথা রচিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে নিয়ে ততটা হয়নি। মহাভারত আর ভাগবতকে সরিয়ে দিলে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গীতগোবিন্দর মত কিছু কিছু রচনা পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু রামায়ণের মত এত জনপ্রিয় আর এত বিচিত্র ধরণের রচনা আর কোন চরিত্র নিয়ে রচিত হয়নি। পণ্ডিতদের মনে এটা একটা বড় প্রশ্ন শ্রীরামচন্দ্র কেন এত জনপ্রিয় হলেন ভারতে, আর তাঁকে নিয়ে এত সাহিত্য কি করে সৃষ্টি হয়েছে? রামায়ণের প্রত্যেকটি চরিত্র, শ্রীরামের চরিত্র, সীতার চরিত্র, লক্ষ্মণ, ভরত, হনুমানের চরিত্র, রাবণের চরিত্র, বিভীষণের চরিত্র প্রত্যেকটি চরিত্র সমাজের বিভিন্ন মানুষের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জিনিষটাই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে আধার করে সাহিত্যে অনুপস্থিত।

বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করছেন একজন ঋষি, কিন্তু রচনার মধ্যে বাল্মীকির ধার্মিকতার ভাবের থেকে তাঁর সাহিত্যিক ভাবটাই বেশি পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে ধর্মীয় ভাবের মধ্যে ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটি জিনিষকে উপস্থাপনা করছেন, কিন্তু তোমরা সবাই ধার্মিক হও, এই উপদেশ দেওয়ার অর্থে কিন্তু রামায়ণ রচনা করা হয়নি। যেমন ইলিয়ড ওডিসির কিছু কিছু জিনিষ সরিয়ে দিলে তাকে পুরোপুরি সাহিত্য রচনাতে ফেলে দেওয়া যায়, ঠিক তেমনি বাল্মীকি রামায়ণের এটাই বৈশিষ্ট্য, বাল্মীকি তাঁর রচনা, রামকথাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন, এক ভাবে দেখলে একে পুরো ধর্মগ্রন্থ রূপে গ্রহণ করা যাবে, আবার কিছু কিছু জিনিষকে সরিয়ে দিলেই বাল্মীকি রামায়ণ একটি সম্পূর্ণ সাহিত্যমূলক

গ্রন্থ হয়ে যাবে। অন্য দিকে অধ্যাত্ম রামায়ণ, যাকে আধার করে পরবর্তি কালে অনেক রামায়ণ রচিত হয়েছিল, তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা এঁদের চরিত্রের কোথাও কোন ধরণের কালো দাগ রাখা হয়নি। এমনকি রাবণ, কুম্ভকর্ণেরও কোন কালো দাগ দেওয়া হবে না।

ধর্ম হচ্ছে যখন আমি ভগবানকে ধরার চেষ্টা করছি, ঠাকুরের প্রতি ভক্তি লাভ করতে চাইছি, তার জন্য এত জপ, এত পাঠ, এত ধ্যান, এত পারায়ণ, এত তীর্থ ভ্রমণ ইত্যাদি করে যাচ্ছি। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যখন আসে তখন পুরো জিনিষটাই পাল্টে যায়। তখন ভগবানই যেন আমাকে ঘাড় ধরে নিয়ে নানা অনুভূতির মধ্য দিয়ে যেন দেখাতে থাকেন এই দ্যাখ্ আমার স্বরূপ, এই ভাবে আমাকে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ধর্ম ও অধ্যাত্মের এটি একটি বিরাট পার্থক্য। মানুষ যখন আধ্যাত্মিক হয়ে যায় তখন সে ভালো-মন্দের পারে চলে যায়। আধ্যাত্মিক পুরুষ ভালোতেও ভালো দেখেন মন্দতেও ভালো দেখেন, আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের এটাই সব থেকে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এটাই তার বিরাট গুণ। যে মানুষের মধ্যে ভালো মন্দের বোধ এখনও খুব প্রবল তখন বুঝতে হবে সে এখনও ধর্মের এলাকার মধ্যেই বাঁধা রয়েছে। যারা ধর্মের এলাকায় বাঁধা রয়েছে তারা কিন্তু যে কোন মুহুর্তে অধর্মের এলাকায় ঢুকে যেতে পারে। জগতে যত গোঁড়া ধার্মিক সম্প্রদায় আছে এরা বেশির ভাগই পড়ে আছে ধর্মের এলাকায়। তাদের কাছে ভালো আর মন্দকে যে ভাবে বোঝান হচ্ছে, সেই ব্যাখ্যাকেই তারা গ্রহণ করে নিচ্ছে।

এখন যারা কিছু জিনিষ করছে সেটা তাদের কাছে ভালো বলেই করছে, ঐ জিনিষ যারা করবে না তারা খারাপ। যারা খারাপ তাদেরকে উন্মূলন করতে হবে। কিভাবে উন্মূলন করতে হবে? তখন বোমা মারতে হবে, গুলি চালাতে হবে, এই ভাবে খারাপকে উন্মূলন করে দাও। এদের কিন্তু কোন দোষ নেই, কারণ এদের দৃষ্টিটা অধ্যাত্ম থেকে সরে গেছে। এরাও কিন্তু বলছে তোমাকে সৎ হতে হবে কিন্তু এদের কাছে সৎ এর ব্যাখ্যা অন্য রকম। এদের যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে তা নয়, নিজের ব্যক্তিগত লোভ বা লাভের জন্য করছে তাও নয়। গোঁড়াদের মাথায় বসে গেছে যে আমি ধর্মের লোক, আমি আমার ধর্ম পালন করছি, আমার ধর্ম বলতে এটা ঠিক এটা ভুল। এদের মধ্য থেকে আধ্যাত্মিকতা সরে যাওয়াতে ভালো মন্দের বিচার প্রবল হয়ে গেছে। যারাই রাবণের উপর প্রচুর মন্দ গুণ আরোপ করছে, শ্রীরামচন্দ্রের উপর খুব ভালো গুণ আরোপ করছে, সীতার উপর সব ভালো গুণ চাপিয়ে দিচ্ছে তারাই কিন্তু খুব ধার্মিক লোক। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক লোক হবে সে তখন কখনই একজনের উপর সবটাই খারাপ আবার আরেকজনের উপর সবটাই ভালো রঙ চাপিয়ে দেবে না। তিনি ভালো মন্দের পারে চলে যান। ঈশ্বরের ব্যাপারে ঠাকুর বলছেন – কখন ভাবি তিনি ভালো, কখন ভাবি তিনি মন্দ। ঠাকুরের কাছে আধ্যাত্মিক সত্তা ছাড়া কিছু নেই। যাঁর কাছে আধ্যাত্মিক সত্তা ছাড়া আর কিছু নেই তখন রাবণ কি তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক সত্তার বাইরে বলে মনে হবে? সেমেটিক ধর্মে, মানে জহুদি, খ্রীশ্চান ও মুসলিম, এদের কাছে সৃষ্টিতে দুজন আছে, একটি ঈশ্বরীয় সত্তা আর অন্যটি শয়তানের সত্তা। সেমেটিক ধর্ম এই দুটোকে ছাড়া চলতে পারেনা। এই নিয়ে অনেক বিতর্ক চলতেই থাকে। কিন্তু মূল কথা যিনি একবার দেখে নিয়েছেন তিনি ছাড়া আর কিছু নেই তখন তিনি কাকে মন্দ বলবেন। ঠাকুর বারবার বলছেন আমি দেখি তিনিই আছেন, ভালোর মধ্যেও তাঁকে দেখি মন্দের মধ্যেও দেখি তিনিই আছেন। কলকাতায় যে নষ্টা মেয়েগুলো পথে যেতে চোখে পড়ে তাদের মধ্যে আমি মা ভগবতীকেই দেখছি। এখন তার বাইরে তো আর কিছু বিচার করা যায় না। অধ্যাত্ম রামায়ণ ঠিক এই রকম এক আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন ঋষির রচনা। ফলে তিনি রাবণকেও দেখছেন ভক্ত রূপে। কেমন ভক্ত রাবণ? তিনি বৈকুন্ঠে নারায়ণের দ্বারী ছিলেন, তাঁর পতন হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে আবার বৈকুণ্ঠের কোন ধারণা নেই, তাই জয় আর বিজয়ের কথাও নেই।

এটাই হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য, হিন্দু ধর্ম সব কিছুকেই নিজের মধ্যে টেনে নেয়, গরু যেমন শুকনো ঘাসও খায়, আবার সবুজ ঘাসও খায়। সব কিছুই খাচ্ছে, সব কিছুকে হজম করে সব কিছুর সার পদার্থ

দুধটাকে মাঝখান থেকে বার করে দিচ্ছে। গরুর যেমন বাছাবাছির কোন ব্যাপার নেই, হিন্দু ধর্মের কাছে সব কিছুই গ্রহণীয় বাছাবাছির কিছু নেই।

বাল্মীকি রামায়ণে যখন শুধু ধর্ম, অর্থ ও কামের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, অধ্যাত্ম রামায়ণে সেই ধর্ম, অর্থ ও কামের বাইরে এসে শুধু মোক্ষকেই সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, অর্থাৎ অধ্যাত্ম রামায়ণে মোক্ষই মূল। এই মোক্ষকে তুলে ধরার জন্য রাবণ যখন শূর্পণখার কাছে শ্রীরামচন্দ্রের খবর পাচ্ছে তখন সে খুব খুশী হয়ে ভাবছে – আহা, শ্রীরামচন্দ্র এসে গেছেন, এবার তাহলে আমার রাক্ষস যোনি থেকে উদ্ধার হবে। সীতাকে যখন অপহরণ করতে যাচ্ছে, তখন রাবণ সীতার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না, অধ্যাত্ম রামায়ণে দেখাচ্ছে রাবণের আঙুলে ছিল বড় বড় নখ, সীতা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে মাটি শুদ্ধু নখ দিয়ে সীতাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে সীতাকে স্পর্শ না করতে হয়। কারণ রাবণের কাছে সীতা মায়ের মত। অধ্যাত্ম রামায়ণ যিনি রচনা করেছিলেন তিনি দেখেছিলেন মালিরা গাছের গোড়া মাটি শুদ্ধু তুলে নিয়ে এসে অন্য জায়গায় রোপণ করে, তিনিও এই ভাবটা নিয়ে অধ্যাত্ম রামায়ণে সীতার অপহরণে লাগিয়ে দিলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণের এই হচ্ছে মোটামুটি দৃষ্টিভঙ্গি। এই অধ্যাত্ম রামায়ণকে আধার করেই তুলসীদাস রামচরিতমানস রচনা করলেন, পরে যা সারা ভারতে খুব জনপ্রিয় ভক্তিগ্রন্থ হয়ে গেল। যে কোন রচনাতে যদি আধ্যাত্মিকতার উপাদান না থাকে তাহলে আস্তে আস্তে সেই রচনা মানুষের মন থেকে হারিয়ে যায়। সেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজার বা রোমিও জুলিয়েত, কিংবা আমাদের ভারতের কালিদাসের মেঘদূত কাব্য বা কুমারসম্ভব সাহিত্যের মূল্যায়নে অতি উচ্চমানের সাহিত্য। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত সারা ভারতের লোক যেমন নিত্য পাঠ করে, সেক্সপিয়র বা কালিদাসের সাহিত্য কেউ নিত্য পাঠ করে না। কারণ সেই একটাই, যদি আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া না থাকে তা যতই উচ্চমানের সাহিত্য হোক না কেন, মানুষ সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্য দিন কয়েক পড়বে কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের মন থেকে সেটা হারিয়ে যাবে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত সেই কত হাজার হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল কিন্তু মানুষ এখনও নিত্য এগুলো পাঠ করে যাচ্ছে, আর এই সব শাস্ত্র থেকেই পরে পরে কত ধরণের ধর্ম গ্রন্থ ও সাহিত্য যে রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা করা যায় না।

বাল্মীকি রামায়ণ যেহেতু ধর্ম, অর্থ আর কাম কে নিয়ে আলোচনা করেছে সেইজন্য একে আমরা ধর্মশাস্ত্র বলতে পারি। কিন্তু যে ধর্মগ্রন্থ যতক্ষণ মোক্ষকে না নিয়ে আসবে ততক্ষণ তাকে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক শাস্ত্র বলা যাবে না। বাল্মীকি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চমানের কবি। বাল্মীকি রামায়ণ না পড়লে বোঝা যাবে না যে তিনি কত উচ্চমানের কবি ছিলেন। তিনি তাঁর কল্পনার রাজ্যকে এমন তুঙ্গে নিয়ে চলে গেছেন, আর সেই কল্পনাকে এমন ভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন মনে হবে যেন এটাই বাস্তব। যেমন পাখি উড়ে যাচ্ছে, তাই দেখে তিনি বললেন হনুমান আকাশ মার্গে যাচ্ছেন। কবির এই কাব্যিক কল্পনার ফলে পরের দিকে যারা এগুলোকে নিয়ে কিছু লিখতে গিয়েছেন তখন তাদের কাছে এটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন বৃটিশ লেখকের ইচ্ছে হয়েছিল বাল্মীকি রামায়ণের একটা ভালো ইংরাজী অনুবাদ করবেন। অনুবাদ করতে করতে যখন হনুমানের লঙ্কায় লাফ দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এসে গেছে, তখন তিনি সেই ঘটনাকে আর মেলাতে পারছেন না। তখন তিনি নিজের থেকে অনেক ধরণের যুক্তিকে দাঁড় করাতে লেগে গেলেন, বলছেন ওখানে অনেক জেলেদের মাছ ধরার নৌকা ছিল, হনুমান সেই নৌকা করে গায়ের জোরে লঙ্কায় গিয়েছিলেন। কিন্তু লেখকের বাল্মীকি রামায়ণের অন্যান্য আনুষাঙ্গিক জিনিষ গুলির ব্যাপারে ধারণা খুবই উচ্চ, কিন্তু হনুমানের লঙ্কায় লাফ দিয়ে যাওয়াটাকে কিছুতেই হজম করতে পারলেন না। যদি হনুমানকে লঙ্কায় লাফ দিয়ে না নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেই লেখা ভারতে কেউ পড়বে না। আবার হনুমানের এই লাফ দেওয়াটা অরণ্যদেব, সুপারম্যানদের কমিক্সের মতও নয়, এরও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে।

আধ্যাত্মিক রচনার যত উপকরণ তার সবই ভাবরাজ্য থেকে সংগ্রহিত। তাই আধ্যাত্মিক রচনা মানেই ভাবরাজ্যের রচনা। যদিও বাল্মীকি রামায়ণ একটি কাব্যিক রচনা, কিন্তু এই কাব্যিক রচনাই পরে

পরে ধীরে ধীরে মানুষের ভাবরাজ্যে প্রবেশ করে গেছে। ভাবরাজ্য মানে, মানুষ যখন তার মনেই একটা জগৎ তৈরী করে। প্রত্যেক মানুষেরই দুটো রাজ্য থাকে, একটা এই বাস্তবিক জগৎ আরেকটি কাল্পনিক জগৎ। কাল্পনিক জগতে যখন উচ্চ ভাবের প্রেরণা আসে তখন তাকেই বলে ভাবরাজ্য। আমরা সবাই কিছু না কিছু সময় কল্পনার রাজ্যে বাস করি। সেইজন্য স্বপ্ন জগৎ কল্পনার সাম্রাজ্য, যেখানে মন কল্পনার রাজ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। সাধারণ মানুষও কল্পনার জগতে বাস করে। অফিসে যাওয়ার সময় বাড়ি থেকে বেরোবার মুহুর্তে যদি বাড়ির কারুর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়, তখন সারা রাস্থা চিন্তা করতে থাকবে, আমি আজ বাড়ি ফিরে যদি এই রকম দেখি তাহলে এই করব, যদি আমাকে এই কথা বলে তাহলে আমি এই বলব, যদি এই বলে তাহলে আমি বলে দেব আমি চললাম আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকব, এখানে আমি থাকতে পারব না। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে দেখছে কিছুই হচ্ছে না। এর সবটাই কল্পনার জগৎ।

কল্পনার জগৎ বেশির ভাগ সময় মনের ভেতর থাকে। কিন্তু এই কল্পনার জগৎ অনেক সময় মুখের উপরে চলে আসে। যখনই মুখের উপরে চলে এল তখন লোকে বলে এর মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় মাট্রিক্স, আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলে যাবে। তার যা কিছু চলছে কল্পনার জগতেই চলছে কিন্তু মুখে এসে বিড়বিড় করতে থাকে। আর যখন সেটা কার্যে করতে থাকে তখন বুঝতে হবে সে পাগল হয়ে গেছে। পাগলের বাস্তবিক জগৎ যেটা সেটাও আছে আবার কাল্পনিক জগৎটাও আছে। যারা স্বাভাবিক মনের তারা সবাই জানে কল্পনার জগতের সাথে বাস্তব জগতের মাঝখানে একটা লাইন টেনে দিতে হয়। এই লাইন টানাটাই বন্ধ হয়ে যায় স্বপ্নে। ঘুমিয়ে পড়লে মনের উপর আর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। স্বপ্নে কত কিছুই হচ্ছে, কোনটার সাথে কোনটার মিলই থাকে না। যারা পাগল তারা এই কল্পনার জগতকে টেনে ব্যবহারিক জগতে নামিয়ে নিয়ে আসে। আমরা সবাই আমাদের অজান্তেই ইন্দ্রিয় সংযম করছি, বাক্ সংযম করে নিচ্ছি, মনকে সংযম করছি। আমরা যখন টিভি দেখি, কোন নাটক দেখি, কোন লেকচার শুনছি তখন আমাদের মন কল্পনার জগতে যায় না। অথচ যখন চুপচাপ থাকি, কোন কাজ করছি না, সেই সময় আমরা সবাই কল্পনার জগতেই বাস করছি। এই কল্পনার জগতকে কেউ যখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নামিয়ে নিয়ে আসে তখন তাকেই আমরা পাগল বলি। আবার পাগলের মধ্যে অনেকের থাকে স্ক্রিজোফেনিয়া, মানে স্বপ্নের জগতে সব সময় সে নিজেকে রাজা ভাবছে, আসলে সে হয়তো একটা অফিসের পিওন। এইভাবে কল্পনা করতে করতে একটা সময় নিজেকে সে সত্যি সত্যিই মনে করে যে আমি রাজাই। রাজা হয়ে তার মালিককে দ্বারোয়ান বানিয়ে দিয়েছে। বসে বসে সে এই কল্পনা নিয়েই খেলা করতে থাকে আর নানা রকম জাল বুনতে থাকে। এখান থেকে যখন তার আচরণে পাগলামোর লক্ষণ দেখা যেতে শুরু করে, তখন তার কল্পনার জগতটাই হয়ে যায় বাস্তব আর বাস্তব জগতটা হয়ে যায় কল্পনার জগৎ।

এই দুটোর পারে অর্থাৎ বাস্তব জগৎ আর কল্পনার জগতের পারে একটি রাজ্য আছে, তার নাম ভাবরাজ্য। ভাবরাজ্যের কল্পনার মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্তা থাকে। একটা মেয়ে একটা ছেলেকে ভালোবাসছে, যখন ছেলেটি কাছে থাকে না, তখন মেয়েটি ভাবছে ছেলেটি এখন এই করছে, মনে মনে তার সাথে কথা বলতে থাকে, এখানে মেয়েটি কল্পনার জগতে রয়েছে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – তাঁর সাথে একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ছেলেটি একটি মেয়েকে এতই ভালোবাসে যে, মেয়েটি হয়তো অনেক দূরে আছে, কিন্তু সে এখানে বসে বলে দিচ্ছে আজকে মেয়েটি এই রঙের পোশাক পড়েছে। স্বামীজী বলছেন ছেলেটি মেয়েটির প্রতি এত আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে ঐ মেয়ে বন্ধুকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। যারা ভাবরাজ্যে ঢুকে পড়ে তারাও একটা সত্তা পেয়ে যায়। ভাবরাজ্যের ঐ সত্তা থেকে আধ্যাত্মিকতার পুরো উপকরণ গুলো বেরোতে শুরু করে। তাই আধ্যাত্মিক ব্যাপার না থাকলে ভাবরাজ্য হয় না। কবিরা, সাহিত্যিকরা যে কল্পনা করেন, কল্পনা করে যা কিছুই রচনা করছেন ঐ কল্পনার মধ্যে যদি আধ্যাত্মিকতা না থাকে তাহলে সেই কল্পনাকে কখনই ভাবরাজ্য বলা যাবে না।

যারা ভাবরাজ্যের বাসিন্দা তারা কিন্তু সত্যিই দেখেন হনুমান ঝাঁপ মেরে লঙ্কায় চলে গেলেন। কারুর কাছে যদি ঐতিহাসিক তথ্য থাকে যে, হনুমান নৌকা করে লঙ্কা গিয়েছিলেন, তাও কিন্তু তার ভাব সাম্রাজ্যে হনুমান লাফিয়ে লঙ্কায় চলে যাবেন। এখন যুক্তিবাদী বা বিজ্ঞান পড়া ছেলেমেয়েরা বলবে কি সব আজগুবি মার্কা গপ্পো বানাচ্ছেন। ভাবরাজ্যের বাসিন্দা বলবেন – হ্যাঁ আমিও জানি ঐ রকম হবে না, কিন্তু আমার ভাবরাজ্যে এটাই সত্য। ভাবরাজ্যের যাঁরা পথিক তাঁরা যদি কিছু রচনা করেন তখন তাঁদের কাছে ঐটাই সত্য। যখন এটা সত্য হয়ে দাঁড়ায় তখন কি হয়? এই যে স্বামীজী বলছিলেন ছেলেটির প্রেমিকাকে সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছে যে সে অমুক রঙের জামা পড়েছে, ঠিক তেমনি তিনি দেখতে পান তাঁর ভাব সাম্রাজ্যের যিনি ইষ্ট তিনি সাক্ষাৎ এই রকমই।

যদি কেউ বলেন ভাব সাম্রাজ্যে যেটা দেখছে সেটা ঠিক না ভুল? এখন যদি বলা হয়, যিনি এই প্রশ্ন করছেন তিনি তো আমাকে দেখছেন, এই মস্তিষ্ক দিয়েই তিনি আমাকে দেখছেন, এই মস্তিষ্ক ছাড়াতো আর কিছুই নেই। আমি কিছু স্পর্শ করছি, কথা শুনছি, ফুলের গন্ধ শুঁকছি, সবটাই তো এই মস্তিষ্ক দিয়েই হচ্ছে। আবার এই মস্তিষ্ক দিয়েই তাঁরাও ভাবরাজ্যের সব কিছু দেখছেন। সেইজন্য কোন জিনিষের সার্থকতার পরীক্ষা হচ্ছে তার জীবন অনাবিল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে আছে কিনা। আমাদের জীবনেরও সার্থকতা হচ্ছে আনন্দে থাকা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ভাবরাজ্যের পথিকের এমন একটা অবস্থা হবে যে, সেই অবস্থায় তার শোক দুঃখ কম হবে। এই নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে।

এক মহিলা তার এক শিশুকে জন্ম দেওয়ার পরই সেই শিশুটি মারা যায়। শিশুটি মারা যাবার পরই শোকে মহিলাটি পাগল হয়ে যায়। মহিলাটি এমন পাগল হয়ে যায় যে তাকে উন্মাদ আশ্রমে রেখে দিতে হয়েছে। একজন ডাক্তার সব সময় এই মহিলার চিকিৎসা করছেন। একদিন সকাল বেলা ডাক্তারকে দেখে ঐ মহিলা আনন্দে ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে বলছে 'ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু! আপনি জানেন কাল একটা বিরাট ঘটনা হয়েছে'। ডাক্তার জিজ্ঞেস করছেন 'কি হয়েছে গো'? 'জানেন ডাক্তারবাবু আমি কাল রাত্রে তিনটে শিশুকে জন্ম দিয়েছি, তিনজনই খুব সুন্দর হয়েছে, আর সবাই খুব সুস্থ আছে'। ডাক্তারবাবুও খুব আনন্দে ওকে অভিনন্দন জানিয়েছেন 'সবাইকে ভালো করে একদিন কিন্তু তোমাকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে' এই সব বলে ডাক্তারবাবু চলে এসেছেন। সেই ডাক্তার তার বন্ধুকে ঘটনাটা বলছিলেন 'দেখো এই মহিলা আসলে জীবনে কোন দিন মা হতে পারবে না'। তখন বন্ধু বলছে 'তাহলে ওকে তোমরা চিকিৎসা করছ না কেন'? ডাক্তার বলছে 'হ্যাঁ চিকিৎসা করা যায়, ওষুধ দিয়ে ওর এই পাগলামো বন্ধ করা যায় ঠিকই, কিন্তু আবার মাঝে মাঝে ভাবি ও তো নিজের জগতে খুশিই আছে। আমি ওষুধ দিলে মহিলা তার বাস্তব জগতে ফিরে আসবে তখন এই কষ্টটা তাকে সহ্য করতে হবে, তখন আবার তার অনেক সমস্যাও এসে যেতে পারে, হয়তো এই বাস্তবের সম্মুখীন হতে নাও পারতে পারে, মানসিক ভাবে আরও বিপর্যয় কিছু হয়ে যেতে পারে। আমার কাছে এটা এক বিরাট দ্বন্দ্ব'।

এই ভদ্রমহিলার ঘটনাটি পুরোপুরি পাগলামি তাকে দিয়ে ফলদায়ক কোন কাজই হবে না। কিন্তু ভাব সাম্রাজ্যের যারা প্রবেশ করছেন, এই ভদ্রমহিলা যেমন বলছিলেন আমি কাল রাত্রে তিনটে শিশুর জন্ম দিয়েছি, তারাও বলেন রামলালাকে স্নান করালাম, রামলালাকে খই খাওয়ালাম, যেমন আমরা ঠাকুরের জীবনে দেখছি, লীলাপ্রসঙ্গে রামলালার সঙ্গে ঠাকুরের দিব্যলীলার খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, ঐ মহিলা যেমন আনন্দ পাচ্ছেন, ঠাকুরও আনন্দ সাগরে ডুবে যাচ্ছেন। কিন্তু ঠাকুরের আশেপাশের লোকেরা দেখছে অষ্টধাতুর একটি মুর্তিকে স্নান করান হচ্ছে। ভক্তের ভাবরাজ্যের দিব্যভাবের যে আনন্দ, এখন এই আনন্দকে কেউ আটকাতে চাইবে? কোন দরকার নেই। কেন নেই? এই যে আমরা বললাম জীবনের সার্থকতা হচ্ছে আনন্দ, ভক্ততো ভাবরাজ্যের আনন্দে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখন যদি কোন পাগল বৈশাখ মাসের এই গরমে রোদের মধ্যে গায়ে কম্বল জড়িয়ে বলে আমার খুব আনন্দ লাগছে, তাহলে আমার কি দরকার তাকে টেনে ঘরে নিয়ে আসা। তবে হ্যাঁ, যদি দেখা যায় এই পাগলামির ফলে তার শরীর খারাপ

হতে পারে, যদি সে বলে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে অথচ বুঝতে পারছেন না কি করলে তার কষ্ট কমবে, তখন তাকে টেনে ছায়ায় নিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় যেটা, তা হল, যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ, যাঁরা ভাবরাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁরা সর্বদা জগতের কল্যাণে রত। একটা অবস্থাতে তাঁরা যে আধ্যাত্মিক সত্তাকে উপলব্ধি করছেন, আর আমি আপনি যে জাগতিক সত্তা দেখছি, এই দুটোর মধ্যে তাঁরা সত্যিই গুলিয়ে ফেলেন কোনটা বেশি সত্য। কারণ ঘুমের মধ্যে আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন সেই স্বপ্নকে মনে হয় বাস্তব, কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর বলি – ও বাবা! এটা তো স্বপ্ন, মিথ্যা। তখন জাগ্রত অবস্থাকেই আসল বাস্তব বলে মনে হয়। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে চলে যান তাঁদের কাছে এই জিনিষটাই পুরো উল্টো হয়ে যায়। তাঁদের কাছে ভাবরাজ্যের যে সত্তা ঐটাই আসল সত্তা আর বাস্তব জগতের সত্তাটা নকল। একজন ভাবরাজ্যের ঠিক ঠিক লোক কিনা বুঝব কি করে? তিনি ঐ রাজ্যে নিজের ইচ্ছে মত যখন খুশি চলে যেতে পারেন, আর ঐখানে আনন্দে মশগুল হয়ে থাকেন। যেটা পাগলদের পক্ষে যেটা কখনই সম্ভব নয়।

আর যারা গাঁজা খেয়ে বুম্ হয়ে থাকে তারাও আনন্দে থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রথম শর্ত সেখানে পূরণ হচ্ছে না। পতঞ্জলি যোগসূত্রে আছে ঔষধি আর মন্ত্র দিয়ে এই ভাবরাজ্যের আনন্দ হয় না, ওষুধ আর মন্ত্রের প্রভাব চলে গেলে আবার এই বাস্তব জগতের দুঃখ হতাশা ঘিরে ধরবে। ভাবরাজ্যের পুরুষ সব সময় *আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ*, নিজের আত্মার আনন্দেই সে বুঁদ হয়ে আছেন, তাঁর জন্য বাইরের কোন কিছুর অবলম্বনের দরকার পরে না। ভাবরাজ্যে থেকেও তাঁরা জগতের অনেক মঙ্গল করতে পারেন। কিন্তু ড্রাগ যখন নিয়ে নেয় তখন সে আর কিছু করতে পারে না। এগুলোই মূল কথা। জীবনের সার্থকতাই আনন্দে থাকা, শোক-মোহের পারে গিয়ে আনন্দ লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। গাঁজা খেয়েও তো আনন্দে থাকা যায়। হ্যাঁ আনন্দে থাকা যায়, কিন্তু গাঁজা খেয়ে চব্বিশ ঘন্টা কাটান যাবে না, গাঁজার আনন্দ ক্ষণিক। কিন্তু আমি যদি ভাবরাজ্যের এই সাধনা চালিয়ে যাই, তাহলে এই আনন্দটাই আমার চিরস্থায়ী হয়ে যাবে, এটা গেল এক নম্বর। দ্বিতীয়তঃ গাঁজা খাওয়ার পর তুমি কাউকে ভালো করতে পারছ না, কিন্তু আমি পারছি, আর গাঁজা সেবনে তোমার শরীর মনকে দুর্বল করে দিচ্ছে, কিন্তু ভাবরাজ্যের সাধনা আমার শরীর মনের ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করছে। কিন্তু মূল কথা আনন্দ, আর ভাবরাজ্যের পুরো ব্যাপারটাই আনন্দের। যাঁরাই ভাবরাজ্যে বাস করেন, যখন হনুমান মহেন্দ্র পর্বত থেকে ঝাঁপ দিচ্ছেন তখন তার মনে হিন্দী সিনেমার নায়কের অভিনয় দেখে যেমন মজা লাগে, লোকে মজার চোটে হাততালি দিতে থাকে, সেই রকম মজা তাঁর লাগবে না, এখানে তাঁর ভেতর থেকে একটা আনন্দ স্ফুরণ হয়। কেন আনন্দ হয়? তাঁর ভেতরের আধ্যাত্মিক সত্তা নমস্কার জানাচ্ছে বাইরের সেই আধ্যাত্মিক সত্তাকে, যে সত্তাকে সে দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছে।

রামায়ণের সুন্দরকাণ্ড, এর পুরোটাই ভাবরাজ্যের তুঙ্গে। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ গ্রন্থে আর কোথাও এতো উপরে ভাবরাজ্যকে নিয়ে যাননি যতটা সুন্দরকাণ্ডে নিয়ে গেছেন। আরও যেটা বড় কথা সুন্দরকাণ্ডের শ্রীরামচন্দ্রের কোন ভুমিকাই নেই। পুরো সুন্দরকাণ্ড উৎসর্গ করা হয়েছে মহাবীর স্বামী হনুমানজীকে। বলা হয় পুরো বাল্মীকি রামায়ণের সব থেক শক্তিদায়ক, প্রেরণাদায়ক কাণ্ড হল এই সুন্দরকাণ্ড। সুন্দরকাণ্ডে কোথাও নায়কের চোখে জল নেই, মান অভিমানের কোন ব্যাপার নেই, পুরোটাই শক্তি, শক্তি আর শক্তি। যার জন্য যাদের বাড়িতে অশান্তি, অসুখ বিসুখ লেগে রয়েছে, অনেক দুঃখ কষ্ট চলছে তারা এক সপ্তাহ বা এক মাস বাড়িতে সুন্দরকাণ্ড, বিশেষ করে রামচরিতমানসের সুন্দরকাণ্ড পাঠ করিয়ে নেন, যাতে বাড়িতে সুখ শান্তি ফিরে আসে। সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের শৌর্য বীর্যের স্তুতি করা হয়েছে। সেইজন্য সুন্দরকাণ্ড পাঠ করলে ভেতরে একটা যেন শক্তি চলে আসে। অযোধ্যকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে আমরা অনেক দুঃখের কাহিনী পেয়েছি কিন্তু সুন্দরকাণ্ডে দুঃখ শোকের কথা কোথাও উল্লেখ নেই, সীতার কথাও যেখানে আছে সেখানেও ঘুরে ঘুরে সেই শক্তির কথাই আসে।

সুন্দরকাণ্ডে শক্তির কথা ছাড়া আমরা লঙ্কার বর্ণনা, পুষ্পক রথের বর্ণনা, রাবণের বাড়ির বর্ণনা, রাবণের যত স্ত্রী ছিল তাদের বর্ণনা, তারপর কথা প্রসঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের শরীরের বর্ণনা, সীতার শরীরের বর্ণনা, রাবণের শরীরের বর্ণনা একেবার তুঙ্গে নিয়ে চলে গেছেন বাল্মীকি। বীরত্ব, শৌর্য, শক্তির পাশাপাশি সুন্দরকাণ্ডের সৌন্দর্য রসের যা বর্ণনা করা হয়েছে, সব ধরণের সৌন্দর্য, শৃঙ্গার রসের বর্ণনা, নারীর সৌন্দর্য, পুরুষের সৌন্দর্য, রাজমহলের সৌন্দর্য, লঙ্কা নগরীর সৌন্দর্য সব যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে কোন পাঠক-পাঠিকার মনকে অভিভূত করে দেয়।

মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে হনুমান ঝাঁপ দেবার জন্য দাঁড়িয়েছেন। এখন হনুমানের শক্তির স্মৃতি ফিরে এসেছে, এবারে তিনি তাঁর শরীরকে বড় করতে শুরু করেছেন। হনুমান নিজের ইচ্ছে মত তাঁর শরীরকে বিশালাকার করতে পারেন আবার ছোট্ট একটা পোকার মতও শরীর করে নিতে পারেন। এখন তিনি শরীর বড় করতে শুরু করেছেন। শরীর বড় করার ফলে তাঁর লাফ দেওয়াটাও বড় হবে। হনুমানের শরীর যত বড় হচ্ছে ততই মহেন্দ্র পর্বতের উপরে চাপ পড়ছে, তার উপরে তিনি আবার পা দিয়ে চাপ দিতে শুরু করেছেন। যার ফলে পাহাড়ে যত জন্তু জানোয়ার, যত সাপ ছিল সব ভয় পেয়ে বেরিয়ে এসেছে, ঋষি-মুনিরা ঘাবড়ে গেছেন, কি হচ্ছে বুঝতে পারছেন না। মনে হচ্ছে যেন বিরাট ভূমিকম্প হচ্ছে।

হনুমানের সাথে যে সব বানরেরা মহেন্দ্র পর্বতে দাঁড়িয়েছিল তারা দেখছেন যে, পূর্ণিমা তিথিতে সমুদ্রে যেমন জোয়ার আসে আর সমুদ্র স্ফীত হতে থাকে, ঠিক সেই রকম হনুমানের শরীরটা আস্তে আস্তে স্ফীত হয়ে উঠছে। এখানে বাল্মীকির সমুদ্রের বর্ণনাও খুব নিখুঁত ও কাব্যময়। অনেক পণ্ডিতরা বলেন বাল্মীকি থাকতেন কানপুরের কাছে, সেখানে থেকে তিনি সমুদ্রে কবে দেখলেন, সমুদ্র কেমন তাই তিনি জানতেন না। কিন্তু সমুদ্রের বর্ণনার কোথাও কোন রকমের অসঙ্গতি নেই। এখন তিনি কারুর কাছে সমুদ্রের বর্ণনা শুনে দিয়েছেন না নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করেছেন আমাদের জানা নেই, পণ্ডিতেরা অনেক কিছুই বলে দিতে পারেন। বরঞ্চ কালিদাস সমুদ্রের বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক অসঙ্গতি নিয়ে এসেছেন। কালিদাস বলছেন সমুদ্রের ধারে তমাল বৃক্ষ। কিন্তু সমুদ্রের ধারে তমাল বৃক্ষ কখনই হয় না। আর স্বামীজী বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন – কালিদাসের রচনা পড়লে মনে হয় উনি জীবনে কোন দিন হিমালয় দেখেননি। স্বামীজী বলতে চাইছেন যে কালিদাস শুনে শুনেই বর্ণনা করেছেন। পরে নাকি স্বামীজী আবার ঐ মতটা পাল্টে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাল্মীকির সমুদ্রের বর্ণনাতে কোন ত্রুটি পাওয়া যাবে না।

এখানে বাল্মীকি বর্ণনা করছেন, মহেন্দ্র পর্বতে যত তপস্বী ছিলেন, বিদ্যাধর যাঁরা ছিলেন, এনাদের সবারই মনে হল যেন যারা ভূত হয়ে আছে তারাই এই পাহাড়টাকে ঘিরে ফেলেছে। বাল্মীকি রামায়ণে এই 'ভূত' শব্দটা এসেছে ভূত অর্থেই। ভূত বলতে যে কোন প্রাণীকেই বোঝায়। অজ্ঞাত ভূতরা পাহাড়টাকে যেন ভেঙ্গে দিচ্ছেন এই ভয়ে বিদ্যাধররা তাদের স্ত্রীদের হাত ধরে তাড়াতাড়ি আকাশে উড়ে গেলেন। বাকীরা দেখছেন হনুমানের শরীরটা যেন আগুনের শরীরের মত মনে হচ্ছে, হনুমানের লোম হলুদ বর্ণের বলে জ্বলজ্বল করছে। শরীরকে জোর ঝাঁকানি দিয়েছেন, লোমগুলোকে ঝাড়া দিলেন, আর তার সাথে জোরে জোরে চিৎকার শুরু করেছেন। দৌড়বার আগে দৌড়বীররা যেমন মাটিতে একটা হাঁটু আর হাত দুটো রেখে চাপ দিয়ে পজিশান নেয়, হনুমানও পাহাড়ের পাথরের উপর নীচু হয়ে ঝাঁপ মারার জন্য পজিশান নিয়েছেন। বলছেন, হনুমান নিজের দৃষ্টিটা সামনে করলেন। আর – **রুরোধ হৃদয়ে প্রাণানাকাশমবলোকয়ন্।।** ৫/১/৩৭। নিজের হৃদয়ে প্রাণকে কেন্দ্রীভূত করে নিয়ে এলেন।

আমাদের শরীর প্রাণশক্তিতে চলে। প্রাণশক্তি যখন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হবে তখন বুঝতে হবে একটা খুব বড় মাপের কাজ হতে চলেছে। বাচ্চাদের সারা শরীর জুড়ে প্রাণশক্তি ছড়িয়ে থাকে, কখন হাত ছুড়ছে, কখন পা চালাচ্ছে, কখন মুখ নাড়ছে। যেমন যেমন বড় হতে থাকে বিশেষ বিশেষ অঙ্গে প্রাণশক্তি নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা চলে আসে। একটা বিশেষ অঙ্গে যখন প্রাণশক্তিকে কেন্দ্রিভূত করার ক্ষমতা এসে যায় তখন ঐ অঙ্গ দিয়ে বিশেষ কার্য সিদ্ধি করা যায়। যাঁরা খুব লেখালেখি

করেন তাঁদের প্রাণশক্তি হাতের উপর বেশি কেন্দ্রিভূত হয়। যখন খুব গভীর চিন্তা ভাবনা করে তখন প্রাণশক্তি মস্তিষ্কে বেশি যায়। প্রাণশক্তি যদি মাথায় বেশি চলে যায় তখন পেট থেকে প্রাণশক্তিটা বেরিয়ে যায়, যার জন্য দেখা যায় যাঁরা বেশি চিন্তা ভাবনা করেন, উদ্বেগ নিয়ে চলেন তাঁদের প্রথমেই পেটের গণ্ডগোল দেখা দেয়, বেশি খাওয়া দাওয়া করেতে পারেনা, বেশি খেলেও হজম করতে পারেনা। ডাক্তারি শাস্ত্রও বলছে টেনশান থেকেই যত হজমের গণ্ডগোলের সূত্রপাত। মানুষ যখন খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তনের মধ্যে থাকে তখন তার খাওয়া দাওয়াও অনেক কমে যায়, সামান্য একটুতেই তার শরীরের সব ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। এটাই তার প্রাণশক্তি পাল্টে যাওয়ার লক্ষণ। সেইজন্য বলা হয় ব্রহ্মচর্য যদি ঠিক মত পালন না করা হয় তাহলে আধ্যাত্মিক সাধনা ঠিক ঠিক হয় না। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে প্রাণশক্তি হৃদয়ে নিয়ে আসতে হয়। যারা শারীরিক পরিশ্রম করে, যারা বেশি চিন্তা ভাবনা নিয়ে থাকে তারা যদি ব্রহ্মচর্য ঠিক ভাবে পালন না করে তাহলে প্রাণশক্তি এদিক সেদিক ছিটকে বেরিয়ে যাবে, এবং তার পরিণামে আধ্যাত্মিক সাধনাতে ঘাটতি দেখা দেবে। খুব বেশি লেখালেখি করা মানেই আধ্যাত্মিকতার সাধনায় খারাপ প্রভাব পড়বে। এক সঙ্গে ভৌতিক কাজ আর আধ্যাত্মিক চিন্তন করা কখনই সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রাণশক্তিকে যত কেন্দ্রীভূত করা যাবে তত তার একাগ্রতা বাড়বে। সেইজন্য ধ্যানের আগে বলা হয় একটু প্রাণায়াম করে নিতে। প্রাণায়াম করে করে একটা জায়গায় প্রাণকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়। প্রাণ যখন এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হল তখন ধ্যানটা ভাল হয়। অনেকে যারা প্রাণায়াম না করে শুধু একাগ্র ও অনুরাগের সাথে জপ করেন তাদের জপ করতে করতে মন যখন ইষ্টের চিন্তনে গভীর ভাবে একাগ্রতা লাভ করে তখন নিজে থেকেই বিনা প্রচেষ্টায় কুম্ভক হয়ে যায়, প্রাণ নিজেই একটা জায়গায় গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। এইজন্য দুটো উপায়ের কথা সব সময় বলা হয়। একটা হচ্ছে প্রাণকে জোর করে যদি একটা জায়গায় নিয়ে আসা যায় তাহলে ধ্যান হবে, আর ধ্যান যদি ভালো হয় তাহলে প্রাণ নিজেই একটা জায়গায় চলে আসবে। যোগের পথ হল – তুমি প্রাণকে জোর করে একটা জায়গায় নিয়ে এসে ধ্যান কর। আমাদের এখানকার সাধনা হল, তুমি পবিত্রতার সাথে ধ্যান কর তাহলে প্রাণ নিজে থেকেই একটা জায়গায় এসে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে। দুটো একই জিনিষ।

হনুমান এখন নিজের প্রাণশক্তিকে গুটিয়ে নিয়ে এসেছেন। যারা জুডো ক্যারাটে করে তাদের এমন ভাবে ট্রেনিং দেওয়াই হয়ে থাকে যে, তারা তাদের পুরো প্রাণশক্তিকে হাতের মধ্যে, বা একটা আঙুলের মধ্যে নিয়ে আসে। তার শরীরের ওজন যদি সত্তর কিলো হয়ে থাকে তখন পুরো সত্তর কিলোর শক্তিটা হাতের উপরে নিয়ে আসছে। তখন ঐ হাতে সাঙ্ঘাতিক শক্তি চলে আসে। এটাই প্রাণের শক্তি। আবার প্রাণ যখন কারুর কূপিত হয়ে যায় তখন তার শরীরের নানা রকমের ব্যাধির আক্রমণ হয়। যেমন ক্যান্সার, ক্যান্সারের প্রধান কারণ হল সেল গ্রোথ, সেল গ্রোথ যদি না হয় তাহলে শরীরই দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু যখন ওয়াইল্ড সেল গ্রোথ হয় তখন ঐটাই ক্যান্সার। সেইজন্য যারা প্রাণায়ামদি করেন, যোগাভ্যাস করেন, আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন তাদের শরীরে রোগভোগটা অনেক কম হয়। তাও রোগ হবে, প্রারব্ধ বশতঃ অনেক কিছুই হবে।

এখানে এটাই বলা হচ্ছে, হনুমান তাঁর প্রাণশক্তিটাকে পুরো একটা জায়গায় গুটিয়ে নিয়ে এসেছেন। তখন হনুমান নিজের মনে মনে বলছেন – যখন আমি খবর পেয়ে গেছি যে, রাবণ সীতাকে লঙ্কায় রেখেছে, এই আমি ঝাঁপ মারলাম, এর পর লঙ্কায় গিয়ে সীতাকে যদি না পাই, এই বেগেই আমি স্বর্গলোকে পৌঁছে যাব। স্বর্গেও যদি না পাই, তাহলে সোজা আবার লঙ্কায় যাব, লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে বেঁধে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের পায়ের তলায় হাজির করে দেব।

হনুমান ঝাঁপ দিয়েছেন, এখন কি হচ্ছে, বাল্মীকি একটা খুব সুন্দর জিনিষকে, যেটা পুরোপুরি বিজ্ঞানের ধর্ম, সেটাকে এখানে বর্ণনা করে দিলেন। বলছেন – হনুমানের বেগে আকৃষ্ট হয়ে মহেন্দ্র পর্বতে যত বৃক্ষাদি ছিল সব শেকড় শুদ্ধু উপড়ে গেছে, আর সমস্ত গাছগুলো, তার মধ্যে যত পাখির বাসা ছিল,

পাখিরাও এক সাথে হনুমানের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে। এই শ্লোকটা পড়লে আমাদের মনে হয় বাল্মীকির মাথায় বিজ্ঞানের এই তত্ত্বটা এলো কিভাবে, যদিও এটা আসার কথা নয়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা ভেঞ্চুরি এফেক্ট। ভেঞ্চুরি এফেক্টের নিয়ম হচ্ছে, প্রচণ্ড বেগে যখন একটা জিনিষ ছুটে যায়, সেই জিনিষের নীচে যদি কোন স্থির জিনিষ থাকে সেটাকে উপড়ে নেয়। ঝড় যখন চলে তখন বাড়ির ছাদ গুলোকে টেনে নেয়। কি করে টেনে নিচ্ছে? যে কোন রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়ালে বিজ্ঞানের এই জিনিষটাকে ভালো বোঝা যাবে। যখন কোন মেল ট্রেন প্রচণ্ড বেগে স্টেশন দিয়ে বেরিয়ে যায় তখন ট্রেনের শেষ বগির পেছনে কাগজের টুকরো, শুকনো পাতা আরও আবর্জনা সব ট্রেনের সাথে উড়ে উড়ে চলে যায়। বার্ণালিস্ট প্রিন্সিপ্যলকে অনুসরণ করে ওখানে একটা ভ্যাক্যুম তৈরী হয়ে যায়, ঐ ভ্যক্যুমের মধ্যে যা কিছু থাকবে সেগুলোকে টেনে নেয়। সেইজন্য দুরন্ত গতিতে ট্রেনের পেছনে পেছনে উড়ে যেতে থাকে। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে খবর বেরোয় যে অমুক জায়গায় দেখা গেছে আকাশ থেকে মাছ পড়েছে। আসলে সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন ঝড় বয়ে যায় তখন সে জলকে তো টানছেই, সঙ্গে সঙ্গে মাছকেও টেনে নিচ্ছে। ঝড়ের বেগ কখন না কখন তো কমে আসবে, যখন বেগ কমে আসে তখন মাছ গুলো নীচে পড়তে থাকে।

কিন্তু যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার তা হল, রামায়ণে বাল্মীকি এখানে ঝড়ের বর্ণনা দিচ্ছেন না। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে সব পাতা, ধুলো, আবর্জনা গুলো উড়ে চলে। এখানে তা বলা হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে হনুমান প্রচণ্ড বেগে যাচ্ছেন, আর ঐ গতিতে যাওয়ার দরুন হনুমানের পেছনের জিনিষ গুলোকে টেনে নিচ্ছে। ঠিক এই জিনিষটাই আমরা রেল স্টেশনে দেখতে পাই। কিন্তু বাল্মীকি এটা কোথা থেকে দেখেছেন, সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। যারা গ্রাম দেশে থাকে তারা দেখে যখন ঘূর্ণি ঝড় হয় তখন ঘূর্ণি ঝড় নিজের মধ্যে সব কিছু নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ট্রেনের ক্ষেত্রে কি হয় যখন দুরন্ত গতিতে যাচ্ছে তখন তার পেছনে সব কিছু আবর্জনাকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু রেলগাড়ির মত এই ধরণের দ্রুতগত সম্পন্ন যানই তখনকার দিনে ছিল না। একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে, ঘোড়া, রথ ছুটে যেতে দেখেছেন, যখন ছুটে যাচ্ছে তখন রাস্থার ধুলো সব রথের পেছনে উড়ে যেতে দেখে থাকতে পারেন। কিন্তু সেখান থেকে এত বড় জিনিষের উপর বর্ণনাকে ফুটিয়ে তোলা খুবই অবাক লাগে। এটাই কবি মনস্কতা। যে জিনিষটাকে জগতে দেখা যায় না, অথচ সত্য, সেই জিনিষটাকেই দেখিয়ে দিচ্ছেন কবি। মজার ব্যাপার বলছেন, যে বৃক্ষগুলো ভারী ও খুব বড় ছিল সেই বৃক্ষগুলো আগে পড়ে গেল, আর যে বৃক্ষগুলো ছোট ও হাল্কা ছিল সেগুলো উড়তে থাকল। পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মে ঠিক এটাই হওয়ার কথা। যেগুলো বেশি ভারী সেগুলো বেশিক্ষণ থাকবে না, কম ভারি জিনিষ গুলো বেশিক্ষণ থাকবে।

হনুমান এত বেগে যাচ্ছেন যে, তার বগলের পাশ দিয়ে যে হাওয়াটা কেটে যাচ্ছে, সেটা বাদলের মত, মানে মেঘের মত গর্জন করছে। এটাও আশ্চর্যজনক, বাল্মীকি কোথা থেকে বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব পেলেন সত্যিই আমরা অবাক হয়ে যাই। আমরা যদি আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার গুলিকে বাদ দিয়ে দিই, তাহলে কোথাও একটা জিনিষ এই রকম বেগে যাচ্ছে আর তার এমন তীব্র গর্জন হচ্ছে এই জিনিষকে ভাবতেই পারব না। কোন বিমান বন্দরে দাঁড়ালে দেখা যাবে একটা এরোপ্লেন যখন রানওয়ে দিয়ে ছুটে যায় তখন তার ডানার পাশ দিয়ে বাতাস কাটার কি প্রচণ্ড আওয়াজ হয়। যখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে প্লেন উড়ে যায় তখন যা আওয়াজ হয় তখন বোঝা যায় না, প্লেন যাচ্ছে না মেঘ ডাকছে। এই অনুভব বাল্মীকি কিভাবে পেয়েছিলেন সত্যিই আশ্চর্যের। তখনকার দিনে প্লেনের মত গতিতে কোন জিনিষই উড়তে পারত না, আর এত বেগে গেলে তার এত আওয়াজ হবে, এগুলো জানার সুযোগ বা সম্ভবনা তখনকার দিনের মানুষের ছিল না। কিন্তু বাল্মীকি তাঁর কল্পনাকে এত দূর নিয়ে গিয়েছিলেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের ফিজিক্সের নিয়মের সাথে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। এটাই বাল্মীকির বিলক্ষণ প্রতিভা।

বাল্মীকি বর্ণনা দিচ্ছেন – তেজস্বী হনুমান যখন এই তীব্র বেগে উড়ে যাচ্ছেন তখন মনে হচ্ছে, পাহাড়ের যেন ডানা লেগে গেছে আর পাহাড়টাই যেন উড়ে যাচ্ছে। মহেন্দ্র পর্বতের পরেই সমুদ্র, পর্বত

থেকে ঝাঁপ দিয়েই একটু এগোতেই হনুমান সমুদ্রের উপরে এসে পড়েছেন। সমুদ্রেরর উপর দিয়ে উড়ে যেতেই সমুদ্র এতো উত্তাল হয়ে উঠেছে যে, সমুদ্রকে একটা সাধারণ পাত্রের মত মনে হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশটাই দেখা যাচ্ছে, মানে এমন বেগে হনুমান যাচ্ছেন সমুদ্রের পুরো জলটাকেই টেনে নিচ্ছেন। সমুদ্রের জলকে মাঝখান দিয়ে চিরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। নদীর উপর দিয়ে যখন স্পীড বোট প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যায় তখন নদীর জল মাঝখান দিয়ে চিরে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে, যেন ফাল চালিয়ে দিচ্ছে।

সমুদ্রের মধ্যে ছিল মৈনাক পাহাড়। সমুদ্র মৈনাক পাহাড়কে বলছেন – দ্যাখো, ইক্ষ্বাকু বংশের শ্রীরামচন্দ্রের হয়ে হনুমান কাজ করতে যাচ্ছেন, এই ইক্ষ্বাকু বংশের সাথে আমার পুরনো বন্ধুত্ব, তুমি এক কাজ কর, তাড়াতাড়ি করে তুমি যাও আর হনুমানকে একটু বিশ্রাম করার সুযোগ করে দাও। হনুমান দেখছে হঠাৎ করে সমুদ্রের মধ্যে একটা পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গেছে। হনুমান ভাবল এটা হয়ত কোন রাক্ষস হবে, আমার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে এসেছে। তিনি তখন আস্তে করে নিজের বুক দিয়ে পাহাড়ের মাথায় একটা ধাক্কা মেরেছেন, তাতেই পাহাড়টা ছিটকে পরে গেছে। মৈনাক তখন হনুমানকে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। এখানে বাল্মীকি মৈনাকের মাধ্যমে পুরাণের একটা কাহিনী নিয়ে এসেছেন। বলছেন, কৃত যুগে, সত্য যুগের তখন নাম ছিল কৃত যুগ, কৃত যুগে সমস্ত পাহাড়দের ডানা ছিল, আর পাহাড় গুলো চারিদিকে উড়ে বেড়াত, আজকে এখানে আছে, কালকে আবার আরেক জায়গায় গিয়ে বসে গেল। এখন দার্জিলিং এ যে পাহাড় গুলো আছে, কাল সকালে যদি সেই পাহাড় গুলো বেলুড় মঠের পাশে এসে বসে যায়, তাহলে কি অবস্থা হবে। সেই সময় পাহাড় গুলো যখন উড়ে যেত সব প্রাণিরা ভয় পেয়ে যেত, যেখানে গিয়ে বসে পড়ত সেখানকার সব জীব জন্তু, লোকালয় ধ্বংস হয়ে যেত। এই অবস্থা দেখে ইন্দ্র ঠিক করলেন – এদের ডানা গুলো ছেটে দিতে হবে। ইন্দ্র তখন বজ্র নিয়ে পর পর সব পাহাড় গুলোর ডানা গুলো ছেটে দিতে লাগলেন। যে যে পাহাড়ের ডানা ছাটা হয়ে যাচ্ছে সেই পাহাড় যেখানে পরে গেছে সেই পাহাড় সেখানেই থেকে গেল। মৈনাকের উপরে ইন্দ্র যখন বজ্র চালাতে গেছে তখন বায়ু দেবতা সঙ্গে সঙ্গে মৈনাককে টেনে নিয়ে সমুদ্রের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে। ইন্দ্র আর মৈনাককে পরে খুঁজে পায়নি বলে মৈনাকের ডানা থেকে গেছে, তাই সেও কখন উঠে আসে কখন আবার সমুদ্রের ভেতরে চলে যায়।

মৈনাক হনুমানকে বলছেন – আপনার বাবা বায়ু দেবতা আমার এই মঙ্গল করেছিলেন, আপনার বাবার জন্যই আমার ডানা রক্ষা পেয়েছিল। আপনি বায়ু পুত্র তাই আপনাকে বিশ্রাম দেবার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। হনুমান তখন একটু মুচকি হেসে হাত দিয়ে হাল্কা করে মৈনাক পাহাড়কে স্পর্শ করলেন। স্পর্শ করে বলছেন – আমি এখন শ্রীরামের কার্যের জন্য অধৈর্য হয়ে আছি, আমার এখন কোন বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। এই বলে হনুমান এগিয়ে গেলেন।

হনুমান তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছেন। পথে আবার এক বিপত্তি। সুরসা এসে হনুমানের পথ আটকেছে। সুরসা ছিলেন নাগমাতা। দেবতারা সুরসাকে বলছেন – হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের কাজের জন্য চলেছেন, রাবণকে জব্দ করতে হবে, আসলে হনুমান আমাদের কাজই করতে চলেছেন, এখন এর শক্তি, বুদ্ধি কেমন সেটার পরীক্ষা নেওয়া দরকার, তুমি এই পরীক্ষাটা নাও। সুরসা হনুমানের পথ আটকে বলছে – হনুমান, আমার এই পথ দিয়ে যে যাবে সেই আমার খাদ্য। দেবতারই এই নিয়ম প্রথম থেকে করে রেখেছেন। তাই তোমার বাঁচার কোন পথ নেই, এই আমি আমার মুখ প্রসারিত করলাম তুমি আমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করে যাও। এটাই তোমার নিয়তি, নিয়তিকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না। সুরসা তখন এক এক করে বলছে ব্রহ্মা আমাকে এই বর দিয়েছিলেন, আমার এই এই ক্ষমতা। তখন হনুমান বলছেন – তুমি যখন বরপ্রাপ্তা, দেবতারা যখন এই নিয়মই তোমার জন্য ঠিক করে রেখেছেন, ঠিক আছে তাই হবে, কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে আমার কাজটা করে নিতে দাও। আমার মা সীতার খোঁজ নিয়ে আসতে দাও, আমি তাঁকে দর্শন করে ফিরে আসার সময় তুমি আমাকে গ্রাস করে খেয়ে নিও। সুরসা তখন বলছে – না, তা কি করে হবে, আমার বর আছে যে, আমাকে লঙ্ঘন করে কেউ কখন যেতে পারবে না। তোমার

ক্ষমতাই নেই যে তুমি আমাকে লঙ্ঘন করে চলে যাবে। সুরসার কথা শুনে এবারে হনুমান মনে মনে খুব রেগে গেছে। বলছেন ঠিক আছে তাই হবে। বলেই নিজের শরীরকে বড় করতে থাকলেন। বাল্মীকি বলছেন হনুমান তিরিশ যোজন পর্যন্ত নিজের শরীরকে বিস্তৃত করেছে। এখন তিরিশ যোজন বলতে তখন কি মাপ ছিল বোঝা মুশকিল। শূন্যের আবিষ্কার আমাদের পূর্ব পুরুষরা করেছিলেন। সেইজন্য যে কোন একটা সংখ্যার পর কয়েকটা শূন্য বসিয়ে দিতে খুব মজা পেতেন। মানুষ একশ বছর বাঁচে। এখন শ্রীরামচন্দ্রের বয়সের উপর একশর পরে কয়েকটা শূন্য বসিয়ে দিলেন। আসলে শূন্যের কোন দাম নেই কিনা, কিন্তু একের পর শূন্য থাকলে সেই শূন্যের অনেক দাম হয়ে যায়।

এরপর সুরসা তার মুখটাকে তিরিশ যোজনের থেকে আরও বড় করেছে। হনুমান আবার সুরসার মুখের হাঁ থেকে নিজের শরীরকে আরও বড় করলেন। এইভাবে বড় করতে করতে হনুমান যখন নব্বুই যোজন পর্যন্ত শরীরটাকে বড় করে নিয়েছেন, সুরসা তখন একশ যোজন পর্যন্ত মুখের হাঁ বড় করেছে। একশ যোজন কতটা হবে, হয়তো কলকাতা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত হবে। হনুমান তখন নব্বুই যোজন থেকে নিমেষের মধ্যে নিজের শরীরটাকে একটা ছোট মাছির মত করে নিয়ে সুরসার মুখের মধ্যে সাঁ করে ঢুকে আবার সুরসার বোঝার আগেই সাঁ করে বেরিয়ে এসে সুরসাকে বলছেন – দ্যাখো, তোমার মুখে যাওয়ার যা বর আছে সেই বর অনুসারে আমি তোমার মুখে প্রবেশ করেছি। সুরসার তো হনুমানকে দেখার কোন সুযোগ ছিল না, কারণ সে তখন বিরাট বড়। বড় হওয়ার চিন্তা ভাবনা হনুমানই আগে আগে করেছিলেন। হনুমানের যখন নব্বুই যোজন তখন সুরসা একশ যোজন হয়ে গেছে। সেখান থেকে হনুমান চোখের পলকের মধ্যে মাছির মত ছোট হয়ে সুরসার মুখে সাঁ করে ঢুকে বেরিয়ে চলে এলেন।

সুরসা দেখে বলছে – বাঃ, তোমার প্রখর বুদ্ধি আছে, তোমার সাহস আছে, তোমার পরাক্রম আছে, তুমি যে কাজে যাচ্ছ সেই কাজ তুমিই করতে পারবে। এই বলে সুরসা নিজের আসল রূপ ধারণ করে সব কথা বলে পরিচয় দিয়ে হনুমানকে বলছে – তুমি পারবে সীতাকে খুঁজে নিতে, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার মিলনও হবে। তুমি এগিয়ে যাও।

এরপর হনুমান এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু আবার এক রাক্ষসি এসে তাঁর বিঘ্ন হয়ে পথ আটকে দিয়েছে। সমুদ্রে তিমি, শার্ক প্রভৃতি যে বিশালাকার মাছ আছে, এই মাছ গুলোর কথা হয়তো বাল্মীকি জানতেন। সমুদ্রে যে বিভিন্ন রকমের বড় বড় মাছ থাকে সেগুলিকেই বাল্মীকি এক এক রকমের রাক্ষস নয়তো রাক্ষসী বানিয়ে দিলেন। সিংহীকা নামের এই রাক্ষসিও ছিল ভারত মহাসাগরের এক বাসিন্দা। এর ক্ষমতা ছিল যে কোন প্রাণির ছায়াকে ধরে নিতো আর সেই ছায়াকে টানতেই সেই প্রাণি খাদ্য স্বরূপ তার কাছে এসে যেত। যেমন একটা পাখি সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, পাখির ছায়াটা সমুদ্রের জলে পরেছে, এই রাক্ষসী পাখির ছায়াটাকে ধরে ফেলত। আমরা জানি সাধারণত মানুষকে ধরলে তার ছায়াকেও ধরা যাবে; কিন্তু এখানে ঠিক উল্টো হচ্ছে। ছায়াকে ধরে নিলে বস্তুও ধরা পরে গেল। হনুমানের ছায়াকে রাক্ষসী ধরে নিয়েছে। হনুমান আর এগোতে পারছে না। হনুমান তখন আশ্চর্য হয়ে দেখছেন কি ব্যাপার। দেখতেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন কি হতে চলেছে। তখন হনুমানের মনে পরে গেল যে, যখন আসছিলাম তখন জাম্বোবান বলেছিল সমুদ্রে ছায়গ্রাহী বলে এক ধরণের রাক্ষসী থাকে। হনুমানের ছায়াকে ধরে নিয়েছে এখন হনুমান এগোতেই পারবে না। হনুমান তখন সমুদ্রের উপর নেমে তার বুকে এমন কয়েকটা মোক্ষম্ ঘুষি মারলেন তাতেই সিংহীকা ওখানে মরে পরে রইল। রাক্ষসী মারা যেতেই আকাশে যত পাখি ছিল সবাই আনন্দে হনুমানকে বলছে – আপনি আমাদের যে কি মঙ্গল করলেন তা আমরা কোন দিন ভুলতে পারব না, এর ভয়ে আমরা আকাশে চলতে পারতাম না, কখন যে কার ছায়া ধরে নেবে বোঝাই যেত না।

এখানে বাল্মীকি বলছেন – যে পুরুষের মধ্যে চারটি গুণ থাকে সেই পুরুষ সব কাজেই সফল হয়। প্রথম গুণ ধৃতি, ধৃতি মানে লেগে থাকা, একটা জিনিষকে ধরে রাখা, দ্বিতীয় গুণ – দৃষ্টি, দৃষ্টি মানে লক্ষ্যটা পরিষ্কার, আমি এই করতে চাই, তৃতীয় গুণ মতি, মতি মানে বুদ্ধি, চলতি ভাষাতেও মতি শব্দ ব্যবহার করা

হয় – তোমার মতি গতি ভালো নেই, মানে তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার নয়, চতুর্থ গুণ – দাক্ষ্যম্‌, দাক্ষ্যম্‌ অর্থ কুশলতা, দক্ষতা, কার্যকুশলতা। যে কোন কাজে এই চারটে জিনিষ যদি থাকে – ধৃতি, দৃষ্টি, মতি ও দাক্ষ্যম্‌, তাহলে তোমার কাজে কখনই অসফলতা আসবে না। একটি ছেলে পড়াশোনা করছে, ক্লাশ টেনে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, এখান দেখা হবে ধৃতি আছে কিনা, মানে সে নিয়মিত লেখাপড়াতে লেগে আছে কিনা, দৃষ্টি আছে কিনা, মানে সে পরিষ্কার জানে যে আমাকে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে, মতি আছে কিনা, মানে বুদ্ধি আছে কিনা, জানে কিভাবে পড়াশোনাটা করতে হবে আর সব শেষে হচ্ছে দাক্ষ্যম্‌, মানে সব বিষয়ে তার জ্ঞান আছে কিনা, ঠিক ঠিক সব কিছুকে বুঝে নিতে পারছে কিনা। এই চারটে জিনিষ যার মধ্যে থাকবে তার কোন কাজে সফলতার ব্যাপারে কোন সংশয় থাকবে না। এই সব বলে বলা হচ্ছে – হনুমান তোমার কোন চিন্তা নেই, যে কাজে যাচ্ছ সেই কাজ তুমি পারবে। তখন হনুমান ঐ বেগেই লঙ্কায় পোঁছে গেছেন। এত গুল বিঘ্নকে অতিক্রম করে হনুমান শেষ পর্যন্ত লঙ্কায় অবতরণ করলেন।

এরপর বাল্মীকি লঙ্কার খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন। সুন্দরকাণ্ড, এর সব কিছুই সুন্দর আর সৌন্দর্যের বর্ণনা। এই লঙ্কা নগরীকে নির্মাণ করেছেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা। বাল্মীকি এই লঙ্কা নগরীর বর্ণনা করছেন এক সুন্দরী নারীর সঙ্গে তুলনা করে। লঙ্কার প্রাচীর সুন্দরীর শরীরের এই রকম, তার চারিদিকে যে সমুদ্র নারীর অমুক জিনিষটা, লঙ্কার বনভূমি যেন সেই সুন্দরী নারীর বস্ত্র। যদিও অনেকে বলে কালিদাস উপমার সম্রাট, কিন্তু বাল্মীকি এত রকমের উপমা নিয়ে এসেছেন যে তার কাছাকাছি কেউই আসতেই পারবে না।

লঙ্কাতে হনুমান পোঁছে দেখছেন যে চারিদিকে রাক্ষসরা সব পাহারা দিচ্ছে, আর তারা লঙ্কাকে রক্ষা করার জন্য খুব সতর্ক, যদিও সমুদ্রই লঙ্কার স্বাভাবিক রক্ষা কবচ, প্রকৃতিই লঙ্কাকে রক্ষা করে আছে। হনুমান ভাবছে, হে ভগবান, শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে বানররা যদিও লঙ্কায় পোঁছেও যায় কিন্তু এই নগরীতে ঢুকবে কি করে, ঢোকার তো কোন পথই নেই। লঙ্কায় যে রাম রাবণ যুদ্ধ হয়েছিল, পুরো যুদ্ধটাই লঙ্কার বাইরে হয়েছিল। লঙ্কা নগরী এমন একটা কেল্লা যে ওখানে বাইরের কেউই ঢুকতে পারবে না। হনুমান ভাবছে, এত সুরক্ষিত যে লঙ্কাপুরীতে ঢোকা যাবে না, তারপর সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ এই চার প্রকারের কোন কৌশলই শত্রুর উপরে প্রয়োগ করা যাবে না। রাক্ষস গুলোর সাথে কোন ভাবেই মেলামেশাও করা যাবে না। একমাত্র অঙ্গদ, নীল, সুগ্রীব আর আমি, এই চারজন ছাড়া কিষ্কিন্ধা থেকে সমুদ্র পেরিয়ে এখানে কেউ পোঁছাতেই পারবে না। মাত্র চারজন এসে এত বড় লঙ্কাপুরীকে ধ্বংস করবে কি করে? হনুমান এই সব ভাবতে ভাবতে নিজেকে বলছেন, আমাকে এখানে খুব সাবধানে চলা ফেরা করতে হবে। সূর্যোদয় যেমন অন্ধকারকে নষ্ট করে দেয়, ঠিক তেমনি দূত যদি অবিবেকী হয়, অসাবধাণ হয় তাহলে যার সে দূত হয়ে এসেছে তার উদ্দেশ্যকেই নষ্ট করে দেবে।

হনুমান অনেক চিন্তা ভাবনা করে সারাটা দিন লুকিয়ে লুকিয়ে কাটিয়ে দিলেন। সূর্যাস্ত যখন হয়ে গেল, অন্ধকার যখন নেমে এল, তখন তিনি চুপিসারে অন্ধকারের মধ্যে এক ঝাঁপ দিয়ে লঙ্কা নগরীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। এর আগে লঙ্কার বাইরে থেকে যে সৌন্দর্য দেখেছিলেন, ভেতরে গিয়ে দেখছেন লঙ্কাপুরীর সাজ্ঘাতিক সৌন্দর্য। সুন্দর বাগান, বাগানের মাঝখানে সুন্দর সুন্দর জলাশয়, সুন্দর তোরণ, সবই সোনার নির্মিত আর নানান রকমের রত্নখোচিত। লঙ্কার এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, তাঁরও নাম লঙ্কা, নগরীর নাম লঙ্কা, আর সেই নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরও নাম লঙ্কা। অধিষ্ঠাত্রী দেবী মানে যিনি নগরীকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করেন। কলকাতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যেমন মা কালিকা। বিভিন্ন নগর ও শহরে একজন করে অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা দেবতা থাকেন, তাঁকে কেন্দ্র করেই সেই শহর বা গ্রামের জীবন প্রবাহ চলতে থাকে। ঠিক তেমনি প্রত্যেক মানুষেরও একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকেন, তিনিই তার ইষ্ট, এই ইষ্ট দেবতাই তাকে রক্ষা করেন।

সেই লঙ্কা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী লঙ্কা দেবী হনুমানকে প্রবেশ করতে দেখেই ধরেছে, ধরে জিজ্ঞেস করছেন – হে বানর তুমি কে, কোথা থেকে কি উদ্দেশ্যে এসেছ? আমি হলাম এখানকার অধিষ্ঠাত্রি দেবী,

আমার কাজ হল এই নগরীকে রক্ষা করা। লঙ্কা দেবী বুঝতে পেরেছেন এই বানরের মতলব ঠিক নয়। লঙ্কা দেবী হনুমানকে বলছেন – আমাকে পরাস্ত না করে তুমি এই নগরীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। হনুমান তখন কায়দা করে বলছেন – আমি এই একটু ঘুরতে এসেছি, একটু ঘুরে টুরে চলে যাব। কারণ সত্যিই তো হনুমান দেখতে এসেছেন সীতা আছেন কিনা। সীতার খোঁজ নেওয়া ছাড়া তো হনুমানের আর কোন খারাপ উদ্দেশ্য নেই।

হনুমানের মুখে এই সব কথা শুনে লঙ্কা দেবী কষিয়ে হনুমানের গালে এক চড় মেরেছেন। এমন জোরে চড় মেরেছেন যে, অন্য কেউ হলে ঐখানেই শেষ হয়ে যেত। এই ভাবে একটা মেয়ের হাতে চড় খেয়ে হনুমান প্রচণ্ড রেগে গেছেন। হনুমানও তখন তাঁর বাঁ হাতের বজ্রমুষ্টি দিয়ে সেই লঙ্কা দেবীকে এক জোর ঘুষি মেরেছে। ঘুষি মারতেই লঙ্কা দেবী মাথা ঘুরে মাটিতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেছে। লঙ্কা দেবী একটু হুঁশ হতেই বলছেন – হে বানর, আমি জানিনা তুমি কে। ব্রহ্মা আমাকে এই নগরীকে রক্ষা করার জন্য যখন বর দিয়েছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, যেদিন তুমি এক বানরের হাতে পরাস্ত হয়ে যাবে সেদিন তুমি বুঝে নিও তোমার কাজ শেষ, আর লঙ্কা নগরীরও আয়ু শেষ।

এই ঘটনা থেকে আমরা একটা শুভ ইঙ্গিত পাই। আমরা যখন খুব বড় একটা কাজে অগ্রসর হই, সেই সময় ছোট ছোট কাজে যখন সফলতা আসতে শুরু হয় তখন উৎসাহটা বাড়তে থাকে। বেশি এই জিনিষটা দেখা যায় বাড়ি মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ার সময়, প্রথমে একটা পাত্র পাওয়া গেল, তখন একটা খুব আনন্দ হয়, কথা যখন একটু এগিয়ে গেলো তখন আরেকটু আনন্দ হল, একটু একটু করে এগোচ্ছে, হয়তো বলে দিয়েছে এখানেই কুটো বাঁধা হয়ে গেছে, তবুও যেমন যেমন কাজ কর্ম এগোতে থাকে ততই আসল কাজের দিকে উৎসাহটা বাড়তে থাকে। হনুমানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। একটা একটা কাজে যেমন যেমন সাফল্য আসছে, তেমন তেমন তাঁর উৎসাহটা বাড়ছে। প্রথম সমুদ্র লাফ দিয়ে পার হওয়ার প্রচেষ্টা, সমুদ্রে দুজন তিনজনকে হারিয়ে দিয়ে এসেছেন, লঙ্কায় প্রবেশ করতে পেরেছেন, এবারে লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রি দেবী বলছেন তুমি পারবে। এবারে উৎসাহ কিন্তু অনেকটাই বেড়ে গেছে। সেইজন্য কেউ যখন কোন মহৎ কাজ করে তখন তাকে যদি একটু উৎসাহ না দেওয়া হয়, সে কিন্তু একটা সময় উৎসাহের অভাবে ঐ কাজ থেকে হারিয়ে যায়। স্বামীজী সেইজন্য বারবার বলছেন যে, তোমার বাড়ীর বাচ্চাদের সব সময় positive thoughts দেবে, কখনই এটা বলতে নেই যে তুমি পারবে না, তোমার দ্বারা এটা হবে না। বরং তাকে বলতে হয়, বাঃ বাঃ, খুব সুন্দর করেছ, আরো ভালও কর। এতে তার উৎসাহ বাড়ে। তার যদি হবার থাকে হবে, যদি হবার না থাকে তাহলে হবে না। কিন্তু যদি হবার থাকে, তখন যদি উৎসাহটা বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে পুরোটাই সে আনন্দে করতে পারে। আর যদি হবার না থাকে, উৎসাহ দিলেও সে নিজে থেকেই এক সময় পিছিয়ে আসবে। সেইজন্য কখন নেতিবাচক চিন্তা দিতে নেই। হনুমানের ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে লক্ষণ, তোমার কার্যসিদ্ধি হতে চলেছে।

লঙ্কা দেবীকে পরাস্ত করে দিয়েছেন এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। এখানে বাল্মীকি সময়ের হিসেবে একটু গোলমাল করে দিয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণে সময়ের একটু গোলমাল হওয়ার সহজ কারণ হচ্ছে, আমরা যদি ধরে নিই বাল্মীকি তালপত্রে বা ভুজ্যপত্রে লিখে যাচ্ছেন, এখন এই চব্বিশ হাজার শ্লোক লিখতে কম করে না হলেও দুই থেকে আড়াই বছর লাগার কথা। তার মধ্যে আবার ছিল প্রতিপদে লেখালেখি করতেন না, পূর্ণিমার দিনে কোন কাজ করবে না। এখন পনের দিন কি এক মাস আগে কি লিখেছিলেন সেটা সব সময় মনে থাকার কথা নয়। কল্পনা করে করে লিখে যাচ্ছেন, মাঝখানে একটা সময় কিছুই লিখলেন না, আবার একটা সময় লিখতে থাকলেন, এই ভাবে লেখার ফলে এত বিশাল রচনার মধ্যে সময়ের একটু এদিক সেদিক হয়ে যাওয়াটা কোন অস্বাভাবিক নয়। হনুমান যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন তখন দেখান হচ্ছে যেন মধ্যরাত, অথচ সীতার কাছে যখন যাচ্ছেন তখন দেখানো হচ্ছে যেন একটু সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

এবারে দেখানো হচ্ছে চারিদিকে রাক্ষসরা রাবণের স্তুতি করছে, রাজমার্গে সব রাক্ষসরা ঘোরাফেরা করছে, আর সেখানে নানান রকমের আকৃতির রাক্ষসরা সব রয়েছে। কিছু কিছু রাক্ষসদের বাড়িতে হনুমান দেখছেন যে মেয়েরা খুব মিষ্টি সুরে বাজনা বাজাচ্ছে, আর পুরুষেরা খুব সুন্দর মৃদঙ্গের তাল দিচ্ছে। রাক্ষস বলে যে তারা একেবারে অসংস্কৃতি সম্পন্ন তা নয়। আমরা যদি শ্রীলঙ্কার সংস্কৃতির দিক নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই সেখানকার সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই খুবই উন্নত মানের ছিল। রাক্ষসদের মধ্যে অনেকেই গুপ্তচর ছিল। এই গুপ্তচররা কিরকম ছিল? কাউকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বিরাট যোগী, যোগের দীক্ষা নিয়ে বসে আছে, কেউ জটা বানিয়ে রেখেছে, কেউ মুণ্ডিত মস্তকে রয়েছে। বেশির ভাগই গুপ্তচর সাধুর বেশে আছে। বাল্মীকি রামায়ণের সময়তেই গুপ্তচররা সাধু বেশ ধারণ করে ঘুরে বেড়াত, কারণ সাধুদের লোকেরা কম সন্দেহ করে।

রাক্ষসদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের চেহারা দেখা যাচ্ছে। কারুর মাত্র একটি চোখ, কারুর শরীরের মধ্যেই অনেক রঙ আছে, কারুর বিরাট পেট, কারুর মুখ বেঁকা, অনেক রকমের শরীরের বর্ণনা আছে। আবার কিছু রাক্ষস বেশি মোটা নয় বেশি রোগা নয়, বেশি লম্বা না, বেশি বেঁটে না কেউ খুব ফর্সা নয়, কেউ বা অত্যন্ত কালো নয়, কেউ বা বেশি কুঁজো আবার বেশি খাটোও নয়– **নাতিস্থূলান্নাতিকৃশান্নাতিদীর্ঘাতিহ্রস্বাকান্। নাতিগৌরান্নাতিকৃষ্ণান্নাতিকুজান্ন বামনান্**।।৫/৪/১৯)। এগুলো আসলে কাব্যিক সৌন্দর্যকে বাড়াবার জন্য এইভাবে বর্ণনা করা। যত রাক্ষস ছিল সবারই কিন্তু শক্তি ছিল, অনেক রাক্ষস ছিল যারা শূল, বজ্র ইত্যাদি অস্ত্র ধারণ করে ছিল। হনুমান দেখল এক লক্ষ রাক্ষসই শুধু মাত্র রাস্তায় রাস্তায় পাহাড়া দেওয়াতে রত ছিল। আমরা এর আগেও বলেছি যে আমাদের পূর্বজদের কাছে শূন্যের কোন দাম ছিল না। কত ছিল জানা নেই, এখানে বাল্মীকি একটা সংখ্যা দিয়ে দিয়েছেন, আর এগুলো সবই কথা। কথাতে ঘটনার উপরে বেশি জোর দেওয়া হয় না।

এইবার হনুমান লঙ্কার যত অন্তঃপুর রয়েছে, অন্তঃপুর হচ্ছে যেখানে মেয়েরা থাকে, আগেকার দিনে নিয়ম ছিল বাড়ির বাইরের দিকে পুরুষেরা থাকত আর ভেতরের দিকে মেয়েরা থাকত, এই অন্তঃপুরের চারিদিকে হনুমান সীতাকে অনুসন্ধান শুরু করেছেন। বাল্মীকি যেখানেই সৌন্দর্য রসের বর্ণনা সুযোগ পেয়েছেন, সেখানে সেখানে যত রকমের বর্ণনা করা যেতে পারে তার কোনটাই বাদ দেননি। তারপরে বিভিন্ন রাক্ষসের নাম দিয়ে দেখাচ্ছেন তাদের কত ধন সম্পদ। সেখান থেকে রাবণের রাজমহল আর তাঁর পুষ্পক রথ যে কত সুন্দর, তার বর্ণনা দিচ্ছেন। পুষ্পকযান দেখে হনুমান এত মুগ্ধ হয়ে গেছেন যে, একবার দেখার পর আবার ঘুরে দ্বিতীয়বার তিনি সেই পুষ্পকযানকে দেখতে গেছেন।

রাবণ এক সময় এত তপস্যা করেছিলেন, বলছেন – **তপঃ সমাধান পরাক্রমার্জিতং**।৫/৮/৪। আগেও অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাল্মীকি রামায়ণে তপস্যার উপর বিরাট জোর দেওয়া হয়েছে, তপস্যা যদি তুমি কর, তার ফল তুমি পাবেই পাবে। সেই তপস্যাকে সামনে নিয়ে আসার জন্য রাবণকে নিয়ে বলছেন, রাবণের এত শক্তি কেন ছিল? বলছেন – *তপঃ সমাধান পরাক্রমার্জিতং।* মনকে একাগ্র করে যে কঠোর তপস্যা করেছিল রাবণ তার পরাক্রমে, মানে তপস্যার ফল হিসেবে সে এই পুষ্পকযান অর্জন করেছিল।

পুষ্পকযানের এটাই বৈশিষ্ট্য ছিল, রাবণ যখন এই পুষ্পকযানে আরোহণ করে যেখানে যাবার ইচ্ছা মাত্র করতেন, সেখানেই পুষ্পকযান তাঁকে নিয়ে যেত। সংস্কৃতে বিমান শব্দের অর্থ হয় উঁচু বাড়ি। বিমানের এই অর্থকে নিয়ে অনেক সংশয়ের উদ্ভব হয়। অনেক সময় বিমান শব্দটা ব্যবহার করেছেন এই অর্থে যে, বাড়িটা খুব উঁচু ছিল। আর আমরা বিমানের অনুবাদ করছি উড়োজাহাজ, ইংরাজীতে এ্যারোপ্লেন। পুষ্পককে অনেক সময় বিমান যেমন বলা হয়েছে আবার অনেক সময় যানও বলা হয়েছে। তবে এর বৈশিষ্টের কথা বলতে গিয়ে বলাই হচ্ছে যে এই যানে বসে যেখান যাবার ইচ্ছা করা হবে, পুষ্পকযান তাকে সেখানেই নিয়ে যাবে। রূপকথার গল্পে যেমন আমরা দেখেছি ডাইনিরা ঝাঁটার উপরে বসে যেখানে খুশি চলে যেতে

পারত। এ্যস্ট্রিক্স বইতে ম্যাজিক কার্পেটের কাহিনীতেও এই রকম ব্যাপার দেখা যায়। আবার অনেক যোগীরা আসনে বসে যখন যেখানে যাবার ইচ্ছা করতেন আসন বসেই তিনি সেখানে চলে যেতে পারতেন। এগুলো আমরা বইতেই পাই কিন্তু দেখা কোথাও যায় না।

হনুমান এইবার রাজমহলের ভেতরে প্রবেশ করেছেন সীতাকে খুঁজবেন বলে। প্রবেশ করেই দেখছেন, সেই রাজমহলে হাজার হাজার সুন্দরী নারী ঘুমিয়ে আছে। এই সব সুন্দরী নারীর বিরাট বর্ণনা করছেন বাল্মীকি, প্রায় সবাই মদ খেয়ে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে আছে, তাদের সাজসজ্জা, পোষাক অবিন্যস্ত হয়ে রয়েছে। যেটা আসল রাবণের রাজমহল, সেখানে ঢুকে হনুমান দেখছেন সেখানে রাবণও ঘুমিয়ে আছেন, আর তার পাশে তাঁর স্ত্রীরাও ঘুমিয়ে আছে। এর মধ্যে অনেক স্ত্রীদের রাবণ অপহরণ করে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু বেশির ভাগ স্ত্রীরা রাবণের কাছে নিজেরাই স্বইচ্ছায় এসে গিয়েছিল। রাবণের শক্তি, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য্য, পরাক্রম দেখে আকৃষ্ট হয়ে এই সব মেয়েরা রাবণের স্ত্রী হবার বাসনা নিয়েই চলে এসেছিল। এইসব ঘুমন্ত স্ত্রীদের মাঝখানে রাবণকে দেখে হনুমান বলছেন – রাতের আকাশে তারাদের মাঝখানে চাঁদকে যেমন দেখায় রাবণকে ঠিক সেই চাঁদের মত এই নারীদের মাঝখানে দেখাচ্ছিল। মেয়েগুলো যেন আকাশের তারা আর রাবণ যেন আকাশের চাঁদ।

যাশ্চ্যবন্তেহ স্বারাত্তারাঃ পূণ্যশেষসমাবৃতাঃ। ইমাস্তাঃ সঙ্গতাঃ কৃৎস্না ইতি মেনে হরিস্তদা।।৫/৯/৪২। আকাশের ভোগাবশিষ্ঠ পূণ্য নিয়ে যে তারাগুলো খসে পড়ে, বাল্মীকি খুব সুন্দর শব্দ ব্যবহার করছেন – *পূণ্যশেষসমাবৃতাঃ*। একজন লোক সাধনা করেছে, তপস্যা করেছে, পূজা করেছে, এইসব করে সে পূণ্য অর্জন করেছে, সেই পূণ্যের প্রভাবে সে স্বর্গে চলে গেছে বা তারার লোকে বা বিদ্যুৎলোকে এক একটা তারা হয়ে আছে। তারাগুলো যেন স্বর্গের এক একটি সুন্দরী। এর পরে তাদের কি হচ্ছে – *ক্ষীণেপূণ্যে মর্ত্তলোকং বিশ্যন্তি*। পূণ্য যখন শেষ হয়ে যায় তখন তারা আবার পৃথিবীলোকে ফিরে আসে, কিন্তু পূণ্যতো পুরোটাই শেষ হয়ে যাবে না। একটা শিশিতে যখন তেল ঢালা হয়, পুরো তেল ঢালা হয়ে গেলেও কিছুটা তেল থেকে যায়। ঐ যে অবশিষ্ঠ পূণ্য, একটু পূণ্য যে থেকে গেল সেটাও কম কি, অনেক বিরাট। এরা সবাই ছিল স্বর্গের তারা, এবার তারা সবাই তাদের অবশিষ্ঠ পূণ্য নিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছে, এরাই সব সুন্দরী নারী হয়ে জন্ম নিয়েছে। সিনেমার হিরোদের বলা হয় স্টার আর নায়িকাদের বলা হয় স্টারলেট্, আমাদের ভাষাতে বলা হয় সিনেমার তারকা। এই যে সুন্দরীরা ঘুমোচ্ছে, এদের সৌন্দর্য এই পৃথিবী লোকের সৌন্দর্যই নয়, এত সুন্দরী এরা। এই রকম বাল্মীকি খুব সুন্দর সুন্দর কাব্যিক বর্ণনা করছেন, আর কোন কোন সুন্দরী কিভাবে কিভাবে শুয়ে আছে আর তাদের কার কার অঙ্গসাজ, পোষাক কেমন হয়ে আছে সব কিছুর নিখুঁত বর্ণনা করে যাচ্ছেন।

এদের মধ্যে রাবণ কাউকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল আর কেউ কেউ নিজে থেকেই রাবণের কাছে চলে এসেছিল। কিন্তু রাবণ কাউকেই জোর করে টেনে নিয়ে আসেনি। তার কারণ, রাবণের এত অলৌকিক গুণ ছিল যে, মেয়েরা সহজেই রাবণের প্রতি মোহিতা হয়ে যেত। বলছেন – **বিনা বরার্হাং জনকাত্মজাং তু।।**৫/৯/৭০। মানে, সীতা ছাড়া এমন কোন নারী সেখানে ছিল না যে, যাকে রাবণ জোর করে নিয়ে এসেছে। এটাকে একটা বিশেষ শব্দে বলা হয় higher morality বা higher literature, তাতে এক ধরণের সাহিত্য রচনা করা হয় যাতে ভালোকে সব সময় ভালো আর মন্দকে সব সময় খুব মন্দ করেই তুলে ধরা হয়। ভালোকে সব সময় সাদাতে আর মন্দকে সব সময় কালোতে দেওয়া হয়। এই ধরণের সাহিত্য খুব সাধারণ মানের রচনা। এখানে যেটা ভালো তার পুরোটাই সাদা আর যেটা খারাপ তার পুরোটাই কালো। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি শ্রীরামচন্দ্র সর্বগুণসম্পন্ন আর রাবণ অতি বদমাইস ক্রুর লোক। কিন্তু যখন উচ্চমানের সাহিত্য হবে তখন সাদা কালোর ব্যাপার বলে কিছুই থাকবে না, সবটাই সাদা আর কালোর সংমিশ্রণ। এই সাদা ও কালোর সংমিশ্রণে পাঠক-পাঠিকার বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করবে কে বেশি ভালো আর কে বেশি মন্দ। বাল্মীকিও যে ভালো মন্দের মিশ্রণে শ্রীরামচন্দ্র ও রাবণের

চরিত্র অঙ্কন করেছেন, সেই দেখে রাবণের যে ভক্ত সেও বলতে পারে যে, শ্রীরামের অনেক গোলমাল ছিল। মহাভারতেও দুর্যোধনের গুণের কথা বলা হয়েছে, অন্য দিকে যুধিষ্ঠিরেরও দোষ দেখান হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ভারতের আপামর হিন্দু জনগণের হৃদয়ের দেবতা, মহাভারতে শিশুপাল তাঁর বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ নিয়ে আসছে। এটাই উচ্চমানের সাহিত্যের নমুনা। Childish writing আর mature writing এর মধ্যে এইটাই পার্থক্য। Childish writing লেখা মানে, একটা ফোরের বাচ্চাকে যদি তার গ্রামের উপর একটা রচনা লিখতে দেওয়া হয়, তখন সে নিজের গ্রামের এমন বর্ণনা দেবে যে তার গ্রামের মত আর কোন গ্রাম হয় না। জগতে কোন জিনিষই পুরোটাই ভালো বা পুরোটাই মন্দ হয় না, সব কিছুই ভালো আর মন্দের সংমিশ্রণে তৈরী।

এখানে তাই বলছেন রাবণ যত নারীকেই নিয়ে এসে থাকুন না কেন, তিনি কাউকেই জোর করে নিয়ে আসেননি। তার মানে রাবণের দোষের মধ্যে একটাই দোষ সীতাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে এসেছেন। কেন এনেছেন? তাঁর বোনকে এইভাবে নাক কান কেটে দিয়ে অপমান করা হয়েছে। এই ধরণের রচনাকেই বলা হয় উচ্চমানের রচনা। আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে, আমাদের যে প্রথম রচনা সেটাই অতি উচ্চমানের রচনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। কেননা একটা সমাজে উচ্চমানের সাহিত্য তৈরী হতে সময় লাগে। অথচ আমাদের প্রথম রচনা বাল্মীকি রামায়ণ, আর এই প্রথম রচনাই এত উচ্চমানের। আগেকার দিনে যেসব কথা কাহিনী সমাজের লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলো কোথাও লিখিত আকারে ছিল না, বাল্মীকি রামায়ণেই আমরা প্রথম লিখিত আকারে পাই।

হনুমান রাবণের মহল্লায় মহল্লায় সীতার অন্বেষণে ঘুরছেন। রাজমহলের এক কক্ষে হনুমান দেখতে পেলেন এক অতি সুন্দরী নারীকে। বাল্মীকি বর্ণনা করছেন অনিন্দ্য সুন্দরী ও কৃশোদরী, মানে তার পেট কোমর সরু। হনুমান শুনেছিলেন সীতা খুব রোগা। এর আগে শূর্পণখার মুখে সীতার বর্ণনাতে পেয়েছিলাম সীতা হচ্ছে নির্ণতোদরীম্, মানে সীতার পেটটা ভেতরে ঢোকান। এই নারীকেও হনুমান দেখছেন রোগা, এখানে নির্ণতোদরী বলা হচ্ছে না, বলছেন কৃশোদরী। একে দেখে হনুমানের মনে হল এই হয়ত সীতা। হনুমান তখন আনন্দে আতিশয্যে লেজটাকে মাটিতে আছাড় দিতে থাকলেন। আনন্দে কখন একটা স্তম্ভের উপরে উঠে যাচ্ছেন, আবার কখন ওখান থেকে ঝাঁপ মেরে নীচে নামছেন। তারপরে হঠাৎ হনুমানের মনে হল, আমি যা শুনেছি সীতা তো শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া আর কারুর প্রতি মন দিতে পারবেন না, সীতা এই অবস্থায় না ঘুমোতে পারবে, না শৃঙ্গার করবে, না অলঙ্কার ধারণ করবে, না প্রসাধন লাগাতে পারবে, না খুব দামী বস্ত্র পরিধান করতে পারবে। আর – **ন ভোক্তুং নাপ্যলঙ্কর্তুং ন পানমুপসেবিতুম**।।৫/১১/২। পতিপ্রাণা সীতা শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকে বিযুক্তা হয়ে না অলঙ্কার পড়তে পারবে, না ভোজন করতে পারবে, আর মদ পান করা, এটাতো সীতা কখনই করবে না। আমরা এখন বলি আজকাল মেয়েরাও পার্টিতে তো মদ পান করছে আর অনেক মেয়ে তো রীতিমত এটাকে অভ্যেস করে নিয়েছে, বলা হয় মদ খাওয়াটা এখন ভদ্রবাড়ির মেয়েদের কালচার। কিন্তু রামায়ণের যুগে এটাও একটা কালচার ছিল, মেয়েদের মদ খাওয়ার অভ্যাস আগে থাকতেই ছিল। আর লঙ্কার কালচার আমাদের থেকে আলাদা নয়, কারণ রাবণ ছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র, সেইজন্য আসলে রাবণ একজন ব্রাহ্মণ। এইজন্য অনেক ব্রাহ্মণ বলে শ্রীরামচন্দ্র একজন ক্ষত্রিয় পুরুষ আর আমি ব্রাহ্মণ হয়ে শ্রীরামের কি পূজা করব! শ্রীলঙ্কা আর ভারতের কালচার কোন আলাদা কালচার নয়। সেখানেও দেখলাম যোগী বেশে আছে, সন্ন্যাসী বেশে আছে, লঙ্কাতেও বেদ পাঠ হত। মেঘনাদ যজ্ঞ-যাগ করত, তন্ত্রের অনুশীলন করত। তন্ত্রের অনুশীলনের কথা প্রথম আমরা বাল্মীকি রামায়ণেই পাই, যেখানে মেঘনাদ কালো ছাগলের বলি দিতে যাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা, ভারত আর নেপাল এই তিনটে দেশ কখনই মনে করে না যে সংস্কৃতির দিকে থেকে আমরা আলাদা। বার্মার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি আলাদা, সেখানকার সংস্কৃতি আবার চীনের সংস্কৃতির কাছাকাছি। হনুমান তখন বলছেন – কোন মানুষ, দেবতা, ঈশ্বরের কাছে সীতা কখনই যাবে না, নিশ্চয়ই এ অন্য কোন নারী হবে। তখন আবার হনুমান হতাশ হয়ে পড়েছেন।

হনুমান ঘুরতে ঘুরতে দেখে বড় বড় সোনার পাত্রে সব খাওয়া-দাওয়ার সামগ্রী রাখা আছে। কি কি খাবার রাখা আছে? ময়ূরের মাংস রান্না করে রাখা আছে। কোন পাত্রে মুরগীর মাংস। বলছেন – **বরাহ-বাধ্রীণসকান্ দধিসৌবর্চলাযুতান্। শল্যান্ মৃগময়ূরাংশ্চ হনুমানন্ববৈক্ষত।**।৫/১১/১৬ মানে ময়ূরের মাংস আর মুরগীর মাংস, শূয়রের মাংস, আরও অনেক রকম পশু পাখির মাংস। আর বেশির ভাগ মাংসই রান্না হয়েছে দই আর লবণ দিয়ে, দক্ষিণ ভারতে এই ভাবেই মাংস রান্না হয়।

হনুমান ঘুরে ঘুরে চক্কর দিয়েই চলেছেন, কেননা তিনি বুঝে গেলেন যে রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী যে রাবণের পাশে শুয়ে আছে সে সীতা হতে পারেনা। আবার বিভিন্ন মহলে মহলে ঘুরে ঘুরে মেয়েদের দৃশ্য দেখছেন, দেখতে দেখতে হঠাৎ হনুমানের মনে খুব অনুশোচনা এসে গেল – ছিঃ ছিঃ এ আমি কি করছি, ঘুমন্ত অবস্থায় অপরের স্ত্রীদের দেখে আমি কত খারাপ কাজ করলাম। তখন তিনি বলছেন – **ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্মলোপং করিষ্যতি।**।৫/১১/৩৮। এই যে আমি, ঘুমন্ত অবস্থায় অপরের স্ত্রীর অবিন্যস্ত শরীর ও মুখবদন দেখলাম, যার ফলে আমার যত ধর্ম, কর্মের ফল সব নাশ হয়ে গেল। একে তো নারীমুখ তার ওপরে আবার সেই নারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা, ঘুমন্ত অবস্থায় মানে তারা সজাগ নয়, সচেতন নয়। সজাগ না হওয়া মানেই তুমি আড়ালে কিছু আস্বাদন করছ। **ন হি মে পরদারানাং দৃষ্টির্বিষয়বর্তিনী। অয়ং চাত্র ময়া দৃষ্টঃ পরদারপরিগ্রহঃ।**।৪/১১/৩৯। আজ পর্যন্ত আমি কোনও নারীর মুখের দিকে তাকাইনি, কিন্তু পরস্ত্রী হরণকারী রাবণকে আজ আমি দেখলাম। হনুমান ছিলেন বাল ব্রহ্মচারী আর চিরদিনই তিনি বাল ব্রহ্মচারী থেকে গেলেন। সেইজন্য হনুমান বলছেন, আমি জীবনে কোন দিনই নারীর মুখের দিকে তাকাইনি, এ আমি কি করে বসলাম রাবণের দেশে এসে। পর নারী তাও ঘুমন্ত অবস্থায়। শুধু যে পরস্ত্রী তাই নয়, যেসব স্ত্রীদের রাবণ অপহরণ করে নিয়ে এসেছে তাদেরও মুখ আমাকে দেখে নিত হল, ছিঃ।

এই সব চিন্তা করতে করতে হনুমানের মনের মধ্যে যখন খুব অনুশোচনা এসে যাচ্ছে, তখন এই অনুশোচনা থেকে তার মধ্যে ক্ষোভ আর দুঃখে একটা হতাশার ভাব এসে যাচ্ছে, তখন বলছেন – **কামং দৃষ্টা ময়া সর্বা বিশ্বস্তা রাবণস্ত্রিয়ঃ। ন তু মে মনসা কিঞ্চিদ্ বৈকৃত্যমুপপদ্যতে।**।৫/১১/৪১। রাবণের স্ত্রীরা নিঃশঙ্কায় ঘুমাচ্ছিল, মানে তাদের কোন শঙ্কা ছিল না যে কেউ এখানে আসতে পারে, সেইজন্য তারা বিভিন্ন সাজে ও সাজ বিহীন হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে, এই অবস্থায় পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা খুব গর্হিত। আমিও মানছি, কিন্তু *ন তু মে মনসা কিঞ্চিদ্ বৈকৃত্যমুপপদ্যতে* তার জন্য আমার মনের মধ্যে তো কোন ধরণের বিকার কিছু আসেনি।

প্রথমের দিকে হনুমানের মনে হতাশা এসে গিয়েছিল। কারণ মানুষ যখন প্রথম কোন অন্যায় কাজ করে তখন মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। একটা বাচ্চা ছেলে যখন প্রথম মিথ্যা কথা বলতে যাবে তখন তার মনে প্রচণ্ড ভয় আসে – আমার শিং বেরিয়ে যাবে, আমি ধরা পড়ে যাব। অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে যখন কেউ প্রথম ঘুষ নিতে যায় তখনও তার ভয়ে বুক দুর্‌দুর্ করতে থাকে, এই বুঝি সবাই জেনে ফেলবে, এই বুঝি আমি ধরা পড়ে যাব। তারপর থেকে কয়েক দিন ধরে ঘুষ নিতে নিতে তার এই লজ্জা ভয়টা কেটে যায়– ঠাকুর বলছেন মেথর ময়লা নিয়ে যেতে যেতে তার বিষ্ঠা থেকে ঘেন্নাটা চলে যায়।

এই কারণেই আমাদের বলা হয় সব সময় কিছু কিছু ভালো জিনিষের অভ্যেস করতে হয়। ভালো কিছু অভ্যেস করে নিলে পরে এই শুভ সংস্কারই আমাদের অনেক কিছু থেকে রক্ষা করবে। প্রথমবার মানুষ যখন কোন অন্যায় করে তখন মানুষ চিৎকার করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি সে করে তাহলে বুঝে নিতে হবে কদিন পর থেকেই সে মাথায় নোংরা বইবে আর অন্যায় কাজ করার প্রতি তার ঘেন্নাটা চলে যাবে। যে কোন অন্যায় প্রথমবার দুর্ঘটনার মত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়বারও মন যদি সেটা করতে যায় তাহলে তখনই তাকে সাবধান হয়ে যেতে হবে। হনুমান এই কথাই বলছেন – আমার মনে কোন বিকার আসেনি। শুভ আর অশুভ কর্ম যা কিছু করা হয়, এর প্রথম যে প্রেরণা আসে

সেটা মন যোগান দেয়। আমার যে মন এর মধ্যে কিন্তু কোন বিকার আসেনি, একজন সুন্দরী নারী তার দিকে বেশিক্ষণ তাকাব আর এ অসুন্দরী নারী এর দিক থেকে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছি এই ধরণের কোন বিকার আমার নেই। আমি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছি। তার মানে আমি কোন দোষ করিনি।

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, হনুমান এমনই ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, একটা অন্য অবস্থাতে অন্য পরিবেশের মধ্যে পড়ে ভোগের জিনিষ দেখেও তাঁর মনে কোন ধরণের বিকার আসছে না। যারা আধ্যাত্মিক পথের পথিক, যারা সাধনার মধ্যে রয়েছেন, তাদের সব সময় বলা হয় যেখানে ভোগের কোন ব্যাপার থাকবে তার ধারে কাছে যেন না যায়। ভোগের ধারে কাছে গেলেই কিন্তু তার সাধনায় বিঘ্ন বা কোন গোলমাল আসতে বাধ্য। এখানে একটা ঘটনার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কোন মঠের এক ব্রহ্মচারীকে একবার কোন কাজে একটা গ্রামে পাঠান হয়েছিল। কোন কারণে কাজে আটকে যাওয়ার ফলে তার আশ্রমে ফিরে আসাটা সম্ভব হয়নি বলে রাত্রিবেলা তাকে এক গৃহস্থের বাড়িতে রাত কাটাতে হয়েছিল। রাত্রিবেলা যে ঘরে শুয়েছে তার পাশের ঘরে যাদের বাড়ি, সেই বাড়ির স্বামী-স্ত্রী শুয়েছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের মধ্যে যে ধরণের ভালোবাসার কথাবার্তা হয় সেই সব কথা বলছিল। পাশের ঘরে ব্রহ্মচারীর কানে ঐ সব কথাবার্তার কিছু কিছু গেছে। শুনে শুনে এক রাত্রের মধ্যে তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। পরে তাকে মঠ ছেড়েই দিতে হল। এক রাত্রের মধ্যে তার জীবন পুরো পাল্টে গেল। সেইজন্য সাধনার প্রথম অবস্থায় বলা হয় শারীরিক ভাবে নিজেকে সমস্ত রকমের ভোগ্য বস্তু থেকে দূরে থাকতে। কারণ, ভোগের বস্তু সামনে থাকলেই মনে বিকার জাগবে, মনে বিকার জাগলে মনের ইচ্ছা জাগ্রত হবে, ইচ্ছা জেগে গেলেই তখন বাণীর দ্বারা সেটা প্রকাশ হতে শুরু করবে, বাণীতে প্রকাশ হওয়ার পরেই সেটা কার্যে পরিণত হবে। কার্যে যখনই পরিণত হয়ে গেল, তখন তার মনে প্রথম একটা গভীর ছাপ সংস্কার রূপে জমে গেল। এতক্ষণ যেটা চলছিল সেটা মনের উপরে উপরে চলছিল, সমুদ্রের ঢেউ গুলো উপরে উপরে হয়, কিন্তু সুনামি যখন আসে তখন সেটা সমুদ্রের নীচ থেকে উঠে আসে। কারুর হাতে একটা দামী মোবাইল ফোন দেখে আমার মনে একটা বিকার এল। এই বিকার আসার পর হঠাৎ আমার ইচ্ছা হল আমারও এই রকম একটা দামী মোবাইল হোক। এবার আমি ব্যবস্থা করে ঐরকম একটা ফোন জোগাড় করলাম, এতক্ষণ ওটা মনের উপরিভাগে ছিল, এখন এটাই মনের গভীরে চলে গেল। মনের গভীরে যেটা চলে যাবে সেটাকে ওখান থেকে বার করে নির্মূল করা খুব কঠিন কাজ হয়ে যাবে। সেইজন্য মহিলা ভক্তদের বিশেষ করে বলা হয়, তোমরা যখন আশ্রম যাবে কিংবা কোন সাধুর কাছে যাবে তখন শৃঙ্গার করে যেয়ো না। শৃঙ্গার করে গেলেই কি হবে, তাঁর মাথায় একটা ধাক্কা দিতে পারে। যদি ধাক্কা খায়, তাহলে সেখান থেকে জাগবে তাঁর ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই তাঁকে বার্তালাপের দিকে ঠেলে দেবে। একবার যখন বার্তালাপ হয়ে গেল, সেখান থেকে শেষ পরিণাম হচ্ছে ঐ জিনিষটাতে নেমে যাওয়া। যেই ঐ জায়গাতে নেমে গেল তখন যেটা মনের উপরে চলছিল সেটা এখন মনের গভীরে গিয়ে একটা দাগ কেটে দিল। এবার কিন্তু এই দাগকে নির্মূল করা খুব কঠিণ হয়ে গেল। মাটির উপরে যে বীজটা পড়েছিল সেই বীজ থেকে একটা শেকড় বেরিয়ে মাটির গভীরে ঢুকে গেল। এবার কিন্তু গাছটাকে উপড়ে ফেলা খুব কঠিণ।

হনুমান এবার ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে হনুমান গেছেন একটা চৈত্ত প্রাসাদে। বাল্মীকি রামায়ণের যুগে তখন মন্দিরের ধারণা তৈরী হয়নি, মন্দিরের ধারণা আরও অনেক পরে এসেছে। অনেক ঐতিহাসিকরা বলেন বৌদ্ধদের থেকে মন্দিরের ধারণা হিন্দুদের মধ্যে এসেছে। তার আগে যেসব ধর্মীয় স্থান ছিল সেগুলো একটা হল ঘরের মত থাকত যেখানে সবাই সমবেত হয়ে প্রার্থনাদি বা পূজা অর্চনা করত, এই ধরণের হল গুলিকে বলা হত চৈত্ত। এখন বেলুড় মঠে, কালীঘাটের মন্দিরে যেভাবে পূজা অর্চনা করা হয় সেইভাবে পূজা অর্চনা করা হত না।

হনুমান যখন সেই চৈত্ত প্রাসাদে গেছেন, সেখানে গিয়ে দেখছেন একটা গাছের তলায় একজন অতীব সুন্দরী নারী যার চেহারা – *মলিন সম্বিতাম্* , অত্যন্ত মলিন সাধারণ কাপড় পরিধাণ করে এক অতি

সুন্দরী নারী বসে আছেন, আর তাঁকে অত্যন্ত দুর্বল ও দীন দেখাচ্ছে। তাঁকে কিরকম দেখাচ্ছে – **দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবামলাম্।**।৫/১৫/১৯। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদকে যেমন শীর্ণ একটা উজ্জ্বল রেখার মত দেখায়, সেই নারীকে ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে। তাঁর পরনে একটা পুরনো হলুদ রঙের শাড়ি। রাবণ যখন সীতাকে অপহরণ করেছিলেন তখন তিনি যে শাড়ি পরিধাণ করে ছিলেন সেই শাড়িটাই হনুমান দেখছেন। তাঁর শরীরে কোন অলঙ্কারাদি নেই, কেননা সব অলঙ্কার খুলে কাপড়ে জড়িয়ে সুগ্রীবের কাছে ফেলে এসেছেন। তাঁকে শ্রীহীন দেখাচ্ছে। কিরকম শ্রীহীন? বাল্মীকি উপমা দিয়ে বর্ণনা করছেন – **সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীম্।**।৫/১৫/২১। পদ্ম পুষ্প ছাড়া পুষ্করিণী যেমন দেখায়। একটা পুকুরের সৌন্দর্য পদ্ম ফুল দিয়েই হয়। যে পুকুরের পদ্ম ফুল নেই সেই পুকুরের শোভা নেই। এই নারীকে ঠিক সেই রকম শ্রীহীন দেখাচ্ছে।

পতন কত রকমের হতে পারে বাল্মীকি বলছেন। বলছেন পতিত, এখানে পতিত মানে খারাপ অর্থে বলা হচ্ছে না, ভালো অবস্থা ছিলে সেখান থেকে পতিত হয়ে গেছে, মানে পড়ে গেছে। সন্দিগ্ধ স্মৃতির মতে, স্মৃতি মানে এখানে মনে রাখা, আমি শাস্ত্রে একটা কিছু উল্লেখ করছি, কিন্তু আমার শাস্ত্রের উক্তিটা আমার মনে পড়ছে না, প্রথম দুটো কথা মনে পড়ছে, পরেরটা মনে আসছে না। এই স্মৃতিকে বলছেন সন্দিগ্ধ স্মৃতি, মানে মনে নেই। তারপরে বলছেন নিপতিত ঋদ্ধিম্। ঋদ্ধি মানে সমৃদ্ধি, নিপতিত ঋদ্ধিম্ মানে সমৃদ্ধিটা যেন মাটিতে লোটাচ্ছে, তার মানে বলতে চাইছেন তার ঐশ্বর্য নেই। তারপর – রিহতাম শ্রদ্ধাম্ - শ্রদ্ধাটা যেন ভেঙ্গে গেছে। আমাকে কেউ শ্রদ্ধা করে, আমি এমন কিছু করলাম তাতে আমার থেকে তার শ্রদ্ধাটা চলে গেল, বীতশ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাটা ভেঙ্গে গেছে। আর হচ্ছে ভগ্ন আশা, আশা যখন ভেঙ্গে যায়। বিঘ্ন যুক্ত সিদ্ধি, সিদ্ধি পেয়েছি কিন্তু একটা বিঘ্ন তার মধ্যে থেকে গেছে। কোর্টে একটা মামলা করেছি, বিচারের রায় আমার অনুকূলে গেছে কিন্তু তার সাথে এমন একটা ফ্যাঁকড়া জুড়ে দিয়েছে যে আমার অনুকূলে রায় গেলেও অন্য দিক দিয়ে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তারপরে বলছেন কলুষিত বুদ্ধি – বুদ্ধি আছে কিন্তু কলুষিত। তারপরে মিথ্যা কলঙ্ক। তারপর ভ্রষ্ট কীর্তি – কীর্তি যার ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। সীতাকে ঠিক এই রকমই মনে হচ্ছে। কিভাবে কিভাবে একেকটা জিনিষ থেকে পতন হয় দুটি শ্লোকে তার বর্ণনা দিচ্ছেন – সন্দিগ্ধ স্মৃতি, পতিত ঋদ্ধি, শ্রদ্ধাচ্যুত, ভগ্ন আশা, বিঘ্ন যুক্ত সিদ্ধি, কলুষিত বুদ্ধি, মিথ্যা কলঙ্ক এবং ভ্রষ্ট কীর্তি। এই এত ভাবে সীতা মাটিতে পড়ে আছে।

এরপরে বলছেন, একটা বিদ্যাকে যদি ঠিক মত অভ্যাস না করা হয়, তখন ঐ বিদ্যার প্রতি একটা সন্দেহ উৎপন্ন হয়। গীতা রোজ পাঠ করা হচ্ছে না, তার মানে গীতাকে অভ্যেস করা হচ্ছে না, তার ফলে গীতার ভাব আমার কাছে দুর্বল হয়ে যাবে, তাই বলা হয়ে বিদ্যাকে রোজ অনুশীলন করতে হয়।

এবারে হনুমানের মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগল, এই কি সীতা? সীতার যা বর্ণনা শুনেছেন তার সাথে মিলছে না। সীতার বর্ণনা শুনে শুনে হনুমানের মনে সীতার চেহারা সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরী হয়ে গিয়েছিল, সীতা একজন খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী, কিন্তু এখানে এই নারীকে মনে হচ্ছে যেন পতিতা। কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার পরে হনুমান ভাবছেন যে, শ্রীরামচন্দ্র আমাকে সীতার সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেন সব দেখেতো মনে হচ্ছে ইনিই সেই সীতা। শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতার বর্ণনা করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন তাঁর অঙ্গে কি কি আভূষণ আছে। সুগ্রীবের কাছে যা যা ফেলে দিয়েছিলেন তার বাইরে আর যা সামান্য আভূষণ তাঁর অঙ্গে ছিল, সেগুলো সেই রকমই আছে।

শ্রীরামচন্দ্র সীতার অভাবে করুণা, দয়া, শোক আর প্রেম এই চারটে থেকে সন্তপ্ত হয়ে আছেন। বাল্মীকি খুব সুন্দর এটাকে বিশ্লেষণ করছেন। সীতা এক স্ত্রী ও এক নারী, সেই স্ত্রী বা নারী হারিয়ে গেছে এই থেকে শ্রীরামচন্দ্রের করুণা আসছে। সীতা আমার স্ত্রী ছিলেন, সে আমার আশ্রিতা ছিল এখন সীতা নিরাশ্রয় হয়ে গেছে সেইজন্য আমার মনে দয়া জাগছে। আমাকে সীতার দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছিল, আমি সেই দায়ীত্ব ঠিক মত পালন করতে পারলাম না। তৃতীয়তঃ আমার স্ত্রী আমার থেকে সরে গেছে, সেইজন্য আমি

শোক সন্তপ্ত। চতুর্থতঃ সীতা শুধু মাত্র আমার স্ত্রীই নয়, সে আমার প্রিয়তমা আমার কাছে নেই এই ভেবে শ্রীরামচন্দ্রের মন প্রেমের বিরহ বেদনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

হনুমান তখন গালে হাত রেখে ভাবছেন – যে লক্ষ্মণ এত শক্তিমান, এত বুদ্ধিমান ও কর্মকুশল, আর সেই লক্ষ্মণের দাদা হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র, মানে তিনি লক্ষ্মণের থেকেও আর কত বড় বীর, তাঁর প্রিয়তমা হলেন এই সীতা, সেই সীতাকেই যদি এত দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, তাহলে এটাই মানতে হবে যে, - *কালোহি দুরতিক্রমঃ*। মহাভারতে এই কথা বারবার ঘুরে ঘুরে আসে – *কালোহি দুরতিক্রমঃ*, কালকে অতিক্রম করা যায় না। এখানে কাল মানে ভাগ্য, সময় সব একই অর্থে আসে, এই কালকে উল্লঙ্ঘন করা অসম্ভব। যাঁর স্বামী হলেন অতি পরাক্রমী, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, যাঁর দেবর লক্ষ্মণ, সেই নারীর যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সাধারণের কি অবস্থা হতে পারে, কালের হাত থেকে কে বাঁচতে পারে। তবে যাই বলা হোক না কেন, সীতার যে শীল, স্বভাব, আচরণ, তার যে এত সুন্দর এই কালো নয়ন এই সব যা দেখছি, সত্যিই তিনি শ্রীরামচন্দ্রেরই যোগ্যা আর কারুরই তিনি যোগ্যা নন। এমন নারীর জন্য শ্রীরামচন্দ্র যদি সমগ্র পৃথিবীকে ওলোট পালট করে দেন তাহলে সেটা কোন অনুচিত কাজ হবে না, সীতার জন্য এমনটিই করা উচিৎ। একদিকে যদি তিনটে লোকের সাম্রাজ্য রেখে দেওয়া হয় আর অন্য দিকে শুধু সীতাকে যদি রাখা হয় তাহলেও তিন লোকের সাম্রাজ্য সীতার তুলনায় এক কলাও, মানে ষোল ভাগের এক ভাগও হবে না। তার মানে সীতার তুলনা এই জগতের কোন কিছুর সাথেই করা যায় না।

এই সীতা হলেন – **কামভোগৈঃ পরিত্যক্তা হীনা বন্ধুজনেন চ**।৫/১৬/২৪। সীতার পাশে তাঁর কোন স্বজন বান্ধব নেই, তিনি এখন সঙ্কুচিতা হয়ে আছেন, কাম ভোগ সব কিছু থেকে দূরে। তাঁর খাওয়া-পড়া কিছুই নেই, তবুও কিন্তু তাঁর মন শুধু শ্রীরামের প্রতি পড়ে আছে। কথামৃতে খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন – সীতার মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ, কোন কিছু সম্বল নেই, কিন্তু সীতার দেহ মন পুরোপুরি শ্রীরামের দিকে পড়ে আছে, শ্রীরাম ছাড়া তাঁর আর কোন চিন্তা নেই।

হনুমান দেখছেন রাক্ষসীরা সীতাকে ঘিরে রেখেছে। বাল্মীকি আবার এই রাক্ষসীদের এক বিরাট বর্ণনা দিচ্ছেন – কারুর মুখ শূয়োরের মত, কারুর হরিণের মত, কারুর মুখ সিংহের মত ইত্যাদি, কারুর নাক বড়, কারুর নাক ছোট, কারুর নাক বেঁকা, কারুর নাক হাতির নাকের মত, কারুর আবার নাকই নেই, আবার কারুর নাক কপালে উঠে গেছে, শুধু নাক নিয়েই এক বিশাল বর্ণনা দিচ্ছেন। বাল্মীকির এটাই বৈশিষ্ট্য, যে জিনিষটাকে তিনি ধরছেন তাকেই একেবারে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছেন।

এরপরে একটা কাণ্ড হয়েছে। মাঝ রাত্রে কোন কারণে রাবণের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সেই মাঝ রাত্রে রাবণ হাজির হয়েছে সীতার কাছে। সীতাকে রাবণ নানান ভাবে প্রলোভন দেখাতে শুরু করেছে। অনেক প্রলোভনের পরেও সীতা রাবণকে বলছেন – পাপাচারী পুরুষ কখন সিদ্ধি লাভের আশা করতে পারেনা। সীতা কিসের সিদ্ধির কথা বলছেন? তপস্যার সিদ্ধি, আমি জপ ধ্যান করছি, তপস্যা করে যাচ্ছি কিন্তু অন্য দিকে পাপে মগ্ন হয়ে রয়েছি, এই ধরণের লোকেদের কখন সিদ্ধি লাভের আশা করা উচিৎ নয়। সীতা তাই বলছেন – ঠিক তেমনি তুমি কখনই আমাকে আশা করো না, কারণ তুমি কোন দিক দিয়েই আমার যোগ্য নও। যে পাপাচার করছে আবার তপস্যাও করছে সে ঐ তপস্যার ফলের আশা করলে কোন দিন সে সেই তপস্যার ফল পায়না, তুমিও পাপাচারে রত হয়ে আমাকে কখনই আশা করতে পারো না। নিজেকে তুমি আদর্শ পুরুষ ভেবে তোমার নিজের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত থাক। যারা নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না তাদেরকে ধিক্কার দিতে হয়। যারা চঞ্চল পুরুষ, আর পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়, পরস্ত্রী আজ হোক কাল হোক সেই পুরুষকে বিপদের দিকে টেনে নিয়ে যাবেই যাব। ঠাকুর বলছেন – কোন মেয়ে যদি কাউকে উপপতি করে তারপর একদিন সেই মেয়ে উপপতির গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে বলে – তবে রে শালা, তোর জন্য আমি সব ছাড়লাম আর তুই আমাকে দেখবি না মানে। সীতা বলছেন – যেমন সূর্য থেকে সূর্যের কিরণ আলাদা হতে পারেনা, ঠিক তেমনি আমি শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে এক। তুমি যতই প্রলোভন দেখাও

না কেন, সেই প্রলোভনে কোন কাজ হবে না। আর তুমি মনে রেখো, শ্রীরামচন্দ্র যতক্ষণ এখানে আসছেন না ততক্ষণই তোমার লম্ফঝম্প। একটা কুকুর যখন দুটো বাঘের সামনে পরে যায়, তখন সেই কুকুরের যে দুরবস্থা হয়, শ্রীরাম আর লক্ষ্মণের সামনে তোমারাও ঠিক সেই কুকুরের মত দুরবস্থা হবে।

বাল্মীকি রামায়ণ – ২০ই জুন ২০১০

রাবণের সমস্ত প্রলোভনকে প্রত্যাখান করে সীতার তেজোদীপ্ত বচন শোনার পর রাবণের মনে কিছু একটা হয়েছে, যেখান থেকে সে সীতাকে বলছে – আজ থেকে তোমাকে দু মাসের সময় দেওয়া হল, এই দু মাস সময়ের মধ্যে যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী না হয়ে যাও তাহলে আমার যে রাঁধুনি আছে, তারা তোমাকে টুকরো টুকরো কারে মাংস রান্না করে আমার ভোজনে দিয়ে দেবে।

সীতা তখন রাবণকে বলছেন – এই লঙ্কা নগরীতে নিশ্চয়ই এমন কোন লোক নেই যে তোমার মঙ্গল চায়। কারণ যে তোমার মঙ্গল চায় সে তোমাকে এই পাপ কর্ম করা থেকে বিরত করত। তুমি এই রকম গর্হিত কাজ, মানে আমাকে বধ করবার যে চেষ্টা করছ, এটা করতে যেওনা। সীতা এখানে বলছেন – **মাং হি ধর্মাত্মনঃ পত্নীং শচীমিব শচীপতেঃ**।৫/২২/১৪ যেমন ইন্দ্রের স্ত্রী হলেন শচী, ঠিক তেমনি আমি হলাম শ্রীরামচন্দ্রের ভার্যা। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে যারা জানতে ইচ্ছুক, তাদের এই জিনিষ গুলোকে খুব ভালো করে বোধগম্য করা উচিৎ। বাল্মীকি রামায়ণ বৈদিক যুগের রচনা। রামায়ণ যখন লেখা হচ্ছে বেদের প্রভাব তখনও তুঙ্গে। বেদের প্রভাব তুঙ্গে বলে যখন কাউকে আদর্শ রূপে দেখান হবে তখন ইন্দ্র আর শচীকেই আদর্শ রূপে দেখান হয়েছে। ইদানিং কালে তো কেউ বলছেন না যে, ঠাকুর হলেন ইন্দ্র আর শ্রীমা শচী। কারণ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার রূপটা পাল্টে যাচ্ছে। ঠাকুরের সময় ইন্দ্র আর শচীর বদলে শিব আর পার্বতী বা বিষ্ণু আর লক্ষ্মীর সাথে তুলনা করা হচ্ছে। বাল্মীকি রামায়ণ এত প্রাচীন যে শিব-পার্বতী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী এনারা তখনও আসেননি। তাই এখানে সীতা ইন্দ্র আর শচীর কথা বলছেন, ইন্দ্রের গুরুত্ব শুধু বেদের সময়েই ছিল। বৈদিক যুগের পরে যখন রামায়ণ মহাভারতের যুগ শুরু হল, মহাভারতের পর যখন পুরাণ এসেছে তখন ইন্দ্রের প্রভাব শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে বিষ্ণু আর শিবের প্রভাব শুরু হওয়াতে সব কিছুতেই শিব আর বিষ্ণুর উপমা দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। তারপর থেকে ভারতে এই দুজন দেবতা বিষ্ণু আর শিবই থেকে গেলেন।

বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণুর শক্তি রূপে দেখাচ্ছেন, সেই থেকে বিষ্ণুরও প্রভাব বাড়তে শুরু হয়েছে। রামায়ণে তখনও অবতারের ধারণা আসেনি, অবতারের ধারণা প্রথম আসতে শুরু হয় মহাভারত থেকে, পুরাণে তো অবতারবাদ পাকাপাকি ভাবে হিন্দু ধর্মে বসে গেল। বাল্মীকি রামায়ণ হল বৈদিক যুগ থেকে পরবর্তি যুগে পরিবর্তনের প্রথম অবস্থা। সীতা বলছেন – শচীকে পাওয়ার কল্পনা যেমন কেউ করতে পারেনা, ঠিক সেই রকম আমাকে অধিকার করে নেবার কল্পনা করে কেউ রেহাই পাবে না। কোন জঙ্গলে হাতি আর খরগোশের যদি যুদ্ধ লাগে, তখন খরগোশের যা অবস্থা হবে, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যদি তুমি সামনা-সামনি যুদ্ধে নাম তখন তোমারও ঠিক এই খরগোশের মত একই অবস্থা হবে।

তারপর সীতা বলছেন – **তস্য ধর্মাত্মনঃ পত্নী স্নুষা দশরথস্য চ। কথং ব্যহরতো মাং তে ন জিহ্বা পাপ শীর্ষতি**।।৫/২২/১৯ আমি রাজা দশরথের পুত্রবধু, শ্রীরামচন্দ্রের আমি ভার্যা, আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে গিয়ে তোমার জিহ্বাটা পচে গলে খসে পড়ে যাচ্ছে না কেন, এই ভেবেই আমার অবাক লাগছে। সীতা আক্ষেপের সুরে বলছেন – আমি তো শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী, আমাকে অপহরণ করে নিয়ে আসার ক্ষমতা কখনই তোমার ছিল না। তবে – **নাপহর্তুমহং শক্যা তস্য রামস্য ধীমতঃ। বিধিস্তব বধার্থায় বিহিতো নাত্র সংশয়ঃ**।।৫/২২/২১। বিধাতা যিনি, তিনিই এটা করেছেন। কেন করেছেন?

বোধার্থায়, তোমার মৃত্যুর জন্য। তোমার বিনাশের জন্যই বিধাতা এই তোমাকে দিয়ে আমার অপহরণ করিয়েছেন। তুমি এবার মরবে, তোমার মৃত্যু অবধারিত।

সীতার মুখ থেকে এই ধরণের কথা শোনার পর রাবণের যে প্রতিক্রিয় হয়েছে, বাল্মীকি তার বিরাট বর্ণনা দিচ্ছেন। সব কথা শোনার পর রাবণ এখন প্রচণ্ড রেগে গেছে। সীতার কাছে যত রাক্ষসীরা ছিল, রাবণ রেগে গিয়ে তাদের বলছে – তোমরা সবাই এই সীতাকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও, সীতাকে বশে আনার দায়ীত্ব তোমাদের ওপর ন্যস্ত করলাম। সেই সময় রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী পাশে এসে বলছে – হে রাক্ষসরাজ! আমি আপনার জন্য আছি, আমি এত সুন্দরী, আমি থাকতে আপনি কেন অযথা এই এক মানবীকে নিয়ে বিচলিত হচ্ছেন, একে আপনি ছেড়ে দিন। হে প্রাণনাথ, **অকামাং কাময়ানস্য শরীরমুপতপ্যতে।**।৫/২২/৪২। যদি কোন নারী নিজের থেকে কোন পুরুষকে না ভালোবাসে, তা সত্ত্বেও পুরুষ যদি সেই নারীর কাছে যায়, তাতে তার ভেতরে তাপ সৃষ্টি হয়, সেই তাপ তাকে অশান্তিতে ঘিরে ফেলে, আপনি এই রকমটি করতে যাবেন না। মন্দোদরী রাবণকে বোঝাচ্ছে, সীতাকে পাওয়ার জন্য এই ভাবে চেষ্টা করার আগে আপনি মনে রাখবেন কোন স্ত্রী যদি নিজে থেকে আপনার কাছে না আসতে চায়, এই যে আপনি সীতাকে পেতে চাইছেন কিন্তু সীতা আপনাকে চাইছে না, এতে কিন্তু আপনার শরীরের তাপ উৎপন্ন হবে – আপনার মধ্যে রাগ, ক্রোধ, জেদ এই জিনিষগুলো আপনার শরীরে শুধু তাপ তৈরী করবে। আপনি সীতাকে পাওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হন, সীতার প্রতি আপনার সমস্ত আকাঙ্খা ছেড়ে দিন।

এখানে রাক্ষসীদের বাল্মীকি বর্ণনা করছেন – **একাক্ষীমেকর্ণাঞ্চ কর্ণপ্রাবরণাং তথা। গোকর্ণীং হস্তিকর্ণীঞ্চ লম্বকর্ণীমকর্ণিকাম্।**।৫/২২/৩৩। যেসব রাক্ষসীরা সীতাকে ঘিরে রেখেছে তাদের কারুর একটি মাত্র চোখ, মাত্র একটি কান, কারুর কান *কর্ণপ্রবরণাং*, এত বড় কান যে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখছে, কেউ আবার *গোকর্ণীম্* – গরুর মত কান, কারুর কান *হস্তিকর্ণীম্* – হাতির মত কান, কেউ *লম্বকর্ণীম্* – লম্বা কান, *অকর্ণিকাম্* – কারুর আবার কানই নেই। শব্দকে নিয়ে কিভাবে খেলা করা যায়, শব্দকে কত সুন্দর ছন্দোবদ্ধ করা যায় বাল্মীকি এখানে দেখিয়ে দিলেন – *গোকর্ণীং হস্তিকর্ণীঞ্চ লম্বকর্ণীমকর্ণিকাম্* তারপরে পায়ের বর্ণনা – **হস্তিপদ্যাশ্বপদ্যৌ চ গোপদীং পাদচূলিকাম্। একাক্ষীমেকপানীঞ্চ পৃথুপাদীমপাদিকাম্।**।৫/২২/৩৪ কারুর হাতির মত পা, কারুর ঘোড়ার মত পা, কারুর গরুর মত পা আবার কারুর পা চুলে ঢাকা, কারুর আবার একটা পা, তাও গোদা পা। এই জিনিষ গুলোকেই আবার একটার সাথে আরেকটা মিলিয়ে মিশিয়ে বলছেন – যেমন, বিরাট মাথা, বিরাট হাত, বিরাট মুখ, লম্বা জিহ্বা, লম্বা নখ ইত্যাদি। বিরাট লম্বা একটা বর্ণনা বাল্মীকি দিয়ে যাচ্ছেন।

আসলে রাক্ষসীদের চেহারায় কি এই রকম কিছু ছিল? কখনই ছিল না, এগুলো বাল্মীকি রামায়ণের কাব্যিক বর্ণনা। কোন লেখক বা কবি যখন কোন আদর্শ বা ভাবকে সামনে নিয়ে আসতে চান, তখন ঐ আদর্শ, বিচার ধারাকে সামনে রাখার জন্য অনেক ধরণের জিনিষের অবতারণা করেন। যেমন আদর্শ ভালোবাসা ঠিক কি রকম হবে? তখন কবিরা শ্রীরাধা আর শ্রীকৃষ্ণের ভালোবাসাকে সামনে নিয়ে এলেন। অনেকে প্রশ্ন করেন রাধা বলে কি কেউ ছিলেন? মহাভারতে তো রাধার নামই নেই। ভাগবতেও রাধার নামই পাওয়া যায় না। তাহলে শ্রীরাধা কোথা থেকে এসে গেলেন? কোথাও থেকে শ্রীরাধা আসেননি। যদি রাধা কোথাও থাকেন তাহলেও কিছু যায় আসে না, আর যদি রাধা কোথাও নাও থাকেন তাহলেও কিছুই যায় আসে না। আজকে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে কেউ ছিলেন প্রমাণিত। ভবিষ্যতে যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন না, তখন কি হবে? কিছুই হবে না, যা ছিল তাই থাকবে। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান শিব বলে কেউ ছিলেন না বলে ঐতিহাসিকরা সব প্রমাণ করে দিচ্ছেন। যদি তাঁদের প্রমাণটাই সত্য বলে জানা যায় তাহলে কি হবে? কিছুই হবে না, ওনারা যা ছিলেন তাই আছেন ভবিষ্যতেও তাই থাকবেন। কেন থাকবেন? কারণ মানুষ যখন কারুর পূজো করে তখন সে আদর্শের পূজো করে। যেমন সত্য, সত্য

একটা আদর্শ। ঠিক তেমনি ভালোবাসা, এইটিও একটি আদর্শ। সেই রকম আধ্যাত্মিক সাধনা, ঈশ্বরকে ভালোবাসা এটিও একটি আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ আসলে হলেন, ঈশ্বরকে যিনি ভালোবাসবেন, তাঁকে কিভাবে ভালোবাসবে, তারই একটা ভাবমূর্তি। আমি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাথা নত করছি, তখন আমি একটা ভাব বা আদর্শের সামনে মাথা নত করছি, আমি কখনই শ্রীরামকৃষ্ণের মুর্তি বা ছবিতে মাথা নত করছি না। সাধারণ মানুষ এই ভুলটাই করে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন, তাঁর ছবি ছায়া কায়া সমান, ব্যস্ ছবিতে মাথা ঠুকে দিলেই সব হয়ে যাব। আসলে কিন্তু তা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবের প্রতিমুর্তি, সে ভাবকে শ্রদ্ধা করার জন্য তাঁর ভৌতিক শরীর ছিল কি ছিল না, সেটা কোন প্রকারেই ভাবকে প্রভাবিত করে না। তিনি যদি সেই ভৌতিক শরীরে রাজার মত বসে থাকতেন আর ভক্তরা যত আপীল করে যাচ্ছেন, সব আপীলই তো মঞ্জুর করে দিতে পারতেন। বাচ্চা ছেলেরা পরীক্ষার আগে কি নিষ্ঠার সঙ্গে কত সরলতার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে প্রার্থনা করে, আর ওদের মত সরল মনে নিষ্ঠার সাথে প্রার্থনা আর কেউ করতে পারেনা। তাই বলে কি তিনি সব বাচ্চকেই পরীক্ষায় ফার্স্ট করিয়ে দিচ্ছেন? এই যে বলা হয় ঠাকুরের কাছে সরল হৃদয়ে প্রার্থনা কর, কিন্তু বাচ্চাদের থেকে সরল হৃদয় আর নিষ্ঠা কার আছে! যখন যে আদর্শের সামনে প্রার্থনা করা হবে তখন ঐ আদর্শের ফলস্বরূপ যা হওয়ার কথা সেটাই আসবে।

এখানে বাল্মীকি আমাদের বোঝাতে চাইছেন, মানুষ যখন ক্রুর হয় তার চেহারাটাও ভয়ঙ্কর দেখতে লাগে। সীতাকে ঠিক এই রকম ক্রুর, ভয়ঙ্কর দেখতে মহিলা রক্ষীরা সব ঘিরে রেখেছে। এখন যেমন মহিলা কনস্টেবল হয়, রাবণের লঙ্কাতে এই রকম মহিলা রক্ষী ছিল, যেটা অযোধ্যাতে ছিল না। মহিলা পুলিশের ধারণা রাবণের ছিল। এরা কি রকম? এরা হচ্ছে ক্রুরা, নির্দয়া আর ভয়ঙ্করী দেখতে। এই ক্রুরা, নির্দয়া আর ভয়ঙ্করীকে কাব্যে কিভাবে প্রকাশ করা যাবে? বাল্মীকি তখন এইভাবে বুঝিয়ে দিলেন। বাল্মীকি যদি এক কথায় বলে দিতেন এরা হচ্ছে ভয়ঙ্কর দেখতে, হৃদয়ে দয়ামায় কিছু নেই, তাহলে আমাদের মনে কোন রেখাপাত করত না। কিন্তু যখন বলে দিলেন *একাক্ষিং এককর্ণী চ কর্ণ...* তখন মনে হবে ওরে বাবা কি ভয়ঙ্করী সব। এদের যে স্বরূপ সেটাকে বোঝানোর জন্য এইভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। আবার যখন সীতার রূপের বর্ণনা করা হচ্ছে তখন আবার সুন্দর রূপের ধারণা যাতে আমাদের দৃঢ় হবে সেইভাবে বর্ণনা করছেন। যখন দেখাচ্ছেন সীতা এখন খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছেন, তখন অন্য ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। একটা ভাব বিচারকে সাধারণ মনে কিভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে, তখন সেই ভাবটাকে বোঝানর জন্য এইভাবে চিত্রণ করা হচ্ছে। একজন চিত্রকরকে যদি একটা ভয়ঙ্কর ছবি আঁকতে বলা হয় তখন সে বিরাট একটা কাটা মুণ্ডু তার চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে ইত্যাদি রং টং চরিয়ে এঁকে দেবে। যারা দুর্গা প্রতিমা বানায় তাদের যদি বলা হয় আমাদের একটা রাক্ষসের মুর্তি বানিয়ে দিতে তখন সেই রকম একটা মুর্তি বানিয়ে দেবে। যারা লেখক তাদেরকে যদি কেউ বলে একটা ভয়ঙ্কর কিছু বর্ণনা করতে হবে, তখন সে কি করবে? হয় দুই এক কথায় বলে দেবে সে দেখতে খুব ভয়ঙ্কর ছিল, হৃদয় নির্দয় ছিল, ক্রুর ছিল ইত্যাদি। আর যারা সত্যিকারের উচ্চমানের সাহিত্যিক তারা বাল্মীকির মত এইভাবে বর্ণনা দিয়ে ভয়ঙ্করের ছবি আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে দেবেন। বাল্মীকি আমাদের সবার প্রত্যেকটি ভাবকে নিয়ে তার উপরে রঙ চড়িয়ে চলে গেছেন, যাতে আমাদের মনে ওই ভাবটা বসে যায়।

মন্দোদরী বোঝাবার পর রাবণ সীতার কাছে থেকে চলে এসেছে। তখন সেই সব রাক্ষসীগুলো সীতাকে বোঝাচ্ছে – সীতা, তোমাকে ভালো কথা বলছি, তুমি কিন্তু এই রকম গোঁ ধরে থেকো না, তেত্রিশ জন যে দেবতা আছেন তাঁদের সবাইকে এই রাবণ পরাজিত করেছেন। আমরা আগেও বলেছি যে বেদে তেত্রিশ দেবতার কথা আছে। সেই তেত্রিশ সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন তেত্রিশ কোটি হয়ে গেছে। তেত্রিশ জন দেবতাদের মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু আর অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণুও একজন আদিত্য, আর শিব একাদশ রুদ্রের মধ্যে একজন রুদ্র। পরের দিকে দ্বাদশ আদিত্যের বিষ্ণু উপরের দিকে চলে এলেন আর বাকি আদিত্যরা নীচে নেমে গেলেন। একাদশ রুদ্রের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ হয়েছে, শিব একাদশ রুদ্রের মধ্যে উপরে চলে এলেন আর বাকী দশ জন রুদ্র নিচে চলে গেলেন।

রাক্ষসীগুলো এই তেত্রিশ দেবতার কথাই বলছে, এরা সবাই রাবণের কাছে হেরে গেছে, তুমি রাবণকে এসব কথা বলার আগে খুব ভাবনা চিন্তা করে নিও, তুমি কিন্তু ঠিক কাজ করছো না, ইত্যাদি।

তখন রাক্ষসীরাই সবাই মিলে সীতাকে ভয় দেখাতে আরম্ভ করেছে, ওরা নিজেরাও ভয়ে আছে, কেননা রাজা সাক্ষাতে বলে গেছেন সীতাকে বশে নিয়ে আসতে। রাক্ষসীরা নিজেদের মধ্যে বলছে, চল এই সীতাকে মেরে আমরাই এর মাংস খেয়ে নিই। তখন সীতা বলছেন – **দীনো বা রাজ্যহীনো বা যো মে ভর্তা স মে গুরুঃ। তং নিত্যমনুরক্তাস্মি যথা সুরযং সুবর্চলা।।**৫/২৪/৯। এই শ্লোকটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সীতা বলছেন আমি যাকে আমার পতি রূপে বরণ করে নিয়েছি, তিনি আমার স্বামী, তিনিই আমার গুরু। সুর্বচলা যেমন সুর্যের নিত্য অনুরক্তা, আমিও তেমনি সর্বদা রামেরই অনুরক্তা। পরের দিকে স্বামীজী বারবার বলছেন – ভারতীয় নারীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। সীতার আদর্শ হল, আমি একবার যাঁকে বরণ করে নিয়েছি আমি আর অন্য কোন দিকে মন দেব না, তিনিই আমার স্বামী, তিনিই আমার গুরু। আমার শ্রীরামচন্দ্রের যাইই হয়ে যাক, তিনি পথের কাঙাল হয়ে যান, তিনি রাজ্যহীন হয়ে যান তাতে শ্রীরামের প্রতি আমার অনুরাগ আগের মতই থাকবে।

রামসীতা ছিলেন বাল্মীকির কাছে আদর্শ। সীতা মন, প্রাণ, শরীর সব কিছু দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে ভালোবেসেছেন। *যো মে ভর্তা*, ভর্তা মানে যিনি ভরণ করেন, যিনি আমার সব ভার গ্রহণ করে আমার সব কিছু দেখাশোনা করছেন তিনিই আমার গুরু, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন আমি আর কিন্তু অন্য কোন দিকে মন দেব না। এর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, একজন পুরুষ মানুষ রূপে শ্রীরামচন্দ্রের যা সব অসাধারণ গুণ ছিল, আর সীতার মন শ্রীরামচন্দ্রের এই অসাধারণ গুণের মধ্যে এমন ভাবে ডুবে ছিল যে, সীতার পক্ষে অন্য কারুর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। ইদানিং কালে বেশির ভাগ ছেলেরা হয় গাঁজাখোর হবে নয়তো মদের নেশায় আসক্ত হবে, না হয় আড্ডাবাজ হবে, না হয় উদাসীন হবে, না হয় বদমেজাজী হবে, এই সব ছেলেদের কোন শিক্ষিতা মেয়ে বলতে পারবে যে ইনিই আমার ভর্তা, ইনিই আমার স্বামী, ইনিই আমার গুরু! যে কোন মেয়ের পক্ষেই খুব কঠিন কাজ। কেন? কারণ সেই গুণই নেই। মানুষের মধ্যে ক্ষোভ, দুঃখ এখান থেকেই জন্ম নেয়, আর এর থেকেই আসে বিদ্রোহ। যারা খুব নিকৃষ্ট আর অসমর্থ তাদের গোলামী যদি করতে হয় মানুষ এক সময় বিদ্রোহ করে বসে। পুরুষ বা নারী সে যতই আকর্ষণীয়া হোন বা হ্যাণ্ডসাম হোন তার মধ্যে যদি সেই গুণ না থাকে আর তার যদি গোলামী করতে হয়, একটা সময় তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের অভিব্যক্তি হবেই হবে। একটা সুযোগ দেবে দুটো সুযোগ দেবে তারপর কিন্তু একটা সময় ফেটে পড়বে।

তাই এখন স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে সীতা হচ্ছেন আদর্শ, তাহলে স্ত্রীও বলতে পারে – হ্যাঁ, আমি সীতার আদর্শই অনুসরণ করব, কিন্তু তুমিও তোমার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এসো। এক বাবা ছেলেকে শাসন করছেন – জানো, তোমার মত বয়সে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পড়াশোনায় এত ভালো ছিলেন যে প্রত্যেক ক্লাশে ফার্স্ট হতেন। ছেলে বলছে – হ্যাঁ বাবা জানি, আর আপনার মত বয়সে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। একদিক থেকে কথা বললে তো চলবে না, দুটো দিকেই বলতে হবে। সেইজন্য এইভাবে কখনই বলতে নেই। সীতা যে কথাগুলি বলছেন তিনি পথের কাঙাল হয়ে যান আর রাজ্যহীন হয়েই যান তবুও তিনিই আমার স্বামী, তিনিই আমার গুরু, এগুলো তিনি শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের দিকে তাকিয়ে, তাঁর পৌরুষত্বের দিকে তাকিয়েই বলছেন। বাল্মীকির বৈশিষ্ট্য এইটাই, তিনি এমন একটি চরিত্রকে আদর্শ রূপে দাঁড় করেছেন যে আজও সমাজের সব বাবা মাই চায় আমার মেয়ে সীতার মত হোক, প্রত্যেকটি মেয়েও প্রথমে সীতার মত সচ্চরিত্র হতে চায়, কিন্তু বড় হয়ে অন্য রকম হয়ে যায়, সেটা আলাদা কথা, কিন্তু বাল্মীকি যে আদর্শ দিয়ে গেছেন সে আদর্শটাই এখনও সবার কাছেই একটা লক্ষ্য হয়ে আছে।

সীতা এরপরে বলছেন – শচী যেভাবে ইন্দ্রের সেবায়, অরুন্ধতি বশিষ্টের সেবায়, রোহিনী চন্দ্রমার সেবায়, লোপমুদ্রা অগস্ত্য মুনির সেবা, সুকন্যা চ্যবনের সেবায়, সাবিত্রী সত্যবানের সেবায়, শ্রীমতি কপিলের

সেবায়, মদয়ন্তি সৌদাসের সেবায়, দময়ন্তী নলের সেবায় সর্বদা লেগে রয়েছেন ঠিক সেইভাবে আমি শ্রীরামচন্দ্রের সেবাতে আমার পুরো মন লেগে রয়েছে, সেইজন্য অন্য কোন দিকে আমার মন দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা কদিন আগেই দেখলাম অগস্ত্য আর লোপমুদ্রার সঙ্গে সীতার দেখা হয়েছিল। সুকন্যা আর চ্যবন, সাবিত্রী সত্যবান আর নল ও দময়ন্তীর কথা মহাভারতে বিস্তৃত ভাবে দেওয়া আছে। তেমনি সৌদাস বেদের সময়ে একজন রাজা ছিলেন, তাঁরও এক বিরাট লম্বা কাহিনী আছে। বাল্মীকি যে নাম গুলো শুধু উল্লেখ করে বেরিয়ে গেছেন, সেটাই মহাভারতে গিয়ে বিরাট কাহিনী রূপে দাঁড়িয়ে গেছে।

এইভাবে সীতা একবার করে বলে যাচ্ছেন, আর রাক্ষসীরাও তত বার ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে, একই জিনিষ অনেকক্ষণ চলছে। এরই মধ্যে বাল্মীকি খুব সুন্দর সুন্দর উপমা নিয়ে পরিবেশেকে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এত ভয় দেখিয়েও সীতার মনকে রাক্ষসীরা কিছুতেই টলাতে পারছে না। এখানে আবার একটা কাহিনী উপস্থাপনা করে বলা হচ্ছে যে রাবণের উপরে একটা অভিশাপ ছিল যে সে যদি সীতাকে কাম ভাব নিয়ে স্পর্শ করে তাতেই রাবণের মৃত্যু হয়ে যাবে, এই কারণে রাবণ জোর করে সীতাকে কিছু করতে পারছিল না। আবার অন্য মতে বলা হয় যে, রাবণের মূল্যবোধ এত কঠোর ছিল যে তিনি নিজের ইচ্ছেতে কোন নারীর অনিচ্ছার বিরুদ্ধে তার খারাপ কিছু করবেন না।

যাই হোক সীতা খুব দুঃখ করে রাক্ষসীদের বলছেন – **ছিন্না ভিন্না প্রভিন্না বা দীপ্তা বাগ্নৌ প্রদীপিতা। রাবণং নোপতিষ্ঠেয়ং কিং প্রলাপেন বশ্চিরম্।**।৫/২৬/১০। তোমরা আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দাও, আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দাও। *দীপ্তা* মানে হচ্ছে শিককাবাব জাতীয়, মাংসকে শিকের মধ্যে গেঁথে আগুনে ঝলসানো হয়। সীতা বলছেন তোমরা আমাকে ঐ রকম আগুনে পুড়িয়ে মার। *প্রদিপীতা* – মানে একেবারে ভস্ম করে দেওয়া। সীতা এটাই বলতে চাইছেন – তোমার আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দাও, আমাকে কেটে কেটে টুকরো টুকরো করে দাও, আগুনে ঝলসিয়ে দাও, পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও, রাবণের কাছে আমি যাচ্ছি না। রাবণ এই রাক্ষসীদের আদেশ করে গেছেন কিনা যে করেই হোক তোমরা সীতাকে রাজী করাও। বললেই তো আর কাউকে রাজী করান যায় না, বিশেষ করে যাঁরা উচ্চ আদর্শকে ধরে রয়েছেন তাঁরা যদি গোঁ ধরে নিয়ে থাকেন তাহলে হিমালয় টলে যাবে কিন্তু তাঁদের কোন কিছুতেই টলানো যাবে না। একজন ব্রহ্মচারী যখন মঠে জয়েন করতে আসে তখন বাপ মা কত কান্নাকাটি করেন, কত কিছু প্রলোভন দেখান, কিন্তু তাতে তার কিছুই হয় না। যে একবার আদর্শকে ধরে নেয় তাকে আর আদর্শচ্যুত করা যায় না। সীতাও এক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত, সেই আদর্শ থেকে কিছুতেই তাঁকে সরান যাবে না।

সীতা আরও বলছেন – জগতে দেখা যায় যারা তার স্বজন, আপনজন, যতক্ষণ তারা চোখের সামনে থাকে ততক্ষণই তার প্রতি ভালোবাসা মমতা, যখনই চোখের সামনে থেকে সরে যাবে তখনই তার প্রতি ভালোবাসাটা কমতে থাকে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এই ধরণের মানুষ নন, আমি যে এত দিন রাবণের এখানে বন্দিনী হয়ে পড়ে আছি, তাই বলে যে শ্রীরামচন্দ্র আমাকে ভুলে যাবেন তা কখনই হতে পারেনা।

এই সব ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদের মধ্যে ত্রিজটা নামে একজন রাক্ষসী ছিল, তার বুদ্ধি, জ্ঞান বিবেক অন্য রাক্ষসীদের তুলনায় একটু বেশি জাগ্রত। আমাদের রাক্ষসী বলতে রূপকথার সেই বর্ণনা গুলো চোখের সামনে ভাসে, বড় বড় নখ থাকবে, দুটো দাঁত বাইরের দিকে ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকবে, কিন্তু তা না। রাক্ষসরা আসলে একটা জাতি, যেমন পাঞ্জাবী, বিহারী, বাঙ্গালী, এই রকম। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রকমের বৈশিষ্ট্য। এখন এই ত্রিজটা বলছেন যে সে একটা স্বপ্ন দেখেছে। বাল্মীকি রামায়ণেও আছে আর অন্যান্য গ্রন্থেও কিছু কিছু আছে, আর পরের দিকে এটাই একটা বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য রূপে সৃষ্টি হল যেখানে স্বপ্ন বিচারের উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় স্বপ্ন বিচারে কতকগুলি জিনিষকে বিশেষ বিশেষ ভাবে দেখা হয়, যেমন স্বপ্নে যদি লাল শাড়ি পরিহিতা কোন মহিলা তাকে টেনে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে তার মৃত্যু অবধারিত। ত্রিজটা বলছে – আমি দেখলাম সীতাকে শ্রীরামচন্দ্র নিজের বুকে লাগিয়ে রেখেছেন, সেখান থেকে সীতা লাফিয়ে আকাশে গিয়ে সূর্য আর চন্দ্রকে নিজের দুটো

হাত দিয়ে আদর করছে। স্বপ্ন বিচারে বলে যদি স্বপ্নে কেউ সূর্য আর চন্দ্রমাকে স্পর্শ করে নেয় তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকার তার এসে যাবে। তার মানে সীতা কিছু দিনের মধ্যেই সাম্রাজ্য পেতে চলেছে। এটা ত্রিজটা স্বপ্নে দেখেছে নিজের ব্যাপারে নয়, অন্যের ব্যাপারে। আর রাবণের ব্যাপারে স্বপ্নে দেখেছে, রাবণ মাথা ন্যাড়া করে তেলে স্নান করে লাল কাপড় পরে বসে আছে, আর দেখছে রাবণ মদ খেয়ে মাতলামো করে পুষ্পকযান থেকে পড়ে গেছে। এর লক্ষণ হচ্ছে কিছু দিনের মধ্যেই রাবণের ধ্বংস আর মৃত্যু অনিবার্য হয়ে আসছে। আবার দেখছে রাবণকে একজন স্ত্রী টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর রাবণ কালো কাপড় পরে আছে। এগুলো দিয়ে তখন অনেক স্বপ্ন বিচার করা হত, বাল্মীকির সময়ে এই ধরণের স্বপ্ন বিচারকে মানা হত। বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও ওল্ড টেস্টামেন্টে স্বপ্ন বিচার পাওয়া যায়। সেখানে একটা আছে এক রাজা স্বপ্ন দেখছে সাতটা ভূট্টা নিজেরা নিজেদেরকে খেয়ে নিচ্ছে, এগুলো নিয়ে প্রিস্টদের কাছে যাওয়া হত বিচারের জন্য, প্রিস্টরা বিচার করে বলতেন। এখন রাজার স্বপ্নের কথা শুনে তাঁরা রাজাকে বলছেন এখন সাত বছর আপনার খুব অন্ন হবে তার পরের সাত বছর বিরাট দুর্ভিক্ষ চলবে। স্বপ্ন বিচার শুনে রাজা বিরাট বিরাট গুদাম ঘর বানালেন, সাত বছর যত অন্ন হবে এই গুদাম ঘরে সব মজুত করে রাখা হবে। যখন দুর্ভিক্ষ আসবে তখন এই মজুত শস্যই আমাদের বাঁচাবে।

ত্রিজটা স্বপ্নে আরও দেখেছে যে শ্রীরামচন্দ্রের এক দূত বানর রূপে এই লঙ্কায় এসে লঙ্কাকে ভস্ম করে দিয়েছে। আর এই লঙ্কার যত রাক্ষসী তারা লঙ্কা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে দুঃখে তেল পান করে যাচ্ছে আর নেচে যাচ্ছে। মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে তখন সব কিছুই সাজানো থাকে না, এলোমেলো ছড়ান ছেটান থাকে, কোনটার সাথে কোনটার সঙ্গতি থাকে না। ত্রিজটা বলছে – কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য বড় বড় বীর রাক্ষসরা লাল কাপড় পরে গোবরের গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। তাই আমি বলছি, এই স্বপ্ন বিচার করে যদি দেখ তাহলে সীতার উত্থান আর রাক্ষসদের বিনাশ হতে চলেছে।

ত্রিজটার এই সব স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনেও সীতার মন মানছে না, বলছেন, আমি আর থাকতে পারছি না, আমি এবার আমার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেব। বলেই হঠাৎ সীতা বেশ কিছু শুভ চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো হচ্ছে লক্ষণ, ঠাকুরও মানতেন, তিনিও একদিন বলছেন অমুকের মুখ দেখে উঠেছি বলে রাখালের শরীর খারাপ হয়েছে। সীতা দেখছেন তাঁর বাম হস্ত যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে, মনে করা হয় পুরুষের যদি ডান হাত আর মেয়েদের বাঁ হাতের পেশী কাঁপতে থাকে তার মানে ভালো কিছু হতে যাচ্ছে। আমরা শুনেছি ছেলেদের ডান হাতের তালু যদি চুলকায় তাহলে টাকা আসবে আর বাঁ হাতের তালু চুলকালে টাকা বেরিয়ে যাবে। সীতা আরও কিছু কিছু এই রকম শুভ চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন। তখন সীতা ভাবছেন – আমি যে এদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে প্রাণ দিয়ে দেব ভেবেছিলাম, না আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, দেখা যাক কি হয়। আসলে এই হয়, সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে বলছিলেন – মানুষ যদি বেঁচে থাকে তাহলে জীবনে অনেক কিছুই দেখতে পায়, অনেক কিছুর প্রাপ্তি হয়, মরেই যদি যায় তাহলে আর কি পাবে সে! সেইজন্য যারা আত্মহত্যা করতে চায়, তাদের এই কথাই বলতে হয়, সে যে কোন কারণেই হোক, টাকা পয়সার জন্যই হোক, মান সম্মানই হোক, নারীসুখ কি স্বামীসঙ্গই হোক, যেটাই হোক না কেন, আজকে তুমি যেটা মনে করছ সব শেষ হয়ে গেছে, তোমার কর্মের বীজ কি সব শেষ হয়ে গেছে? তোমার সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যা করে এসেছ তার মধ্যে শুভ আর অশুভ দুটোই করেছ, সেই কর্মের কোটাটা তো জমে আছে। সেই কারণে আজকে তোমার যা অশুভ কর্মের ফল রয়েছে সেটা এখন বেরোচ্ছে, কিন্তু তোমার মধ্যে শুভ ফলের কোটাও তো রয়েছে, সেটা যখন বেরোতে থাকবে তখন বর্তমানের এই দুঃখ-কষ্টকে আবার ভুলে যাবে। আসলে মানুষ অশুভ কর্মের ফলে যখন নানান ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে যায় তখন সে বুঝতে পারেনা, ভুলে যায় যে এর পরে আবার ভালোটাও আসবে।

এদিকে হনুমান আড়াল থেকে সব দেখছে এখানে কি কি হচ্ছে। হনুমান তখন নিজকে খুব ছোট করে রেখেছেন, তা নাহলে রাক্ষসরা সব তাঁকে দেখে ফেলবে। হনুমান বসে বসে ভাবছেন, কিভাবে সীতার

সাথে কথা বলা শুরু করা যায়। যদি তড়বড় করে বলতে শুরু করি তাহলে গোলমাল হয়ে যাবে। হনুমান ভাবছেন – **শনৈরাশ্বাসয়াম্যদা সন্তাপবহুলামিমাম্**।।৫/৩০/১৬। সীতার মনে অনেক সন্তাপ আছে। যার মনে প্রচুর কষ্ট জমে থাকে, অনেক দিন ধরে যে খুব দুঃখের মধ্যে পরে আছে তাকে যখন সান্ত্বনা দিতে হয় শনৈঃ শনৈঃ, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে অবস্থা বুঝে তাকে সান্ত্বনা দিতে হয়। কিন্তু তা না করে তাকে গিয়ে যদি প্রথমেই বলা হয়, এসব কিছুই হয়নি উঠে দাঁড়াও তোমার মধ্যে আত্মার শক্তি আছে তাকে জাগাও, তখন সে বলবে আমার নিকুচি করেছে আত্মার শক্তিতে। ঠাকুরের কাছেও অনেক সন্তপ্ত মানুষরা আসত, এই রকম একজন এসেছে, ঠাকুর তার দুঃখের কথা শুনতেই থাকলেন, সব শোনা হয়ে যাওয়ার পরেই তিনি একটা গান গাইতে থাকলেন – জীব সাজ সমরে, এমন ভাবে গাইতে থাকলেন যে, সেই গান শুনে আস্তে আস্তে তার মনের অশান্ত ভাবটা কমে যেতে থাকল। কারুর সন্তান মারা গেছে বা স্বামী মারা গেছে তখন মায়েরা বা বউরা যখন কান্নাকাটি করতে থাকে তখন পাড়ার অন্যান্য মেয়েরাও খোঁজ নিতে এসে তারাও কাঁদতে থাকে, এক সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে তারপরে শোকটা একটু প্রশমিত হয়। যাদের শোক সন্তাপ খুব গভীর আকার নিয়েছে তখন ঐ মুহুর্তে গিয়েই কিছু বলতে নেই, তার শোকের ভাগীদার হয়ে ধীরে ধীরে সান্ত্বনা দিতে হয়।

হনুমান নিজেকে বলছেন, একদিকে আমার শরীর অত্যন্ত ছোট, তিনি নিজেকে ছোট করে রেখেছেন, তার ওপর আমি একটা বানর জাতি, তারপর ভাবছেন – **যদি বাসং প্রাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্। রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি**।।৫/৩০/১৮। সংস্কৃত ভাষা হল দেবভাষা, মানে দেবতারা যখন পরস্পর কথা বলেন তখন সংস্কৃতে কথা বলেন। এখন ঠাকুর বাংলা ভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু ইংরেজরা যখন ঠাকুরের কাছে ইংরাজীতে প্রার্থনা করেন তখন ঠাকুর কি করে বুঝবেন? ঠাকুরকে একজন ইন্টারপ্রেটার রাখতে হবে, যে সব ভাষাই জানে।

একটা নাপিতের গল্প আছে। এক দেশে সেই দেশের নাপিত আর মন্ত্রীর মধ্যে বিরাট ঝগড়া ছিল। রাজা মারা গেছে। শ্রাদ্ধশ্রান্তি সব মিটে গেছে। রাজার ছেলে এখন রাজা হয়েছে। একদিন নাপিত নতুন রাজাকে কামাতে এসে কায়দা করে বলছে – রাজামশায়, আমি সেদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম আপনার বাবা স্বর্গে বড় কষ্টে আছেন, একা একা থাকেন, কেউ কথা বলার নেই। আমাকে দেখে বললেন – তুমি আমার ছেলেকে বলে যদি মন্ত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দাও তাহলে আমার খুব ভালো হয়। রাজা এসে মন্ত্রীকে বললেন, বাবা আপনাকে খুব ভালোবাসতেন, উনি খুব একা অনুভব করছেন, আপনি স্বর্গে বাবার কাছে চলে যান। এবার মন্ত্রীকে চিতায় উঠিয়ে দেওয়া হবে। মন্ত্রী বুঝতে পেরে গেছেন যে এটা নাপিতের কারসাজি। তিনি বলছেন ঠিক আছে। যেদিন চিতায় উঠিয়ে দেওয়া হবে তার আগেই মন্ত্রী নিজের মেয়েকে বলে রেখেছিলেন যেখানে চিতা সাজান হবে তার ঠিক তলাতে একটা গর্ত খুঁড়ে সুরঙ্গের মত করে রাখতে। চিতায় উঠিয়ে আগুন দেওয়ার পর যখনই ধোঁয়া হয়েছে মন্ত্রী তখনই গর্তের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গেছে। মাস খানেক এদিক সেদিক ঘুরে নিজের রাজ্যে এসে সোজা রাজার কাছে গিয়ে হাজির হয়ে বলছেন – আমি স্বর্গ থেকে সব খবর টবর নিয়ে এসে গেছি, রাজা মশাই খুব ভালো আছেন, আমাকে বললেন আমার কাছে আর থাকতে হবে না, ছেলে ওখানে একা আছে তুমি ওকে গিয়ে দ্যাখো। রাজা তখন বাবার কি খবর জানতে চাইছে। আপনার বাবা ভালই আছে, তবে আমাকে বলছিল যে আমার দাড়িগুলো বিরাট লম্বা লম্বা হয়ে গেছে, এখানে স্বর্গে কামানর কোন লোক নেই, তুমি গিয়ে যদি নাপিতটাকে পাঠিয়ে দাও খুব ভালো হয়। রাজা শুনেই নাপিতকে চিতায় তুলে পুড়িয়ে দিলেন। রামকৃষ্ণলোকে ঠাকুরের ইন্টারপ্রিটার দরকার এখন কাকে পাঠানো হবে, পাঠানোর আগে তো তাকে চিতায় তুলে পুড়িয়ে দিতে হবে। দেবতা আর ঈশ্বরের মধ্যেই এটাই পার্থক্য, দেবতাদের ভাষা, মানে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি এনাদের ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত, আর যিনি ঈশ্বর তাঁর কোন ভাষা নেই, সব ভাষাই তাঁর ভাষা, সব ভাষাই তিনি সমান বুঝতে পারবেন। দক্ষিণ ভারতেই কত রকমের ভাষা, ওখানে যত মন্দির আছে সেখানে ঠাকুরকে তাঁর ভক্তরা রসম্, ইড্লী,

ধোসা দিচ্ছেন, কিন্তু ইন্দ্রকে এসব দিলে ইন্দ্র রেগে যাবেন, দেবতাদের তাঁদের মত খাদ্য নিবেদন করতে হবে। দেবতাদের আবার প্রধান ছিল সোমরস পান করা, এখন সোমরস আর পাওয়াও যায় না, দেবতারাও এখন সোমরস পান করা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু যিনি অবতার বা ঈশ্বর তাঁকে যাই ভক্ত ভক্তি সহকারে নিবেদন করেন তিনি তাই আনন্দ সহকারে গ্রহণ করেন।

হনুমান বলছেন, সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে মানুষের ভাষা। আমরা এখানে তিনটে জাতি পরিষ্কার পেয়ে যাচ্ছি, মানব জাতি, রাক্ষস জাতি আর বানর জাতি। সমুদ্রের তীরে যারা বাস করে তাদের রাক্ষস জাতি বলছে, জঙ্গলে পাহাড়ে যারা বাস করে তাদের বানর জাতি বলা হচ্ছে, শহরের দিকে যারা বাস করছে তাদের মানব জাতি আখ্যা দিচ্ছে। শহর অঞ্চলে যারা বাস করতেন তাদের ভাষা ছিল সংস্কৃত। যদি জিজ্ঞেস করা হয় রাক্ষসীরা কি সংস্কৃত ভাষা জানত? যদি না জানত তাহলে সীতার সঙ্গে কথা বলছে কি করে? এখন রাক্ষসীরা যদি তামিল বা সিংহলী ভাষায় কথা বলত তাহলে সীতা বুঝল কি করে ওরা কি বলতে চাইছে। আসলে এগুলো হচ্ছে বাল্মীকির কল্পনা, তাছাড়া ভাষা না বুঝলেও বডি ল্যাঙ্গোয়েজেও অনেক কিছু বোঝান যায়।

হনুমান ভাবছেন, আমি যদি ব্রাহ্মণদের মত সংস্কৃতের বাণী প্রয়োগ করি তাহলে সীতা আমাকে রাবণ বলে ভাববেন, নয়তো রাবণের চর বলে মনে করবেন। হনুমান বলছেন *রাবণমন্যমানা*, এখানে রাক্ষসদের মধ্যে একমাত্র রাবণই ভালো সংস্কৃত জানতেন। যদিও লঙ্কায় অনেকেই সংস্কৃত জানত, লঙ্কায় যজ্ঞ যাগ হত, অনেক বাড়িতে বেদ পাঠ হত। কিন্তু সীতা আমাকে মনে করতে পারে এ এখানে এসে কেন এই রকম করছে, রাবণের লোক মনে করে হয়তো ভয় পেয়ে যাবে। সংস্কৃত ভাষা হল খুব উচ্চ শিক্ষিত সংস্কৃতবান লোকদের জন্য, সবাই সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করতে পারেনা। হনুমান তাই ঠিক করলেন আমি সার্থক ভাষা, মানে সীতা যেখানে থাকতেন সেই জায়গার ভাষা অবধী ভাষাতে কথা বলবেন। অবধী ভাষা অযোধ্যার আঞ্চলিক ভাষা। এর মানে হনুমান খুব বড় একজন বহু ভাষাবিদ, উনি বানর জাতির ভাষা জানেন, তারপর কদিন আগে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যখন হনুমানের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তখন হনুমানের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছিলেন – দ্যাখো লক্ষ্মণ এর সংস্কৃতের জ্ঞান কি প্রখর, ব্যকরণের অধ্যয়ন কত গভীর, আর এ বেদ পড়েছে, বেদের সঙ্গে বেদাঙ্গ মানে শিক্ষা, কল্পাদি পাঠ করেছে। এখন হনুমান বলছেন আমি অবধী ভাষায় কথা বলব তাহলে সীতা আমাকে রাবণ বলে সন্দেহ করবেন না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমি যদি আমার এই বানর রূপ ধারণ করে যাই তাহলেও সীতা সন্দেহ করবে, কেননা এখানকার অনেক রাক্ষসরা মায়াবী, যখন যা খুশী রূপ ধারণ করে নেয়। সেইজন্য আমি সীতার সামনে যাব না, উনি যদি আমাকে দেখে চেঁচাতে শুরু করে দেন, তখন এই রাক্ষসীরা সব তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, তাতে আবার আমি যে কাজের জন্য এখানে এসেছি সেই কাজটাই হয়ত ভেস্তে যেতে পারে। যদি সমস্ত লঙ্কাবাসী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলেও আমি সব কটাকে মেরে শেষ করে রেখে দিতে পারব, কিন্তু সব শক্তি তাতেই শেষ হয়ে গেলে পরে লাফ দিয়ে সমুদ্র পার করে ফিরে যেতে পারব না। যদি নাই ফেরত যেতে পারি তাহলে লঙ্কায় এসে আমার লাভটা কি হল!

এখানে হনুমানের এত বেশি শক্তি ছিল না, কারণ যুদ্ধের একটা জায়গায় রাবণ আর হনুমানের যখন যুদ্ধ হয়েছিল তখন হনুমান রাবণকে বলছিলেন তুমি আমাকে আগে মেরে নাও, আমি মারলে তুমি আর বাঁচতে পারবে না। কিন্তু রাবণ বারবার বলছিলেন, না আগে তুমি আমাকে মার। হনুমান তখন রাবণকে মারতে থাকল কিন্তু রাবণের কিছুই হল না। এর পর রাবণ হনুমানকে এমন একটা ঘুষি মেরেছিল যে, হনুমান মাথা ঘুরে পরে গিয়েছিল। যাদের গায়ে খুব শক্তি আছে তারা মনে করে আমি একাই শেষ করে দেব। হনুমান তাই এখানে বলছেন আমি একাই সব রাক্ষসকে মেরে দিতে পারি কিন্তু তাতে আমার শক্তিটা ক্ষয় হয়ে গিয়ে যা অবশিষ্ঠ থাকবে তাতে আমি সমুদ্র লাফিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফিরে যেতে পারব না।

হনুমান বলছেন – **অসত্যানি চ যুদ্ধানি সংশয়ো মে ন বোচ্যতে।৫/৩০/৩৫।** – যুদ্ধের ব্যাপারটা সব সময় সংশয় যুক্ত, কে জিতবে কে হারবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। আর সংশয় যুক্ত কোন কার্য করতে নেই। যুদ্ধ যখন অপরিহার্য হয়ে যাবে তখনকার কথা আলাদা, তখন আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু হনুমানের কাছে দুটো উপায় আছে, একটা হচ্ছে যুদ্ধ করে বেরিয়ে যাওয়া আর একটা পথ হচ্ছে যুদ্ধ না করে কৌশলে কার্য সিদ্ধি করে বেরিয়ে যাওয়া। হনুমানের কাছে গুরুত্ব হচ্ছে লঙ্কা থেকে ফিরে যাওয়াটা। তাহলে কোনটা করা উচিৎ? যে উপায়ের ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, যেটা আমার হাতে রয়েছে সেটাই অবলম্বন করা উচিৎ। তখন হনুমান দ্বিতীয় পন্থাটাই অবলম্বন করলেন।

হনুমান মনে মনে ঠিক করে বলছেন – ঠিক আছে, আমি অবধী ভাষাতে শ্রীরামচরিত গান করে সীতাকে শোনাব। হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী লক্ষ্মণের কাছে অনেক শুনেছেন, শ্রীরামচন্দ্রও তাঁর নিজের জীবনের অনেক ঘটনা হনুমানকে বলেছেন। তখন হনুমান শ্রীরামচরিত কথা গান করছেন। এটাই প্রথম স্বীকৃত শ্রীরামচরিত কথা যেটা হনুমান এখন গান করে সীতাকে শোনাতে যাচ্ছেন। যার জন্য বলা হয় যেখানে যেখানে শ্রীরামচন্দ্র কথা পাঠ করা হয় সেখানে সেখানে হনুমান স্বয়ং হাজির থাকেন। এই শ্রীরামচরিতের মাধ্যমে হনুমান খুব সংক্ষেপে শ্রীরামের কীর্তি কথা আর শ্রীরামচন্দ্রে গুণের কথা গান করে করে বলে যাচ্ছেন।

সীতা এইবার হনুমানের এই গান শুনে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত, তিনি প্রচণ্ড বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। আপনি একজনকে ভীষণ ভালোবাসেন, আপনার অত্যন্ত প্রিয়জন, সে আপনার কাছে নেই, তার অভাব বোধ করছেন। সেই সময় আড়াল থেকে কেউ আপনার সেই ভালোবাসার মানুষটিকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। পঞ্চবটীতে শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাকে হন্যে হয়ে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, যেখানেই সীতার সঙ্গে কিছু সাদৃশ জিনিষ দেখছেন তক্ষুনি তিনি দৌড়ে সেখানে চলে যাচ্ছিলেন। অনেক দিন ধরে প্রিয়জন কাছে নেই, এখন কেউ তার সম্বন্ধে কিছু বলছে সেই আওয়াজটা তার কর্ণে এসে পৌঁছেছে, তখন সে উদগ্রীব্ হয়ে কান পেতে আরো ভালো করে শুনতে চায়। ছেলে প্রথম হস্টেলে গেছে, বাবা পৌঁছে দিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছে। ছেলের মা এখন বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসে স্বামীকে ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই থাকবে।

সীতা তখন এদিকে ওদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে হলুদ রঙের একটা বানর গাছের ডালে আড়ালে বসে আছে। সীতা বানর দেখেই ভাবছেন – আরে কি আশ্চর্য এখানে বানর কোথা থেকে এল, আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি। এখানে বানরের আসা কথা নয়। সীতা ভাবছেন আমি হয়তো খুব বাজে স্বপ্ন দেখছি, স্বপ্নে যদি বানর দেখা হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপার হয়ে যায়। পরের দিকে হনুমান সীতাকে বলছিলেন – দেখুন মা সীতা, আমরা এমনই জাত যে স্বপ্নে আমাদের যদি কেউ দেখে নেয় তাদের কাছে সেটা অমঙ্গল, আর ঘুম থেকে সকাল সকাল যদি আমাদের কেউ দেখে নেয় তাহলে তার দিনটা খারাপ যায়।

সীতা আবার ভাবছেন, আমি কি স্বপ্নেই গাছের উপরে বানরকে দেখছি, না সত্যিই চাক্ষুস দেখছি! কারণ আমার শোক, সন্তাপ এতে বেশি যে রাত্রে ঘুম হয় না। ঘুমই যখন হয় না তাহলে স্বপ্ন কোথা থেকে আসবে, বানরটাকে আমি তাহলে কোত্থেকে দেখছি! সীতা এই সব ভাবছেন, তারপর খুব সুন্দর বলছে – **রামেতি রামেতি সদৈব বুদ্ধ্যা বিচিন্ত্য বাচা ব্রুবতী তমেব। তস্যানুরূপঞ্চ কথাং তদর্থামেবং প্রপশ্যামি তথা শৃণোমি।।৫/৩২/১১।** আমার বুদ্ধি আমার মন সব সময় রাম রাম রাম রাম রাম করছে। আর বাণী? মুখ সর্বদা রাম রাম রাম জপ করে যাচ্ছে। সেইজন্য হয়তো ক্ষণিকের জন্য আমার চোখের দুটো পাতা লেগে গিয়েছিল বলেই আমি ঐ ধরণের স্বপ্ন দেখেছি।

মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যে রকম চিন্তা ভাবনা করে, তার যেমন বিচার ধারা হবে, নিদ্রা জগতে স্বপ্নও মানুষের সেই রকমটিই হবে। হনুমান বসে বসে শ্রীরামচন্দ্রের কথা বলছেন, সীতা ভাবছেন এই বানর শ্রীরামের কথা জানল কি করে, আর শুনলই বা কোথায়! তখন তাঁর মনে পরে গেল, ওঃ, আমি সব সময় রাম রাম ভাবি, ভাবতে ভাবতে আমি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই স্বপ্নেই এই রামকথা শুনছি। সীতা সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ভাবছেন জিনিষটা কি হতে পারে। সীতা তখন বলছেন – যে এই রামকথা বলছে সে যেন আমার সামনে আসে। ততক্ষণে হনুমান গাছ থেকে নেমে এসেছেন।

হনুমান গাছে উপর থেকে নেমে এসে হাত জোড় করে প্রণাম করে অনেক কথা বলছেন। তার মধ্যে প্রশ্নও করছেন, যেমন হনুমান প্রশ্ন করছে – রাবণ গায়ের জোরে যে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছেন, আপনি কি সেই সীতা? হনুমান একেবারে ঠিক ঠিক ভাবে জানতে চাইছেন। কেননা এর আগে রাবণের রাজমহলে রাত্রিবেলা মন্দোদরীকে দেখে তাকেই সীতা ভেবে হনুমানের গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য দ্বিতীয় বার আর ভুল যাতে না হয় তাই প্রশ্ন করে নিশ্চিত হতে চাইছেন। বিবিধ প্রশ্ন করে করে হনুমান বলছেন আপনি কি সেই সীতা?

তখন সীতা বলছেন – শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অযোধ্যায় বারোটি বছর সুখ ভোগ করেছি, আরও অনেক কথা বলে বলে সীতা হনুমানকে বলছেন আমিই সেই সীতা। আমি এখন – **উর্ধ্বং দ্বাভ্যাং তু মাসাভ্যাং ততস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্**।৫/৩৩/৩১। রাবণ আমাকে দু'মাস সময় দিয়েছে, এই দু'মাসের মধ্যে যদি শ্রীরামচন্দ্র আমাকে উদ্ধার না করেন, তাহলে এইখানেই আমি শেষ হয়ে যাব। হনুমান তখন সীতাকে বলছেন – প্রাণ দিয়ে দেব এই রকম চিন্তা আপনি একবারেই করবেন না। এখানে আবার বলছেন – **কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মা। এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি**।।৫/৩৪/৬। লৌকিক প্রবাদ আছে যে একশ বছর যদি মানুষ কোন রকমে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সব কিছুই সে এমনিতেই পেয়ে যায়, আপনি এই যে বলছেন প্রাণ দিয়ে দেব, এ রকম করতে যাবেন না। যদি বেঁচে থাকেন তাহলে সবটাই হবে।

এখনও কিন্তু সীতার সব কিছু পরিষ্কার হচ্ছে না, যা যা দেখছে, শুনছে এটা স্বপ্ন না সত্য! তখন বলছেন – **অহো স্বপ্নস্য সুখতা যাহমেব চিরাহৃতা**।৫/৩৪/২০। আমি তো একজন অপহৃতা নারী, আমি কি এটা স্বপ্ন দেখছি, না সত্যিকারের শ্রীরামচন্দ্রের প্রেরিত দূতকে দেখছি। আবার ভাবছেন যে, স্বপ্নে বানরকে দেখে নিলে ভালো হয় না, অভ্যুদয় হয় না, ভালো কিছুই হয় না। কিন্তু আমার তো অভ্যুদয় হয়েছে, মানে এত দিন ধরে যে আমি শোক সন্তপ্ত হয়ে আছি, কিন্তু এখন রামকথা শুনে আমার মনে আনন্দের তরঙ্গ উঠছে।

এবার সীতার মনে হনুমানকে নিয়ে সংশয়ের কিছুটা অবসান হয়েছে। আরও ভালো ভাবে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সীতা হনুমানকে বলছেন – তুমি যখন নিজেকে শ্রীরামচন্দ্রের দূত বলছ, তাহলে তুমি শ্রীরামচন্দ্রের শরীরের বর্ণনা কর তো। হনুমান তখন বলছেন – ঠিক আছে, শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের শরীরের যা যা চিহ্ন যে রকম দেখেছি তার বর্ণনা আমি আপনাকে দিচ্ছি। তখন হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের শরীরের খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন। *রামঃ কমলপত্রাক্ষ* – প্রস্ফুটিত পদ্মের পাপড়ির মত তাঁর চোখ, *পূর্ণচন্দ্র বিভাবনঃ* – চন্দ্রমা পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর তার যে সৌন্দর্য, শ্রীরামচন্দ্রের মুখ ঠিক সেই রকম সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। তাঁর তেজ সূর্যের মত প্রখর, ক্ষমা পৃথিবীর মত, পৃথিবীর বুকে যতই অত্যাচার হোক সে সব সময় ক্ষমা করে দেয়। বুদ্ধি বৃহস্পতির মত, বৃহস্পতি ছিলেন দেবতাদের গুরু, দেবতারা সব থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি, সেই শ্রেষ্ঠদের গুরু বৃহস্পতি, তাই বৃহস্পতির মত বুদ্ধি আর কারুর হতে পারেনা। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা, যশ ইন্দ্রের সমতুল্য। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা তাই তাঁর মত যশ আর কারুর নেই। এখানে সূর্য হলেন দ্বাদশ আদিত্যের এক দেবতা, ক্ষমা পৃথিবী, বুদ্ধি হলেন দেবতাদের গুরু, যশ ও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে দেবতাদের রাজা ইন্দ্র।

শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন – **রামো ভামিনি লোকস্য চাতুর্বর্ণস্য রক্ষিতা**।৫/৩৫/১১। চতুর্বর্ণ যেটা তার রক্ষা শ্রীরামচন্দ্র করেন। ভারতের স্বাধীনতার পর জাতপ্রথা নিয়ে এত রকমের বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে, আর স্বাধীনতার আগে শূদ্র জাতির উপর এত অত্যাচার হয়েছে, স্বামীজীর মত লোক, যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, আর আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছে জাতিপ্রথা কোন ব্যাপারই নয়, তিনিও এই জাতিপ্রথা নিয়ে প্রচণ্ড নিন্দাবাদ করেছেন। কিন্তু যে কোন সমাজের ভারসাম্য দাঁড়িয়ে থাকে এই চারটে বর্ণের সমান অভ্যুদয়ের উপরে। এই চারটে বর্ণের মধ্যে যদি সমান অভ্যুদয় না হয় তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা আসবেই, কেউই আটকাতে পারবে না। আমাদের ভারতবর্ষে বিদেশীরা এসে যে এত আধিপত্য বিস্তার করেছে তার কারণ ক্ষত্রিয় বর্ণের লোকেরা তাদের ক্ষত্রিয় ধর্ম ঠিক ঠিক পালন করেনি। অন্য দিকে তিব্বতী বৌদ্ধরা অনেক ভারতীয় শাস্ত্রকে সংরক্ষণ করে রেখেছিল, এমন কি হিন্দুদের অনেক প্রাচীন শাস্ত্র ভারত থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তিব্বতী বৌদ্ধরা সেই সব শাস্ত্র গুলিকে সংস্কৃত ভাষা থেকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করে ওদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দুদের অনেক শাস্ত্রই এখন তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হয়ে তিব্বতী বৌদ্ধ আশ্রমে সংরক্ষিত হয়ে আছে। অথচ সেই সব শাস্ত্রের সংস্কৃত সংস্করণ লুপ্ত হয়ে গেছে। সেই তিব্বতী ভাষা থেকে সংস্কৃতে পুনর্নুবাদ করে আবার আমরা আমাদের শাস্ত্রকে ফেরত পাচ্ছি। তন্ত্র শাস্ত্রের অনেক মূল পাণ্ডুলিপি তো সম্পূর্ণ ভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে, এখন আর কোথাও পাওয়াই যায় না। তিব্বত মানেই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম, কিন্তু তাদের কাছে হিন্দুদের অনেক কিছুই এখনও সংরক্ষিত হয়ে আছে। কিন্তু তিব্বতী বৌদ্ধরা এত অহিংসা অহিংসা করেছে যে তাদের মধ্য থেকে ক্ষত্রিয় ধর্মটা পুরোপুরি হারিয়ে গেছে আর পরে চীনের সামরিক বাহিনীরা এসে যখন তিব্বতীরদের মারতে শুরু করল তখন তাদের বাঁচার আর কোন পথ রইল না। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে আছে, যখন তুমি দেখবে কাউকে বধ করে দিলে বা অস্ত্র ধারণ করলে আরও উচ্চ ধর্মের সাধন হবে, তখন তোমাকে তাই করতে হবে। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকলে যা হয়, চীনের ঐ উচ্চ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সামরিক বাহিনীর সামনে ভারতই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, সেখানে তিব্বতী বৌদ্ধরা তো খড়কুটোর মত উড়ে যাবে। সেইজন্য চারটে যে বর্ণ, ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা শ্রেণীর, পণ্ডিত সমাজ যারা শিক্ষা জগৎকে নিয়ে আছেন, আর যারা অর্থনৈতিক জগতের ভারসাম্যকে ঠিক রাখছেন এবং যারা সমাজকে পরিষেবার মাধ্যমে মসৃণ ভাবে চালাচ্ছে, যেটাকে শূদ্রের কাজ বলা হয়, এই চারটে বর্ণের ভারসাম্য ঠিক ঠিক রক্ষিত না হলে সমাজ কখনই দৃঢ়ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এখন শূদ্রের কাজ পাল্টে যাচ্ছে, যে কোন পরিচর্যাত্মকং কাজই হচ্ছে শূদ্রের কাজ। যেমন হোটেল ম্যানেজমেন্ট, রেলওয়েজের যত পরিষেবার কাজই হচ্ছে শূদ্রের কাজ, শুধু রূপটা পাল্টে যাচ্ছে। এখন পুরো সমাজকে ভাঙ্গা হচ্ছে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে একটা নতুন ব্যবস্থা যখন দাঁড়াবে তখন সব কিছুরই নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। আগেকার দিনে যখন বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হত তখন পাড়ার বন্ধু বান্ধব আর আত্মীয় স্বজনরা পুরো রান্নাবান্না পরিবেশনের কাজ করে দিত, এখন কি কেউ তাই করতে পারবে? এখন ক্যাটারিংদের যদি না দেওয়া হয় তাহলে সবাই অথই জলে পড়ে যাবে, ক্যাটারিং ব্যবসা যদি না থাকে তাহলে কারুর বাড়িতে বিয়ে হবে না, পৈতে হবে না। হনুমান এখানে এইটাই বলছেন যে, শ্রীরামচন্দ্র এই চারটে বর্ণকে রক্ষা করে সমাজের ভারসাম্যকে বজায় রাখছেন।

হনুমান এবার শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন। উনি রাজনীতিতে পূর্ণ শিক্ষিত, আর শ্রীরামচন্দ্র হলেন ঠিক ঠিক জ্ঞানবান, শীলবান, বিনম্র আর পরন্তপঃ, মানে শত্রুদের তিনি তাপ দেন, ব্রাহ্মণদের উপাসক। শ্রীরামচন্দ্র যজুর্বেদের শিক্ষা পেয়েছেন, তার মানে, যজুর্বেদ হল যজন্তি আর ঋকবেদ স্তবন্তি, যজ্ঞে যখন আহুতি দেওয়া হয় তখন যজুর্বেদের মন্ত্র বলা হয়, ঋকবেদ স্তুতি করার জন্য, যে মন্ত্র দিয়ে দেবতাদের স্তুতি করা হয় সেই মন্ত্রগুলো ঋকবেদ থেকে নেওয়া হয়, এখানে বলা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র যজুর্বেদের পণ্ডিত। এখানে চারটে বেদের কথা কেন বলা হয়নি এটাই আশ্চর্যের, কেননা এনারা যখনই বেদের কথা বলেন তখন চারটে বেদের নীচে কখনই বলেন না। যেহেতু শ্রীরামচন্দ্র যজুর্বেদে শিক্ষিত

ছিলেন তাই ধরা যায় যাগ-যজ্ঞের প্রথা গুলো তিনি জানতেন। এরপরে বলছেন – **ধনুর্বেদে চ বেদে চ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ।**।৫/৩৫/১৪ তিনি বেদ জানেন, বেদাঙ্গ জানেন আর ধনুর্বেদ জানেন।

এরপর শ্রীরামচন্দ্রের স্থূল মানব শরীর বাল্মীকির মতে কি রকম ছিল হনুমানের মুখ দিয়ে বলান হচ্ছে – তাঁর কান দুটো পুরু ছিল, বাহু দুটো বেশ লম্বা, গলা শঙ্খের মত, মুখ খুব সুন্দর, গলার হাড় মাংস দিয়ে ঢাকা, বলে গলার হাড় দেখা গেলে বুঝতে হবে তার শরীর স্বাস্থ্য ভালো নয়, চোখ দুটো হাল্কা হাল্কা লাল, লাল চোখ কিসের ইঙ্গিত করছে আমাদের ঠিক জানা নেই, তবে শক্তির জন্য হতে পারে, রাজকীয় ভাবকে বোঝাবার জন্যও লাল বলা হতে পারে। গলার স্বর দুন্দুভির মত, মানে গলার আওয়াজ খুব ভারী ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের শরীরে যত গুলো অঙ্গ আছে তার সবটাই হচ্ছে সামঞ্জস্যপূর্ণ, শরীরের কান্তি শ্যাম বর্ণের – **সমশ্চ সুবিভাক্তাঙ্গো শ্যামং সমাশ্রিতঃ।**।৫/৩৫/১৬ শ্রীরামচন্দ্র খুব ফর্সা ছিলেন না, তাঁর গায়ের রঙটা হচ্ছে শ্যামবর্ণ।

এইখানে এসে বাল্মীকি শরীর শাস্ত্রকে নিয়ে বিরাট একটা আলোচনা করছেন। পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই একজন আদর্শ সুপুরুষের শরীরের এইভাবে নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যাবে না। সত্যিকারের পুরুষোচিত চেহারা কি রকম হতে পারে, বাল্মীকিই প্রথম এত সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাবে সাহিত্যে কাব্যিক ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন। সংক্ষেপে তার মধ্যে একটা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের তিনটে অঙ্গ স্থির। প্রথমে তিনটে তিনটে করে বলা হচ্ছে – **ত্রিস্থিরস্ত্রিপ্রলম্বশ্চ ত্রিসমস্ত্রিষু চোন্নতঃ। ত্রিতাম্রস্ত্রিষু চ স্নিগ্ধো গম্ভীরস্ত্রিষু নিত্যশঃ।**।৫/৩৫/১৭। এরপরে চার চার করে বলে যাচ্ছেন। এরমধ্যে তিনটে যে অঙ্গ – বক্ষস্থল, হাতের উপরের অংশ আর হাতের মুষ্টি, এই তিনটে প্রচণ্ড স্থির, এই তিনটেকে কেউ নাড়াতে পারবে না। বাল্মীকি এভাবে ঠিক না বললেও ভাষ্যকারদের সাহায্য নিয়ে এই বৈশিষ্ট্য গুলিকে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে। কিছু কিছু অঙ্গ আছে, যেগুলো সমান, যেমন চুল, চুলের যে অগ্রভাগ তার সবটাই সমান। কিছু কিছু অঙ্গ আবার সামনের দিকে বেরিয়ে আছে, যেমন বক্ষস্থল, পেটটাও হাল্কা একটু বেরিয়ে আছে, আর সীতার ব্যাপারে বাল্মীকি বলেছিলেন তাঁর পেটটা ভেতরের দিকে এগিয়ে আছে। শ্রীরামচন্দ্রের তিনটে জিনিষ লাল, তাঁর নখ, হাতের তালু আর তাঁর পায়ের চেটো। আবার বলছেন তিনটে জিনিষ তাঁর খুব মসৃণ, তিনটে জিনিষ আবার খুব গভীর, তাঁর কণ্ঠে তিনটে রেখা। গলায় তিনটে দাগ থাকা রূপবান পুরুষের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যার থাকে তাকে নাকি খুব সুন্দর দেখায়। কিছু কিছু জিনিষ ভেতরের দিকে ঢোকান, যেমন তাঁর পায়ের রেখাগুলো ভেতরে দিকে ঢোকান। তিনটে জিনিষ খুব ছোট, পৃষ্ঠদেশ, পায়ের পেশী। আবার পায়ের আংঠাতে চারটে রেখা আছে। শ্রীরামচন্দ্রের উচ্চতা চার হাত। সাধারণতঃ মানুষের উচ্চতা হয় সাড়ে তিন হাত, নিজের হাতের মাপে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের হাত একেই লম্বা সেই হাতের চার হাত তিনি লম্বা। শ্রীরামচন্দ্রের শরীরে চৌদ্দটি অঙ্গ আছে দুটি দুটি করে, যেমন ভ্রু, চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি তাঁর সব কটি অঙ্গই সমান ও সুসামঞ্জস্য পূর্ণ। শ্রীরামচন্দ্রের চার রকম হাঁটার ভঙ্গিমা, সিংহ, বাঘ, হাতি ও ষাঁড়। বিভিন্ন সময়ে তিনি এই চার রকম পশুর ভঙ্গিমাতে হাঁটাচলা করেন। আসলে এই চারটে প্রাণীই আরামসে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে রাজকীয় ভাবে চলে। শ্রীরামচন্দ্রের ঠোঁট, থুতনি, নাক খুব প্রশস্ত, নাক একেবারে খুব সরু নয়। শ্রীরামচন্দ্রের চুল, চোখ, দাঁত, চামড়া আর পায়ের তলা কেমন একটা স্নিগ্ধতার পেলব মেশান। তাঁর আটটি অঙ্গ উত্তম চিহ্ন যুক্ত – দুটো হাত, দুটো জঙ্ঘা, আর তার পায়ের আঙুলে ভালো ভালো মঙ্গলযুক্ত শুভ চিহ্ন আছে।

বাল্মীকি কি সুন্দর সব বর্ণনা দিচ্ছেন। যারা বাল্মীকির খুব নিন্দুক তারা বলে যে এই রামায়ণ ছয় শত খ্রীস্ট পূর্বের রচনা, মানে ছাব্বিশ শ বছর আগে নাকি রামায়ণ রচিত হয়েছে। কিন্তু খুব ভালো করে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে পনের'শ খ্রীস্ট পূর্বের রচনা ছাড়া হতেই পারেনা। মানে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে রামায়ণ রচিত হয়েছে। এখানে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের শরীরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর খুব সামান্য অংশই আমরা উল্লেখ করলাম। প্রথমে তিনটে তিনটে করে পরে চারট চারটে করে বলছেন

মাঝখানে আবার দুটো করে বললেন। এরপর দশট করে – **দশপদ্মো দশবৃহৎ ত্রিভির্ব্যাপ্তো দ্বিশুক্লবান্। ষডুন্নতো নবতনুস্ত্রিভির্বাপ্নোতি রাঘবঃ।।**৫/৩৫/২০ বলছেন শ্রীরামচন্দ্রের দশটি অঙ্গ পদ্মফুলের মত, মুখ, চোখ, জিহ্বা, ঠোঁট, তালু, নখ ইত্যাদি এগুলো সব পদ্মফুলের মত। দশটি অঙ্গ যেমন পদ্মফুলের মত, ঠিক তেমনি দশটি অঙ্গ তাঁর বিশাল যেমন বুকের ছাতি, মাথা, ললাট, গলা, হাত, কান ইত্যাদি, পশ্চাদ দেশ, বক্ষস্থল, পেট, নাক, কান আর ললাট এই ছয়টি অঙ্গ উঁচু। শরীরের নয়টি অঙ্গ পাতলা যেমন কেশ, নখ, লোম, চামড়া, বুদ্ধি, দৃষ্টি ইত্যাদি।

শরীর চলে যাবার কিছু দিন আগে এক দিন স্বামী ভূতেশানন্দজী বসে আছেন, কাছেই তাঁর সেবকও বসে সেবা করতে করতে দেখছেন মহারাজের চামড়া এত স্বচ্ছ যে ভেতরের শিড়া গুলো দেখা যাচ্ছে, যদিও মহারাজের রঙ শ্যামবর্ণ ছিল, কিন্তু তাও সব যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সেবক বলছেন – মহারাজ আপনার শরীরের চামড়াটা কি পাতলা। মহারাজ খুব আস্তে করে বলছেন – দেব শরীর কিনা। সেবক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন – মহারাজ কি বললেন। মহারাজও তাড়াতাড়ি মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলছেন – ও কিছু না। যারা খুব উচ্চ আধারের পুরুষ হয়ে যান তাদের যেটা একটা পরিবর্তন হয় সেটা হচ্ছে তাঁদের গায়ের চামড়া অত্যন্ত পাতলা হয়ে যায়। শিশুদেরও চামড়া খুব পাতলা হয়, যত বড় হতে থাকে চামড়াটাও মোটা হতে থাকে। তার মানে দেবলোক থেকে যে শিশুরা শরীর নিয়ে এলো তারা সেই সংস্কার নিয়ে আসে, পরে আস্তে আস্তে পরিবার, সমাজের সংস্কারের মধ্যে যত ঢুকতে থাকে তত তাদের চেহারের মধ্যে পরিবর্তন আসতে থাকে। ঠাকুরের চামড়াও খুব পাতলা ছিল। উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষদের মন খুব অনুভূতি সম্পন্ন হয়, একটুতেই তাঁদের মন তোলপাড় করে ওঠে। সীতা চলে যাওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র তাই এত কষ্ট পাচ্ছেন।

পরের দিকে ভক্তিমার্গের কবিরা এগুলোকে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অভিনয় বলে চালিয়ে দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের এগুলো যদি অভিনয় হয়ে থাকে, তাহলে তো তিনি পূজো পাবারই যোগ্য নন। ঠাকুর বলছেন পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে, এটা সত্যি সত্যিই তাই হয়, একেবারে আক্ষরিক সত্য। এনাদের কোনটাই অভিনয় নয়। এই যে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের শরীরের বর্ণনা দিচ্ছেন, এই ধরণের শরীর মানে প্রচণ্ড অনুভূতি সম্পন্ন শরীর, অনুভূতি সম্পন্ন শরীর মানে মনটাও প্রচণ্ড অনুভূতি সম্পন্ন। এই ধরণের মনের বিরূপ কিছু হলেই খুব কষ্ট হয়। যারা তাঁর প্রিয়জন তাদের থেকেই কষ্টটা পান, অপরের থেকে কষ্ট পাননা।

শ্রীরামচন্দ্রের শরীরের সব বর্ণনা করার পর হনুমান বলছেন – শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা সত্যধর্মে সংলগ্ন। এখানে একটা ব্যাপার খুব ভালো করে বোঝার আছে। যাঁরা মহাপুরুষ হন তাঁরা দুই ধরণের মহাপুরুষ হন। প্রথম আধ্যাত্মিক পুরুষ, তাঁরা ঈশ্বর চৈতন্যে মানে শুদ্ধ চৈতন্যের চিন্তন নিয়ে সব সময় থাকেন। দ্বিতীয় ধরণের মহাপুরুষরা ধর্মকে অবলম্বন করে থাকেন। এই ব্যাপারটা বুঝতে হলে অবতার সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা রয়েছে সেটাকে মাথা থেকে পুরোপুরি নামিয়ে রাখতে হবে। এখানে মহাপুরুষ মানে আমরা মানুষ হিসেবে বা সাধক হিসেবে বলছি। এখন যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয় শ্রীরামকৃষ্ণের কি বৈশিষ্ট্য, স্বামী বিবেকানন্দের কি বৈশিষ্ট্য বা যিশু খ্রীষ্টের কি বৈশিষ্ট্য? স্বামীজী তো প্রায়ই রেগে যেতেন আর রেগে গিয়ে অনেক কটূ কথাও বলতেন। ঠাকুরের কোন গুণটা আমাদের কাছে অনুকরণীয়? কোনটাই নয়। এনারা সবাই চৈতন্যবান পুরুষ। এনাদের শক্তিটা আসলে আসছে সেই আধ্যাত্মিক শুদ্ধ চৈতন্যের অনুভূতি থেকে। শ্রীকৃষ্ণের হেন ছল চাতুরি যুক্ত কর্ম নেই যে তিনি করেননি, যেটা শেষ বয়সেও করতে ছাড়েননি। কিন্তু তিনিই আবার গীতায় বলছেন *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। গান্ধারী যখন শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিচ্ছেন – তোমার যদুবংশ নির্মূল হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ সেই অভিশাপ খুব হাসি মুখে গ্রহণ করে নিলেন, যেন কোন ব্যাপারই নয় তাঁর কাছে। শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা ছেড়ে দিন, শ্রীকৃষ্ণ সমেত পুরো যদুবংশই নাশ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি তাতে কোন ভ্রুক্ষেপই করছেন না, তখনও তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। আবার অপরের বংশ নাশ হয়ে গেলেও তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এই ভাবে সব কিছুতে নির্বিকার থাকাটা সম্ভব হচ্ছে সেই শুদ্ধ

চৈতন্যের শক্তিতে নিজেকে একাত্ম করে শক্তিমান হয়েছেন বলে। বৃন্দাবনে এই গোপীদের সঙ্গে তিনি কত কি করেছেন। কুরুক্ষেত্রে একবার সূর্য গ্রহণ হয়েছে। বৃন্দাবন থেকে গোপীর সেই উপলক্ষে তীর্থে স্নান করতে কুরুক্ষেত্রে এসেছেন। এত দিনে সবাই বড় হয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন রাজাধিরাজের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, রুক্মিনীকে নিয়ে আছেন। কিন্তু বৃন্দাবনের গোপীদের সঙ্গে চপলতার স্বভাব যায়নি। কুরুক্ষেত্রে গোপীদের সঙ্গে দেখা করে বলছেন – কি গো! আমি তো সেই অসুর রাক্ষসদের বধ করতে নেমে গেলাম, এত দিনে তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে ভুলে গেছ। অন্য দিকে রুক্মিনীকে বলছেন – আমার তো আত্মজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই।

স্বামীজী বলুন, শ্রীকৃষ্ণ বলুন যদি বিচার করা যায় সবারই কিছু না কিছু দোষ বেরিয়ে আসবে, তথাপি এনারাই আমাদের অনেকেরই ইষ্ট। এর কারণ একটাই, তাঁরা সেই চৈতন্য শক্তিতে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেছেন, তারপরেও হৃদয়ের সঙ্গে যখনই কোন গোলমাল লেগে যেত তখন ঠাকুরও কম গালাগাল দেননি হৃদয়কে, হৃদয়ও ছাড়ত না। রামলাল দাদা দেখে বলতেন এরা দুজনে জীবনে আর হয়তো একে অপরের সাথে কথা বলবে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার গলাগলি। গ্রামের লোকেরা নিজেদের মধ্যে এই রকম ঝগড়াই হয়ে থাকে। গ্রাম দেশে যে ধরণের কথাবার্তা, অশ্লীল ভাষা বলা হয় কথামৃতের পাতায় ঠাকুরের মুখে সেই সব ভাষা শোনা যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যেভাবে থাকতেন আমরা বলি তিনি কত কৃচ্ছতা করে দিন কাটিয়েছেন। কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখুন প্রত্যেক গ্রামেই ঠাকুরের মত কত ব্রাহ্মণ আছেন যারা অর্ধউলঙ্গ অবস্থায়, কোন রকমে খাওয়া দাওয়া করছে, কোন দিন হয়তো কিছুই জুটছে না, আর এই ভাবে দিনের পর দিন সৎ ভাবে জীবন যাপন করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? নিজের পরিবার আর গ্রামের কয়েকজন লোক ছাড়া বাইরের কজন লোক তাঁদের কথা মনে রেখেছে? তাহলে ঠাকুরের মহত্ত্ব কোথায়? আত্মজ্ঞানই ঠাকুরের মহত্ত্ব। আমরা যেমন বলি কুবেরের মত ধনী, ঠিক সেই রকম আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যে যখন ঢুকবো সেখানে দেখবো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের বাদশা। এনাদের শক্তির সামনে আর কেউই দাঁড়াতে পারেনা। এনারা সবাই হলেন আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যে মহাপুরুষরা আছেন, এনারা ধর্মকে অবলম্বন করে একটা বিশেষ দিকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। যাঁরা কোন একটা ধর্মকে অবলম্বন করে বিরাট হয়ে যান তাঁদের সাথে পরের দিকে যাঁরা অধ্যাত্ম শক্তিকে অবলম্বন করে বড় হয়েছেন এই দুই ধরণের মহাপুরুষদের মধ্যে একটা অবস্থার পরে পার্থক্য করা খুব কঠিণ হয়ে যায়। এখন একজন বিদ্বান উচ্চ শিক্ষিত মানুষকে যদি জিজ্ঞেস করেন সক্রেটিস আর যিশুর মধ্যে কে বড়, বেশির ভাগ পণ্ডিতরা সক্রেটিসকেই বড় বলবেন। সক্রেটিস ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এখন যদি আমাদের দেশের বড় বড় স্কলারদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় গান্ধীজী আর স্বামীজীর মধ্যে কে বড়, যারা স্বামীজীর ভক্ত তাদের কথা বলা হচ্ছে না, ১৯৪০ সালে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন জোর কদমে চলছে সেই সময়ে স্বামীজী আর মহাত্মা গান্ধীর তুলনা করা হলে বেশির ভাগ লোক মহাত্মা গান্ধীকেই বড় বলবেন, এমন কি রোমা রোঁলা পর্যন্ত সেই সময় মহাত্মা গান্ধী আর স্বামীজীকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এগোচ্ছিলেন। কারণ একটা নির্দিষ্ট সময়ে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যক্তিত্বকে আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের থেকে পার্থক্য করা যায় না। গান্ধীজী ছিলেন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। সত্য আর অহিংসা এই দুটো ধর্মে গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আর যারা আধ্যাত্মিক মানসিকতা সম্পন্ন নয় তাদের কাছে দুজনেই সমান, শুধু তাই নয় এই ধরণের অনেক লোক স্বামীজীকে সমালোচনা করতে ছাড়েন না। কারণ সাধারণ লোক আধ্যাত্মিকতা বোঝে না, তারা ধর্মটাকেই সব মনে করে। যে লোকটি তলোয়ার চালানোর যে ধর্ম, তাতে যদি প্রতিষ্ঠিত হয় আর যে পূজো করবে তার শক্তি যদি সেই স্তরের হয়, তখন তলোয়ার চালানোর ধর্মে যে প্রতিষ্ঠিত তাকেই বেশি লোক মান্যতা দেবে। যেমন আলেকজাণ্ডার, আলেকজাণ্ডার এই নামটির নামে পৃথিবীর সব থেকে বেশি লোকের নামকরণে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে এত প্রচলিত নাম আর কোন নাম নেই। এই আলেকজাণ্ডার নাম খ্রীশ্চানরাও ব্যবহার করছে মুসলমানরাও ব্যবহার করছে, পার্সিয়ানসরা,

জুইসরাও ব্যবহার করছে, যদিও মুসলমানদের ক্ষেত্রে আলেকজাণ্ডার নামটা সিকান্দর হয়ে যায়। আর কোন নাম সারা পৃথিবীতে এত বেশি ব্যবহার হয় না। কেন? আলেকজাণ্ডার ছিলেন একটা বিশেষ বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত, সেটা হল অস্ত্র বিদ্যা। মানুষ যখন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সে এক বিরাট মানুষ হয়ে যায়।

আমরা অন্য দিকে না গিয়ে বলতে পারি বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, সেখানে কিন্তু তাঁকে তিনি আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত লোক হিসেবে দেখাচ্ছেন না। আধ্যাত্মিকতার ধারণা তখন এতটা প্রসার লাভ করেনি, যদিও বাল্মীকির সময়ে উপনিষদ এসে গিয়েছিল, কিন্তু বাল্মীকি তাঁর রচনায় কোথাও উপনিষদের নাম ব্যবহার করছেন না। বাল্মীকি ছিলেন পূর্বমীমাংসক বা কর্মকাণ্ডের আদর্শ লোক। কথামৃতের সব থেকে কাছাকাছি যদি কোন সাহিত্য থাকে তা হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণ, আর কোন বইয়ের সাথে কথামৃতের এত মিল নেই। এই যে এক পুরুষের শরীরের কি অদ্ভূত বর্ণনা দিচ্ছেন, বাল্মীকির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। কত গভীরে চলে গেছেন, সীতার যখন বর্ণনা দিচ্ছেন তখনও অবাক হয়ে যেতে হয় যে, একজন ঋষি হয়ে তিনি নারী শরীরের এত কিছু জানলেন কি করে! বাল্মীকি যখন উপমা দিচ্ছেন বা ঋতুর বর্ণনা করছেন, তখন তার সামনে কালিদাস, ব্যাসদেব কেউই দাঁড়াতে পারছে না। অথচ ভারতবর্ষের কেউই বাল্মীকি রামায়ণ পড়েন না। ইদানিং তাও গীতা প্রেসের দৌলতে আমরা বাল্মীকি রামায়ণ পাচ্ছি। অথচ মজার ব্যাপার হল বাল্মীকি রামায়ণ ইংরাজী ভাষাতে সব থেকে বেশী অনুবাদ হয়েছে, যেখানে তুলসীদাসের রামচরিতমানস একটা অনুবাদ তাও বহু কষ্টে হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণ রামচরিতমানসের তুলনায় পাশ্চাত্য দুনিয়ায় বেশি সমাদৃত। বাল্মীকি রামায়ণের বিষয় বস্তু, তার উপস্থাপনা, তার বর্ণনা, বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের চিত্রণ এক কথায় অনবদ্য, কোন সাহিত্যের সাথে এর তুলনা করা যায় না। ভারতের কেন, বিশ্বের কোন কবিকেই বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। ভারতে বাল্মীকি রামায়ণ পড়ে না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণ মোক্ষের কথা বলে না। বাল্মীকি চারটে পুরুষার্থের ধর্ম, অর্থ আর কামকে নিয়েই আলোচনা করে গেছেন, মোক্ষকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে চলে গেছেন। আপনি যত বড় বড় শাস্ত্রই রচনা করুন না কেন, যদি মোক্ষের কথা না বলা হয় তাহলে সেই শাস্ত্র ভারতে চলবে না। অর্থ আর কাম ইহলোকের সুখ আর ধর্ম হল পরলোকের সুখ। বাল্মীকি এই তিনটে কে নিয়ে কি গভীর এক সাহিত্য রচনা করে গেলেন কিন্তু কোথাও মোক্ষের কথা বলা হল না বলে, শুধু এটুকুর জন্য ভারতে রামচরিতমানস বা অধ্যাত্ম রামায়ণের মত বইটা কদর পেল না।

এত কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য, শ্রীরামচন্দ্রের তাহলে বিশেষত্বটা কোথায়? শ্রীরামচন্দ্রের যে আমরা এত পূজো করছি, তাঁকে মর্যাদপুরুষ, পুরুষোত্তম বলছি, কেন বলছি, তাঁর বিশেষত্বটা কি? আবার শ্রীরামচন্দ্রের রামকথা শ্রীকৃষ্ণের কথা থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সেই তুলনায় অনেক গভীর, তা সত্ত্বেও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা শ্রীলঙ্কাতেও হচ্ছে, কাশ্মীরেও হচ্ছে, বার্মাতেও হয়, ইন্দোনেশিয়াতেও হয় আবার জাভা সুমাত্রাতেও হয়, পুরো উপমহাদেশ জুড়ে শ্রীরামচন্দ্রের পূজো হচ্ছে। তাঁর বিশেষত্বটা কোথায়? অনেক বলবেন তিনি রাবণকে বধ করেছিলেন, তাহলে আলেকজাণ্ডার বা হিটলারকেও তো পূজো করতে হয়। অনেক বলবেন শ্রীরামচন্দ্রের একপত্নী ব্রত ছিল, তাহলে বেশির ভাগ লোকেরই তো একটাই বউ আছে, কিন্তু তাদের তো কেউ পূজো করছে না। লক্ষ্মণের তো একটা বউ, ভরতেরও তাই, কিন্তু পূজো শ্রীরামচন্দ্রের হচ্ছে। কেন? শ্রীরামচন্দ্রের একটাই বৈশিষ্ট্য - *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, শ্রীরামচন্দ্র দুই রকম কথা বলেন না।

শ্রীরামের এক কথা, যেটা বলে দিলেন, আর সেই কথা থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া যাবে না। আমি বলতে পারি লক্ষ্মণও তো তাই করেছেন, না, লক্ষ্মণ নিজের ইচ্ছায় বনে এসেছেন। রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে অন্যায় ভাবে বলে দিলেন চৌদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে যেতে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র এক কথায় বলে দিলেন – পিতার আজ্ঞা! ঠিক আছে আমি চললাম। কিন্তু লক্ষ্মণ বলছেন এই বুড়ো বাপকে জেলে বন্দি করে দাও, আর ভরতের পক্ষে যারা দাঁড়াবে তাদের মেরে উড়িয়ে দাও। লক্ষ্মণের সেই শক্তি নেই, লক্ষ্মণ

একবারও বলছেন না যে বাবা যখন বলে দিয়েছেন তখন জঙ্গলে যেতে হবে, আর লক্ষ্মণকেও আদেশ করেননি, আদেশ করা হয়েছে একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রকে। আড়াল থেকে বালিকে কেন শ্রীরামচন্দ্র বধ করলেন? তিনি সুগ্রীবকে কথা দিয়েছেন। অগ্নি সাক্ষী রেখে আমি তোমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি যা বলবে আমি তোমার জন্য তাই করব। সুগ্রীব বলছেন আমার দাদাকে মারতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রও কথা দিয়ে দিলেন আমি বালিকে মারব। তারপর আর কোন ব্যাপার নয়, আমি যখন কথা দিয়ে দিয়েছি তুমি ধরে নাও বালি মারা গেছে। যে মুহুর্তে তিনি কথা দিয়ে দিয়েছেন এখন তিনি পেছন থেকে মারছেন কি সামনে থেকে মারছেন তাতে শ্রীরামচন্দ্রের কিছু যায় আসে না। সীতাকে খুঁজে বার করতে হবে, এখন ভাল্লুককে নিতে হবে কি বানরদের নিতে হবে তার কাছে কিছু নয়, আমাকে কার্যোদ্ধার করতে হবে। তার জন্য আমাকে যা কিছু ত্যাগ করতে হয় করে দেবো, আমার প্রাণও যদি চলে যায় তাহলে আমি এই কাজ করবই, কোন কিছুই আমাকে এই কাজ নিষ্পন্ন করা থেকে বিরত করতে পারবে না।

বাল্মীকি রামায়ণে সেইজন্য যুদ্ধের পর যখন সীতাকে নিয়ে আসা হয়েছে তখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলছেন – দ্যাখো সীতা! তুমি এটা মনে করো না যে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি বলে এত কিছু কাণ্ড করেছি। আমি রাজধর্মে প্রতিষ্ঠিত, রাক্ষসদের মারার জন্যই আমি এত কাণ্ড করেছি। কারণ শ্রীরামচন্দ্র বলেই দিয়েছিলেন রাবণের সব কিছু নাশ করে দিতে হবে, ব্যস্ এর পর আর কোন হেতু আসতে পারেনা। সীতাকে ভালোবেসে তিনি উদ্ধার করতে আসেননি, তিনি রাবণকে নাশ করবেন বলে দিয়েছেন যখন, তখন রাবণ শেষ ধরে নিতে হবে, এর জন্য তাঁকে কি মূল্য দিতে হবে তার জন্য তিনি থোরাই ভাবছেন। শ্রীরামচন্দ্র যেটাই কথা দিয়ে দিচ্ছেন তার পেছনেও কিন্তু ধর্ম আছে। যখন তিনি বাবার কথায় চৌদ্দ বছরের জন্য রাজলক্ষ্মী ত্যাগ করে চলে আসছেন তখন তিনি পিতৃধর্ম পালন করছেন, পিতৃধর্মে এটা পুরোপুরি অনুমোদিত।

পিতৃধর্ম তো না হয় পালন হয়ে গেল, তাহলে মাতৃধর্ম পালনে কি হবে? এটাই উন্নত মানের ও পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। উন্নত মানের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই হল যেখানে দুটো বিপরীত ধর্মের দ্বন্দ্বকে পাঠকের সামনে তুলে দেওয়া। ধর্ম দুই প্রকারের, একটা ধর্ম যেখানে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে সেখানে কোন খারাপ কিছু নেই, আরেকটা ধর্ম হল ভালো ও মন্দ মেশানো, কিংবা ধোঁয়াশার মত, ভালো মন্দটা ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। সাধারণ মানের সাহিত্যে নায়ক জানে তাকে কি করতে হবে আর ভিলেন যে সেও পরিষ্কার তাকে কি করতে হবে। কিন্তু উচ্চমানের সাহিত্যে দুটোকেই সমান ভাবে গুরুত্ব দিয়ে সামনে নিয়ে এসে দুটোর মধ্যে সঙ্ঘাত তৈরী করে দেবে। এখানেও পিতৃধর্ম আর মাতৃধর্মের মধ্যে সঙ্ঘাত তৈরী করে তার সমাধান পাঠকের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন, তুমি কোনটাকে নেবে। শ্রীরামচন্দ্র এইসব ক্ষেত্রে একটা ধর্মকেই অবলম্বন করে নিচ্ছেন, আর ঐ ধর্মকে অবলম্বন করেই এগিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে আমার মায়ের কি হবে আমার স্ত্রীর কি হবে তা নিয়ে তিনি কোন গ্রাহ্যই করছেন না। শ্রীরামচন্দ্রের সামনে তখন অনেক ধর্ম দাঁড়িয়ে গেছে, পিতৃধর্ম, মাতৃধর্ম, পতিধর্ম, রাজধর্ম, ক্ষত্রিয় ধর্ম, আর সব কটা ধর্ম পরস্পরের সাথে সঙ্ঘাত তৈরী করে দিয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র এতগুলো ধর্মের মধ্যে একটা ধর্মকেই অবলম্বন করে নিলেন, ঐ একটাকে ধরে বাকি সব ধর্মকে পেছনে ফেলে দিয়ে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। বালিবধের ক্ষেত্রেও তিনি এই একই নীতি অনুসরণ করছেন। তখন তিনি মিত্রধর্মে প্রতিষ্ঠিত। বালিবধের সময় এই মিত্রধর্মেই তিনি প্রতিষ্ঠিত, তখন তাঁর ক্ষত্রিয় ধর্ম, যোদ্ধার ধর্ম, মানব ধর্মের সাথে মিত্রধর্মের যত সঙ্ঘাতই আসুক না কেন, তখন কোন ধর্মই শ্রীরামচন্দ্রের কাছে কাজ করছে না। কারণ মিত্রধর্মে এই ধরণের কৌশল সম্পূর্ণ ভাবে অনুমোদিত। দুটো ধর্মের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব আসে তখন আমরা কোনটাকে নেব? এই ধর্মটাকেই তোমার গ্রহণ করা উচিৎ কাজ হবে, এই ভাবে কখনই ব্যাখ্যা করা যায় না। যে ধর্মটাকেই আমি অনুসরণ করব, সেই অনুসারেই ভবিষ্যত বলে দেবে আমার চরিত্র, আমার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত চিত্র কি রকম – ইনি এই রকম পরিস্থিতিতে এই রকম করেছিলেন।

এত সব কিছুর উপরে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে মৌলিক ধর্ম একটাই তা হল - *রামো দ্বির্নাভিভাষতে,* শ্রীরাম দুই রকমের কথা কখনই বলেন না। শ্রীরামচন্দ্র যাই করছেন তার নীচে মূল স্রোতটা হচ্ছে - *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ যা কিছুই করছেন তার মূল ভিত হল ঈশ্বরই সত্য আর বাকি সব অনিত্য। ঠিক সেই রকম স্বামীজীর ক্ষেত্রে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। কেন শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাঁর চরিত্রের বিশেষত্বটা কোথায়? এই হচ্ছে তার সঠিক উত্তর। বুদ্ধ, যিশু ও অন্যান্য মহাপুরুষদের তুলনায় শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের বিশেষত্বকে খুব সহজেই বর্ণনা করা যায়। কারণ, শ্রীরামচন্দ্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ম কি ছিল? সত্যে আধারিত। শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রে সত্য কি? দুই রকমের কথা বলা যাবে না, যেটা বলেছি সেটাই করব। যেটা বলেছেন সেটাই করব, তাহলে এটা কি তাঁর গোয়ার্তুমি? আদপেই না। যেটা তিনি কথা দিচ্ছেন সেটাও কোন না কোন শাস্ত্র নির্ধারিত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত।

হনুমান বলছেন – শ্রীরামচন্দ্র হলেন সত্যধর্মের অনুষ্ঠানে সর্বদা সংলগ্ন, শ্রী সম্পন্ন, ন্যায় পরায়ণ ইত্যাদি। আর লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিলিপি, পার্থক্য একটাই লক্ষ্মণের গায়ের রঙ ফর্সা আর শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন শ্যামবর্ণ। এরপরে হনুমান সীতার অপহরণের পরে কি কি হয়েছে সব সংক্ষেপে বর্ণনা করে সীতাকে বললেন। হনুমানের কাছে এত সব কথা শোনার পর এবারে সীতার মনে বিশ্বাস হয়েছে যে, এতক্ষণ যা যা দেখেছি এগুলো তাহলে কোনটাই স্বপ্ন নয়।

বাল্মীকি রামায়ণ – ২৬শে জুন ২০১০

আমরা গতকাল দেখলাম হনুমান সীতার কাছে পৌঁছে গেছেন। হনুমান তখন ভাবছেন আমি যদি সংস্কৃতে কথা বলি তাহলে সীতার মনে সন্দেহ হতে পারে, তিনি হয়তো ভাবতে পারেন যে কোন রাক্ষস চালাকি করে বানর রূপ ধরে আমার কাছে আসতে চাইছে। সেইজন্য হনুমান ঠিক করলেন অযোধ্যায় যে ভাষা প্রচলিত আমি সেই ভাষাই ব্যবহার করব। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে হনুমান বহু ভাষাবিদ ছিলেন। যে কোন লোক যদি দুটো বা দুটোর বেশি ভাষায় কথা বলতে পারে তাহলে নিশ্চিত বুঝে নিতে হবে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সপ্রতিভ। যেমন আমরা বাংলা জানি, এখন ইংরাজী ভাষাতে যদি দখল নিতে হয় তখন মস্তিষ্ককে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাতে হবে, মস্তিষ্ককে বেশি খাটানোর ফলে মস্তিষ্ক অনেক চাঙ্গা হয়ে যায়। ভারতীয়রা এমনিতেই একের অধিক ভাষা জানে। ভারতে যাদের ব্যবসা বা চাকরির জন্য বিভিন্ন রাজ্যে ঘোরাঘুরি করতে হয় তাদের দুটো ভাষা জানতেই হয়। এখন কে কত ভালো দুটো ভাষাতে ভালো রপ্ত তার ওপর নির্ভর করছে তার বুদ্ধিমত্তা। হনুমানও খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। পুরো রামায়ণে কোথাও দেখা যায় না যে হনুমান কোন ভুল কাজ করেছেন।

হনুমান যে তিনটে ভাষা জানতেন এখানে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিষ্কিন্ধার আঞ্চলিক ভাষা তো হনুমানের মাতৃভাষা ছিল, দ্বিতীয় এর আগে আমরা দেখেছি তিনি সংস্কৃত জানেন, শ্রীরামচন্দ্র প্রথম হনুমানের কথা শুনে লক্ষ্মণকে বলছেন – নিশ্চয়ই এ বেদ অধ্যয়ন করেছে, ব্যকরণ খুব ভালো ভাবে জানে, বেদাঙ্গের শিক্ষাতে যে বৈদিক সংস্কৃতের উচ্চারণের শুদ্ধতা শেখানো হয়, হনুমান সেই শিক্ষাকেও খুব ভালো ভাবেই রপ্ত করেছেন। তৃতীয় হনুমান সীতাকে অবধী ভাষায় রামচরিত শোনাচ্ছেন। হনুমানের আরেকটি খুব দুর্লভ গুণ হল অল্প কথায় তিনি অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারেন।

এখন হনুমান ভাবছেন যদি আমি শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলি সীতা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতে পারে, তখন আবার অন্য অনেক সমস্যা এসে যেতে পারে। সেইজন্য তিনি প্রথমে গাছের উপরে বসে অবধী ভাষায় গুনগুন করে খুব সংক্ষেপে রামকথা বলতে শুরু করলেন, অযোধ্যা রাজ্যের রাজা দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম থেকে শুরু করেছেন। রামকথা শুনেও সীতার মনে আশঙ্কা, উনি ভাবছেন এটা কি ব্যাপার, কে এইভাবে রামকথা বলছে, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? রামকথা গান করা শেষ হয়ে গেলে হনুমান

নীচে নেমে এসেছেন। সীতা তখন আরো নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা করতে বলছেন। হনুমান এখন শ্রীরামচন্দ্রের যে বর্ণনা করছেন এই বর্ণনা কিন্তু হনুমানের নয়, বাল্মীকিই এর বর্ণনা করে হনুমানের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন। কারণ এমন এমন বর্ণনা করা আছে যেটা হনুমানের পক্ষে জানার কথা নয়। বাল্মীকি এই বর্ণনার দ্বারা বলে দিচ্ছেন আদর্শ পুরুষ যিনি তাঁকে দেখতে কি রকম হবে, তাঁর শরীর কি রকম হবে। এত কিছু বলার পরে সীতার অপহরণ হয়ে যাওয়ার পর থেকে কি কি হয়েছে সেটাও হনুমান সীতাকে জানিয়ে দিলেন।

এইবার হনুমানকে সীতা জিজ্ঞেস করছেন – তুমি কে, তোমার পরিচয় কি? হনুমান নিজের পরিচয় দিচ্ছেন – আমি হনুমান, বানর জাতির, বায়ু দেবতার পুত্র ইত্যাদি। সীতার যখন হনুমানের প্রতি বিশ্বাস জন্মাল তখন তিনি বলছেন – **বানরোহহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ। রামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্**।।৫/৩৬/২। অঙ্গুলিয়কং বলতে ঠিক ঠিক বোঝায় আঙ্গুলে যেটা পরা হয়। আংটি বা মুদ্রিকার যে কোন একটা হতে পারে। সীতার অন্বেষণে যখন সবাই চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে এই মুদ্রিকা দিয়ে বলেছিলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমিই সীতার খোঁজ নিতে পারবে, তাই আমি তোমাকে আমার এই মুদ্রিকাটা দিলাম যাতে সীতার পক্ষে তোমাকে আমার দূত হিসাবে চিনে নিতে অসুবিধা না হয়। মুদ্রিকা হল এখনকার দিনের সীলমোহরের মত। যখন পুলিশের বড়কর্তা কোন কাগজে সই করে কাউকে দিচ্ছে তখন সেই সই দেখে কেউ বুঝতে পারবে না যে এটা পুলিশের বড়কর্তার সই, কিন্তু সইয়ের নীচে যদি বড়কর্তার একটা রাবার স্টাম্প দেওয়া থাকে তখন সেই সইয়ের অনেক দাম হয়ে যায়। আগেকার দিনে রাজারা, শুধু রাজারাই নয়, তাঁর নীচে মন্ত্রী, সেনাপতিদের আঙ্গুলে একটা আংটি থাকত, সে আংটিতে তাঁদের নিজেদের নাম খোদাই করা থাকত। কাউকে যদি কোন খবর পাঠাতে হত বা নির্দেশ পাঠাবে তখন কাগজে ঐ আংটিটা খুলে একটা ছাপ মেরে দেওয়া হত। যারা তাদের নিজের লোক হত এই চিহ্ন একমাত্র তারাই চিনে নিতে পারত। এখন শ্রীরামচন্দ্রের সীল কজন আর চিনতে পারবে, একজন রাজার নামাঙ্কিত সীল তাঁর মন্ত্রী চিনবে, তাঁর সেনাপতি চিনবে, রানী চিনবে, শ্রীরামচন্দ্র তখনও রাজা হননি, তাঁর নামাঙ্কিত সীল সীতাই জানতেন। আবার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পরিচয় দেওয়ার জন্যে তাকে ঐ মুদ্রিকাটাই দিয়ে দেওয়া হত, ঐ মুদ্রিকা দ্বারবান বা যাকেই দেখাবে সে তক্ষুনি দরজা খুলে দিত, তাকে আর কেউ আটকাবে না, এটা ঠিক কতকটা কম্প্যুটারের পাসওয়ার্ডের মত। তাই হনুমানকে শ্রীরামচন্দ্র যেটা দিয়েছিলেন ওটা ঠিক আংটি দেননি, তিনি তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রিকা দিয়েছিলেন। মুদ্রিকা আর আংটির কি তফাৎ আমরা দেখলাম। সেইজন্য বাল্মীকি এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করছেন অঙ্গুলিয়কং রামনামাঙ্কিতং, এতে রাম নাম লেখা আছে। সীতা শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী তিনি তাঁর স্বামীর এই মুদ্রিকা চিনতেন, তাতে রাম নাম লেখা আছে।

হনুমান বলছেন – আপনার যাতে বিশ্বাস হয় তাই এই মুদ্রিকা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। সীতা তখন ঐ আংটি হাতে নিয়েছেন, তাঁর মন তখন প্রচণ্ড আলোড়নে আন্দোলিত হতে শুরু করেছে। যিনি তাঁর এত প্রিয়, যিনি তাঁর ধ্যান জ্ঞান সর্বস্ব, তাঁর থেকে এত দূরে পড়ে আছেন, কতদিন হয়ে গেছে, সেই কবে সীতা অপহরণ হয়েছেন, তারপর থেকে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে কত জায়গায় খুঁজেছেন, সুগ্রীবের ওখানে কত দিন চুপচাপ বসে কাটিয়েছেন। এর মধ্যে বালি-সুগ্রীবের লড়াই থেকে কত কি হয়ে গেছে। কত মাস চলে গেছে। এত দিন পরে শ্রীরামচন্দ্রের একজন দূত গিয়ে সীতার কাছে পৌঁছেছে। সীতার যত রকমের আবেগ সব এখন বেরিয়ে এসেছে। আবার খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে হনুমানের প্রশংসা করতে শুরু করেছেন – হে হনুমান তুমি অত্যন্ত শক্তিশালী, পরাক্রমী, কত দূর থেকে কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এই রাক্ষসদের রাজ্যে এসে বিক্রমের সাথে দাঁড়ালে, সত্যিই তোমার বীরত্বের তুলনা কারুর সাথেই করা যায় না। সীতা কিন্তু এখনও হনুমানের পুরো পরিচয় জানেন না। তিনি বলছেন – রাক্ষস রাজ রাবণের নামে তোমার যে কোন ভয় হচ্ছে না, তোমার কোন বিকার হচ্ছে না, তাতেই আমি বুঝতে পারছি যে, তুমি এক অসাধারণ

বানর। আমি শ্রীরামচন্দ্রকে ভালো ভাবেই জানি, তিনি এমন কাউকে আমার কাছে পাঠাবেন না যার শক্তি নেই, সাহস নেই, যে পরাক্রমী নয়, যার স্বভাব মার্জিত নয়। একজন লোক, যার বিরাট শক্তি আছে কিন্তু শীল স্বভাব নয়, এমন লোককে শ্রীরামচন্দ্র আমার কাছে পাঠাবেন না।

হনুমানের প্রশংসা করে সীতা বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের মত বীর এক সঙ্গে থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে পারছেন না, এটা আমারই দুর্ভাগ্য, আমার কর্ম খারাপ তাই এই রকম হচ্ছে, তা নাহলে আমার তো এই রকম দুর্বিষহ অবস্থা হওয়ার তো কথা নয়।

এরপরে বাল্মীকি একটা বিশেষ কাব্যিক শৈলীকে এখানে প্রয়োগ করছেন, যে শৈলীকে পরের দিকে ব্যাসদেব মহাভারতে অনেকবার অনুকরণ করেছেন। এখানে প্রশ্ন করে করে একটা বক্তব্যকে তুলে ধরা হচ্ছে। সীতা ভালো মতই জানেন যে শ্রীরামচন্দ্র এই রকমই হবেন, কিন্তু প্রশ্নটা উল্টো ভাবে করে যাচ্ছেন। পুরো ভারত উপমহাদেশে, মানে ভারত, পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ নিয়ে যে উপমহাদেশ, সেখানে কথার শেষে একটা করে 'না' বা 'তো' লাগিয়ে দেবে। ভারতের সব কটি আঞ্চলিকে ভাষাতেই এই জিনিষটা দেখা যায়, বিশেষ করে হিন্দীতে মারাত্মক ভাবে ব্যবহার হচ্ছে – তুম্ জাওগে না, বাংলায় বলবে তুমি যাবে তো। মুশকিল হচ্ছে এখন এর যখন ইংরাজী অনুবাদ করতে যাচ্ছে তখন সেখানেও একটা 'না' জুড়ে দিচ্ছে। যদি জিজ্ঞেস করে তুমি যাবে তো? এর ইংরাজী হবে Will you go? কিন্তু ইদানিং এর সাথে ঐ 'না' টাকেও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে – Will you go, na? অথচ ইংরাজীতে এই 'na' এর কোন অর্থই হয় না। হিন্দীতে কিন্তু সব সময় বলবে – তুম্ জাওগে না? বাংলায় বলবে – তুমি যাবে তো? এই যে 'না' বা 'তো'টা লাগিয়ে দিচ্ছে মানে বোঝাতে চাইছে আমি নিশ্চিত যে তুমি যাচ্ছ। যদি জিজ্ঞেস করে আজকে ক্লাশ হবে? তার মানে হতেও পারে নাও হতে পারে। যখন বলবে – ক্লাশটা হবে তো? মানে ধরেই নিয়েছি ক্লাশ হবে। এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে না, উত্তর জানান হচ্ছে। এই উপমহাদেশে এই স্টাইলটা একটা রোগের মত ছড়িয়ে আছে। এখানে আসলে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আপনাকে উত্তর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মা ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে – কিরে খাবি তো? মা ধরেই নিয়েছে ছেলে খাবে। মা যদি প্রশ্ন করেন - কিরে খাবি? তার মানে ছেলে খেতেও পারে নাও খেতে পারে। এখানকার লোকেরা ইংরাজীতেও এই স্টাইলটাকে আমদানি করে নিতে শুরু করে দিয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাল্মীকি এই জিনিষটাকে প্রথম ধরেছেন, আর এই শৈলীটাকেই তিনি এখানে তুলে ধরেছেন, মানে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

এখানে ঠিক এইভাবেই সীতা বলছেন – **কচ্চিন্ন ব্যথতে রামঃ কচ্চিন্ন পরিতপ্যতে। উত্তরাণি চ কার্যাণি কুরুতে পুরুষোত্তমঃ।।৫/৩৬/১৫** – হে হনুমান বল শ্রীরামচন্দ্র কোন ব্যাপারে সন্তপ্ত হয়ে যাচ্ছেন না তো। তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি যে তিনি সন্তপ্ত হচ্ছেন না, আমি জানি আমি নেই বলে তাঁর সন্তপ্ত হওয়ার কথা। শ্রীরামচন্দ্রের মনে কোন ব্যাথা নেই তো, এটাই একটা নতুন শৈলী, যে শৈলীকে বাল্মীকি তাঁর কাব্যে প্রয়োগ করে জনপ্রিয় করে দিয়েছেন। এখনতো এই উপমহাদেশের লোকেদের রক্তের মধ্যে এটা মিশে গেছে। তারপরের প্রশ্ন – *উত্তরাণি চ কার্যাণি কুরুতে পুরুষোত্তম* – পর পর যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো ঠিক পর পর করছেন তো? যদিও এটা একটা স্টাইল কিন্তু মূল বক্তব্য হচ্ছে সীতা জানতে চাইছেন শ্রীরামচন্দ্র এখন কেমন আছেন। ইদানিং কালে যদিও কমে গেছে, কিন্তু কিছু বছর আগেও মেয়ে বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়িতে নতুন এসেছে, কয়েক দিনের মধ্যে নিজের বাপের বাড়ির দেশ থেকে কোন পরিচিত কেউ এসেছে দেখা করতে, তখন মেয়েটি তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্ন করে বাপের বাড়ির খবর জানতে চাইত। আসলে মন প্রাণ তখনও বাপের বাড়িতে পড়ে রয়েছে। মানুষের মন প্রাণ যেখানে পড়ে থাকে সেখানকার খবর সে একটু একটু করে জানতে চায়।

তারপরে বলছেন **কচ্চিন্ন দীনঃ সম্ভ্রান্তঃ কার্যেষু ন মুহ্যতে। কচ্চিৎ পুরুষকার্যাণি কুরুতে নৃপতেঃ সুতঃ।।৫/৩৬/১৬** এমন তো নয় যে, শ্রীরামচন্দ্র দীন ভাবকে প্রাপ্ত করেছেন। দীন ভাব মানে নিজেকে ছোট করে নেওয়া। দীনভাবকে প্রাপ্ত করে কি করছেন – *কার্যেষু ন মুহ্যতে*, যে নিজেকে দীনভাব

করে নিচ্ছে, তখন তার কি সমস্যা হয় – তখন কোন কাজে তার আর মন থাকে না, কাজ করতে ইচ্ছে যায় না। এখন যদি কারুর সন্তান মারা যায়, স্ত্রী বা স্বামী মারা যায়, তখন কি হয়? তখন তাকে একটা দীনভাব এসে গ্রাস করে নেয়, বাইরেও এই দীনভাবকে ব্যক্ত করে। যখন এই দীন ভাবকে ব্যক্ত করে তখন সে আর কাজ করতে পারেনা। সীতা হনুমানকে সেটাই জিজ্ঞেস করছেন। সাধরণ লোকেরা, যারা সমাজে আছে তাদের এটা গভীর সমস্যা, দীনভাব প্রাপ্ত হলে তারা আর কোন কাজ করতে পারেনা। শ্রীরামচন্দ্রেরও কি এই রকম কিছু হচ্ছে? সীতা এখানে বলছেন না যে, আমি তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছি, আমি অপহৃতা, সেই কারণে তিনি কোন দীনভাব প্রাপ্ত হননি তো, পরোক্ষ ভাবে ঘুরিয়ে বলছেন। সীতা প্রশ্ন করছেন – শ্রীরামচন্দ্র যে কাজই করছেন, সেই কাজ করার সময় পুরুষার্থ লাগিয়ে রাখছেন তো? বক্তব্যটা হচ্ছে সীতাকে এক রাক্ষস অপহরণ করে নিয়ে গেছে, শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সীতা এখন নেই, এই অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্রের কি অবস্থা।

এখন যদি সীতাকে বলা হত, শ্রীরামচন্দ্র সীতার অভাবে খুব হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়েছেন। তাহলে সীতা কি খুব খুশি হতেন? বলা খুব মুশকিল। এই জগতে সব থেকে বড় একটা ধাঁধা আছে, যে ধাঁধার উত্তর আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। এক বীরপুরুষকে এক রাজকুমারী ভালোবাসত, রাজকুমারী তার প্রিয়তমের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এর মধ্যে রাজকুমারী জানতে পারল যে এই বীরপুরুষ অন্য এক মেয়েকে ভালোবাসে। এই ব্যাপারটা জানতেই রাজকুমারী প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এতই সে রেগে গেছে যে, এমন একটা কাণ্ড করল যার ফলে রাজা ঠিক করলেন ঐ বীরপুরুষকে সিংহের খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে সিংহের খাবার বানিয়ে দেওয়া হবে। যেখানে সিংহের খাঁচা রাখা আছে সেখানে আরেকটি খাঁচাও রাখা আছে, যার মধ্যে যে মেয়েটিকে ছেলেটি ভালোবাসে, তাকে রাখা হয়েছে। দুটো খাঁচার মধ্যে কোনটাতে সিংহ আছে আর কোনটাতে মেয়েটি আছে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। এখন এই বীরপুরুষকে বলে দেওয়া হয়েছে তুমি গিয়ে যে কোন একটা খাঁচাকে গিয়ে খুলতে, যে খাঁচাটি খুলবে সে তাকেই পাবে, হয় সিংহ মানে মৃত্যু আর অন্যটা হলে মেয়েটিকেই সে চিরদিনের মত পেয়ে যাবে। এই বীরপুরুষের খুব নামডাক ছিল, সবাই তাকে ভালোবাসত, সবাই গিয়ে ঐ রাজকুমারীর হাতে পায়ে ধরেছে – আপনি এই ভাবে এত বড় বীরের জীবনকে নষ্ট হয়ে যেতে দেবেন না। রাজকুমারী তখন নরম হয়ে বলছে – রাজার আদেশ হয়ে গেছে, এখন রাজার সামনে তো আমি কিছু করতে পারব না, তবে আমি খবর নিয়ে জেনে নিচ্ছি কোন খাঁচাতে কি আছে। আমার হাতে দুটো রুমাল থাকবে, ঐ বীরপুরুষ যখন খাঁচার দরজা খুলতে যাবে তখন আমি যে হাতের রুমালটা উপরে তুলব তখন সে সেই দিকের খাঁচার দরজাটা খুলবে। গোপনে সেই বীরপুরুষের কাছে খবর চলে গেছে। যেদিন খাঁচা খোলা হবে সেদিন গোটা শহরের হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে কি হয় দেখবার জন্য। যদি সে ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচার দরজাটা খুলে দেয় তাহলে সিংহ বেরিয়ে এসে তাকে খেয়ে নেবে, আর অন্য দরজাটা খুললে সেই মেয়েটি বেরিয়ে আসবে, যে মেয়েটিকে সে ভালোবাসে। রাজকুমারী এখন খবর পেয়ে গেছে কোন খাঁচাতে কি আছে। যখন সেই বীর যোদ্ধার খাঁচার দরজা খোলার সময় হল তখন রাজকুমারী তার একটা হাতের রুমাল তুলেছে। এখানে ধাঁধাটা হচ্ছে রাজকুমারী কোন রুমালটা তুলেছিল। সিংহের খাঁচার দিকের রুমাল? না কি মেয়েটি যে খাঁচাতে ছিল সেই খাঁচার দিকের রুমাল? আজ পর্যন্ত এর কোন সঠিক উত্তর নেই। কারণ আপনি এক রকম বলবে আমি আরেক রকম বলব। ঠিক সেই রকম সীতাকে যদি বলা হত – আপনার কথা মনে করে তিনি হতাশ হয়ে মুষড়ে পড়ে আছেন। আরেক রকম বলা যেত – শ্রীরামচন্দ্র পুরো উদ্যমে নিজের বিক্রমে চলছেন। এখন কোন কথাতে সীতা খুশী হবেন? এর উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল, কারণ দেবতারাও নারীদের চরিত্রের খবর জানেন না। আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন আমিও উত্তর দিতে পারব না। যদিও রাজস্থানে ক্ষত্রিয় মেয়েদের আত্মত্যাগের কাহিনী আমাদের জানা আছে যেখানে তারা যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেতেই আত্মাহুতি দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সেটা ছিল ধর্মের জন্য তারা পুরোপুরি নেমে পড়েছিল। আবার যে মেয়ে যাকে ভালোবাসে সেকি তাকে কখন মরতে দেবে, কখনই দেবে না। আবার সে যাকে ভালোবাসে সে অন্য একটা মেয়ের

সঙ্গে থাকবে, এটা কোন মেয়ে কি মেনে নিতে পারবে? না কি সহ্য করতে পারবে? বলা খুব মুশকিল। আবার এমন মেয়েও দেখা যায় যে বলে দিচ্ছে – তুমি যাকে পেয়ে, যেখানে থেকে সুখী হতে চাও বলে সেই ছেলেকে রেহাইও দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ মেয়েই বলবে – হয় আমার পায়ের তলায় নাহলে কোত্থাও না।

এখানে একটা কথার পরিপ্রেক্ষিতে রাজার চারটি নীতির কথা বলা হচ্ছে – সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ। সাম হচ্ছে মিত্রতা, বন্ধুত্বের মাধ্যমে রাজার শক্তি বৃদ্ধি করা, সাম আবার বোঝায় নিজের মধ্যে সাম্য ভাবকে ধরে রাখা। দান হল টাকা পয়সা ও সামগ্রী দিয়ে শত্রুকে বশে রাখা। ভেদ মানে শত্রুপক্ষের নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করে দুর্বল করে দেওয়া। দণ্ড মানে অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে নজির স্থাপন করা। এই নীতি যে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে তাই নয়, আমাদের দৈনন্দীন জীবনেও এর প্রয়োগ আমাদের অনেক কিছুতে সাফল্য এনে দিতে পারে। যে যাকে ভালোবাসে সে মনে করে সে যেন আমারই হয়ে থাকে, সেইজন্য চেষ্টা করে তার ভালো লাগার পাত্রের সাথে সবার যাতে ঝগড়া হয়ে যায়, এই জিনিষ বেশি দেখা যায় কলেজের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে। এটাই ভেদ নীতি।

সীতা জিজ্ঞেস করছেন শ্রীরামচন্দ্র নিজের বন্ধুদের প্রতি সাম্য ভাব বজায় রাখছেন তো? আর সময় মত সবাইকে দান, উপহার এইসব দিচ্ছেন তো। বন্ধুদের প্রতি দুটো – সাম আর দান। শত্রুদের প্রতি তিনটে জিনিষকে বজায় রাখতে বলা হচ্ছে – দান, ভেদ ও দণ্ড। এগুলো সবই বাল্মীকির নীতি। আমার দুজন শত্রু আছে, এই দুজন শত্রু যদি নিজেদের মধ্যে আপোষ হয়ে মিলে যায় তাহলে আমার বিপদের সম্ভবনা অনেক বেড়ে যেতে পারে। দুজনের মধ্যে চর লাগিয়ে সব সময় ঝগড়া লাগিয়ে রাখতে হবে, আর দণ্ড, যখনই সুযোগ পাওয়া যাবে তখনই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর শত্রুদের প্রতি দান নীতি হল, যদি টাকা দিয়ে শত্রুকে কিনে নেওয়া যায়, তাহলে তাই করতে হবে। কোন এক আশ্রমের এক সেন্টারের স্কুলে একজন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই শিক্ষক কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই নানান রকমের ঝামেলা করতে থাকেন, এই নিয়ে অনেক অভিযোগ আসার পর আশ্রমের সেক্রেটারীকে জানান হয়। সেক্রেটারী সেই শিক্ষকের পাঁচশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। তারপর থেকে সে খুব ভালো ভাবেই কাজ করতে থাকলেন। ওনার নামে অভিযোগ আসাও বন্ধ হয়ে গেল। পরে সেক্রেটারী মহারাজ বলছেন – যাকে পাঁচশ হাজার টাকা দিয়ে মাপা যায় তাকে কখনই বিশ্বাস করতে নেই। মানে, পাঁচশ টাকা কম পাচ্ছিল বলে খিটখিট করছিল, যেই পাঁচশ টাকা মাইনে বেড়ে গেল তখন তার মানসিকতা পাল্টে যাচ্ছে, এই ধরণের লোককে কখনই বিশ্বাস করতে নেই। শিক্ষকতার জীবিকা পুরোপুরি একটি উচ্চ আদর্শ ও নিষ্ঠার উপরে দাঁড়িয়ে। নিষ্ঠা ও আদর্শকে কখন টাকা দিয়ে মাপা যায় না, যার নিষ্ঠা আছে যে কোন অবস্থাতেই তার নিষ্ঠা থাকবে, যার নেই তার কোন অবস্থাতেও থাকবে না। যেমন বাড়ির যে পরিচারিকা, যার নিষ্ঠা আছে, তাকে কম টাকা দিয়ে দিন সে সেই নিষ্ঠা নিয়েই কাজ করবে, কিন্তু যাদের নিষ্ঠা নেই, তাদের যত টাকাই দিন, তারা কখনই নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করবে না। সেইজন্য নিষ্ঠা দেখেই তাকে অনুরূপ মাহিনা দেওয়া হয়। সেক্রেটারী মহারাজ তাই বলছেন – কটা টাকা দিয়ে যার নিষ্ঠা কেনা যায় তাকে কখনই বিশ্বাস করতে নেই। আর ঠিক তাই হল, সেই শিক্ষক দু তিন মাস আবার অন্য ধরণের গোলমাল করতে শুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাকে স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হল। শত্রুকেও কখনও টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া যাবে না, কিন্তু তার মুখ বন্ধ কর রাখা যায়। শত্রুদের কিছু দান দিয়ে দাও, মুখ বন্ধ থাকবে। এই নীতি গুলো প্রথম নিয়ে আসছেন বাল্মীকি, মহাভারতে গিয়ে এই নীতি গুলিই সমাজ ও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মহাভারতে আবার বিশেষ করে বলে দেওয়া হয়েছে কোন কোন অবস্থায় শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে।

সীতা আরেকটা গুণের কথা বলছেন। শ্রীরামচন্দ্র চেষ্টা করে বন্ধু সংগ্রহ করছেন কিনা। যারা সংসারী এবং সমাজে বাস করছে তাদের কাছে এই গুণটা খুব প্রয়োজনীয়। আমাদের ভারতের বিরাট বড় সমস্যা হল, এখানকার মানুষের কাছে প্রাচীন কাল থেকে আদর্শ পুরুষ হচ্ছেন সাধু সন্ন্যাসীরা। সাধু

সন্ন্যাসীদের সঙ্গে জগতের কোন সম্পর্ক নেই, একটা গ্রামের বাইরে গাছের তলায় বসে রইল তো বসেই রইল। বাউল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা তাই করে বেড়াচ্ছে, কখন গাছের তলায়, কখন মন্দিরের চাতালে, কখন নদীর ঘাটে, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধারণ লোকেদের মনে সন্ন্যসীর আদর্শ ঢুকে গেছে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের আদর্শ কক্ষণ গৃহস্থদের নিতে নেই। বাল্মীকি রামায়ণের আদর্শই ঠিক ঠিক গৃহস্থদের আদর্শ। আমরা যে বলি শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন গৃহস্থদের আদর্শ, ঠাকুর কিন্তু ঠিক ঠিক গৃহস্থদের আদর্শ নন। তার কারণ ঠাকুরের প্রকৃত আদর্শ সন্ন্যাসীর আদর্শ। ঠাকুরের যাবতীয় আচরণ আমরা যেভাবে পাই তা সবই সন্ন্যাস ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বাল্মীকি রামায়ণকে কেন গৃহস্থদের প্রকৃত আদর্শ বলা হচ্ছে? যেমন এখানে সীতার মাধ্যমে বলা হচ্ছে চেষ্টা করে আপনাকে চার জন বন্ধু রাখতে হবে। ঠাকুর কিন্তু কোথাও বলছেন না যে তোমাকে কয়েক জন বন্ধু বান্ধব জোগাড় করতে হবে। যার জন্য ঠাকুরের শরীর চলে যাবার পর শ্রীমা কি প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে পড়ে রয়েছেন, শ্রীমাকে সেই সময় দেখার জন্য কেউ নেই। পাঁচ জন বন্ধু থাকলে এভাবে শ্রীমাকে কষ্ট পেতে হত না। শেষে বলরাম বাবুকে জানাতে তাঁর বাড়ির লোকেরা শ্রীমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে এলেন। সেইজন্য সীতা বলছেন – **কচ্চিম্মিত্রাণি লভতেহমিত্রৈশ্চাপ্যভিগম্যতে। কচ্চিৎ কল্যাণমিত্রশ্চ মিত্রৈশ্চাপি পুরস্কৃতঃ।।**৫/৩৬/১৮। চেষ্টা করে, আচরণের দ্বারা বন্ধু-বান্ধব জোগাড় করা। যারা শত্রু তাদের সাথেও শ্রীরামচন্দ্র বন্ধুভাবে মিলিত হচ্ছেন তো? মিত্রদের কল্যাণ করলে মিত্ররাও আনুকূল্যের হাত বাড়িয়ে পুরস্কৃত করে থাকেন।

বাল্মীকি বলছেন, যারা আপনার মিত্র হয়েছে তাদেরকে এমন দান উপহার দিতে হবে যাতে তারা আপনার কাছে চির ঋণী হয়ে থাকে। সমাজে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে হলে প্রত্যেক সংসারীকে এই ভাব ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যদি কেউ বলে আমার কোন বন্ধু বান্ধবের দরকার নেই, তখন সেটাই হয়ে যাবে সন্ন্যাসীদের ধর্ম। একজন সন্ন্যাসীর যদি কোন পরিচিতি না থাকে তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না, বরঞ্চ তাঁর সন্ন্যাস জীবনের পক্ষে সেটাই পরম মঙ্গলদায়ক। কিন্তু একজন গৃহস্থের এই মনোভাব কক্ষণই সমর্থন যোগ্য নয়।

এরপরে সীতা যেটা বলছেন এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা – **কচ্চিদাশাস্তি দেবানাং প্রাসাদং পার্থিবাত্মজঃ। কচ্চিৎ পুরুশকারঞ্চ দৈবঞ্চ প্রতিপদ্যতে।**৫/৩৬/১৯। হে হনুমান! শ্রীরামচন্দ্র দেবতাদের কৃপাপেক্ষ আছেন তো? মানে শ্রীরামচন্দ্র দেবতাদের কাছে হাতজোড় করে প্রার্থনা করছেন তো – হে দেবতা! আমাকে কৃপা করুন। আর বলছেন – *কচ্চিৎ পুরুশকারঞ্চ দৈবঞ্চ প্রতিপদ্যতে* – পুরুষকার মানে প্রচেষ্টা আর দৈব মানে দেবতাদের কৃপা এই দুটোতে সমান ভাবে শ্রীরামচন্দ্র ঠিক ঠিক অবস্থিত কিনা। সংসারে থাকতে গেলে আমাদের অনেক রকম বড় বড় কাজে হাত দিতে হয়। যেমন মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছি, আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঠিক মত যোগাযোগ হয়ে উঠছে না, তার মানে আমার দৈবটা খারাপ। পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা পুরোপুরি পুরুষকারে বিশ্বাস করে, আর আমরা পুরোপুরি দৈবের উপর নির্ভর করে থাকি।

বেশির ভাগ ভক্তদের বলতে দেখা যায় – ও যা হবার ঠাকুরের ইচ্ছাতেই হয়ে যাবে। তাঁরা ভুলে যান, এই ভাবে কোন দিন কিছুই হয়ে যাবে না। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই যদি সব হয়ে যেত, তাহলে তো বেলুড় মঠ করার কোন দরকার ছিল না। তাঁর ইচ্ছেতেই যদি সব কিছু হয়ে যেত তাহলে তিনি তো রাতারাতি সবাইকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে দিতেন, কিন্তু সবাইকে ব্রহ্মজ্ঞান তিনি দিচ্ছেন না কেন? কখনই তিনি দেবেন না। একটা দুধের শিশুর কোন বোধ নেই, মা তাকে খাইয়ে দিলে সে খায়, তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে সে ঘুমিয়ে পড়ে, শিশুর ক্ষেত্রে দৈব বা পুরুষকারের কোন কথাই আসে না। কিন্তু তার যখন বোধ আসে তখন আর মা তাকে খাইয়ে দেয় না। আজকে আমরা যে বয়সে এসে পৌঁছেছি, এখন আমাকে খেতে গেলে আমাকে নিজের হাতেই খেতে হবে, আমাদের নিজেদের রান্নার ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে, রান্নার উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা আমাদেরকেই করতে হবে। এই অবস্থায় আমাদের প্রত্যেকটি কাজে পুরো দমে চেষ্টা

চালিয়ে যেতে হবে। একটা জিনিষকে আমি যতটা শক্তি দিয়ে ঠেলব Newton laws of motion অনুসারে সেই জিনিষটা ততটা সরবে। কিন্তু আমাদের বাস্তবিক দৈনন্দিন জীবনে এই নিয়ম চলবে না। আমি যতটা ঠেলব তাতে সেই জিনিষটা হয় বেশি যাবে নয়তো কম যাবে। এই কম ও বেশি যাওয়াটাকে ঠিক করছে দৈব। এই দৈবটা কোথা থেকে আসছে – *দেবানাং প্রসাদম্*।

সাহেবের কাছে অনেকেই দরখাস্ত করে, কিন্তু সাহেব কয়েকজনের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। এটা কার উপর নির্ভর করে? সাহেবের প্রসাদের উপরে। সাহেবের আগে পেছনে যারা বেশি ঘোরাঘুরি করে তারাই আগে সাহেবের প্রসাদ পায়। দেবতাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, যারা দেবতাদের আগে পেছনে বেশি ঘোরে তারাই দেবতাদের কৃপা পায়। বেলুড় মঠে এসে যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা ভাবছেন আমরা ঠাকুরের কাছে এসে গেছি এবার ঠাকুর আমাদের দেখবেন। এই যদি মনোভাব নিয়ে নেন, তাহলে তাঁরা এই ভাবেই পড়ে থাকবেন, কত জন্ম পড়ে থাকবেন কোন ঠিক নেই, তুমি চেষ্টা যদি না কর তোমার কিছু হবে না। আর চেষ্টা করার পর তোমার কপালে যদি না থাকে, তাহলে তাও কিছু হবে না। কপাল কোথা থেকে আসছে? আমরা বলি পূর্বজন্ম থেকে আসছে। ঠিকই, পূর্বজন্ম থেকেই আসছে, কিন্তু পূর্বজন্মের কৃত কর্মের ফল ঠিক ঠিক তখনই আসবে যখন ঈশ্বর, দেবতা এঁদেরকে সন্তুষ্ট করা হয়। এখানে বাল্মীকি রামায়ণে দেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি। বর্তমানে যুগে আমাদের দেবতা হলেন আমাদের যার যার ইষ্ট দেবতা। কিন্তু তাও দেখা যায় বাড়িতে যদি কোন গোলমাল হয়, অশান্তি, অসুখ বিসুখ, মামলা মকোদ্দমা লেগে থাকে তখন বেশির ভাগ মানুষ নিজের ইষ্টের কাছে না গিয়ে কোন তান্ত্রিকের কাছে ছুটে যায়। আসল কথা হল মানুষ যখন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে কিছু করে তখন এই দুটো, পুরুষকার আর দৈবের ভারসাম্য বজায় রেখে তাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

এইভাবে সীতা হনুমানকে প্রশ্নের মাধ্যমে অনেক কিছু বলে যাচ্ছেন। হনুমান কিন্তু সব শুনে যাচ্ছেন কোন উত্তর দিচ্ছেন না। বলছেন, আমার জন্য শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চয়ই সন্তপ্ত হয়ে আছেন? বলেই বলছেন – হে হনুমান, এমন তো নয় আমাকে শ্রীরামচন্দ্র ভুলে গিয়ে আমার থেকে অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন? সীতা দুটোই জিজ্ঞেস করছেন – এমনতো নয় শ্রীরামচন্দ্র আমার জন্য বড্ড বেশি সন্তপ্ত হয়ে আছেন, আবার এমন তো নয় শ্রীরামচন্দ্র আমাকে ভুলেই গেছেন। **কচ্চিন্নান্যমনা রামঃ কচ্চিন্মাং তারয়িষ্যতি।**।৫/৩৬/২৩ – আমাকে তিনি এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করবেন কি করবেন না? আমি কি শীঘ্রই যুদ্ধে রাবণ আর তার বন্ধু বান্ধবদের বিনাশ দেখতে পারব কি পারব না? প্রথম প্রশ্ন শুরু করেছেন শ্রীরামচন্দ্র থেকে তারপর সেখান থেকে আস্তে আস্তে সীতা নিজের উপরে পুরোপুরি চলে এসছেন। সীতার মূল বক্তব্য হচ্ছে – আমি আশা করছি শ্রীরামচন্দ্র যত শীঘ্র লঙ্কায় এসে যুদ্ধ করে এদের বধ করে আমাকে উদ্ধার করবেন।

সীতার যখন সব প্রশ্ন করা শেষ হয়ে গেছে, তখন হনুমান তাঁর সেই বিখ্যাত অঞ্জলী মুদ্রাতে, যেটা হনুমানের সব ছবিতে দেখা যায়, একটা হাঁটু মাটিতে রেখে, অপর হাঁটুটি ভাঁজ করে বুকের কাছে এনে হাত জোড় করে বসে আছেন। কাউকে খুশি করতে, শরণাগতের ভাবকে প্রকাশ করতে আমাদের ভারতবর্ষে দুটো খুব নামকরা মুদ্রা আছে। একটা হনুমান মুদ্রা আরেকটা হল গরুড় মুদ্রা। বিষ্ণুর সামনে গরুড় তাঁর শরীরের উপরের অংশটাকে সামনের দিকে একটু বেঁকিয়ে হাতজোড় করে আছেন। কাউকে বিশেষ করে মালিককে খুশি করার এই দুটো বিখ্যাত মুদ্রা। তবে নিজের বসের কাছে কেউ যদি হনুমান মুদ্রা করে বসে থাকেন তখন সেটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, সেই সব ক্ষেত্রে গরুড় মুদ্রাই চলতে পারে। কাউকে কিভাবে খুশি করতে হবে এগুলো আমাদের শাস্ত্রেই বর্ণনা করা আছে। কোম্পানীর মালিক, মন্ত্রী, আমলাদের খুশি করতে গরুড় মুদ্রা আর সন্ন্যাসীদের খুশি করতে হনুমান মুদ্রা।

হনুমান এখন এইভাবে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে বলছেন – হে দেবী! শ্রীরামচন্দ্র জানেনই না যে আপনি লঙ্কায় বন্দীনি হয়ে আছেন। তিনি যদি জানতে পারেন যে, আপনি লঙ্কায় আছেন, তখন এক সময় ইন্দ্র যেভাবে দানবদের মাঝখান থেকে শচীকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন, ঠিক তেমনি যে করেই হোক

আপনাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে চলে যাবেন। আপনি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকতে পারেন, এই নিয়ে আপনি আর কোন চিন্তা করবেন না। শ্রীরামচন্দ্র যে করেই হোক এই সমুদ্রকে লঙ্ঘন করে লঙ্কার ভূমিতে পদার্পণ করে এই লঙ্কাভূমিকে রাক্ষস শূন্য করে দেবেন।

এইভাবে সীতাকে অভয় ও উৎসাহ প্রদান করে হনুমান বলছেন – হে সীতে! শ্রীরামচন্দ্র আপনাতে এতই অনুরক্ত আর আপনাকে এমনই ভালোবাসেন যে, তিনি রাত্রে কখন নিদ্রা যান না। সব সময় আপনার কথাই চিন্তা করতে থাকেন। যদি কখন চোখের দুটি পাতা এক মুহূর্তের জন্য জুড়েও যায় তখনই তিনি 'হা সীতা! হা সীতা!' বলতেই চোখের দুটো পাতাই আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি শ্রীরামচন্দ্রের দৃষ্টি কোন সুন্দর জিনিষ চলে আসে, যেটা আপনার প্রিয়, বা আপনার স্মৃতিজড়িত কোন বস্তু তিনি দেখে ফেলেন তখনই তিনি 'হা প্রিয়ে! হা প্রিয়ে!' বলে অধৈর্য হয়ে ওঠেন। এই সব বলে হনুমান বলছেন – এখন আর কোন চিন্তা নেই এবার সব ব্যবস্থা করা হবে। হনুমানের মুখে শ্রীরামচন্দ্রে কথা শুনে সীতার অন্তরে যে প্রচণ্ড শোকতাপ জমে ছিল সেটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল।

আগেকার দিনে মেয়েদের যখন বিয়ের পর নতুন শ্বশুর বাড়ি আসত তখন কিছু দিন যেতে না যেতেই নিজের বাপের বাড়িতে খবর পাঠাত যে বাবাকে বল আমাকে এসে শিগ্‌গিরি নিয়ে যেতে তা নাহলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে দেব। এতক্ষণ সীতার অন্য ধরণের একটা কষ্ট হচ্ছিল, এখন যেমনি হনুমানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের খবর সব পেয়ে গেছেন, তখন আর সীতাকে সামলান যাচ্ছে না। বলছেন তুমি যে করেই হোক শ্রীরামচন্দ্রকে বল আমার জন্য যেন খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা ব্যবস্থা করেন। হে হনুমান! আমার আর কোন গতি নেই, আর কদিন পরে রাবণ আমাকে কেটে খেয়ে নেবে, তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে বল আমাকে যে করেই হোক এখান থেকে নিয়ে যেতে।

সীতার এত কাতরোক্তি শুনে হনুমান বলছেন 'হে দেবী! আপনি এত চিন্তা করছেন কেন! আপনি আমার পিঠে বসবেন, আর আমিও এক্ষুণি আপনাকে নিয়ে যেভাবে এখানে এসেছি ঠিক সেইভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাব'। হনুমানের এই উক্তিকে অবলম্বন করে মাকবুল ফিদা হোসেন একটা খুব বিতর্কিত ছবি এঁকেছিলেন, পরের দিকে যে ছবি নিয়ে অনেক বাগবিতণ্ডা ও মামলা মকোদ্দমা হয়েছিল। আসলে ফিদা হোসেন যত বড় শিল্পীই হয়ে থাকুন না কেন, এইভাবে একটা মিথ্যা কল্পনাকে আশ্রয় করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে আঘাত দিয়ে তাদের দেবী দেবতাদের অশ্লীল ছবি আঁকাটা কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই উচিৎ নয়। মহম্মদের জীবনের কোন ঘটনাকে নিয়ে ফিদা হোসেনের এই ধরণের ছবি আঁকার কোন সাহসই হবে না। হনুমান সীতাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন মাত্র, আসল ঘটনার দিকে না গিয়ে সেটাকে নিয়েই একটা কুৎসিৎ ছবি আঁকার প্রেরণা তিনি পেয়ে গেলেন, হনুমানের পিঠে সীতা বসে আছেন, আর সীতার শরীরে কোন বস্ত্র নেই। সীতা, যাঁকে ভারতের কোটি কোটি মানুষ জননীর সিংহাসনে বসিয়েছে, আপামর মানুষের কণ্ঠ যাঁকে মা বলে ডাকছে, সেখানে এভাবে সেই সীতা মাঈয়াকে নিয়ে একটা অশ্লীল ছবি কেউ আঁকতে পারে ভাবা যায়! এখন যদি এই নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে যায় তখন সে হয়ে যাবে সাম্প্রদায়িক লোক। আমাদের বুদ্ধিজীবিদের কোন বোধ নেই, কোন চিন্তন নেই বলে আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে নিয়ে এই ধরণের বিকৃত শিল্প বেড়েই চলেছে।

যাই হোক, হনুমান এখন থেকে থেকেই খুব উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছেন। মা! আপনার চিন্তা কি, শুধু আপনাকে কি, পুরো লঙ্কাকেই আমি পিঠে নিয়ে সমুদ্রকে লাফিয়ে চলে যাব। বার বার হনুমান বলছেন – আপনি আমার কথাকে উপেক্ষা করবেন না, আপনি আমার পিঠে বসুন, এক্ষুণি আমি আপনাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমি যেভাবে এখানে ঢুকেছি, আমাকে যেমন কেউ দেখতে পায়নি, ঠিক সেই ভাবেই আমি আপনাকে নিয়ে বেরিয়ে যাব, আপনি শুধু আমার পরাক্রম দেখে যান।

এই সব শুনে সীতার মনে প্রথমে একটু আনন্দ হয়েছে। এত দিন সীতা কোন আশার আলো পাচ্ছিলেন না, এখন তাও একটা উপায় এসেছে লঙ্কার এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার। আনন্দ

হওয়া সত্ত্বেও সীতা হনুমানকে বলছেন – হনুমান! তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কি করে বলছ! তোমার এই সব কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে – **তদেব খলু তে মন্যে কপিত্বং হরিযুথপ।**।৫/৩৭/৩১। বানররা স্বভাবতই একটু বেশি চঞ্চল, চপল হয়, তোমার এই কথাতে সেই চঞ্চলতা, সেই চপলতারই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তুমি আমাকে পিঠে বসিয়ে নিয়ে যাবে কি করে? মানে সীতা বলতে চাইছেন, হনুমানের শরীরের উপরে যে সীতা বসবেন সেটা বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ হনুমান যখন লঙ্কা আসার সময় সমুদ্রের উপর দিয়ে লাফ দিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর শরীরটা পাহাড়ের মত বিশাল করেছিলেন, ঐ বিশাল শরীরের উপরে সীতা কি ধরে বসবে, কারণ সীতার শরীর তো ছোট্ট। হনুমান তো মুডের উপরে বলে দিল চলুন, আমার পিঠে বসিয়ে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

হনুমান কিন্তু এখন খুবই ছোট্ট শরীর ধারণ করে সীতার সামনে বসে আছেন। সীতা ভাবছেন, হনুমান এই ছোট্ট শরীর নিয়ে কোন রকমে লুকিয়ে টুকিয়ে এখানে এসে গেছে। সীতা তাই বলছেন, তোমার তো এইটুকু ছোট্ট শরীর, তোমার থেকে আমার শরীর কত বড়, তুমি আমাকে কি করে পিঠে বসিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছ। তখন হনুমান তাঁর নিজের স্বরূপ সীতাকে দেখাতে শুরু করলেন। ছোট্ট শরীরটাকে সামান্য একটু বড় শরীর করেই হনুমান এই গাছ থেকে সেই গাছ, সেই গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে ঝাপিয়ে বেড়াতে লাগল। তাও হনুমান পাহাড়ের মত আকার ধারণ করেননি। এবার তিনি ক্রমশ নিজেকে বড় করতে থাকলেন, বড় করতে করতে যখন পুরো পাহাড়ের মত শরীরে করে নিয়েছেন তখন হনুমান বলছেন – মা, এইবার দেখুন আমাকে, আমি যদি চাই পুরো লঙ্কাকেই উপড়ে নিয়ে চলে যেতে পারি।

সীতা তখন বলছেন – হ্যাঁ হনুমান! আমি তোমার ক্ষমতা বুঝতে পারছি, কিন্তু তুমি যে তীব্র গতিতে আমাকে নিয়ে যাবে, এই বেগ সম্বন্ধে আমার তো কোন অভিজ্ঞতা নেই, এই বেগে যদি আমাকে নিয়ে যাও তাহলে আমি সেই বেগকে সামলাতে পারব না, আমার তো মুর্ছা হয়ে যাবে। খুব উঁচু বাড়ির ছাদের কার্ণিশের কাছে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকালে মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে, অনেকের তো মাথা ঘুরতে থাকে। ছোট বাচ্চাদের যদি দু হাত ধরে জোরে ঘোরায় তখন ওরা ভয়ে চেঁচাতে শুরু করে। সীতাও অভ্যস্ত নয় অত বেগে চলার। ভারতে যখন প্রথম রেলগাড়ি চালু হয়েছিল তখন সাধারণ বগিগুলোর দরজা তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হত, সেকেণ্ড ক্লাশ আর ফার্স্ট ক্লাশে তালা লাগান থাকত না, সেইজন্য সাধারণ বগি গুলোকে ক্যাটেল ক্লাশ বলা হত, গরু ছাগলকে যেমন দরজা বন্ধ করে রাখা হয় সাধারণ ক্লাশের লোকগুলোকে ট্রেনের বগির মধ্যে আটকে রাখা হত। তার একটাই কারণ, ট্রেনের যে গতি এই গতি সম্পন্ন কোন যান ভারতে ছিল না, সাধারণত রথ, আর ঘোড়ার গাড়ি নয়তো গরুর গাড়িই ছিল একমাত্র যান পরিবহন। ট্রেনের গতিতে সাধারণ মানুষ অভ্যস্ত ছিল না, ভয়ে যাতে বেরিয়ে এসে ছিটকে পড়ে না যায় তাই কম্পার্টমেন্টের দরজা গুলোকে তালা দিয়ে রাখা হত। সীতা তাঁর বোধ বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছেন যে হনুমান কি প্রচণ্ড বেগে লাফ দিয়ে সমুদ্র পার হবেন, তাই বলছেন – হনুমান তুমি যখন ঐ বেগে যাবে তখন আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারব না, মুর্ছিত হয়ে তোমার পিঠ থেকেই হয়তো পরে যাব, আর সমুদ্রের হিংস্র প্রাণীরা আমাকে খেয়ে নেবে।

সীতা এরপর বলছেন – দ্বিতীয় যেটা তা হল, তুমি একা যেভাবে আসার এসেছ। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় একজন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ, তাই দেখে রাক্ষসরা তোমাকে সন্দেহ করবে। তখন লঙ্কার যত রাক্ষস আছে, সব তোমার পেছনে তাড়া করবে। তোমার পিঠ যদি শক্ত করে ধরেও রাখি, কিন্তু অত গুলো রাক্ষস আমার পেছনে তাড়া করে আসছে, ঐ দেখে আমি ভয়েই নীচে পড়ে যাব। সেই সময় তুমি যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করে দাও, তখন যুদ্ধে কে জিতবে কে হারবে আগে থেকে যুদ্ধের পরিণামের কথা কিছুই বলা যায় না। রাক্ষস গুলো যদি সবাই মিলে হুঙ্কার দিয়ে উঠে সেই হুঙ্কারেতেই তো আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে, তখন তোমার সব চেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে যাবে। সীতার প্রাণ খুব কোমল ছিল। সীতা বলছেন, এমনও হতে পারে আমি রাক্ষসদের হাতে ধরা পরে গেলাম, আর তারপর রাবণ আমাকে

এমন গুপ্ত স্থানে রেখে দিল, এখন যাও বা একটা জায়গায় খুঁজে পাওয়া গেছে, তখন আর খুঁজে পাওয়ারও কোন আশা থাকবে না। সীতা একটার পর একটা যুক্তি দেখিয়ে যাচ্ছেন।

এই সব যুক্তি দেখিয়ে সব শেষে সীতা হনুমানকে বলছেন – তবে কি জানো হনুমান, তোমাকে আমার মনের আসল ভাবটা বলছি – **ভর্তুর্ভক্তিং পুরস্কৃত্য রামদন্যস্য বানর। নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানোরত্তম।**।৫/৩৭/৬২ এটাই হচ্ছে সীতার মূল কথা। ঠাকুরও এই কথা উল্লেখ করছেন। – *ভর্তুভক্তিং পুরস্কৃত্য*, আমার যিনি ভর্তা, শ্রীরামচন্দ্র, তাঁর অনুমতি ছাড়া – *নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং* – অন্য কোন পুরুষকে আমি নিজে থেকে স্পর্শ করব না। রাবণ যে আমাকে স্পর্শ করে নিয়ে এসেছিল, সেতো আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে এসেছে। সেখানে আমার কোন দোষ ছিল না, সেটা *বলাৎ*, জোর করে রাবণ আমাকে স্পর্শ করেছে। তুমি যাইই হও না কেন, আমার কাছে তুমি পর পুরুষ। ভর্তা মানে যিনি ভরণ পোষণ করেন, ভাতার কথাটাও ভর্তা থেকে এসেছে, আবার ভরত শব্দও এখান থেকে এসেছে, ভরত যা, ভাতারও তাই আবার ভর্তাও তাই। আমার যিনি ভর্তা, যিনি আমার ভরণ পোষণ করেন, সেই শ্রীরাম ছাড়া আর অন্য কোন পুরুষের স্পর্শ আমি নিজে থেকে করতে পারিনা।

এতক্ষণ সীতা লৌকিক যুক্তির অবতারণা করছিলেন, সাধারণ যুক্তি কি ছিল – তুমি অত বেগে যাবে তাতে আমি মুর্ছিত হয়ে পড়ে যাব, তার আগে রাক্ষসরা আমাকে দেখে নেবে, তারা আক্রমণ করবে, আমি ভয় পেয়ে যাব, ভয়ে মরে যেতে পারি, পড়ে যেতে পারি, মরে গেলে সব শেষ, রাক্ষসদের হাতে ধরা পরে গেলে রাক্ষসরা তখন আবার কোথায় রেখে দেবে, হয়তো আরও গুপ্ত স্থানে রেখে দেবে সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করা আর কোন সম্ভবনাই থাকবে না। কিন্তু আসল যুক্তিটা হচ্ছে নিজের প্রাণ রক্ষা করার জন্যও আমি কিন্তু পর পুরুষের স্পর্শ করব না।

খ্রীশ্চানদের একজন মহিলা সেন্ট ছিলেন, নাম ছিল সেন্ট তেরেসা, খ্রীশ্চানদের খুব বিরাট নামকরা সেন্ট। একবার সেন্ট তেরেসাকে জেলে বন্দী করা হয়েছিল। জেলে গিয়ে জেলের এক রক্ষীর সাথে খুব বন্ধুত্ব করতে থাকেন, ভাই ভাই করে তাকে খুব ভালো করে আদর যত্ন করতেন। এই ভাবে কয়েক দিনের মধ্যে সেন্ট তেরেসা এই রক্ষীর বিশ্বাসভাজন হয়ে যায়। সেও এখন যখন তখন পাহারাটা শিথিল করে দিয়েছিল। কখন সে অসাবধান হয়ে জেলের দরজা খোলা রেখে দেয়। এই রকম এক অসাবধান অবস্থায় দারোয়ানকে বোকা বানিয়ে সেন্ট তেরেসা জেল থেকে পালিয়ে যায়। সেন্ট তেরেসা তো পালিয়ে গেল, কিছুক্ষণ পরেই জানা যাবে সে পালিয়েছে। তারপর সেই দারোয়ানের কি অবস্থা হবে, হয় তার গর্দান যাবে নয়তো চাকরীটা চলে যাবে, কারণ তার দায়ীত্ব ছিল সেন্ট তেরেসাকে পাহারা দেওয়ার। যে সন্ন্যাসী মহিলা নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ভাই ভাই বলে একজন নিরপরাধ লোককে ফাঁসিয়ে দিতে পারে তার প্রতি কারুর শ্রদ্ধা আসবে? কিন্তু এখানে সীতাকে অন্যায় ভাবে বন্দিনী করে রাখা হয়েছে, মুক্তির পথ হাতের মুঠোয়। তবুও তিনি সেই সুযোগকে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। ধর্মের পথ থেকে আমি সরব না। কি ধর্ম? পতিব্রতা ধর্ম, পর পুরুষকে আমি স্পর্শ করব না। তোমরা যদি এসে আমাকে না মুক্ত করতে পার তাহলে রাবণ আমাকে এসে কেটে দেবে, কাটুক, আমি কিন্তু কখন আমার ধর্ম থেকে সরব না। এইজন্যই সীতা আজও দেবীর সিংহাসনে বসে আছেন। আমরা এর আগে আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনি এই সব কিছুকে তোয়াক্ক করেন না, তাঁর পুরো শক্তি আসে আধ্যাত্মিক সত্তা যিনি আছেন তাঁর কাছ থেকে। যাঁরা ধার্মিক পুরুষ তাঁদের শক্তি কিন্তু পূজো অর্চনা থেকে আসে না, তাঁদের শক্তি আসে মূল্যবোধ থেকে। এখানে সীতার মূল্যবোধ কি? আমার প্রাণ চলে যায় যাক, কিন্তু আমি নিজে থেকে পর পুরুষের স্পর্শ করব না।

মূল্যবোধ এক এক জনের এক এক রকম হতে পারে। সীতা মরে যাবেন তবু তিনি অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করবেন না, তাঁর কাছে বেঁচে থাকাটা বেশি মূল্যের নয়, আবার মহাভারতে দেখা যায় বিশ্বামিত্রের কাছে বেঁচে থাকাটাই সব থেকে বড়। একবার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, কোথাও কিছু খাবার

নেই। বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত হয়ে রয়েছেন, কিছু না খেলে এবার মরতেই হবে। তিনি তখন এক চণ্ডালের বাড়ি থেকে কুকুরের মাংস চুরি করে আনছেন। চণ্ডাল দেখছে, আমি এক নিকৃষ্ট জাতি, সেই নিকৃষ্ট জাতির বাড়ি থেকে কুকুর যাকে স্পর্শ করলেই স্নান করতে হয় সেই কুকুরের মাংস তাও আবার তার পাছার মাংস, পেছনের ঠ্যাং চুরি করছে, এ কে! তারপর চণ্ডাল ভালো করে দেখে বিশ্বামিত্র ঋষি, দেখে চণ্ডাল বলছে 'আমি অধম, কুকুর আমার থেকে অধম, কুকুরের যে পাছা সেটা আরও অধম, আপনি একজন ঋষি হয়ে এত নীচ কাজ করছেন'? বিশ্বামিত্র তখন বলছেন, 'না, আমার কাছে প্রাণ বাঁচানই প্রধান'।

এরপর বাড়িতে এনে মাংসকে পুড়িয়ে খাওয়ার আগে ইন্দ্রাদি দেবতাদের অর্পণ করে বললেন 'আজকে এই কুকুরের মাংসই তোমাদের উৎসর্গ করছি'। ইন্দ্র দেখছে 'বাপরে, কুকুরের মাংস খেতে হবে', বলেই তাড়াতাড়ি করে নেমে বিশ্বামিত্রকে বলছেন 'দাঁড়ান দাঁড়ান এই জিনিষ আপনি আমাদের নিবেদন করবেন না'। তখন সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মাংস পাল্টে গিয়ে অন্য ভালো জিনিষের মাংস হয়ে গেল আর বৃষ্টি নেমে এল। এটাই হচ্ছে ঋষির শক্তি। বিশ্বামিত্রের এই শক্তির উৎস আধ্যাত্মিকতা। এখন সীতার যদি এই রকম পরিস্থিতি হত? উনি বলতেন, আমি প্রাণ দিয়ে দেব তবুও আমি কুকুরের মাংস ছোঁব না। বিশ্বামিত্রকে দিলে তিনি বলতেন কেন খাবো না, নিয়ে এস কুকুরের মাংসই। বিশ্বামিত্র সেটা নিয়েই আগে ইন্দ্রকে ডাকতেন, তুমি আমার নিজের লোক, এসো আমরা দুজনে বসে ভাগাভাগি করে খাই, আর আমার আগে তুমিই খাওয়া শুরু কর। ইন্দ্র বাপ বাপ বলছেন আমার লাগবে না, আমাকে ক্ষমা করুন। তাহলে সীতা আর বিশ্বামিত্রের মধ্যে কে বড়? বাল্মীকি রামায়ণে আধ্যাত্মিকতার কোন চর্চা নেই এখানে ধর্ম, অর্থ আর কামকে নিয়েই তিনি এগিয়ে গেছেন, এখানে মোক্ষের কোন স্থান নেই। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে ধর্ম আর মোক্ষ এই দুটোকেই চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। মোক্ষ মানেই যেখানে চৈতন্যের শক্তি, এই শক্তি যখন এসে যায় তখন জিনিষটা অন্য রকম হয়ে যায়। আর যেখানে ধর্মকে নিয়ে চলে তখন এই জিনিষটাই হয়, আমার প্রাণ যায় যাক, আমি মাথা নোয়াব না। আমাদের দেশে যখন মুসলমানরা ধর্মান্তরিত করতে শুরু করেছিল তখন তারা হিন্দুদের গিয়ে বলত, হয় গরুর মাংস খাও, আর তা নাহলে গলা কেটে দেব। হিন্দুরা বলত তুমি আমার গলা কেটে দেবে তো দাও, আমি গরুর মাংসও খাব না, আর মুসলমানও হব না। হিন্দুদের মধ্যে আগে ধর্মের এই ভাবটা প্রবল ছিল। তবে ধর্মের এই ভাব কয়েকটি মুষ্টিমেয় জিনিষের উপরেই ছিল, আমি হিন্দু ধর্ম ছাড়ব না, আমি গরুর মাংস খাব না, এর বাইরে আর কিছু ভাব নিতো না। আমি সত্য কথা বলব, আমি চুরি করব না, এই সব মূল্যবোধের ধর্মকে শক্ত করে না ধরার ফলে, যে জিনিষটাকে ধরত সেটাই দৃঢ় হয়ে গেছে। হিন্দু ধর্মটা খুব দৃঢ় হয়ে গেছে, কিন্তু ভারতে মূল্যবোধের খুব অভাব, এই মূল্যবোধের অভাবটাই আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির রূপ নিয়ে ঢুকে গেছে। সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলাকে না মানা, এক অপরকে ঠকান এটা ভারতে একটা জাতিগত দোষে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু গরুর মাংস খাওয়ার ব্যাপারে সব হিন্দুরা পিছিয়ে আসবে। তবে নতুন যে প্রজন্ম আসছে তারা কি করবে বলা মুশকিল। বেশ কয়েক বছর আগেও ব্রাহ্মণদের মুরগীর মাংস খেতে দেখা যেত না, এমন কি মুরগী স্পর্শ করলে স্নান করতে হত। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে মুরগীর মাংস খাওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি ওঠে না। এই মূল্যবোধটা আমাদের চোখের সামনে পাল্টে যেতে দেখেছি। জানিনা অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুরা গরুর মাংস না খাওয়ার ব্যাপারটা কত দিন ধরে রাখতে পারবে।

বাল্মীকি রামায়ণ – ২৭শে জুন ২০১০

এর আগেও অনেকবার বলা হয়েছে যে, বাল্মীকি রামায়ণের বাইরে যত রামকথা ভারতে প্রচলিত আছে তার মধ্যে এমন অনেক কিছু কাহিনী আছে যেগুলো বাল্মীকি রামায়ণে নেই। বাল্মীকি রামায়ণে নেই বলে তাতে কিছু যায় আসে না, বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ যেটাকে যেভাবে জানে তখন ধরে নিতে হবে সেটাই ঠিক। যেমন অনেক রামায়ণে দেখানো হয়েছে গৌতম মুনির অভিশাপে অহল্যা পাথর হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে অহল্যা পাথর হচ্ছেন না, বাল্মীকি অহল্যাকে অদৃশ্য রূপে দেখাচ্ছেন,

বায়ু রূপে বা ছাই হয়ে গেছেন। ঠিক তেমনি আমরা অনেক রামায়ণে লক্ষ্মণ রেখার উল্লেখ পাই, লক্ষ্মণ সীতার চারদিকে একটা রেখা বা দণ্ডি কেটে দিয়ে সীতাকে বলছেন আপনি এই রেখার বাইরে যাবেন না, এটাকেই বলা হচ্ছে লক্ষ্মণ রেখা। বাল্মীকি রামায়ণে লক্ষ্মণ রেখার কোন উল্লেখ আমরা পাই না। আমাদের উদ্দেশ্য ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানা। বাল্মীকি রামায়ণে এমন কিছু কথা শুনব যেটা আমরা এর আগে শুনিনি, আবার আমরা যে জিনিষগুলো এত দিন শুনে এসেছি, সেই জিনিষগুলো এখানে নেই। তার জন্য কোন সমস্যা হয় না। ঐতিহাসিক তথ্য একটা দিক আবার ভাবরাজ্য অন্য একটা দিক। সেইজন্য এইগুলোকে কখনই এক করে দেখা উচিৎ নয়। যিনি ইতিহাসের ব্যাপারে আগ্রহী তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নাম রামকৃষ্ণ কে দিয়েছিলেন এটা তার কাছে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ, কিন্তু যিনি ভাবরাজ্যের পথিক, ঠিক ঠিক ভক্তের কাছে রামকৃষ্ণ নাম কে দিয়েছিলেন এগুলোর কোন গুরুত্ব তাঁর কাছে নেই, আদপে তাঁর রামকৃষ্ণ নামই ছিল কিনা এই নিয়েও তাঁদের কিছু আসে যায় না। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এনারা হচ্ছেন এক একটি ভাবের ভাবমুর্তি। আমরা প্রত্যেকে সবাই একটা বিশেষ ভাবের প্রতিরূপ, আমি একটা ভাবকে প্রকাশ করছি, তিনি আরেকটা ভাবের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণও একটা ভাবকে প্রকাশ করছেন। যখন সেই ভাবটাকে আমি চাইছি তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলে আদপে কেউ ছিলেন কিনা তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ এনারা আর ব্যক্তি বিশেষ নন, এনারা প্রত্যেকেই এক একটি ভাবের প্রতিমুর্তি। এখন এই ভাবের মধ্যে যখন আমরা ঐতিহাসিক তথ্যগুলো খুঁজতে শুরু করব তখন সেই তথ্য কখনই মিলবে না। যদি মিলেও যায় খুব ভালো আর না মিললেও কোন ক্ষতি নেই। এখন শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম যজ্ঞ থেকে হয়েছিল, না কি তাঁর জন্ম স্বাভাবিক ভাবে হয়েছিল কিংবা দশরথ দত্তক নিয়েছিলেন কিনা, তাতে কাহিনীতে কোন গোলমাল হবে না। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক জন্ম হবে না, স্বাভাবিক জন্ম হলে কাহিনীটা একটু অন্য দিকে সরে যাবে। কিন্তু তাতেও কিছু ক্ষতি হবে না, কারণ শ্রীরামচন্দ্র হলেন একটা ভাব। শ্রীরামচন্দ্র যখন একটা ভাবের প্রতিমুর্তি হয়ে যান, তখন ভক্তরা তাঁকে নিজের ভাবের দৃষ্টিতে দেখেন।

কথামৃতে এই জিনিষটাকে খুব সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। এক ভক্ত তাঁর ইষ্টদেবতার মুর্তির দিকে ভাব নয়নে তাকিয়ে আছে, ভক্ত দেখছে সেই দেবতার কানের কুণ্ডল দুটো নড়ছে না। ভক্ত তখন বলছে – প্রভু তোমার এই কুণ্ডল নড়ছে না কেন। তখন সে উত্তর পাচ্ছে – তুমি দোলাচ্ছ না বলে দুলছে না। তার অর্থ হচ্ছে, আমি ঠাকুরকে কি দেখছি সেটা ঠাকুরের উপর নির্ভর করে না, পুরোপুরি আমার উপর নির্ভর করছে আমি ঠাকুরকে কি দেখছি। ভাবরাজ্যের যাবতীয় যা কিছু সব ভক্তের উপর নির্ভর করে। আধ্যাত্মিক জগতে Objective reality পুরোপুরি subjective reality হয়ে যায়।

এই ব্যাপার গুলো সবার পক্ষে ধারণা করা খুব কঠিণ হয়ে যায়। ঠাকুরেরও ক্ষমতা ছিল না যে সব কথা সবাইকে বুঝিয়ে দেবেন। মাঝে মাঝে নরেনের উপর এতো রেগে যেতেন যে বলতেন – শালা, তুই আর আসবি না এখানে, আসিস কেন যদি আমার কথা নাই মানিস। নরেনও জবাব দিচ্ছে – বাঃ, আপনার কাছে এলে আপনার সব কথাই মানতে হবে নাকি। কিন্তু ঠাকুরের একটা জিনিষ ছিল, নরেন মানতে চাইছে না, কিন্তু তিনি নরেনকে এটা মানাতে চাইছেন, তখন হঠাৎ তিনি নরেনকে স্পর্শ করে দিলেন। তার মানে, ঠাকুর একটা শক্তি সঞ্চার করে দিচ্ছেন নরেনের মধ্যে, শক্তি সঞ্চার হওয়াতে নরেনের মনটাই গেল পাল্টে। কিন্তু এই ক্ষমতা তো সবার নেই আর নরেনের মত আধারও কারুর নেই। অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে ভগবানও বোঝাতে পারবেন না, একটা সীমার পর ঠাকুর, যিশু, বুদ্ধ কেউই বোঝাতে পারেন না। ঠাকুর হাজরার উপরে কি প্রচণ্ড রেগে যেতেন, বলতেন, হাজরা এখানকার মত উল্টে দিতে চাইছে। হাজরা ঠাকুরেরই আত্মীয় ছিলেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঠাকুরের ঘরের বাইরের বারান্দায় থাকতেন আর খুব জপ করতেন, নিজেকে খুব বিরাট সিদ্ধ পুরুষ বলে মনে করতেন। এখানকার মত মানে ঠাকুরের মত, ঠাকুর যে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য অবতারের শরীর ধারণ করেছিলেন, সেটাকেই তিনি বলছেন এখানকার মত। তার মানে ঠাকুরের একটা নতুন দর্শন আছে, আর হাজরার মত কুতর্কী সেই নতুন দর্শনকে উল্টে দিতে চাইছে। হাজরা যে জেনেশুনে খুব সচেতন হয়ে এই রকমটি করেছেন তা নয়, হাজরার যত দূর বিদ্যে বুদ্ধি, যে

রকমটি ধারণা তিনি করে রেখেছেন সেই রকমটিই বলছেন। হলধারীও একই জিনিষ করছে, ঠাকুরের কথা মানতে চায় না। একবার তো ঠাকুর ভাবের ঘোরে হলধারীর কাঁধে গিয়ে চেপে বসেছিলেন।

একজন আচার্য তো আর ঠাকুরের মত করে বোঝাতে পারবেন না, তাঁরা যুক্তি দিয়ে যতটা নিয়ে যাওয়া যায় ততটুকুই জিনিষটাকে বোঝাতে চাইবেন। ঠাকুর, স্বামীজীরা ছিলেন আধিকারিক পুরুষ। যাঁরা আধিকারিক পুরুষ হন, তাঁরা যাকে বুঝে নিতেন যে একে এর নিজস্ব উপলব্ধির জন্য বা একে বোঝালে জগতের উপকার হবে, একে বুঝিয়ে কাজ হবে, তখন তাঁরা নানা রকমের কায়দা করে তাকে তাঁর দিকে টেনে নিতেন। ঠাকুর নরেন, রাখালাদি যুবক ছেলেরা যাতে হাতের মুঠো থেকে না বেরিয়ে যায় তার জন্য কত কিছুই না করতেন। আবার অন্য দিকে একজন এসে বলছে – বুঝিয়ে দিক আমাকে কেউ যদি ঈশ্বরকে দেখে থাকেন। ঠাকুর তাকে বলছেন – তার ভারি বয়ে গেছে তোমাকে বোঝাতে। ঠাকুর দেখছেন একে বুঝিয়ে কোন লাভ নেই, বোঝালেও বুঝবে না, একটা দুটো কথাতেই তিনি তাকে বিদায় করে দিচ্ছেন।

ওল্ড টেস্টামেন্টে যিশুও তাই করছেন, সেখানে তিনি বলছেন – একটা উট ছোট একটা ছুঁচের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারবে, কিন্তু একজন বড়লোক স্বর্গের বড় ফটক দিয়ে যেতে পারবে না। সোজা বলে দিলেন তোমার দ্বারা হবে না। এরা সব জাগতিক বুদ্ধি আর চিন্তায় নিমজ্জিত। কচুরীপানায় ভরা পুকুরের জল দেখা যায় না, এদেরও পুরো ব্যক্তিসত্তা জাগতিক চিন্তা ভাবনাতে ঢাকা রয়েছে, ঠাকুর এদেরকে এড়িয়ে যেতেন। যখন দেখতেন একে দিয়ে জগতে আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রচার কাজ হবে, তখন তিনি তাকে নিয়ে দলাই মলাই করতে শুরু করতেন, কি ভাবে একে এখানে মুঠোর মধ্যে রাখা যায়। কেননা অবতারেরও হাতে বেশি সময় নেই, তাঁরও কাল সীমিত, কটি বছর আর বাঁচবেন, এরই মধ্যে কত রকমের লোকজন আসছে, সেই সময়েও যদি আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট হয়ে যায়, তাই ঠাকুর খুব অল্প কয়েকজনকেই বেছে নিলেন। পরে শ্রীমা বলছেন ঠাকুর সব ভালো কটিকে নিজে নিয়ে নিলেন আর আমার জন্য সব পিঁপড়ের সার দিয়ে গেলেন। এক কিলো দুধে পাঁচ সের জল দিয়ে সেটাকে জাল দিয়ে রাবড়ি বানাতে কত কাঠ পোড়াতে হবে আর কত সময় ধরে জাল দিতে হবে! শ্রীমা বলছেন আঁচ দিতে দিতেই সময় চলে যায়।

ভাবরাজ্যের সাধক সবাই হতে পারেনা। অযোধ্যা, বৃন্দাবনে কিছু কিছু এই রকম ভাবরাজ্যের সাধক পাওয়া যায়, এঁদের আবার বলা হয় রসিক। তার মধ্যে অনেকে আছেন নিজেকে সীতা ভেবে শ্রীরামচন্দ্রের সাধনা করছেন। বৃন্দাবনে সবাই নিজেকে শ্রীমতি মনে করেন। বাউলদের মধ্যেও এই ধরণের কয়েক জন উচ্চ ভাবের সাধক দেখা যায়। ভাবরাজ্যে সাধন করতে করতে সাধক যখন অন্য জগতে চলে যায়, সেই জগতের সাথে এই জগতের কোন মিল হবে না। শ্রীরামচন্দ্র একটা ভাবের প্রতীক, বাল্মীকি হচ্ছেন ঐ ভাবরাজ্যের পথিক। তুলসীদাসও শ্রীরামচন্দ্রের আরেকটি ভাবের পথিক। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজের নিজের ভাবরাজ্যের ভাব অনুযায়ী বর্ণনা করছেন। ভাব কোথাও পাল্টাবে না। শ্রীরামচন্দ্র যে একজন মর্যাদা পুরুষোত্তম, মানে তাঁর মুখ থেকে যেটাই বেরিয়ে যাবে সেটাই হবে, তার জন্য আমাকে জঙ্গলেই যেতে হোক, তার জন্য আমাকে বালিবধ করতে হোক, তার জন্য রাবণকে বধ করতে হবে, তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

এখন এর মধ্যে যে ছোট ছোট ঘটনা আছে সেগুলো এক এক রামায়ণে এক এক রকম হবে, কোনটার মধ্যে হয়ত সেই ঘটনা নাও থাকতে পারে। এমন কি বড় বড় ঘটনা যেগুলো আছে, যেমন যজ্ঞ থেকে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়েছে, চৌদ্দ বছর বনবাস, বালিবধ, রাবণবধ, এগুলোকেও অনেকে পাল্টে দিতে পারেন, তাতেও কোন ক্ষতি হবে না। মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম যিনি তিনি সেই রকমই থাকবেন। কিন্তু কেউ এমন লিখে দিল যে শ্রীরামচন্দ্র আদপে জঙ্গলেই যাননি, তখন কিন্তু কাহিনী আর একই রকম থাকবে না, পুরো কাহিনীটাই গোলমাল হয়ে যাবে। এখন কোথাও যদি বলা হয় চৌদ্দ বছর না গিয়ে তিনি সাড়ে তেরো

বছরের জন্য গিয়েছিলেন, তাহলে কিছুই হবে না। কিন্তু তাতেও একটা ছোট্ট সমস্যা হয়ে যাবে, গুহক বলেছিল চৌদ্দ বছর পরে যদি আপনি এসে দেখা না করেন তাহলে চিতায় আমার নিজের শরীরকে আহুতি দিয়ে দেব। ভরতও ঐদিকে বলে রেখেছে চৌদ্দ বছরের মধ্যে যদি আপনি না ফিরে আসেন তাহলে আমি প্রাণ ত্যাগ করে দেব। এখন যিনি শ্রীরামচন্দ্রকে মর্যাদা পুরুষোত্তম রূপে চিত্রিত করতে চাইছেন, যিনি তাঁর কথার খেলাপ কখন করেন না, এখন ঐ চৌদ্দ বছরের হিসেব মতে গুহক আর ভরতের কাছে চৌদ্দ বছরের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে যেতে হবে। যদি গুহকের কথা ভরতের কথাকে রামায়ণে উল্লখ না করা হয় তাহলে ভাবরাজ্যের গভীরতা কমে যাবে। ভাবরাজ্য পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে তার গভীরতার উপর। যতই ঘটনা গুলোকে সন্নিবেশ করা হবে ততই ভাবরাজ্যের গভীরতা পাকাপোক্ত হয়। সীতা রামেশ্বরমে শিবলিঙ্গের পূজা করেছিলেন, এই ঘটনা বাল্মীকি রামায়ণে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য রামায়ণে এই ঘটনা আছে, আর এই ঘটনা জনমানসে খুব গভীর ভাবে বসে আছে যে সীতা শিবলিঙ্গের পূজা করেছিলেন। ভারতের লোকেরা হয় রাজা শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত, না হয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, না হয়তো কালীর ভক্ত, আর এনারা সবাই হচ্ছেন ভাবরাজ্যের ভগবান। বলাই হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন। যখনই এগুলোকে যুক্তি দিয়ে তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে যাবেন তখনই এই ভাবগুলো হারিয়ে যাবে।

বাল্মীকি রামায়ণ একটি উচ্চমানের উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ, যা মহাভারত থেকেও অনেক উঁচু স্তরের, কালিদাসের থেকেও শ্রেষ্ঠ, যদিও কালিদাসের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আবার ভাগবতের সমকক্ষ, অথচ ভারতে ভাগবত যেখানে ঘরে ঘরে পাঠ হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণ সেই তুলনায় ঘরে ঘরে পাঠ হয় না। ভারত বাল্মীকিকে আদিকবির শিরোপা দিয়ে রেখেছে, বাল্মীকি রামায়ণে সব ধরণের রসদ থাকা সত্ত্বেও সেই জনপ্রিয়তা নেই। এর প্রধান কারণ হল বাল্মীকি রামায়ণে মোক্ষকে একেবারেই নিয়ে আসা হয়নি। আর দ্বিতীয় কারণ ভাবরাজ্যের উপর এতটা জোর নেই যতটা জোর অন্যান্য শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে ঐতিহাসিক এবং কাব্যাত্মক ব্যাপারটা অনেক বেশি। ভারতের আপামর সাধারণ মানুষের বাল্মীকি রামায়ণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার এটাই প্রধান কারণ। যতক্ষণ কোন শাস্ত্রে ভাবরাজ্যের মালমশলা না দেওয়া হবে ততক্ষণ ভারত সেই শাস্ত্র গ্রহণ করবে না।

ভাবরাজ্যের আরেকটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমরা অন্যান্য রামায়ণে পাই যেটা বাল্মীকি রামায়ণে কোথাও পাওয়া যাবে না। রামেশ্বরমে সেতু বন্ধন করতে হবে। কোন কিছু নির্মাণ করতে গেলে একটা যজ্ঞ করতে হয়, যজ্ঞ করতে গেলে একজন ব্রাহ্মণের দরকার। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বন্ধন করতে যাচ্ছেন, এখন ব্রাহ্মণের দরকার, এখানে এখন শুধু ক্ষত্রিয় আর বানর, ভল্লুক রূপী সব আদিবাসী, ব্রাহ্মণ কোথায় পাওয়া যাবে। তখন রাবণের কাছে দরবার করা হল, আপনি ব্রাহ্মণ আপনি যদি সেতু বন্ধনের যজ্ঞে ব্রাহ্মণের কাজটা করে দেন। তখন রাবণ এসে পূজো করে দিয়ে গেলেন। কোন একটা রামায়ণে এই ঘটনার উল্লেখ করা আছে।

সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বাল্মীকি রামায়ণ রচিত হয়েছিল। সাড়ে তিন হাজার একটা বিরাট দীর্ঘকাল সময়, এই বিরাট সময়ের ব্যবধানে কত কিছু হয়ে যেতে পারে। যারাই পরে রামায়ণ লিখেছেন সবাই তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে অনেক কিছু কাহিনী তৈরী করে রামায়ণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। স্কন্দ রামায়ণে, অদ্ভূত রামায়ণে এই রকম অনেক কিছু পাওয়া যাবে, অনেক জায়গায় বলা হয়েছে সীতা ছিল শ্রীরামচন্দ্রের বোন। শ্রীরামচন্দ্রের বোন কে ছিল জানা ছিল না, যখন জানা গেল যে নিজের বোনকে বিয়ে করেছেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তিনি জঙ্গলে চলে গেলেন। এটা হচ্ছে বৌদ্ধদের একটা কাহিনী। আবার কোন রামায়ণে দেখান হয়েছে সীতা আসলে ছিলেন রাবণের কন্যা।

তুলসীদাস একদিকে ছিলেন ভক্তিপথের উচ্চ সাধক আবার অন্য দিকে খুব বিরাট মাপের কবি। তিনি এক জায়গায় বর্ণনা দিচ্ছেন, একবার হনুমান দেখছেন তাঁরই মত একজন হনুমান। হনুমান দেখেই চমকে উঠেছেন, ভাবছেন কোন রাক্ষস টাক্ষস হয়তো আমার রূপ ধরে এসেছে। সেই হনুমান তখন আসল হনুমানকে প্রণাম করে বলছে আমি আপনার সন্তান মকরধ্বজ। নিজের সন্তানের কথা শুনেই হনুমানের

মাথা গেল ঘুরে, আমি হলাম বাল ব্রহ্মচারী আমার সন্তান কোত্থেকে আসবে! স্বপ্নেও আমার নারীরূপ দর্শন হয় না। সে তাও বলে যাচ্ছে, না আমি আপনার সন্তান। হনুমান প্রচণ্ড রেগে গেছেন। মকরধ্বজ তখন বলছে – আপনি যখন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করবার জন্য লাফ দিয়েছেন তখন পরিশ্রমের জন্য আপনার শরীরে ঘাম উৎপন্ন হয়েছিল, ঘামটা নির্গত হয়ে যখন সমুদ্রের জলে পড়েছিল, তখন সেই ঘামের একটা ফোঁটা একটা মাছ খেয়েছিল, সেখান থেকে আমার জন্ম। সেই কারণে আমি আপনার পুত্র। এই মকরধ্বজকে নিয়ে তুলসীদাস কি সুন্দর একটা কাহিনীকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ভাবাই যায় না।

এখন লক্ষ্মণ রেখা, রাবণের ব্রাহ্মণ রূপে সেতুবন্ধনে পূজো করা এগুলো মানা হবে কি হবে না? নিশ্চয়ই মানা হবে। এক মতে হয়েছিল অবশ্যই বলা হবে। ঠাকুরও বলছেন একমতে শুকদেবকে বিয়ে করিয়ে ছাড়ল, তার আবার একটা কন্যাও নাকি হয়েছিল। ঠাকুর এটাকে উপহাস করছেন, মানছেন না, কারণ এটা হবার কথা নয়, কারণ শুকদেব ছিলেন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, যিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ তাঁর আবার বিয়ে কি করে হবে আর তাঁর সন্তানই বা কোত্থেকে আসবে। এই হচ্ছে ভাবরাজ্যের ব্যাপার, শ্রীরামচন্দ্রের সব কথা ও কাহিনী একটি মাত্র রামায়ণ গ্রন্থেই পাওয়া যাবে না।

মহাভারতে শ্রীরাধা বলে কেউ নেই, এমনকি ভাগবতেও শ্রীরাধার সেইভাবে কোন সরাসরি উল্লেখ নেই, সেখানে শুধু গোপী গোপী করেই গেছে। শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যে দুটো মূল গ্রন্থ তাতে শ্রীরাধার কোন উল্লেখ নেই। তাহলে যারা বৈষ্ণব, রাধার যারা অনুরাগী, শ্রীরাধাকে ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকে যারা চিন্তাই করতে পারে না, তাদের তাহলে কি হবে? কিছুই হবে না, শ্রীরাধা যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। অথচ জয়দেব গীতগোবিন্দ শ্রীরাধাকেই আধার করে কাব্য রচনা করে গেছেন। কারণ হিন্দুরা কখনই ঐতিহাসিক রাধাকে খুঁজতে চাইবে না, ভক্ত সব সময়ই খোঁজে ভাবের ভগবানকে, সেখানে শ্রীরাধা ছিলেন কিনা, তাঁর স্বামীর কি নাম ছিল, তাঁর বাবার কি নাম ছিল, শ্রীরাধার বয়স কত ছিল, শ্রীকৃষ্ণের থেকে তিনি কত বড় ছিলেন, না কি ছোট ছিলেন, এই সব ব্যাপারে ভক্তের কোন মাথা ব্যাথা নেই। শ্রীরাধা ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি অনুগত ভক্তের পবিত্র ভালোবাসা কি রকম হবে, তার প্রতীক মাত্র। যখন ঈশ্বরের প্রতি পবিত্র ভালোবাসার নিদর্শনকে সামনে নিয়ে আসতে হবে তখন শ্রীরাধাকেই নিয়ে আসতে হবে। এনারা কাল্পনিক কি বাস্তব কোন ঐতিহাসিক চরিত্র তাতে কিছু আসে যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমাও একটা ভাবাদর্শের মূর্ত রূপ।

আধ্যাত্মিকতার শক্তি যখন যে আধারকে আশ্রয় করে তখন সেই আধারই হয়ে যান স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিত্ব। আধ্যাত্মিকতা আসলে অন্তর্জগতের ব্যাপার, এই অন্তর্জগতের শক্তি যখন বাইরে প্রকাশ হবে, তখন সেই প্রকাশই স্বামী বিবেকানন্দ রূপ ধরে আসবে। স্বামী বিবেকানন্দ হলেন সেই আধ্যাত্মিক শক্তির একটা ভাবের প্রতিরূপ, এখন তিনি ১১ই সেপ্টেম্বর ভাষণ দিয়েছিলেন, কি ১২ই জানুয়ারী জন্ম নিয়েছিলেন তাতে সেই ভাবের কিছুই পরিবর্তন হবে না। ভারতের মাটি ভাবরাজ্যের মাটি, তাই এখানে ঐতিহাসিক তথ্যকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যার জন্য আমরা শ্রীরামচন্দ্রের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা ছোটবেলা থেকে যা যা শুনে এসেছি, এখন ঠিক ঠিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গিয়ে সেগুলোর অনেক কিছুই হয়তো মিলবে না, কিংবা কোথাও পাওয়াও যাবে না। তাই বলে এখন যেটা জানছি সেটাকেও অবিশ্বাস করতে হবে না, আবার যেটা শুনে এসেছি তাকেও অবিশ্বাস করে ফেলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় এই ব্যাপারটা আমাদের খুব ভালো করে মাথায় রেখে শাস্ত্রের গূঢ়ার্থকে ধারণা করতে হবে।

এর আগে বাল্মীকি রামায়ণের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। হনুমান সীতাকে প্রস্তাব দিয়ে বলছিলেন – মা, আপনি আমার পিঠে বসুন, আমি সমুদ্র লঙ্ঘন করে এখান থেকে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। সীতা তখন হনুমানের প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে কয়েকটি যুক্তি দিলেও তাঁর একমাত্র যুক্তি হল – হনুমান! শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া আমি কখনই অন্য কোন পর পুরুষকে স্পর্শ করতে পারিনা। রাবণ যে আমাকে স্পর্শ করেছিল, সেটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেছিল, কিন্তু

তোমাকে আমি পেছন থেকে যে ধরব, তখন সেটা আমার নিজের প্রাণ বাঁচার জন্য পর পুরুষের স্পর্শ হয়ে যাবে। মানুষ যখন এই ভাবে কোন একটা আদর্শে দৃঢ় থাকে, আমার ধর্ম আমি ছাড়ব না, তখন তাকে কোন ভাবেই সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা যায় না। আমরা যদি সবাই যে কোন একটা অত্যন্ত সাধারণ ধর্মকেও অবলম্বন করে নিই, যেমন আমি ঠিক করে নিলাম আমি রোজ ভোর পাঁচটায় উঠে সাধন ভজন করব, এবারে আগুন লেগে যাক, ভূমিকম্প হয়ে যাক, ভোর পাঁচটাতেই আমি উঠব, খুবই সাধারণ আদর্শ, যেটা করতে খুব বেশি শক্তি লাগছে না, প্রচুর সময়ও লাগছে না, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে যদি করে যাই, কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের ব্যাক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে। সীতার আদর্শ হল শ্রীরামচন্দ্রকে একবার দেখে নিয়েছি, ব্যাস্, আর কোন পুরুষকে আমি স্পর্শ করছি না। রাবণ এক মাস সময় দিয়ে দিয়েছে, যদি সীতা রাবণকে বিয়ে করতে না রাজী হয় তাহলে সীতাকে কেটে খেয়ে নেবে, তাঁর প্রাণ চলে যাচ্ছে, এদিকে হনুমানের প্রস্তাবে তাঁর লঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে চলে যাওয়ার সুযোগও এসে গেছে, কিন্তু তবুও সীতা তাঁর আদর্শে অবিচল, সেখান থেকে তাঁকে এক চুলও সরানো যাচ্ছে না। যখন এই ধরণের মূল্যবোধে যে কোন মানুষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তিনি দেবতা হয়ে যান, আর যে সমাজে তিনি বাস করেন সেই সমাজের কাছে তিনি মহৎ দৃষ্টান্ত হয়ে যান, সমাজও তাঁদের সংসর্গে পবিত্র হয়ে যায়। সন্ন্যসীদের তাই বলা হয় কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, যখন কেউ সন্ন্যাসীতে সফল হয়ে যান তখন তাঁর বংশ বা কুল পবিত্র হয়ে যায়, আর তাঁর জননী কৃতার্থা হয়ে যান।

সীতাও একটি আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রও ঠিক এই আদর্শ পালন করে জগতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখালেন। রাজধর্মে প্রজার কল্যাণার্থে শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাকে ত্যাগ করে দিলেন, সীতাও জঙ্গলে চলে গেছেন। কিন্তু তারপর যখন শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চলেছেন, তখন সবাই বলছেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে তো স্ত্রীকে দরকার, এখন সীতা বনবাসে, আপনি আরেকটি বিয়ে করুন। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – তোমাদের কথানুসারে সব কিছুই করা হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ আমি আর করছি না, সীতাই আমার একমাত্র স্ত্রী। স্ত্রী না হলে অশ্বমেধ যজ্ঞ কিভাবে করা হবে? সেইজন্য সীতার সোনার মুর্তি তৈরী করা হল, সেই সোনার মুর্তিকে সাক্ষী রেখে যজ্ঞ সম্পাদন করা হল। এটাই শ্রীরামচন্দ্রের এক পত্নী ধর্ম। একটি ছেলের সাথে মেয়ের বন্ধুত্ব ছিল। কিছু দিন পরে শোনা গেলে মেয়েটির সাথে তার বন্ধুত্ব কেটে গেছে। একজন জিজ্ঞেস করছে – কিরে তোর বন্ধুত্ব কেটে গেল কেন? ছেলেটি বলছে – আর বলবেন না দাদা, দেখি মেয়েটির সঙ্গে আরও চার পাঁচটা ছেলের বন্ধুত্ব, আমি জিজ্ঞেস করলাম এগুলো কি হচ্ছে তোমার? মেয়েটি কি উত্তর দিলেন জানেন? বলছে – You are my permanent and they are my temporary. এখন শ্রীরামচন্দ্রকে যখন বিয়ে করতে বলা হয়, তখন তিনি বিয়ে করে সীতাকে বলতে পারতেন – You are my permanent and they are my temporary, কোন প্রশ্নই নেই, শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ে সীতা ছাড়া অন্য কোন নারীর স্থানই নেই। এখন রাজধর্ম চাইছে সীতাকে অযোধ্যা থেকে সরিয়ে দিতে হবে, সীতাকে সরিয়ে দেওয়া হল, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্ত এর পরে বলছেন অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে আরেকটা বিয়ে করতে হবে, এটা শ্রীরামচন্দ্রের পুরোপুরি ব্যক্তিগত ব্যাপার এসে গেছে, এখানে সীতা ছাড়া আর কারুর স্থান নেই, আর অশ্বমেধ যজ্ঞ আমার জন্যই করা হচ্ছে। তখন সোনার মুর্তি করা হল। আবার যখন সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তখন আবার তিনি প্রজাদের কথা ভেবে কিছু বলছেন না। আদর্শই কোন কোন মানুষকে মহৎ করে দেয়। এগুলো প্রথমের দিকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু পরবর্তি কালে সমাজকে এগুলোই ভেতর থেকে শক্তি দেয়। আমাদের ভারতের মায়েরা নিশ্চুপ ভাবে সংসারে স্বামী, সন্তান, শ্বশুড়, শাশুড়ী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের নিঃস্বার্থ সেবা করে যাচ্ছে, ভারতকে নারীজাতির এই মাতৃধর্মই প্রথম থেকে শক্তি দিয়ে যাচ্ছে। এখন নতুন যে প্রজন্ম আসছে তাদের মধ্যে ভারতীয় নারীদের মধ্যে মাতৃধর্ম আদর্শের প্রচণ্ড অভাব, সমাজও ক্রমশ তাই অবনতির দিকে যাচ্ছে, কারুর কিছু করার নেই, সমাজের অবক্ষয় কেউ ঠেকাতে

পারবে না। তবে হাজার হাজার বছর ধরে এইভাবে সমাজকে যেভাবে ভারতীয় নারীরা ধরে রেখেছে এর একটা পূণ্য আছে, সেই পূণ্যের প্রভাবে অত সহজে সমাজ তলিয়ে যাবে না।

এবার হনুমান লঙ্কা থেকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফেরত যাবেন। সীতা তখন হনুমানকে একটা খুব সুন্দর ও প্রচলিত কাহিনী বলছেন। একবার ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্তের মাথায় এক দুর্বুদ্ধি এসেছিল। এই যে শ্রীরামচন্দ্র জঙ্গলে কপর্দক শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন, এনার মধ্যে এমন কি শক্তি আছে যে ঋষিরা এমনকি দেবতারাও শ্রীরামচন্দ্রকে খুব সম্মান করেন! শ্রীরামচন্দ্রের শক্তির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য জয়ন্ত একটা কাকের রূপ ধারণ করে নিয়েছে। দেবতা কিনা তাই নানা রকমের রূপ ধারণ করবার ক্ষমতা আছে। কাকের রূপ ধারণ করে জয়ন্ত এখন সীতাকে বিরক্ত করতে শুরু করেছে। সীতার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ঠোঁট দিয়ে ঠোক্কর দিতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্র তখন বিশ্রাম করছিলেন বলে সীতা তাঁকে বিরক্ত করতে চাননি। কাকটি বারবার সীতাকে ঠোঁট দিয়ে ঠোক্কর দিয়েই যাচ্ছে। সীতার বুকে, ঘাড়ে, শরীরের রক্ত ঝরতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্র একটু পরেই বিশ্রাম সেরে এসে দেখছেন সীতার শরীরের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তিনি আশ্চর্য হয়ে বলছেন – কি হয়েছে, এত রক্ত কেন? সীতা কাকটিকে দেখিয়ে বলছেন – দ্যাখোনা, এই কাকটা আমাকে তখন থেকে ঠোক্কর দিয়ে যাচ্ছে। কাকেরা কখন কখন মানুষকেও আক্রমণ করে। একবার এক টাক মাথা লোক একটা কাকের বাসা ভেঙ্গে দিয়েছিল, তখন কাক আর কাকী টাক মাথা লোক দেখলেই সোজা শাঁ করে টাকে আক্রমণ করত। বানরদের মধ্যেও এই রকম প্রতিশোধ নেওয়ার স্বভাব দেখা যায়। হাতি তো কোন দিন ভুলবে না। হাতির যদি কেউ ক্ষতি করে তিরিশ বছর পরেও সে মনে রাখবে, তাকে দেখলেই সে ভুল করবে না যে, এ আমার ক্ষতি করেছিল। শ্রীরামচন্দ্র তখন যে কুশাসনে বসেছিলেন, সেই কুশাসন থেকে একটা কুশ নিয়ে মন্ত্রসিক্ত করে সেটাকে ব্রহ্মাস্ত্রে রূপান্তরিত করে দিলেন। ব্রহ্মাস্ত্র হল দিব্যশক্তি পরিচালিত অস্ত্র। মনে করা যাক আমার কাছে ব্রহ্মাস্ত্র আছে, এখন একটা কলম নিয়ে সেটাকে ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রে অভিষিক্ত করে ছুঁড়ে দিলাম, এই কলমটাই এখন ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে যাবে। ব্রহ্মাস্ত্র যে সব সময় তীর নিয়েই ছুঁড়তে হবে তার কোন মানে নেই। আসলে ঐ শক্তিটাই হচ্ছে প্রধান। যাঁরা ব্রহ্মাস্ত্রের অধিকারী ছিলেন তাঁরা সাধারণত একটা বিশেষ তীর নিয়ে সেটাকে অভিষিক্ত করে ছেড়ে দিতেন।

শ্রীরামচন্দ্র এখন একটা কুশ ঘাসকে ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রে অভিষিক্ত করে ছেড়ে দিয়েছেন, কুশ ঘাসটা একটা ব্রহ্মাস্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এখন যে কাককে উদ্দেশ্য করে শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছেন, সেই কাককে এই ব্রহ্মাস্ত্র আর ছাড়বে না, কাকের আর কোন নিস্তার নেই। কাক এখন পালাতে শুরু করেছে, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র তার পিছন ছাড়ছে না, কাক তখন তিন লোক পরিক্রমা করে এসে শ্রীরামচন্দ্রের পায়ের কাছে পড়েছে রক্ষা পাওয়ার জন্য। শ্রীরামচন্দ্র তখন বুঝতে পারলেন যে এই কাকটা শয়তানী করছিল। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন – দ্যাখো, ব্রহ্মাস্ত্রতো কখন নিষ্ফল হয় না, এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমাকে আঘাত করবে, এখন তুমি বল তোমার কোন অঙ্গে সে আঘাত করবে। তখন কাক বললে – আমার ডান চোখটাকে সে আঘাত করুক। ডান চোখকে বলা হয় জীবনী শক্তির অভিব্যক্তি। এই ভাবে কাকের ডান চোখটা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল।

সীতা হনুমানকে বলছেন – একটা সাধারণ কাক যখন আমাকে কষ্ট দিয়েছিল, শ্রীরামচন্দ্র সেই কাকের উপরে ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়ে দিয়েছিলেন, আমার প্রতি এমনই তাঁর ভালোবাসা। একজন বন্ধু ঘুমোবার সময় যদি আরেক বন্ধুকে বলে ভাই খুব মশা কামড়াচ্ছে, তখন সেই বন্ধু বলবে – ও কিছু না, পাশ ফিরে মুখ ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়। কিন্তু বাচ্চা যদি মাকে বলে – মা খুব মশা কামড়াচ্ছে। মা সঙ্গে সঙ্গে যত রকমের মশা মারার ওষুধ বেরিয়েছে, ঘরের মধ্যে সব লাগিয়ে দেবে। যে যাকে আন্তরিক ভালোবাসে তার জন্য সে বিশেষ যত্নবান হয়। সীতা সেটাই হনুমানকে বলছেন 'শ্রীরামচন্দ্রের আমার প্রতি কি ভালোবাসাই না ছিল, একটা সাধারণ কাক আমাকে বিরক্ত করছিল বলে তার উপর ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আমি রাবণের এখানে এভাবে নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ে রয়েছি, তিনি কিছু একটা করছেন না কেন'! সীতা অভিমান করেই এত কথা বলছেন। এই অভিমানটাই ভালোবাসার অভিব্যক্তি। পরীক্ষিৎকে যখন

তক্ষক সাপ দংশন করেছিল তখন জনমেজয় রেগে মেগে ঠিক করে ফেলল সর্পযজ্ঞ করে জগৎ থেকে সাপের অস্তিত্বই বিলোপ করে দেবেন। যেখানে ভালোবাসা নেই তখন বলবে – ও কিছু না, ওরকম হয়ে থাকে, ক্ষমা করে দাও। কিন্তু যার প্রতি ভালোবাস আছে তার কিছু ক্ষতি হয়ে গেলে তখন আর ক্ষমা-ফমার কথা আসে না, তার বংশকে নির্বংশ না করা পর্যন্ত থামবে না। আমি আপনাকে ভালোবাসি, আপনাকে কেউ কিছু বলল, আপনি হয়তো তাকে ছেড়ে দেবেন, আমি কিন্তু তাকে ছাড়ব না। এগুলোই ভালোবাসার এক একটা রূপের অভিব্যক্তি। ভালোবাসার আবেগে মনের কি কি ধর্ম হতে পারে, মন কত ভাবে খেলা করে, বাল্মীকি ছিলেন এই সব ব্যাপারে বিরাট মনস্তত্ত্ববিদ্।

এবার হনুমান চলে আসবেন। সীতা তাঁর শরীরে যে যৎ সামান্য অলঙ্কার ছিল সেখান থেকে চূড়ামণি নামে একটি অলঙ্কার শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে হনুমানের হাতে দিলেন। হনুমান তখন খুব ছোট্ট শরীর ধারণ করেছিলেন, কিন্তু চূড়ামণিটি এতই সরু যে ছোট্ট হনুমানের হাতেও ঢুকছে না, তার মানে বাল্মীকি দেখাতে চাইছেন সীতা কত শীর্ণকায় ছিলেন। তাই হনুমান কাপড়ে ঐ অলঙ্কারটাকে বেঁধে নিলেন। হনুমানকে সীতা বলছেন ‘হনুমান তুমি যা কিছু করবে তাতে তোমারই সম্মান বাড়বে, আর শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে সব শক্তি আছে, সেই শক্তি দিয়ে তিনি এসে আমাকে উদ্ধার করুন এটাই আমি চাইব’।

হনুমান ফিরে আসার আগে ভাবছেন, আমি যখন এত দূর চলেই এসেছি, তখন এই সুযোগে ফিরে যাবার আগে যদি কিছু ভালো কাজ আগে থাকতে করে রাখা যায়, তাহলে শ্রীরামচন্দ্রের কাজটা একটু এগিয়ে থাকবে। হনুমান বলছেন – **কার্যে কর্মণি নিবৃত্তে যো বহূন্যপি সাধয়েৎ। পূর্বকার্যাবিরোধেন স কার্যং কর্তুমর্হতি।**।৫/৪১/৫। যখন কোন সঙ্কল্প নিয়ে কেউ একটা কাজ করতে যায়, ঐ কাজটা যখন ঠিক ঠিক হয়ে গেল, তখন অন্য যে অতিরিক্ত কাজগুলো রয়েছে সেই কাজগুলোও যদি সেই অবসরে মূল কাজের ক্ষতি না করে করে নেওয়া হয়, এটাই তখন হয়ে যায় খুব ভালো কর্তার লক্ষণ। আমাকে বাড়ি থেকে বাজারে পাঠান হল মাছ কিনে নিয়ে আসার জন্য। মাছ কেনা হয়ে গেছে, আমি দেখছি এখন আমার হাতে পাঁচ মিনিট সময় আছে, আর কিছু টাকাও বেঁচে গেছে। তখন আমি সেই সময়কে কাজে লাগিয়ে বাড়তি টাকা দিয়ে কিছু আনাজ কিনে নিলাম। হয়তো আমি সচরাচর আনাজ কিনতে বিকেলে আসি, বা আগামীকাল আসব, কিন্তু আমি সেই কাজটা এখন এগিয়ে রাখলাম। এগুলোই খুব বিচক্ষণতার লক্ষণ। হনুমান এখন বিচার করছে, আমার মূল কাজ ছিল সীতাকে খুঁজে বের করে তাঁর সাথে দেখা করা। এই কাজ সমাধান হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে এখান থেকে আমাকে ফিরে যেতে হবে, আমি যদি ফিরে না যেতে পারি তাহলে সমস্যা যা ছিল সেই একই থেকে যাবে। কিন্তু লঙ্কার কোন রাক্ষসই আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। তাই আমি কিছু বাড়তি কাজ করে রেখে যাই। এই বাড়তি কাজটা হনুমান কি মনে করছেন? কিছু রাক্ষসকে যদি আগেই সংহার করে রেখে দেওয়া যায়। এতে একটা কাজ হবে এই যে, রাবণ বুঝে নেবে যে এদেরও শক্তি আছে, এতে কাজটা এগিয়ে থাকবে। যার ফলে শ্রীরামচন্দ্রের কাজটা আরও সহজ হয়ে যাবে।

হনুমান তখন বলছেন – **ন হ্যেকঃ সাধকো হেতুঃ স্বল্পস্যাপীহ কর্মণঃ। যপ হ্যর্থং বহুধা বেদ স সমর্থোঽহর্থসাধনে।**।৫/৪১/৬। এই কথাগুলো গৃহস্থদের পক্ষে খুব মূল্যবান – বলছেন, যে কোন ছোট কাজেও একই ধরণের প্রচেষ্টা লাগাতে হবে তা নয়। এখানে প্রয়োজন সিদ্ধি অনেক বড় ব্যাপার, শ্রীরামচন্দ্রের সেনা এসে রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করবে, এই কার্যটাই একটা বিরাট প্রকল্প, এখানে অনেক ধরণের প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা জড়িত রয়েছে। একটা সাধারণ কাজ যখন করা হয়, যেমন ছেলেকে এখন স্কুলে ভর্তি করতে হবে, কিন্তু তার আগে কত কিছু জোগাড় করতে হয়। লাইন দিয়ে ফর্ম নিতে হবে, তারপর ফর্ম জমা দিতে হবে, কত সার্টিফিকেট সব এ্যাটাস্টেড করে লাগাতে হবে। তারপর ভর্তি হওয়ার পরীক্ষা দেওয়ানো হল, পরীক্ষার পর আশা করছেন ছেলের রেজাল্ট যাতে ভালো হয়। তারপর

এই দাদা, এই নেতা, কমিটির লোককে ধরতে হবে, দাদা দেখবেন ছেলেটার জন্য একটা ব্যবস্থা হয়। এটি অতি সাধারণ কাজ কিন্তু এই সাধারণ কাজের জন্যে পাঁচ রকমের আলাদা আলাদা চেষ্টা চালাতে হবে।

এই সব চিন্তা ভাবনা করতে করতে সীতার ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন হনুমান। রাক্ষসী যারা সীতাকে পাহারা দিচ্ছিল, তখন ওরাও লক্ষ্য করল যে সীতা একটা বানরের সাথে কথা বলছেন। রাক্ষসী গুলো এসে সীতাকে জিজ্ঞেস করছে – ওহে সীতা, আমরা লক্ষ্য করছিলাম তুমি একটা বানরের সাথে কথা বলছিলে, ঠিক করে বলো এই বানর কে ছিল? সীতা আর হনুমান অবধী ভাষায় কথা বলছিল বলে রাক্ষসীরা বুঝতে পারেনি, কারণ ওরা সিংহলী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা বুঝতে পারেনা। সীতা তখন ভয় পেয়ে গেছেন। সীতা তখন বলছেন – **রক্ষসাং কামরূপাণাং বিজ্ঞানো কা গতির্মম।**।৫/৪২/৮ রাক্ষসরা ইচ্ছামত রূপ ধারণ করতে পারে, তাদের কথা আমি আর তোমাদের কি বলব, আমার থেকে তোমরাই ভালো বলতে পারবে। তারপরে বলছেন – **অহিরেব হ্যহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ।**।৫/৪২/৯ সীতা একটা প্রবাদ বাক্য বলছেন, সাপের পা সাপই চিনতে পারে। আসলে সাপের পা হয়না, তাহলে আমরা কি করে বুঝব সাপেরা কি রকম। তাহলে কে বুঝবে? সাপই বুঝবে। মানে সীতা বলতে চাইছেন, যে যে জাতের তারাই তাদের জাতের ব্যাপার বলতে পারে। তার মানে রাক্ষসরা কি করে তা আমি আর কি বুঝব। সরাসরি সীতা বলছেন না যে আমি হনুমানকে চিনি না, ঘুরিয়ে বলছেন। কি করে বিপদের সময় কথার মারপ্যাঁচে প্রতিপক্ষকে কায়দা করতে হয়ে সীতা দেখাচ্ছেন।

একটা বিদেশী কাহিনী আছে, যদিও কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে কাহিনীটা রচিত হয়েছে। সেই কাহিনীতে একজন কমরেড তার নিজের দল কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বিদ্রোহ করে তার অনুগত লোকেদের মধ্যে একটা নতুন ভাষার জন্ম দিয়ে দিল। নতুন ভাষাটা হল, কম্যুনিষ্টরা যখন সন্দেহের বশে তাদের কাউকে ধরত তখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলত – তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তুমি কাজ করনা। সত্যিই কি তুমি কাজ করছ না? সে কিন্তু সত্যিই কাজ করছে না। সে তখন এই ভাষা প্রয়োগ করত 'কি বলছেন, কাজ করা তো আমাদের ধর্ম, আমাদের আদর্শই হচ্ছে কাজ করতে করতে প্রাণ দিয়ে দেওয়া'। এই কথাও বলছে না যে আমি কাজ করব কিনা, আবার এটাও বলছে না যে আমি কাজ করছি না। বলছে আমরা কম্যুনিস্ট, কম্যুনিস্টদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে কাজ করে করে প্রাণ দিয়ে দিতে হবে। এদের যাই জিজ্ঞেস করা হবে তখনই উদ্দেশ্যটা কি আর আদর্শ কি সেইটাই খালি বলতে থাকবে। কিছুতেই এর মুখ দিয়ে কোন কথা আর বার করা যাচ্ছে না, শেষে কোর্টে দাঁড় করিয়ে দিল, সেখানেও সেই একই পদ্ধতিতে বলে যাচ্ছে। হ্যাঁও বলবে না, নাও বলবে না, সবটাই এই ভাবে ঘুরিয়ে বলবে। তারপর এমন হল যে, আস্তে আস্তে ঐ শহরে সবাই এই ভাষাতেই কথা বলতে শুরু করেছে। পুলিশ চোর ধরে বলছে তুমি চুরি করেছ? সে বলছে আমাদের 'এই রাজ্যে চুরি করা সর্বথা অন্যায় কাজ বলে গণ্য করা হয়, কেউ যদি চুরি করে তার জন্য তাকে দণ্ড দেওয়া অবশ্যই উচিৎ, চুরি করা মহা পাপ'। বলছে না যে আমি চুরি করিনি বা চুরি করেছি। যদি বলে তুমি কি একে চুরি করতে দেখেছ? তখন বলছে – চুরি করা মহাপাপ, যদি কাউকে চুরি করতে দেখা যায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হাতে তাকে ধরিয়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। কর্তব্য পালন করেছি কি করিনি সেটা বলছে না। সীতাও ঠিক এই ভাষাতেই বলছেন – রাক্ষসদের মতি গতি রাক্ষসরাই জানে, সাপের পা সাপেরাই জানে, আমি আর কি জানব।

ইতিমধ্যে রাক্ষসীরা রাবণের কাছে খবর পাঠিয়েছে যে একটা ছোট্ট বানর এসে সীতার সাথে দেখা করে কি সব কথা বলছিল, অন্য দিকে হনুমান সীতার কাছ থেকে সরে এসে এবার নিজের আসল রূপ নিয়ে নিয়েছে; এখন সে বিশাল শরীর ধারণ করে লেজ দিয়ে জোরে জোরে মাটিতে আঘাত করতে করতে বলছেন **জয়ত্যতিবলো রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণাভিপালিত।**।৫/৪২/৩৩। সংক্ষেপে হনুমান নিজের পরিচয় দিতে শুরু করেছেন – শ্রীরামচন্দ্রের জয়, লক্ষ্মণের জয়, আমি হলাম সুগ্রীবের দাস, সুগ্রীবের জয়। রাক্ষসদের মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে

বলছেন, আমি হলাম বায়ুপুত্র হনুমান, আমি তোমাদের নাশ করতে এসেছি। হনুমান রাক্ষসদের চ্যালেঞ্জ করছে। এইসব করে, হনুমান অশোকবনের কাছেই যে চৈত্ত প্রাসাদ ছিল, তার বাটিকাতে যত গাছপালা ছিল তার সব ডালপালা ভেঙে তছনছ করতে শুরু করে দিয়েছে।

হনুমান যখন সব ডালপালা ভাঙতে আরম্ভ করেছে তখন হনুমানকে আটকাবার জন্য রাক্ষসদের যত সেনাপতিদের যে যুবক ছেলেরা ছিল, তারা সব এক এক করে হনুমানকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে, এমনকি রাবণের সন্তানরাও একে একে আসতে শুরু করল। এক এক করে আসছে হনুমান তাকে মেরে শেষ করে দিচ্ছে। তারপর রাবণের মন্ত্রীর সাত জন পুত্র যখন আক্রমণ করল তাদেরকেও হনুমান বধ করে দিয়েছে। এগুলো ছিল রাবণকে সঙ্কেতে দেওয়া, দ্যাখো আমাদের কত শক্তি আছে। পরের দিকে দেখা গেছে, যখন শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় চলে এসেছেন তখন রাবণের কাছে দূত পাঠিয়ে সংবাদ দেওয়া হল, হয় সীতাকে ফেরত দাও, তা নাহলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তখন আলোচনা হচ্ছে রাবণের কাছে দূত হয়ে কাকে পাঠানো হবে, যাকে দূত করে পাঠান হবে তার শক্তি চাই, বুদ্ধি চাই, প্রত্যুৎপন্নতা চাই ইত্যাদি। তখন হনুমান আবার এগিয়ে এসে বলছেন আমিই যাবো। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন – না, এটা করতে নেই, একই লোক যদি বারবার দূত হয়ে যায় তাহলে শত্রুপক্ষ ভাববে এদের এই একটাই মাথা। তখন ঠিক করা হল অঙ্গদকে পাঠানো হবে। হনুমান যেমন লঙ্কার ধ্বংস সাধন করেছিলেন, অঙ্গদ ঠিক উল্টো করেছিলেন। অঙ্গদ রাবণের রাজসভাতে গিয়ে বলছেন – দেখুন তো আপনাদের এখানে এমন কেউ শক্তিমান যোদ্ধা আছেন কিনা যে আমার এই পা টাকে নাড়াতে পারে। কেউই যখন নাড়াতে পারল না, তখন রাবণ নিজেই এগিয়ে এসেছে। অঙ্গদ তখন রাবণকে সঙ্গে সঙ্গে আটকে দিয়েছেন, না আপনি এই কাজ করবেন না, আপনি রাজা হয়ে আমার পায়ে হাত দেবেন না। এগুলো হচ্ছে কাব্যের হাসি মজা। এখন একটা যুদ্ধকালীন অবস্থা, যুদ্ধের আবহাওয়াতে মানুষ যাতে অত্যন্ত ক্রুর কর্মা না হয়ে যায়, কেউই রক্তপাত চায়না, সবাই চাইবে আমার নিজের লোক যাতে না মরে। বাল্মীকি রামায়ণে বারবার এই কথা বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের কি পরিণতি হবে, কে হারবে কে জিতবে, এটা একমাত্র ভগবানই জানেন। নিজের লোকও মরতে পারে, এমন কি রাজাও মারা যেতে পারেন।

আকবর যখন দিল্লীর বাদশা ছিলেন, তখনও তাঁর অনেক কাছের লোক, বড় বড় সেনাপতিরা অকারণে যুদ্ধে মারা গেছে। আবুল ফজল, যিনি আকবরনামা লিখেছিলেন, তাকে আকবর প্রচণ্ড স্নেহ করতেন আর বিশ্বাস রাখতেন, আকবরের ছেলে জাহঙ্গীর যখন বিদ্রোহ করেছিল সেই সময় আবুল ফজল মারা গেলে আকবরের এই ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে। খবর পেয়ে আকবর হাউ হাউ করে দরবারে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল। আকবর বলছিলেন – আমার সব কিছু চলে গেলেও এত দুঃখ হত ন, আবুল ফজল চলে যাওয়াতে আমার যা দুঃখ হচ্ছে। বীরবল মারা যাওয়ার সময়ও এই একই অবস্থা হয়েছিল আকবরের। তাই যুদ্ধে কে মারা যাবে কে বাঁচবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। যুদ্ধে আমি জয়লাভ করতে পারি, কিন্তু আমার কত প্রিয়জনের বিয়োগ হয়ে যেতে পারে। তাই দুম্ করে যুদ্ধ কেউই চাইত না, যুদ্ধের আগে অনেকবার দু পক্ষের মধ্যে সঙ্কেত পাঠিয়ে সাবধান করে দেওয়া হত। হনুমানও এই ভাবে রাবণকে সাবধান করে দিচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে বলে দেননি যে, তুমি লঙ্কায় গিয়ে সীতার খোঁজ নেওয়ার পর কিছু রাক্ষসকে বধ করে আসবে। হনুমান তাই বারে বারে বলছেন – সেই দূতই শ্রেষ্ঠ দূত, স্বামী বলে দেননি কিন্তু স্বামীর কোনটা প্রিয় কাজ, কোন্ কাজটা করলে স্বামীর কাজ অনেক এগিয়ে থাকবে, স্বামীর প্রিয় কোন্ কাজটা করতে হয় আর কোনটা করতে নেই যে ভালো মত জানে সেই দূতই শ্রেষ্ঠ দূত। শ্রেষ্ঠ দূতের বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে হনুমান এখন অনেক গুলো কাজ করে রাখছে।

এরপর রাবণের পাঁচ জন সেনাপতি এগিয়ে এসেছে হনুমানের দিকে। ওদের মধ্যে একজন লোহার খুব শক্তিশালী পাঁচটি বাণ এক সঙ্গে হনুমানের দিকে মেরেছে, সেই পাঁচটা বাণ হনুমানের মাথায় গিয়ে বিঁধে গেছে। হনুমানের মাথা থেকে রক্ত বেরোতে আরম্ভ করেছে। সে রক্ত দেখে হনুমান এবারে পুরো

ক্রোধ বৃত্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে প্রচণ্ড রেগে গেছেন, রক্ত মানুষের মনকে খেপিয়ে দেয়। এরপর হনুমানের সামনে আর কোন রাক্ষসই দাঁড়াতে পারছে না। এক এক করে তিনি অনেক রাক্ষসকে বধ করে দিলেন।

রাবণের পুত্র অক্ষকুমার এবার এগিয়ে এসেছে। অক্ষকুমার যখন এগিয়ে এসেছে হনুমান তাকেও বধ করে দিয়েছে। এই অক্ষকুমার মেঘনাদ থেকে বয়সে ছোট ছিল। অক্ষকুমারকে দেখে হনুমানের খুব কষ্ট হয়েছে, আহারে বেচারা – **অবালবদ্ বালদিবাকরপ্রভঃ করোত্যয়ং কর্ম মহন্মহাবলঃ। ন চাস্য সর্বাহবকর্মশালিনঃ প্রমাপণে মে মতিরত্র জায়তে।**।৫/৪৭/২৬। এই ছেলেটি বাল সূর্যের মত তেজস্বী। হনুমান বলছেন – এতটুকু বাচ্চা ছেলে অথচ এখনই কি তেজ এর মধ্যে, একে বধ করে দিতে আমার এতটুকু ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু একে যদি বধ না করে দিই তাহলে এ কিন্তু আমারই নাশ করে দেবেই দেবে। খুব সুন্দর বাল্মীকি লিখছেন – **ন খল্বয়ং নাভিভবেদুপেক্ষিতঃ সমীক্ষতে মাং প্রমুখোহগ্রতঃ।**৫/৪৭/২৯। যুদ্ধ যখন হয় তখন দুই রকমের যুদ্ধ হয়। আমি একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, তাকে আমি এমন মার মারলাম যে, সে আহত হয়ে পালিয়ে গেল, মানে তার ক্ষমতা নেই। কিন্তু অক্ষকুমার সেই ধরণের যোদ্ধা নয়, অক্ষকুমারের যা ক্ষমতা আছে তাতে সে হনুমানকেও মেরে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আবার অক্ষকুমারকে একটা দুটো চড় মেরে দিলাম আর সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে, সেই বালকও সে নয়। এখানে দুজনের মধ্যে একজন বাঁচবে, কেউই বেঁচে ফিরে যাবে না, হয় অক্ষকুমার মারা যাবে নয়তো হনুমান মারা যাবে। এখানে পেছনে ফিরে তাকাবার কোন প্রশ্নই নেই। এই অক্ষকুমার কিন্তু এখানে শুধু কায়দা দেখাতে আসেনি, সে সত্যিই লড়াই করতে এসেছে। আমি যদি না মারি সে আমাকে শেষ করে দেবে। হনুমান তাই প্রথমেই অক্ষকুমারকে ধরে নিয়েছেন, তারপর চারিদিকে ঘুরিয়ে আছাড় মারতেই মারা গেছে। রাবণের কাছে পর পর সব খবর পৌঁছে যাচ্ছিল, এখন অক্ষকুমার মারা যাওয়াতেই রাবণের টনক নড়েছে, এবার তিনি সত্যিই একটু যেন চমকে উঠেছেন।

এরপর মেঘনাদ উঠে দাঁড়িয়েছে। মেঘনাদের আরেক নাম ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রকে একবার সে যুদ্ধে হারিয়েছিল বলে তার নাম ইন্দ্রজিৎ। অশোককাননের কাছেই হনুমান এত কাণ্ড করে যাচ্ছিল। অশোক বাটিকা রাবণের খুব নামকরা প্রমোদ উদ্যান। শ্রীলঙ্কা সরকার এখন রামায়ণের প্রসিদ্ধ এই জায়গা গুলোকে নিয়ে পর্যটন কেন্দ্র বানাচ্ছে। এখন যেখানে অশোকবাটিকা করা হয়েছে, শ্রীলঙ্কা সরকার বলছে এই জায়গাতেই নাকি রামায়ণের বর্ণিত অশোক কানন ছিল। তবে এখানকার মাটি আর আবহাওয়া এমনই যে সুন্দর সুন্দর গাছপালা এখানে আপনা থেকেই হয়, আর যদি যত্ন পায় তাহলে তো আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। রামায়ণে বর্ণিত এই জায়গা গুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য শ্রীলঙ্কা সরকারের একটা পুরো আলাদা ডিপার্টমেন্ট কাজ করে চলেছে।

ইন্দ্রজিৎ ছিল খুব বড় যোদ্ধা। সে এসে চেষ্টা করছে হনুমানকে বধ না করে কোন ভাবে বেঁধে ফেলতে। হনুমান এত ক্ষিপ্র যে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও হনুমানকে কিছুতেই ধরতে পারছে না। আবার অন্য দিকে হনুমান চেষ্টা করছে কিভাবে ইন্দ্রজিৎকে ধরা যায়। হনুমানও কিছুতেই ইন্দ্রজিৎকে ধরতে পারছে না। ইন্দ্রজিৎ যখন দেখছে হনুমানকে কিছুতেই ধরা যাবে না, তখন সে একটা পর একটা দিব্যাস্ত্র হনুমানের উপরে চালাতে শুরু করেছে, কিন্তু কোন দিব্যাস্ত্রই হনুমানের উপরে কাজ করছে না। কারণ হনুমানের উপর ব্রহ্মার বর আছে।

হনুমানের যখন জন্ম হয়েছিল, তখন সেই বাল্যাবস্থাতেই সকাল বেলা পূবাকাশে লাল সূর্যকে দেখে মনে করেছে এটা বুঝি কোন ফল হবে। বানর কিনা, তাই ফলের প্রতি ছোটবেলা থেকেই স্বাভাবিক প্রীতি। সূর্যকেও ফল ভেবে খেয়ে নেওয়ার জন্য এক ঝাঁপ দিয়েছে। সূর্যকে বাঁচাবার জন্য ইন্দ্র আবার তাঁর বজ্র হনুমানের উপর চালিয়ে দিলেন। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বাচ্চা হনুমান ছিটকে নীচে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেছে। সেই দেখে হনুমানের বাবা বায়ু দেবতা গেছেন প্রচণ্ড রেগে 'আমার এই ছোট্ট সন্তান! এতটুকু শিশুর উপর বজ্র চালান হয়েছে! দ্যাখাচ্ছি এবার'। বলেই বায়ু করল কি, নিজের নড়াচড়া বন্ধ করে দিলেন। বায়ু মানে

সমস্ত প্রাণীর প্রাণশক্তি, আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে বলে বেঁচে আছি, জগতে যা কিছু প্রাণী আছে সব প্রাণশক্তিতেই জীবন ধারণ করে আছে, জগতে যদি সেই প্রাণশক্তির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সমস্ত প্রাণীকুলের অবশ্যম্ভাবি বিনাশ, শুধু প্রাণীকুলই নয়, যত জড় বস্তু আছে তারাও আর একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত না থেকে আলাদা হয়ে ছিটকে পড়বে। এই যে গ্লাশ, এটা এভাবে কি করে আছে, এর মলিক্যুলস্‌গুলি এক অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ধরে রয়েছে বলে। কে এই ভাবে ধরে রেখেছে? প্রাণশক্তি ধরে রেখেছে। গ্লাশের এই প্রাণশক্তি যদি গ্লাশকে ছেড়ে দেয় তক্ষুণি এর মলিক্যুলস্‌ গুলো এর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। এই ভাবে প্রত্যেকটি বস্তুর যে আকার তার প্রাণশক্তিই তাকে ধরে রেখেছে বলে সে এই আকারে এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে। এখন পবন দেবতা যেমনি নিজের প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছেন তখনি জগতের সব কিছুই অসংযুক্ত অবস্থায় চলে এসেছে। সব দেবতারা দৌড়ে এসে বায়ু দেবতাকে বলছেন – আপনি এ কি করতে চলেছেন? আপনি শান্ত হোন, আপনি ক্ষমা করুন। তখন বায়ু দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সব দেব দেবীরা এসে হনুমানকে বরদান করতে শুরু করলেন। সরস্বতী দেবী এসে হনুমানকে সব জ্ঞান দিয়ে দিলেন, যার জন্য হনুমানকে বলা হয় – *জ্ঞানীনাং অগ্রগণ্যম্‌*। হনুমানকে খুশি করার জন্য না, বায়ু দেবতাকে খুশি করার জন্যই সরস্বতী তাড়াতাড়ি করে এই বর দিয়ে দিলেন। এর পর একে একে এসে সব দেবতা এসে যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী বর দিতে লাগলেন, শক্তি দিতে লাগলেন, হনুমানকে কেউ বধ করতে পারবে না, হনুমানের ইচ্ছামৃত্যু ইত্যাদি।

এখন মেঘনাদ যে একটা পর একটা দিব্যাস্ত্র হনুমানের উপর চালাচ্ছে, তাতে তার কিছুই হচ্ছে না, দিব্যাস্ত্র কোন কাজই করছে না। মেঘনাদ ছিলেন খুব বুদ্ধিমান, আর বিরাট যোদ্ধা, রাবণের পুত্র বলে কথা। রাবণ নাম শুনলেই আমাদের ছোটবেলা থেকে নানা রকমের কাহিনী শুনে শুনে মনের মধ্যে একটা ধারণা এসে গেছে যে রাবণ খুব হিংস্র, বদমাইশ, বদ চরিত্রের। আসলে কিন্তু রাবণ তা নয়, রাবণ দেখতে ছিলেন খুব সুন্দর এবং সুপুরুষ। অন্য এক রামায়ণে সীতাকে বনবাসে পাঠানোর পেছনে একটা অদ্ভুত কাহিনী আছে, সেখানে বলছে, অযোধ্যাতে সীতার এক সেবিকা সীতাকে জিজ্ঞেস করেছে 'রানীমা! আপনি তো অনেক দিন লঙ্কায় ছিলেন, রাবণকেও অনেক দিন দেখেছেন, রাবণ দেখতে কি রকম ছিল'? সীতা তখন একটা কাঠ কয়লা নিয়ে দেওয়ালে রাবণের চোখ এঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন রাবণ কি রকম দেখতে ছিলেন। ঠিক সেই সময় শ্রীরামচন্দ্র নাকি সেইখানে উপস্থিত হন। রাবণের ছবি আঁকা দেখে শ্রীরামচন্দ্র তখন প্রচণ্ড রেগে গেছেন। শ্রীরামচন্দ্র ভাবছেন, নিশ্চয়ই সীতা রাবণের সঙ্গে রাত্রিবাস করেছিল, রাবণের সঙ্গে এত দিন ছিল বলে ওকে ভালোবেসে ফেলেছে, তাই সীতা রাবণকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না বলে দেওয়ালে রাবণের ছবি এঁকেছে। ঐ রাগ থেকেই শ্রীরামচন্দ্র পরের দিন ভোর হতেই সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। এটা অন্য একটি রামায়ণের মত। আসলে কিন্তু রাবণ প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ছিল। রাবণ কিন্তু কোন দিন কোন মেয়েকেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুলে আনেনি, যুদ্ধ জয় করে সুন্দরী নারীদের নিয়ে এসেছে। বর্ণনা আছে যে, রাবণের এত ধন-সম্পদ, তার রূপ, ঐশ্বর্য, পরাক্রম দেখে অনেক রাজার মেয়েরাও রাবণকে পতিরূপে কামনা করে চলে এসেছিল, তারা ভালো করেই জানত যে রাবণের অনেক স্ত্রী আছে, তা সত্ত্বেও রাবণকে পাওয়ার লোভে তারা রাবণের কাছে ধরা দিয়ে দিত। রাবণের যে হাজার হাজার রানীর কথা আমরা জানি, তা এভাবেই হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র সীতাকে রাবণ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হরণ করে নিয়ে এসেছিল।

রাবণ কখনই সাধারণ লোক ছিলেন না, তাঁর পুত্র হচ্ছে মেঘনাদ, মন্দোদরীর গর্ভজাত। মেঘনাদ বুঝে গেছে এই বানরকে বধ করা যাবে না। মেঘনাদ একবার খুব তপস্যা করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে একটা দড়ি দিয়েছিলেন, এই দড়ির পৌরাণিক নাম হচ্ছে ব্রহ্মপাশ, কোন কোন রামায়ণে বরুণপাশও বলে। ব্রহ্মপাশ আসলে একটা লম্বা দড়ি, এই দড়িকে যখন মন্ত্রশক্তির দ্বারা অভিষিক্ত করে কারুর উপর ছুঁড়ে দিলে তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে নেবে। কিন্তু হনুমানের উপর ব্রহ্মার বর ছিল বলে ব্রহ্মপাশ এসে যখন হনুমানকে বাঁধছে তখন হনুমানের কোনই কষ্ট হয়নি। হনুমান নিজে মনে মনে ভাবছেন

– আমাকে ব্রহ্মা আশীর্বাদ দিয়েছিলেন যে ব্রহ্মার কোন অস্ত্রই আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি যদি ইচ্ছে করি ব্রহ্মপাশ থেকে মুক্ত হবার, তাহলে কিন্তু আমি এক্ষুণি মুক্ত হয়ে যাব। কিন্তু এতে ব্রহ্মাকে অসম্মান করা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কথা, আমার কাছে খুব ভালো সুযোগ এসে গেছে, এই ভাবে যদি বন্ধন অবস্থায় থাকতে পারি তাহলে আমি রাবণের সামনে যেতে পারব, আরও অনেক কিছুই করতে পারব। এই সব ভেবে তিনি ব্রহ্মপাশকে চুপচাপ গ্রহণ করে নিয়েছেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য রাক্ষসরা এসে আরও দড়ি, লতা এনে হনুমানকে আরও বেশি করে বেঁধে দিয়েছে, যাতে হনুমান কোন ভাবেই বন্ধন মুক্ত না হয়ে যেতে পারে। এরা তো আর ইন্দ্রজিৎএর মত বুদ্ধিমানও নয়, আর ব্রহ্মপাশের নিয়মাদিও জানেনা। ব্রহ্মপাশের নিয়ম আছে, ব্রহ্মপাশ আসলে আধ্যাত্মিক শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তির উপরে যেমনি জাগতিক শক্তি লাগান হবে তখনই আধ্যাত্মিক শক্তিটা চলে যাবে। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – বৈকুন্ঠে ভগবান বিষ্ণু বসে আছেন, হঠাৎ তিনি দৌড়ে চলে গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দৌড়ে চলে এলেন। মা লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার। ভগবান বিষ্ণু তখন বললেন – আমার এক ভক্ত ভাবের ঘোরে আমার নাম করতে করতে যেতে গিয়ে ধোপা কাপড় শুকোতে দিয়েছে সেটা মারিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তাই দেখে লাঠি নিয়ে ধোপা আমার ভক্তকে মারতে যাচ্ছিল দেখে আমি তাকে বাঁচাতে যাচ্ছিলাম। তাহলে আপনি ফিরে এলেন কেন? কিন্তু কিছু দূর গিয়েই দেখি ভক্ত একটা আধলা ইট তুলেছে ধোপাকে মারবার জন্য। তাই আবার আমি বৈকুন্ঠে ফেরত চলে এলাম। এর মর্মার্থ হচ্ছে, আমার নিজের চেষ্টা যখনই চলে আসবে তখনই আর দৈবী শক্তি কাজ করবে না। তাই ব্রহ্মপাশও হনুমানকে ছেড়ে দিয়েছে। দৈবী শক্তি আর জাগতিক শক্তি এক সঙ্গে চলে না। বাল্মীকি রামায়ণে এই মত গুলো এসেছে, পরের দিকে এগুলোই বড় বড় কাহিনীর আকার নিয়েছে।

মেঘনাদ ব্রহ্মপাশের নিয়মটা জানে বলে রাক্ষসদের এই কাণ্ড দেখে হতাশ হয়ে গেছে। এত কষ্ট করে আমি এর ওপরে ব্রহ্মপাশ চালালাম আর এরা নির্বুদ্ধির মত কাজ করে বসল। মেঘনাদ এদিকে লক্ষ্য করছে হনুমানকে। দেখছে হনুমান ব্রহ্মপাশ থেকে ছেড়ে বেরিয়ে আসছে না, সাধারণ বানর হলে ব্রহ্মপাশ থেকে এখনই মুক্তি হয়ে বেরিয়ে আসত। মেঘনাদের মনে তখন অন্য এক দুশ্চিন্তা এসে গেছে, এর মতলবটা ঠিক নয়। এই বানর এখন বাঁধনে নেই, ব্রহ্মপাশ তখনই একে ছেড়ে দিয়েছে যখন অন্য দড়ি এসে গেছে, অথচ এমন আচরণ করছে যেন সে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে। তার মানে এর মতলব ঠিক নয়। মেঘনাদ বুঝে নিল এবার কিন্তু ব্যাপারটা আরও জটিল ও গভীর হয়ে গেল। মেঘনাদও আর কিছু বলছে না, কেননা সেও বুঝে গেছে এবারে কিছু একটা গোলমাল হতে চলেছে। এখন হনুমানকে বেঁধে রাবণের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

রাবণকে দেখে হনুমান চমকে উঠেছে। বাল্মীকি বলছেন – **ভ্রাজমানং ততো দৃষ্ট্বা হনুমান্ রাক্ষসেশ্বরম্। মনসা চিন্তয়ামাস তেজসা তস্য মোহিতঃ।।**৫/৪৯/১৬। হনুমানের মত বীর রাবণের তেজ দেখে মোহিত হয়ে গেছেন। হনুমান মনে মনে নিজেকে বলছেন – **অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ। অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা।।** ৫/৪৯/১৭। অহো হচ্ছে বিস্ময় সূচক ভাব প্রকাশ। রাবণকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, হনুমান বলছেন – রাবণকে দেখতে যেমন সুন্দর আবার কি ধৈর্য, ধৈর্য হল শক্তির প্রতীক, হনুমান কিছুক্ষণ আগে এত কাণ্ড করলেন, তাতেও রাবণ ধৈর্য হারাননি, আর কি শক্তি এর। পরে আমরা দেখব রাবণ সীতার ব্যাপারে বলছেন – আমি তো কখন কোন গোলমাল করিনি। হ্যাঁ, আমি সীতাকে দেখে তার রূপে মোহিত হয়েছি, সেতো যে কোন পুরুষই হতে পারে, তাতে আমি কি এমন ভুল করেছি। এখানে হনুমান রাবণের এই রূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে বলছেন *অহো রূপম্ অহো ধৈর্যম্, অহো সত্যম্ অহো দ্যুতি*, এর কি তেজ, কান্তিযুক্ত চেহারা। আর *সর্বলক্ষণযুক্ততা* – এই রাক্ষসরাজ আমার শত্রু হতে পারে কিন্তু কি আশ্চর্য, এর মধ্যে সব রাজোচিত লক্ষণ, রাজা হতে গেলে যা যা লক্ষণ থাকার

কথা সব লক্ষণই এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। রাজা যাকে তাকে করা যায় না, তার শরীরে, স্বভাবে, চরিত্রে রাজা হওয়ার মত বিশেষ কিছু লক্ষণ থাকা চাই।

শৈশব কাল থেকে শুনে শুনে রাবণের সম্বন্ধে আমাদের অন্য রকমের বিচিত্র ধারণা হয়ে আছে। কিন্তু যখন নতুন ভাবে দেখা যাবে তখন অন্য রকম লাগবে। গুণের দিক দিয়ে, শক্তির দিক দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র আর রাবণের কোন রকমের তফাৎ করা যায় না, কোন কোন ক্ষেত্রে রাবণের শ্রীরামচন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি কিছু ছিল। তবে ঠাকুর বলছেন পুত্রশোক রাবণকে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। আর অপরের স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে রাবণ অন্যায় কাজ করেছে। অপরের স্ত্রীকে অপহরণ করার অনুমতি আমাদের শাস্ত্র দেয়না, এই একটা শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্মে রাবণের অনেক শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। এই একটি অন্যায় যদি রাবণ না করত, তাহলে কি হত ভগবানই জানেন। আমরা আজকে শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান রূপে জানি, আর যতক্ষণ শ্রীরামকে ভগবান রূপে দেখা হবে তখন এগুলোর আলোচনা করাই উচিৎ হবে না। কিন্তু যখন শ্রীরামচন্দ্রকে মানুষ রূপে দেখা হবে তখন এগুলোও আলোচনার মধ্যে চলে আসবে। কিন্তু যখন শ্রীরামচন্দ্র আর রাবণকে এক রাজা রূপে তুলনা করা হবে, বা সমানে সমানে যদি দুজনের লড়াই হত তখন কি হত খুব বলা মুশকিল।

একদিকে হনুমান যেমন রাবণকে দেখে খুব মোহিত হয়ে গেছে, অন্য দিকে রাবণও হনুমানকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। এই বানর এত বড় একটা কাণ্ড করল কি করে? এখানে বলা হচ্ছে – **রোষেণ মহতাবিষ্টো রাবণো লোকরাবণঃ।।**৫/৫০/১। রাবণ শব্দের অর্থ হচ্ছে যে সারা জগতের লোককে রোদন করিয়ে দিতে পারে। রাবণের যা শক্তি তাতে সে এই তিনটে লোকের রোদন করিয়ে দিতে পারে, মানে সবাইকে সে হারিয়ে দিতে পারে, শুধু হারিয়েই দিতে পারে না, হারিয়ে কাঁদিয়ে দিতে পারে। কাঁদিয়ে দিতে পারে বলে তার নাম রাবণ। বলছেন – *রোষেণ মহতাবিষ্টো* – একদিকে লোকটা সারা জগতকে কাঁদিয়ে দিতে পারে অন্য দিকে সেই লোকটা এখন রোষের মধ্যে পড়ে গেছে, আরেক দিকে তার আশঙ্কা। কিসের আশঙ্কা? এই বানরটা কোত্থেকে এলো আর কি কৌশলেই বা এখানে পৌঁছাল।

অনেক কাল আগে শিবলোকে গিয়ে রাবণ শিবের দুই সাকরেদ নন্দী ভৃঙ্গীর মধ্যে নন্দীর চেহারা দেখে হেসে ফেলেছিল। তখন নন্দি রেগে গিয়ে রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিল, তোমার অহঙ্কারই তোমার পরাজয়ের কারণ হবে। হনুমানকে দেখে রাবণের সেই নন্দির কথা মনে পড়ে গেছে, এটা কি সেই নন্দি? নন্দিই কি বানর রূপে এখানে এসেছে? নাকি এ সেই বাণাসুর? বাণাসুর হচ্ছে আগেকার দিনের এক নামকরা অসুর। রাবণ ভাবছে – এত শক্তি এই বানর কোথা থেকে পেয়েছে!

রাবণ রাজা কিনা, তাই হনুমানের সঙ্গে রাবণ সরাসরি কথা বলবেন না, তাই প্রহস্তকে বলছেন, প্রহস্ত ছিলেন রাবণের একজন অন্যতম মন্ত্রী, কিছুক্ষণ আগে হনুমানের হাতে যার কয়েকজন পুত্র মারা গেছে 'হে প্রহস্ত, তুমি একে জিজ্ঞেস কর এ কোথা থেকে এসেছে, কেন এখানে এসেছে'। রাজা কখনই সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন না। কেন করেন না? যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে উত্তর না দিয়ে বা অন্য কিছু আজেবাজে কথা বলে রাজাকে অপমানিত করে দিতে পারে। এক পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি তো এখানে নিরাপদ অবস্থায় আছেন, ভয়ের কিছু নেই, তবু কেন আপনি এত বডিগার্ড নিয়ে চলাফেরা করেন? নিরাপত্তার জন্যই শুধু যে বডিগার্ড রাখা হয় তা নয়, এই নিরাপত্তার কর্মিরা প্রথম ধাক্কাটাকে সামলে নেয়। আমি যদি কাউকে বলি আমি আইজি, তাহলে কে আমাকে পাত্তা দেবে। কিন্তু একজন পুলিশ কনস্টেবল সঙ্গে থাকলে লোকে ওকেই আগে জিজ্ঞেস করবে এই লোকটি কে? তখন এ বলবে, আইজি। নিজের ডাঁট যদি দেখাতে হয় তখন নিজে থেকে কথা বলতে নেই।

প্রহস্ত তখন বলছে 'ওহে বানর, তুমি ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি'। রাবণ প্রহস্ত এরা কিন্তু হনুমানের ব্যাপারটা জানে না, জানে একমাত্র মেঘনাদ। মেঘনাদ বাদে সবাই মনে করছে হনুমান

দড়ি দিয়ে বাঁধা, হনুমান এখন কিছুই করতে পারবে না, কিন্তু মেঘনাদ জানে এই বানর যখন খুশি বাঁধন খুলে বেরিয়ে আসতে পারে। প্রহস্ত হনুমানকে বলছে ‘বানর, তুমি সত্য করে বল, সত্য বললে তুমি যা কিছু করেছ আমরা সব ক্ষমা করে দেব। ঠিক ঠিক বল তোমাকে এখানে কে পাঠিয়েছে? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কারুর দৌত্য কার্য করছ, তুমি নিজে থেকে এখানে আসনি, আর এটাও বোঝা যাচ্ছে তুমি নিজের বেশ পাল্টে এসেছ, সব খুলে বল’। প্রহস্ত সমস্ত দেবতাদের নাম করে করে হনুমানকে জিজ্ঞেস করছে। হনুমান তখন প্রহস্তকে উত্তর দিচ্ছেন না, তিনি রাবণকে সরাসরি উত্তর দান করছেন।

হনুমান বলছেন ‘ইন্দ্র, যম, বরুণ এদের দূত আমি নই, আর কুবের বা যক্ষ এদের কারুর সঙ্গে আমার কোন বন্ধুত্ব নেই। আমি কোন সাজগোজ করে চেহারা পাল্টে আসিনি, জন্মসূত্রেই আমি বানর। রাক্ষস রাজ রাবণকে আমার দেখার ইচ্ছে ছিল, আর তাই তোমার অশোক বাটিকাকে আমি ধ্বংস করে এসেছি। লঙ্কাতে এতো উৎপাত করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি যাতে আপনার সামনে আসতে পারি। দেবতা বা অসুর এদের কারুর ক্ষমতা নেই যে তাঁরা আমাকে পাশে বদ্ধ করে দেবে। ব্রহ্মাও আমাকে বর দিয়ে রেখেছেন, তাই তাঁরও কোন পাশ আমাকে আবদ্ধ করতে পারবে না। সেইজন্য জেনে নিন আমি এখনও পাশমুক্ত, আমি শুধু ভাণ করে আছি যে আমি পাশ বদ্ধ। আমি হচ্ছি শ্রীরামচন্দ্রের দূত, তাঁর কাজ করার জন্যই আমি এখানে এসেছি’। এই সব বলে হনুমান রাবণকে জানিয়ে দিলেন তাঁর কি মতলব।

হনুমান বলছেন ব্রহ্মার বরে কারুর কোন অস্ত্র আমার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না, এই বক্তব্যের মধ্যে বেদের সময় থেকে বাল্মীকির সময়ের মধ্যে একটা বিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। বেদে যে দেবতারা ছিলেন আর পরের দিকে বাল্মীকির সময়ের যে দেবতারা এসেছেন তাঁদের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এসে গেছে। এই পার্থক্যটা হল ব্রহ্মার আবির্ভাব। বেদে ব্রহ্মার কোন ধারণা ছিল না, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে ব্রহ্মা প্রধান দেবতা রূপে আবির্ভূত হয়ে গেছেন। এখানে দেখান হচ্ছে ইন্দ্রাদি দেবতাদের থেকেও ব্রহ্মাকে যেন বড় করে দেখান হচ্ছে। আজকের হিন্দু ধর্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরকে প্রধান দেবতা বলা হয়। বিষ্ণু দেবতা রূপে বেদে উল্লিখিত হয়েছেন, শিব রুদ্র রূপে বেদে আছেন। দেবতাদের কয়েক প্রকার শ্রেণী বিভাগ আছে, তেত্রিশ দেবতাদের মধ্যে একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য আছেন। বারো জন আদিত্যের মধ্যে ইন্দ্র একজন দেবতা আবার বিষ্ণুও একজন দেবতা, আর এগারো জন রুদ্রের মধ্যে রুদ্রও একজন দেবতা, যিনি পরের দিকে শিব রূপে পূজিত হচ্ছেন। ব্রহ্মার নাম বেদে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু বাল্মীকি ব্রহ্মাকে নিয়ে এলেন। কোথা থেকে তিনি ব্রহ্মাকে নিয়ে এলেন? প্রজাপতি থেকে। বেদে প্রজাপতির নাম আছে, যিনি কন্যাদের জন্ম দিচ্ছেন, সেই কন্যারা দেবতাদের বিয়ে করছেন, এই সব অনেক কাহিনী আছে। কিন্তু বাল্মীকির গ্রন্থে এসে ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা হয়ে গেছেন। মানে প্রজাপতি ও তাঁর সৃষ্টির ক্ষমতা ব্রহ্মাতে এসে এক হয়ে গেছে, আর ব্রহ্মা ক্ষমতার দিক থেকে সর্বোচ্চ হয়ে গেছেন। এই পরিবর্তনটা প্রথম বাল্মীকি রামায়ণে এসে ধরা পড়ে, যেখানে ব্রহ্মাকে সবার থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কি রকম গুরুত্ব? হনুমান বলছেন, দেবতা আর অসুরের কোন পাশ তো আমাকে বাঁধতেই পারবে না, একমাত্র বাঁধতে পারে ব্রহ্মার পাশ, কিন্তু তিনিও আমাকে বর দিয়ে রেখেছেন আমার পাশও তোমাকে বাঁধতে পারবে না। হনুমানের এই বক্তব্যই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ব্রহ্মার ক্ষমতা দেবতাদের থেকেও বেশি। মহাভারতে গিয়ে আস্তে আস্তে এই ত্রয়ী দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বরের প্রচণ্ড গুরুত্ব বেড়ে যাবে, অন্য দিকে দেবতাদের গুরুত্ব কমতে কমতে একেবারে তলানিতে চলে আসবে। বাল্মীকি রামায়ণে এখনও দেবতাদের বিরাট স্থান আছে, কিন্তু এখান থেকে দেবতাদের একটু একটু করে গুরুত্ব কমতে শুরু করে দিয়েছে। যেমন এর আগে আমরা দেখেছি কৌশল্যা ইন্দ্রের পূজা না করে বিষ্ণুর পূজা করছেন। কিন্তু এখানে সব থেকে বড় যে পরিবর্তনটা আসছে, ব্রহ্মার গুরুত্ব অন্যান্য দেবতাদের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। সব দেবতার ব্যক্তিত্ব যেন ব্রহ্মাতে এসে মিশে গেছে, তিনিই পুরো ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর স্রষ্টা। পুরুষসূক্তমে যে আদি পুরুষের উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রহ্মাকে কিছুটা আদি পুরুষের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিছুটা

প্রজাপতির ধারণা, কিছুটা ভগবানের সৃষ্টির ক্ষমতার ব্যাপারটা মিলিয়ে দিয়ে বাল্মীকি ব্রহ্মাকে সামনে নিয়ে এসে সমস্ত দেবতাদের উপরে বসিয়ে দিয়েছেন।

এই কারণেই বলা হয় ভাবরাজ্যই হল আসল ব্যাপার। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বসেন এর মধ্যে কোনটা সত্য? কোনটাই সত্য নয়। কেউ যদি মনে করেন অগ্নি দেবতাই সৃষ্টির দেবতা, তিনিই সব সৃষ্টি করছেন, তখন সেটাও ঠিক, অন্য দিকে আবার কেউ যদি বলেন বিষ্ণুই সব কিছু করছেন, তাহলে বিষ্ণুই সব করেন, কাল যদি বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণই সব কিছু করেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলছে, শ্রীরামকৃষ্ণই সব কিছু করেন। কারণ এগুলো হল এক এক জনের এক এক রকম ভাব। সৃষ্টি থাকলেই একজন সৃষ্টিকর্তা থাকবেন। তাহলে সৃষ্টিকর্তা কে? যে কেউ হতে পারেন, যিনি যেই দেবতাকে নিয়ে সাধনা করে সমাধির গভীরে চলে যাচ্ছেন, সমাধির গভীরে গিয়ে তিনি দেখছেন তাঁর ইষ্ট দেবতা থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। সমাধি থেকে নেমে এসে তিনি তাঁর শিষ্যদের সেইভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সেইজন সৃষ্টিকর্তা যে কেউই হতে পারেন। কিন্তু বেদে ব্রহ্মা বলে কেউ সৃষ্টিকর্তা নেই।

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন, বাল্মীকির আগে ব্রহ্মা বলে আদৌ কেউ ছিলেন কি ছিলেন না, নাকি ব্রহ্মা বাল্মীকিরই কোন কাল্পনিক সৃষ্টি? প্রথম কথা হল, ভারতে আগে কোন কিছুই পাণ্ডুলিপিতে লেখা হত না। লিখিত আকারে কিছু না থাকা সত্ত্বেও ভারতে সাহিত্য রচনা কিন্তু হয়েই আসছে। তবে ঠিক কবে থেকে এই লেখা পদ্ধতি চালু হয়েছে বলা খুব মুশকিল। বাল্মীকির আগেও শ্লোক ইত্যাদি যে রচনা হত তার কথাও বাল্মীকিও একটা জায়গায় বলছেন। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে বাল্মীকিই প্রথম শ্লোক রচনা করেছেন। কোথাও একটা দ্বন্দ্ব আছে। লোকেরা যে আগে থাকতে কাব্যগ্রন্থ পড়তেন, নাটক করতেন, এটা আমরা এই বাল্মীকি রামায়ণেই পাই, যখন ভরত মামার বাড়িতে ছিলেন, ভরতের বিনোদনের জন্য প্রহসনাদি নাটক করা হত, এর উল্লেখ আমরা আগেই পেয়েছি।

একটা জংলী, আদিম, বর্বর সমাজের মধ্য থেকে হঠাৎ করে বাল্মীকির মত কবির রচনা কখনই বেরিয়ে আসতে পারেনা। লোকেরা তাহলে বাল্মীকিকে মেরেই ফেলত। প্রতিভার স্ফুরণ সেই সমাজ থেকেই বেরিয়ে আসে যেখানে মাঝারি শ্রেণীর মানুষের (mediocre) সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপর কি কেউ কখন আক্রমণ করেছে? স্বামীজীকে কি কেউ কখন ইট পাটকেল ছুঁড়েছে? ঠাকুর স্বামীজীকে সেই রকম কোন প্রচণ্ড জন বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়নি, কেউই তাঁদের উপর কোন ধরণের অত্যাচার করেনি। কিন্তু যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হল, মহম্মদকে মক্কা থেকে মদিনা, মদিনা থেকে মক্কা কতবার তাড়া করে বেড়িয়েছে। কেন করেছে? কারণ ঐ সমাজের মানুষ তখনও আদিম, বর্বর ছিল, হঠাৎ একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়ে গেছে, এই মহাপুরুষদের গ্রহণ করার মত সমাজ তখনও তৈরী হয়নি। পুরো ইউরোপ তখন এক ধর্মান্ধতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, হঠাৎ করে গ্যালিলিও এসে গেলেন, সমাজ তখন তাঁর দিকে মার ব্যাটাকে মার বলে ছুটে গেল। ব্রুনোকে দিল পুড়িয়ে। আইনস্টাইন যখন বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটালেন, তখন কিন্তু তাঁর দিকে সমাজ খড়্গহস্তে ছুটে আসেনি মারবে বলে। কারণ তখন মাঝারি ধরণের বুদ্ধিজীবি সাধারণ মানুষরা এসে গিয়েছিল। মাঝারি ধরণের বুদ্ধিজীবি সাধারণ মানুষ যতক্ষণ সমাজে না আসছে ততক্ষণ প্রতিভা স্বীকৃতি পায় না।

আফ্রিকাতে একটা খুব ছোট গোষ্ঠির আদিম জাতি আছে, তাদের ভাষা আছে, কথাও বলতে পারে, কিন্তু তাদের আচরণ এখনও পশুর মত। ইংরাজী ভাষায় যেমন ছাব্বিশটা বর্ণ আছে, তার মধ্যে একুশটা ব্যঞ্জণবর্ণ, কিন্তু এদের ভাষার মধ্যে মাত্র সাতটি ব্যঞ্জনবর্ণ, আবার মেয়েদের জন্য ছটি বর্ণ। এরা যখন কথা বলে তখন কোনটা লম্বা লম্বা টেনে, কোনটা তার থেকে আরও লম্বা টেনে বলে, এই করে পুরো ভাষাটাকে কথায় নিয়ে আসে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল মুখে বলার সময় অনেক গুলো শব্দ থাকবে না। যেমন, ওদের কেউ একজন লোক চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল, ওকে এখন জিজ্ঞেস করা হল, লোকটা কোথায় গেল? তখন লোকটা একটা শব্দ করল, তার অর্থ হচ্ছে, ঐ লোকটা আমাদের অনুভূতির পারে চলে গেছে। আবার

ওদের সামনে যদি মোমবাতি জ্বালিয়ে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেওয়া হয়, তখনও তারা ঐ শব্দটাই ব্যবহার করবে, মানে মোমবাতির আলোটা আমাদের অনুভূতির বাইরে চলে গেছে। এদের কাছে একটা লোক চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া আর মোমবাতিকে নিবিয়ে দেওয়া একই জিনিষ। পৃথিবীর অনেক গবেষকরা এদের উপর অনেক রকম ভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। গবেষণাতে বলছে যে এদের পূর্বপুরুষদের কোন স্মৃতি নেই। তাদের যে বাবা ছিল, বাবা মরে গেছে, সেই নিয়ে এদের কোন মাথাব্যাথা নেই। ওদের যদি কেউ প্রশ্ন করে, তোমার আগে কি ছিল? এই জগৎ হওয়ার আগে কি ছিল? এই ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই নেই। এরা অবাক হয়ে বলে এর আগে এই রকমই ছিল। আমি মারা যাব, কিংবা আমার বাবা মারা গেছে এই নিয়ে তাদের কোন অনুভূতিই নেই। যে ভদ্রলোক এদের ওপরে খুব বেশি গবেষণা করছেন, তাঁর স্ত্রী প্রাণপনে এদের খ্রীশ্চান বানান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যীশুর কথা ওদের বলা হচ্ছে, যেমনি বলে দেওয়া হল যীশু দুই হাজার বছর আগে ছিলেন, ওদের মস্তিষ্ক আর সেটাকে নিতে পারেনা। অনেক বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিন্তু ওদের মস্তিষ্ক কিছুতেই যিশুকে নিতে পারছে না। হাজার বছরের কিছু ব্যাপারে বলতে গেলেই কিছুক্ষণ ওরা সেটাকে ধরে রাখে, কিন্তু তারপরেই ওরা এই ব্যাপারে সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। পশুদের ক্ষেত্রে যেমন হয়, কুকুরের বাপ মরে গেলে যেমন কুকুরের কিছুই হয় না, এদেরও ঠিক তাই হয়।

এই ঘটনাটা এই জন্যই এখানে বলা হল যে, যেখানে খুব নিচু স্তরের সমাজ ব্যবস্থা, সেখানে হঠাৎ করে একটা উচ্চ আদর্শকে নিয়ে এলে সেই সমাজ নিতেই পারবে না, উচ্চ আদর্শকে মাটিতে পিষে ফেলে দেবে। কিন্তু যখন সমাজে মাঝারি ধরণের আদর্শ এসে যায়, তখন সেখানে উচ্চ আদর্শকে নিয়ে আসা যায়, মাঝারি ধরণের লোকেরাই উচ্চ প্রতিভার কদর করতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষ কোন আদর্শকেই পিষে ফেলবে না। বিজ্ঞান যদি আজ বিরাট কিছু তত্ত্বকে নিয়ে আসে ভারত তাকেও যেমন সাদরে গ্রহণ করবে আবার আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শকেও ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করবে। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে কেউ তেড়েফুড়ে আক্রমণ করতে আসছে না। বাল্মীকি অজানা অচেনা বর্বর কোন সমাজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই ধরণের আদর্শকে নিয়ে আসেননি। তিনি যখন বর্তমান ছিলেন তখন সমাজে এই আদর্শগুলো আগে থাকতেই ছিল, তা নাহলে বাল্মীকিকে অনেক আক্রমণ সহ্য করতে হত। বেদের পরই আমরা পাচ্ছি বাল্মীকি রামায়ণ। বেদ আর বাল্মীকি রামায়ণের মাঝখানে যা কিছু সাহিত্য এসেছিল তার কিছুই এখন আর অস্তিত্ব নেই। একটা সমাজ চলছে, সেখানে বাইরে থাকে একজন দেবতাকে নিয়ে এসে সমাজের মধ্যে বসিয়ে বলে দেবে যে ইনিই হলেন শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাবান দেবতা, বাল্মীকি এত বড় অন্যায় কাজ কখনই করবেন না, কারণ তিনি একজন ঋষি। আর বাল্মীকি তাই যদি করতেন তাহলে তখনকার সমাজও সেই দেবতাকে অত সহজে মেনে নিতে চাইবে না। সেইজন্য আমরা বলতে পারি ব্রহ্মার ধারণা বাল্মীকির আগেই নিশ্চয়ই কোথাও ছিল।

যেমন তন্ত্র, একদিক থেকে তন্ত্র বেদেরও অনেক আগের, কিন্তু বেদ করল কি, ঋষিদের দিয়ে একটা পরম্পরা তৈরী করে বেদকে একটা প্রণালীর মধ্যে বেঁধে নিয়ে পুরো সমাজকে তাই দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল, তাতেই বেদ হয়ে গেল সমাজের সব থেকে জনপ্রিয় শাস্ত্র আর তন্ত্র চলে গেল নীচে। কিন্তু তন্ত্র সমাজে বরাবরই একই ভাবে থেকে গেছে। ফলে বৌদ্ধদের সময়ে অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায় তন্ত্রের অনেক অনুশীলনকে নিজের সাধনার অঙ্গ করে নিয়েছিল। এখন আস্তে আস্তে তন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা হিন্দু ধর্মে খুব ভালো ভাবেই এসে গেছে। তন্ত্র আর বেদের মৌলিক পার্থক্য হল, পুরো বেদ বর্ণাশ্রমের উপর ভিত্তি করে, বর্ণপ্রথা যদি না থাকে তাহলে বেদ চলবে না। শঙ্করাচার্যও গীতাভাষ্যে বেদকে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলছেন। কিন্তু অন্য দিকে তন্ত্র সম্পূর্ণ বর্ণাশ্রম রহিত, বর্ণাশ্রমকে তন্ত্র স্বীকারই করে না। বেদ আর তন্ত্রের এই সংঘাত চিরন্তন। মহানির্বাণতন্ত্রে এসে এই সংঘাতের একটা সমঝোতা করে নেওয়া হয়েছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে দুটো বর্ণকে নিয়ে আসা হয়েছে, গৃহস্থ আর সন্ন্যাসী। কিন্তু গৃহস্থ আর সন্ন্যাসীর মাঝখানে বাকি দুটি বর্ণ এবং অন্য যত জাত ছিল তন্ত্র সব উড়িয়ে দিয়েছে। এইভাবে মহানির্বাণ তন্ত্র এক ধরণের আপোষ করে নিয়েছে।

একটা জিনিষ শুধু লিখিত আকারে আর প্রণালিবদ্ধ ভাবে লেখা হয়নি বলে তার কোন অস্তিত্ব নেই বলা যাবে না। তাই ব্রহ্মা নিশ্চয়ই বাল্মীকি রামায়ণের আগেই ছিল, তবে ব্রহ্মার ধারণা অন্য রূপে ছিল। কবিদের সব কিছুই কল্পনার উপরেই রচিত হয় না, অনেক কিছুই সেই সময়ের সমাজের বিভিন্ন ধারণার বাস্তবতাকে ভিত্তি করেও রচিত হয়। ব্রহ্মা বেদে ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু ব্রহ্মার ভাবটা বেদে ছিল, সৃষ্টিকর্তার একটা ধারণা বেদেও ছিল তবে সেটা ব্রহ্মা নামে ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মা নামটা বাল্মীকি রামায়ণেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। তবে ব্রহ্মা বাল্মীকির মস্তিষ্ক প্রসুত আবিষ্কার নয়, ব্রহ্মা তখনকার আধ্যাত্মিক সমাজরই আবিষ্কার।

যাই হোক, আমরা এর পরের দৃশ্যে দেখছি, হনুমান রাবণকে দেখে খুব মুগ্ধ হয়ে গেছেন। এবারে হনুমান সম্বোধন করছেন – *তান্ ভবান্*, এখানে ভবান্ শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, ভবান্ মানে আপনি, কাউকে আপনি বলাটা একটা সম্মানজনক সম্বোধন। গীতাতেও দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বলছেন – *ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ*। হনুমান বলছেন – **তপঃসন্তাপালব্ধস্তে সোঽয়ং ধর্মপরিগ্রহঃ। ন স নাশয়িতুং ন্যায্য আত্মপ্রাণপরিগ্রহঃ।।**৫/৫১/২৫। আপনি যে শুধু ধর্ম আর অর্থতেই সফল তা নয়, তপস্যা করেছেন, তপস্যা করে পূণ্য সঞ্চয় করেছেন, কিন্তু একি, আপনি অপরের স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে বন্দী করে রাখলেন, পরস্ত্রী-হরণের মত শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম দ্বারা সেই ধর্মফলকে নাশ করা আপনার কখনই উচিত হইনি।

মূলতঃ কাম জিনিষটাই অত্যন্ত জঘন্য জিনিষ। পুরুষের ক্ষেত্রে কি হয়, কাউকে যদি তার ভালো লেগে গেল, আর তার যদি ক্ষমতা থাকে, তাহলে তাকে আর আটকে রাখা যায় না। কাম এমনই এক রিপু যে একে সামলানো খুবই কঠিন, পশুদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যখন ঋতুর পরিবর্তন হয় তখন এদের কোন ভাবেই আটকানো যায় না। কিছু দিন আগে সার্কাসের একটা হাতি মত্ত হয়ে গিয়েছিল, হাতি এমন দাপানি শুরু করেছিল যে, মাহুত সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। মাহুত ভালো করে জানে যে হাতিকে এখন কিছুতেই ঠাণ্ডা করা যাবে না, তিন দিন পরে নিজে থেকেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কাম দিয়ে সৃষ্টি চলে কিনা, তাই কামের প্রচণ্ড ক্ষমতা। কোন পুরুষ বা নারীর মধ্যে যখন কামের আবির্ভাব হয়, তখন সেই পুরুষ বা নারী কামে এমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় যে, জগতের সব কিছুই মন থেকে হারিয়ে যায়। হনুমান তাই রাবণকে বলছেন 'আপনি কেন এই কামকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছেন'। পরে রাবণ বলবে সীতার উপর থেকে কাম ভাবকে দূর করা আমার পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। সীতাকে দেখে রাবণের মন যে কাম ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, আর সীতাকে হরণ করে নিয়েছিল, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আবার শ্রীরামচন্দ্র যেভাবে সীতাকে উদ্ধার করেছেন সেটাও অস্বাভাবিক কোন কিছু হয়নি। এগুলো এখন যে যেভাবে ব্যাখ্যা করবেন সেটাই ঠিক বলে মনে হবে। যে ভক্ত সে বলবে, রাবণের উপর অভিশাপ ছিল, জয় বিজয়, ভগবান বিষ্ণুর দ্বারবান, সনকাদি মুনিরা অভিশাপ দিয়েছিলেন বলেই রাবণ হয়ে জন্ম নিয়ে এই সব করেছিল। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে মানুষের মনের স্বাভাবিক যে ধর্ম সেটাকে রাবণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। রাবণ একটা জিনিষে মোহাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, অন্য দিকে দুর্যোধন আরেকটা জিনিষের প্রতি আসক্ত হয়ে গিয়েছিল, দুর্যোধন ক্ষমতার সত্তার লোভে একেবারে বশীভূত হয়েছিল। এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি কোন কিছুতে মন প্রচণ্ড আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, ডাক্তাররা ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে আচ্ছন্ন ভাবটাকে নিস্তেজ করে দেন।

হনুমানও রাবণকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন 'ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ সব সময়ই অত্যন্ত হানিকারক, আর এই ধর্ম বিরোধী কর্ম কর্মের কর্তাকে শেকড় সমেত উপড়ে দেয়। আপনি যা করছেন এতে আপনার রাক্ষস কুলেরই সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ হতে চলেছে'। যে মানুষ প্রবল ভাবে অধর্ম কর্মে লিপ্ত হয়ে গেছে, সে যদি ধর্ম কাজ করে তখন কিন্তু তার সেই ধর্ম কাজের ফল পায়না। যেমন, আমি ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ করে ঘরে বসে আছি, এখন বাইরে যত মিষ্টি বাতাসই চলুক না কেন, সুমিষ্ট বাতাসের শীতল স্পর্শ আমি পাবনা। এটা বাল্মীকির নিজস্ব সিদ্ধান্ত, যে প্রচুর অধর্ম করছে তার আগের আগের করা ধর্ম কাজের ফল সে পাবে না। প্রচুর অধর্ম কাজে নিযুক্ত থাকলে তখন তো ধর্ম কাজ করতেই পারবে না, ঐ সময় সে জপ ধ্যান

করতেই পারবে না, আসনে বসতেই দেবে না। স্বামী ভূতেশানন্দজী বলতেন – যে সন্ন্যাসী প্রতি দিন সকালে এক ঘন্টা আর সন্ধ্যায় এক ঘন্টা একাসনে না বসতে পারে, বুঝে নিতে হবে তার সন্ন্যাস জীবনের ইতি হয়ে গেছে। ভক্তদের পক্ষে সম্ভবই নয়। বাল্মীকি বলছেন – তবে অধর্ম কাজ করার পরে যদি বড় কোন ধর্ম কাজ করে, তখন সেই কর্ম অধর্মকে নাশ করে দেয়। এই কথাই হনুমান রাবণকে বলছেন – 'হে রাবণ! এর আগে আপনি যা যা ধর্ম কাজ করেছেন, সেই সব কাজের ফল আপনি সব পেয়ে গেছেন, লঙ্কা নগরীর অধীশ্বর হয়েছন, সুন্দরী নারীদের পেয়েছন। কিন্তু সীতাকে অপহরণ করে যে অধর্ম করেছেন এই অধর্মের ফল এবার আপনি পেতে চলেছেন। আপনাকে একটা কথা বলি, আপনার এই সীতার প্রতি কামাসক্তির জন্য আপনি আপনার যত মিত্র, মন্ত্রী, আত্মীয়, ভাই, সন্তান সবাইকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন'।

একটা বানরের মুখে এই সব বড় বড় কথা শুনে রাবণ এতই রেগে গেছে যে, কেউ কিছু বলার আগেই বলে দিলেন 'এই বানরটাকে এক্ষুণি বধ করে দাও'। কিন্তু বিভীষণ যখন উঠে বোঝালেন যে, এই কাজ করা শাস্ত্র সম্মত নয়, হনুমান একজন দূত হয়ে এখানে এসেছেন, দূতকে এইভাবে বধ করা যায় না। সব শুনে রাবণ বললেন 'ঠিক আছে, বানরদের প্রিয় হচ্ছে তাদের লেজ, এর লেজে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হোক'। তারপর হনুমানকে আবার দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধা হল। তখন হনুমান বলছেন 'আমি যদি চাই তাহলে এখানে যত রাক্ষস আছে সব কটাকেই শেষ করে দিতে পারে, তবে শ্রীরামচন্দ্রের প্রীত্যার্থে আমি কাউকেই বধ করব না'। তার মানে হনুমান বলতে চাইছেন, শ্রীরামচন্দ্র নিজে এখানে এসে সবাইকে বধ করে সীতাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন।

ইতিমধ্যে সীতার কাছে খবর গেছে যে, হনুমানের লেজে আগুন লাগান হয়েছে। সীতা তখন অগ্নি দেবতার কাছে প্রার্থনা করছেন – হে অগ্নি, আমি যদি আমার স্বামীর ঠিক ঠিক সেবা করে থাকি, আর – **যদি বা ত্বেকপত্নিত্বং শীতো ভব হনুমতঃ**।৫/৫৩/২৮। আমি যদি এক পতিত্ব ধর্মে অবিচল থেকে থাকি, ঠিক ঠিক মন দিয়ে আমি যদি স্বামীর তপস্যা করে থাকি, আমার স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষের দিকে যদি কোন দিন মন না দিয়ে থাকি, তাহলে হনুমানের লেজের আগুনটা শীতল হয়ে যাবে। এটাই হল তপস্যার আসল শক্তি, তপস্যা যদি ঠিক ঠিক করা থাকে, তাহলে সেই শক্তিকে যেখানে ইচ্ছে লাগিয়ে দেওয়া যায়। সীতা অগ্নির কাছে আরও প্রার্থনা করছেন – শ্রীরামচন্দ্রের মনে এখনও যদি আমার প্রতি একটুও ভালোবাসা স্নেহ থাকে, হে অগ্নি তুমি তাহলে শান্ত হয়ে যাও।

হনুমান বায়ু দেবতার পুত্র। বায়ু দেবতা দেখছেন আমার ছেলের লেজে আগুন লাগান হয়েছে, তখন উনি সঙ্গে সঙ্গে বাতাসকে খুব শীতল করে প্রবাহিত করতে শুরু করে দিলেন। অন্য দিকে সীতা অগ্নির কাছে প্রার্থনা করেছেন বলে আগুনও শীতল হয়ে গেছে। হনুমান তখন অবাক হয়ে দেখছেন, আমার লেজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সেই আগুনে আমি পুরো লঙ্কাকে দগ্ধ করে দিচ্ছি, কিন্তু আগুন আমার লেজকে দগ্ধ করছে না কেন! হনুমান কিছুই বুঝতে পারছেন, এমনকি তাঁর শীত করতে লাগল। কারণ আগুন একদিকে নিজেকে শীতল করে নিয়েছে, অন্য দিকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে।

এর পরের কাহিনী আমাদের সবারই জানা। হনুমান এক প্রাসাদ থেকে আরেক প্রাসাদ, এক অট্টালিকার ছাদ থেকে আরেক অট্টালিকার ছাদে যত লাফ দিয়ে চলেছে আর আগুন ততই লঙ্কার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সবাই ভয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়ে ভাবছে কে এই বানর। বাল্মীকি তখন খুব সুন্দর বর্ণনা করে বলছেন – **কিং বৈষ্ণবং বা কপিরূপমেত্য রক্ষোবিনাশায় পরং সুতেজঃ। অচিন্ত্যম্ অনন্তমব্যক্তমনন্তমেকং স্বমায়য়া সাম্প্রতমাগতন্বা বা**।।৫/৫৪/৩৭। বাল্মীকি এখানে বিষ্ণু মায়া এই শব্দটা ব্যবহার করছেন। পরে এই বিষ্ণু মায়াই বৈষ্ণবী মায়া রূপে উল্লেখিত হয়েছে। সমস্ত রাক্ষসরা অবাক হয়ে বলছে, এই বানর কে? এ কি বিষ্ণুর মায়া বানর রূপ ধারণ করে এসেছে? এত শক্তি সে কোথা থেকে

পাচ্ছে? বিষ্ণুকে এখনো ভগবান বলে মানা হচ্ছে না। বিষ্ণু দেবতা, কিন্তু তাঁর মায়া রূপ আছে, সেই মায়ার রূপ দিয়েই কি এই বানর এইসব কাণ্ড করে চলেছে?

এদিকে হনুমান সমস্ত লঙ্কাকে পুড়িয়ে দিয়েই হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, আরে আমি এ কী করলাম! সীতাও তো এর সাথে পুড়ে গেল নিশ্চয়! কথামৃতে ঠাকুর এই উপমাটাই দিয়েছেন। হনুমান বলছেন আমি এ কী কুৎসিৎ কাজ করলাম। মানুষের ভেতরে যখন ক্রোধের উৎপন্ন হয়, সেই ক্রোধ সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষ সম্বরণ করে নেয়, সেই মানুষই মহৎ। আগুন লাগলে জল দিয়ে যেমন সেই আগুনকে শান্ত করে দেওয়া হয়, সেটাই ঠিক কাজ। হনুমান বলছেন – **ক্রুদ্ধঃ পাপং ন কুর্যাৎ কঃ ক্রুদ্ধো হন্যাত গুরূনপি। ক্রুদ্ধঃ পুরুষায় বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষেপেৎ।**।৫/৫৫/৪ – মানুষ রাগে বশীভূত হয়ে গেলে যে কোন পাপ কাজ করে ফেলে। মানুষ রেগে গেলে কটূ কথা বলা তো সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু নিজের গুরুজনকেও পর্যন্ত হত্যা করে দিতে দ্বিধা বোধ করে না। আর বলছেন *ক্রুদ্ধঃ পুরুষায় বাচা নরঃ সাধূনধিক্ষেপে* – যাদের মধ্যে ক্রোধের জন্ম নেয় তারা অত্যন্ত কঠোর কথা বলতে পারে, আর যারা সাধু পুরুষ তাদেরকেও তারা অত্যন্ত গর্হিত কথা বলে দিতে পারে। হনুমান বলে যাচ্ছেন – **বাচ্যাবাচ্যং প্রকুপিতো ন বিজানাতি কর্হিচিৎ। নাকার্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ।**।৫/৫৫/৫ – কাকে কি বলা উচিৎ আর অনুচিত এই জ্ঞানটা তারা হারিয়ে ফেলে। আর বলছেন – *নাকার্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে ক্বচিৎ* – মানুষের যখন ক্রোধ এসে যায় তখন এমন কোন গর্হিত কাজ নেই যে সে করবে না, আর যখন রেগে যায় তখন তার মনের উপরে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। হনুমান ভাবছেন আমি এ কি করে বসলাম। বলছেন যে নিজের ক্রোধকে ক্ষমা দিয়ে প্রশমিত করে দেয় সে-ই মহৎ পুরুষ। এই সব চিন্তা করে হনুমান আবার ঝাঁপ দিয়ে অশোক বাটিকার কাছে এসেছেন সীতাকে দেখবেন বলে। অশোক বাটিকাতে যখন সীতাকে দেখলেন যে তিনি ঠিক আছেন, তখন হনুমানের মন শান্ত হল।

মন শান্ত করে তিনি এইবার আবার এক ঝাঁপে সমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন করে এই পারে ফিরে এসেছেন। এখানে এসে তিনি সবাইক খবর দিলেন। সবাই একজোট হয়ে পরিকল্পনা করে ঠিক করল যে, শ্রীরামচন্দ্র, সুগ্রীবকে খবর দেবার আগেই আমরা লঙ্কাকে আক্রমণ করে সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তখন আবার এই চিন্তাও তাদের মধ্যে এলো যে, সীতা তো রাবণকে অভিশাপ দিয়েই শেষ করে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তো তা করছেন না। তার মানে, সীতার ইচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র নিজে এসে রাবণকে বধ করে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এইসব চিন্তা ভাবনা করার পর সবাই মিলে কিষ্কিন্ধ্যার দিকে যাত্রা করল। সুগ্রীব চারটে দলকে চার দিকে পাঠিয়েছিলেন। হনুমান, অঙ্গদ, জাম্বোবান এরা সবাই দক্ষিণ দিকে এসেছিল। কিষ্কিন্ধ্যা যাওয়ার পথে সুগ্রীবের একটা প্রিয় বাগান ছিল, এরা আনন্দের আতিশায্যে সেই বাগানে গিয়ে নানা রকমের উৎপাত শুরু করেছে। এই খবর যখন সুগ্রীবের কাছে পৌঁছেছে তখন সুগ্রীব বুঝে গেছে যে হনুমানের কার্য সফল হয়েছে, তা নাহলে এই দুঃসাহস কারুরই হবে না যে তাঁর এই প্রিয় বাগানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে, লুটপাট তো পরের কথা।

এরপর সবাই কিষ্কিন্ধ্যাতে পৌঁছে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে হনুমান সব খবর দিয়ে সীতা প্রদত্ত সেই চূড়ামণীটা তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণ – ৩রা জুলাই ২০১০

যুদ্ধকাণ্ড

লঙ্কা থেকে হনুমান কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্র সব শোনার পর হনুমানকে বলছেন 'হে হনুমান! তুমি যে দুরূহ অকল্পনীয় কাজ করেছ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে এই কাজ করতে পারা দূরে থাক, ভাবতেও পারবে না। এত বড় কাজ করার পর তোমাকে যা কিছুই দেওয়া হোক না কেন, কোনটাই তোমার এই কাজের উপযুক্ত সম্মান হবে না। কিন্তু হনুমান, আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে দিচ্ছি'। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর কি সর্বস্ব দেবেন হনুমানকে? তখন তিনি হনুমানকে বুকের মধ্যে টেনে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করলেন। আলিঙ্গন করার তাৎপর্য হচ্ছে আমি তোমাকে আমার সবই দিয়ে দিলাম। শ্রীরামচন্দ্র আলিঙ্গন দিয়ে হনুমানকে বুঝিয়ে দিলেন, এ ছাড়া তোমাকে কিছু দেওয়ার মত আমার নেই, অন্য কিছু দেওয়া মানে তোমাকে ছোট করা। যখন কাউকে আলিঙ্গন করা হয় তখন তাকে সব কিছুই দেওয়া হয়ে যায়। বুকে জড়িয়ে ধরা বিশেষ করে দেখা যায় মা আর সন্তানের মধ্যে, মা যখন সন্তানকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার মানে মায়ের সর্বস্ব সন্তানকে উজাড় করে দেওয়া হচ্ছে।

এই সব প্রাথমিক কথাবার্তার পর সবাই বুঝে গেছে সীতা কোথায় আছেন। সবাইকে এখন লঙ্কায় যেতে হবে, লঙ্কায় পৌঁছাতে হলে প্রথমে দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন করতে হবে। সমুদ্রের অগাধ বিশাল জলরাশিকে অতিক্রম করতে হবে ভেবে শ্রীরামচন্দ্র আবার হতাশ হয়ে বসে পড়েছেন। সীতার খবর না হয় জানা গেলে, কিন্তু সেখানে যেতে হলে সমুদ্রকে লঙ্ঘন করা হবে কি ভাবে! প্রথমেই শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে হতাশ ভাব দেখে সুগ্রীব বলছেন – **নিরুৎসাহস্য দীনস্য শোকপর্যাকুলাত্মনঃ। সর্বথা ব্যবসীদন্তি ব্যসনঞ্চাধিগচ্ছতি।**।৬/২/৬। যে মানুষ নিরুৎসাহ, একটা কাজ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই কাজের ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই, *দীনস্য*, আর যার মধ্যে দীন ভাব, মানে আমি পারব না, আমার দ্বারা এই কাজ হবে না, *শোকপর্যাপ্তকুলাত্মনঃ*, শোকে যার মন ব্যাকুল হয়ে রয়েছে, এদের দ্বারা কোন দিন কোন কাজ করাই সম্ভব নয়। এরা বিনা কারণে নানান রকম আপদ বিপদে জড়িয়ে পড়ে। আট দশ বছরের শিশুর মধ্যে সব সময় খুব উৎসাহ থাকে, বাড়িতে বা স্কুলে যদি বকাঝকা করা হয় তাতেও তাদের উৎসাহের কোন ঘাটতি হয় না। কিছু সময় গুম্ হয়ে থাকবে, কান্নাকাটিও করবে কিন্তু একটু পরেই আবার উৎসাহে ভরপুর হয়ে যাবে। এখন অবশ্য দিনকাল পাল্টে গেছে। সুগ্রীব বলতে চাইছেন যদি কোন মানুষ উৎসাহহীন হয়, দীন ভাবে ডুবে থাকে আর মন সর্বদা শোকাকুলে ভারাক্রান্ত থাকে, মানে কারণে অকারণে চোখের জল ফেলতেই থাকে, এদের দ্বারা কোন কাজই হয় না।

স্বামীজী ভারতের যুবকদের বারবার এই ধরণের দীন ভাব, নিরুৎসাহ ভাবকে জয় করে উঠে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। এই কথা গুলো শুধু মাত্র তত্ত্বই নয়, এটাই বাস্তব। এই যে মাইক্রোফোন এখানে রয়েছে, এই মাইক্রোফোন কাজ করছে বিদ্যুতের জন্য। এখন এখানে কেউ যদি মারা যায়, তার শরীরটা তখন বিদ্যুত বিহীন এই মাইক্রোফোনের মতই হয়ে যাবে। মৃত শরীর এক খণ্ড জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। টিউব লাইটটা জ্বলছে ইলেকট্রিসিটির জন্য, পাখা চলছে ইলেকট্রিসিটির জন্য, ঠিক তেমনি আমাদের শরীর চলছে অন্তর্যামীর জন্য, যাঁকে আমরা বলছি জীবাত্মা, যিনি চৈতন্যময়। এই চৈতন্যই যে সমস্ত জড় পদার্থকে চালিত করছে, এই ব্যাপারটা ধারণা করা আমাদের পক্ষে একবারেই অসম্ভব। আমরা মুখে যাইই বলি না কেন, যত তত্ত্ব কথাই বলি না কেন, সমস্ত কিছুকে যে চৈতন্য সত্তাই চালাচ্ছে, এটা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিণ। সে সন্ন্যাসীই হোন আর ভক্তই হোন এই চৈতন্য সত্তাকে ধারণা করা তো অনেক দূরের কথা, আমাদের বিশ্বাসই হয় না। সবাই সাধু সন্ন্যাসীদের মুখের থেকে কিছু কথা শুনে নিয়েছি, দু-চারটে গ্রন্থ পড়ে নিয়েছি, আর সেই থেকে কয়েকটা কথা শিখে নিয়েছি যে, ঈশ্বর আছেন, জীবাত্মা আছেন,

পরমাত্মা আছেন। কিন্তু ঐ শুনে রাখাই সার, এক পয়সার ধারণাই নেই। যেদিন ঠিক ঠিক ধারণ হবে, তার প্রথম বোধ হবে এই যে হাতপাওয়লা শরীর, আমার মন, চিত্ত, বুদ্ধি এগুলোর কোন চেতনা নেই, সবই জড় পদার্থ। কতটা জড়? এই টেবিল, চেয়ার যেমন জড়, শরীর, মন, বুদ্ধিও সেই রকম জড়। এগুলো ক্রিয়াশীল হয় চৈতন্য সত্তার জন্য। এই চেতনা বিজ্ঞানের consciousness নয়, এটাই আধ্যাত্মিক consciousness, এই চৈতন্যকেই অন্তর্যামী বলা হয়, একেই জীবাত্মা বলছে, একেই আত্মা বলা হয়, একেই পরমাত্মা বলা হয়, একেই ব্রহ্ম বলা হয়। এখন জীবাত্মাই বলা হোক, কি অন্তর্যামী, কি পরমাত্মা, আত্মা, ব্রহ্ম যাই বলা হোক না কেন, সব একই কথা আর এই আত্মা বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হলেন অনন্ত। মানুষ প্রথমেই এই অনন্ত সর্বব্যাপী আত্মাকে ধারণা করতে পারে না। প্রথমে সে শুরু করে তার হৃদয়ে যিনি অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করে আছেন, সেখান থেকে। নিজের হৃদয়ে পরমাত্মাকে দর্শন করার পর সে দেখে আমার হৃদয়ে যিনি বিরাজ করছেন, বাইরেও সেই তিনিই সর্বত্র বিরাজ করে আছেন। তারপর দেখে হৃদয়ের অন্তর্যামী রূপে যিনি আছেন আর বাইরে যিনি সর্বব্যাপীর রূপে বিরাজ করছেন এই দুটোতে কোন বিভেদ নেই। সব শেষ দেখে একমাত্র তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। এই ভাবে ধাপে ধাপে মানুষ আধ্যাত্মিক চেতনার স্বরূপের সাথে নিজের ব্যক্তিসত্তার চৈতন্যকে এক করে দেয়। এই ধাপ গুলোকে বলা হয় আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ। কিন্তু তার মনে এই নয় যে একটার পর একটা হবে, এই ধাপ গুলো আগে পরেও হতে পারে, কিন্তু একদিন না একদিন সবারই হবে।

আমার সঙ্গে এবং সবার সঙ্গে ঠিক সেটাই হবে যেটা আমি অন্তর্যামীকে দিয়ে রেখেছি, তার বাইরে কিছু হবে না। আমার মুখের কথা, মনের কথা কোনটাই ফলপ্রসু হবে না, আর বাইরের জগৎ যাই ঘটাতে চাক আমার প্রতি, সেও ঘটাতে পারবে না। তাহলে কোনটা ফলপ্রসু হবে? কোনটা ঘটবে? যেটা অন্তর্যামী ঘটাবেন। ঠাকুর যেমন বলছেন – ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটাও নড়তে পারেনা। গাছের পাতাকে কে নাড়াচ্ছেন? ঈশ্বর। ঈশ্বর কে? অন্তর্যামী। অন্তর্যামী কে? আমার হৃদয়ের চৈতন্য সত্তা যার, তিনিই অন্তর্যামী। তিনি কিভাবে আমাকে চালান? আমার কর্মের উপর আধার করে, যেমনটি কর্ম করেছি, সেই অনুসারেই তিনি আমাকে চালাবেন। কর্মটা হল, যেটা আমি ঠিক ঠিক অন্তর থেকে চেয়েছি, সেটাই কর্ম রূপে বেরিয়ে আসবে। প্রথমে হবে, এই মুহুর্তে আমি অন্তর থেকে যেটা চাইছি সেটা। এই ব্যাপারটা বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিণ। এখন যদি কারুর খুব প্রিয়জন মারা যেতে বসেছে, কিংবা কেউ খুব একটা সঙ্কটের মধ্যে পড়ে তার বাঁচা মরার সমস্যা এসে গেছে, তখন যদি তাকে বলা হয় তুমি তোমার মনের কথা কি, তুমি কি চাও, ঠাকুরকে গিয়ে বল, তখন তার মুখ থেকে যে কথা গুলো বেরোবে, সেটাই হবে ঠিক ঠিক কথা যেটা সে তার অন্তর্যামীকে দিয়ে রেখেছি। এটাই হল আমাদের ভেতরের আসল কথা, আর অন্তর্যামী আমাদের ঠিক ঠিক তাই দেবেন।

এখন আমার মনের ভেতরে কোথাও শোক বাসা বেঁধে রেখেছে, আমি দীনহীন হয়ে আছি, আর মুখে বলে যাচ্ছি আমার কিছু হয়নি, আমি সব করে দেখিয়ে দেব। আমি কিন্তু কিছুই করে দেখাতে পারব না। ভেতর থেকে যদি আমার দৃঢ়তা এসে থাকে, এটা আমি করবই, এই আত্মবিশ্বাস থাকার অর্থ হচ্ছে অন্তর্যামীকে বলা হয়ে গেছে, আর অন্তর্যামী জানেন যে এটা হবে। তাহলে কেউ বলতে পারে যে, ছেলেটা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারল না কেন? কারণ ছেলেটা ভালো ভাবেই জানে যে আমার পড়াশুনা নেই, আমার দ্বারা এই পরীক্ষা পাশ করা হবে না। কিন্তু আমি যদি কারুর জন্য প্রার্থনা শুরু করি, তার অনেক ঐশ্বর্য হোক, তার অসুখ ভালো হয়ে যাক, সেখানেও প্রার্থনা ফলপ্রসু হওয়ার খুব কম সম্ভবনা। ফলপ্রসু হবে, যদি অনেকে মিলে তার জন্য প্রার্থনা করে, তাতেও নির্ভর করবে যার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে সে অন্তর থেকে কি চাইছে।

এখন যদি সবাইকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনারা কি কেউ এক কোটি টাকে নেবেন। বেশির ভাগই বলবেন না না এক কোটি টাকা দিয়ে আমি কি করব, আমার লাগবে না। কিন্তু এখন কোন যাদুবিদ্যার

কৌশলে লাগ্ ভেলকি লাগিয়ে সবাইকে এক কোটি টাকা করে দেওয়া হলে সবাই কিন্তু আমরা নিয়ে নেব। কারণ আমাদের মন মুখ এক নয়, ভেতরে কোথাও চাইছি, কিন্তু মুখে বলব না। সমস্যাটা আরও গভীরে রয়েছে, আমি জানি যে ঐ টাকা পাওয়ার অধিকারই আমার নেই, অর্জন করার ক্ষমতাই নেই। কিন্তু অন্তর্যামীর কাছে যদি নিজেকে পরিষ্কার করে বলতে পারি এটা আমার পাওয়ার কথা, এটা পাওয়ার আমি যোগ্য, আমি এটা পাব। হতে পারে এই মুহূর্তেই আমি পেলাম না, কিন্তু আজ হোক কিংবা কালই হোক ওটা আসবেই আসবে, কেউই আটকাতে পারবে না। স্বামীজী যে বলছেন, অদম্য ইচ্ছা শক্তির কাছে হিমালয় চূর্ণ হয়ে যাবে, সাগর শুকিয়ে যাবে। স্বামীজীর এই বাণী একেবারেই বাস্তব সত্য। কারণ অন্তর্যামী হচ্ছেন সেই চৈতন্য সত্তা, চৈতন্য সত্তা যা বলবে তাইই হবে। চৈতন্য সত্তার ক্ষমতাতো ভগবানরই ক্ষমতা।

কিন্তু ভগবান তো নিজে একটা আহাম্মক কিছু নন। আমরা বেশির ভাগই মনে করি ভগবান একজন আহাম্মক ছাড়া আর কিছু নন। তাই শনিবার পাঁচ সিকের বাতাসা নিয়ে মাকালীকে বলব আর মাকালী কিছু একটা করে দেবেন। কিন্তু মাকালী কিছুই করবেন না, করবেন আমার অন্তর্যামী। চিকাগো ধর্মসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বামীজী যখন বলছেন 'হে আমার আমেরিকাবাসী ভাই ও ভগিনীগণ' স্বামীজীর অন্তর্যামী তখন ভেতরে কি বলছেন তাঁকে? এরা লোক না পোক। স্বামীজী প্রথমে চিকাগো ধর্মসভায় মঞ্চে উঠে ভাষণ দিতে চাইছিলেন না, বার বার ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ স্বামীজী ঠাকুরের একটা দিব্য দর্শন পেলেন। ঠাকুর স্বামীজীকে বলছেন, উঠে আয়, কাকে ভয় পাচ্ছিস, এগুলো লোক না পোক? ঠাকুর বলতে চাইছেন, সভাতে এরা যারা বসে আছে, এরা কি মানুষ, এরা তো সব পোকামাকড়, এদেরকে তোর ভয়! এর পর স্বামীজী ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন। এখন পোকামাকড়রা কি করবে, সিংহের সামনে ছাগল, ভেড়ার যা অবস্থা হয়, এদেরও তাই অবস্থা। এটাই হতে বাধ্য, কিছু করার নেই এখানে। উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে বাধ্য তারা, ঐ চৈতন্য সত্তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। এখন যদি সেখানে সেই সময় ঠাকুর সশরীরে উপস্থিত থাকতেন তখন উল্টোই হত, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হয়তো আরও জোরে হাততালি দিয়ে বলতেন এই দ্যাখো চৈতন্য সত্তার প্রকাশ।

এখন মনে মনে হৃদয়ের মধ্যে আমি যদি দীন হয়ে যাই, শোকাকুল হয়ে যাই, হতাশ হয়ে থাকি, তখন কিন্তু আর কোন কাজ করা যাবে না। আমাকে যত রকমের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হোক না কেন আমি কোন কাজেই আর সফল হতে পারব না। এখানে সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথাই বলতে চাইছেন, এই রকম দীনভাব, শোকাকুল, উৎসাহহীন হয়ে গেলে মানুষ প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। এটাই নিয়ম। শুধু যে নিরুৎসাহ, দীনতা, শোকাকুল অবস্থা নিয়ে বলা হচ্ছে তা নয়, যে কোন চিন্তা, আমি ভেতর থেকে ঠিক করে জানি এইটাই হবে, তাই বলে আকাশ কুসুম কল্পনার কথা বলা হচ্ছে না, যেমন আমি বিরাট অফিসার হতে চাইছি, তেণ্ডুলকারের মত ক্রিকেট খেলব, আর এগুলোকেই মনের মধ্যে পুষে যাচ্ছি, তাই বলে এগুলো কখনই ফলপ্রসু হবে না। সেটাই হবে যেটা ঠিক ঠিক তার অন্তর্যামী, তার চৈতন্য সত্তা জানেন, আমার এটাই হবে, তখন সেইটাই হবে। যার জন্য যাদের জীবন পরে খুব সাফল্য মণ্ডিত হয় ছোটবেলা থেকেই তাদের মানসিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস একটা অন্য ধরণের। মহাত্মা গান্ধী ছোটবেলায় 'সত্য হরিশ্চন্দ্র' নামে একটা নাটক দেখেছিলেন। ঐ নাটকটা দেখে গান্ধীজী দারুণ ভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন, প্রচণ্ড অনুপ্রাণীত হয়ে পরের দিকে যে তিনি সত্যবাদী হয়েছিলেন, ভালো করে দেখলে এর সাথে সেই ছোটবেলায় দেখা সত্য হরিশ্চন্দ্রের কোথাও একটা যোগসূত্র পাওয়া যাবে। কারণ গান্ধীজীর অন্তর্যামী ঐ সত্যকে মূল্য দিচ্ছেন। ছোটবেলা থেকে গান্ধীজী সত্যকে মূল্য দিয়ে এসেছেন বলে জীবনের পরবর্তি অধ্যায়ে তাঁর পুরো ব্যক্তিত্ব এই সত্যের উপর আধারিত হয়েছিল।

কেউ যদি ছোটবেলাতেই মারা যায়, কেউ যদি আত্মহত্যা করে নেয়, কিংবা যদি কেউ পাগল হয়ে যায়, সব ক্ষেত্রেই কোন একটা সময় দেখা যাবে সে তার অন্তর্যামীকে খুব গভীর ভাবে বলেছিল যে, আমি আর পেরে উঠছি না। তুমি পারছো না বলছ, ঠিক আছে, তাহলে তুমি কি পাগল হতে চাও, নাকি

আত্মহত্যা করে নিতে চাও? যে কোন একটা করে নিলে এই মুহূর্তে তোমাকে আর কষ্ট ভোগ করতে হবে না। কিন্তু তোমার রেহাই নেই। তুমি আবার যখন ফিরে আসবে তখন ওখান থেকেই শুরু করতে হবে। যখন সে অন্তর্যামীকে বলে দিয়েছে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই, তখন তাকে অন্তর্যামী আত্মহত্যা করিয়ে ছাড়বেন। যে রকমটি ভেবেছে অন্তর্যামী সেইটিই করিয়ে ছাড়বে, চৈতন্য সত্তা কিনা।

এখন কোন একটা বিশেষ সমস্যার জন্য সে ভেবেছে আমি আত্মহত্যা করব, আবার যখন অন্য কোন একটা বিশেষ কারণে যদি বলে সে আত্মহত্যা করব না, তখন অন্তর্যামীর কাছে কোন খবরটা যাবে? খবর একটাই যাবে, দুটো খবর যাবে না। বৈপরিত্য মূলক জিনিষ অন্তর্যামীর কাছে থাকবে না, একটাই থাকে। তখন অন্তর্যামী দেখেন তার মনের কথা কোনটা আর মুখের কথা কোনটা। যেটা মনের কথা সেটাই থাকবে, মন যেটা ভেবে রেখেছে সেটাই হবে, মনের কথা থেকে আর তাকে বাঁচান যাবে না। যারা কম বয়সে মরে যায়, হঠাৎ একটা অসুখ করল আর মরে গেল, এদের কোন এক জন্মে কোথাও একটা মৃত্যুর ইচ্ছা হয়েছিল সেটা থেকে গেছে।

যার কোন কিছুর প্রতি যদি দুর্বলতা থাকে, আর সে যদি দিন রাত তার উল্টো চিন্তা করতে থাকে, ধরুন তার কোন একটা পাপ করার প্রবৃত্তি আছে, হয়তো সে খুব মিথ্যে কথা বলে, সে নিজেও জানে যে আমি খুব মিথ্যে কথা বলি, অন্তর্যামী ওকে দিয়ে মিথ্যে কথাই বলাবে, কোন অবস্থাতেই তাকে দিয়ে সত্যি কথা বলাবেন না। এখন সে যদি কোন কারণে সচেতন মন নিয়ে দিবারাত্র বলতে থাকে আমি এবার থেকে সত্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকব, এইভাবে চিন্তা করতে করতে যদি মনের এই কথাটা অন্তর্যামীর কাছে পৌঁছে যায় তাহলে অন্তর্যামী ওর সেই মিথ্যে কথা বলার প্রবৃত্তিটাকে ফেলে দেবে। একবার যখন ফেলে দিল, তখন আর তাকে সত্য থেকে টলান যাবে না। শক্তির ব্যাপারেও ঠিক এটাই হয়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – যত দোষই করো না কেন, একবার ভগবানের কাছে গিয়ে যদি বল এই রকমটি আর করব না, তৎক্ষণাৎ সে সেই পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কারণ অন্তর্যামীকে সে এতদিন এক রকম বলে আসছিল, এখন সে অন্য রকম বলে দিয়েছে। কিন্তু এটা মুখের কথা হলে চলবে না, ভেতরের কথা হতে হবে।

সুগ্রীব এই ব্যাপারটাই শ্রীরামচন্দ্রকে বোঝাতে চাইছেন – 'হে শ্রীরামচন্দ্র, আপনি এই ভাবে হতাশ হয়ে নিশ্চুপ বসে থাকবেন না, আপনি উঠুন, আমরা করবই। মানুষের সব সময় উচিৎ - **যত্তু কার্যং মনুষ্যেণ শৌটীর্যমবলম্ব্যাতাম্**।৬/২/১৪ – শোক মানুষের শৌর্যকে বিনাশ করে দেয়, আপনি বীর এই ভাবে শোক করে আপনার শৌর্যকে শেষ করে দেবেন না। শৌর্যকে অবলম্বন করুন, কেন পারব না, অবশ্যই পারব এই মনোভাব নিয়ে নেমে পড়তে হবে। তখন তার ব্যক্তিত্ব অলঙ্কৃত হয়ে যায়। সুন্দরী মেয়েকে খুব সুন্দর অলঙ্কার দিয়ে সাজান হলে যেমন তার সৌন্দর্য আরো বেড়ে যায়, ঠিক তেমনি যে পুরুষ শৌর্যকে অবলম্বন করে নেয়, হ্যাঁ আমি করবই, এই রোখ যখন এসে যায় সেই পুরুষের ব্যক্তিত্ব পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। শৌর্যকে অবলম্বন করার আগে সেই জিনিষের প্রতি শ্রদ্ধা আনতে হবে, শ্রদ্ধার পর যখন শৌর্যকে অবলম্বন করে নেবে তখন জগতের কোন শক্তি নেই যে তার সামনে দাঁড়াতে পারবে। তার মানে এই রোখ যখন এসে যায় তখন বুঝে নিতে হবে তার চৈতন্য সত্তাকে বলা হয়ে গেছে।

সুগ্রীব বলছেন – হে শ্রীরামচন্দ্র, যখন কোন জিনিষ হারিয়ে যায়, বা নষ্ট হয়ে যায়, সেটার জন্য মানুষের যে শোক হয়, শোক মানে একটা জিনিষ ছিল সেটা চলে গেছে, তখন মানুষ শোকে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। যখন মানুষ শোকে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, প্রথমে তার তেজটা নষ্ট হয়ে যায়। তেজ যখন ক্ষয় হতে থাকে তখন ধৈর্য লাগিয়ে সেই তেজকে ধারণ করে রাখতে হয়। তেজ হারিয়ে সে যেন মাটিতে না লুটিয়ে পড়ে যায়। যদি মাটিতে না লুটিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে সেখান থেকে ধৈর্যকে অবলম্বন করে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে। একটা বটবৃক্ষের সব ডালপালা কেটে দেওয়া হয়েছে, তার পরেও যদি কোথাও তার একটু প্রাণ থাকে তাহলে সেখান থেকেই সে আস্তে আস্তে আবার ডালপাল বিস্তার করতে থাকবে।

হে শ্রীরামচন্দ্র, আপনি এখন শোকাকুল, ঠিক আছে, আর কিছুই না পারুন কিন্তু আপনি শত্রুর প্রতি ক্রোধ নিয়ে আসুন। শত্রুর প্রতি রোখ নিয়ে এলেও আবার আপনার হারান তেজ ফেরত চলে আসবে।

এগুলোই বাল্মীকির মানব মনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সুগ্রীবের মাধ্যমে বলা হচ্ছে। একটা পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে বাল্মীকি এই ভাবে বিশ্লেষণ করছেন – যে জায়গা থেকে ভেতরটা শোকাকুল হয়ে গেছে, সেই জায়গাতে যাকে শত্রু বলে চিহ্নিত করা যাবে, তার প্রতি ক্রোধ নিয়ে আসতে হবে। তেজ আর ক্রোধ এই দুটো খুব কাছাকাছি। মানুষ যখন রেগে যায় তখন একটা শক্তির প্রকাশ হয়, আবার যখন তেজ আসে তখনও একটা শক্তির প্রকাশ হয়। শক্তি এখানে একই রকম মনে হবে কিন্তু দুটোর প্রকাশ আলাদা। স্বামীজীর যে তেজ ছিল, সেই তেজ হলে চেহারার মধ্যে ঔজ্জ্বল্য বেড়ে যায়। হিটলারের আবার রাগ ছিল, তেজ ছিল না। তেজস্বী, যিনি স্বাভাবিক রূপে দীপ্যমান, কান্তিমান, তার যদি তেজ কোন কারণে কমে যায়, তখন তাকে রোখ করতে হয়। ঠাকুরও বলছেন খুব রোখ করতে।

মারিও কুজোর বিখ্যাত উপন্যাস ‘গড ফাদার’, যাকে নিয়ে পরে খুব জনপ্রিয় সিনেমাও হয়েছিল। আমেরিকার সিসিলির মাফিয়াদের নিয়ে কাহিনী। এর যে আসল গড ফাদার ছিল সে বুড়ো হয়ে গেছে। তার যে বড় ছেলে, তাকে কায়দা করে খুন করে দেওয়া হয়েছে। মেজো ছেলেটি ছিল একেবারে অপদার্থ। ছোট ছেলেকে নিয়ে আসা হয়েছে পরবর্তি গড ফাদার তৈরী করার জন্য। কিন্তু কেউ কোন দিন ভাবেনি যে ছোট ছেলেটি একজন সফল আর অতি কঠোর একজন গড ফাদার হতে পারবে। গড ফাদারের কাজই হচ্ছে, একে শেষ করে দাও, একে গুম্ করে দাও ইত্যাদি। ছোট ছেলেটি ছেলাবেলাতে এত নরম প্রকৃতির ছিল যে, কারুর মনেই হত না সে এত কঠোর আর নিষ্ঠুর হতে পারবে। কাহিনীর শেষের দিকে একটা বদলার ব্যাপার ছিল। এই নতুন গড ফাদার একটা বদলা নেবে। যাকে বদলা নেবে সে কিন্তু গড ফাদারের এখন ভগ্নীপতি হয়ে গেছে। ভগ্নীপতি ছেলেটিকে এক সময় এমন মেরেছিল যে তার ঠোঁটটা কেটে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। অনেক দিন হয়ে যাওয়ার পরও ছেলেটি ঠোঁটের ক্ষতটাকে কিছুতেই চিকিৎসা করাচ্ছিল না। তার স্ত্রীও অনেকবার বলছে যে তুমি কেন সারাচ্ছ না, প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে ঠোঁটাকে সারিয়ে নাও। কিন্তু কিছুতেই সে সারাবে না। কেউই এর গূঢ় রহস্যটাকে ধরতে পারছে না। আসল রহস্য হচ্ছে, রোজ যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করে তখন ঠোঁটের ঐ ক্ষতটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজেকে মনে করিয়ে দেয়, এর বদলা নিতে হবে। শেষে একটা অবস্থা এল, সে নিজের হাতে তার নিজের ভগ্নীপতি একটা দোষ করেছিল সেই অজুহাতে খুন করে দিল। সে নিজের বোনকে অত্যন্ত ভালোবাসে, তখন ওর সাকরেদরা এসে ছেলেটিকে সেলাম করে গেল। তুমি আমার গায়ে হাত তুলেছিলে, আর তুমি বাঁচবে না। বোন তার খুব আদরের বোন, বোন আবার নিজে ভালোবেসে বিয়ে করেছে, বোন আবার যতদিন ধরে ছোড়দার ঠোঁটের ক্ষত দেখছে ততদিন ধরে সে ভয়ে কাঁপছিল। ভগ্নীপতিকে গুলি করে খুন করে দেওয়া হয়ে গেল, তারপর ক্ষতটা প্লাস্টিক সার্জারি করে সারিয়ে নিল। এইটাই হচ্ছে রোখ।

শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণের ধর্মই ঠিক ঠিক ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম। এখানে বাল্মীকি কি বলছেন – বদলা না নিয়ে ছাড়াছাড়ি নেই, তোমার স্ত্রীকে হাত দিয়েছে, ওর আর নিস্তার নেই, সংহার করে দাও ওকে, ওর পুরো জাতটাকেই শেষ করে দাও। এটাই আসল হিন্দু ধর্মের ছবি। আমাদের মুনি ঋষিরা গরুর মাংস সুরা সব কিছুই খেতেন। কিন্তু গোলমালটা লাগল শুক্রাচার্যের অভিশাপে। অভিশাপ দিলেন, যে ব্রাহ্মণ মদ খেয়ে মাতলাম করবে তাকে ব্রাহ্মণত্ব থেকে বার করে দেওয়া হবে। শুক্রাচার্য ছিলেন অসুরদের গুরু, বৃহস্পতি ছিলেন দেবতাদের গুরু, দুজনেই খুব উচ্চকোটির ব্রাহ্মণ। আর অগস্ত্য মুনিকে এমন মাংস খাইয়েছিল যে তারপর তিনি অভিশাপ দিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণ যেন মাংস না খায়। তারপর থেকে ব্রাহ্মণদের মাংস না খাওয়াটাই আস্তে আস্তে আমাদের পরম্পরাতে স্থায়ী হয়ে গেল। ভারতীয় ধর্মের মধ্যে এখন যে দুর্বলতাটা এসেছে, এই দুর্বলতার ভাবটা এসেছে বৌদ্ধ আর জৈনদের সময় থেকে। আগে এই সব ক্ষমা টমার কোন ব্যাপারই হিন্দুদের মধ্যে ছিল না, হ্যাঁ, একটা দুটো খুব বেশি হলে তিনটে সুযোগ দেওয়া হত,

তারপরেও যদি তুমি না শোধরাও তাহলে তোমার বংশ শুদ্ধু উপড়ে ফেলে দেব, তোমার আর বাঁচার কোন অধিকারই নেই, তুমি শেষ।

সুগ্রীব বলছেন – প্রভু আপনার তেজ নষ্ট হয়ে গেছে, আপনার তেজকে ফিরিয়ে আনুন। কিভাবে তেজকে ফিরিয়ে আনতে হবে? শত্রুর উপর ক্রোধ করুন। এই ক্রোধ যদি না আনা হয়, রোখ যদি না করা হয় তাহলে মানুষ বর্ষাকালের কেঁচো, ক্যাড়া, গুগলীর মত হয়ে যায়, এরা যেমন মাটিতে বুক ঠেকিয়ে চলে, তেজহীন মানুষের বুক পেট মাটিতে ঠেকে যায়। আগে ঠিক করে নিতে হবে আমার দুষমনটি কে, কে আমাকে এগোতে দিচ্ছে না। শ্রীরামচন্দ্রের মনে অশান্তির সৃষ্টি কে তৈরী করেছে? সীতার অপহরণই শ্রীরামচন্দ্রের মনে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। কে অপহরণ করেছে? রাবণ। তাহলে ওকে শেষ করে দাও। আমি এখন ঠিক করে নিয়েছি আমি আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাই, আমি ব্রহ্মজ্ঞান চাই, ঈশ্বর দর্শনই আমার জীবনের মূল লক্ষ্য করে নিয়েছি। এর জন্য আমার টাকা পয়সা চাইনা, আমার নারীসঙ্গ চাইনা, আমি সমাজে প্রতিষ্ঠা চাইনা, দেশ বিদেশ ঘুরতে চাইনা। কিন্তু আমার আত্মজ্ঞানের পথে কে বাধা সৃষ্টি করছে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য আর তার সাথে কুসংস্কার, এগুলোই আমার পথের বাধা, এরাই আমার চরম শত্রু। যখন শত্রুকে চিনে নিলাম, ঠিক আছে আমি এদেরই নাশ করে দেব। এদের বশীভূত হয়ে আমি কোন কাজ করবই না।

এক সাধু এক নির্জন জনবসতি শূন্য জঙ্গলে অনেক দিন ধরে তপস্যা করছিলেন। একদিন সন্ধ্যের দিকে সাধনায় মগ্ন আছেন, সেই সময় তার কর্ণে মেয়েদের পায়ের নুপূরের আওয়াজ ভেসে আসে। তিনি চিন্তা করলেন নিশ্চয়ই কোন নারী এখানে এসেছে। অনেক দিন কোন নারীর মুখ দেখেননি। তখন তিনি আসন থেকে উঠে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছেন মহিলাটি কি রকম দেখতে। মেয়েটিকে দেখেই তার হঠাৎ বিবেকে দংশন হতে লাগল। এটা কি হল! আমি একটা মেয়ের শরীর দেখার জন্য ধ্যান ছেড়ে আসন থেকে উঠে পড়লাম! ঠিক আছে, এই যে আমার সাধনায় বিঘ্ন হল, এই বিঘ্ন কে করল? আমার মন বিঘ্ন করল, চোখ দেখতে চাইল। এরা দুজন কার সাহায্য নিল? আমার পায়ের সাহায্য নিল। পা তুমি শোন, আজ থেকে তোমাকে আর হাঁটাচলা করতে দেওয়া হবে না। এই রোখ করে সেই যে আসনে বসে পড়লেন আর উঠলেন না। ঐখানেই বসে বসে ধ্যান করতে করতে তার জীবনটা একদিন শেষ হয়ে গেল।

যারা সাধক হতে চান, তাদের কাছে এই ঘটনা গুলো খুব উদ্দীপক ও উৎসাহদায়ক, সাধক জীবনে এই রকম রোখ করতে হয়। আমরা প্রায়ই মনের সাথে চালাকি করে একটা মিটমাট করে নিই, কিছু একটা দুর্বলতা আছে যেটা আমি জানছি সাধন ভজন করতে করতে কিছুদিন পরে চলে যাবে। এটা অন্য জিনিষ, কিন্তু একবার যখন বুঝে নিয়েছি এই জিনিষটা আমার বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, মনে অশান্তি তৈরী করছে, রাত্রে ঘুমোতে দিচ্ছে না, খাওয়া হজম হতে দিচ্ছে না, তখন রোখ করে এই বিঘ্নকে সমূলে বিনাশ করে দিতে হবে। রাবণ হল আমাদের বাইরের শত্রু, কিন্তু আমাদের অন্তরে তার থেকেও অনেক ভয়ঙ্কর শত্রুরা সব বাসা বেঁধে রয়েছে।

শ্রীরামচন্দ্র আবার হনুমানকে জিজ্ঞেস করছেন রাবণের লঙ্কা নগরী কেমন দেখলে। হনুমান রাবণ আর লঙ্কার বর্ণনা করে প্রথমে রাবণের সম্বন্ধে বলছেন 'রাবণ সব সময় যুযুৎসু'। যুযুৎসু মানে যুদ্ধের জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকা, যুদ্ধ করতে পারলে রাবণের বিরাট আনন্দ, যেটা ক্ষত্রিয়দের ধর্ম। 'রাবণ তার স্বভাব থেকে কখন বিচলিত হয় না, সব সময় – **উত্থিতাশ্চাপ্রমত্তশ্চ বলানামনুদর্শনে**।।৬/৩/১৯। মানে, কখনই রাবণ অশান্ত চিত্ত হয় না, সর্বদাই তার মধ্যে ধীর ভাব পরিলক্ষিত হয়'। হনুমান যখন প্রথমে এত কাণ্ড করতে শুরু করেছিলেন তখন সে-ই হুড়মুড় করে নিজেই হনুমানের সাথে লড়াই করতে নেমে পড়েননি, যখন যেমন যেমন যোদ্ধাদের, যেমন যেমন সৈন্যদের পাঠানোর দরকার হয়েছে সেইভাবে পাঠিয়ে রাবণ হনুমানকে আটকাবার চেষ্টা করে গেছে। এমনকি হনুমানকে যখন বেঁধে রাজ দরবারে নিয়ে আসা হল, তখনও রাবণ নিজে একটা প্রশ্ন না করে মন্ত্রীকে দিয়ে প্রশ্ন করিয়েছে। এতেই বোঝা যায় রাবণের নিজের

উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ। এই ধরণের মানুষকে কাবু করা খুব কঠিন। এত বড় সংহার হয়ে গেলে লঙ্কায়, সেই সংহারের সময়েও নিজের মনটাকে স্থির রেখে দিয়েছে। এই ধরণের যাদের মন স্থির থাকে যুদ্ধের সময় এরাই প্রচণ্ড বিপজ্জনক হয়। যার জন্য মহাভারতের যুদ্ধে, এমনকি বাল্মীকি রামায়ণেও দেখা যায় শত্রু পক্ষের যোদ্ধাকে রাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রেগে যাওয়া মানে তার অর্দ্ধেক শক্তি ওখানে ক্ষয় হয়ে যাওয়া।

এরপর হনুমান লঙ্কা নগরীর সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন – চার রকমের দুর্গ লঙ্কাকে ঘিরে আছে, নদী দিয়ে ঘেরা, পাহাড় দিয়ে ঘেরা, জঙ্গল দিয়ে ঘেরা আর কৃত্রিম দিয়ে ঘেরা। কৃত্রিম মানে পরিখা, কেল্লার চারিদিকে চক্রাকারে একটা খাল কেটে দেওয়া হয়। যে কোন দুর্গকে রক্ষা করার জন্য এই চার ধরণের সুরক্ষা থাকে, যেমন নদী, নদী পার হওয়া তখন খুব কষ্টসাধ্য ছিল, আলেকজাণ্ডারের কাছে নদী পার হওয়ার সমস্যাটা সব সময় ছিল। গ্রীস থেকে যখন আলেকজাণ্ডার ভারতের দিকে এসেছিলেন, তখন তাকে এই ধরণের বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেহেতু লঙ্কা এই চারটে জিনিষ দিয়েই সুরক্ষিত হয়ে আছে, তাই লঙ্কাকে আক্রমণ করা খুব সহজ হবে না। আর তার যে রাজা, তার মধ্যে এই গুণ গুলো রয়েছে – শান্ত চিত্ত, স্বস্থ, স্বস্থ মানে নিজের মধ্যে অবস্থিত থাকা, আবার যুযুৎসু, একদিকে মন তার শান্ত আবার অন্য দিকে যুদ্ধের জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে আছে। এদের সাথে যুদ্ধ করা খুব কঠিন।

এইসব কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পর সুগ্রীব এবার তার সেনাপতিদের নির্দেশ দিতে শুরু করেছেন। নীলকে দায়ীত্ব দেওয়া হল সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তাকে বলা হল সেই পথ দিয়েই যেতে হবে যে পথে গেলে প্রচুর ফলফলাদি পাওয়া যাবে, শীতল ছায়া পাওয়া যাবে, ঠাণ্ডা জল পাওয়া যায় আর পর্যাপ্ত মধু পাওয়া যাবে। বানররা এই জিনিষ গুলোই বেশি পছন্দ করে। সৈন্যরা যখন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় চলাচল করে তখন তাদের কয়েক জনের একমাত্র কাজ হচ্ছে ঠিক ঠিক সহজ পথ আর সুবিধাগুলোর দিকে নজর দেওয়া। মিলিটারিতে প্রতিদিনের খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখাটা একটা বিরাট সমস্যা।

রাশিয়ার উপরে দুটো সব থেকে বড় আক্রমণ হয়েছিল, প্রথম আক্রমণ হয়েছিল নেপোলিয়নের দ্বারা আর দ্বিতীয় হিটালারের দিক থেকে। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়াকে আক্রমণ করেছিল, রাশিয়া তখন দেখল আমরা নেপোলিয়নের সাথে লড়াই করে কখনই পেরে উঠব না। নেপোলিয়ন পুরো ইউরোপকে জয় করে নিয়েছেন তখন। যখন নেপোলিয়ন আক্রমণ করেছিল, তখন রাশিয়ার সৈন্যরা একটু একটু করে বিলম্ব করে যেতে লাগল। যখন অক্টোবর নভেম্বর মাস এসে গেল চারিদিকে ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, তখন রাশিয়ান সৈন্যরা প্রাণ নিয়ে পেছনে মস্কোর দিকে পালাতে শুরু করে দিল। মনে করুন পাকিস্থানের দিক থেকে আক্রমণ শুরু করেছে, তখন পুরো ভারত সরতে সরতে পেছনের দিকে কলকাতার কাছে চলে এসেছে, সৈন্যরা সব ঘোড়ার পিঠে করে আসছে। তারপর প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। ফরাসী থেকে মস্কো অত লম্বা পথ পেরিয়ে, প্রায় দু হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে। তার মধ্যে টুকটাক যুদ্ধও চলছে, রাশিয়নদের যারা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে তারা সব প্রাণ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে আর যাবার আগে সব পুড়িয়ে রেখে যাচ্ছে। নেপোলিয়নের সৈন্যরা যত ভেতরের দিকে এগিয়ে এসেছে, রাশিয়ানরা আবার অন্য দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে এদের সাপ্লাই লাইনটা কেটে দিয়েছে। নেপোলিয়নের সৈন্যদের খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। কারণ যেখান দিয়েই এরা পালাচ্ছে সেখানকার সব কিছুই পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে পেছন দিক থেক যে খাবার দাবার আসার কথা তার পথটাও উড়িয়ে দিয়েছে। একদিকে খাবার নেই, অন্য দিকে বরফ পড়ছে। দিনের পর দিন এই অবস্থাতে থেকে শেষে তারা প্রাণ নিয়ে উল্টো দিকে পালাতে শুরু করল, অন্য দিকে রাশিয়ান সৈন্যরা মাঝে মাঝে ঘিরে নিয়ে এদের উপর আক্রমণ করছে, এতেও এদের অনেকেই মরছে। শেষে এমন অবস্থা হয়েছিল যে, ওদের যে ঘোড়াগুলো মারা যাচ্ছিল তার কাঁচা মাংস খেতে আরম্ভ করল। মানে রান্না করার আগুন পর্যন্ত নেই। নেপোলিয়ন প্রথমে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে রাশিয়াকে আক্রমণ করেছিল, শেষে যখন ফিরল তখন মাত্র তিরিশ হাজার

সৈন্যই ফিরতে পেরেছিল, আর পুরো বাকী সৈন্যরা রাশিয়ার ঐ ঠাণ্ডায় না খেয়ে মারা গেল। এখানেও সুগ্রীব প্রথমেই নীলকে বলে দিলেন যে, তুমি এমন পথ দিয়ে এগোবে যে পথে গেলে জল, ফল আর মধু পাওয়া যাবে, বানর সেনা কিনা তাই ফলের বেশি প্রয়োজন।

সুগ্রীব বলছেন – রাবণ খুব ধুরন্ধর লোক, সে তো অবশ্যই খবর পেয়ে যাবে, তাই রাস্তায় যত জলাশয় আছে তাতে আর খাবার দাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। এই কাজ সব সৈন্যরা করে থাকে, এখনও অনেক জায়গায় কুয়োতে বিষ ফেলে দেওয়া হয়। শত্রুকে মারতে হবে, অনেক রকম উপায় উদ্ভব করে যে করেই হোক শত্রুকে মারো। যুদ্ধে তাই হবে, আমি তোমাকে না মারলে তুমি আমাকে মারবে, তুমি আমাকে না মারতে পারলে আমি তোমাকে মেরে দেব, একটু এদিক ওদিকে ব্যাপারের মাঝখানে দুজনের জীবন দাঁড়িয়ে আছে।

আবার এখানে লক্ষণের উল্লেখ পাই, বাল্মীকি রামায়ণেই আমরা প্রথম বিভিন্ন লক্ষণের কথা পাই। সুগ্রীব এই লক্ষণ দেখে বলছেন – আমরা যা সব লক্ষণ দেখছি তাতে আমি পরিষ্কার যে সীতাকে আমরা উদ্ধার করতে পারবই পারব, আর এই যুদ্ধে আমরাই জিতব। অন্য দিকে বাল্মীকি যখন লঙ্কা যুদ্ধের প্রস্তুতির বর্ণনা দিচ্ছেন তখন সেখানে বলবেন রাক্ষসরা সব অশুভ লক্ষণ দেখছিল।

বেদ হল আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ, কারণ বেদ গুরু-শিষ্য পরম্পরাতে চলে আসছিল। বেদের বাইরে সমাজে তখন অন্য যা কিছু রীতিনীতি, কাহিনী, তখনকার মানুষের ধারণা বলতে যা কিছু ছিল, এগুলো গুরু-শিষ্য পরম্পরা ছিল না, লেখার পদ্ধতিও ততটা উন্নতি হয়নি। বাল্মীকি রামায়ণই প্রথম লিখিত শাস্ত্র। সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণ পড়লে তৎকালীন সমাজের একটা ধারণা পাওয়া যায়, কি অবস্থায় তখন সমাজ ছিল। কোন এক সমাজ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কতটা উন্নত তার মাপকাঠি হল ভাষা। একজন মানুষ যে ভাষা ব্যবহার করছে তাতে বোঝা যায় সেই মানুষটি কত সুসংস্কৃত। যে সমাজে খুব মার্জিত, রুচি সম্মত ভাষা ব্যবহার করা হয় বুঝতে হবে সেই সমাজ সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত। মানুষ মানসিক ভাবে কতটা উন্নত, সে কতটা সুসংস্কৃত তার ভাষাই বলে দেবে। আজকের যুগে মোবাইল ফোনে যে ধরণের ভাষা এস/এম/এস করতে ব্যবহার হচ্ছে, তাতে বোঝা যায় যে আমরা ভাষার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি, ভাষার জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে কখন কেউ সুসংস্কৃত হয় না, সুসংস্কৃত না হওয়া মানে তার মনও নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। মন নিয়ন্ত্রণ না থাকা মানে একটু কিছু হলেই গলায় দড়ি দিয়ে দেবে। পুরো সমাজ এখন ক্রমশ ড্রাগস আর আত্মহত্যার প্রবণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের যেমন মৃত্যু অবধারিত, তেমনি যুবক ছেলেমেয়েরা যখন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অবহেলা করে বিদেশী অপসংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হবে তাদেরও এই ধরণের মৃত্যু অবধারিত। আমাদের নতুন প্রজন্ম যে কোন্ দিকে এগোচ্ছে তারা নিজেরাই জানেনা।

বাল্মীকি যে ভাষাকে তাঁর লেখাতে ব্যবহার করেছেন সেটা তাঁর তৈরী করা ভাষা নয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ভাষাতে গীতাঞ্জলী লিখেছেন, গীতাঞ্জলীর ভাষা রবীন্দ্রনাথের নিজের তৈরী নয়। একটা ভাবকে ব্যক্ত করবার জন্য দু-চারটে শব্দকে তিনি তৈরী করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন সেই ভাষাই বঙ্গ সমাজের যাঁরা সুসংস্কৃতবান লোক, তাঁরাই অনেক দিন ধরে ব্যবহার করে আসছেন। ইদানিং কালে ইংরাজী ভাষায় কত বই ছাপা হচ্ছে, তার যে কোন একটা বই পড়লেই বোঝা যাবে দিল্লী বোম্বের লোকেরা কি ভাষা ব্যবহার করছে। একশ বছর আগেকার কোন উপন্যাস পড়লে বোঝা যাবে তখন মানুষ কি ভাষা ব্যবহার করত। বর্তমান কালের ভদ্র বাঙ্গালী সমাজ কি ভাষা ব্যবহার করছেন সেটাকে জানতে হলে ইদানিং কালের বাংলার যাঁরা শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের সাহিত্যে কি ধরণের ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে জানতে হব, তাতে তাঁর বই বাজারে চলুক আর নাইই চলুক সেটা কোন বড় কথা নয়, তাঁর লেখা বই নিয়ে তাঁর যে জীবনদর্শন আর তার যে ভাষার ব্যবহার কি রকম হয়েছে দেখতে হবে।

বাল্মীকি যখন শ্রীরামচন্দ্র আর গুহক সংবাদ লিখছেন, গুহক ছিলেন জংলী আদিবাসীদের সর্দার, তাই বলে বাল্মীকি সেখানে একটিও গেঁয়ো ভাষা ব্যবহার করেননি, অলঙ্কার যুক্ত সংস্কৃত ভাষাকেই তিনি সেখানে প্রয়োগ করেছেন। গুহক কি সংস্কৃত ভাষা জানত? গুহকের সংস্কৃত ভাষা জানার কথাই নয়। তাহলে বাল্মীকি কেন গুহকের ভাষাকে সেখানে রাখলেন না? কারণ যারা উচ্চমানের লেখক, তাঁরা ভাষার সঙ্গে কখনই আপোষ করেন না। ইদানিং কালে অনেক উঠতি লেখক, সাংবাদিকরা যে সব বই লিখছেন তাতে হেন কুৎসিৎ অশ্লীল গালাগাল নেই যে ব্যবহার করছেন। এরা হচ্ছে অসংস্কৃত। ইংরাজী ভাষাটা ভালো শিখে গেছে, আর ইংরাজী ভাষা শিখে নেওয়াটাই আজকের যুগের সুশিক্ষিত, সুসংস্কৃত নাগরিকের পরিচয়। ইংরাজী জানলেই একটা ভালো মোটা টাকার চাকরিও পেয়ে যাচ্ছে, টাকা এসে যাওয়াতে এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে নিচ্ছে।

বাল্মীকি যখন এখানে শুভ লক্ষণ, অশুভ লক্ষণের কথা লিখছেন, তখন বুঝে নিতে হবে এর অনেক তাৎপর্য আছে। বাল্মীকি নতুন কিছু লিখে সমাজে একটা নতুন ধারা প্রবর্তন করে দিচ্ছেন না। ভারতে এই জিনিষ গুলো খুব ভালো মতই প্রচল ছিল, সমস্যা হচ্ছে তখন লেখার প্রথা ছিল না বলে সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে সেই সময় এই জিনিষ গুলো আসেনি। দ্বিতীয় সমস্যা, বেদ যেমন গুরু-শিষ্য পরম্পরায় থেকে গেছে, কিন্তু তখনকার দিনের অন্যান্য সাহিত্য গুলো ঐভাবে না থাকার দরুন অনেক সাহিত্য হারিয়েও গেছে। বাল্মীকি রামায়ণে সেই সময়কার সমাজের অনেক খুঁটিনাটি তথ্যগুলিকে খুব প্রাঞ্জল ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে পাঁচ-ছয় হাজার পূর্বে ভারতের যে সমাজ ব্যবস্থা ছিল সেই সমাজ সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক উন্নত ছিল। এখানে যেমন সুগ্রীব বলছেন – আমাদের যে সেনারা অগ্রসর হচ্ছে, সেই সময় তাদের পেছনে শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে? মন্দ মন্দ গতিতে। যত পশু পাখি আছে সবাই মিষ্টি সুরে গান করছে, সূর্যের নির্মল কিরণে চারিদিক ঝলমল করছে, সর্বত্র একটা খুশির বাতাবরণ ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলোকে শুভ লক্ষণ বলা হচ্ছে, তার মানে, এনারা দেখেছেন যখন এই রকম হয় তখন এর পরেই ভালো কিছু হয়। এই জিনিষটা তো একটা প্রজন্মেই এদের মধ্যে এসে পড়েনি, অনেক প্রজন্ম ধরেই এনারা দেখে এসেছেন এই জিনিষ হলে এই এই জিনিষ গুলো হবে।

সব সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে, এখন পুরো দায়ীত্বটা সুগ্রীবের উপর, শ্রীরামচন্দ্রের এখন আর কোন কাজ নেই। তিনি সীতাকে নিয়ে আবার বিলাপ করতে শুরু করেছেন। ঠাকুর কথামৃতে একটা কথা একাধিকবার বলেছেন – পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। ব্রহ্ম যে কাঁদেন, এটা কতটা সত্য কতটা মিথ্যা আমরা জানিনা, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে দেখানো হয়েছে, কিন্তু থেকে থেকেই একটু সামান্য কিছুতেই শোক আর মোহ তাঁকে ঘিরে ফেলছে। এখন তাঁর পাশে অনেকেই এসে গেছেন, সুগ্রীব, হনুমান, পুরো বানর সেনা তাঁর পাশে, কিন্তু শোক তাঁকে কিছুতেই ছাড়ছে না।

এদিকে রাবণের কাছে খবর আসতে শুরু হয়ে গেছে। তিনিও বুঝে গেছেন কিছু একটা কাণ্ড হতে যাচ্ছে। রাবণের ওখানে অনেক শলাপরামর্শ চলছে, বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্ত্রণা দিচ্ছে। রাবণকে একজন বলছেন – মানুষ তিন রকমের হয়। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁরা একটা কিছু করার আগে বন্ধু বান্ধব, যাদের সাহায্যে কাজ করা হবে, সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে, খুব ভালোভাবে সব আনুষাঙ্গিক দিকগুলোকে চিন্তা করে ঐ কাজে হাত দেন। এঁরাই হলেন উত্তম পুরুষ, নিজের মত আর অন্যান্য সবার মতকে সমণ্বয় করে কাজে এগোবেন। যে মানুষ সব কিছু একাই করে, যেমন কর্তব্যের বিচার একা করে, ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপার একা করে, এর বাইরে যত রকমের কর্ম আছে সবই একা করে, এরা হল মধ্যম পুরুষ। যেমন, আমি ঠিক করলাম বেলুড় মঠ থেকে আমি দীক্ষা নেব, কিন্তু আমার বাড়ির কারুর মত নেই। এখন আমি ঠিক করলাম – ধ্যুর্, ওরা কি বলবে আমি দীক্ষা নেব কি নেব না, দীক্ষার ব্যাপারে ওরা কি বুঝবে! এরা হচ্ছে মধ্যম পুরুষ। কিন্তু আমি যদি বাড়ির সবাইকে বলি – দ্যাখো, আমার এখন বয়স হয়েছে, আমার

এখন ধর্মকর্মে মন দিতে ইচ্ছে হয়েছে, আমি চাইছি তোমরা সবাই এই দীক্ষার ব্যাপারে আমার পক্ষে সহমত হও। যারা সহমত হতে পারছে না, তাদেরকে বোঝাতে হবে কেন আমি দীক্ষা নিতে চাইছি। সবার সঙ্গে একমত হয়ে যখন কোন কাজে হাত দেওয়া হয়, তখন সেই কার্যের সিদ্ধি হবেই হবে। মধ্যম পুরুষ বলবে – তোমরা শোন আর নাই শোন আমি যখন ঠিক করে নিয়েছি দীক্ষা নেব, তখন আমি নেবই। এই হল মধ্যম পুরুষের ব্যাখ্যা, সে বাকীদের সম্মত করাতে পারছে না। আর যে অধম পুরুষ সে রোখ করে বলে আমি করব। আমি করব এই কথা বলে দৈবের আশ্রয়কেও ছেড়ে দিয়ে, ভাগ্যের কথা না ভেবে, কোন চিন্তা ভাবনা না করে, 'আমি করব' এই বলে গুণ, দোষ, পরিণতি না ভেবে কাজে নেমে পড়ল। কিসের জোড়ে? নার্ভাস এনার্জির জোরে। কেউ হয়তো কোন সমস্যার কথা বলেছে, তখন কোন ভাবনা চিন্তা না করে বলে দেবে – কিছু চিন্তার নেই, আমি সব ঠিক করে দেব। এরাই অধম পুরুষ, সমস্ত কাজের অসাফল্যের পেছনে এদেরই বেশি ভূমিকা। নিজের কাজটাও ঠিক মত করতে পারেনা, উল্টে অপরের কাজকেও বানচাল করে দেয়।

শুনে আমাদের অবাক লাগতে পারে, এই দেশ আর জগৎ যাঁরা চালাচ্ছেন, তাদের বেশির ভাগই এই তৃতীয় শ্রেণীর। কোম্পানির হেডকোয়ার্টারের বাইরে যারা কাজ করে তারা প্রায় প্রত্যেক দিনই হেড অফিস থেকে একটা করে নোটিশ পান, এই ভাবে কাজ করতে হবে, এই এই কাজ করা যাবে না ইত্যাদি। একজন কর্মচারী ভাবছে – হেড অফিসের কর্তার হয়তো সকালে দাঁত মাজতে মাজতে মাথার মধ্যে একটা কোন চিন্তা আসে আর অফিসে এসে সেটাকেই নোটিশ বানিয়ে পাঠিয়ে দেয়। এমনই কপাল যে সেই কর্মচারীর কয়েক দিন পরেই হেড কোয়ার্টারসে বদলি হয়ে গেল। এখানে এসে দেখছে যেটা ভেবেছিল ঠিক সেই জিনিষই এখানে হয়। বড় বড় কোম্পানীর হেড কোয়ার্টারসে বড় বড় সাহেবরা চা খাচ্ছে, সিগারেট খাচ্ছে, টেবিল টেনিস খেলছে, আর মাঝে মাঝে এসে টাইপ করে সব ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দিচ্ছে – To all Branches, this should be implemented, এরাই প্রকৃত অধম পুরুষ, কোন গুণ দোষ বিচার করছে না, কারুর সঙ্গে আলোচনা করছে না।

এটাই বাল্মীকি বলছেন – সবাই যখন মন্ত্রণা করবে তখন সবাই যেন সহমত হয়। লোকসভা ও রাজ্যসভাতে সহজে কোন বিলকে ভোটিং এ নিয়ে যাওয়া হয় না। কোন বিল এলে অধ্যক্ষ বিলটাকে সভাতে পেশ করে বলবেন – আপনারা সবাই এক মত তো। লোকসভায় যখন কোন বিলকে ভোটে নিয়ে যাওয়া হয়, তার মানে সরকারের প্রতি আমাদের আস্থা নেই, ভোটিং ব্যাপারটা খুব কমই হয়। তাই বলা হচ্ছে, মন্ত্রী যারা আছ তারা এক জোট হয়ে কাজ কর। যদি না হয় তাহলে যাদের নিয়ে কাজ করবে তাদেরকে বুঝিয়ে টুঝিয়ে মিল করিয়ে নাও, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে এই কার্যটা সফল হবে না।

বিভীষণ তখন রাবণকে বোঝাচ্ছেন 'হে লঙ্কাধিপতি রাবণ! আপনি আমার দাদা, আমি আপনাকে হাতজোড় করে বলছি, আপনি দয়া করে সীতাকে সসম্মানে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিন। এছাড়া আমাদের আর বাঁচার পথ নেই'। বিভীষণ বেশ কয়েকবার এইভাবে বলাতে রাবণ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে গেল। বাল্মীকি এখানে আবার খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন। এই জিনিষগুলো বুঝতে গেলে একটু অনুভূতি থাকা দরকার, সবাই বুঝতে পারবে না। বলছেন – **স বভূব কৃশো রাজা মৈথিলীকামামোহিতঃ। অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্মণা।**।৬/১১/১ সীতাকে পাবার ইচ্ছায় রাবণ দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, তাঁর তেজ কমে যাচ্ছে, নিজের সুহৃদরাও রাবণের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করছে। রাবণ আর কত রোগা হবে, আসলে বলতে চাইছেন, কাম হল সব কিছুর মূলে, সৃষ্টি কাম দ্বারাই চালিত হয়। সেইজন্য মানুষ যখন কারুর প্রতি কামাসক্ত হয়ে যায়, আর সেই কামের যদি পুর্তি না হয়, তার যে কি দুরবস্থা হয় ভাবাই যায় না। যখন কেউ কামাসক্ত হয়ে যায়, তখন প্রথম যেটা তার চলে যায় তা হল খাওয়া-দাওয়া। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খাওয়ার পরিমাণ খুব কমে যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাওয়া বেড়ে যায়, কিন্তু দুটোই

রোগের লক্ষণ। রাবণ এমন কামাসক্ত হয়ে গেছে যে সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। আর – *অসম্মানাচ্চ সুহৃদাং পাপঃ পাপেন কর্মণা* - তার যারা সুহৃৎ, হিতৈষী, তারা তাকে অসম্মান করতে শুরু করে দিয়েছে।

আমার যে গোলমাল হয়েছে, আমার মধ্যে যে একটা আসক্তি এসে গেছে আমি কি করে বুঝব? এইজন্য বলছেন, সাধুসঙ্গ করতে হয়, শাস্ত্র চর্চা করতে হয়। মানুষ নিজের মনকে তো নিজে বুঝতে পারেনা। কিন্তু এগুলোই লক্ষণ, এই লক্ষণ দিয়েই নিজের মনকে বোঝা যায়। কামাসক্ত যে সব সময় কোন নারীর প্রতিই হবে তা নয়, যে কোন জিনিষের প্রতিই আসক্তি হতে পারে। যে কোন কিছুর আসক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে প্রথমে তোমার আহার নিদ্রার ব্যঘাত ঘটবে। দ্বিতীয় তোমার বন্ধুরা, তোমার হিতৈষীরা যদি তোমাকে অসম্মান করতে শুরু করে, তার মানে বুঝতে হবে তুমি কামাসক্ত হয়ে গেছ। যারা আমার অপরিচিত তারা যে কোন কারণে আমাকে অপমান করতেই পারে, কিন্তু আমার ছোট ভাই, আমার বোন, আমার বন্ধু এরা যদি আমার প্রতি সম্মান হারিয়ে ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। এই যে আমি পাপকর্ম করছি, এর জন্য সবাই আমার আড়ালে আমাকে পাপী বলছে। এর জন্য সব সময় নজর রাখতে হবে আমার প্রতি লোকের কি দৃষ্টিভঙ্গী, আমাকে নিয়ে তারা কি কথা বলছে। রাজাকে এ ব্যাপারে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে, কারণ তুমি রাজা, রাজার সামনে এসব কথা বলার সাহস কারুর হবে না। এত কথা বলা সত্ত্বেও রাবণের মন কিছুতেই বুঝছে না। এই রকমই হওয়াটাই স্বাভাবিক, যখন কোন কিছুতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন তার যে কি দুরবস্থা হয়, কোন কিছুতেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসা যায় না, আসক্তিটা যেন কিছুতেই যেতে চায় না।

ইতিমধ্যে কুম্ভকর্ণকেও কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে যে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে তার মধ্যে এই অংশটি খুব ভালো উদাহরণ। রাবণ কুম্ভকর্ণকে নিয়ে লঙ্কার এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু একটু পরেই আবার এক জায়গায় বলা হচ্ছে, কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে তোলা হচ্ছে। এই দুটো জিনিষ এক সাথে হতে পারেনা। যখন বলা হচ্ছে কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে তোলা হচ্ছে তখন অনেক বার বলা হচ্ছে যে, কুম্ভকর্ণের অভিশাপ ছিল তাই সে ছয় মাস ঘুমিয়ে থাকত। যাই হোক, বাল্মীকি বর্ণনা করে বলছেন – রাবণ এখন সভার সব পারিষদের নিয়ে বসে আছেন, সেখানে রাবণ বলছেন, কুম্ভকর্ণ ছয় মাস ঘুমিয়ে থাকে, এখন ওর ঘুম ভেঙ্গেছে, সেও এখানে এসে গেছে তাই আমি সবাইকে নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি। সীতাকে আমি তুলে নিয়ে এসেছি, কারণ সীতার মত সুন্দরী মেয়ে আমার নজরে নেই, আমি সীতাকে পেতে চাইছি, কিন্তু সে আমার কাছে আসতে চাইছে না। বাল্মীকি বলছেন – **পশ্যংস্তদবশস্তস্যাঃ কামস্য বশমেয়িবান্। ক্রোধহর্ষসমানেন দুর্বর্ণকরণেন চ**।।৬/১২/১৭ – সীতার সৌন্দর্যে আমি কামাসক্ত হয়েছি। কাম জিনিষটা কি রকম হতে পারে? কোন জিনিষকে পাওয়ার ইচ্ছা যখন প্রবলাকার ধারণ করে তখন কি হয়? ক্রোধ আর হর্ষ এবং শোক ও সন্তাপ, এই চারটে মনের ধর্ম – আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন, আবার আমি আপনার উপর রেগে আছি, অন্য দিকে আমি কোন জিনিষকে নিয়ে শোক করছি, এবং কোন জিনিষকে নিয়ে আমার মনে সন্তাপ আছে। এই চারটে আবেগের সময় যে জিনিষটা এক ভাবে থেকে যায় তা হল *দুর্বর্ণকরণেন*, বর্ণটাকে দূরবর্ণ করে দেয়, মানে শরীরটাকে ফ্যাকাসে করে দেয়, কান্তিটাকে ম্লান করে দেয়। সেই কাম আমাকে গ্রাস করেছে। রাবণ খোলখুলি বলে দিচ্ছেন, লুকোচুরির কোন ব্যাপার নেই। আমার কি হয়েছে? দুরতিগম্য কামের দ্বারা আমি আক্রান্ত হয়েছি। কার প্রতি? সীতার প্রতি।

রাবণের বয়স তখন পঞ্চাশের বেশি বা তার একটু কম। রাবণের যে সন্তান মেঘনাদ তখন অনেক বড়, নিজেও একজন সফল যোদ্ধা রূপে প্রতিষ্ঠিত, ইতিমধ্যে ইন্দ্রকেও একবার হারিয়ে এসেছে। রাবণ বলছেন, আমি এখন সাংঘাতিক কামের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছি, এমন সাংঘাতিক যে, হর্ষ, ক্রোধ, শোক ও সন্তাপ প্রত্যেকটি আবেগের মাঝখান দিয়ে এক কাম সমান ভাবে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন – যার পিঠে ফোঁড়া হয়, সে যাইই করুক মনটা পিঠে ফোঁড়ার ব্যাথাতেই পড়ে থাকে। রাবণের যত হর্ষই

হোক, যত ক্রোধই হোক আর শোকই হোক আর সন্তাপই হোক, যত যাইই হোক না কেন, তাঁর মনটা সীতার উপরে পড়ে আছে।

রাবণের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ খুব অবাকও হয়েছে আবার অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে, অসন্তুষ্ট হয়ে বলছে – দাদা! এটা তুমি কি কাজ করলে! পরস্ত্রী হরণ তো অত্যন্ত জঘন্য কাজ। তুমি হচ্ছ রাজা, রাজার এসব কাজ করা শোভা দেয় না। তুমি যুদ্ধ করে জয় করে সীতাকে নিয়ে এলে সেটা অন্য জিনিষ হত, কিন্তু এইভাবে কাপুরুষের মত লোভের বশবর্তী হয়ে অপরের স্ত্রীকে চুরি করে হরণ করে এনে তুমি নিজের কলঙ্ক ডেকে নিয়ে এসেছ। কুম্ভকর্ণ বলছে – **অনুপায়েন কর্মাণি বিপরীতানি যানি চ। ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রয়তেষ্বিব।।**৬/১২/৩১। *অনুপায়েন* মানে, অসদোপায়ে কোন কাজ করা শাস্ত্রের বিপরীত, এই রকম কাজ করতে নেই। কোনটা কার্য ও অকার্য তা শাস্ত্র ঠিক করে দিয়েছে, শাস্ত্রে যেটা করতে নিষেধ করা হয়েছে সেই কাজ কখনই করতে নেই।

মনুস্মৃতিতে কার্য ও অকার্যকে ঠিক ঠিক ভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে মনু স্মৃতিতে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে, কোন্ ধরণের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে, আর কত ভাবে বিয়ে করা যায়, তার মধ্যে রাক্ষসী বিবাহ, আসুরী বিবাহ ইত্যাদির বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে এসে বিয়ে করা যায়, আমাদের শাস্ত্রে এই ধরণের বিবাহের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেমন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই রুক্মীণিকে অপহরণ করে বিবাহ করেছিলেন, অর্জুন সুভদ্রাকে অপহরণ করে বিয়ে করেছিলেন। এই ধরণের বিবাহে আশ্চর্যের কিছু নেই, শাস্ত্রও এই ধরণের বিবাহে অনুমতি দিচ্ছে। রুক্মিণীর বিয়ে ঠিক হয়েছিল শিশুপালের সঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে কায়দা করে তুলে নিয়ে বিয়ে করেছিলেন, এই কারণে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের উপর আরও খাপ্পা হয়ে গিয়েছিল। সুভদ্রার কোন পাত্র ঠিক ছিল না, কিন্তু অর্জুন তাকেও অপহরণ করে এনে বিয়ে করেছিল। কিন্তু পরস্ত্রীকে অপহরণ করে বিয়ে করা যাবে শাস্ত্রে কোথাও এই রকম কোন অনুমতি দেওয়া হয়নি। বাৎসায়ণের কামশাস্ত্র, যাতে নারী-পুরুষের সঙ্গ কত ভাবে করা যাবে তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে বিবাহের কথা বলা হচ্ছে না, কিন্তু কোন্ কোন্ ধরণের নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাবে বলে দিয়েছে। প্রথমেই বলছে, যদি পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি দিতে যাও তাহলে আগে দেখে নাও সেই স্ত্রীর স্বামী কেমন, সে যদি প্রবল ক্ষমতাশালী, সামর্থবান পুরুষ হয়, যদি কঠোর লোক হয় তাহলে সেই নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করতে যেও না। মানে পরস্ত্রীর দিকে মন দিতে পার, তবে নিজেকে সামলে সুমলে দেবে। সেখানে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে স্বামীর কি কি দোষ থাকলে পরস্ত্রীর দিকে মন দেওয়া যায়। ভারত চিরকালই জাগতিক দিক থেকে অনেক প্রগতিশীল দেশ। এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, যে স্বামী স্ত্রীর দিকে ভালো করে নজর দেয় না, স্বামী যদি অথর্ব হয়, শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়, স্ত্রীকে টাকা-পয়সা দেয় না, স্বামী যদি অন্য নারীতে আসক্ত হয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরস্ত্রীর দিকে মন দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আগে দেখে নিও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে কিনা। যদি ক্ষতি করে দিতে পারে তাহলে তার কাছে একেবারেই এগোবে না। তবে এগুলো সাধারণ লোকের কথা বলা হচ্ছে, রাজা কখন এই রকম করতে পারেনা। কুম্ভকর্ণ তাই রাবণকে বলছে, তুমি ঠিক কাজ করনি।

এইসব বলে কুম্ভকর্ণ বলছে 'তবে ভাই, তুমি আমার দাদা, তুমি ভুল করেছ ঠিক আছে, আমি কিন্তু তোমার হয়ে শত্রু সংহার করব, শ্রীরামচন্দ্র যেই হোন, আমি তাঁকে শেষ করে দেব। কয়েক দিনের ব্যাপার মাত্র, দেখবে কিছু দিনের মধ্যেই সীতা তোমার কাছে নিজে থেকেই এসে গেছে'। এখানে কুম্ভকর্ণ ঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিল নাকি ভুল করেছিল? রামায়ণ আর মহাভারতের এটাই বৈশিষ্ট্য। উপনিষদ গীতা কজন পড়তে পারে, রামায়ণ ও মহাভারতই আমাদের ঠিক ঠিক ধর্মশাস্ত্র। এগুলো হচ্ছে দ্বন্দ্ব মূলক পরিস্থিতি, কুম্ভকর্ণের একদিকে আছে শাস্ত্রের ন্যায় নীতির মূল্যবোধ, অন্য দিকে দাদার প্রতি ভালোবাসা। এখন সে কোন দিকে যাবে? ছেলে চোর হয়ে গেছে, মা এখন কার পক্ষে দাঁড়াবে, সমাজের পক্ষে না সন্তানের পক্ষে? এইসব ক্ষেত্রে রামায়ণ মহাভারত আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে এক তরফা বিচার করে কারুর প্রতি

একটা রায় দেওয়া কখনই ঠিক হবে না। রামায়ণ মহাভারতে কোথাও বলে দিচ্ছে না যে এটাই তার করা উচিৎ বা এটাই তার করা অনুচিত। কিন্তু পরের দিকে মহাভারতের কাহিনীতে আমরা পাই, গান্ধারী দুর্যোধনকে ডেকে বলছেন – দুর্যোধন তুমি নির্বস্ত্র হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াও, আমি একবার চোখের বাঁধন খুলব, তোমার সর্বাঙ্গে একবার আমার চোখ দিয়ে অবলোকন করব, তাতেই তোমার শরীর বজ্রের মত হয়ে যাবে। এখন গান্ধারী ঠিক করেছিলেন কি ভুল করেছিলেন? সারা মহাভারতে পাই গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বরাবর পাণ্ডবদের পক্ষে কথা বলে গেছেন। আবার অন্য দিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁর সব সন্তান মারা যাওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিচ্ছেন, মাতৃস্নেহের বশবর্তী হয়ে বলেছিলেন ঠিক আছে। এগুলো মেনে নেওয়া যায় কিন্তু পরের দিকে যে কাহিনী পাই যেখানে দুর্যোধনের শরীর বজ্রের মত করে দিতে চাইছেন। অবশ্য এটা কাহিনী, আক্ষরিক ভাবে নিতে বলা হচ্ছে না। সে যাই হোক না কেন, কিন্তু এই কাহিনীর মাধ্যমে যে ভাবটাকে তুলে আনা হচ্ছে এটা ঠিক না ভুল? একদিকে মাতৃস্নেহ অন্য দিকে শাস্ত্র নির্দেশিত ধর্ম। সেইজন্য এসব ক্ষেত্রে কখনই এক তরফা কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে রায় দিতে নেই।

উপনিষদ, গীতা বলুন, নিউ টেস্টামেন্ট বলুন, এগুলো বাস্তবিক ধর্মশাস্ত্র নয়। উপনিষদে যে কথা গুলো বলা আছে সেগুলো শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ঠিক আছে, আমাদের মত সাধারণ লোকের জন্য চলবে না। কারণ, সাধারণ মানুষের যে সমস্যা, দৈনন্দীন যে উভয় দিকের সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয় তখন তার সমাধান করতে গিয়ে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, কখন আমাদের মনে হয় এটাও ঠিক আবার কখন মনে হয় অন্যটাও ঠিক। আমি যদি ঘুষ না নেই তাহলে আমার ছেলেকে চিকিৎসার করার অত খরচের টাকা জোগাড় করতে পারব না, আমার ছেলে মরে যাবে। আবার ঘুষ যদি নিই তাহলে একটা পাপ কাজ করছি, ছেলেকে যদি না বাঁচাতে পারি তাহলে আরেকটা পাপ করছি। এই উভয় সঙ্কটে কোনটা করবে? যখনই বলছি আমাকে এটাই করতে হবে, তখনই আমি judgmental হয়ে যাচ্ছি। এসব ক্ষেত্রে একশ জনের মধ্যে পঞ্চাশ জন এক রকম করবে বাকী পঞ্চাশ জন অন্য রকম করবে। রামায়ণ মহাভারত কখনই বলে দেবে না যে তোমাকে ঐদিকেই যেতে হবে। রামায়ণ মহাভারত কাহিনী দাঁড় করিয়ে এই উভয় সঙ্কটকে নিয়ে এসে বলবে, তখন এই রকম হয়েছিল, আর তারা এই রকম করেছিলেন, আর এই রকম করেছিলেন বলে তাদের চরিত্র এই রকম হয়েছিল। মহাভারতে বারবার বলছে *যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ*, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়, কিন্তু ধর্মটা কি কোথাও নির্দিষ্ট করে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। পুরো মহাভারত পড়ে নিলেও বোঝা যায় না ধর্মটা কি। ধর্ম সব সময় হচ্ছে, আমি কি ঠিক করে রেখেছি, জীবনে আমি কি চাইছি, সেই দিকে এগোতে যেটা সাহায্য করবে সেটাই আমার ধর্ম হবে। তাই বলে আমার ধর্ম আর অন্যের ধর্ম কখনই এক হবে না। দ্বিতীয় কথা হল, নিজের ধর্মে ঠিক থাকতে গিয়ে যদি দুবার চারবার পতন হয়ে যায় তাতেও কিছু এসে যাবে না, তার মানে এই নয় যে, পতন হয়ে গেলেই আমি আর মহৎ হতে পারবো না, সে-ই মহৎ হয় যে লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

কুম্ভকর্ণ এখানে যেটা বলছে ভুল কিছুই বলছে না। আমি জানি আমার ধর্ম কি, আমি জানি তুমি অন্যায় করেছ, কিন্তু তবুও আমি তোমার পাশেই দাঁড়াব। স্বামীজী নিবেদিতাকে চিঠিতে এই কথাই বলছেন – তুমি ভারতের জন্য কাজ কর আর নাই কর, মৃত্যুও যদি তোমাকে ঘিরে ফেলে তখনও আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব। মানে, আমি তোমার গুরু, আমি তোমাকে ছাড়ব না।

স্বামী বিরজানন্দ যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন সেই সময় এক সন্ন্যাসী কোন এক অন্যায় কাজের জন্য নাম কাটা গিয়েছিল। এখন যে সন্ন্যাসী তাঁর জীবনের কুড়ি তিরিশটা বছর মঠে কাটিয়ে দিল, এখন নাম কাটা গেলে সে কোথায় যাবে, বাড়ির সাথে কোন সম্বন্ধ নেই, জাগতিক কাজ সে রকম কিছু করার কোন অভিজ্ঞতা নেই, বাইরের জগতের ছলচাতুরিকে বোঝে না, এখন সে কোথায় বা যাবে আর করবেই বা কি। ট্রাস্টি মিটিংএ ঠিক হয়ে গেছে সন্ন্যাসীর নাম কেটে দেওয়া হবে। স্বামী বিরজানন্দ দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলছেন – ওর নাম তাহলে কেটে দেওয়াই হবে, তাই না? সবাই

বললেন – হ্যাঁ। মহারাজ তখন বলছেন – এক কাজ কর, বরানগরে গঙ্গার ঐ পারে আমার জন্য একটা কুঠিয়া বানিয়ে দাও। সবাই অবাক হয়ে গেলেন – কেন মহারাজ? কেন এই কথা বলছেন? মহারাজ বলছেন – না, ওতো আমারই শিষ্য, আমার কাছেই দীক্ষা হয়েছে, সন্ন্যাস হয়েছে, জগতে আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই, সব কিছু ছেড়ে দিয়েই তো আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে, এখন ও কোথায় যাবে, ওকে তো আর বেলুড় মঠেও রাখা যাবে না। এখন আমাকেই তো ওকে আশ্রয় দিতে হবে। আমিও বেলুড় মঠকে ছাড়তে পারব না, তাই বলছিলাম, গঙ্গার ঐ পারে আমার জন্য একটা কুঠিয়া বানিয়ে দাও, আমি ওকে নিয়ে ঐ কুঠিয়ায় থাকব, ঐখান থেকেই আমি বেলুড় মঠের কাজকর্ম চালাব। তখন ট্রাস্টির অন্য সব মহারাজরা সমস্যায় পড়ে গেছেন, যাই হোক ক্ষমাটমা করে দিয়ে তাকে মঠেই রাখা হল।

যুধিষ্ঠির কথায় কথায় অর্জুনকে বলছেন – অর্জুন তোমার উপর ভরসা করেই এত বড় যুদ্ধে নেমেছি, তুমি ছেড়ে দিলে তো চলবে না। কুম্ভকর্ণের উপর ভরসা করে আছে রাবণ। কুম্ভকর্ণও বলছে, দাদা ঠিক করুক কি ভুল করুক, প্রথমে আমি আমার ঘরকে সামলাব, ঠিক তাইই করল কুম্ভকর্ণ। আমি যদি অন্যায় কোন কাজে জড়িয়ে পড়ে অনেক ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ি আর তারপর সেইজন্য যদি আমার বন্ধুরা আমাকে ছেড়ে চলে যায়, তাহলে তখন বুঝতে হবে এরা কোন দিনই আমার বন্ধু ছিল না, বন্ধু হলে কখন বন্ধুকে ঐভাবে ছেড়ে চলে যাবে না। বন্ধুর অর্থই হচ্ছে, ভালো হোক আর মন্দই হোক, সব সময় বন্ধুর পাশেই থাকবে, গালাগাল দেবে, তিরস্কার করবে কিন্তু ছেড়ে চলে যাবে না।

কুম্ভকর্ণও দাদাকে দুটো কথা শুনিয়ে দিয়ে বলছে – **রামস্ব কামং পিব চাগ্র্যবারুণীং কুরুষ্ব কার্যাণি হিতানি বিজ্বরঃ।**৬/১২/৪০ – যাও যাও দাদা, খুব করে মস্তি কর, উত্তম সুরা পান কর, ভালো খাওয়া দাওয়া কর, আর এইটা ধরে নাও যে শ্রীরামচন্দ্র যমালয়ে চলে গেছেন, আর সীতা তোমার কাছে এলো বলে, আর তুমি কোন চিন্তা করো না, যদিও আমি জানি তুমি এটা খুবই অন্যায় কাজ করেছ।

আবার একজন মাঝখান থেকে বলছে – ধ্যুস্, এত ঝামেলা করার কি আছে, সীতাকে টেনে আপনি বিছানায় নিয়ে আসুন। পরে রাবণ এক জায়গায় বলবে যে, আমার অভিশাপ আছে আমি কোন পরস্ত্রীকে বা নারীকে জোর করে বিয়ে করতে পারিনা। কোন এক অপ্সরাকে রাবণ জোর করে বিয়ে করতে গিয়েছিল। সেই অপ্সরা আবার ব্রহ্মার কাছে গিয়ে নালিশ করাতে ব্রহ্মা রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিল যে, যদি তুমি জোর করে কোন মেয়ের যেই হাত ধরতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে। সেইজন্য জোর করে সীতাকে কিছু করার সাহস রাবণের নেই।

বিভীষণই একমাত্র অন্য ভাবে রাবণকে বোঝাচ্ছিলেন। বিভীষণের কথা শুনে রাবণ এইবার তাঁকে প্রচণ্ড গালাগাল দিয়ে বলছে – বিভীষণ! মানুষ একটা শত্রুর সঙ্গে বাস করতে পারে, একটা বিষধর সাপের সঙ্গেও বাস করতে পারে কিন্তু যে নিজেকে বন্ধু বলে অথচ অন্য দিকে শত্রুর গালে গাল লাগায় এই ধরণের লোকের সঙ্গে এক মুহূর্তও বাস করতে নেই। কারণ দেখা গেছে, যারা স্বজাতীয়, নিজের লোক বলতে যাদের বোঝায়, এদের একটা স্বভাব যে, যখন তার স্বজাতীর ক্ষতি হয়, পতন হয়, তখন তাদের সব থেকে বেশি আনন্দ হয়। এই হচ্ছে বাল্মীকি রামায়ণ, রাবণ বিভিষণকে বলছেন – নিজের জ্ঞাতীদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয় যখন নিজের কোন লোকের পতন হয়। যদি কারুর আর্থিক ক্ষতি হয়ে যায়, তার মেয়ের ডিভোর্স হয়ে গেল, মামলা মোকদ্দমাতে হেরে গেল, তখন শত্রুর যত না আনন্দ হবে তার জ্ঞাতিদের আনন্দ অনেক বেশি হবে। জগতের নিয়ম, ভাইয়ের যখন কোন ক্ষতি হয় ভাই সবচেয়ে আনন্দ পায়। রাবণ এই কথাই বিভীষণকে বলছে।

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, এক বাঙ্গালী আরেক বাঙ্গালীর ভালো দেখতে পারে না। কিন্তু এটা শুধু বাঙ্গালীদের ক্ষেত্রেই নয়, এটাই সারা জগতের নিয়ম, স্বজাতীয়রাই স্বজাতীয়দের ডোবায়। উর্দুতে একটা সায়ের আছে – নিজের লোকেরাই আমাকে শেষ করে দিল, যারা আমার দূরের লোক তাদের ক্ষমতা

কোথায় যে আমার কিছু ক্ষতি করতে পারে। বন্দুক থেকে যদি গুলি চালান হয় তখন বন্দুকের কাছে যে থাকবে গুলি তাকেই তো বিদ্ধ করবে, এক কিলোমিটার দূরের লোকের গায়ে কখনই লাগবে না, ক্ষতি সব সময় কাছের লোক থেকেই হয়, দূরের লোক কখনই ক্ষতি করতে পারেনা। এই কথা বাল্মীকি লিপিবদ্ধ করে গেছেন, রাবণ সেই কথা বিভীষণকে বলছেন।

আর কি কি রাবণ বলছেন? স্বজাতীয় যারা, জ্ঞাতি যারা, তার নিজের লোকেদের যখন কোন সঙ্কট আসে, তারা যখন বিপদে পড়ে যায়, তখন তারা এমনই আনন্দ করে যে দরকার পড়লে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, বিষ দিয়ে দেওয়া, অস্ত্র চালিয়ে দেওয়া, টাকা পয়সা হরণ করে নেওয়া এগুলো তাদের কাছে তখন কোন ব্যাপারই নয়। আর এরা নিজের মনোভাব লুকিয়ে রাখে, ঠিক সময়ে সেই মনোভাবকে ব্যক্ত করে। স্বামীজীও এই সমস্যা নিয়ে অনেক বার বলছেন – ভারতীয়দের মধ্যে একে অপরের প্রতি এই হিংসার ভাব প্রচণ্ড জাতিগত সমস্যা।

বাল্মীকি এখানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – **শ্রূয়ন্তে হস্তিভির্গীতাঃ শ্লোকাঃ পদ্মবনে পুরা**।৬/১৬/৬ – বাল্মীকিকে যখন ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন যে যখন তুমি রামকথা লিখবে তখন তুমি সেটা শ্লোক রূপে লিখবে। বাল্মীকি যখন শ্লোক রূপে লিখেছেন তখন প্রায় সব শ্লোকই অনুষ্টুপ ছন্দে, মানে আট আট মাত্রায় লিখেছেন। কিন্তু বাল্মীকি যে শ্লোক রচনা করেছিলেন, এটা নতুন কিছু ছিল না, বাল্মীকি এখানে নিজেই বলছেন যে, এখনও শ্লোক রূপে গান করা হয়। তার অর্থ হচ্ছে, বাল্মীকি তখনকার যে সব কথা শ্লোক রূপে লিখেছেন সেই জিনিষগুলো তখনকার সমাজের লোকেরা গান করত, আর সেটা শ্লোকরূপেই গান হত। বাল্মীকির কৃতিত্ব হল এত বড় রামকথাকে তিনি একটা জায়গাতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। *শ্লোকাগীতা* – পরম্পরাতে একটা কাহিনী চলে আসছে, সেই কাহিনী লোকের মুখে শ্লোকের মাধ্যমে গানের আকারে চলে আসছিল। বাল্মীকি সেই রকমই একটা কাহিনীকে তুলে এনে রাবণের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন – কয়েকটা হাতি পদ্মবন নামে এক জঙ্গলে ছিল। হাতিরা দেখছে কিছু লোক হাতে দড়ি নিয়ে তাদের দিকে আসছে। লোকগুলোকে দেখে হাতির রাজা হাতিদের বলছে – ভাই, আমি কোন কিছুকেই ভয় পাইন, সে দড়িই হোক, আর অস্ত্রই হোক, সবই আমি উড়িয়ে দেব, কিন্তু আমি ভয় পাই শুধু আমার নিজের জাতিকে। মানে পোষা হাতিগুলোকে ভয় করে। জঙ্গলের জংলী হাতিকে কাবু করার, ফাঁসিয়ে দেওয়ার কোন উপায় নেই। হাতিকে কাবু করা হয় একমাত্র হাতিকে দিয়েই। বিশেষ করে মেয়ে পোষা হাতিকে দিয়ে যখন কোন হাতিকে ঘিরে দেয় তখন এরা আর কিছু করতে পারেনা। কারণ মেয়ে হাতিকে পুরুষ হাতি কখনই আক্রমণ করে না। এটা হাতিদের একটা প্রথা বা সংস্কার বলা যেতে পারে। লঙ্কা হল হাতির দেশ, এখনও শ্রীলঙ্কাতে প্রচুর হাতি পাওয়া যায়। রাবণ হয়তো হাতির এই ব্যাপার গুলো জানতেন, তাই হাতির উদাহরণ দিয়ে বলছেন – হাতির রাজা বলছে কোন কিছুকেই আমি ভয় পাইনা কিন্তু নিজের জাতভাই থেকেই আমার একমাত্র ভয়।

রাবণ এবারে চারটে জিনিষের নাম করে বলছেন, এই চারটে জিনিষ হল একটা জিনিষের সার – হব্য গব্য, যজ্ঞের সময় যেটা অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয় তাকে হব্য গব্য বলা হচ্ছে। এই হব্যগব্য তৈরী হয় পুরোপুরি দুধ দিয়ে, দুধ না হলে হব্যগব্য তৈরী হবে না। এই দুধ গরুতে থাকে, গরুর সার পদার্থ দুধ। *স্ত্রীষু চাপল্যম্*, মেয়েদের মধ্যে চাপল্য, চঞ্চলতাই সার। মেয়েদের মধ্যে কখনই স্থিরতা থাকবে না। *ব্রাহ্মণে তপঃ*, ব্রাহ্মণদের মধ্যে তপস্যা থাকবেই, তপস্যাই ব্রাহ্মণের সার। যে গরু দুধ দেয়না সে গরু গরুই নয়, যে মেয়ের মধ্যে চপলতা নেই, সে মেয়ে মেয়েই নয়, যে ব্রাহ্মণের তপস্যা নেই, তাকে আর ব্রাহ্মণ বলা যাবে না। আর চতুর্থ হল, *জ্ঞাতিতো ভয়ম্*, জ্ঞাতিদের কাছ থেকে ভয় থাকবেই, জ্ঞাতিদের সার ভয়। এই চারটে হচ্ছে সার – গরুতে দুধ, মেয়েতে চপলতা, ব্রাহ্মণের তপস্যা আর জ্ঞাতি ভাইদের কাছ থেকে ভয়।

একটার পর একটা বাক্যবাণে বিভীষণকে রাবণ বিদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। তার মধ্যেই হঠাৎ বিভীষণ দাঁড়িয়ে পড়ে বলছেন 'আমি তো তোমাকে তোমার ভালোর জন্যই বলছিলাম, কিন্তু তুমি যখন নিজেই নিজেকে নাশ করতে চাইছ তখন আমি লঙ্কা ছেড়ে চললাম'। তখন বিভীষণ এবং আরও তাঁর চারজন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আকাশমার্গে লঙ্কা থেকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে চলে এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সেনারা এখনও সমুদ্র পার করে লঙ্কায় পৌঁছায়নি।

বিভীষণকে বানর সেনারা দেখেই বুঝতে পেরেছে যে এ রাক্ষস জাতিদের থেকে এসেছে। এখানে একটা মজার ব্যাপার দেখার, বানর আর ভাল্লুককে বাল্মীকি বানর আর ভাল্লুক রূপেই দেখিয়েছেন কিন্তু বিভীষণকে বাল্মীকি মানুষ রূপে দেখাচ্ছেন। আসলে রাক্ষসরা একটা জাতি বিশেষ। বিভীষণকে দেখে বানর সেনাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেছে, বিভীষণকে নিয়ে নানান রকম কথাবার্তা বলছে নিজেদের মধ্যে, একে একটু জিজ্ঞেস করা যাক গুপ্তচর কিনা। ইতিমধ্যে হনুমান তাদেরকে খুব সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন 'না এই ধরণের প্রশ্ন করতে নেই, কোন অপরিচিত লোককে যদি অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তখন তার মনে সন্দেহ হতে শুরু করবে – এরা আমাকে এত প্রশ্ন করছে কেন? এরা কি আমাকে সন্দেহ করছে? আবার কোন কারণে যদি সে আমাদের বন্ধুরূপে এখানে এসে থাকে তাহলে এতো জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার হৃদয়ে আমাদের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্ম নিয়ে মন কলুষিত হয়ে যেতে পারে। যাদের শরণে সে এসেছে তাদেরকে আর বিশ্বাস করতে পারবে না'। জিজ্ঞাসাবাদ বেশি করলে সে ভাবে – আরে, আমি আমার ধর্ম, কুল সব ছেড়ে তোমার কাছে এলাম, আর তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ! ধ্যুৎ, আমি থাকবই না। হনুমান তাই বলছেন, এই রকম করতে নেই।

হনুমান খুব সুন্দর বলছেন 'দ্যাখো, যে দুষ্ট পুরুষ, কোন দুরভিসন্ধি ভাবকে আশ্রয় করেছে, সে কখনই নিঃসঙ্গ, স্বস্থচিত্ত হয়ে থাকতে পারেনা। মনের ভাব যদি কলুষিত থাকে, সে যতই তাকে লুকোবার চেষ্টা করুক, ঐ ভাব কোন না কোন ভাবে বেরিয়ে আসবেই। দ্বিতীয়তঃ, এই লোকটির বাণী দোষযুক্ত নয়, ঠিক ঠিক কথা বলছে, সেইজন্য এই লোকটির মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি নেই'। যদিও লাই ডিটেক্টরকে আদালত অত নির্ভরযোগ্য বলে গ্রাহ্য করছে না, কিন্তু কাউকে ঠকাবার উদ্দেশ্য যদি কারুর মধ্যে থাকে, মিথ্যে কথা যদি বলে থাকে তাহলে লাই ডিটেক্টরে ধরা পড়ে যাবে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের গলার স্বর, কথা বলার সময় হাত পা নাড়া, চোখের চাহনি যেমন থাকার কথা, অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে এখানে আর চালাকি করতে পারেনা, ধরা পড়বেই পড়বে। বাচ্চারা অন্যায় করলে মায়েরা যে বুঝতে পারেন, তারা এইভাবেই বাচ্চাকে ধরে ফেলেন। কিন্তু যারা বড় মাপের ক্রিমিনাল, তাদের উপর পুলিশ থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করেও কিছু বার করতে পারেনা। এদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, আমরা এখানে সাধারণ লোকের কথা বলছি। এখানে হনুমান বলছেন, যতই সে লুকাবার চেষ্টা করুক না কেন, ভেতরের ভাব প্রকাশ হবেই হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটা ঘটনাকে নিয়ে বিখ্যাত একটা কাহিনী আছে। একবার ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের যৌথ বাহিনী জার্মানিকে আক্রমণের জন্য অগ্রবর্তি ঘাঁটির দিকে এগোচ্ছে। একটা সময় যৌথ বাহিনীর প্রধানরা লক্ষ্য করলেন যে তাদের সব খবর জার্মানি শিবিরের কাছে চলে যাচ্ছে। কারণ চারিদিকে গুপ্তচরদের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে রয়েছে। আমার কথা আপনার কাছে আছে, আবার আপনার কথা যে আমার কাছে চলে আসছে সেটার খবর আপনার কাছে যাচ্ছে, আবার আমার খবর আপনার কাছে চলে গেছে সেটা আমি জানি, মানে বিশাল নেটওয়ার্কিং থাকে। যৌথ বাহিনীর সেনাপ্রধানরা অনেক করে ধরার চেষ্টা করছে কোথা থেকে, আর কিভাবেই বা আমাদের সব খবর জার্মানিদের কাছে আগে থাকতেই চলে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কেউ আমাদের মধ্যেই বা আমাদের আশেপাশেই রয়েছে যে জার্মানির লোক। একটা সময় এরা একজনকে সন্দেহ করছে যে, এই লোকটিই জার্মানির গুপ্তচর। যেখানকার কথা হচ্ছে সেখানকার লোকেরা কেউ জার্মান ভাষা জানেনা। এবারে ঐ সন্দেহভাজন লোকটিকে সেনা দপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছে, আনার পর ওর উপর এক নাগাড়ে জেরা করে যাচ্ছে। জেরার পর বেরিয়ে এল যে, লোকটি গত কুড়ি বছর

ধরে ঐ অঞ্চলেই বসবাস করছে। মানে যখন থেকে ওখানকার লোকেরা ওকে জানে তখন থেকেই সে ওখানে আছে। ঐ অঞ্চলের সব কিছুই তার নখদর্পণে, ওখানকার চাষবাস, আবহাওয়া কখন কেমন হয়, সব কিছুই ওর জানা। একা একা থাকে, কিন্তু জানে সব কিছু। কোন ভাবেই বোঝা যাচ্ছে না যে লোকটি একটি গুপ্তচর, মানে জার্মানির সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই এটা ও প্রমাণ করে দিয়েছে। এই ভাবে দিনের পর দিন ওকে সকালে ডাকা হয়, সারাদিন জেরা করে বিকেলে ছেড়ে দেওয়া হয়। যতই ওকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি জার্মান কখন গিয়েছ, জার্মান ভাষা জানো কিনা, বারবার সে না বলেই যাচ্ছে। আসলে লোকটি কিন্তু জার্মানদেরই গুপ্তচর ছিল। অনেক দিন আগেই একে জার্মান সৈন্য বিভাগ থেকে ঐখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যখন প্রয়োজন হবে তখন তাকে কাজে লাগান হবে। এদিকে সবাই মোটামুটি হাল ছেড়েই দিয়েছে, কিছুতেই প্রমাণ করা যাচ্ছে না যে লোকটি গুপ্তচর। শেষ দিন যৌথ বাহিনীর অফিসার বললেন আজকে আমার শেষ একটা বাণ ওকে মারব, ঐটাকে যদি ও কাটিয়ে দিতে পারে তাহলে ওর কাছে মিথ্যে সন্দেহ করার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ছেড়ে দেব। সেইদিন ছিল শেষ জেরা, সব জেরাটেরা হয়ে যাবার পর অফিসার তার শেষ বাণটা মেরেছে, হঠাৎ লোকটাকে জার্মান ভাষায় বলল – তোমার কোন দোষ নেই, তুমি যেতে পার। বলেই লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে ওর চোখের পাতাটা আনন্দের অভিব্যক্তিতে ঠক্ করে নড়ে উঠল। অফিসারের ওই একটি কথাতেই লোকটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, ওতো ভালো করে জানে যদি ধরা পড়ে যাই সোজা ফায়ারিং স্কোয়াডে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। কাহিনীটার শেষ লাইনটা হচ্ছে – তারপরে ফায়ারিং স্কোয়াডে যাওয়া পর্যন্ত তারা জার্মান ভাষাতেই কথা বলল। চোখটা একটু নড়েছে তাতেই ধরা পড়ে গেছে। এতদিন বলে আসছিল আমি জার্মান ভাষা জানিনা, কিন্তু যাই ওকে জার্মান ভাষায় বলা হল, তুমি মুক্ত, মানে অতটা টেনশান তৈরী করার পরে হঠাৎ করে টেনশানটা ছেড়ে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখে ছাপ পড়ে গেছে। ব্যস্, ফায়ারিং স্কোয়াড ছাড়া আর কোন পথ নেই। বলা হচ্ছে তারপরে আর কোন ভাণ করেনি যে সে জার্মান জানেনা। হনুমান এটাই এখানে বলতে চাইছেন, তুমি যতই কায়দা মারো, তোমার ভেতরের পাপকে চেপে রাখতে পারবে না, ও বেরোবেই।

শ্রীরামচন্দ্রও তখন বলে দিলেন – এই লোকটি গুপ্তচরই হোক আর যাই হোক, সে আমার শরণাগত হয়ে এসেছে, ও আমার কাছেই থাকবে। এখানে এসে আবার একটা কাহিনীর অবতারণা করা হচ্ছে, যেটা পরের দিকে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। আমরা আগে আগে শুনে এসেছি, একজন ব্যাধ একটা মেয়ে পায়রাকে বেঁধে রেখেছিল। একটা গাছের তলায় ব্যাধ আশ্রয় নিয়েছিল। গাছের ওপরে ছেলে পায়রাটি বসে আছে। তখন খুব বৃষ্টি নেমেছে, ব্যাধ আর কোথাও যেতে না পেরে ঐ গাছের তলাতেই রাত কাটাতে বসে গেল। গাছের পায়রাটি দেখছে আমার এখানে একজন অতিথি আশ্রয় নিয়েছে, যদিও সে আমার জুড়িকে বন্দি করে রেখেছে, কিন্তু তবুও সে আমার অতিথি তাকে আমার সৎকার করা উচিৎ। এই আদর্শগুলোই ঠিক ঠিক ভারতের সনাতন আদর্শ। আমরা অনেকে মনে করি এইসব আদর্শ ভারতে অনেক পরের দিকে এসেছে, কিন্তু তা ঠিক নয়। এটা বাল্মীকি বলছেন, তাও আবার শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – আমরা এই কাহিনীটা শুনে এসেছি। তার মানে বাল্মীকির সময়ে এই কাহিনীটা খুব ভালো ভাবে প্রচলিত ছিল। দুটো পায়রা ছিল, মেয়ে পায়রাটাকে ব্যাধ ধরে নিয়েছে। সেই ব্যাধ এখন রাত্রিতে বৃষ্টির সময় ঐ গাছের নীচে এসেছে যে গাছে পায়রা দুটো থাকত। তখন ছেলে পায়রাটা বলছে, আহা, আমার অতিথি বৃষ্টির মধ্যে কত কষ্ট পাচ্ছে, তখন সে কোথা থেকে ঠোঁটে করে কাঠের ছোট ছোট টুকরো নিয়ে এসে ফেলেছে, তারপর কোথা থেকে আগুন নিয়ে এসে তাতে দিয়েছে। এইসব দেখে ব্যাধের মনে করুণার উদ্রেক হল, তখন সে মেয়ে পায়রাটাকে ছেড়ে দিয়েছে। আরেকটা কাহিনীতে বলা হয়েছে, তিনটে পাখি এক এক করে আগুনে প্রাণ দিয়ে দিয়েছে। তখন ব্যাধের মনে এতো গ্লানি এসে গেল যে, ব্যাধের পেশাটাই পরে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু মূল কাহিনী হচ্ছে, একজনকে যে ব্যাধ ধরেছে, তাকে আরেকজন এত কষ্টের মধ্যেও সৎকার করছে, এই কাহিনীটাই বাল্মীকির সময়ে বেশি প্রচল ছিল।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – **আর্তো যদি বা দৃপ্তঃ পরেষাং শরণং গতঃ। অরিঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য রক্ষিতব্যঃ কৃতাত্মনা।**।৬/১৮/২৮ – দুঃখী হোক, অহঙ্কারী হোক, অভিমানী হোক, যাইই হোক, শত্রুও যদি শরণাগতি নিয়ে নেয়, পায়ে এসে পড়ে যায়, তখন তাকে কিন্তু আশ্রয় দিতে হয়, তার রক্ষার সব রকম প্রযত্ন করতে হয়। যারা শরণাগতি দেয়না, তারা খুবই অহঙ্কারী, বিনাশই তাদের পরিণতি। বিভীষণকে তখন শ্রীরামচন্দ্র রাবণের শক্তি, পরাক্রমাদির ব্যাপারে যেমন যেমন জিজ্ঞেস করছেন, বিভীষণও সব বিস্তারিত ভাবে তেমন তেমন শ্রীরামচন্দ্রকে বলতে থাকলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তখন খুব সুন্দর কথা বলছেন 'হে লক্ষ্মণ! সমুদ্র থেকে জল নিয়ে এস। আমি বিভীষণের উপর প্রসন্ন, খুব খুশী হয়েছি। আমি যে প্রসন্ন হয়েছি বিভীষণের প্রতি, এর প্রতিদান কিছু তো দেওয়া দরকার। কি প্রতিদান দেবো এঁকে? আমি বিভীষণকে লঙ্কার রাজা বলে স্বীকার করে সমুদ্রের জল দিয়ে অভিষেক করিয়ে দেব'। এই ব্যাপারটাকে বলা হয় Emperor in exile, ইদানিং এই শব্দটা প্রায়ই আসে। আফ্রিকায় অনেক ছোট ছোট দেশ আছে, তাদের কোন রাজনৈতিক নেতা হয়তো বাইরে কোথাও রয়েছে, আমেরিকা বৃটেন এরা করে কি তাকেই বলে দেয় এই হচ্ছে সেই দেশের সম্রাট, এবার একে কেন্দ্র করে অনেক কিছু হতে থাকে, এটাকেই বলা হয় Emperor in exile, বা Dictator in exile, ইদানিং যেমন তিব্বতে যিনি ধর্মীয় প্রধান হবেন তিনিই রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হবেন। দালাই লামা হচ্ছেন তিব্বতের ধর্মীয় প্রধান, তিনিই আবার রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তিনি আগেই প্রধান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে হয় কি, দেশের বাইরে বাইরেই থাকেন, আর তাকে রাজা ঘোষিত করে দেওয়া হল, এই রকম প্রচুর ঘটনা আছে।

ঠাকুর ডাক্তার সরকারকে অনেক কথা বলার পর বলছেন – কিগো, একটা থ্যাঙ্ক্যু দাও। ডাঃ সরকার বলছেন, একটা থ্যাঙ্ক্যু দিলেই কি সব হয়ে গেল। ঠাকুর – হ্যাঁ, মুর্খদের জন্য দরকার। কেন মুর্খদের জন্য দরকার? বলছেন, রাজা রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করলেন তখন ঠিক করলেন বিভীষণকে রাজা করবেন। বিভীষণ বলছেন, আমার এই সব কিছু লাগবে না। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন – মুর্খ যারা তারা বলবে বিভীষণতো শ্রীরামচন্দ্রের এত সেবা করল কিন্তু ফল কি পেল। এই ধরণের লোকগুলোর যাতে বিশ্বাস হয় সেইজন্য তোমাকে রাজা করা হল। তুমি মুর্খদের জন্য রাজা হও। মুর্খদের জন্য কিছু কিছু জিনিষ করতে হয়। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র বানরদের সামনে বিভীষণকে রাজা করে দিয়ে বানরদের একটা বার্তা দিয়ে দিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের জন্য যখন কিছু করবে, তিনি যখন প্রসন্ন হয়ে যাবেন তখন অনেক কিছুই হয়ে যাবে।

বাল্মীকি রামায়ণ – ১০ই জুলাই ২০১০

ছোটবেলা থেকে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, রাবণ, বিভীষণের সম্বন্ধে অনেক রকম কাহিনী শুনে শুনে এঁদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সবারই নিজস্ব কিছু কিছু ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। কিন্তু যখন বাল্মীকি রামায়ণ পড়া হয় তখন ঠিক ঠিক বোঝা যায় যে শ্রীরামচন্দ্র আর রাবণ এরা দুজনই অন্য যে কোন রাজার মতই। কিন্তু এঁদের দুজনের মধ্যেই একটা বিশেষ শক্তি আছে। বিশেষ শক্তি যদি নাই থাকত তাহলে এত বড় মহাকাব্য লেখা হত না।

যুদ্ধের ব্যাপারে একদিকে শ্রীরামচন্দ্র যেমন দুশ্চিন্তায় রয়েছেন যে, রাবণকে কিভাবে পরাস্ত করবেন, ঠিক তেমনি রাবণেরও মনে দুশ্চিন্তা আছে। রাবণও মনে করতে পারছেন না যে, খুব সহজেই এদের উপর আমি জয় পেয়ে যাব। রাবণও চিন্তিত তার শত্রুপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে। শত্রুপক্ষ কতটা শক্তি ধরে, তার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য শুক আর সারণ বলে দুটো রাক্ষসকে গুপ্তচর করে শ্রীরামচন্দ্রের শিবিরে পাঠান হয়েছে। রামায়ণ থেকেই আমরা এই গুপ্তচর বৃত্তির কথা পাই। তখনও রাজারা চর লাগিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে শত্রুদের বিভিন্ন খবরাখবর সংগ্রহ করাত, এমনকি দরকার পড়লে কাউকে অপহরণ করে তুলেও নিয়ে আসা

হত। বিশেষ করে গত একশ বছরের ইতিহাসে রাশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে এই গুপ্তচর বৃত্তির উপর প্রচুর রোমাঞ্চকর কাহিনী ও ঘটনার কথা শোনা যায়।

এক রাশিয়ান ভদ্রলোক, যার নিজের জাতির প্রতি, দেশের প্রতি একটা প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। কিভাবে সে পালিয়ে ইংলণ্ডে চলে আসে। এখানে এসে সে ইংল্যাণ্ডের হয়ে চর বৃত্তির কাজ করতে আরম্ভ করে দিল। এমনও হয়েছে একটা মিটিং চলছে, সেখানে কিভাবে ঢুকে গিয়ে আসল লোকটাকে কায়দা করে তুলে নিয়ে এসেছিল। পরের দিকে ইয়াং ফেমিং এই লোকটাকে আধার করে জেমস্ বণ্ডের মত এক বিখ্যাত চরিত্রের সৃষ্টি করেন। গুপ্তচর বৃত্তি প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। খুব বুদ্ধিমান, শক্তি আছে, শত্রু শিবিরে ঢুকে খবরাখবর নিয়ে আসবে, খবর না আনতে পারলেও দরকার হলে কিছু একটা করেও আসতে পারবে, রাজারা এই রকম বিশ্বস্ত লোকের উপর খুব নির্ভর করত।

শুক আর সারণকে পাঠান হয়েছে এই উদ্দেশ্যেই, যদি কোন রকমে শ্রীরামচন্দ্রের আর সুগ্রীবের মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে দেওয়া যায়, যাতে সুগ্রীব আর শ্রীরামচন্দ্র আলাদা হয়ে যায়। তাই রাবণের এই দুজন চর গিয়ে সুগ্রীবকে বলছে – **অহং যদ্যহরং ভার্যাং রাজপুত্রস্য ধীমতঃ। কিং তত্র তব সুগ্রীব কিষ্কিন্ধাং প্রতি গম্যতাম্।**।৬/২০/১১। আমি রামচন্দ্রের স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে এসে থাকি, হে সুগ্রীব, তাতে তোমার কি ক্ষতি হয়েছে। লড়াইতো আমার আর রামের মাঝখানে, তুমি এর মধ্যে নিজেকে কেন মিছিমিছি জড়াচ্ছ। এটি খুব প্রাচীন পদ্ধতি, শত্রু পক্ষের মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে দেওয়া, divide and rule policy, যখন দেখবে শত্রুরা সব একজোট হয়ে গেছে তখন কোন ভাবে এই জোটের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেওয়ার প্রথা খুব প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

বলা হয়, সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে তেলের সাহায্য নিয়ে, তেলের জন্য। নতুন যে বিশ্ব অর্থনীতি পুরো দাঁড়িয়ে আছে তেলের উপর, পুরো জগৎ চলছে তেলের জোরে। কথায় কথায় একে অপরকে টিপ্পণি কাটে – কিরে খুব তেল মারছিস? আমেরিকা আর ইউরোপ ভালো করেই জানে যে যার হাতে তেল তার হাতে ক্ষমতা। বিশ্বে যা তেল আছে সেটা শেষ হতে আর খুব জোর একশ বছর। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই চাইছে না যে তার শাসনকালে তেলের ক্ষমতা তার হাতে থেকে চলে যাক। আমেরিকা আর ইউরোপ হচ্ছে খুব ধুর্ত জাত, তেলের দেশ যত আছে, ইরাক, ইরান, সৌদি আরব এদের মধ্যে সব সময় মারামারি লাগিয়ে রাখতে চাইছে। যখন এরা মারামারি করবে না, তখন লাগিয়ে দিচ্ছে সিয়া সুন্নির বিবাদ। ভারতে এক হাজার বছরের ইতিহাসে হিন্দু মুসলমান কে কি ধর্ম নিয়ে আছে জানত না। প্রথম যখন মুসলমান ভারতে আসে তখন থেকেই হিন্দু মুসলমান সবাই শান্তিতেই ছিল। কিন্তু ইংরেজ এসে দেখল হিন্দু আর মুসলমান যদি শান্তিতে থাকে তাহলে আমাদের আর ভারতে শাসন করতে হবে না। শুরু হয়ে গেল হিন্দু মুসলমানের কাটাকাটি। এর ফলে আজকে এমন অবস্থা হয়ে গেছে ভারতে কোথাও শান্তি নেই।

মধ্যপ্রাচ্য যত তেলের দেশ আছে ওরাতো সবই মুসলিম রাষ্ট্র, সেখানে কি করবে, তাই তুমি সিয়া তুমি সুন্নি, এই বলে কাটাকাটি লাগিয়ে দিয়েছে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে তেলের নিয়ন্ত্রণটা কে দখলে নেবে। কর্তৃত্ব কায়েম করতে হলে এদের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিতে হবে, সে শক্তিমানই হোক আর শক্তিমান নাই হোক। যেমনি ঝগড়া লেগে যাবে তখনই শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে। মুঠো যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন সেটা হয়ে যায় ঘুষি, মুঠো যদি আলগা করে দিলেই আঙুল, আঙুল আর ঘুষিতে বিরাট তফাৎ। সেটাই রাবণ করতে চাইছেন। চর পাঠিয়ে সুগ্রীব আর শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে ফাটল ধরাতে চাইছেন। কিন্তু বিভীষণ এদের দুজনকে চিনে ফেলেছেন। রাক্ষস দুটো পাখির রূপ ধরে চর হয়ে গিয়েছিল। বানররা বুঝতে পারতেই সব পালক উপড়ে ফেলেছে দেখে শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা বানরদের কাছ থেকে প্রাণ রক্ষা পাবার পর লঙ্কায় এদের আবার রাবণের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

শ্রীরামচন্দ্র এখন রামেশ্বরের দিকে অবস্থান করছেন। শ্রীরামচন্দ্র জীবনে কখন সমুদ্র দেখেননি, এই প্রথম সমুদ্র দেখছেন। সেই বিশাল জলরাশি, উত্তাল তরঙ্গ দেখে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন – **অবলেপঃ সমুদ্রস্য ন দর্শয়তি যঃ স্বয়ম্**।৬/২১/১৪। হে ভাই লক্ষ্মণ, তুমি দেখেছ, এই সমুদ্রের নিজের উপরে কি প্রচণ্ড অহঙ্কার! আমি আমার সৈন্য নিয়ে এসেছি, কিন্তু সমুদ্র নিজে এগিয়ে এসে আমার সাথে এখনও দেখা করছে না। এখন যদি কেউ বলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ বলছেন সমুদ্র এসে দেখা করছে না, সমুদ্র আবার কিভাবে এসে দেখা করবে? হিন্দুদের এইটি খুব চিরন্তন ধারণা এই, যে কোন শক্তিমান জিনিষ আছে, এমনকি শক্তিহীনও যদি কোন কিছু থাকে, তাদের প্রত্যেকেরই একটি আধ্যাত্মিক মুর্তিমান সত্তা আছে। যেমন আমাদের এই স্থুল শরীরের ভেতরে আত্মা আছেন, ঠাকুর বলছেন – আমি দেখছি শরীরটা যেন একটা খোল, ভেতরে কেউ একজন আছেন, তিনি নাড়াচ্ছেন বলেই এই শরীরটা নড়ছে। প্রত্যেক জিনিষের পেছনে একটি চৈতন্য সত্তা আছে, এই ধারণাটা বহু প্রাচীন কাল থেকে আমাদের হিন্দু সমাজে দৃঢ় ভাবে বসে গেছে। শ্রীরামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্র মুনির সাথে তাড়কা রাক্ষসাদিকে বধ করতে যাচ্ছিলেন, বিশ্বামিত্র তখন শ্রীরামচন্দ্রকে দিব্য অস্ত্র সকল যখন দিয়েছিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত দিব্য অস্ত্রকে মুর্তিমান দেখছিলেন, দিব্যকান্তি রূপ ধারণ করে সবাই শ্রীরামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত ছিলেন। ঠিক তেমনি এই অগাধ জলরাশি আর উত্তাল তরঙ্গ নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের সামনে যে সমুদ্র গর্জন করে চলেছে, এরও একটা আধ্যাত্মিক মুর্তিমান রূপ আছে। এই বিপুল জলরাশি হচ্ছে সমুদ্রের বাহ্যিক রূপ, এটা তার স্থুল শরীর, তার যে আধ্যাত্মিক শরীর তিনিই হচ্ছেন সমুদ্র দেবতা। ঠিক সেই রকম গঙ্গা বা যমুনা বা ভারতের কোন নদীকেই হিন্দুরা কখনই শুধু নদী বলে মনে করে না, গঙ্গাকে দেবী রূপে শ্রদ্ধা করা হয়। দশহরাতে গঙ্গার যে পূজা করা হয়, সেখানে কেউ নদীর পূজা করছে না, গঙ্গার যে একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, তার পেছনে যে দিব্য সত্তা আছে তাঁরই পূজা সবাই করে।

একটা পুকুরের দিব্যশক্তি আছে বলে আমরা মনে করতে পারিনা। কিন্তু কোন মহাপুরুষ এসে যদি এই পুকুরে কিছু একটা দিব্যদর্শন পেয়ে থাকেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এখানে একটা শক্তি আছে। তিনি যখন বলে দিলেন শক্তি আছে, সেই বিশ্বাস নিয়ে যদি এই পুকুরের পূজা শুরু হয়ে যায়, আর যদি দীর্ঘকাল ধরে পূজা চলতে থাকে, পঞ্চাশ বছর, একশ বছর, দুশো বছর ধরে পুজো চলতে থাকে তখন তার চৈতন্য শক্তি জাগ্রত হয়ে যাবে, শক্তি তখন প্রকাশ পেয়ে যাবে। যেখানে সেখানে কত পাথরই পড়ে থাকে কিন্তু সব পাথরকে লোক পূজো করতে যায় না। কিন্তু কালীঘাটের যে পাথর, সেখানে কত লোক কত ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরে আগে বেশি লোক যেত না, ইদানিং কালে কি প্রচণ্ড ভিড় হচ্ছে, তার অর্থ চৈতন্য শক্তির প্রকাশ হচ্ছে। ঐখানে যারা পূজো করছে, তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা পূজার সাহায্যে এই চৈতন্য শক্তির প্রকাশ হয়। আজকে যদি কোন কারণে দক্ষিণেশ্বরে বা কালীঘাটে পূজো বন্ধ হয়ে যায়, তখন আস্তে আস্তে ঐ চৈতন্য শক্তির প্রকাশটা কমে যাবে। মানুষও যদি খুব ভোগের মধ্যে ডুবে থাকে, খুব করে খাওয়া-দাওয়া করছে, মারামারি করছে, খবরের কাগজ, টিভি, নভেল নিয়ে পড়ে থাকে, আর বছর বছর খালি সন্তান উৎপাদন করে যাচ্ছে, তখন কি হয়, তার মধ্যে যে চৈতন্য সত্তা আছে সেও আস্তে আস্তে নীচে পড়ে যায়। আবার এর ঠিক উল্টো যদি নিয়মিত জপ-ধ্যান বেশি করছে, পূজো-পাঠ করছে তখন তার ভেতরের চৈতন্য সত্তার প্রকাশ উত্তোরত্তর বাড়তে থাকে। তখন তাকে পাঁচজন লোক মানতে থাকে, সম্মান দিতে শুরু করবে। চৈতন্য সত্তা সব কিছুর মধ্যেই আছে, এই মাইক্রোফোনের মধ্যেও আছে, কিন্তু এখানে চৈতন্য সত্তা সুপ্ত অবস্থাতে রয়েছে। এই মাইক্রোফোনেরই যখন পূজো অর্চনা করা হবে, তাকে যখন আধ্যাত্মিক সত্তা রূপে দেখা হবে, তখনই এর সুপ্ত চৈতন্য সত্তা জাগতে শুরু করবে। নৃসিংহ অবতার রূপে যখন ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন হিরণ্যকশ্যিপুকে বধ করবার জন্য, তখন এই তত্ত্বটাই দেখানো হয়েছিল। একটা স্তম্ভ থেকে ভগবান বেরিয়ে আসছেন।

শ্রীরামচন্দ্র এখানে একটা খুব মূল্যবান কথা বলছেন – **প্রশমস্য ক্ষমা চৈবা আর্জবং প্রিয়বাদিতা।**।৬/২১/১৪। চারটি সদগুণ, শান্তি, ক্ষমা, সরলতা এবং শেষে চতুর্থ হচ্ছে মধুর ভাষণ, যারা গুণহীন পুরুষ, অসংস্কৃতজ্ঞ, গেঁয়ো লোক তাদের সামনে এই চারটে সদ্গুণ কাজ করেনা। শম মানে শান্তি, শান্তির ঠিক ঠিক অর্থ হচ্ছে নিজের শক্তিকে প্রকাশ না করা, অর্থাৎ নিজেকে সংযমে রাখা। ক্ষমা, কেউ অপরাধ করেছে তাকে মাফ করে দেওয়া। সরলতা, ভেতরে কোন প্যাঁচঘোচ নেই, আপনার হয়ত কিছু দরকার আপনি সরল মনে বলে দিলেন। আর চতুর্থ হচ্ছে মধুর ভাষণ, মিষ্টি কথা, মিষ্ট ব্যবহার। শ্রীরামচন্দ্রের এই মতটিকে নিয়ে একটা খুব সুন্দর রম্য রচনা আছে। একজন লোক পুলিশে চাকরি করতে গেছে। প্রথমেই তাকে ট্রাফিক পুলিশের কাজে লাগান হয়েছে। রাস্থায় দাঁড়িয়ে রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, গাড়ির ড্রাইভাররা কেউ ট্রাফিক আইনের বাইরে কিছু করতে দেখলেই এই পুলিশটি গিয়ে মিষ্টি করে ভদ্রভাবে বলছে – দাদা, এভাবে যাচ্ছেন কেন। কিছু দিন পরে এরা বুঝতে পারল এই লোকটা পুলিশের লোকই নয়, পুলিশের লোক কি এত মিষ্টি করে কথা বলে নাকি। তারপর থেকে একে আর কেউ পাত্তাই দেয়না। থানার দারোগা তো এই ট্রাফিক পুলিশকে পরে সাসপেণ্ড করে দিয়ে বলে দিল, কিছু দিন গ্রামে গিয়ে ভালো করে গালাগাল টালাগাল শিখে এসো, তারপরে পুলিশের কাজ করতে পারবে। তারপর সে একটা জায়গায় গিয়ে কয়েকটা মস্তান লোকের সঙ্গে আলাপ করেছে। ওদেরকে একদিন বলছে - তোরা আমাকে ভালো করে বাঁধ, বেঁধে মার, আর আমি একটাও যদি মিষ্টি কথা বলি তাহলে আরও বেশি করে মারবি, যতক্ষণ না আমি গালাগাল দিতে না শুরু করছি ততক্ষণ মেরেই যা। তারপর দেখা যাচ্ছে, গ্রামের দুজন মস্তান এর হাত পা বেঁধে খুব মারছে। একজন মুখ্যমন্ত্রী আছেন, উনি যখন খুব মিষ্টি করে কথা বলেন তখন শালা দিয়েই শুরু করেন। রিপোর্টাররা এই কথা বলছেন, আমাদের কাজ তথ্য লেখা, কিন্তু উনি যেসব ভাষা ব্যবহার করেন, এইসব ভাষা ছাপার অক্ষরে লেখার ধৃষ্টতা আমাদের নেই।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, এই চারটে গুণের কদর কে করেন? একমাত্র যারা ঠিক ঠিক ভদ্রলোক তারাই এই চারটে গুণকে সম্মান দেন। কিন্তু যাদের মধ্যে কোন গুণ নেই, একেবারেই গেঁয়ো, অসংস্কৃতজ্ঞ তাদের কাছে এই গুণের কোন কদর নেই, এগুলোর কোন মূল্যই দেয় না তারা। এই সমুদ্রও হচ্ছে এই ধরণের লোক, আমি এত মিষ্টি করে পথ চাইছি, কিন্তু সে কোন ভাবেই পথ দিচ্ছে না। এই জগতে দুষ্ট লোকেদের মধ্যে কে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, তাদের মধ্যে সম্মান কে বেশি পায়? শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – **আত্মপ্রশংসিনং দুষ্ট ধৃষ্টং বিপরিধাবকম্।**।৬/২১/১৫। যারা নিজের ঢাক নিজে পেটায়। আত্মপ্রশংসা কোথায় চলে, যারা মুর্খ তাদের কাছেই নিজেদের ঢাক পেটান যায়। আমরাও মুর্খ বলে যত রাজনৈতিক নেতারা আমাদের সামনে ঢাক পিটিয়ে যাচ্ছে আর আমরাও মুর্খের মত তাদের কথায় নেচে যাচ্ছি।

মুর্খ লোকদের শায়েস্তা করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, *দুষ্টম্, ধৃষ্টম্* স্বভাব রাখতে হবে। ঠাকুর গোলক চৌধুরীর কথা বলছেন। গোলক চৌধুরীর খুব প্রতাপ, প্রজা যেখানে দুর্দান্ত হয়ে যায় জমিদার সেখানে গোলক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেয়। আমেরিকার টেক্সাস হচ্ছে মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য, ওখানে দুনিয়ার যত ক্রিমিনালরা গিয়ে জড়ো হয়। আমেরিকার সরকার আর টেক্সাসের গভর্নর প্রাণপন চেষ্ট করেও কিছুতেই এদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। তখন সরকার থেকে ওখানে একজন নামকরা মাফিয়াকেই কাজে লাগানো হল, সে ছিল মহা দাগী লোক, যখন রাস্থায় চলত দু হাতে দুটো রিভলবার উঁচিয়ে চলত। এ আবার কারুর সাথে মুখে কোন কথাই বলবে না, গুলি দিয়েই কথা শুরু করত। প্রথমে গিয়ে টেক্সাসের যারা সবচাইতে বড় ক্রিমিনাল, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। বলছে যে, পরে সে দিনে একশটা করে ক্রিমিনালকে ধরে নিয়ে জেলে পুরতে থাকল। এখন দিনে একশটা ক্রিমিনাল রাখবে কোথায়, জেলে অত জায়গা কোথায় পাবে। তখন একটা বিরাট চার্চ ছিল, সেইটাকেই জেল খানা বানিয়ে তাতে সবকটাকে পুরতে শুরু করল। এক মাসের মধ্যে টেক্সাসকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল। বদমাইসকে দিয়েই বদমাইসদের এইভাবে ঠাণ্ডা করতে হয়। আর কি বলছেন – *ধৃষ্টম্,* কোন কিছুকেই এরা তোয়াক্কা করে না। যেখানে খুশি

এরা ঢুকে পড়বে, আর – *দণ্ডশ্চ লোকঃ,* মানে, ভালো লোকই হোক আর খারাপ লোকই হোক কোন কিছুই দেখতে যাবে না, আগে সবাইকে পিটিয়ে দেবে। এই ধরণের যখন রাজা হবে, তখন তাকে সব প্রজারা ভয় পাবে। দুষ্ট গ্রহের মত। কলকাতার রাস্তাঘাটে লোকেরা যেখানে সেখানে প্রস্বাব করে, কেউ নিজের বাড়ি দেওয়ালকে বাঁচাবার জন্য দেওয়ালে শনি ঠাকুরের ছবি এঁকে দেয়। শনি হচ্ছেন দুষ্ট গ্রহ, শনি দেবতাকে এমনই ভয় পায় যে ঐ ছবি দেখে আর দেওয়ালে প্রস্বাব করতে সাহস করে না। শনি ঐসব কোন বিচার করতে যাবে না, লোকটা ভালো কি মন্দ।

এত কথা শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলে যাচ্ছেন। বলছেন – দ্যাখো ভাই, সাম্যভাব নিয়ে, শান্ত ভাবের নীতি অবলম্বন করে কাজ করলে এই জগতে কীর্তি পাওয়া যায় না, সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায় না আর নাম যশেরও প্রসার হয় না। শ্রীরামচন্দ্র এখন খুব সন্তাপের মধ্যে রয়েছেন, সীতাকে খুব তাড়াতাড়ি করে কিভাবে উদ্ধার করা যায় সেই নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে সমুদ্রের উপরে রেগে আছেন। তিনিও ভালো ভাবেই জানেন যে, তিনি যা বলছেন আসলে জিনিষটা তা নয়। মানুষ যখন রেগে যায়, ক্রুদ্ধ হয়ে যায় তখন সে যে যুক্তির আশ্রয় নেয় তখন সেটা অন্য রকমের হয়ে যায়।

এইসব বলে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – ঠিক আছে, হে লক্ষ্মণ, এইবার দ্যাখো আমার শক্তি। শ্রীরামচন্দ্র করলেন কি, যে দিব্য বাণ গুলি অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন, রেগে গিয়ে সেই বাণ গুলিকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে সন্ধান করতে শুরু করলেন। দিব্য বাণের তেজস্ক্রিয়তার ফলে এমন অবস্থা হল যে, সমুদ্রে বিশাল বিশাল ঢেউ উঠতে লাগল আর সমুদ্রের তিমি মাছের মত বড় বড় জলজ প্রাণীরা মরে ভেসে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে সমুদ্রের অস্তিত্বই বিলোপ হতে বসেছে। লক্ষ্মণ দেখলো শ্রীরামচন্দ্র রেগে গিয়ে যা শুরু করেছেন এতে ভালো কিছুই হবে না, বরঞ্চ অনেক কিছু কাণ্ড হয়ে বিরাট সঙ্কট এসে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

লক্ষ্মণ দৌড়ে গিয়ে দাদার ধনুষকে দু হাতে জাপটে ধরে বলছেন – দাদা, আপনি এই কাজ থেকে বিরত হন, এ রকম করবেন না। প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্মকে আপনি নষ্ট করে দিতে চলেছেন। আপনার মত পুরুষের এই ভাবে রেগে যাওয়া কোনমতেই শোভা পায় না। শ্রীরামচন্দ্র শক্তিমান পুরুষ কিনা, তাই লক্ষ্মণ গিয়ে দাদাকে থামিয়ে দিতে চাইছেন। লক্ষ্মণ বলছেন – দাদা, আমাদের এমন একটা উপায় বের করতে হবে যেটা সহজ হবে, আপনি এই রকম ক্রোধের বশীভূত হয়ে কিছু করবেন না। রাজা যদি রেগে যায় তাহলে আর বাঁচার কোন পথ থাকেনা, কেননা রাজার কথাই তো শেষ কথা। মুম্বাইতে যখন পাকিস্থানী সন্ত্রাসবাদীরা বম্বিং করল তখন মনমোহন সিং বার বার নিজেকে সংযত রেখেছিলেন। মনমোহন সিং যদি সেই সময় অসংযত হয়ে পাকিস্থান আক্রমণ করতে চাইতেন তখন তাঁকে আটকাবার আর তো কেউ থাকত না। এখানে লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে আটকে দিলেন।

পরের দিকে অন্যান যত রামায়ণ রচিত হয়েছে সেখানে শ্রীরামচন্দ্রকে এই রকম ক্রোধান্বিত দেখান হইনি। যারা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্যকে বুঝতে চাইছেন তাদের এই জায়গাটাকে ধরতে হবে। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে যিনি আধিকারিক পুরুষ, আত্মজ্ঞানী, বাল্মীকি রামায়ণে যদিও এক জায়গায় শ্রীরামচন্দ্রকে আত্মজ্ঞানী পুরুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, হয়তো এই অংশটা প্রক্ষিপ্ত হতেও পারে, সেখানে বলা হচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের দুটো শক্তি আছে, তিনি একদিকে যেমন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করতে পারেন, যেটা শেষ কথা, আবার অন্য দিকে তাঁর আত্মজ্ঞানও আছে। সচরাচর দেখা যায় যাঁর আত্মজ্ঞান থাকে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যা জানা থাকে না। আসলে আমাদের যত অবতার পুরুষ ছিলেন তাঁরা সকলেই এই রকমই ছিলেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া। যেমন ভগবান বুদ্ধ তিনি অস্ত্রবিদ্যা জানতেন না, যিশুও অস্ত্রবিদ্যাতে যাননি, আমাদের ঠাকুর অস্ত্রবিদ্যা জানতেন না। স্বামীজীর আবার শৌর্য ছিল, অবতার পুরুষরা শৌর্য রাখেন না বা থাকে না। শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণ এনারা দুজনে ব্যতিক্রম ছিলেন, এঁদের দুজনেরই আত্মজ্ঞান ছিল, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সাথে সাথে অস্ত্রবিদ্যাতেও দখল ছিল, দুটোই তাঁদের ছিল। তা যাই হোক না

কেন, ভক্তিশাস্ত্রে অবতারকে কখনই দেখান হয় না যে তিনি রেগে গেছেন বা ক্রোধে বশীভূত হয়ে গেছেন। কিন্তু ঠাকুর রেগে যেতেন, আর যখন রেগে যেতেন গ্রাম্য ভাষায় গালাগালও দিতেন। আর স্বামীজীর রাগ তো খুব নামকরা রাগ ছিল। রাগ হবে না কেন, আত্মজ্ঞানীরও রাগ হওয়াটা কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু গীতাতে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আত্মজ্ঞানীর রাগ হবে না। আত্মজ্ঞানীর এটা একটা দিক। কিন্তু সব সময় একই রকম থাকবেন না, যিনি অবতার পুরুষ হন তিনিও রেগে যান। যিশুও প্রচণ্ড রেগে যেতেন, একবার এক মন্দিরে গিয়ে সেখানে যত পয়সা নিয়ে পাণ্ডাগিরি করত তাদের ধরে ধরে সব পয়সা ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন, যত ঘুঘু পাখি বলি দেওয়া হত, সব পাখিগুলোকে ধরে ধরে ছেড়ে দিয়েছেন। যিশুকে যে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রধান যে অস্ত্র নেওয়া হয়েছিল এই কাণ্ডটাই ছিল তাদের হাতিয়ার – যিশু আমাদের মন্দিরের মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। কালীঘাটে গিয়ে যদি কেউ বিপ্লব করতে যায় ওখানকার পাণ্ডারা কি তাকে ছেড়ে দেবে নাকি, ওখানেই ডাণ্ডা মেরে শেষ করে রাখবে। ভগবান বুদ্ধকে দেখে আমাদের মনে হয় তিনি খুব শান্ত ছিলেন, আদৌ তিনি এই রকম শান্ত ছিলেন না, আর শান্ত থাকার কথাও নয়। শান্ত যদি হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল আছে। তবে কি হয়, এনাদের ব্যক্তিত্বে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির লেশ মাত্র থাকেনা। রাগটাও ক্ষণিকের, এই রাগ হয়ে গেল, পরের মুহূর্তেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন।

পরের দিকে ভক্তিশাস্ত্রে কিন্তু অবতারের রাগ ক্রোধাদিগুলোকে একেবারেই দেখান হয়নি। সেখানে আবার উল্টো ভাবে দেখান হয়েছে – লক্ষ্মণ রেগে গিয়ে বলছে, সমুদ্রকে বাণ মেরে শুকিয়ে দেব। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন দাঁড়াও লক্ষ্মণ ঐ রকম ক্রোধ করতে নেই, আমি স্তোত্র পাঠ করে সমুদ্রকে তুষ্ট করি। শ্রীরামচন্দ্র তখন স্তোত্র পাঠ করছেন। স্তুতি করার পরেও সমুদ্র আসছে না দেখে তখন শ্রীরামচন্দ্র রাগ দেখাতে থাকলেন, রাগ দেখাতেই সমুদ্র দৌড়ে এসে শ্রীরামচন্দ্রের পায়ে পড়েছে। বাল্মীকি কিন্তু পুরো উল্টো বলছেন – শ্রীরামচন্দ্র রেগে গিয়ে বাণ মারতে শুরু করেছেন, লক্ষ্মণ দৌড়ে গিয়ে দাদাকে আটকে বলছেন – দাদা! দাদা! আপনি এই রকম করতে যাবেন না। যারা অধ্যাত্মকে, ধর্মকে ঠিক ঠিক বুঝতে চান তাদের কাছে বাল্মীকি রামায়ণের মত শাস্ত্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ধরণের শাস্ত্র না পড়লে ধর্মকে আদপেই বোঝা যাবে না। যারা খ্রীশ্চান সাধক তাদের কাছে পাপ হচ্ছে একটা প্রচণ্ড সমস্যা। কিন্তু আমাদের কাছে এগুলো কোন ব্যাপার নয়, আমার রাগ এসেছে, ও কিছু না, শ্রীরামচন্দ্রেরও রাগ এসেছিল, ঠিক আছে এই রাগকে কাটিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত এগিয়ে চল।

সমুদ্রে যখন ঐ রকম অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তাতেও কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র থেমে যাননি। উনি তখন ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করলেন, তার মানে সমুদ্রকে পুরো শুকিয়ে দেবেন। ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান করতেই সমুদ্র ভয় পেয়ে ছুটে এসেছে, কারণ তার ভৌতিক শরীরটাই এবারে বিনষ্ট হতে চলেছে। সমুদ্র এসে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে হে রাঘব বলে সম্বোধন করছেন, প্রভু বলছেন না, কারণ সমুদ্রের কাছে শ্রীরামচন্দ্র একজন রাজা, যে রাজার শক্তি আছে। হে রাঘব! **পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ রাঘব। স্বভাবে সৌম্য তিষ্ঠন্তি শাশ্বতং মার্গমাশ্রতঃ।**।৬/২২/২৬। – এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চভূত দিয়ে – ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। ক্ষিতি, মানে পৃথিবী, এই পৃথিবী মানে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি সেই পৃথিবীর কথা বলা হচ্ছে না, পৃথিবী হচ্ছে একটি পরিভাষা, পঞ্চভূতের মধ্যে সব থেকে ভারি সূক্ষ্ম বস্তু। বায়ু, এই বাতাস নয়, এই বাতাসের পেছনে যে আছে তার কথা বলা হচ্ছে। আকাশ, যাকে স্পেস বলছে, এটাও একটা সূক্ষ্ম বস্তু। জল, এই স্থুল ভৌতিক জল নয়, এই জলের পেছনে যে আছে তার কথা বলা হচ্ছে। আর তেজ, আগুনের পেছনে যে সূক্ষ্ম ভূত।

সমুদ্র বলছেন – হে রাঘব, এই পাঁচটা যে সূক্ষ্ম ভূত, এদের নিজের যে স্বভাব সেই স্বভাবে সব সময় অবস্থিত থাকতে হয়। কেউ যদি এদের ভয় দেখায়, বা কেউ যদি এদের প্রার্থনা করে, এরা কিন্তু কোন অবস্থাতেই এদের স্বভাবকে ত্যাগ করে দিতে পারবে না। কারণ এরা যদি নিজেদের স্বভাবকে ছেড়ে

দেয় তাহলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুহুর্তের মধ্যে বিনাশ হয়ে যাবে। যেমন জলের স্বভাব কি? জলের অনেক গুলো স্বভাব আছে, তার মধ্যে একটা হল তার নিম্নগামীনতা। হঠাৎ যদি জল তার স্বভাবকে ত্যাগ করে উর্দ্ধগামী হয়ে যায়, তখন সমুদ্রের যত জল আছে সব উবে আকাশে চলে গিয়ে এই পৃথিবীকে মরুভূমি করে দেবে। পৃথিবীর স্বভাব হচ্ছে গুরু, ভারী, এখন পৃথিবীর সব অনুগুলো যদি আকাশের মত হাল্কা হয়ে যায়, তখন এই যাবতীয় যা কিছু আছে সব খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। মাধ্যাকর্ষণ কোন কাজই করবে না। টাটা কোম্পানির নতুন গাড়ির নাম ন্যানো, ন্যানো শব্দের অর্থ অত্যন্ত ছোট। যে কোন পার্টিকেলস যখন ন্যানো স্তরে নেমে যায় তখন তার ফিজিক্যাল প্রপার্টি আর কেমিক্যালস প্রপার্টি পাল্টে যায়। যেমন তামা, তামার ধর্ম হচ্ছে ওপেক, মানে যে কোন তামার জিনিষ চোখের সামনে রাখলে আর কিছু দেখতে পারবে না। কিন্তু এই তামা যদি ন্যানো সাইজে চলে যায় তখন তামা স্বচ্ছ হয়ে যায়। তার উপাদান পাল্টে যাচ্ছে বলে পুরো জিনিষটাই উলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে। তাও তামা যে মূল পাঁচটা সূক্ষ্ম ভূতের যেগুলো দিয়ে নির্মিত হয়েছে সেটাকে পালটানো হচ্ছে না, এগুলো তামার বাইরের উপাদানের পাল্টানোর কথা বলা হচ্ছে, বাইরের জিনিষ পাল্টানোতেই এত সমস্যা হয়ে যাচ্ছে।

তাই সমুদ্র বলছে, হে রাঘব, আপনি যদি ব্রহ্মাস্ত্র চালিয়ে দেন আমার কিছুই করার নেই, কিন্তু আমি আমার ধর্মকে ছাড়ব কি করে। আপনার ব্রহ্মাস্ত্রে করলা মিষ্টি হয়ে যেতে পারে, আম তেতো হয়ে যেতে পারে, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এই পঞ্চ মহাভূত যদি তাদের স্বাভাবিক ধর্মকে ছেড়ে দেয় তার পরিণামে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের দিকে চলে যাবে। সমুদ্র বলছেন **ন কামান্ন চ লোভাদ্ বা ন ভয়াৎপার্থিবাত্মজ।**৬/২২/২৮। হে রামচন্দ্র, আপনি শক্তিমান হতে পারেন, কিন্তু আমার কোন কামনা নেই, কোন কিছু আমি চাইছি এমন নয় কিংবা কোন লোভের বশে আমি আছি তাও নয়, আর আমার কোন ভয়ও নেই, আপনি যদি ব্রহ্মাস্ত্র চালাতে চান চালান। কামনা হচ্ছে, যেটা নেই সেটা চাইছি আর লোভ মানে, যেটা আছে সেটা আরো পেতে চাইছি। সমুদ্র বলছেন – আপনি যদি ব্রহ্মাস্ত্র চালান তাহলে আপনিই পাপ করবেন, এই জগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের দায় আপনার উপরেই বর্তাবে, আমি কিন্তু স্তম্ভিত হব না। স্তম্ভিত হব না মানে, সমুদ্রের জলকে সরিয়ে দিয়ে রাস্তা আমি দিতে পারব না।

সমুদ্র এত শক্তি নিয়ে কি করে শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলতে পারছেন? আসলে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের নাম শুনলেই মনে করি তিনি সেই পরমাত্মা, ভগবানের অবতার। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে প্রথম কথা হল শ্রীরামচন্দ্র হলেন একজন রাজপুরুষ, দ্বিতীয় যেটা তিনি বিষ্ণুর অংশ থেকে জন্ম নিয়েছেন, বিষ্ণুর অংশ থেকে জন্ম হওয়া মানে বিষ্ণু দেবতার অংশ, তাই সমুদ্র দেবতা আর বিষ্ণু দেবতার বিশেষ কোন দূরত্ব নেই বলেই শ্রীরামচন্দ্রকে সমুদ্র এইভাবে কথা বলতে পারছে। ইন্দ্র দেবতার অংশের হলে তাও এতটা এইভাবে সমুদ্র বলতে পারতেন না, কারণ ইন্দ্র হলেন দেবতাদের রাজা। শ্রীরামচন্দ্র আর সমুদ্রের এই লড়াইটা আসলে দেবতা দেবতার লড়াই। এটা ঠিক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আর বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর লড়াই, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর লড়াই এটা নয়। এখানে তুমিও দেবতা আমিও দেবতা, তোমার আমার মর্যাদা সমান সমান, আমি কেন তোমাকে পাত্তা দিতে যাব! তোমার শক্তি আছে তুমি ব্রহ্মাস্ত্র চালাতে চাইছ চালাও, সমুদ্র শুকিয়ে যাবে কিন্তু তাই বলে তোমার কথা আমি মেনে নেব না। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যদি ভগবান হতেন তখন তাঁর সামনে সমুদ্রের এইভাবে কথা বলার সাহস হত না, কারণ দেবতাদের যে শক্তি, সেটা ভগবান, ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি। এখানে সমুদ্রের যে শক্তি সেটা শ্রীরামচন্দ্র প্রদত্ত শক্তি নয়, এখানে শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন বিষ্ণু দেবতার অংশের, বেদে বিষ্ণু এক অতি সাধারণ দেবতা, বারোজন আদিত্যের একজন। এটাই এখানে মূল কথা। বাল্মীকির পরে যত রামায়ণ রচিত হয়েছে তখন এই দৃশ্যই অন্য ভাবে আসবে তখন সমুদ্র এসে বলবে – হে প্রভু, আপনিই আমাকে এই স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আমার ধর্মকে নষ্ট করার অধিকার আপনার আছে কিন্তু আপনি এই ভাবে আমার ধর্মকে নষ্ট করবেন না, এতে আপনারই নিন্দা হবে ইত্যাদি।

এরপর সমুদ্র বলছেন – আপনাকে আমি একটা উপায় বলে দিচ্ছি, সেই উপায়কে অবলম্বন করলে আপনারও সম্মান থাকবে আর আমারও কোন দুঃখ থাকবে না। আপনি এই রামেশ্বরম্ থেকে আমার উপর একটা বাঁধ তৈরী করুন। এইখানে এসে আবার অনেক সংশয়ের অবকাশ এসে যায়। বাঁধ তৈরী করতে বলেছিল, না কি ব্রীজ বানাতে বলেছিল বোঝা যায় না। কেননা সেতু বলতে বাঁধও বোঝায় আবার ব্রীজও বোঝায়। এখনও আর্কোলজিস্টরা ঠিক করে বলতে পারছেন না, এটা সমুদ্রে ভাসছিল, না কি সমুদ্রের তল দেশে বসেছিল। ভক্তিশাস্ত্রে বলা আছে বানররা পাথরের উপর 'শ্রীরাম' লিখে লিখে সমুদ্রের জলে ফেলছে আর পাথর গুলো ভাসতে থাকল, ভাসা মানে ব্রীজ হয়ে গেল। পাথর গুলোকে ডুবতে হবে, না ডুবলে বাঁধ হবে কি করে, যেটাকে আমরা এখন ব্যারেজ বলি, যেমন ফরাক্কা ব্যারেজ। রামায়ণ রচয়িতাদের কাছে এটা একটা সমস্যা, তবে অনেকে মনে করেন এটা একটা ভাসমান ব্রীজ ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে পণ্ডিতরা বেশি ব্যাখ্যায় যাননি।

সমুদ্রের কথাতে শ্রীরামচন্দ্র একটু ঠাণ্ডা হয়েছেন। ঠাণ্ডা হওয়ার পর বলছেন – দ্যাখো সমুদ্র, আমি এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার উপর সন্ধান করেছিলাম, কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছে অমোঘ একবার সন্ধান করা হয়ে গেলে একে আর ফেরান যায় না, এখন তুমি বল এই ব্রহ্মাস্ত্রকে আমি কোথায় ফেলব। সমুদ্র তখন বলছেন – ঠিক আছে, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমারই একটা জায়গা আছে, সেখানে কিছু জাতি আছে যারা খুব দুষ্কর্ম করে বেড়ায়, এরা আমার নামের কলঙ্ক, আপনি সেই জায়গার দিকেই এই বাণ চালিয়ে দিন। তারপর শ্রীরামচন্দ্র যেমনি এই ব্রহ্মাস্ত্র অভিষিক্ত বাণকে সেইদিকে চালালেন, সেই অঞ্চলটা মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেল। এটা বাল্মীকি বলছেন। আসলে পৃথিবীতে যত মরুভূমি আছে সবটাই আগে সমুদ্র ছিল। ভূবিজ্ঞানীরাও বলছেন যে, আমাদের থর মরুভূমি নাকি আগে সমুদ্র ছিল। পৃথিবীর ভূস্তরের ভেতরে অনেক প্লেট পর পর সাজান রয়েছে, এই প্লেট গুলো যখন নড়ে চড়ে যায় তখন সমুদ্রের জলের স্তর অনেক নেমে যায়, কোথাও মাটিটা উপরের দিকে চলে আসে, তখন সেই অঞ্চলটা সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসে। সমুদ্রের তলায় আছে শুধু বালি, সেটাই মরুভূমি হয়ে যায়। এশিয়ার গালফ্ অঞ্চলের যত দেশ আছে, কুয়েত, সৌদি আরব, ইরাক সবই বালির দেশ, বালি ছাড়া কিছুই নেই। বলা হয়, এই অঞ্চলটা আগে সমুদ্রের মত বিশাল জলাভূমি ছিল, ঐসব জলাভূমিতে প্রচুর জলজ বিশাল বিশাল প্রাণী ছিল। কোন ভূমিকম্পের ফলে সেই প্রাণীরা নীচে চলে গেছে, সেটাই পরে তেল হয়ে গেছে, জলটা সরে গিয়ে বালিটা থেকে গেছে। আমাদের হিমালয় নাকি আগে সমুদ্রের তলায় ছিল, এগুলো অবশ্য বিজ্ঞানীদের মত। তবে হিমালয়ে এমন কিছু প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, যে সব প্রাণীরা সমুদ্রেই থাকে, তাতেই মনে করা হচ্ছে যে হিমালয়ের ভূভাগ যেটা উপরে চলে এসেছে সেটা কোন এক কালে সমুদ্রের তলায় ছিল।

তখন সমুদ্রই বলে দিল, আপনার এই সব বীর বানরদের মধ্যে অনেকেই ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ জানে, আপনি এদের দিয়ে সেতু তৈরীর কাজ শুরু করুন। সেতু তৈরীর কাজ যখন শুরু হয়েছে তখন বিভীষণ সমুদ্রের অপর পারে, মানে লঙ্কার দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন, যাতে যেমন যেমন ব্রীজ এগোতে থাকবে তখন ঐ দিক দিয়ে যাতে রাক্ষসরা এসে ব্রীজকে ভেঙ্গে না দেয়। রাবণের সেই সাহস নেই যে বলবে, তোমরা যা করে পার এইদিকে এসো, তারপর তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। রাবণেরও ভয় আছে, তাই যে করেই হোক শ্রীরামচন্দ্রের বানর সেনাদের এই দিকে আসতেই দেবে না, লঙ্কায় যাতে ঢুকতেই না পারে তার জন্য অনেক কিছুই করতে পারে। এমনি সহজ ভাবে তো শ্রীরামচন্দ্ররা আসতে পারবেন না, বাঁধ তৈরী করে আসছে, ঠিক আছে ঐ বাঁধটাকেই উড়িয়ে দেওয়া যাক। যে কোন দেশের মধ্যে যখন যুদ্ধ লাগে প্রথমে একে অপরের রাস্তা ঘাটকে উড়িয়ে দেবে, সবার আগে ব্রীজ গুলোকে বম্বিং করে উড়িয়ে দেবে, তারপরে রেললাইন আর রাস্তা, যাতে শত্রুর সৈন্যরা চলাচল না করতে পারে। সেইজন্য বিভীষণেরও ভয় আছে, তাই ব্রীজ রক্ষা করতে তিনি লঙ্কার দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

এরপর সেতু বানান হয়ে গেলে সবাই ঐ পারে পৌঁছে গেছে। দু পক্ষই এখন বিচার করছে, একদিকে শ্রীরামচন্দ্র বিচার করছেন, অন্য দিকে রাবণও বিচার করছেন, এই যুদ্ধে কার জেতার সম্ভবনা বেশি। ঐদিক থেকে শুক আর সারণ গুপ্তচর বৃত্তি করতে এসে নাজেহাল হয়ে লঙ্কায় ফিরে গিয়েছিল। এই প্রথম কোন রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্রকে পরিষ্কার ভাবে কাছ থেকে দেখেছেন, এর আগে শূর্পনখা দেখেছিল। শূর্পণখা শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে গিয়ে রাবণকে শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা দিয়েছিল, কিন্তু সেই বর্ণনাটা প্রতিহিংসা বশতঃ ঠিক ঠিক ভাবে উপস্থাপনা করতে পারেনি, শূর্পণখা শ্রীরামচন্দ্রের নিন্দাসূচক বর্ণনাই করেছিল। কিন্তু এখন সারণ রাবণকে লঙ্কার প্রাচীরের পারে নিয়ে এসে শ্রীরামচন্দ্রের সাথে যারা বড় বড় বীর যোদ্ধা আছে তাদেরকে লক্ষ্য করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। হনুমানকে দেখিয়ে সারণ রাবণকে বলছেন – হনুমানকে তো আপনি ভালো করেই চেনেন, ওঁর পাশে যে দাঁড়িয়ে আছেন – *পদ্মনিভেক্ষণঃ*, যাঁর পদ্মফুলের পাপড়ির মত টানা টানা চোখ, যাঁর গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ। শ্রীরামচন্দ্র গৌরবর্ণ ছিলেন না, হাল্কা একটু শ্যামবর্ণের ছিলেন, লক্ষ্মণ গৌরবর্ণ ছিলেন। ভারতে যদিও গৌরবর্ণের বেশি কদর কিন্তু আমাদের তিনজন খুব নামকরা ব্যক্তিত্ব শ্যামবর্ণের ছিলেন, একজন শ্রীরামচন্দ্র, আরেকজন শ্রীকৃষ্ণ, তৃতীয়জন খুব নামকরা সুন্দরী শ্যমবর্ণের ছিলেন তিনি হলেন দ্রৌপদী, সেইজন্য দ্রৌপদীর আরেক নাম ছিল কৃষ্ণা।

সারণ শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা দিচ্ছেন – **যস্মিন্ন চলতো ধর্মো যো ধর্মং নাতিবর্ততে। যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ।**।৬/২৮/১৯। এই একটি শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের ঠিক ঠিক ব্যক্তিত্বকে ব্যক্ত করা হয়েছে। ধর্ম কখনই এনার থেকে আলাদা থাকে না। আর তিনি কক্ষণ ধর্মের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করেন না। মানে ধর্ম যে তাকে ছেড়ে চলে যাবে তাও হয় না, আবার তিনি যে ধর্মকে ত্যাগ করবেন তাও কখনই করেন না। ঠাকুর বলছেন – যিনি মহাপুরুষ হন তাঁর বেতালা পা পড়েনা। অজান্তে যদি কিছু হয়েও যায় তখন সেটাও ধর্ম হয়ে যায়, অধর্ম করলেও সেটা আর অধর্ম থাকবে না। যারা খুব বড় ওস্তাদ নৃত্যশিল্পী, তারা যদি অবচেতন মনেও যদি নৃত্য করে তাতেও তার কিন্তু বেতালা পা পড়বে না। যারা নতুন নাচ শিখছে তারা মেপে মেপে পা ফেলে। যারা মেপে মেপে পা ফেলে তাদের ভুল হতেই পারে। কিন্তু যারা ওস্তাদ তার কখন ভুল পা পড়বে না। আমাদের যদি ঘুমন্ত অবস্থাতেও জিজ্ঞেস করে ‘ই’, ‘এফ’, ‘জি’র পরে কি হবে, ঘুমের মধ্যেই আমরা বলে দেব ‘এইচ’। এতদিন ধরে আমরা অনুশীলন করে এসেছি যে ‘জি’র পরে কখনই ‘পি’ বলব না।

শ্রীরামচন্দ্রের আর বৈশিষ্ট্য কি? *যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদাংশ্চ বেদ বেদবিদাং বরঃ* – ইনি ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞাতা, ব্রহ্মাস্ত্র চালনার কৌশল এনার দখলে। সবাই ব্রহ্মাস্ত্র চালাতে পারেনা, তার জন্য আলাদা বিশেষ শক্তির দরকার। শ্রীরামচন্দ্র যেমন ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞাতা আবার অন্য দিকে তিনি বেদজ্ঞ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের দুটো শক্তিই তার মধ্যে যুগপৎ বিদ্যমান। যাঁরা বেদ জানেন, তাঁদের মধ্যেও শ্রীরামচন্দ্রের স্থান অনেক উঁচু। একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের অনেক কিছুই জানতে পারেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কিন্তু তার সাথে সাথে তিনি যদি গীতা উপনিষদাদি জানেন, তখন স্বাভাবিক ভাবে আমরা বিস্মিত হয়ে নতমস্তক হয়ে যাই। এ পি জে আবদুল কালাম, আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, মিসাইল টেকনোলজির একজন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী আর তার সঙ্গে তিনি গীতা উপনিষদও জানেন, সেইজন্য তাঁর সম্মান অনেক বেশি। এটাই শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে সারণ রাবণকে বলছে।

শ্রীরামচন্দ্রের যে বাণ, তা আকাশকে ভেদ করে দিতে পারে, পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে দিতে পারে, আর এনার ক্রোধ মৃত্যুর সমতুল্য, পরাক্রমে ইনি ইন্দ্রের তুল্য। বাল্মীকির সময়ে বেদের প্রভাব তুঙ্গে ছিল, বেদে বিষ্ণুর সেই রকম স্থান নেই বলে, শ্রীরামচন্দ্রের তুলনার করার সময় বিষ্ণুর কোন নাম উল্লেখ করা হচ্ছে না। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, এমনকি মৃত্যু দেবতারও স্থান আছে, কিন্তু বিষ্ণুর সেই রকম স্থান তখন ছিল না। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্রের পরাক্রমকে ইন্দ্রে সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, বিষ্ণুর সাথে তুলনা করা হচ্ছে না। পরের দিকে মহাভারতে গীতাতে আসতে আসতে পরাক্রম কার মত হয়ে যাচ্ছে? বিভুতিযোগে বলা হচ্ছে

রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্, শস্ত্র চালনাতে শ্রীরামচন্দ্রের মত। বাল্মীকি যখন রামায়ণ লিখছেন তখন পরাক্রম ইন্দ্রের মত বলা হচ্ছে, আর মহাভারত যখন লেখা হচ্ছে তখন পরাক্রম শ্রীরামচন্দ্রের মতন তুলনা করা হচ্ছে। সারণ যখন শ্রীরামচন্দ্রের এইভাবে প্রশংসা করেই চলেছে, তখন রাবণ রেগে গিয়ে শুক আর সারণ এই দুই চরকে ওখান থেকে দূর করে দিলেন – আমারই খাস আমারই পড়িস আর আমার শত্রুর গুণগান করছিস হতভাগা! দূর হয়ে যা এখান থেকে ব্যাটারা।

এখন রাবণ খুব উদগ্রীব ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, তবে কতটা উদ্বিগ্ন হচ্ছেন আমরা ঠিক বলতে পারব না, কারণ বাল্মীকি তাঁর বর্ণনাকে কাব্যিক রূপ দেবার জন্য দেখাচ্ছেন রাবণ খুব উৎকন্ঠার মধ্যে রয়েছেন। পরের দিককার রামায়ণে এই জিনিষ গুলোই প্রচুর মালমশলা জুগিয়েছে। রাবণের একজন ছিল যে যাদু জানত, এখানে শব্দটা বাল্মীকি বলছেন মায়াজ্ঞ। মায়ার অনেক অর্থ হয়, মায়া মানে যাদুও হয়, মায়া দিয়ে অনেক কিছু সৃষ্টি করাও হয়। রাবণ এখন ছটফট করছে, কারণ তার দরজার দোরগোড়ায় শ্রীরামচন্দ্র পৌঁছে গিয়ে খটখট করছে। সেই যাদুকরকে রাবণ গিয়ে বলছে – চল, আমরা সীতাকে গিয়ে মোহিত করি। কিভাবে মোহিত করা যাবে? মায়ার সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্রের একটা কাটা মুণ্ডু তৈরী করা হয়েছে। আমরা তোমার রামকে মেরে ফেলেছি, এই নাও তার মুণ্ডু।

রাবণ চাইছে যে করেই হোক সীতার মনের অদম্যতাকে ভেঙ্গে দিতে। এখন সীতা যখন দেখবে তার রামচন্দ্র মারা গেছেন, তখন সীতা অগত্যা আমাকেই বিয়ে করতে বাধ্য হবে। এগুলো রাবণ ভাবছে। কিন্তু রাবণকে যতই সীতা বলছে তুমি যাই করে নাও না কেন তুমি কিন্তু কোন দিনই আমাকে পাবে না। যতই সীতা বলুক, রাবণ কেন সীতাকে পাবার আশা ছাড়বে, এটাই তো হচ্ছে কামের প্রতি তীব্র আসক্তি, রাবণ সীতার লোভে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে। যখন কুম্ভকর্ণাদিদের বোঝাচ্ছে তখনও ঠিক এই কথাই রাবণ নিজেই বলছিল, আমি একটা নারীকে দেখে প্রলুব্ধ হয়েছি, এতে আর কি দোষ হয়েছে। এখানেই আমাদের নৈতিকতার সমস্য, আমার ক্ষমতা আছে, আমার সাহস আছে, শক্তি আছে, পরাক্রম আছে আমি একজন মহিলাকে পছন্দ করে নিয়ে এসেছি তাতে দোষ কি আছে। বেশির ভাগ রাজারা কিংবা ক্ষমতাবান লোকেরা এই রকমই করে থাকে।

এখন সত্যি সত্যি রামচন্দ্রের কাটা মুণ্ডু নিয়ে রাবণ সীতার কাছে হাজির হয়ে বলছেন – **খরহন্তা স তে ভর্তা রাঘবঃ সমরে হতঃ। ছিন্নং তে সর্বথা মূলং দর্পশ্চ নিহতো ময়া।।**৬/৩১/১৫ – সীতা, তোমার এত দিনের দর্প, যার জন্য তুমি এত দিন ধরে লাফাচ্ছিলে, এই নাও আমার ভাই খরের হত্যাকারী সেই রামের মুণ্ডু। বলেই সীতার সামনে রামের কাটা মুণ্ডুটা রেখে দিল। আরেকজন রাক্ষস এসে সেই কাটা মুণ্ডুর উপর একটা কোপ মারতেই মুণ্ডু থেকে সব ঘিলু বেরিয়ে এসেছে। মায়া বিদ্যাতে আবার শ্রীরামাচন্দ্রের ধনুকের মত একটা ধনুক নিয়ে এসে রাবণ সীতাকে দেখিয়ে বলছে – এই নাও শ্রীরামচন্দ্রের সেই বিশ্ব বিখ্যাত ধনুক, এটাও তোমার সামনে রেখে দিলাম।

সীতা দেখছেন সেই চোখ, সেই রকম মুখ, সেই রকম কপাল, সেই রকম ঘন কেশ আর সেই পরিচিত চূড়ামণি, চুলে যেটা বাঁধা থাকে, এই সব দেখে ডানা কাটা বিহঙ্গের মত সীতা ভেঙ্গে পড়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন, হাউ হাউ করে ক্রন্দন করছেন, আর নানান রকমের বিলাপ করে চলেছেন। সীতা যখনই কাঁদে তখন নিজের জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা গুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই কান্নাটা হতে থাকে – যেমন এখানে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, কৈকেয়ির সব স্বপ্ন, সব মনোবাসনা সফল হয়ে গেল, আমার সব শেষ হয়ে গেল। কিংবা কখন বলবেন – আমাকে তো আগেই জ্যোতিষরা বলে দিয়েছিল আমি রানী হব, জ্যোতিষীদের কথা তো মিথ্যা হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে, সীতার ওখানেই রাবণের কাছে খবর এলো যে যুদ্ধের ব্যাপারে একটা খুব মারাত্মক সঙ্কট তৈরী হয়েছে, যে কারণে রাবণকে এক্ষুণি রাজদরবারে যেতে হবে। খবর পেয়েই রাবণ যখন সীতার

ওখান থেকে চলে এসেছেন তখন তাঁর যে মায়াজ্ঞ, যাদুকরকেও রাবণের সাথে চলে আসতে হয়েছে। এরা দুজন স্থান ত্যাগ করতেই তার যে যাদুর সম্মোহনটা ছিল সেটাও সরে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে কাটা মুণ্ডু আর ধনুকও হাওয়া হয়ে গেল। যাদুকর যতক্ষণই থাকেন ততক্ষণই যাদু থাকে। এই জগৎ কতক্ষণ আছে, যতক্ষণ মায়াধীশ ভগবান আছেন। ভগবানকে সরিয়ে দিলেই আর জগৎ নেই। মঞ্চ থেকে পিসি সরকারকে সরিয়ে দিলেই মঞ্চের সব যাদু চলে যাবে। এই যে বলা হয় out of sight out of mind, আমি আপনি দুজন আছি, আপনাকে দেখে আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেললাম, কতক্ষণ ভালোবাসব? যতক্ষণ চোখের সামনে ততক্ষণই ভালোবাসব, চোখের আড়ালে যেই চলে গেলেন তখন কে কার? আপনি তো আমার যাদুকর, আমাকে মোহিত করে রেখেছেন, যাদুকরই যদি উড়ে যায় তাহলে আর যাদু কোথায়, সব শেষ। বলতে পারেন ধ্যানের মধ্যে তাকে দেখব। কিন্তু এটা যাদু, ধ্যানে মানুষ কাকে দেখে?

এখানে সমস্যাটা হচ্ছে, আমি একজনের ব্যক্তিত্বে মোহিত হয়ে আছি, আমি সেই ব্যক্তির দিকে মুগ্ধ হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। সে আমার কাছ থেকে চলে গেল, আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু কেউ বলবে আমি তাকে ধ্যান চোখে দেখব। আসলে এটা ভুল, কারণ ধ্যান সব সময়ই হয় স্বরূপের, যদি সেটা আমার স্বরূপ হয় তাহলে ধ্যান হবে। যেমন এই বোতল, এই বোতলের যদি আমি ধ্যান করি তাহলে কি হবে? কিছুই হবে না। কিছু হত, যদি বোতলটা আমার স্বরূপ হত। সীতা যখন শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করছেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন তাঁর স্বরূপ। যদি ভালোবাসা সেই রকমের হয়, এক অপরকে নিজের স্বরূপ রূপে জানে তখন ধ্যান হবে। ঈশ্বরকে ধ্যান করে, আর ধ্যানে তাঁকে ধরে রাখা হয়, কারণ ঈশ্বর হচ্ছেন আমাদের স্বরূপ। কেউ আত্মাকে নিয়ে, কেউ ব্রহ্মকে নিয়ে, কেউ শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে ধ্যান করে, কেউ যিশুকে নিয়ে ধ্যান করে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সফল হচ্ছে। কেন হচ্ছে? কারণ এনারা মায়া নন, এনারা হচ্ছেন আমাদের স্বরূপ। মায়ার ক্ষেত্রে কি হয়, যিনি মায়াধীশ তিনি চলে গেলেই মায়া চলে যায়। ছেলে আর মেয়ের পরস্পরের মধ্যে যে আকর্ষণ, এটা হচ্ছে মায়া, স্বরূপ নয়। আগেকার দিনে নারীদের বলা হত তোমার স্বামীই তোমার পরমেশ্বর, কিন্তু এখন পতি আর পরমেশ্বর নয়, ঝগড়া আর ৪৯৮ ধারার লক্ষ্য। এখন কি পতি কে ধ্যান করলে কিছু হবে? কিছুই হবে না, পতি হচ্ছে মায়া। আগেকার দিনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু মায়ার সম্পর্ক ছিল না, তখন সম্পর্ক ছিল স্বরূপের। এখন ছেলে আর মেয়ের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হয়ে গেছে মায়ার সম্পর্ক। ভালোবাস খুব ভালো জিনিষ, কিন্তু এই ভালোবাসা মায়ার হলেই ঝামেলা আর ঝঞ্ঝাট, দুদিন পরে এই ভালোবাসাই দুর্বাসা হয়ে যাবে। মায়াতে কখনই ভালোবাসা হয় না, ভালোবাসা একমাত্র হয় স্বরূপের, মায়াধীশই আমাদের স্বরূপ। সরমা নামে এক রাক্ষসী সীতাকে ভালোবাসত, সরমা সীতাকে বলছে – হে সীতা, তোমাকে একটা কথা বলছি, এই জিনিষ কখনই সম্ভব নয়, শ্রীরামচন্দ্রকে কেউই মারতে পারবে না।

মাল্যবান ছিলেন রাবণের দাদু, মায়ের বাবা। মাল্যবান রাবণকে বোঝাতে এসেছেন। রাবণকে বুঝিয়ে বলছেন 'তুমি শ্রীরামচন্দ্রর সঙ্গে সন্ধি করে নাও। কারণ, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব এনারা সবাই শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় চাইছেন, তুমি এঁদের বিরুদ্ধে যেও না। ভগবান ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেছেন – সুরানাম সুরাণঞ্চ, সুর আর অসুরদের তিনি সৃষ্টি করেছেন, এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে – ধর্ম আর অধর্ম। দেবতারা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আর অসুররা অধর্মে প্রতিষ্ঠিত'। মাল্যবান এখানে বলছেন যে, এই রকম শোনা যায় যে দেবতারা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। হে রাবণ, তুমি যখন দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিল তখন তুমি অনেক অন্যায় কার্য করেছিলে, সেই সব অন্যায় কার্য করে আমরা অধর্মকে গলায় লাগিয়েছি। সেইজন্য আমরা অসুরকুল, আর তাই আমাদের শত্রু খুব প্রবল। আমাদের এই অধর্ম বৃত্তিকে এখন অজগর সাপ গ্রাস করতে অগ্রসর হচ্ছে। অন্য দিকে দেবতাদের পালিত ধর্ম তাঁদের শক্তি যোগান দিচ্ছে।

বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে যখন প্রবেশ করা হয় তখন বোঝা খুব মুশকিল কোনটা ঠিক ঠিক বাল্মীকির রচিত আর কোনটা প্রক্ষিপ্ত। অনেক জায়গায় পরিষ্কার বোঝাই যায় যে এই অংশটা প্রক্ষিপ্ত, কারণ বাল্মীকি রামায়ণের মূল বক্তব্যের সাথে এই অংশ গুলো খাপ খায়না। সুর আর অসুর অনেকবার

আলোচনায় আসবে, কিন্তু অসুররা যে সব সময়ই অধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই কথা বলা খুব মুশকিল। কারণ বাল্মীকি সচারচর এই ভাবে সুর আর অসুরদের মধ্যে বিভাজন করেননি। পুরাণের মত যে সাদা তার পুরোটাই সাদা, আর যে কালো তার পুরোটাই কালো, বাল্মীকি ঠিক এই পথে যাননি। তাই মাল্যবানের এই জায়গাটাতে এসে একটা সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়, সত্যিই বাল্মীকি এই অংশটা নিজে লিখেছিলেন কিনা। তবে দেবতা আর অসুর এখানে দুটো আলাদা জাতি রূপে দেখান হতে পারে, ধর্ম আর অধর্ম দুজনের মধ্যেই সাধারণ ব্যাপার ছিল। শঙ্করাচার্য একটা জায়গায় ভাষ্যে বলছেন, অসুর হচ্ছে তারাই যারা প্রাণশক্তির উপর বেশি নির্ভর করে চলে।

যাই হোক, রাবণ তাঁর দাদুর মুখে এই ধরণের কথাবার্তা শুনে খুব রেগে গেছেন। রাবণ বলছেন – **দ্বিধা ভজ্যেয়মপ্যেবং ন নমেয়ন্তু কস্যচিৎ। এষ মে সহজো দোষঃ স্বভাবো দুরতিক্রমঃ।। ৬/৩৬/১১ -** আমি দু টুকরো হয়ে যাব তবুও আমি কারুর সামনেই ঝুঁকব না। হে মাল্যবান, এটা হচ্ছে আমার সহজ দোষ। সহজ দোষ মানে স্বাভাবিক দোষ, প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কিছু নিজস্ব দোষ থাকে। বাল্মীকি রামায়ণে আবার দোষ বলে কিছু নেই, এইটাই আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এখানে রাবণের কি বৈশিষ্ট্য? আমি দু টুকরো হয়ে যাব কিন্তু কারুর সামনে ঝুঁকব না।

রাবণ বলছেন – তাই নয়, আপনাকে আরেকটি কথা বলে দিচ্ছি, এই যে রাম কতকগুলি বানরকে নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে লঙ্কাতে চলে এসেছে, ফেরত এরা কেউ আর যেতে পারবে না, এখানেই এদের শেষ। আসলে, বাল্মীকি রামায়ণ খুব মনযোগ নিয়ে যদি পড়া হয় তাহলে দেখা যায় যে যুদ্ধ একেবারে সমানে সমানে চলেছিল, একটু এদিক ওদিক হলেই কি হত বলা যায় না, যদিও রাবণ প্রাণপন চেষ্টা করেছে, কিন্তু সমান সমান লড়াই চলেছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও কৌরব আর পাণ্ডবদের লড়াই সমান সমান চলেছিল। কে জিতবে, শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত বলা খুব মুশকিল ছিল। শ্রীরামচন্দ্র যে যুদ্ধটা লঙ্কাতে জিতেছিলেন খুব সামান্য ব্যবধাণেই ফয়সালা হয়েছিল, তাতেও আবার অনেক ডানদিক বামদিক করতে হয়েছিল।

এরপর যখন যুদ্ধ শুরু হবে তখন শ্রীরামচন্দ্র আদেশ করছেন, যারা বানর আছে তারা কখনই যেন মানুষের রূপ ধারণ না করে। এই আদেশ ঠিক কি ভেবে শ্রীরামচন্দ্র দিয়েছিলেন সঠিক বোঝা যায় না, এর দুটো তিনটে সম্ভবনা থাকতে পারে। অনেক আগে একটা সময় গ্রীস দেশের সৈন্যরা মুখোশ পরে লড়াই করত। একটা যুদ্ধ হয়েছিল যখন সৈন্যরা সব ভয়ঙ্কর মুখোশ পড়েছিল, খেলনার আলগা মত মুখোশ নয়, একেবারে মুখের সঙ্গে লেপ্টে থাকত, সত্যিকারের ঐ রকম ভয়ঙ্কর মুখই মনে হত। যখন শত্রুর উপর আক্রমণ করত তখন তারা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যেত। দ্বিতীয় একটা সম্ভবনা ছিল যে বানররা হয়তো বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারত, তারমধ্যে মানুষেরও রূপ ধারণ করতে পারত। কিন্তু এখানে বাল্মীকি পরিষ্কার করে বলছেন না, কেন শ্রীরামচন্দ্র এই আদেশ দিচ্ছেন। **ন চৈব মানুষং রূপং কার্যং হরিভিরাহবে। এষা ভবতু নঃ সংজ্ঞা যুদ্ধেহস্মিন্ বানরে বলে।**।৬/৩৭/৩৩ – এখানে হরি মানে বানর, যারা বানর আছে তারা যেন মানুষের রূপ ধারণ না করে, কারণ এইটাই আমাদের চিহ্ন। রাক্ষসরা একটা জাতি, কিন্তু আকৃতি মানুষেরই।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – আমি, লক্ষ্মণ, বিভীষণ আর বিভীষণের চারজন মন্ত্রী, এই সাতজনই শুধু মানুষ রূপে থাকবে, আর বাকি সবাই বানর আর ভাল্লুক রূপেই থাকবে, তা নাহলে সবাই মিশে গিয়ে গোলমাল হয়ে যাবে। এখানে একটা শব্দ বলা হচ্ছে – **বানরা এব নশ্চিহ্নং স্বজনেহস্মিন্ ভবিষ্যতি**।৬/৩৭/৩৪। বানরই হচ্ছে আমাদের চিহ্ন। পণ্ডিতরা যতই ব্যাখ্যা করুন, এখানে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন বোঝা খুব মুশকিল। অনেকে মুখে রঙ লাগিয়ে বানরের মত আকৃতি বানিয়ে নিত, বা হয়তো মুখোশ পড়ত, কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে, আমাদের সৈন্যরা বানর রূপে থাকবে, যাতে

রাক্ষসদের সৈন্যদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সংশয় না হয়। আর বলছেন আমাদের লড়াইয়ে বানর চিহ্ন থাকবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের রথের পতাক ছিল কপিধ্বজ, মানে পতাকার মধ্যে বানর চিহ্ন ছিল।

এরপর সবাই এক অপরকে দেখে মেপে নিতে আরম্ভ করেছে, যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে। এরমধ্যে একবার রাবণ পাঁচিলের উপরে উঠে চারিদিক দেখছে, নীচের থেকে হঠাৎ সুগ্রীব প্রাচীরের উপরে রাবণকে দেখতে পেয়েই এক লাফ দিয়ে রাবণের কাছে পৌঁছে গেছে। রাবণের কাছে গিয়েই সুগ্রীব বলছেন – এইসব যুদ্ধের কি দরকার, এসো আমরা কুস্তি করে একটা ফয়সালা করে নিই। তারপরেই দুজনের মধ্যে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বাল্মীকির এটাই বৈশিষ্ট্য যেটাকে বর্ণনা করবেন একেবারে তার শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে ছাড়বেন। এখানেও কুস্তির কত রকমের প্যাঁচ আর চাল হয়, প্রত্যেকটি প্যাঁচের আর চালের আলাদা আলাদা যত নাম আছে সব তিনটে শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। এর শব্দ শুধু যারা কুস্তি লড়েন তারাই হয়তো জানতে পারেন। এই তিনটে শ্লোকের অনুবাদ করতেই অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা লেগে গেছে। যেমন, কখন একটু বেঁকা চলছে, কখন পাশ থেকে মারছে, কখন পুরো শরীরটাকে ঘুরিয়ে আক্রমণ করছে, কখন বাঁ দিকে ঘুরে যাচ্ছে, আবার কখন সামনে থেকে লাফিয়ে যে প্রহার করছে তার থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। আবার যখন আক্রমণ করছে, তখন নিজেকে না সরিয়ে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়েই প্রতিপক্ষকে প্যাঁচের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। কখন নিজেকে এক জায়গাতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, কখন প্রতিপক্ষের চারিদিকে দৌড়াচ্ছে। এই ধরণের প্রত্যেকটা মুভমেন্টের একেকটা করে নাম আছে, যেমন *বক্রগতানি, পরিমোক্ষম্‌, প্রহারাণাম, বর্জনং, পরিধাবনম, অভিদ্রবণং, উপন্যাস্তং, অপন্যস্তং, পরাবৃত্তং, অপাবৃত্তং, অবপ্লুতং* ইত্যাদি, এগুলো সবই কুস্তির বিভিন্ন চালের নাম।

কুস্তি করে করে যখন দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তখন সুগ্রীব সেখান থেকে ফেরত চলে এসেছেন। সুগ্রীবকে শ্রীরামচন্দ্র খুব তিরস্কার করলেন – তুমি রাজা, এই রকম দুঃসাহসের মত কাজ করতে গিয়ে যদি কিছু গোলমাল হয়ে যেত তখন আমি লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান সবাই সমস্যায় পড়ে যেতাম। যদি কিছু অঘটন হয়ে যেত তখন বানর সেনাদের কে সামলাতো, যুদ্ধ তো সেখানেই সমাপ্ত হয়ে যেত। শ্রীরামচন্দ্র তারপর অঙ্গদকে ডেকে বলছেন একটা শেষ প্রচেষ্টা করা দরকার, তুমি রাবণের কাছে যাও, রাবণকে গিয়ে আমাদের সংবাদ দাও।

রাবণের রাজ দরবারে গিয়ে অঙ্গদ রাবণের বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ আনছেন তা হল – *অবিদিতাত্মনা*, তোমার নিজের স্বরূপের জ্ঞান নেই, মানে তোমার আত্মজ্ঞান নেই। তবে এটা বলা খুব মুশকিল, বাল্মীকি ঠিক সেই অর্থেই যে স্বরূপের জ্ঞান বলছেন যে অর্থে মহাভারতে স্বরূপের জ্ঞানের বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আবার বলছেন – **নহি রাজ্যমধর্মেণ ভোক্তুং ক্ষণমপি ত্বয়া।**৬/৪১/৬৯ – তুমি পাপী, তোমার সঙ্গীসাথী যারা তারাও ঘোর পাপী, তুমি অধর্মে প্রতিষ্ঠিত বলে তোমার রাজ্য পালনের কোন অধিকার নেই। অঙ্গদ বলছেন –তুমি যদি নিজেকে পবিত্র করতে চাও সেই কারণে তোমাকে একটা শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তুমি সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে সমপর্ণ করে দাও, এছাড়া তোমার আর বাঁচার কোন পথ নেই।

অঙ্গদ এই বার্তা রাবণকে দিতেই রাবণ প্রচণ্ড রেগে গেছে। রাবণ তাঁর লোকদের বললেন যে এই বানরটাকে ধরে বন্দী করে নাও। তখন চারজন ভয়ঙ্কর রাক্ষস মিলে অঙ্গদকে ধরে নিয়েছে। অঙ্গদ তখন নিজের শক্তি দেখানোর জন্য ঐ চারজনকে শুদ্ধু নিয়ে বিশাল এক লাফ মেরে আকাশ মার্গে চলে গিয়ে এমন এক ঝাঁকুনি দিয়েছে যে শূন্য থেকে ঐ চার রাক্ষস মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েছে। পরবর্তি কালের রামায়ণ রচয়িতারা অঙ্গদের এই কাহিনী নিয়ে দেখলেন এটাতে ঠিক জমলো না, অঙ্গদের আরও শক্তি দেখাতে হবে, তাই অঙ্গদ করলেন কি মাটিতে পা রেখে সবাইকে বললেন যে, আমি এই মাটিতে পা রাখলাম, কেউ এসে আমার এই পাটুকু নাড়াও দেখি। আমরা এখানে ভারতের আধ্যত্মিক ঐতিহ্যকে জানতে এসেছি, এখানে এই সব কাহিনীর খুব দাম নেই। অঙ্গদের শক্তি দেখাতে হবে, এখন সে কিভাবে

দেখাবে কিভাবে দেখাবে না তাতে কিছু যায় আসে না। বাল্মীকি দেখাচ্ছেন অঙ্গদ চারজনকে নিয়ে আকাশে লাফিয়ে উঠে এক ঝাঁকানি দিয়ে চারজনকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন, আর তুলসীদাস দেখাচ্ছেন অঙ্গদ মাটিতে পা চেপে রেখে সবাইকে বলছে, দেখি কার কত মুরোদ আমার পাটাকে একটু নাড়াক। ব্যাপারটা হচ্ছে অঙ্গদ নিজের শক্তি দেখিয়েছে। মূল কথা হচ্ছে, রাবণকে দেখানো যে – হে রাবণ, তুমি যদি মনে করে থাক শ্রীরামচন্দ্রের দিকে যারা আছে তারা সবাই শক্তিহীন তাহলে তুমি কিন্তু ভুল করবে। হনুমান এসে তোমার এখানে এত কাণ্ড করে গেল, হনুমানেরই একা এই রকম শক্তি আছে তা নয়, অন্য অনেকেই এই শক্তি ধরে।

অঙ্গদ রাবণকে বার্তা দিয়ে চলে যাওয়ার পর, আসল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মহাভারতে যুদ্ধ শুরু হবার আগে যেমন অনেক কিছু নাটকীয়তা আনা হয়েছে, বাল্মীকি এখানে ওসব কিছুই দেখাননি। বাল্মীকি যুদ্ধের বিশাল বর্ণনা দিয়েছেন। সারাটা দিন এমন যুদ্ধ চলেছে যে দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যে হয়ে রাত এসে গেছে। রাতের অন্ধকারেও যুদ্ধ চলছে। রাতের অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, তখন বলছেন – **রাক্ষসোঽসীতি হরয়ো বানরোঽসীতি রাক্ষসাঃ**।৬/৪৪/৩ – এক অপরকে ধরে জিজ্ঞেস করছে – তুমি কি বানর, আবার বানর গুলো রাক্ষসদের ধরে জিজ্ঞেস করছে – তুমি কি রাক্ষস। অন্ধকারে বানর বানরকেই ধরে নিয়ে জিজ্ঞেস করছে – তুমি কি বানর, যদি বলে বানর তাহলে ছেড়ে দিল। আবার যদি বানর রাক্ষসকে ধরে বলে তুমি কি রাক্ষস – যদি বলে হ্যাঁ আমি রাক্ষস, তখন ঠিক করবে মারামারি করবে কি করবে না। এই অবস্থাতে যুদ্ধ চলছে। এগুলো হচ্ছে বাল্মীকির কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা। আবার একটা রাক্ষসকে বানর ধরতেই ছিটকে চলে যাচ্ছে দেখে বলছে – *কথং বিদ্রবসীতি চ*, কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ, এসো তোমাকে মারি। এইভাবে বাল্মীকি অনেক মজার মজার বর্ণনা দিচ্ছেন।

অন্য দিকে রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ, মানে মেঘনাদ রণক্ষেত্রে এসেছেন। মেঘনাদের অন্তর্ধান বিদ্যা জানা ছিল। যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুখোমুখি লড়াই করে শত্রুকে নিধন করা, এখন কিভাবে সামনে গিয়ে শত্রুকে মারবে! সেও তো মারবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। তাই শত্রু যদি আমাকে না দেখতে পায়, তখন আমার পক্ষে শত্রুকে আক্রমণ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ইদানিং কালে মিলিটারিতে ক্যামোফ্লেজ করাটা একটা রণকৌশল। নানান রকম ভাবে ক্যামোফ্লেজ করা হয়। রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষের বিমান বাহিনী যদি হানা দেয় তখন কি করে বুঝবে যে বোমারু বিমান সীমানা অতিক্রম করে ঢুকে পড়েছে? এটাকে ধরার জন্য আবিষ্কার হল রাডার, রাডার থেকে মাইক্রোওয়েভ ছাড়তে থাকে। যেমনি বোমারু বিমান ঢুকে পড়বে ঐ মাইক্রোওয়েভ গিয়ে বিমানের গায়ে ধাক্কা লেগে ফেরত এলেই ধরা পড়ে যাবে। উচ্চ প্রযুক্তির রাডার আবার কি এ্যারোপ্লেন যাচ্ছে, কত বেগে যাচ্ছে সব কিছুর খবর বলে দেবে। ঐ রাডারের সঙ্গে আবার এ্যান্টিএয়ারক্রাফট্ লাগানো থাকে যাতে প্লেনটাকে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এখন প্লেনটাকেও তো বাঁচতে হবে, তাই এখন দুই ধরণের টেকনোলজি আনা হয়েছে। একটা টেকনোলজিতে নিয়ে আসা হয়েছে, প্লেন বেশি উঁচু দিয়ে যাবে না, অনেক নিচু দিয়ে উড়ে যাবে, রাডার যত উচ্চতায় রাখা আছে তার থেকে নিচু দিয়ে উড়ে যাবে। এটা না হয় সমতল ক্ষেত্রে চলবে কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলে কি করে যাবে। তাই নতুন নতুন টেকনোলজিতে এখন এমন সব প্লেন বেরিয়েছে যেগুলোতে ধরা পড়ে যাবে সামনে কোন বাধা আছে কিনা, প্লেন ঠিক নিজে থেকেই উপরে উঠে যাবে, সামনে একটা বড় দশ-বারো তলা বাড়ি আছে, ঐ বাড়ির কাছেই এলেই প্লেন নিজে থেকেই উপরে উঠে গিয়ে বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে যাবে। আর দ্বিতীয় যে টেকনোলজি তাতে এক ধরণের কোটিং বার করা হয়েছে, রাডার থেকে যে মাইক্রোওয়েভ ছাড়া হয়, সেই ওয়েভটাকেই এই কোটিং শুষে নেয়। এখন রাডারে যদি ওয়েভটা ফেরত নাই যেতে পারে তাহলে তো কিছুই জানা যাবে না। এগুলো সবই যুদ্ধের বিভিন্ন ক্যামোফ্লেজিং করারা কৌশল। মেঘনাদ ছিলেন ক্যামোফ্লেজিং এর ওস্তাদ কারিগর।

এখানে বলছেন – **ববন্ধ শরবন্ধেন ভ্রাতরৌ রাম লক্ষ্মণৌ।।**৬/৪৪/৩৭। সাপের মত দেখতে বাণ মেরে শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে এক সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে। বলছেন নাগপাশে বদ্ধ করা হয়েছে। বাল্মীকি নাগপাশ জিনিষটা বোঝাতে গিয়ে বলছেন – বাণটা সর্পের আকার, বা হতে পারে এমন কোন দড়ি ছিল যেটা বাণের সাথে গিয়ে বেঁধে ফেলছে, বা গরু, মোষকে দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে দিয়ে যেমন ভাবে বেঁধে ফেলে, নাগপাশ মোটামুটি এমনই একটি অস্ত্র যার থেকে বেরোতে পারবে না। রামায়ণের সিরিয়ালে দেখান হয়েছে নাগপাশে বেঁধে দিয়েছে মানে, সেই নাগরা মানে সাপেরা এসে সব বেঁধে নিয়েছে। তখন আবার সাক্ষাৎ গরুড় এসে বসতেই সাপ গুলো পালাল। এখানেও গরুড় আসবে, তাই এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এটা প্রক্ষিপ্ত। কারণ গরুড়ের কোন অস্তিত্বই নেই বাল্মীকি রামায়ণে। পরের দিকে ভক্তিশাস্ত্রে গরুড় এসেছে ঠিক আছে, সেটা মানা যায়। তারপরে বলছেন **তৌ তেন পুরুষব্যাঘ্রৌ ক্রুদ্ধেনাশীবিষৈঃ শরৈঃ।**৬/৪৪/৩৮। বানরেরা দেখছে এই দু’জন পুরুষশ্রেষ্ঠ হঠাৎ ইন্দ্রজিতের সর্পশরের দ্বারা বন্দী হয়ে গেছেন।

আসলে উভয় পক্ষই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সময় মেঘনাদ লুকিয়ে যুদ্ধ করছিল, তখন কোন একটা সুযোগে মেঘনাদ ঝট করে দড়িটড়ি দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। নাগপাশ নামে একটা বিশেষ বাঁধন দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল। পরবর্তিকালে ভক্তিশাস্ত্রে দেখানো হয়েছে যে সাপ দিয়ে বাঁধা হয়েছে। কিন্তু কোনটা ঠিক আমাদের এখন বলা খুবই মুশকিল, কিন্তু নাগপাশ একটা খুব মজার ব্যাপার। আমাদের শাস্ত্রে যত শব্দ এসেছে, এক এক জন এক এক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আবার পরের দিকে অনেকে সেটাকে ঠিক মত না বুঝতে পেরে অন্য ভাবে জিনিষটাকে নিয়ে গেছে। এর ভালো উদাহরণ – ডবল নিউমোনিয়া। আসলে ডবল নিউমোনিয়া বলে কোন শব্দই হয় না। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার যে সারা বিশ্ব এই শব্দের ব্যবহার করছে। আসল ব্যাপার হল Pleuro, প্ল্যুরো হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের নিউমোনিয়া, যাতে বলা হয় লান্সের গায়ে এক ধরণের বীজানুর সংক্রমণ হয়। এখন প্ল্যুরোর ‘e’ টা উড়ে গিয়ে লোকেরা বলে প্লুরো, প্লুরাল থেকে, সিঙ্গুলার নিউমোনিয়া আর প্লুরাল নিউমোনিয়ে অপভ্রংশ হয়ে ডবল নিউমোনিয়া হয়ে গেছে। ডবল নিউমোনিয়া বলে কোন রোগই নেই, অথচ সারা বিশ্ব এখন এটাই বলে যাচ্ছে। নাগপাশের ব্যাপারটাও ঠিক তাই হয়ে গেছে। আসলে একটা বাঁধনের নাম, অনেক রকমের বাঁধন হয় তার মধ্যে একটা বাঁধনের নামে নাগপাশ, সেটাকেই ভক্তিশাস্ত্রে বানিয়ে বলে দিচ্ছে বড় বড় সাপ দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছে।

যাই হোক এখন নাগপাশ দিয়ে তো শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে বেঁধে ফেলা হয়েছে, কিছুই করতে পারছেন না, আর মেঘনাদও বাণের পর বাণ চালিয়ে যাচ্ছে। বলছেন – **তৌ বীরোশয়ানে বীরৌ শয়ানৌ রুধিরোক্ষিতৌ। শরবেষ্টিতসর্বাঙ্গাবার্তৌ পরমপীডিতৌ।।** ৬/৪৫/১৯। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গে বাণ ঢুকে গেছে। আর শরীরের সমস্ত জায়গা দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে চলেছে। মূল কথা হল, মেঘনাদ এসে শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে উল্টে অচৈতন্য করে ফেলে দিয়েছে। সেইজন্য আমরা বলছিলাম শ্রীরামচন্দ্রদের যুদ্ধে জেতার ব্যাপারটা অত সহজ হয়নি। এখন শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের এই অবস্থা দেখে সব বানর সৈন্যরা ভয়ে এদিক ওদিক পালাতে শুরু করেছে।

তখন বিভীষণ দেখছেন এখনও দুজনের শরীরে প্রাণ আছে, তিনি সবাইকে বলছেন – এখনও এনাদের শরীরে প্রাণ আছে, কোন রকমে এই প্রাণটাকে রক্ষা কর। একবার যখন জ্ঞান ফিরে আসবে তখন দেখা যাবে। তবে কি শ্রীরামচন্দ্রের এখন মৃত্যুর সময় নয়, যার মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন লক্ষ্মী তাকে ছেড়ে চলে যায়, আর লক্ষ্মী ছেড়ে চলে গেলে যে সকল লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়ে, সেই সব লক্ষণ এনার মধ্যে নেই, তার মানে বুঝতে হবে এখন তাঁর মৃত্যু আসছে না।

এদিকে রাবণ সীতাকে পুষ্পকযানে বসিয়ে যুদ্ধভূমিতে নিয়ে দেখাচ্ছে – দ্যাখো, তোমার রাম যুদ্ধে মরে পড়ে আছে। এখানে আর যাদু বা মায়ার কিছু নেই, দেখছে মরে পড়ে রয়েছে। সীতা তখন খুব কাঁদতে শুরু করেছেন, আর নিজের বর্ণনা করে যাচ্ছেন। আমার হাত দেখে জ্যোতিষীরা বলেছিল ‘আমি – *ভর্তৃপূজিতম্*, আমার স্বামী আমার পূজো করবেন, কিন্তু এ কি হয়ে গেল’! এখানে সীতার পূজো মানে,

সীতা যখন রানী হবেন তখন রাজাকে কিছু উপাচারে রানীকে পূজা করতে হয় সেই কথাই এখানে সীতা বলছেন। ‘কিন্তু আমি রানী আর কোথায় হতে পারলাম। জ্যোতিষীরা বলেছিল আমি *নিত্যমঙ্গলময়ী*, আমার বৈধব্য নেই। তাহলে তো তাদের ভবিষ্যদবাণী মিথ্যা হয়ে গেল। সম্রাজ্ঞী হতে গেলে পায়ে এক বিশেষ ধরণের চিহ্ন থাকে, আমার পায়ে সেই চিহ্নগুলো আছে, কিন্তু আমিতো সম্রাজ্ঞী হতে পারলাম না, তাই এটাও মিথ্যা হয়ে গেল। শরীরের অঙ্গে এমন কোন চিহ্ন নেই যে আমাকে বিধবা হতে হবে’। আগেকার দিনে শরীরের এই বিশেষ বিশেষ চিহ্নগুলো খুব মানা হত, শরীরের কোথায় কি দাগ আছে তাই দেখে তার ভবিষ্যৎ কি হবে বলে দেওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। ‘আমার অঙ্গকান্তি মণির মত জ্বলজ্বল করে, শরীরের লোম অত্যন্ত কোমল, পায়ের দশটি আঙ্গুল, গোড়ালি এগুলো খুব কাছাকাছি সংযুক্ত, কোন ফাঁক নেই’। এই ধরণের চিহ্ন হচ্ছে শুভ লক্ষণা। ‘আমার স্বামীকে নিয়েও তো বলা হয়েছিল উনি রাজা হবেন, জ্যোতিষীদের সব ভবিষ্যতবাণী তো মিথ্যা হয়ে গেল।

ত্রিজটা নাকে এক রাক্ষসী সীতার কাছে থাকত, সীতা এইভাবে কাঁদছে দেখে বলছে – হে সীতে, তোমাকে কানে কানে একটা কথা বলছি, শ্রীরামচন্দ্র মারা যাননি, তার কারণ এই পুষ্পকযান অত্যন্ত শুভ জিনিষ, বিধবাকে নিয়ে কখন চলতেই পারবে না, এই পুষ্পক রথ মন্ত্রশক্তিতে চলে কিনা, তুমি যদি বিধবা হয়ে থাকতে তাহলে পুষ্পকযান চলতই না, মাটিতে বসে পড়ত। শ্রীরামচন্দ্র নিশ্চয়ই বেহুঁশ হয়ে আছেন, তুমি কান্নাকাটি করো না।

এরপর বাল্মীকি যুদ্ধের বিরাট বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন, এতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এরমধ্যে হনুমান গিয়ে রাবণকে বলবেন – এসো একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাক। তারপর হনুমান খুব গর্ব করে বলবেন রাবণ তুমি আমাকে আগে মেরে নাও, কারণ আমি যদি তোমাকে আগে মারি তাহলে তুমি তো আর বাঁচবে না, তখন আবার আমি ঋণী থেকে যাব। রাবণও বারবার বলছেন না না, হনুমান তুমি আগে মার। তখন হনুমান রাবণকে মেরেছে তাতে রাবণের একটু কষ্ট হয়েছে। রাবণ বলল এবার আমার পালা, রাবণ তখন এমন এক চড় মেরেছে যে বাল্মীকি বলছেন – **স তলাহভিহতস্তেন চচাল চ মুহুর্মুহুঃ। স্থিতো মুহূর্তং তেজস্বী স্থৈর্যং কৃত্বা মহামতিঃ।**। হনুমান বোঁ করে ঘুরতে শুরু করল। কিন্তু নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে কিছুক্ষণ পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। তখন রাবণ হনুমানকে ছেড়ে অন্য যোদ্ধাকে মারার জন্য এগিয়ে গেল। বিভিন্ন সেনাপতি একে অপরকে মারছে। এরপর কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে উঠিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠান হয়েছে।

এই সব বিভিন্ন লড়াইয়ের বিবরণ দেয়ে শেষের দিকে শ্রীরামচন্দ্র আর রাবণ পরস্পর মুখোমুখি হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র আর রাবণের লড়াইটা অসম লড়াই ছিল, রাবণ রথে বসে যুদ্ধ করছেন আর শ্রীরামচন্দ্র মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। এখানে এসে দেখাচ্ছেন, শ্রীরামচন্দ্রের জন্য ইন্দ্র তার রথ পাঠিয়ে দিয়েছেন, সঙ্গে নিজের সারথি মাতলিকেও পাঠিয়েছেন। মাতলি ইন্দ্রের সারথি, খুবই দক্ষ সারথি। এসেই সে শ্রীরামচন্দ্রকে বুদ্ধি দিতে শুরু করেছে, এইভাবে এইভাবে যুদ্ধ করুন।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র কিছুতেই রাবণকে কাবু করতে পারছেন না। তখন অগস্ত্য মুনি এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – দ্যাখো, এভাবে যুদ্ধ করে রাবণকে কিছুতেই তুমি বধ করতে পারবে না। তুমি ‘আদিত্যহৃদয়’ পাঠ কর। ‘আদিত্যহৃদয়’ আসলে সূর্যের উপাসনা। গায়ত্রীমন্ত্র আর আদিত্যহৃদয়ের মধ্যে অনেক মিল আছে। আদিত্য সূর্যের প্রতীক, সূর্য হলেন শৌর্য তেজের দেবতা। শ্রীরামচন্দ্র আদিত্যহৃদয় পাঠ করতে শুরু করলেন, পাঠ করতেই তিনি দেখছেন তার ভেতরে শক্তির বৃদ্ধি হতে শুরু করে দিয়েছে। আদিত্যহৃদয় আসলে সূর্যের অনেকগুলো নাম নিয়ে একটা মন্ত্র, যেমন – **আদিত্যঃ সবিতা সূর্যঃ খগঃ পূষা গবস্তিমান্। সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ।**।৬/১০৫/১০। বিষ্ণু সহস্রে যেমন বিষ্ণুর হাজারটা নাম, আদিত্যহৃদয়েও সূর্যের অনেকগুলো নাম করে করে বলছেন – **তমোঘ্নায় হিমোঘ্নায়**

শত্রুঘ্নায়ামিতাত্মমনে। কৃতঘ্নায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ।।৬/১০৫/২০ – আপনি অন্ধকারের নাশ করেন, আপনি শীতের নাশ করেন আর আপনি শত্রুর নাশ করেন। কৃতঘ্নদের আপনি বিনাশ করুন। জ্যোতির্মণ্ডলীর অধিপতি, দ্যোতনশীল আপনাকে প্রণাম।

আদিত্যহৃদয় পাঠ করার পর শ্রীরামচন্দ্রের যত রকমের শোক সন্তাপ ছিল, যত রকমের দুর্বলতা ছিল, সব দূরীভূত হয়ে গেল। তারপর শ্রীরামচন্দ্র খুব তেজের সাথে রাবণকে একের পর এক বাণ মেরে যাচ্ছেন। কিন্তু রাবণের উপর তিনি যত রকমের অস্ত্র চালাচ্ছেন রাবণের তাতে কিছুই হচ্ছে না। আসলে তখনকার দিনের যুদ্ধে বড় বড়া যোদ্ধারা শরীরে কবচ ধারণ করে নিতেন, এখন এমন অস্ত্র মারতে হবে যে অস্ত্রের ঐ কবচকে ভেদ করার শক্তি থাকতে হবে। যদি কেউ ভারী কবচ পড়ে থাকে তাহলে আমার আপনার মত লোকেরা তো নড়তেই পারব না। কিন্তু ওদের এতো শক্তি ছিল যে, ঐ কবচ পড়ে আবার যুদ্ধও করছে। ঐ কবচকে ভাঙ্গার জন্য বিরাট শক্তি চাই আর সেই রকম ক্ষমতা সম্পন্ন অস্ত্রও চাই। যখন ভারী পাথর কাটা হয় তখন স্টীল দিয়ে কাটা যায় না, তখন ডায়মণ্ড লাগাতে হয়।

তখন মাতলি শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – আপনি তখন থেকে কি সাধারণ অস্ত্র ব্যবহার করছেন, ব্রহ্মার যে বিশেষ অস্ত্রগুলো আপনার কাছে রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করুন। মাতলির কথা শুনেই শ্রীরামচন্দ্রের মনে পড়ল যে, অগস্ত্য মুনি তাঁকে একটা তীর দিয়েছিলেন যেটা অপ্রতিরোধ্য আর এর সমতুল্য আর কোন অস্ত্র নেই। এই অস্ত্রের কথা শ্রীরামচন্দ্রের মনে পড়ে গেছে, এটাকে তিনি অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সবচেয়ে বড় শত্রুর প্রতি ব্যবহার করার জন্য। অগস্ত্য মুনির এই অস্ত্রের বেগ বায়ুর মত, মানে প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন, তার যে তীক্ষ্ণতা, তেজ অগ্নি আর সূর্যের মত, তার যে শরীর সেটা হচ্ছে আকাশ, মানে সর্বব্যাপী, তার ওজন মেরু পাহাড়ের মত, মেরু পাহাড় হল খুব ভারী, এই অস্ত্র ঐ রকম প্রচণ্ড ভারী। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রচণ্ড ভারী তার সাথে সেই রকম ক্ষুরধার, আবার সেই রকম তেজ সম্পন্ন। মহাভারতে এই ধরণের অস্ত্রের অনেক বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা মনে করি এগুলো বুঝি সামান্য তীর। আসলে অনেক রকমের তীর হত, তারমধ্যে একটা তীরের নাম হচ্ছে সূচীবাণ। সূচীবাণ আসলে একটা ভোঁতা লোহার ডাণ্ডা, কিন্তু তার অগ্রভাগে আঠার মত জিনিষ দিয়ে একটা ছুঁচ লাগান থাকত। এখন সূচীবাণ যাকে মারা হবে সে দেখবে একটা লোহার ভোঁতা তীর লেগেছে, যেই সেই তীরটাকে শরীর থেকে আলগা করতে যাবে তখনই ছুঁচটা ভেতরে থেকে যাবে আর ঐ ভোঁতা লোহার ডাণ্ডা বেরিয়ে আসবে। যারা আনাড়ি লোক তারা ঐটাকে টেনে নিতে যাবে আর ছুঁচটা শরীরের ভেতরে থেকে যাবে, কিন্তু যারা ওস্তাদ লোক তারা কায়দা করে অন্য ভাবে ব্যবস্থা নেবে।

অগস্ত্য মুনির এই অস্ত্রের বর্ণনা দিয়ে বাল্মীকি আরও বলছেন – *তেজসহস্রভুতানাং*, জগতে যত জিনিষ আছে তার সব তেজ দিয়ে যেন এটা তৈরী হয়েছে, সুর্যের মত তার থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে, সুবর্ণভূষিত, সোনা দিয়ে তৈরী, পাখির সুন্দর পালক দিয়ে সাজান। তীরের পেছনের দিকে পাখির পালক দেওয়া থাকে যাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দ্রুত গতিতে ছুটে যেতে পারে। বলছেন, এই অস্ত্র বিষধর সাপের মত বিষাক্ত। আর যে কোন মানুষ, হাতি, ঘোড়া যাই থাকুক তাকে বিদীর্ণ করে দেবে। আধুনিক যুগে বন্দুকে বিভিন্ন ধরণের বুলেট ব্যবহার করা হয়, একই বন্দুকে অনেক রকমের বুলেট ব্যবহার করে। হাতিকে মারার জন্য এক রকম বুলেট, বাঘকে মারার জন্য আরেক ধরণের বুলেট চালায়। এখানেও ধনুষ সেই একই কিন্তু তীরগুলো পাল্টে যাচ্ছে।

অগস্ত্য মুনি প্রদত্ত এই বাণকে শ্রীরামচন্দ্র এইবার তাঁর ধনুতে সন্ধান করেছেন। সন্ধান করতেই পুরো পৃথিবী যেন নড়ে উঠল। রাবণও বুঝতে পেরে গেছেন যে কিছু একটা হতে চলেছে, এবারে হয়ত এই অস্ত্র থেকে বাঁচা যাবে না। তীর যখন নিক্ষিপ্ত হয়ে গেল তখন রাবণ বুঝে গেলেন এর থেকে আমার আর নিস্তার নেই, তাইই হল। এখানে বলছেন – বাণের এমন গতি আর এমন শক্তি যে সেই বাণ রাবণের অমন শক্ত কবচকে ভেদ করে রাবণকে নিয়ে মাটিতে ঢুকে গেছে, এত বেগ তার।

এখন অন্যান্য রামায়ণে রাবণ বধের অনেক রকম কাহিনী পাওয়া যাবে কিন্তু এগুলো সবই কবির কল্পনা। তুলসীদাস যেমন বলছেন যে, রাবণের নাভিতে ছিল অমৃতকুম্ভ। সেই অমৃতকুম্ভ থেকে অমৃতের যোগান হত বলে রাবণকে কিছুতে মারা যেত না। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এমন এক অগ্নি বাণ রাবণের নাভিতে মারলেন যে তাতে সেই অমৃত সব শুকিয়ে গেল, এখন অমৃতের যোগান বন্ধ হয়ে গেছে এবার যত খুশি বাণ চালাও। এইভাবে রাবণকে মারা হয়েছিল। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে পাই, অগস্ত্য মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে একটা বাণ দিয়ে বলেছিলেন এই বাণ অমোঘ, যার ওপর এই বাণ চালান হবে সে আর কোন ভাবেই বাঁচতে পারবে না, অগস্ত্য মুনির এই বাণেই রাবণের শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছিল। আমাদের শাস্ত্রের একটা মজার ব্যাপার হল সব বাণকেই বলছেন অমোঘ, এটা খাটবেই খাটবে। তারপরেও দেখা যাচ্ছে সেই অমোঘ বাণেরও অনেক ফাঁক আছে। কারণ যাকে মারছে সেও তা জানে কিভাবে বাঁচতে হবে। এমনও দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্র মারছে তাও বেঁচে যাচ্ছে, মারণাস্ত্র চালাচ্ছে সেখানেও কেউ কেউ বেঁচে যাচ্ছেন, তবে সবাই বাঁচবে না, খুব অল্প কয়েকজনই বেঁচে যেতে পারে।

রাবণের মৃত্যুর পর এদিকে বিভীষণ কান্নাকাটি শুরু করেছেন, দাদাকে নিয়ে নানান রকম ভাবে বিলাপ করছেন। রাবণের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে বিভীষণ বলছে – **এষোহহিতাগ্নিশ্চ মহাতপাশ্চ বেদান্তগঃ কর্মসু চাগ্র্যশূরঃ।**৬/১০৯/২৩। আমার দাদা রাবণ ছিলেন অগ্নিহোত্রি পুরুষ, রোজ বেদের যজ্ঞ করতেন, তিনি ছিলেন মহা তপস্বী। বলছেন রাবণ কিভাব শিবের তপস্যা করেছিলেন, পরে ব্রহ্মার তপস্যা করেছিলেন। আমার দাদা রাবণ ছিলেন বেদান্তবেত্তা, তিনি শাস্ত্র জানতেন। রাবণ একদিকে ছিলেন সুরবীর, অন্য দিকে তিনি নিত্য যজ্ঞযাগ করতেন, আবার আরেক দিকে তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, অসুর বা রাক্ষস বলে যে বেদ জানে না তা নয়, তিনি বেদজ্ঞ, মানে শ্রীরামচন্দ্রের তুলনায় রাবণ কোন অংশেই কম ছিলেন না। রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিলেন, এটাই তাঁর একমাত্র দোষ। কিন্তু এমন বিরাট কিছু নয়। অন্যান রামায়ণে রাবণের বাকী যেসব দুর্গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কবিরা রাবণের উপরে চাপিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। বাল্মীকি কিন্তু তা করছেন না, তিনি রাবণকে আবার কিছুটা যেন উপরের দিকে নিয়ে আসছেন, হনুমান যখন রাবণকে প্রথম দেখছেন তখন রাবণের ব্যক্তিত্ব, তাঁর শৌর্য, ধৈর্য, তাঁর চেহারার মধ্যে পরাক্রমতার ছাপ দেখে হনুমান চমকে উঠছেন। রাবণকে দেখে পাতক বা পাপী বলে মনে হবে না, বাস্তবিকও রাবণ পাতক নয়, পাপীও নয় সে। যে বেদ বেদান্ত জানে, যে মহা তপস্বী, যে প্রতিদিন অগ্নিহোত্রের মানে বেদের যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, একদিকে রাবণ ঔপাচারিক পুরুষ, মানে যত রকমের যজ্ঞাদি হতে পারে তার অনুষ্ঠান করতেন, আবার অন্য দিকে বেদের দর্শনে সে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই রকম লোককে কি করে পাপী বলা যাবে!

বিভীষণ এই সব বলতে বলতে চোখের জল ফেলছেন আর শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন – **এতস্য যৎ প্রেতগতস্য কৃত্যং তৎ কর্তুমিচ্ছামি তব প্রাসাদাৎ।**।৬/১০৯/২৩। হে শ্রীরামচন্দ্র! মৃত্যুর পর মানুষের যে কর্মগুলো করতে হয় সেই কর্মগুলি করার অনুমতি আমাকে দিন। শ্রীরামচন্দ্র তখন বিভীষণকে বলছেন – হে বিভীষণ, এঁর শেষ সংস্কারগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়াসী হও, বলছেন – **মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তিং নঃ প্রয়োজনম্**।৬/১০৯/২৫। একটা মানুষের প্রতি শত্রুভাব মৃত্যু পর্যন্তই থাকে, মানুষ মরে যাওয়ার পর আর তার প্রতি শত্রুভাব রাখতে নেই। রাবণ এখন মৃত, আমার আর তার প্রতি কোন শত্রু ভাব নেই, তুমি এখন রাবণের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে পুরো সম্মানের সঙ্গে এঁর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান কর। যেরকম তুমি আগে তোমার দাদার স্নেহভাজন ছিলে, সাধারণ অবস্থায় যে সম্মান দাদার প্রতি তোমার ছিল, ঠিক সেই সম্মান দিয়ে তুমি এনার দাহ সংস্কার ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম কর।

রাবণের মৃত্যুর পর যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, সমস্ত বীরদের স্ত্রীরা বিধবা হয়ে গেছে, মন্দোদরী সাংঘাতিক বিলাপ করছেন, বাল্মীকি এসবের খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন। রাবণের মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরে মন্দোদরী কাঁদছেন, এরই মধ্যে মন্দোদরী খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – হে স্বামী! আপনি

আমাদের ছেড়ে এভাবে চলে গেলেন। আপনি এক অতি সাধারণ মেয়ে সীতার মোহে পড়ে এই রকম করলেন, আমাদের এই রাজমহলে সীতার থেকে দেখতে অনেক বেশি সুন্দরী যুবতীরা ছিল, কিন্তু আপনি সীতার প্রতি এমন কামাসক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে আপনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। মন্দোদরী নিজেকে সীতার সঙ্গে তুলনা করে বলছেন – **ন কুলেন ন রূপেণ ন দাক্ষিণ্যেন মৈথিলী**।৬/১১১/২৮ – হে নাথ, মৈথিলী, মানে সীতা, আমার থেকে কুলে বড় ছিল না, রূপেও বড় ছিল না আর দাক্ষিণ্যেও শ্রেষ্ঠ ছিল না, দাক্ষিণ্য মানে গুণের দিক থেকেও সীতা কোন অংশেই আমার থেকে শ্রেষ্ঠা ছিল না। আর - **মায়াধিকা বা তুল্যা বা তত্ত্ব মোহান্য বুধ্যসে**।।৬/১১১/২৮ – সীতা কোন দিক দিয়েই আমার থেকে শ্রেষ্ঠতো ছিলই না, এমনকি আমার সমানও সে কখনই ছিল না, কিন্তু মোহ আপনাকে এমন ভাবে গ্রাস করে নিয়েছিল যে এই ব্যাপারটাকে বোঝার ক্ষমতাই আপনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেইজন্য অকাল মৃত্যু এসে আপনাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিল, এই জগতে কারুর মৃত্যু অকারণে হয় না, এই সীতাই আপনার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল।

এর পরের দৃশ্যে, সীতাকে সংবাদ পাঠান হল। শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকেই আবার পাঠাচ্ছেন, হনুমানকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – যাও, গিয়ে সীতাকে বল, তোমাকে যে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল সে মারা গেছে, সীতা কি বলে শুনে এসে আমাকে জানাও। সীতা শুনে বলছেন ‘এরপর আমার কি আর কথা বলার আছে, আর সেই কথা শোনারই বা কি আছে, আমি শ্রীরামচন্দ্রের কাছেই ফেরত যাব, তিনি আমাকে জয় করেছেন, আমি তাঁর কাছেই যাব’। তখন সবাই সীতাকে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পাঠান হবে বলে ঠিক করা হল। কিন্তু সীতা বলছেন ‘না, আমি যেমন আছি তেমন ভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের কাছে যাব, স্নানও করব না, আমার মন প্রাণ শ্রীরামচন্দ্রে পড়ে আছে’।

সীতাকে এবার পাল্কী করে নিয়ে আসা হচ্ছে। যখন নিয়ে আসা হচ্ছে তখন সব বানর গুলো উৎসুক হয়ে সীতাকে এক নজর দেখতে চাইছে। বানরদের যেন এই ভাব, যার জন্য এত যুদ্ধ করলাম তাঁকে দেখতে কি রকম। সীতার পাল্কীর সাথে সাথে যে দেহরক্ষীরা আসছিল তার ডাণ্ডা মেরে, হাত দিয়ে ঠেলে ঠুলে বানর গুলোকে কাছে আসা থেকে আটকাচ্ছে। বানর গুলো যেমন যেমন সরে যাচ্ছে তখন অন্য দিক থেকে অন্যান্য বানরগুলো আবার দেখার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এইসব কাণ্ড দেখে শ্রীরামচন্দ্র খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। তিনি বলছেন – শোন! এই বানররা আমার হয়ে যুদ্ধ করেছে, এদেরকে এভাবে অপমান করো না। যখন কোন স্ত্রীকে রক্ষা করার থাকে তখন তাকে বাড়ি, বস্ত্র, প্রাচীর এই জিনিষ গুলো তাকে কখন রক্ষা করতে পারেনা। নারীকে একমাত্র রক্ষা করে তার স্বামীর প্রতি প্রেম ভালোবাসা। স্বামীর ভালোবাসাই স্ত্রীর ঠিক ঠিক রক্ষাকবচ। সেইজন্য আমি বলছি, তোমরা এভাবে সীতাকে নিয়ে এসো না, সীতাকে বল পায়ে হেঁটে আমার কাছে আসতে।

পর পুরুষের সামনে দিয়ে সীতাকে হেঁটে আসতে হবে ভেবে সবাই অবাক হয়ে গেছে। সীতা এখন পাল্কী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ঐ ভীড়ের মধ্য দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রে দিকে চলেছেন, সীতা লজ্জায় মাথা নত করে রেখেছেন, সব বানর গুলো অবাক হয়ে সীতাকে দেখছে। সীতা সবার আগে আগে যাচ্ছেন, বিভীষণ পেছনে পেছনে চলেছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের সামনে এসে সীতা দাঁড়িয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন ‘হে ভদ্রে! পুরুষার্থ দিয়ে যা করার ছিল আমি সবই করেছি। আমার উপরে এক কলঙ্কের বোঝা চেপে গিয়েছিল, আমার স্ত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে। এখন আমি এক সঙ্গে দুটোকেই শেষ করে দিয়েছি, এক তোমাকে উদ্ধার করে আমি আমার কলঙ্কের বোঝাকেও শেষ করেছি আর শত্রুরও নাশ করেছি। তুমি যখন পঞ্চবটী আশ্রমে একা ছিলে, তখন তোমাকে এই রাবণ অপহরণ করে নিয়েছিল, এই কলঙ্ক আমার উপর দৈব বশাৎ এসেছিল। দৈব বশাৎ মানে, যেটা হওয়ার ছিল না, কিন্তু হয়ে গেছে, এটাকে আমি পুরুষার্থ দিয়ে স্খালন করেছি। কোন মানুষের যদি বদনাম হয়ে যায়, অপমান বা কলঙ্কের বোঝা চেপে যায়, সেই মানুষ যদি নিজের তেজ, শক্তি দিয়ে ঐ

অপমান বা কলঙ্কের বদলা না নেয়, তাহলে সেই মানুষের যতই তেজ থাকুক, কিন্তু ঐ তেজের কোন মূল্যই নেই’।

‘হে সীতা, তুমি একটা ব্যাপার খুব ভালো করে জেনে নাও, আমি কিন্তু তোমাকে পাবার জন্য এত বড় যুদ্ধ করিনি। তুমি যদি মনে করে থাক, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার জন্য, তোমাকে ফেরত পাবার জন্য আমি এত বড় নরসংহার করেছি, তাহলে তুমি কিন্তু ভুল করবে, আমি এই রকম নীচ কামীপুরুষ নই। আমি হলাম ক্ষত্রিয়, আমি রাজা, আমার উপর একটা কলঙ্ক এসে গিয়েছিল, আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়েছে, আমি তার প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি, ব্যস্ আমার কাজ শেষ। এবারে তুমি যা চাও তাই করতে পার। তুমি কি কি করতে পার? তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে ভরতের কাছে চলে যেতে পার, ভরত তোমার খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করে দেবে, বা তুমি এই লঙ্কায় বিভীষণের কাছে থাকতে পার কিংবা আমার বন্ধু এই সুগ্রীবের ওখানে গিয়েও থাকতে পার, আমার সাথে তোমার আর কোন সম্পর্ক নেই। আর তোমার জন্য – **এতা দশ দিশো ভদ্রে কার্যমস্তি ন মে ত্বয়া।**।৬/১১৬/১৮। হে সীতা, তোমার জন্য দশটি দিকের সব দিকের দরজাই খোলা আছে, তোমার যেদিকে খুশি চলে যেতে পার। আর **কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোষিতাম্।**।৬/১১৬/১৯। কোন্ কুলিন লোক আছে, কোন্ ভদ্র বংশের লোক আছে, যার স্ত্রী এতদিন অপরের বাড়িতে বাস করেছে, তাকে সে আবার বাড়িতে ফেরত নেবে। একদিন দুদিন নয়, মাসের পর মাস এতদিন ধরে তুমি রাবণের কাছে বাস করে গেছ। রাবণ তোমাকে নিজে কোলে করে তুলে নিয়ে গেছে, যে রাবণের পাপদৃষ্টি তোমার উপরে পড়েছে। তাই এটা কখনই হতে পারেনা যে তার কাছে এতদিন থাকার পরও তোমাকে সে ভোগ করেনি। আমার নিজের একটা সম্মান আছে, আমি তাই তোমাকে আর নিতে পারলাম না।

সীতার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের এই বাক্যবাণ নিক্ষেপ হতেই বিরাট হৈচৈ পড়ে গেছে। সীতা তো চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে, বানর গুলোও হায় হায় একি হল বলে নিজেদের মধ্যে চাপা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের ভয়ে কেউ একটা টু শব্দ করতে পারছে না।

এইসব কাণ্ড হয়ে যাওয়ার পর সীতা তখন বলছেন – আমার উপর যখন এত বড় কলঙ্ক লেগে গেছে, ঠিক আছে তাহলে আমি অগ্নিতেই প্রবেশ করব। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে গেলেন, সেই সময় দেবতারা অগ্নিদেবতাকে শীতল হতে অনুরোধ করলে অগ্নিদেবতা শীতল হয়ে গেলেন। তারপর দেবতারা সীতাকে অগ্নি থেকে বের করে এনে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে বলছেন সীতার আদপে কোন কলঙ্কই নেই, সীতা নিষ্কলঙ্ক।

অগ্নিপরীক্ষার ভাবটা আমাদের ভারতীয় পরম্পরাতে অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। দুজনের মধ্যে একটা বিবাদ হয়েছে, এবার একজনের সততাকে যাচাই করা হবে। তাকে যদি বলা হয় আপনি সত্যিই যদি নির্দোষ হয়ে থাকেন তাহলে আগুনে হাত দিয়ে বলতে পারবেন আপনি নির্দোষ? তখন শরীরে রাগ এত প্রচণ্ড থাকে, আমার উপর মিথ্যে কলঙ্ক চাপাচ্ছ, এই রাগের তেজেই সে আগুনে হাত দিয়ে দেবে, হাত পুড়ে যাবে তো যাক। ভারতে আগে সতীদাহ প্রথা ছিল, কিন্তু পরে ইংরেজরা এই প্রথাকে আটকাবার জন্য যাকে সতী করা হবে তাকে আগে আগুনে হাত পুড়িয়ে পরীক্ষা দেওয়ার প্রথা চালু করল। আগুনের তাপ থেকে বাঁচার জন্য মৃত স্বামীর স্ত্রী যদি ভয়ে হাত সরিয়ে নেয় তাহলে তাকে আর সতী করা যেত না। তখন নিজের স্বামী মারা গেছে, স্বামীর মৃত্যুকে নিয়ে তখন মনের ভিতরে এত শোকের জ্বালা, এত বেদনা তাতে সে তোয়াক্কাই করত না যে তার হাত পুড়ছে কি পুড়ছে না। অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপারটা এই রকমই ছিল, বাল্মীকি আবার অগ্নিপরীক্ষার এই ধারণাকে একেবারে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে অন্য একটা রূপ দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করছে, অগ্নিদেবতা তাঁকে আবার নিজে থেকে বার করিয়ে আনছেন। হয়তো বা এটাই হবে যেটা আমরা আলোচনা করলাম, সীতার উপর কলঙ্কের বোঝা চাপান হয়েছে তখন সীতা মনের দুঃখে, ক্ষোভে, যন্ত্রণায় আগুনে হাত দিয়ে বলছেন, এই নাও আমি আগুনে হাত

দিয়ে বলতে পারি আমি যেমন পবিত্র ছিলাম সেই রকম পবিত্রই আছে। আগুনে হাতটা যা পুড়ে যাবার যাবে, তা যাক কিন্তু আমি নিষ্পাপ।

এইসব হয়ে যাওয়ার পর তখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলছেন – হে সীতা! আমি কিন্তু কখনই তোমাকে সন্দেহ করিনি, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য, তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে এটুকু করতে হয়েছে, তুমি যে পবিত্র, নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক সেটা প্রমাণ করবার জন্য আমি এত সব করেছি। আমি যদি তোমাকে সরাসরি নিয়ে নিতাম তাহলে লোকে যেমন তোমার কলঙ্ককে সন্দেহর চোখে দেখতে, আমাকেও ভাবতো আমি এক কামুক পুরুষ বলে এক কলঙ্কিত নারীকে সে আবার নিজের কাছে নিয়ে এসে সহজ জীবন যাপন করছে।

সব কিছু মিটে যাওয়ার পর যখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে পুষ্পকযানে করে ফিরে আসছেন তখন সীতাকে দেখাচ্ছেন, এখানে আমি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পূজো করেছিলাম যাতে সেতুবন্ধ করা যায়। আবার একটি বিশেষ জায়গাকে লক্ষ্য করে দেখাচ্ছেন কোথায় সুগ্রীবের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। পরের পর অনেক জায়গা দেখিয়ে সীতাকে সেইসব জায়গার সাথে শ্রীরামচন্দ্রের কি স্মৃতি জড়িত তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। এরপর আবার ভরদ্বাজ ঋষির সঙ্গে দেখা হল, ফেরার পথে মিত্র গুহকের সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর সবাই অযোধ্যাতে ফিরে এলেন।

যুদ্ধকাণ্ডের পর শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। এইখানে এসেই বাল্মীকি তাঁর রচনাকে শেষ করে দিয়েছেন। কিন্তু পরে এনারা যুদ্ধকাণ্ডের পর উত্তরকাণ্ড নামে আরেকটি কাণ্ডকে রামায়ণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। উত্তরকাণ্ডে এসে অনেক কাহিনী তার আবার নানান ব্যাখ্যা ইত্যাদিকে আনা হয়েছে, তবে উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচনা কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু মূল কথা হল শ্রীরামচন্দ্র রাজা হয়ে গেছেন, সীতা সঙ্গে আছেন, আর রামরাজত্বে কোথাও চোর ডাকাত ছিলনা, সবাই ধর্মপরায়ণ ইত্যাদি বলে রামরাজ্যের বর্ণনা করে বাল্মীকি কাহিনীকে শেষ করে দিয়েছেন।

কিন্তু লব-কুশ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে রামকথা গান করে শোনাচ্ছেন এই কাহিনী গুলো আসছে উত্তরকাণ্ডে। বাল্মীকি রামায়ণেও প্রথমের দিকেই ছিল যে বাল্মীকি লব-কুশকে গান শিখিয়েছেন, তারা গিয়ে গান গেয়ে শোনাচ্ছেন, কিন্তু সেই অংশটা আবার বাল্মীকি নিজে লেখেননি, বাল্মীকি রামায়ণের ঐ অংশটুকু আবার প্রক্ষিপ্ত, কারণ সেখানেই লিখছেন *তপঃস্বাধ্যায়নিরতং*, বাল্মীকির মত ঋষি কখনই নিজের নামে নিজে বিজ্ঞাপন লিখবেন না, এগুলো তাঁর শিষ্যরা পরে ঢুকিয়েছেন। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা থেকে শুরু করে রামরাজ্য স্থাপন পর্যন্ত বাল্মীকির নিজের রচনা বলেই মনে করা হয়।

এইখানেই আমরা এতদিনের বাল্মীকি রামায়ণের আলোচনা ‘জয় রাজা শ্রীরামচন্দ্রকি জয়’ বলে শেষ করছি।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু